সঙ্গিন প্রনয়াসক্তি

suraiya rafa

ভালোবাসা একটি চার অক্ষরের বিশাল অর্থবহ তাজা অনুভূতির রাজ্য। এ অনূভুতি কে কখনো কখনো বিশ্লেষণ করে হাজারটা রুপ দান করা যায়।প্রেম, প্রনয়, মোহ,ঘোর,আসক্তি আরও কত কিই,আবার কারও কারও কাছে এটি “সঙ্গিন প্রনয়াসক্তি” বা(**unhealthy obsession**)।

ভালোবাসার বিশ্লেষণ যেমন সবার কাছে এক’নয়, তেমনই সবার ভালোবাসার ধরনটাও ঠিক এক’রকম নয়।কিছু মানুষের ভালোবাসা সদ্য ফোটা ভৃঙ্গরাজ পুষ্পের ন্যায় আকর্ষনীয় আর সুরভীত।তাদের হৃদয়ের আদ্যপান্ত মিলনে ইষার্ন্বিত হয়ে কত প্রশংসাই না করে মানুষ। অলিতে-গলিতে বন্ধু মহল থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের আড্ডা পর্যন্ত তাদের নিয়ে চলে দিনভর আলোচনার বহর, কি করে তৈরি হলো এমন যুগল?? এতো রাজযোটক।কোনো দিন ভাঙবে না।আরও কত কিই!!!!অন্যদিকে এই পুষ্পরেণুর মতো ভালোবাসার বিপরীতে যে শুধুই ঘৃনার বসবাস তেমনটা নয়, ওই যে বললাম ভালোবাসারও ধরন হয়। কেউ কেউ এসব গঁদবাধা ভালোবাসার নিয়মে গা ভাসাতে পারেনা কোনো কালেই, খালি মুখে ভালোবাসি কথাটা উচ্চারন করাটাও যেন হিমালয় জয় করার মতো এডভেঞ্চারাস আর থ্রিলিং তাদের কাছে, তাই সেসব কিন্তু ওয়ালা মানুষগুলোর ভালোবাসা প্রকাশের

ধরনটাও হয় কিছুটা ভিন্নরকম, সেখানে অনুভূতি প্রকাশের থেকে আদায়করার স্পৃহাটাই বেশি কাজ করে।সেই আদায় করার ধরনটা যেমনই হোক,জোর করে কিংবা তার থেকেও কোন কুৎসিত পন্থায় (এট এ্যনি কষ্ট)।

কারও কাছে সে ভালোবাসা বিষাক্ত তো কারও কাছে অসুস্থ।

কারও মতে এ আবার কেমন ভালোবাসা, এটা কোনো কালেই ভালোবাসা নয়,নিছকই আসক্তি, ভয়ানক আসক্তি। আবার ইঁচড়েপাকা, ডার্ক রোম্যান্স দেখে দেখে ফরেইন কালচারে বেড়ে ওঠা অষ্টাদশীদের কাছে ইটস কল্ড ডেঞ্জারাস লাভ।এতো এতো বিশ্লেষণ আর চর্চার বাইরে গিয়ে আরও একধরণের অনুভূতি রয়েছে, এটা অনেকটা একপাক্ষিক ভালোবাসা বা অনসাইড লাভ। হৃদয়ের সুপ্ত অনুভূতির কথা তাকে না জানিয়েও কি সুন্দর দিনরাত অতিবাহিত করে দেওয়া যায় তাকে কল্পনায় ভালোবেসে। একটিবার চোখের দেখা দেখেও নরম হৃদয়টা পুলকিত হয়ে ওঠে মূহুর্তেই। ভালোবাসা টইটুম্বুর হয়, ভরে ওঠে হৃদয়ের কানায় কানায়,ভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে বই আস্তরিত ফাঁকা লাইব্রেরীর এককোনের ছোট্ট টেবিলটায় সেই শ্যাম পুরুষকে দেখার জন্য কত যায়গাতেই না ছুটে বেড়ায় বেপরোয়া সর্বনাশা মনটা, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে মনের অধিকারী র’ক্তমাংসের মানুষটাও।আপন মনকে অন্যজনের নিয়ন্ত্রনে ছেড়ে দিলে এই হয়। ক্যাম্পাসে এসে তাকে এক নজর না দেখা অবধি অশান্ত মনটা দমার নামই নেয়না। এই যেমন এই মূহুর্তটা মনটা কেমন ঝিমিয়ে

যাওয়া ম'রা বিকেলের ন্যায় শান্ত হয়ে আছে। উচ্ছ্বাস আকাংঙ্খা সবকিছু দমে গিয়ে তৃষ্ণার্থ চোখ জোড়া সবচেয়ে পছন্দের শ্যাম পুরুষটিকে দেখতে ব্যাস্ত। সেকেন্ড, মিনিট,ঘন্টা অতিবাহিত হয়,তবুও তাকে দেখে দেখে চোখ দুটো ক্লান্ত হয়না, কি আছে এই শ্যাম পুরুষের মাঝে?? আহামরি তো কিছু নয়, হলিউড কিংবা বলিউড হিরোদের মতো পেশীবহুল গৌড় বর্ন ও নয়। ছিমছাম গড়নের শ্যাম পুরুষ সে, বেশ লম্বা চওড়া মানুষটা আর সবচেয়ে সুন্দর তার হাসি, হাসির সাথে সাথে কি সুন্দর ঠেউ খেলে যায় টোল পরা গাল দুটোতে। ফাঁকা লাইব্রেরীতে সবচেয়ে কর্নারের টেবিলটায় ঠিক মুখো মুখি হয়ে বসে আছে নিখিল ভাই। এটা বোধ হয় নিখিল ভাইয়ের পছন্দের যায়গা ওই জন্যই তো প্রতিদিন এসে এখানটায় বসে বই পড়ে। পড়বে নাই'বা কেন ভার্সিটির তুখোর ছাত্র নিখিল ভাই,ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে সমাবেশ কিংবা নির্বাচন সব কিছুতেই নিখিল ভাইয়ের অগ্রাধিকার, সেই যের ধরে ভার্সিটির ভিপিও তিনিই। এক নামে সবাই চেনে,তবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটুও কম্প্রোমাইজ করেননা তিনি, এই যে এখনো বই পড়ছে, কানে হেডফোন গুঁজে বইয়ে মুখ ডুবিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে , এই সিনটা দেখতেও মারাত্মক লাগছে, লাগবেই তো এতো কাছ থেকে নিখিল ভাইকে দেখার সুযোগ হয়নি কোনো কালেই। মনে হচ্ছে সময়টা এখানেই আটকে যাক। আজ লাইব্রেরিটাও বেশ ফাঁকা, সিনিয়র রা তেমন কেউই নেই। এই সুযোগে নিখিল ভাইয়ের সাথে দু'একটা কনভারসেশন এগোলে ক্ষতি কি??–নিখিল ভাই,এই যে নিখিল ভাই.......লাজুক হেসে টেবিলে টক

টক করে সামান্য টোকা দিয়ে ডাকছে অরু, তবুও নিখিল ভাইয়ের হেলদোল নেই কোনো। একবার তাকালো না পর্যন্ত আশ্চর্য এভাবে উপেক্ষা করার কি হলো?অরুর বুঝি খারাপ লাগেনা? লজ্জা আর আত্মসম্মানের মাথা খেয়ে অরু আবারও ডাকলো তাকে,কিন্তু এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, নিখিল ভাই কোনোরূপ সারা দিলোনা বরং ওর দিকে না তাকিয়েই বাম হাত দিয়ে একটা ছোট্ট সাইজের এলার্ম ঘড়ি এগিয়ে দিলো ওকে, যেটা এই মূহুর্তে বাজখাঁই আওয়াজ তুলে কানের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে।

–ইশ কি বিরক্তি কর, এটা কেন দিলেন নিখিল ভাই??এবারও নিখিল ভাই নিশ্চুপ, বরং এলার্মের বিরক্তিকর শব্দটা আরও দিগুণ জোরে বাজিয়ে দিলেন তিনি, এলার্মটা বিরক্তির আওয়াজ তুলে কর্নকূহর ছাপিয়ে মস্তিষ্কে এসে লাগছে এবার, কানের পর্দা ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম। নাহ আর নিতে পারলো না অরু,বিরক্তির চড়ম পর্যায়ে গিয়ে শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠলো,

— এটা বন্ধ করুন নিখিল ভাই উফফ আর সহ্য হচ্ছে নাআআআ.. একপর্যায়ে গায়ের কম্ফোর্টারটা ছুড়ে ফেলে হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসলো অরু।ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি.. চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে উঠতে একটু সময় লেগে গেলো ওর,যখন বুঝে উঠলো তখন প্রতিদিনের মতো প্যালেসের ন্যায় মাস্টার বেডরুমের কিং সাইজ বিছানায় নিজেকে আবিস্কার করলো অরু। ঠোঁট কামড়ে একটা চাঁপা নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে নিজের হাটু অবধি লম্বা

সিল্কি চুল গুলোকে মেসি বান করে বিছানা ছাড়লো ও, তারপর সবার আগে বন্ধ করলো বিরক্তিকর অ্যালার্মটাকে।

একে একে পুরাতন জানালার ভারী পর্দা গুলো সরিয়ে রুমটাকে আলোকিত করে বসে পরলো ল্যাপটপ নিয়ে ,,তারপর সেই বিরক্তিকর কাজ মেইল পাঠানো।

গত একবছর ধরে এটা ওর রুটিনে রুপান্তরিত হয়েছে, আপা যে কেন বুঝতে চায়না কে জানে?আবারও ভেতরের আহত বাতাসকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে নিংড়ে বের করলো অরু।মেইল পাঠানো শেষ হলে,শক্ত কাঠের চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে উদাসীন চোখে বাইরে চাইলো অরু,ওর

পড়নে কোন দামি পাজামা সেট নয়, বরং সিম্পল প্লাজো আর একটা ওভারসাইজ টিশার্ট, সাধারন বাঙালি মেয়েরা যা পরে ঘুমায় আর কি, এই রুমের বিশাল জানালার কারুকাজ করা লৌহ গাট গলিয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু বাগানবিলাশের ছড়াছড়ি, এখন বসন্ত চলছে তাই একটু বেশিই সুন্দর লাগছে বাড়ির ফ্রন্ট ইয়ার্ডটা।

পুরান ঢাকায় যতগুলো প্রাচীন আর নাম করা বাড়ি আছে তার মধ্যে এই বাড়িটা অন্যতম। লোকমুখে শোনা যায় এ বাড়ির পূর্ব পুরুষরা নায়েব -গোমস্তা ছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এদের বংশপরম্পরায় নেতৃত্ব আর আভিজাত্য ভাবটা রয়েই যায়, তাইতো যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম সবাই রাজনৈতিক কর্নধার হয়ে নাম লিখিয়ে এসেছেন। এই বাড়িটা ঠিক কোন প্রজন্মের জানা নেই অরুর তবে বাড়িটা বেশ পুরোনো।

প্রায় দশ বিঘা জমি নিয়ে তৈরি এ বাড়িটাকে ছোট খাটো ড্রিম হলিডে বললে মন্দ কিছু হবেনা।

মহলের সদর দরজা থেকে গেইট অবধি যেতে মিনিট দশেক টাইম লেগে যায়, ধীরে সুস্থে হাটলে তার চেয়েও বেশি। তারপর চোখে পরে অযত্নে ইতি-উতি বেড়ে ওঠা বাগান বিলাসে ঘেড়া দানবাকৃতির বিশাল গেইট। তাতে মার্বেল পাথর দিয়ে গুটিগুটি অক্ষরে লেখা" ক্রীতিক কুঞ্জ "।

বছর ত্রিশেক আগেও বাড়ির নাম কিংবা গেইটের চেহারায় ভিন্নতা ছিল, কিন্তু ত্রিশ বছর আগে এ বাড়ির ছোট কর্তার জন্মের পরই তার দাদাসাহেব এক মাত্র আদরের নাতির নামে বাড়ির নাম পরিবর্তন করেন। ইট পাথর আর লোহায় ঘেরা গেইটকে সর্বেসর্বা বিদায় জানিয়ে মার্বেল পাথরের গেইট নির্মান করেন সে'ই, বাড়ির নাম পরিবর্তন করে রাখেন "ক্রীতিক কুঞ্জ"।সময় পাল্টেছে, সময়ের তালে তালে বদলে গেছে কতৃত্ব আর আভিজাত্যে মোড়ানো মানুষ গুলোওও। একে একে খালি হয়েছে ক্রীতিক কুঞ্জ। তাদের দাম্ভিকতা কিংবা রাজনৈতিক অবদান এখন কেবলই লোক মুখের বুলি মাত্র। এতো কিছু বাদ দিলেও রিয়েলস্টেড বিজনেস নিয়ে এ পরিবার এগিয়েছে অনেক দূরে..... দেশ ছাপিয়ে বিদেশে সগৌরবে দাপিয়ে বেড়ায় এদের পারিবারিক বিজনেস। সবাই এক নামে চেনে, দেশিয় পন্যের থার্টি পাসেন্ট জোগান এদের পারিবারিক ব্যাবসা থেকেই আসে,শুধু উচ্ছ পদস্থ না,সয়ং সরকারওও আজকাল মুখে লাগাম দিয়ে কথা বলে এদের সাথে।–আনফরচুনেটলি এই

পরিবারের শুধু টাকাই আছে পরিবার বলে কিছু নেই, আপসোসের সুরে বলে ওঠে অরু। তখনই নিচ তলা থেকে অনুর রাশভারী কন্ঠস্বর শোনা গেলো,

–অরু এই অরুর বাচ্চা খেতে নাম, আমি কি এখন পালকি নিয়ে আসবো? হসপিটালে যেতে দেরি হলে তোর খবর আছে।

শুনেই বোঝা যাচ্ছে বেজায় চটে আছে সে।

অরু দ্রুত চেয়ার ছেড়ে দেওয়াল ঘড়িতে চোখ রাখলো, নয়টা বেজে পয়ত্রিশ,

— এই রে..হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে সময় শেষ করে ফেলেছি, তারউপর আজ আবার ভার্সিটিতে যাওয়ার প্লান আছে, নিচে গেলে আপা নির্ঘাত কথা শুনিয়ে পেট ভরিয়ে ফেলবে... এখন কি করি?বিশাল হলরুমের এক কোনে রান্নাঘর, তার পাশেই ছোট একটা ডাইনিং, চারজন মতো বসার যায়গা হবে।সেখানেই খাবার সাজাচ্ছে অরুর বড় আপা অনু। এ বাড়ির কোনো কিছুই না পারতে ব্যাবহার করেনা অরুরা। যতটুকু না করলেই নয়,ঠিক ততটুকুতেই ওরা অধিকার খাটায়।

অনু খাবার সার্ভ করতে করতেই রেডি হয়ে নিচে নামে অরু, পরনে সেটে আছে টপস আর স্কার্ট, হাতে পুঁথি দিয়ে তৈরি বানজারা ব্যাগ।

অরু কে দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো অনুর। অরুর পরিপাঠি রুপ দেখে তেতিয়ে উঠলো মস্তিষ্কটা, রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো অরু চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে।— এতোক্ষণে আসার সময় হলো

তোর? রুমে দরজা আটকে কি করিস এতো? তোর জন্য আমার হসপিটালে যেতে কতটা দেরি হয়ে গেলো দেখলি??

— অরু রুটি আর ডিমের রোলে কামড় বসাতে বসাতে বললো, রেডি হচ্ছিলাম আপা।

— প্রতিদিনই তোর রেডি হতে লেট হয়? আর রেডি কেন হয়েছিস? কতবার বলেছি ভার্সিটিতে যাওয়ার দরকার নেই, আমি একা এতো কিছু সামলাতে পারছি না হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। নিঃশ্বাসের পাল্লা ভারী হয় অনুর।

অনুর হাজারটা অভিযোগেও অরু নিশ্চুপ। শুধু ছোট্ট করে প্রশ্ন করে, মা এখন কেমন আছে আপা?

অনু আবারও ঝাঁঝ নিয়ে বলে,

— সেটা নিজে গিয়েই বরং দেখে আয়। — আমার দেখতে ভালো লাগেনা আপা, বড্ড কষ্ট হয় মাকে এভাবে নিথর হয়ে শুয়ে থাকতে দেখতে, হসপিটালের ডেটল আর হেক্সাসল এর গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। শ্বাস নিতে পারিনা আমি।

অরুর কথায় অনু আড়ালে নিঃশ্বাস ছাড়ে, মায়ের অসুখের পর থেকে ওর ডান পিঠে দুরন্ত বোনটা নিজেকে অনেক সামলেছে,যে মেয়ে সারাদিন হুরোহুরি আর বান্ধবীদের নিয়ে মেতে থাকতো সেই মেয়ে ঘরকুনো হয়েছে, হাজারটা অহেতুক বায়না ধরা মেয়েটা প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে এখন আর একটা কথাও বলেনা। অরুর মতো মুক্ত বাতাসে ডানাঝাপটানো মেয়ের জন্য এই পরিবর্তন অনেক কিছু, এতো অল্প বয়সে আর কতইবা সামলাবে নিজেকে ও?

অরুর বয়স কম সবে উনিশে পা দিয়েছে, তাইতো অনু নিজেই ওকে এসব হসপিটালের ঝুটঝামেলা থেকে দুরে সরিয়ে রাখে, আবার নিয়তির সাথে পেরে না উঠে নিজেই বিরক্ত হয়ে যায় বারংবার, সে বিরক্তি নিজের মধ্যে আটকে রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে ওর জন্য,গুমরে মরা অশান্ত হৃদয়টাকে একটু হালকা করার দায়ে মাঝেমধ্যেই বহিঃপ্রকাশ ঘটে চড়াও মেজাজের, যার ভুক্তভোগী হয় ওর ছোট্ট বোনটা। অনু নিজেকে বহুবার বুঝিয়েছে আর যাই হোক ছোট বোনের ওপর রাগ ঝাড়বে না, কিন্তু দিন শেষে, মায়ের অসুখ, বাড়ি হসপিটাল-হসপিটাল বাড়ি এই করতে করতে নিজের খেইর নিজেই হারিয়েছে।

–আপা আমি গেলাম, আগামী একসপ্তাহ কোথাও যাবোনা, রান্না বান্না সব আমি করবো তবুও প্লিজ রাগ করিস না তুই।

— এই শোন, অনুর অযাচিত ডাকে পেছনে ঘুরলো অরু।

— ইমেইল...

অনু কি বলবে সেটা বোধ হয় অরু জানতো, তাই এগিয়ে এসে বললো, ইমেইল পাঠিয়ে দিয়েছি।

— কোন রিপ্লে এসেছে??

অরু তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে,

— আপা তুইও না, গত এক বছর ধরে একটানা ইমেইল পাঠানোর পরেও যেখান থেকে একটা রিপ্লে আসেনি,হুট করেই সেখান থেকে রিপ্লে চলে আসবে? এতোটাও বেশি আসা করিস না।

কথা শেষ করে গট গট পা ফেলে প্যালেসের মতো বিশাল মহল ছেড়ে বেরিয়ে যায় অরু।

অরু চলে যাওয়ার পরে.. অনু আনমনে বলে, আমার বিশ্বাস অরু কোনো একদিন ঠিক রিপ্লে আসবে, আর আমরা মাকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশেও নিয়ে যাবো। যেদিন মা আবারও সুস্থ হয়ে ফিরবে, তোর আর আমার দুঃখ সেদিনই ঘুচবে।জটলা পাঁকানো চুলের মতো পুরান ঢাকার রাস্তা গুলোতে ইলেকট্রনিক তারের ছড়াছড়ি, রাস্তার দু ধারে লোহালক্কড়,হলুদ,মরিচ,শাড়ী, বিরিয়ানি আর গুড়ের পাইকারি দোকানের মরচে পড়া গন্ধ। কখনো কখনো সেই গন্ধটা নাকে উৎকট লাগে,আবার কখনো বেশ ভালো। মাথার উপর সূয্যি মামা তীর্যক আলো ছড়াচ্ছে, আজ বোধ হয় ভালোই গড়ম পরবে, দু'ধারে দোকান পাঠ ছাপিয়ে টিংটিং আওয়াজ করে জগন্নাথবিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অটোচালিত রিকশা, তাতে চেপে বসে আছে অরু।

পুরো নাম,মেহরীন শেখ অরোরা। এই বছরই ভার্সিটিতে এডমিশন হয়েছে ওর। তবে নতুন নতুন বড় হয়ে যাওয়া, ভার্সিটির আনন্দ, কিংবা বন্ধুমহল কোনো কিছুই ছুতে পারেনি ওকে, কারন একটাই মায়ের হার্টের অসুখ। আগে তাও হেটে চলে আসতে পারতো কিন্তু গত একবছর ধরে হসপিটালের এক কামরার বেডে শুয়ে দিনাতিপাত করে ওর মা আজমেরী শেখ। মায়ের দিনরাত দেখভাল করতে হয় বলে বড় বোন মেহবীন শেখ অনন্যা ইন্টারমিডিয়েটের পরেই পড়াশোনার ইতি টেনেছে।অরু জানে ওর

বড় আপা এতো রগচটা কোনোকালেই ছিলনা, গত একবছর ধরেই এমন হুটহাট রেগে যায় আপা, আর এও জানে পরিবারের জন্য আপার কত বিষর্জন, এমনটা নয় যে অনু বয়সে অরুর থেকে খুব বড়, পিঠেপিঠি বোন ওরা দুজন,তবুও অনুর কত ত্যাগ।

তাইতো আপার রাগের মাথায় বলা সবচেয়ে তিক্ত কথাগুলোকেও গায়ে মাখেনা অরু।

অরুর উদাসীন ভাবনার ইতি টেনে রিকশা এসো পৌঁছালো গন্তব্যে।

ভার্সিটির গেটে দাঁড়িয়ে লম্বা করে শ্বাস নেয় অরু, এই একমাত্র যায়গা যেখানে এসে একটু প্রানভরে সস্থির নিঃশ্বাস নিতে পারে অরু। সেই সাথে সস্থিদায়ক মানুষটার একটিবার দেখা মিললে তো আর কথায়ই নেই।

যাকে নিয়ে ও রোজ স্বপ্ন দেখে, সুন্দর সপ্ন। অরু জানে নিখিল ভাইয়ের সাথে কমিটমেন্ট কিংবা মুখ ফুটে দুটো কথাবলার সাহস ওও ওর নেই। তারউপর নিখিল ভাই ভার্সিটির সিনিয়র, গ্রাজুয়েশন ও এবছর শেষ তার। তবুও বেহায়া মনটা মানেনা। প্রিয় মানুষের স্কেচ বোর্ডে তার মুখটাই এঁকে ফেলে বারবার। –কবে যে নিখিল ভাই নিজে এসে বলবে, অরু শোনো, আমি ও তোমাকে পছন্দ করি,মনের রঙ তুলির ক্যানভাসে আমিও তোমাকে আঁকি।

–সেই আশায় সেগুড়ে বালি।

পেছনে নীলিমার কাঠকাঠ প্রতিউত্তর শুনে অরুর হাসিহাসি দাঁত কপাটি বন্ধ হয়ে গেলো। মুখটা এইটুকুনি করে বললো,

— তুই আমার মনের কথা শুনলি কি করে?

— যেই টোনে বলছিলি,আমি কেন রিকশা ওয়ালা মামারাও শুনেছে আমি শিওর।

— আপসোস শুধু নিখিল ভাইই শুনলো না।

— কি করে শুনবে? তুইতো তাকে দেখলেই চোরের মতো যথাতথা লুকিয়ে পরিস।

— তা ঠিক চল ভেতরে যাই।

গেট পেরিয়ে ক্যাম্পাসে যেতে যেতে নীলিমা বলে,— আন্টির কি খবর??এখন কেমন আছেন?

— একই রকম।আজকেও আপার বকুনি খেয়ে এসেছি।

নিলীমার শান্তনার বাণী বহু আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে,ঘটে যা ছিল সব কিছু দিয়েই অরুকে বুঝিয়েছে ও তাই এখন আর বলার কিছু নেই। শান্তনা না দিয়ে হয়ে উল্টো প্রশ্ন ছুড়লো নীলিমা।

— তোর ভাইয়ার কোম্পানি থেকে ইমেইল এসেছিল??

কথাটা বলতে একটু অসস্থি হলো নীলিমার, কারন সব ব্যাপারে মুখ খুললেও এই ব্যাপারটা সবসময়ই এরিয়ে যায় অরু, খুব বেশি হলে হুম হা করে উত্তর দেয়।

এবারও তাই হলো, এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে না জবাব দিলো অরু।

নীলিমার রাগ হলো কেন যেন, যদিও ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অরুর ব্যাক্তিগত তবুও এ কেমন ছেলে?? মায়ের খোজ নেয়না, ইভেন

কোনোরকম যোগাযোগ নেই পর্যন্ত। আজকালকার যুগে ইমেইলে কেউ যোগাযোগ করে?

নীলিমা রাগ সংবরণ করতে না পেরে বলেই ফেললো, কেমন ভাই তোর মাকে এভাবে দেশে ফেলে রেখে নিজে বিদেশে পরে আছে??

অরু মেকি হাসলো, হুট করেই নীলিমার রাগের কারন ধরতে পারলো না, তবুও নরম সুরে বললো,–হি ইজ নট মাই সিবলিং।

— তাহলে?? স্টেপ ব্রাদার, মানে আঙ্কেলের দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে তাইতো??

অরু আবারও হাসে এই মেয়ের এতো কৌতূহল কেন?

—- নাহ তেমন কিছুও নয়।

— তাহলে কেমন ভাই তোর??

নীলিমার কথার পেছনে অরু কিছু বলতে যাবে তার আগেই ওদের মাঝে তিথি চলে আসে।

আর মি. জায়ান ক্রীতিককে নিয়ে চলমান রহস্যময় কনভারসেশনের ওখানেই ইতি ঘটে। বসন্তের সকাল,চারিদিকে মৃদুমন্দ ঝিরিঝিরি বাসন্তিক হাওয়া বইছে, কতইবা বেজেছে দশটা কি এগারোটা তবুও মাথার উপর চলছে সূর্য্যের তান্ডব নৃত্য। শীত যাবে যাবে করে এখনো যায়নি, তার আগেই সূয্যি মামা তার প্রখরতা দিয়ে ধরনী উত্তপ্ত করে দিয়েছে।

সূর্য্যের তীর্যক রশ্মিকে পিঠে পিছলে দিয়ে একপ্রকার ছুটে বটতলার ছায়ার নিচে এসে দাঁড়ালো তিথি।

ওখানে অরু আর নীলিমা ওও ছিল। –কিরে এভাবে ছুটে এলি কেন? কিছু হয়েছে?

তারস্বরে জিজ্ঞেস করে নিলীমা।

অরু ও প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

অরুর ভার্সিটি জয়েন করার পরে পুরো বাংলা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে এই দুটোই বন্ধু জুটেছে ওর, তার মধ্যে ওই ইন্ট্রোভার্ট, নীলিমা যাও মোটামুটি একটু চুপচাপ থাকে, কিন্তু তিথী মোটেই চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে নয়, ভার্সিটির সব থেকে গড়ম খবরটা ওর কাছ থেকেই পায় অরুরা,হোক সেটা গসিপ কিংবা কোনো ইম্পর্টেন্ট নিউজ। এছাড়া ডিপার্টমেন্টের অন্য ব্যাচমেটদের সাথে অরুর মুখ চেনাচিনি আছে কিনা সন্দেহ,কিভাবেই বা থাকবে ভার্সিটি জীবন নড়বড়ে ওর,এটেনডেন্স এর জন্যও পর্যন্ত ভার্সিটি আসতে দেয়না অনু, তবুও আপার বকুনি ঝকুনি খেয়ে মাসের মধ্যে দু'একটাবার পা রাখে ভার্সিটির চত্বরে। যদিও সেটা পড়াশোনার জন্য নয়,বরং পছন্দের শ্যাম পুরুষকে একটা নজর দেখার আশায়, সবার আড়ালে তার মুখখানা হৃদমাঝারে স্ক্যান করে নিলেই শান্তি ওর।

নীলিমার কথার প্রতিউত্তরেতিথি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,

— পানি দে দোস্ত, তারপর সব বলছি।

নীলিমা ব্যাগ থেকে পানি এগিয়ে দিলে ঢকঢক করে পানি পান করে দম নেয় তিথি,

–আহ এতোক্ষণে প্রানটা ঠান্ডা হলো।

— কি হয়েছে বললি নাতো? আবারও জিজ্ঞেস করে অরু।

তিথি এগিয়ে গিয়ে অরুর হাত ধরে বলে,

— ওহ,হ্যা তোর কাছেই আসছিলাম অরু, কাল ভার্সিটিতে কেন এলিনা বলতো??তাহলেই তো তো সব জানতে পারতি।

— কি হয়েছে একটু খুলে বল? তাছাড়া কেন আসিনি সেটাতো তুই জানিসই,তাহলে নতুন করে কেন প্রশ্ন করছিস তিথি?

— কাল নিখিল ভাইদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল নিখিল ভাই সেরা ছাত্রত্বের পুরষ্কার পেয়েছে।

নীলিমা সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,

— ওহ এটাতো ভালো কথা।

–তারপর আরও একটা ঘোষণা হয়, আমি পরে সিনিয়রদের থেকে জেনেছি,

অরু সচকিত হয়ে প্রশ্ন ছুড়লো,–কি?

–নিখিল ভাই মাস্টার্স করবে না, উনি হায়ার স্টাডিসের জন্য স্কলারশিপ পেয়েছে, খুব শীঘ্রই ইউ এস এ চলে যাবে।

অরু চমকায় না, কোনো রকম প্রতিক্রিয়াও করেনা, অসস্থির লেস মাত্র নেই ওর মুখশ্রীতে। খুশি থাকার একমাত্র কারনটা হারিয়ে যাচ্ছে ও কি আদোও ঠিক আছে?? ওর ভেতরে যে অস্থির ঝড়োহাওয়া শুরু হয়ে গেছে,মনে হচ্ছে হৃদয়টা শক্ত করে খাঁমচে ধরেছে কেউ, গলাটা শুকনো কাঠে পরিনত হয়েছে,তবুও থমথমে মুখে ছোট্ট করে অরু জবাব দেয়,–ওহ

এটুকু শব্দ উচ্চারণে অরুর অ’গ্নিস্ফুলিংঙ্গ উগরে দেওয়ার মতো কষ্ট হলো। তবুও বান্ধবীদের সামনে মুখের মিথ্যে হাসিটা ঠিকই ধরে রাখলো,কারণ আর যাই হোক একপাক্ষিক ভালোবাসা কিংবা আধুনিক শব্দে বলতে গেলে ক্রাশ কে হারানোর জন্য কা’ন্নাকা’টি করে ভাসিয়ে দেওয়া কিংবা সবাইকে বলে বলে সিমপ্যাথী কুড়ানোর মতো আত্মসম্মানহীন মেয়ে অরু নয়।

এমনিতেই ওর মায়ের অসুস্থতা নিয়ে অনেকেই করুনা দেখাতে আসে, যা ওর শরীরে জ্ব’লন ধরিয়ে দেয়, অরুর করুনা মোটেই পছন্দ নয়, তবে নিজ অধিকারের ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক ও। যা ওর সেটা ওরই।

কিন্তু নিখিল ভাই? সেতো তো ওর নয়, কোনো কালে ছিলোও না। ওই কেবল একতরফা ভালোবেসে গিয়েছে,নিখিল ভাইতো ওকে ছোট বোন ছাড়া কিছুই ভাবেনা, শুধু ওকে কেন ছাত্র নেতা হিসেবে সব জুনিয়র মেয়েরাই তার ছোটো বোনের সমতুল্য, অরু আলাদা করে তো কিছুই নয়।— ক্যাম্পাসের দিকে দেখ নিখল ভাই আসছে।

তিথির কথায় অরুর দিবাস্বপ্নে ভাটি পরে, তরিৎ গতিতে ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে বেরিয়ে দেখতে পায় ক্যাম্পাস থেকে গেইটের দিকেই এগিয়ে আসছে নিখিল ভাই, কালো ডেনিমের সাথে নীল পাঞ্জাবীতে কি সুন্দর লাগছে তাকে, কাধে ঝুলে আছে ল্যাপটপের ব্যাগ,কানে হেটফোন।

সেদিকে একধ্যানে তাকিয়ে তিথি বলে,

–কি এতো গান শোনেন উনি??

কাঠফাটা রোদে উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারাটা জলজল করছে তার, মুখে লেগে আছে সেই সুন্দর হাসিটা। অরু চোখ বন্ধ করে বলতে পারে এই ইনোসেন্ট দেখতে ছেলেটার প্রেমে পরে যাওয়া কোন মেয়ের জন্য চুটকির ব্যাপার মাত্র। নিখিল ভাই ওদের সামনে আসতেই সবাই একযোগে সালাম দিলো তাকে, সিনিয়র বলে কথা। সালামের জবাব দিতে নিখিল ও একটু থামলো, সামনে না গিয়ে ওদের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে আসলো।

নিখিল ভাই ওদের দিকে আসছে দেখে অরু নীলিমার পেছনে গিয়ে গুটিশুটি হয়ে দাড়ালো।

কেঁ’টে ফেলা ডগার ন্যায় কেমন নেতিয়ে পরেছে ওর শরীরটা।

–আরে অরোরা না??

নিখিল ভাইয়ের আকষ্মিক সম্মোধনে ধরা পরে যাওয়া চোরের ন্যায় হুরমুর করে সামনে তাকায় অরু। হ্যা সূচক মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

–জজি ভাইয়া।

–ভালো আছো তো? এখন আর রাস্তা পার হতে ভয় নেই তো??

কি সুন্দর অমায়িক কথার ধরন, আরও একবার হোঁচট খায় অরু।— নিখিল ভাই কিছু জিজ্ঞেস করছে অরু, উত্তর দে.. তিথির ধা’ক্কায় সম্মতি ফিরে পেলো অরু।

তারপর হ্যা না দুদিকেই মাথা নাড়াতে থাকে, আসলে কি করবে কি বলবে ও কিছুই ঠাহর করতে পারছে না,

ওর অবস্থা দেখে নীলিমা তিথি দুজনই অবাক যে মেয়ে কাঠকাঠ কথার জবাব দিতে ছাড়েনা সে কিনা ভেজা বিড়ালের মতো আচরণ করছে।

জুনিয়ররা সঙ্কোচ বোধ করছে দেখে নিখিল আর দাড়ায় না, সকল কে বিদায় জানিয়ে তারাহুরো করে যায়গা ত্যাগ করে।

নিখিল চলে যেতেই নীলিমা তেঁতিয়ে ওঠে,

— স্টুপিড একটা, এটাই শেষ সুযোগ ছিল, নিখিল ভাই নিজে এসেছিল, আর তুই কি করলি?? হাবলার মতো উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব, পশ্চিম মাথা ঝাঁকিয়ে গেলি?

অরু জবাব দেয়না, এই মূহুর্তে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, মাথাটা ভনভন করে ঘুরছে, গলাটা নিম পাতার মতো তেঁতো হয়ে এসেছে। চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হয়তো প্রেশার ফল করেছে। কয়েকবার চোখের পলক ফেলে, অস্ফুটেই অরু বলে,

— ভাল্লাগছে না বাসায় যাবো, আমাকে একটা রিকশা ঠিক করে দে'না তিথি।

— চলে যাবি মানে এটেনডেন্সটা এটলিস্ট দিয়ে যা।

নীলিমার কথায় অরুর ভেতরের তেঁতো ভাবটা বেরিয়ে এলো, মাথাটা ঝাঁঝিয়ে উঠলো, অরু চটে গিয়ে বললো,

— বলেছি তো বাসায় যাবো। শরীর আর মনের একরাশ অসুখ নিয়ে টলতে টলতে ক্রীতিক কুঞ্জে এসে পৌঁছেছে অরু।

বিশাল সদরদরজা ঝনঝন আওয়াজ করে খুলে ভেতরে ঢুকতেই আরও বিরক্ত হয়ে যায় ও।

মামা, মামি আর একমাত্র মামাতো ভাই রেজওয়ান ওরফে রেজা এসেছে।

অরু আর অনুর জীবনের এতো এতো ঝামেলার মধ্যে উটকো ঝামেলা এই পরিবারটা। কথা নেই বার্তা নেই যখন তখন এসে হাজির। আসবে তো আসবে একটা না একটা ঝামেলা পাঁকিয়ে তারপর বিদেয় হবে।

আজমেরী শেখ যখন সুস্থ সবল ছিলেন তখন দিন রাত আগমন ঘটতো এদের, তিন বেলা ফ্রিতে রাজকীয় খাবার আর মহলের নরম গদিতে আরাম আয়েশ করে একটানা দশদিনও কাটিয়ে দিতো। বাড়ি যাওয়ার নাম গন্ধ পর্যন্ত নিতো না। অরুর মামাতো ভাই রেজা এলাকার পাতি মা’স্তান, যার দরুন তার ছেলে পেলেদের ও নিয়ে আসতো একমাত্র ফুফুর আলীসান বাড়িতে।

অরু আর অনু এসবে বেশ লজ্জিত হতো যত যাই হোক তাদের তো এভাবে আরেকজনার অন্ন ধ্বংস করার কোনো অধিকার নেই। একমাত্র ভাই, ভাবী বলে আজমেরী শেখ তেমন কিছুই বলতেন না।

অনু,অরু একটু গাইগুই করলে ওদের কেও চোখ পাঁ’কাতেন আড়ালে।

সবকিছু এভাবেই চলছিল, কিন্তু আজমেরী হক একেবারে বিছানা সজ্জায় চলে গেলে মামা মামির আসল রূপ দেখতে পায় অরুরা।

আপন বোনকে দেখা তো দুরে থাক গত একবছরে হাসপাতালের গন্ডি অবধি মারায়নি ওদের মামা,

বরং দু'দিন পরপর বউ ছেলেকে নিয়ে এবাড়িতে এসে অনুকে মানসিক অশা'ন্তিতে ভুগিয়েছে দিনরাত। তাদের কথা একটাই,— বাবা নেই, মায়েরও ও গ্যারান্টি নেই, আজবাদে কাল মায়ের কিছু হয়ে গেলে ওদের দু বোনের কি হবে? আজ বা কাল এ বাড়ির ছোট সাহেব ঠিকই ফিরবে, তখন তো দুই বোনের কোনো গতি থাকবে না, তাই এখনই যদি তার একমাত্র সুযোগ্যপুত্র রেজার সাথে অনুর বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে একটা কুল তো হবে,আর যাই হোক নদীতে তো আর ভেসে যেতে হবে না।

অরু বুঝে পায়না এতোবড় দুনিয়া থাকতে ওরা নদীতে কেন ভেসে যাবে, কি অপ'রাধ ওদের?

অনুর রাগের ঘট এমনিই পরিপূর্ণ, এসব শুনলে আরও বেশি মাথা খারাপ হয়ে যায়, চে'চামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলে সে, বিপরীতে মামির গা জালানো কথাতো আছেই। এককথায় এরা বাড়িতে পা রাখা মানেই ঝামেলা আর অশা'ন্তি। অরু হলরুমের চারদিকে চোখ বুলায়, অনু কোথাও নেই,

— তারমানে আপা এখনো হসপিটালে যাক ভালোই হলো।

ওর মামি ডাইনিং এ বসে আঙুর চিবুচ্ছে, রেজা কাঁউচে বসে পায়ে পা তুলে টিভি দেখছে। মামা আপাতত আসেপাশে নেই।

অরু সবটাই দেখলো, তারপর না দেখার ভান করে দোতলায় পা বাড়ালো।

দুটো সিঁড়ি মারাতেই পেছন থেকে ডাক পরলো মামির,

— কিরে দেখলি আমরা এখানে বসে আছি তাও ঢ্যাং ঢ্যাং করে উপরে চলে যাচ্ছিস। মামিকে চোখে পরেনা নাকি? আর আমার বউমা কোথায়?

অরু চোখ খিঁচে বন্ধ করে নিলো, এটারই ভয় পাচ্ছিলো ও। অনেক প্রশ্ন করেছে মামি, এক কথায় উত্তর দিতে হবে কি বলা যায়??— অরু পেছনে ফিরে বললো,মাথা ব্যাথা করছে মামি, একটু ঘুমাবো, আর আপা হসপিটালে মায়ের কাছে।

— করে'নে, করে'নে, আরাম আয়েশ যা পারিস করে'নে, আজ বাদে কাল বাড়ির মালিক ফিরলে তোদের তো ঘা'র ধরে বের করে দেবে, অনুটাকে কতোবার বুঝিয়েছি এ কথা,কতোবার বলেছি আমার রেজার সাথে বিয়েটা দিয়ে দেই,কিন্তু মেয়েটা বড্ড বে'য়াদব হয়েছে,বড়দের মুখে মুখে ত'র্ক করে। বাবা মায়ের শাসন না থাকলে এই হয়।

মামির কথায় অরুর নেতিয়ে পরা রাগটা আবারও তরতর করে ঝাঁঝিয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ সু'চেঁর মতো কথা গুলো গিয়ে শরীরে বিধ'লো, ও পেছনে না ঘুরেই বললো, –তুমি যে নরম চেয়ারে বসে আঙুর চিবুচ্ছো, ওটাও কিন্তু এবাড়ির ছোট সাহেবের টাকা দিয়েই কেনা মামি। তাছাড়া জামশেদ জায়ান চৌধুরীর অবর্তমানে আমার মা'ই কিন্তু জেকে গ্রুপের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান।

ওর কথায় একটা তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেলো অরুর মামির মুখে,মনে মনে বললেন, এইটুকুনি মেয়ে ভালোই খই ফুটেছে মুখে। তারপর শ’ক্রুকে পাল্টা তী’র নি’ক্ষেপ করার মতো করে বললেন,

— হতে পারে তোর মায়ের অধিকার আছে,কিন্তু তোদের দু’বোনের তো কোনো অধিকার নেই, তোরা হলি কচুরিপানা। তাছারা তোদের মায়ের আর কদিন, বড় জোর হলে ছয়মাস।

— মামি, অনেক বেশি বেশি বলে ফেলছো এবার, আমাদের মায়ের কিচ্ছু হবেনা। মাকে আমরা বিদেশে নিয়ে যাবো।

আবারও সেই গা জালানো হাসি ছুড়লেন অরুর মামি, বললেন,–তোর কি মনে হয়?? জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী বা তার কোম্পানি তোদের নেওয়ার জন্য বসে আছে? শুনেছি তোর জন্যই নাকি বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল তাকে।

মামির সাথে আর ত’র্কে পেরে উঠলো না অরু, দুশ্চি’ন্তাগ্রস্থ জটলা পাকানো মস্তিস্কটা আর চাপ নিচে পারছে না, হাত পা থরথর করে কাঁপছে। এই মূহুর্তে গলা থেকে একটা কথাও বের হচ্ছে না, মামি যে এতো নোং’রা ভাবে ওকে আ’ক্র’মন করবে ভাবতে পারেনি অরু।

ও সামনের দিকে আরও একবার চোখ বোলালো কয়েকজোড়া আ’ক্রমণা”ত্নক চোখ। মনে হচ্ছে চোখ দিয়েই ওকে ভ’স্ম করে দেবে এরা। ওও আর এক মূহুর্তেওও হল রুমে দাড়ালো না সিরি ডিঙিয়ে

দোতলায় নিজের রুমে গিয়ে সপাটে দরজা আটকে দিলো।ভেতরটা ছিঁ’ড়ে যাচ্ছে, অসহায়ত্ব চারিদিক জংলা আবরণের মতো ঘীরে ধরেছে। মামির তর্কের আ’ঘাতে নিখিল ভাই চলে যাওয়ার কষ্টটা যেন নুন ম’রিচের ছিঁ’টা।

আর ভালো লাগছে না, নীলিমা আর তিথির মতো জীবনটা সাভাবিক কেন হলো না ভাবছে অরু। কেন ওর জীবনে এতো দায়বদ্ধতা? কেন নিখিল ভাইয়ের প্রতি ভালো লাগাটা নিজের মাঝে খুব সহজে তুলে ধরতে পারলো না ও।?এটা কি শুধুই অন্তর্মুখী হওয়ার দরুন, নাকি পরিবারের টানাপোড়েন আর দায়বদ্ধতা।

নিখিলের চলে যাওয়া ভাবতে ভাবতে অরুর মনে পরে যায় নিখিলের সাথে প্রথম দিনের সাক্ষাৎের কথা,

এইতো কয়েকমাস আগের কথা,ভার্সিটিতে এডমিশনের জন্য এসেছে অরু, মায়ের অসুস্থতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অতোবড় বিদ্যাপিঠে পড়ার সুযোগ হয়নি অরুর। মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে যতটুকু পেরেছে তাতেই গুচ্ছতে সুযোগ হয়েছে।

আজ কাগজ পত্র নিয়ে এসেছে সবটা জমা দিতে হবে তাই,

শীতের সকাল, ঠান্ডাটা পুরোপুরি জেঁকে না বসলেও মিষ্টি রোদের মৃদু আলোতে ভালোই আরাম লাগছে। সকাল হতেই অফিসগামী সারিসারি গাড়ির বহর ছুটেছে রাস্তা জুড়ে, ঢাকা শহরে বেড়ে ওঠা হলেও একাএকা রাস্তাঘাট পার হওয়ার অভ্যাস নেই অরুর। সেই দরুন তখন থেকে ভার্সিটির রাস্তার বিপরীতে অসহায়ের মতো

দাড়িয়ে আছে সে। কখন রাস্তাটা একটু ফাঁকা হবে আর ও দৌড়ে রাস্তা পার হবে। অনেকে তো গাড়ির ফাঁক ফোকর দিয়েই চলে যাচ্ছে কিন্তু অরুর সাহস হচ্ছে না। এক পা এগোচ্ছে তো দু পা পিছাচ্ছে।

এভাবেই লেফ্ট রাইট চলতে থাকলো প্রায় আধঘন্টা, অরু বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। এরকম হলে প্রতিদিন ভার্সিটিতে আসবে কি করে সে??–ভয় লাগছে??

পেছন থেকে তী'রের ফলার মতো ছুটে আসা পুরুষালী কন্ঠস্বর শুনে হকচকিয়ে পেছনে ঘুরলো অরু। দেখলো মুখে টোল পরা স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে ওকেই প্রশ্ন করেছে লোকটা।

অরু থ মেরে আছে, হা না কিছুই বলছে না, কি করে বলবে ও তো হাসিতেই কুপোকাত।

লোকটা পাশ থেকে কাউকে ডেকে উঠল,

–এই অন্ত ওকে রাস্তাটা পার করে দে'তো।

পেছন থেকে ছেলেটা বললো,

— জ্বি ভাই দিচ্ছি। ব্যাস তখনই ছিল ভালোলাগার শুরু। অরু বুঝেছিল এই লোকের ভার্সিটিতে বিশাল জনপ্রিয়তা।

তারপর থেকে শুরু হয় অরুর লুকিয়ে লুকিয়ে পর্যবেক্ষন, উদাসীন দুপুরে, কিংবা ম'রচে যাওয়া বিকালে ক্যাম্পাসের এথায় সেথায় তাকেই খুজে বেড়াতো চোখ দুটো। এক নজর দেখা হয়ে গেলে

খুশিতে পুলকিত হতো মনটা, ঝিলিক দিয়ে উঠলো মুখের কোনে মিষ্টি হাসি। যা এখনো চলমান......

কখনো সামনে দাড়িয়ে কথা বলা হয়নি,অরু এও জানেনা নিখিল তার নামটা জানলো কি করে? তবে নিখিলের বায়োডাটা সবই অরুর জানা বলতে গেলে মুখস্থ।

কিন্তু আপসোস এখন এসব কোনো কাজেই আসবে না, নিখিল ভাই চলে যাবে, হাজার কিলোমিটার দুরে হবে তার ঠাঁই, সাইন্সল্যাবের ক্যা’মিক্যাল আর এক্সপেরিমেন্টের মাঝে অরোরা নামটাই হয়তো ভুলে যাবে ওর সবচেয়ে প্রিয় নিখিল ভাই আর কখনো দেখা হবে কিনা তারও গ্যারান্টি নেই। ভাবতেই চোখের কার্নিশ বেয়ে তপ্ত নোনা জল গড়িয়ে পরে অরুর। “তুমি যদি আমার না হও, তবে সুখের অসুখ তোমাকে জ্বা’লিয়ে পু:ড়িয়ে ছা’রখার করে দিক”

বোকা অরু তখনও জানতো না ওর জন্য কেউ এর থেকেও বি’ষা’ক্ত ভালোবাসা নিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষার প্রহর গুনছেরাস্তার দু’ধারে সারিসারি ম্যাপল গাছের বহর। বসন্ত হওয়ার দরুন টুপটাপ বৃষ্টি কনার ন্যায় গায়ে এসে একটু একটু বাসন্তিক ছোঁয়া লাগিয়ে উড়ে গিয়ে নিঃশব্দে পিচঢালা তকতকে রাস্তায় লুটিয়ে পরছে হলুদ কমলা রঙের ম্যাপল লিফ।

এমন দৃশ্য দেখতেই যেন প্রশান্তি খেলে যায় চোখে। আর ফরেইন কান্ট্রি থেকে এলেতো কথায়ই নেই,নিরব শুনশান রাস্তার ধারে ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে বসন্ত বিকেলের একটু খানি সৌন্দর্য্য দেখে দেখেই পুরো যুগ পার করে দেওয়ার মতোই সস্থিতে দুচোখ ভরে

ওঠে। তবে এই মূহুর্তে রাস্তার দুই সাইডে দাড়িয়ে থাকা লোক সমাগমের কারোরই ম্যাপল লিফের সৌন্দয্য বিশ্লেষনে আগ্রহ নেই। বরং সুন্দর টকটকে ম্যাপল গাছের ফাঁক ফোকরে উচ্ছ্বাসিত জনতার ভীর যেন উপচে পড়ছে। তারা অন্যকিছু দেখার জন্য অধীর আগ্রহে সামনের রাস্তায় তাকিয়ে হাত নেড়ে যাচ্ছে নির্বিগ্নে সেই সাথে তাদের প্রবল উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে একই সুরে হইহই করে ওঠা প্রতিধ্বনিতে। ছেলে, বুড়ো যুবক যুবতী সবাই তাতে সামিল। দেখে মনে হচ্ছে তারা কোন পারফর্ম কিংবা প্রতিযোগিতা দেখার জন্য জমায়েত হয়েছে। শুধু যে এইটুকুনি যায়গা ধরে মানুষের ভীর এমনটা নয়, লোকালয় ছাড়িয়ে সানফ্রান্সিসকো শহরের গোল্ডেন গেইট ব্রীজ পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর আর পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু আঁকাবাঁকা রাস্তাটা যতদূর অবধি চোখে পরে,ঠিক ততোদূর পর্যন্তই উচ্ছ্বসিত মানুষের সমাগম। সায়নী সিওর এই রাস্তা ক্যালিফোর্নিয়া অবধি চলে গিয়েছে।

মানুষের এতো আগ্রহ আর হইচই দেখে একটু কৌতুহল নিয়েই সামনে রাস্তায় ওদের দিকে এগিয়ে গেলো সায়নী।

ঠিক তখনই, হুট করে একদম হুট করেই বেশ কয়েকটা বাইক ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে তরিৎ গতিতে রাস্তা অতিক্রম করে চলে গেলো। বাইক গুলো এতোই তারাতারি চলে গিয়েছে যে সায়নি চোখে পলক ফেলা'র সময়টুকু অবধি পেলোনা। বাইক গুলো রাস্তা ক্রস করতেই সবাই জেকে জেকে বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সবার

চিয়ারআপ আর উচ্ছ্বাস দেখে সায়নি বোধ করলো এখানে বাইক রাইডিং কম্পিটিশন হচ্ছে। কিন্তু এরকম ঠান্ডা আবহাওয়ায় পাহাড়ি রাস্তায় কিকরে এতো দ্রুত রাইড করছে এরা?? ভয় ডর নেই নাকি?? এগুলো দেখে আবার মানুষ আনন্দে নাচানাচি করছে,যেমন এরা তেমন এদের বিনোদন স্টুপিড আমেরিকান,ঠোঁট উল্টে মনেমনেই মেজাজ খারাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় সায়নী।

ও চলেই যাচ্ছিল তখন আবারও দ্বিতীয় বারের মতো হাওয়ার গতিতে ছুটে আসা বাইক গুলো রাস্তা ক্রস করে চলে যায়, তৎক্ষনাৎ সবার মুখে মুখে আবারও সেই জেকে নামের হিরিক পরে যায়। — আচ্ছা জেকে কে??

কৌতূহলী মস্তিস্কে প্রশ্নটা আসতেই হাটার গতি থামিয়ে দিলো ও দাড়িয়ে থাকলো এই ভ’য়া’নক বাইক রেচিং শেষ হবার অপেক্ষায়।

টানা তিনবার একই ভাবে রাইড শেষে চারবারের সময় শেষ হলো কম্পিটিশন। পরপর সাতটা বাইক এসে একই যায়গায় থামলো। সায়নী জানে সবার আগে যে(kTM 390 adventure) বাইকটা পৌঁছেছে ওটাই জেকে রাইড করেছে।কারন চারদিক থেকে ভেসে আসা জেকে নামের জয়জয়কার আর আনন্দ উচ্ছ্বাসই তার জানান দিয়ে যাচ্ছে।

তবে জেকে নামক লোকটা একটু অন্যরকম এতোএতো চিয়ারআপেও কোনোরূপ হেলদোল নেই তার, খুবই সাভাবিক মুখভঙ্গি,চ্যাম্পিয়ন হয়েও খুশির লেসমাত্র নেই তার মুখে। অথচ

রানার আপ হওয়া বাইকারটা খুশিতে ফেটে যাচ্ছে। সেই খুশি তার মুখে চোখে জোয়ারের জলের ন্যায় উপচে পরছে।

জেকে হেলমেট খুলে উরুর উপরে সেটাকে সটান বসিয়ে দেয়, হেলমেট খুলতেই বেরিয়ে আসে তার স্টাইলিস ঘাড় ছুঁইছুঁই লম্বা চুল গুলো। ঘার অবধি চুলে তাকে জেন্টেলম্যান লাগছে না মোটেই বরং স্টাইলিস্ট সুপারস্টার বললে হয়তো মানানসই হবে বাক্যটা। মনে হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ বাইকের কয়েকদফা শ্যুট করে মাত্রই থেমেছে সে ।

ডানহাত দিয়ে বেখেয়ালে চুলগুলোকে ব্যাকব্রাশ করতে করতেই অন্য হাতে পরে থাকা অ্যাপেল ওয়াচটায় একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারও হেলমেটটা পরে নিলো সে। ওদিকে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার বিতরণের জন্য স্টেজে তাকে বারবার ডাকা হচ্ছে। জেকে হেলমেট পরেই সেদিকে একবার চাইলো। আশ্চর্য্য সবাই ডাকছে তবুও কেমন বেখেয়ালি ভঙ্গিমা তার, শেষমেশ কতৃপক্ষের একজন তারকাছে এগিয়ে আসতেই জেকে বলে,

–ওয়েট আ মিনিট।

তারপর কাউকে কল করতেই কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা কালো গাড়ি এসে থামলো ওখানে,

গাড়ি থেকে ফর্মাল ড্রেসকোর্ট পরিহিত একজন নামতেই, জেকে লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললো,

–লুক হি ইজ মাই এসিসট্যান্ড প্রত্যয় এহসান, গিভ হিম দা প্রাইজ মানি।

লোকটা বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকায়,

–আর ইউ কিডিং মি?

–নো আ'ম সিরিয়াস।

–দেন হোয়াই আর ইউ এটেন্ড দা গেইম?এন্ড রি'স্ক ইউর লাইফ?লোকটার কথায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

জেকে তীর্যক হাসলো, কাঁধ দুটো সামান্য উপরে তুলে ভাবলেশহীন মুখে বললো,— ইউ নো?রাইডিং ইজ থ্রি'লিং অলসো ডে'ঞ্জা'রাস। এন্ড আই লাভ ডে'ঞ্জা'র আ লট।

শান্ত এবং স্থীর কন্ঠস্বর, তবে শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেবার মতোই ভ'য়া'নক কথার টোন।

শেষ কথাটা বলে,চোখে বিশালাকৃতির রোদচশমা চড়িয়ে, শাঁই শাঁই করে নিজের(kTM 390) বাইক নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে মূহুর্তেই হারিয়ে গেলো জেকে। সবার দৃষ্টি এখনো সেদিকেই স্থীর। কতৃপক্ষের লোকটা বিরক্ত হলো,তবে চটে গেলোনা, এই ছেলে প্রতি বছর একটা না ঝামেলা পাঁকাবেই এটা তার বোধগম্য হয়ে গিয়েছে এতোদিনে, হয় কোনো প্রতিদন্দ্বিকে ইচ্ছে মতো পে'টাবে, নয়তো রাইডিং এর মাঝ পথেই বাইক ঘুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, আর না হলে প্রাইস গিভিং এ এসে ঝামেলা পাঁকাবে।

শুধু পপুলারিটির আর অডিয়েন্সের ডিমান্ডেই সারা বছর ঘুরে ঘুরে রাজি করানো হয় তাকে, নয়তো এমন আধপাগ'ল, র'গচটা ছেলেকে জীবনেও কম্পিটিশনে আনতেন না তিনি। বাপের বয়সই

হোক কিংবা দাদার কারও কথার দু পয়সা সম্মান পর্যন্ত দেয়না এই ছেলে।–সাচ আ সাই'কোপ্যাথ। বিরবিরিয়ে কথাটা বলে থমথমে মুখ নিয়ে নিজ স্থানে ফিরে গেলো লোকটা।

–এটিটিউড, এপেয়ারেন্স, গুড লুক এভরিথিং ইজ সো ম্যানলি। মুগ্ধ নয়নে ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো এক বিদেশিনী।

সায়নীর পাশেই মেয়েটা দাঁড়ানো।

ও মেয়েটার মুগ্ধতা দেখে একটু যেচেই জিজ্ঞেস করলো,

–হু ইজ হি?

মেয়েটা নে'শা লাগানো চোখে বললো,

— হি ইজ জেকে, দা চ্যাম্পিয়ন।

সায়নী মাছি তাড়ানোর মতো করে বললো,

–আই নো দ্যাট বাট....সায়নীর কথাটা শেষ করতে হলো না, তার আগেই বিদেশিনী ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলে,

–ওহ হি ইজ ওয়াসিপ ঝায়ান খ্রিতিক। হি ইজ আ ভেরি গুড রাইডার।

বিদেশিনীর আধও আধও বাংলা শুনে সায়নী মুঁচকি হাসে, তারপর পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বলে,

–হি লুকস ডিফরেন্ট।

বিদেশিনী ভ্রু কুঁচকায়।

সায়নী মনে মনে ভাবে, লোকটা দেখতে একেবারেই অন্যরকম, টকেটকে গৌড় বর্ন, শরীরের গঠন, চেহারা সব কিছুতে ব্রিটিশদের ছাপ স্পষ্ট,অথচ গোল ভাসমান কালো মনি যুক্ত চোখদুটো দেখলে যে কেউ বলবে এশিয়ান কোনো দেশের, কোনো এক সম্ভ্রান্ত গোত্রের উত্তরাধিকার সে, এটলিস্ট এটিটিউড তো তাই বলে।

বিদেশিনী এখনও তার ধূসর চোখে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে, সায়নী মেকি হেসে বলে নাথিং নাথিং, আই জাস্ট সে, হি ইজ সো হ্যান্ডসাম।–ইয়াহ লুক লাইক আ হলিউড হিরো।

বাই'দা ওয়ে হটস ইওর নেম?

বিদেশিনী সম্মোহনী হাসি দিয়ে জানায়,

— ক্যাথলিন ক্রিসটিয়ান। ইওর?

–আ'ম সায়নী মুখার্জি।

— ওহ আর ইউ ফরেইনার?

— ইয়াহ আ'ম ফ্রম ইন্ডিয়া।

তারপর নিজেদের মধ্যে আরও কিছু কুশল বিনিময় হয় ওদের। এক পর্যায়ে সায়নী জানতে পারে ক্যাথলিন জেকে কে মোটামুটি পার্সোনালি চেনে। আর জেকে আসলে ব্রিটিশ ফ্রিটিশ কিছু নয়,বরং আমেরিকান সিটিজেন ধারী আদ্যপান্ত বাঙালি পুরুষ। তাহলে এই ছেলের চেহারায় এতোটা ভীনদেশী ছাপ কেন? প্রশ্নটা থেকেই গেলো সায়নীর কৌতুহলী মনে।টানা দু'দিন হতে চললো মামিরা বিদেয়

হয়েছে। অরু জানতো অনু বাড়িতে ফিরলেই ঝামেলা শুরু হবে, আর হয়েছেও সেটাই।

মামির গা জালানো কথা অরু চুপচাপ মেনে নিলেও অনু খালি মুখে সহ্য করতে পারে না মোটেই, কারন আর যাই হোক মাকে হাসপাতালের এক কামরার বেডে শুয়িয়ে রেখে তার পক্ষে বিয়ের পিঁড়িতে বসা সম্ভব নয়, রেজার মতো পাতি মা’স্তানের সাথে তো নয়ই।

মামিকে এসব মুখের উপর বলে দেওয়া মানে ভ’য়াব’হ ঝড়ের পূর্বাভাস, আর তাই হলো কথায় কথায় গমগমে হয়ে উঠলো পুরো মহল,একপর্যায়ে কথাকা’টাকা’টি থেকে শুরু হয়ে গেলো বিশাল ত’র্ক ।

অনুর মেজাজ সর্বক্ষনই তুঙ্গে থাকে, এই মূহুর্তে মামির কথার আ’ঘাত তার মধ্যে চরম বিরক্তি আর উত্তেজনার সৃষ্টি করলো, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পরলো অযাচিত ক্ষো’ভ আর রাগ, রাগের মাথায় হলরুমের কাঁচের জিনিস গুলো একটা একটা করে আঁ’ছার মেরে ভা’ঙতে লাগলো সে। হলরুমে ঝনঝন করে কাঁচ ভা’ঙার আওয়াজ শুনে অরু নিজের কা’ন্নাকাটিতে লাগাম টেনে বাইরে বেরিয়ে এলো,দেখলো তার ভদ্র,শান্ত, আর নরম মনের আপার সবচেয়ে ক্ষু’ব্ধ রূপ।

ওর এমন রাগ দেখে মামি যে খানিকটা ভরকে যায়নি এমন নয়, তবে সেও দমে যাওয়ার পাত্রি নন,তার ক্ষি’প্ত মুখশ্রী দেখে মনে হচ্ছে এর শেষ দেখেই ছারবেন তিনি।

অবশেষে পরিস্থিতি সামাল দিতে, রেজা নিজের মাকে নিয়ে তৎক্ষনাৎ ক্রীতিক কুঞ্জ থেকে বিদায় নেয়।

–আর কখনো আসবেনা তোমরা...

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনু গিয়ে ঝনাৎ করে মহলের সদর দরজা আটকে দেয়,তারপর নিজের রুমে ঢুকে কক্ষ বন্ধী করে নয় নিজেকেও।

অরু দৌড়ে যায় বোনকে আটকানোর জন্য, তবে সেটা বড্ড দেরি হয়ে যায়, তার আগেই সপাটে দরজার খিল আটকে দেয় অনু।অরু জানে তার আপা আজ রুম থেকে বের হবে না, অরু ডাকতে ডাকতে বেহুশ হয়ে গেলেও না। তবু ও কিছুক্ষন ধরে ডাকাডাকি করে ক্ষান্ত হয়ে ফিরে যায় অরু।সে রাতে দু বোনের কারোরই আর খাওয়া হলো না।

পরেরদিন সকালে নিজ হাতে নাস্তা,মায়ের জন্য স্যুপ সব কিছু বানিয়ে অরু আবারও কড়া নারলো অনুর দরজায়।

এবার অনু দরজা খুললো, পড়নে স্যুতি চুড়িদার হাতে টোটে ব্যাগ, লম্বা চুল গুলোতে এটে আছে সুন্দর ফ্রেন্স বেনি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য একেবারে তৈরি হয়েই বেরিয়েছে সে।

আপাকে পরিপাটি হয়ে বেরোতে দেখে বিমূর্ষ চোখ দুটো খুশিতে টইটুম্বুর হলো অরুর।

অনুকে প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ না দিয়েই অরু একেরপর এক বলতে লাগলো,–টেবিলে নাস্তা রেডি, মায়ের স্যুপ হটপটে ভরে রেখেছি, আর ইমেইল ওও পাঠিয়ে দিয়েছি।

চল একসাথে খাবো,

কথা শেষ করে অরু সামনে হাঁটা ধরতেই, ওর হাত টেনে ধরে ওকে বুকে জড়িয়ে ন্যায় অনু। আপার রাগ কমেছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, খুশিতে পুলকিত হয়ে শক্ত হাতে বোনের গলা জড়িয়ে ধরে অরু নিজেও।

— আপা তুই কেন বদলে গেলি বলতো, কাল তোর রা’গ দেখে আমি নিজেও ভ’য় পেয়ে গিয়েছিলাম।

অনু ঠোঁট টিপে মুচকি হাসে, তারপর বলে,

— বিশ্বাস কর আমি একটুও বদলাইনি,স্বজন রুপী কাল সা”প গুলোকে বের করার জন্যই একটু বেশিবেশি করেছি, নইলে কতদিন পরে পরে আমাদের মাথা খেতো কে জানে??

— তোর কি বুদ্ধি আপা,জিনিয়াস।অনু আবারও হেসে বলে, হয়েছে, কাল থেকে কিছুই খাইনি,চল নাস্তা খাবো, নয়তো মায়ের কাছে যেতে লেট হয়ে যাবে।

অরু আনমনে বলে,

–আমার আপার হাসি সব চেয়ে সুন্দর নিখিল ভাইয়ের চেয়েও।নিখিল ভাই, নামটা মস্তিস্কে গিয়ে ঠেকতেই দুদিন আগের ভাবনার ইতিটানে অরু। সকালে ঘুম থেকে উঠে ইমেইল পাঠাতে

গিয়েই সেদিনের কথা গুলো ভাবছিল ও,তারপর সেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি ঘটে যাওয়া কু'ৎসিত ঘটনা গুলো একেএকে হানা দেয় আনমনা মস্তিষ্কে।

আজ শুক্রবার আপা একটু দেরি করেই হাসপাতালে যাবে আজ, অরু রাতেই বলে রেখেছিল যে সেও মাকে দেখতে যাবে। তাই খুব সকালে উঠেই ইমেইলের কাজ সেরে ফেলছে ও।

তারপর একটা লম্বা শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে যখন মোবাইল হাতে নিলো দেখলো নিলীমার অনেকগুলো মিসডকল ভাসছে।–নিলীমা কল দিয়েছে, তারমানে ইম্পরট্যান্ট কিছুই হবে, কিন্তু কি??

অজানা অনেক প্রশ্নে আবারও মাথাটা ধরে এলো অরুর,কিন্তু ও এতো ভাবতে চায়না,তাই তারাহুরো করে নিলীমাকে কল ব্যাক করলো।

একবার রিং হয়েছে কি হয়নি,তারমধ্যেই নিলীমা কল তুললো।

— কি হয়েছে নিলীমা, এতো গুলো কল দিলি তুই ঠিক আছিস?

— আমি ঠিকই আছি, তুই ঠিক আছিস কিনা সেটা বল, আচ্ছা তুই এমন কেন? দিন দুনিয়া ভুলে হিমালয় পর্বতের সন্ন্যাসীনি হয়ে যাস, নাকি মহাসমুদ্রে ডুব দিস কোনটা বল আমাকে?

— কি অদ্ভুত প্রশ্ন নীলিমা,আমি কেন এসব করতে যাবো? শোন আমার বিয়ে করে সংসার করার বহুত শখ সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী এসব কথা ভুলেও বলবি না।— তাহলে ফোন কেন তুলিস নাআআআ।বিরক্তিতে চিৎকার দিয়ে উঠলো নিলীমা।

— আহ আস্তে বল কানে লাগছে তো, আর ফোন সাইলেন্ট মুডে ছিল।

— তাহলে তুই কেন বসে আছিস এখনো? তুই ও সাইলেন্ট মুডে চলে যা, আর তোর শখের নিখিল ভাই আমেরিকা গিয়ে কোন এক সাদাচামড়ার মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করুক।

–কি হয়েছে নিলীমা?

অরুর কন্ঠে দৃঢ়তা আর সচকিত ভাবটা স্পষ্ট। –নিখিল ভাই আজই চলে যাচ্ছে, এতোক্ষণে হয়তো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলেও গিয়েছে, এটাই তোর শেষ সুযোগ অরু, আমি আর তিথি মেইন রাস্তায় সিএনজি তে ওয়েট করছি তারাতারি চলে আয়, নয়তো এ জীবনে আর নিখিল ভাইকে দেখতে পাবি না তুই।

নিখিল ভাইয়ের সাথে আর দেখা হবেনা, টোল পরা মন ভুলানো হাসিতে মাতোয়ারা হবেনা হৃদয়টা, নিখিল ভাইকে ছাড়া ক্যাম্পাসটাই তো ম”রে যাবে, হৃদয়টা হাড়হীম করা ব্যাথায় শক্ত হয়ে এসেছে অরুর, এবার আর অজান্তে নয়, জেনে শুনেই ফুঁ’পিয়ে কেঁ’দে উঠলো ও। মোবাইলের নেটওয়ার্ক ছাপিয়ে সেই ফোঁ’পানোর আওয়াজ গিয়ে পৌঁছালো নিলীমার কানেও। — দ্রুত চলে আয়, শেষ বারের মতো দেখা হয়েও যেতে পারে,নিঃসংকোচে কথাটা বলে কল রেখে দিলো নিলীমা।

নিলীমার শেষ কথাটা কর্নকুহরে পৌছাতেই অরু আর কা’ন্নাকা’টি করে সময় নস্ট করলো না, টেবিল থেকে পার্সটা ছো মেরে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো রুম থেকে।

নিখিল ভাই চলে যাচ্ছে যাক, কিন্তু মনের কথাটা তো একটাবার শুনে যাক, নিজের একপাক্ষিক ভালোবাসার কোন প্রতিদান চায়না অরু,শুধু শেষবারের মতো মুখ ফুটে বলতে চায়, দিনের পর দিন নিজের মন গহীনে বোনা মাকড়শার জালের ন্যায় ঠুনকো সপ্ন গুলোর কথা।

এই মূহুর্তে অরুর অষ্টাদশী মন বলছে তাকে মন গহীনের সুপ্ত ভালোলাগার কথা না জানালে জীবনটাই বৃথা।

অনু কেবলই খাবার দাবার হটপটে ভরে রেডি হয়ে নেমেছে, তখনই দেখতে পায় হনহন করে কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছে অরু।–কিরে কোথায় যাচ্ছিস, হাসপাতালে যাবিনা?

অরু জবাব দেয়না, এক প্রকার ছুটে বেরিয়ে যায় বাগানবিলাসে ঘেরা ক্রীতিক কুঞ্জ থেকে।

অনুর অযাচিত মন আনমনে বলে,

–ইমেইলটা পাঠালো কিনা কে যানে? চেক করে দেখতে হবে।মানুষ জীবনে আশা নিয়ে বাঁচে, আশা বিহীন এই উত্থান পতনের জীবনে বেঁচে থাকা দূ’রহ বৈকি আর কিছুই না। সবাই দিন শেষে ভাবে নতুন প্রহর তার জন্য নতুন সুখ বয়ে আনবে। কিন্তু কখনো কখনো সেই নতুন প্রহর আসতে বড্ড দেরি হয়ে যায়, সেই সাথে হারিয়ে যায় সুখের আশাটুকুও। এখন এই মূহুর্তে দাড়িয়ে অরুর সুখের আশা’টাও হারিয়ে গিয়েছে,নীলাম্বর আকাশের কোন একফালি শুভ্র মেঘের আড়ালে।খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে কাঁ’দছে অরু। হৃদয়টা এবার সত্যি সত্যি ফাঁকা লাগছে,

নিখিল ভাইয়ের সাথে শেষ দেখাটা হলোনা আর। এয়ার্পোর্টের সামনে এমন কা'ন্নারত মেয়েটাকে দেখে অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।আবার অনেকেই ভাবছে হয়তো কাছের কেউ দূরদেশে পারি জমিয়েছে সেই দুঃখেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাতে অবশ্য অরুর যায় আসেনা,আপাতত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ওর মস্তিষ্ক। ও উড়ন্ত প্লেনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো,–আমি আপনাকে ঠিক খুঁজে বের করবো নিখিল ভাই, আপনার আমার আবারও দেখা হবে, আমি ইউ এস এ যাবো,আপনার জন্য হলেও যাবো, ওই জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী না নিলেও যাবো।

–হয়েছে অরু থাম এবার।

তিথি ওকে থামাতে ব্যাস্ত, কে জানতো অরুর মতো চুপচাপ সভাবের মেয়েটা এভাবে কেঁ'দে কে'টে দুনিয়া ভাসাবে, তাহলে হয়তো ওরা এই প্ল্যান কোনোকালেই করতো না।

আবারও একই নাম ক্রীতিক জায়ান চৌধুরী। নিলীমা বুঝতে পারেনা ব্যাপারটা, তাই সচকিত হয়ে প্রশ্ন ছু'ড়ে,

— আচ্ছা অরু তুইতো শেখ, তাহলে তোর ভাইয়া চৌধুরী কেন??

অরু কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলে বলে,

–ওই বদমা'শ লোকটা আমার ভাইয়া না, ইভেন কিচ্ছুই না আমাদের।

–তাহলে, তাকে কেন ইমেইল পাঠাস প্রতিদিন?

— তাকে পাঠাইনা তো, জেকে গ্রুপের হেড অফিসে পাঠাই, মায়ের অসু’স্থতা জানানোর জন্য, শুধু মাত্র জায়ান ক্রীতিকের এপ্রোভালের জন্যই সবটা আটকে আছে যে। আবারও কা’ন্নায় ভিজে আসে অরুর দু-চোখ। — তাহলে কে সে??

— আমরা একটা অমিমাংশিত সম্পর্কে আটকে আছি নিলীমা, আমার যখন আট বছর বয়স তখন মায়ের সাথে ক্রীতিক কুঞ্জে প্রথম পা রাখি আমরা দু বোন। তখন ওনার বয়স কতইবা হবে বিশ বছর। উনি আমার থেকে প্রায় বারো বছরের বড়। আমার মা, জায়ান ক্রীতিকের বাবা মানে জামশেদ জায়ানের দ্বিতীয় স্ত্রী।

শুনেছি ওনার দাদাসাহেব জোর করে ওই বয়সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করিয়েছিলেন ওনার বাবাকে কোন এক কারনবশত।

তিথি আর নিলীমা একই সুরে বলে,— তার মানে তোদের সাথে ওনার র’ক্তের কোন সম্পর্ক নেই??

অরু এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে বলে

–না নেই, তবে ওনার বাবার অবর্তমানে আমার মা’ই জেকে গ্রুপের চেয়ারম্যান।

তিথি বললো,

— আচ্ছা অরু উনি দেশে আসেন না। আই মিন বাড়িটা তো ওনার।

অরু না সূচক মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলো,

— গত আট বছর ধরে আসেনি, বছর তিনেক আগে যখন ওনার বাবা মা'রা গেলেন তখন নাকি এসেছিলেন, তবে বাড়িতে প্রবেশ করেননি, বাইরে থেকেই দাফন কাফনের কাজ সেরে সেদিনের ফ্লাইটেই চলে গিয়েছেন।

তিথি ঠোঁট উল্টে বললো,

— বুঝেছি তোদের উনি একটুও পছন্দ করেননা, সেই জন্যই তো নিজের বাড়িতে পর্যন্ত আসেননা। যতই হোক তোরা হলি ওনার সৎ মায়ের আগের পক্ষ।

অরু ঠোঁট উল্টে বললো,–কি জানি।

তখনই হঠাৎ করে মোবাইল স্ক্রীনে অনুর নাম্বার ভেসে ওঠে।

সচকিত হয়ে ওঠে অরু, সেই সাথে অকস্মাৎ ভেঙে যায় অবচেতন মস্তিস্কের ধ্যান। আসপাশটা অবলোকন করে বুঝতে পারে ও কত বড় বোকামি করেছে, গভীর থেকে গভীরতর গোপনীয় কথাটা তরতর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বান্ধবীদেরকে বলে দিয়েছে। এবার তো তিথি আর নিলীমাও ওকে কচুরিপানা অথবা পরগাছা উপাধি দেবে।

–আচ্ছা তাহলে তোর বাবা কোথায়??

অরু আর জবাব দেয়না,বরং আড়ালে শুষ্ক ঢোক গেলে,

— আপা কল করছে আমি আসি। এই বলে দ্রুত প্রস্থান করে অরু।

তিথি আর নিলীমা পেছন থেকে উদগ্রীব হয়ে বলে, আরে আরে এভাবে টলতে টলতে কই যাচ্ছিস পরে যাবিতো।

অরুর তাতে ধ্যান নেই, ওও যতদ্রুত সম্ভব ওদের চোখের আড়াল হতে চায়।একরাশ ভারাক্রা’ন্ত মন আর নিজের করা বোকামিতে বিরক্ত হয়ে দ্রুত বাড়ি ফেরে অরু।

সদর দরজা পার হতেই অনুর হাতের শক্ত চপ’টা’ঘা’তে আবারও বিশ্বয়ে বিমূঢ় হয়ে ওঠে ওর মুখশ্রী। মনে মনে একটাই প্রশ্ন আওরায় নিজেকে

–কি করেছি আমি? আমার উপরেই কেন পৃথিবীর সবার এতো রা’গ??ভে’ঙে গু’ড়িয়ে যাওয়া আশাহীন হৃদয়ের ছটফটানি আর তীব্র য’ন্ত্রনা নিয়ে,যা হোক কেবলই ঘরের দুয়ারে পা রেখেছিল অরু।ঠিক তখনই অনাকাঙ্ক্ষিত চ’ড়ে’র আ’ঘা’তে নিস্তব্ধ হয়ে আটকে যায় ওর পা দুটো, পাঁচ আঙুলের শক্ত ছাপ লেগে যায় নরম তুলতুলে আদুরে গালে।র’ক্ত জমে ফর্সা গালটা মূহুর্তেই ধারন করে কালচে বেগুনী রঙ।

গালটা বড্ড জ্বা’লা করছে, তবে সেদিকে হুশ নেই অরুর।মাথার মধ্যে কুন্ডলী পাকাঁনো হাজারো চিন্তাদের পাছে ফেলে দিয়ে শুধু একটা প্রশ্নই বারবার উগরে দিচ্ছে ওর মস্তিস্কটা— কি করেছি আমি??

অরু যে এতোটা ব্যাথা পেয়েছে, নিজ গালে হাত দিয়ে ছলছলে নয়নে এভাবে বোকাদের মতো তাকিয়ে আছে,তার কোনোটাতেই আপাতত ধ্যান নেই অনুর। রা’গের তোপে এখনো শরীরটা রিরি করছে ওর। ইচ্ছে তো করছে অন্য গালে আরও একটা চ”ড় বসিয়ে দিতে।

অনু রা’গে ফোসফাস করছে দেখে, অরু কেঁ’দেই ফেললো, ঠোঁট উল্টে অস্পষ্ট সুরে বললো,

–কি করেছি আমি? এভাবে মা’র’লি কেন? পৃথিবীতে কি মা’র খাওয়ার জন্যই জন্ম হয়েছে আমার?

অনু দাঁতে দাঁত পিষে বললো,

–আমি ছাড়া আর কে মা’রে তোকে?অরু বলতে চাইলো, কে আবার?এবাড়ির ছোট কর্তা।দেশে থাকতে তো সকাল সন্ধ্যা গা’য়ে হা’ত তুলতো,।যদিও সে বহু অতীতের কথা সে কারনে অরু সেসব ভাবতে চায়না,তাই মুখ ফুটে বললো,

–অযথা কারন ছাড়া কেন মা’রবি আমাকে?? কই কখনো তো কারন ছাড়া ভালোবাসিস না, সারাক্ষণ ঝা’ড়ির উপর রাখিস, আমিকি তোর সৎ বোন আপা??

অনুর রা’গের অ’ঙ্গারে যেন একটু একটু ঘি ঢালছে এই মেয়ে, ক্রমশ মেজাজ খারাপটা বেড়েই যাচ্ছে, অনু কিরমিরিয়ে বললো,

,– এমদম পাঁকামি করবি না অরু, আচ্ছা তোর কি মায়ের জন্য আদৌ কোনো চিন্তা আছে বলতো আমায়? নেই তাইনা?–এভাবে কেন বলছিস আপা?

–বলছি কারণ তুই একটা হাঁদারাম, আর আমি কিনা তোর উপর ভরসা করে এতোবড় একটা দায়িত্ব দিয়েছি।

–কি করেছি,প্লিজ খুলে বলবি,

চেঁচিয়ে ওঠে অরু।

অনু এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে ল্যাপটপ টা এনে ওর হাতে তুলে দেয়,

–নিজের চোখেই দেখে নে।

ল্যাপটপের ফ্রন্ট স্ক্রীনে ইমেইলের ইনবক্স ভাসছে সেই সাথে কতগুলো নতুন মেইল সব গুলোই আমেরিকা থেকে এসেছে, যা দেখে অরুর কান্নাভেজা চোখ দুটো খুশিতে চিকচিক করে ওঠে, ও কাঁ'দতে কাঁ'দতে বলে,

–আপা কোম্পানি থেকে মেইল এসেছে, ওরা মাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ইউএসএ নিয়ে যাবে । এটাতো খুশির খবর।

অনু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে,রাগ মিশ্রিত গলায় বলে,— হ্যা এটা খুশির খবর কিন্তু এই মেইলটা আরও একমাস আগে এসেছে,ওরা ভিসা টিকিট সব পাঠিয়ে দিয়েছিলো, এই সপ্তাহেই ফ্লাইট। আজ কৌতুহল বসত আমি যদি মেইলের ইনবক্স না চেক করতাম তাহলে এই টিকিট আর ভিসা আমাদের কোনো কাজেই আসতো না, কারন গত একটা বছর ধরে তুই শুধু রোবটের মতো মেইলই পাঠিয়ে গেছিস,কখনো ইনবক্স কিংবা আদারবক্স চেক করেও দেখিস নি। যদি আমি এটা আরও এক সপ্তাহ পরে চেক করতাম তাহলে আমাদের মায়ের চিকিৎসার কি হতো, বল আমাকেএএ??

অনুর রু'ষ্ট চিৎ'কার শুনে কেঁপে ওঠে অরু। ওর এই মূহুর্তে কিছু বলার নেই। প্রথম প্রথম কয়েকমাস ইনবক্স চেক করেও কোন লাভ হয়নি,তাই ও ধরেই নিয়েছিল এই ইমেইলের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া আর আসবে না, অতএব প্রতিদিন ইনবক্স দেখে দেখে আশাতীত

হওয়ার কোন মানেই হয়না, এতে ক'ষ্টটা দিগুণ হয়ে হৃদয়ে জেঁকে বসে। কিন্তু সকল চিন্তা ভাবনার উর্ধে গিয়ে এমন কিছু হবে সেটা অরু কল্পনাতেও ভাবেনি। ও আরও একবার সচকিত চোখে ল্যাপটপের মেইলটায় চোখ বোলালো, সকল নিয়ম নীতি হলফ করার শেষে একেবারে নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা,

মি. প্রতয় এহসান

সি এফ ও, অফ

জে.কে গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রি।

অরু নামটা দ্বিতীয় বার আওরায়–প্রত্যয় এহসান,ইনি কে আপা?

অনু ঠোঁট উল্টে বলে,

–হবে হয়তো কোম্পানির দায়িত্বরত কেউ।

অরু একেএকে সবগুলো টিকেট চেক করলো, তার মধ্যে অরোরা শেখ নামের ওও একটা টিকেট রয়েছে।

অনু পাশে এসে বলে,

–আমি বুঝলাম না অরু তোর জন্যওও টিকিট পাঠানো হয়েছে, তুই অবশ্য না গেলেও হতো।

অরু আশ্চর্য হয়ে পেছনে চাইলো,

–কি বলছিস আপা?? তোরা অতদূর চলে যাবি, আর আমি এই ফাঁকা ক্রীতিক কুঞ্জে একা একা থাকবো?? ভুতেরা আমাকে আস্ত রাখবে বলে তোর মনে হয়??তুই এটা বলতে পারলি?আমি নির্ঘাত তোর সৎ বোন।

–হয়েছে, ড্রামা বন্ধ কর, আমি কেন বলছি সেটা শুধু আমিই জানি।

–কেন বলছিস??–যতই উন্নত চিকিৎসা হোকনা কেন, মায়ের কাছাকাছি সবসময়ই আমাকে থাকতে হবেরে, তাহলে বিদেশের বাড়ি তোকে আমি কার কাছে রেখে যাবো বল? তারউপর ক্রীতিক ভাইয়া মানুষটা সুবিধার না।

অরু মৃদু হেসে অনুকে আস্বাস দিয়ে বলে, –আমি কি আর ছোট আছিরে আপা? আমি ঠিক সব পরিস্থিতি ম্যানেজ করে নেবো তুই দেখিস, তাছাড়া এতোগুলো বছর পর তিনি নিশ্চয়ই আগের মতো নেই, হতে পারে এতোদিনে বিয়েশাদি করে আমাদের জন্য বিদেশিনী ভাবি রেডি করে রেখেছে।

অনু অরুকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে আলতো চুমু খেয়ে বলে,

–সরি সোনা। জানিস আমার অনেক খুশি লেগেছিল যখন মেইল গুলো দেখছিলাম, কিন্তু রা'গটা তখনই হয়,যখন ভাবলাম এই মেইল একসপ্তাহ পর পেলে আমাদের টিকেট ক্যান্সেল হয়ে যেতো,আমাদের মাকে আরও ভুগতে হতো।

অরু মুখ কালো করে,মাথা নুইয়ে বলে,–তুই না আপা,আমিই সরি,আমিই তো খামখেয়ালি করে কিছুই চেক করতাম না। আমাকে ক্ষমা করে দে প্লিজ।

–হ্যা দেবো, তবে একটা শর্ত আছে।

–কি শর্ত?

–এখন এই মূহুর্তে আমার সাথে মার্কেটে যাবি, অনেক প্রয়োজনীয় শপিং করতে হবে, এই সপ্তাহেই ফ্লাইট।

অরু নিজের হাতের বাঁধন শক্ত করে, অনুর গলা জড়িয়ে ধরে খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলে, –আপা!! আই লাভ শপিং, কতদিন নতুন জিনিসের গন্ধ পাইনা।

তারপর আনমনেই বলে,

–এবার আমি নিখিল ভাইকে ঠিক খুজে বের করবো।আজ রোববার, প্রতিদিনের মতো আজও পরন্ত বিকেলে তীর্যক সূর্য কীরন হানা দিয়েছে খোলা আঙিনার ন্যায় মহলের বিস্তার ছাঁদ জুড়ে। বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে পতপত করে উড়ছে রশিতে শুকাতে দেওয়া সারিসারি জামাকাপড়। সেগুলোই নিতে এসেছে অরু। তবে ছাঁদে পা রাখতেই মনটা কেমন উদাসীন হয়ে গেলো ওর।পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসে পরলো শ্যাওলা পরা চ্যাপ্টা রেলিংএর উপর। বসার দরুন হাটু অবধি খোলা চুল গুলো ধুলো ময়লা জমা মেঝেতে গিয়ে ঠেকলো। গোধূলী বেলার মেঘ ভেজা বাতাসের তালে তালে হাঁপড়ে একটা চাঁপা নিঃশ্বাস বেড়িয়ে এলো ওর বুক চিড়ে।আজমেরী শেখকে ইতিমধ্যে এমারজেন্সি ফ্লাইটে তুলে দিয়ে এসেছে ওরা দু’বোন,ওদের ফ্লাইট রাতে। আর কয়েক মূহুর্ত মাত্র তারপর এই মহল, বাগান বিলাশে ঘেরা বিশাল বাড়ি, বাড়ির পেছনের সুপারি বাগান, সামনের বিশাল গেইট সব কিছু মানবশূন্য হয়ে পরবে। প্রিয় ক্যাম্পাস, প্রিয় বান্ধবী, আর সব চেয়ে প্রিয় নিখিল ভাই,সবাইকে ছেড়ে বহুদূরে পারি জমাবে অরু।অচেনা

দেশে, সব অচেনা মানুষের ভীরে সাদামাটা বাঙালী অরুর জন্য কি অপেক্ষা করছে কে জানে?

কেবল ভরসা একটাই মায়ের সুস্থতা, আর মন গহীনের অযাচিত এক অদম্য ইচ্ছা,নিখিল ভাইকে খুঁজে বের করা। অরু জানে কাজটা এতোটাও সহজ নয়, তবে ও চেষ্টা করবে।পৃথিবীটা তো গোলকার,তার উপর একই দেশে থাকবে ওরা, ইন্টারনেটের যুগে অতোটাও কষ্টকর হবে না ব্যাপারটা,ভাবতেই বিষন্ন মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো অরুর।— আমি আসছি নিখিল ভাই। ঠিক খুঁজে বের করে নেবো আপনাকে।

অরুর দিবাস্বপ্নতে টান পরে নিচ থেকে অনুর বাঁজ খাই আওয়াজে,

— কিরে অরু হাওয়া হয়ে গেলি নাকি, নিচে নাম নয়তো আমি ব্যাগ গুছিয়ে এয়ারপোর্ট চললাম।টাইম ফ্লাইস, ইয়েস ইট ইজ......

এই যেমন চব্বিশ ঘন্টা আগেও অরু পুরান ঢাকার নাম করা বাড়ি ক্রীতিক কুঞ্জের ছাঁদের কোনে দাড়িয়ে ঝিরঝির হাওয়া খাচ্ছিলো। আর এখন এই মূহুর্তে মোটা পশমি লেদার জ্যাকেট পরেও হু হু বাতাসে থরথর করে শীতে কাঁপছে।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে উঠে কাঁপাকাঁপি একটু কমেছে দু’বোনের তবে লম্বা জার্নিতে বড্ড কাহিল হয়ে গিয়েছে শরীরটা। অনুর চেয়েও অরুর অবস্থা বেগতিক কারণ পুরো ফ্লাইটে কিচ্ছু খেতে পারেনি ও।অরুর যে মা’রা’ত্মক রকমের ফ্লাইট ফো’বিয়া আছে, সেটা এই প্রথমবারই জানলো অনু। ভাগ্যিস কোম্পানি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে ওদেরকে পিক করা হয়েছে নয়তো এই অচেনা শহরে

অরুকে নিয়ে নির্ঘাত বিপ'দে পরতে হতো অনুর। অনু অরুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করলেও, অরুর মনে অন্য কিছু চলছিল, ওও ভাবছে, তিথি আর নিলীমার কথা, সেদিন অযাচিত কিছু কথা মুখ ফুটে বলে দেবার পর আর মুখোমুখি হয়নি ওদের। নিজের আত্মগ্লানিই ওকে আটকে রেখেছিল,যাদের সামনে সবসময় নিজের নির্ভীক ব্যাক্তিত্বটা ধারণ করে এসেছে সবসময় তারাই কিনা ওকে নিচু চোখে দেখবে, ফ্র'ট ভাববে এসব ভাবতেই লজ্জায় চোখ মুখ বুজে আসে অরুর। যার যের ধরে এতো দূর চলে এসেছে তবুও নিজের বান্ধবীদের একটাবার জানায়নি পর্যন্ত বরং অরুর মনে হচ্ছিলো দেশ ছেড়ে চলে গেলেই ভালো হবে,তিথি আর নিলীমার মুখোমুখি হতে হবেনা আর। ও বেঁচে যাবে। সানফ্রান্সিসকোর শহুরে পরিবেশ ছাড়িয়ে আরও প্রায় ঘন্টা খানিক গাড়ি চললো। নির্জন হাইওয়ে রাস্তায় মাঝেমধ্যে দু'একটা প্রাইভেট কার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না ওদের, কিছুদূর পর পর রাস্তার কোল ঘেঁষে দু'একটা ওয়ালমার্ট আর ম্যাক ডোনাল্টস এর ক্যাফেটেরিয়া দেখা গেলো। তবে সেগুলো ও জনমানবশূন্য। এছাড়া রাস্তার দু'পাশে যা চোখে পরে তা হলো উঁচু নিচু পাহাড় আর সারিসারি উইল্ডমিল।

তবে চারিদিকের পরিবেশ প্রান জুড়িয়ে দেবার মতোই সুন্দর। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা গুলো পরিষ্কার তকতকে দেখে মনে হচ্ছে আজই পিচ ঢালা হয়েছে এতে। অথচ বাংলাদেশ হলে মানুষের গিজগিজ আর ময়লা আবর্জনায় রাস্তার মুখ খানা পর্যন্ত দেখার উপায় নেই।

যেতে যেতেই অরু বোধ করলো, এদেশের মানুষ যতটা শৌখিন ঠিক ততটাই পরিশ্রমী।

আসলে এখানে অরুর কোন দোষ নেই, প্রথম পরিচিতিতে মানুষের ভালো দিক গুলোই বেশি নজরে আসে। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে একটা ছোটমোটো ডুপ্লেক্স বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো গাড়িটা, এতোক্ষন সব কিছু ঠিকঠাক লাগলেও হুট করেই নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে অরুর, হাত পা গুলো যেন অবস হয়ে এসেছে, সেই সাথে ব'মিব'মি ভাব। মনে হচ্ছে কিছু একটা গলায় আঁটকে আছে। কিছুক্ষন বাড়িটার দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিলো ও। ততক্ষণে অনু নেমে ওপাশ থেকে বারবার তাড়া দিচ্ছে।

— কি হলো নাম, তোকে রেখে আমি হসপিটালে যাবো, ইমার্জেন্সী কল এসেছে।

গাড়ির সাউন্ড প্রুভ কাঁচ গলিয়ে সে কথা অরুর কানে গেলোনা, ও আস্তে ধীরে সময় নিয়ে নামলো। বাইরে প্রচন্ত বাতাস আর গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে ঠান্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম।

অরু নামলে, ড্রাইভার মতো লোকটা একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললো,–দিস ইজ হাউজ পাসওয়ার্ড।

অরু মাথা কাত করে কার্ডটা নিলো।

অনু এগিয়ে এসে অরুকে বললো,

–তারাতারি চল জমে যাবো নইলে।

অরু এখনো নিশ্চুপ, শুধু উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে সায় জানালো।

কিন্তু অনুর আর বাড়ির ভেতরে ঢোকা হলো না, তার আগেই ওর ফোনটা বেজে ওঠে, ফোন রিসিভ করে অনু কি কি বললো সেসব কিছুই কানে যায়নি অরুর।

তবে তার পরপরই ওর শরীর জমে হীম হয়ে গিয়েছে। বাইরের খারাপ ওয়েদার এই শীতলতার কাছে কিছুই নয়। কারন এবার ওর শরীর নয় বরং ক'লিজা জমে এসেছে। একটু আগে ফোনে কথা শেষ করে, অনু এসে জানায়,

— আমাকে এক্ষুনি হসপিটালে যেতে হবে অরু, অনেক ফর্মালিটিস বাকি,আর সব কাগজ পত্র আমার ব্যাগে, এগুলো না পূরন করলে ওরা মাকে ভর্তি করাতে পারবে না,মায়ের শরীর আরও খা'রাপ হয়ে যাবে। তুই পাসওয়ার্ড দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম কর, আমি যত তারাতাড়ি সম্ভব চলে আসবো।

অরু চমকায়, হকচকিয়ে বলে,— নানা আমি একা একা ভেতরে যেতে পারবো না, যদি কেউ থাকে, তার চেয়ে বরং আমি তোর সাথে যাবো।

— পাগলামি করিস না অরু,বাইরের অবস্থা দেখেছিস?? আমি সিওর রাত হলে ঝ'ড় আসবে, তাছাড়া তুইনা বলেছিস,আমার কথা শুনবি।

অরু ঠোঁট উল্টে কাঁদও কাঁদও হয়ে বলে,

— আমার ভ'য় করছে আপা, যদি ভেতরে কেউ থাকে??

— আমি যতদূর জানি কেউ বাড়িতে নেই, নয়তো ড্রাইভার পাসওয়ার্ড দিতোনা, আর যদি থেকেও থাকে তুই নিজের পরিচয় দিবি,কোনো বোকামি করিস না, কেমন??

অরু ঘার কাত করে সায় জানালো।— অনু পুনরায় গাড়িতে উঠে পরে, যেতে যেতে বলে সাবধানে থাকবি, প্রয়োজন হলে ফোন করবি।

— কিভাবে ফোন করবো আমার কাছেতো সীম কার্ডই নেই। মাথা নিচু করে বিরবিরিয়ে কথাটা বললো অরু।

অচেনা দেশ,অচেনা শহর, অচেনা একটা বাড়ি,এখন আপাও চলে গেলো, এর চেয়ে অসহায় বোধ হয় এই আঠারো বছরের জীবনে আর কোনোদিন লাগেনি অরুর।

চারিদিকের অবস্থা বেগতিক, আকাশটা কালও মেঘে ঢেকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে, এখানে আর দাড়িয়ে থাকার উপায় নেই, তাইতো দুরুদুরু বুকে ফ্রেন্স গেটটা খুলে ফ্রন্ট ইয়ার্ড থেকে পা টিপে টিপে সদরদরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অরু, তারপর কার্ডে টুকে দেওয়া পাসওয়ার্ড দিয়ে দরজা খোলে ও। আশ্চর্য হলেও সত্যি পাসওয়ার্ডটা ছিল খুবই কঠিন। কে এতো বুদ্ধি খাঁটিয়ে কৌশলী পাসওয়ার্ড সেট করেছে সেটাই আপাতত ভাবছে অরু। তবে ওর ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলোনা তার আগেই সদর দরজা খুলে গেলো।ভেতরে প্রবেশ করে চারিদিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলো অরু,কেউ নেই বাড়িতে। লোকালয় ছাড়িয়ে অনেকটা নির্জন পরিবেশে ছোট্ট একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি। নিচ তলার

পুরোটা জুড়ে বিশাল হল রুম, তার একপাশে আধুনিক ধাঁচের কিচেন কাউন্টার, কাউন্টারের সামনে সেট করা দুটো বারস্টুল কিচেন আর হলের মাঝে কোন দেওয়াল নেই,বরং কিচেন কাউন্টারের সামনেই গোলাকার ডাইনিং। হলে রুমের ঠিক অন্যমাথায় কিছু আধুনিক কারুকাজ করা নড়ম সোফা আর ডিভান। ডিভানের উপর এবরো থেবরো হয়ে পরে আছে একটা কুমড়ো সাইজের কালো রঙের হেলমেট। তারসামনে বিশাল মনিটর।

–টিভি হবে হয়তো, কিন্তু এতো বড় টিভি কে দেখে ভাই? ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেলো অরুর।

সামনের দিকে ভালো করে পর্বেক্ষন করে পেছনে চাইলো ও, দেখলো দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটা পুরোটাই কাঁচের।

অরু ঠোঁট উল্টে মিনমিনিয়ে বললো,— বোরিং, প্রয়োজনের বাইরে কোনো জিনিসই নেই, এতো সুন্দর বাড়িটা আমার হলে আমি মন ভরে সাজাতাম।

আপাতত আর কিছুই দেখার ইচ্ছে নেই ওর, শরীরটা বড্ড ক্লান্ত। বাড়িতে কেউ নেই ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই কাঁচুমাচু ভাবটা কমে গিয়ে ঝরঝরয়ি দিগুণ ক্লান্তি নেমে এসেছে শরীর জুড়ে, কাঁচের চকচকে সিরি বেয়ে উপরে উঠে কোনমতে ভারি জামাকাপড় পাল্টে, প্লাজো আর টিশার্ট গায়ে চড়িয়ে, শরীরটাকে ছেড়ে দিলো নরম বিছানা আর কম্ফোর্টারের ভাজে। অরু, এই অরু, অরুউউউ

সুন্দর ভেলভেটের ন্যায় নড়ম বিছানার মধ্যে থেকেই নরেচরে উঠলো ঘুম কাতুরে অরু।

–অরুউউ,

অনেক দুর থেকে আপার আওয়াজ ভেসে আসছে, মনে হয় সকাল হয়েছে তাইতো প্রতিদিনের মতোই এতো ডাকাডাকি।

কিন্তু আজ ঘুমটা বড্ড ভারী লাগছে, চোখ খোলাই যাচ্ছে না, এতো নরম কেন লাগছে বিছানাটা। মনে হচ্ছে শরীরটা টানছে নিজের দিকে।

অনু আবারও ডাকে শব্দ করে,

–অরু ওওওঠ!!

ঘুমের মাঝেই অরু বলে ওঠে,–ঘুমাতে দে না আপা, এই বিছানাটা অনেক নরম আর এই কুশনের এর গন্ধটা চন্দন কাঠের মতো, এই বলে কুশনে নাক ডুবিয়ে আবারও লম্বা শ্বাস টানে অরু।

এদিকে অরুর কান্ডে অনুর লজ্জায় জা’ন যায় যায় অবস্থা। ও চোখ খিচে অস্পষ্ট সুরে বলে,

–অরুউউ ওঠ, এটা তোর রুম নয়, আর না তুই বাংলাদেশে আছিস। আমরা আজ সন্ধ্যায়ই আমেরিকা এসেছি ভুলে গেছিস, আর এই মূহুর্তে তুই অন্য কারও রুমে ঘুমিয়ে আছিস।

অনুর শেষ কথাটা একেবারে ছক্কা লাগার মতোই অরুর মস্তিস্কে গিয়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ধরফরিয়ে উঠে বসলো অরু, মুখের

কোনে জমে যাওয়া লালাটুকু মুছে শুষ্ক ঢোক গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,

–কি বলিস আপা কার রুমে আমি?অনু আড় চোখে দরজার দিকে দেখালো, অরু ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকেই চাইলো,দেখলো ফুল স্লিভ সাদা টিশার্ট আর আর ব্ল্যাক ট্রাউজার পরিহিত লম্বা মতো লোক, অরু এক পলকেই এই সুদর্শন পরিচিত মুখটা ধরতে পেরেছে, এটা অন্য কেউ নয় সয়ং জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী।

অরুর মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে, কি করেছে ও এটা? কার বিছানায় এতোক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে??

এই মূহুর্তে দরজার বাইরে থেকে ওর দিকেই অনুভূতিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা, নিস্প্রভ,শীতল চাউনি, কিন্তু বরফ কেঁ’টে ফেলার মতোই ধা’রালো তার তীক্ষ্ণতা চোখ দুটোতে। কি আছে ওই চোখে? রাগ, বিরক্তি, কৌতূহল নাকি অন্য কিছু?? ধরতে পারলো না অরু, পাছে শুধু আস্তে করে ভয়ার্ত ঢোক গিললো।

— তারাতারি চল আমাদের রুম অন্য পাশে, অনু তাড়া দিতেই অরু তরিঘরি করে উঠে অনুর পেছন পেছন চলে যায়, যাওয়ার সময় খুব সতর্কে আরও একবার পেছনে তাকায় ও,পেছনে তাকাতেই, হুটকরে চোখাচোখি হয়ে যায় ওই রহস্যে ঘেরা চোখ দুটোর সাথে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টা কেঁপে ওঠে ওর, করিডোরের মাঝ বরাবর পকেটে হাত গুঁজে দাড়িয়ে এখনো একই ভাবে তাকিয়ে আছে ক্রীতিক।

অরু আর তাকানোর সাহস পেলোনা, দাঁত দিয়ে নখ কা’ম’ড়াতে কা’ম’ড়াতে দ্রুত অন্য রুমে ঢুকে পরলো ও।

ওরা চলে গেলে ক্রীতিক ও নিজের রুমে পা বাড়ায়, রুমে ঢুকতেই ফ্লোরে পরে থাকা মেয়েদের কাপড় চোপড়ে পা আটকে যায় ওর। সেগুলো একপ্রকার ইগনোর করেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলো ও, কুশনটা এখনো অরুর লালায় ভিজে আছে, তারঠিক পাশে সুতোর মতো আঁটকে আছে একটা লম্বা চুল। ক্রীতিক চুলটা হাতে তুলে ধরে, সাভাবিকের চেয়েও বেশ লম্বা চুলটা।

খানিকক্ষণ ওটাকে উল্টে পাল্টে নিয়ে ভ্রুকুটি করে ক্রীতিক বলে,

–এতো বড় কবে হয়ে গেলো??নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে ধরনীতে। তবে আজকের সূচনাটা বেশ অন্যরকম, পাখির কিঁচিরমিচির, ভোরের নরম রোদ, কাঁচের জানালার ফাঁক গলিয়ে সূর্যের ম্যাজিক্যাল আলোছায়া, কিংবা অনুর গলা ছেড়ে বাঁজখাই চিৎকার সব কিছুই অনুপস্থিত আজ।

ফোনে সকাল নয়টার এলার্ম বেজে যাচ্ছে অনর্গল। অরু চোখ মেলে সটান হয়ে শুয়ে শুভ্র সিলিংএর পানে চেয়ে আছে, আজ আর এলার্ম ওর ঘুম ভাঙাতে পারেনি। ওরা পৃথিবীর উল্টো দিকে আছে সে হিসেবে বাংলাদেশে এখন সন্ধ্যারাত। রাত দিনের এই তারতম্যের কারনেই সারারাত এপাশ ওপাশ করে নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছে অরু। তারউপর রাতের ওই ঘটনা, কথা নেই বার্তা নেই একেবারে সিং’হের গু’হায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে এসেছে। কি সাংঘা’তিক, ভাবলে এখনো পিলে চমকে ওঠে অরুর। সকাল নয়টা বেজে

পয়ত্রিশ। অনু একটু আগেই রেডি হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে হসপিটালের উদ্দেশ্যে। বলেছে কি একটা জরুরি কাজ আছে তাই সকাল সকাল যাচ্ছে। বয়সের তুলনায় অনুর মধ্যে ম্যাচিউরিটি ভাবটা অনেক বেশি, দায়িত্ব জ্ঞানের দিক দিয়ে সবসময় সচেতন সে। আসলে বাস্তবতা যার দরজায় বেশি হা’না দেয়, সেই ততবেশি ম্যাচিউর হয়,এখানে বয়সের কোন হাত নেই।

অরু তখনও শুয়েই ছিল,উদাসীন হয়ে কি জানি কি ভাবছিল।তখনই নিচ থেকে এক অপরিচিত কন্ঠস্বর কানে ভেসে এলো ওর। গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে পুরুষ মানুষ।লোকটা নিচ থেকেই হাক পেরে পেরে ডেকে চলেছে তখন থেকে।— জেকে, জেকেএএ, আমি জানি তুই রুমে আছিস নিচে নাম এক্ষুনি, নইলে কিন্তু আমিই উপরে চলে আসবো।ইম্পর্টেন্ট কথা আছে ইয়ার!!

লোকটা আবারও ডাকতে যাবে,তখনই উপর থেকে ভেসে আসা মেয়েলী রিনরিনে কন্ঠস্বর সুনে,হকচকিয়ে গেলো সে।

–এই বাসায় মেয়ে কোত্থেকে এলো? ভুল এড্রেসে আসিনিতো?

অরু রুম থেকে বেরিয়ে দোতলার করিডোরে দাড়িয়ে মালকিনের মতো করে গলায় আত্নবিশ্বাস জমিয়ে বললো,

–এখানে জেকে বলে কেউ থাকেনা ভুল বাসায় নক করেছেন।আ....অরুর কথা মাঝ পথেই আটকে গেলো,কারন ততক্ষণে পাশের রুম থেকে ক্রীতিক ওও বেরিয়ে এসেছে,লম্বায় অরুর চেয়ে দিগুণ ক্রীতিক, ওর মুখভঙ্গিমা দেখতে হলে অরুকে মাথা উঁচিয়ে চাইতে হয়, এই মূহুর্তে অরু সেভাবেই তাকিয়ে আছে

ক্রীতিকের মুখের দিকে, অনুভূতিহীন টকটকে ফর্সা মুখ, ফর্সা মুখশ্রী জুড়ে দু'দিন ক্লীন সেভ না করা খর দাড়িগুলো মাথা চাড়া দিয়ে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে বলে তীক্ষ্ণ চোয়ালটা ব্লে'ডের মতোই ধা'রালো মনে হচ্ছে, লম্বা চুল গুলো এলোমেলো হয়ে কপাল ছুয়ে আছে আর পেছন দিক থেকে ঘার, সেই সাথে এটে আছে গোলাকার দুটো ভাসা ভাসা চোখ। প্রথম দর্শনে একত্রিশ বছরের ক্রীতিক কে অরুর চোখে গ্রীক গডের মতোই সুদর্শন ঠেকলো।–গো ব্যাক টু ইউর রুম।

পাশ থেকে আসা,একটা গমগমে আওয়াজে অরুর ধ্যান ভেঙে গেলো।বেকুবের মতো পাশে তাকিয়ে উল্টে আবার প্রশ্ন করলো,

–অ্যা??

ব্যাপারটা এমন যে, আমাকে বলছেন? কারন ক্রীতিকের দৃষ্টি এখনো একই ভাবে সামনের দিকেই স্থীর।

— গো ব্যাক টু ইউর রুম।

শান্ত, নিস্প্রভ কন্ঠস্বর, তবে কথার মাঝেই আটকে আছে কঠোর আদেশ।

ক্রীতিকের এক্সপ্রেশন, বাচনভঙ্গিমা,কিছুই মাথায় ঢুকলো না অরুর, ও উল্টে বাঁচালের মতো বলতে শুরু করলো,

— আরে আমি কেন রুমে যাবো? দেখতে পাচ্ছেন না , কথা নেই বার্তা নেই অন্যের বাসায় ঢুকে লোকটা জেকে জেকে বলে চেচাচ্ছে, ওটাকে আগে বিদায় করতে হবে।

— রুমে যেতে বলেছি তোকে। এবার কাঠকাঠ স্পষ্ট বাংলায় অরুর মুখের দিকে তাকিয়েই কথাটা বললো ক্রীতিক।

অরু ভয়ার্ত ঢোক গিললো, এক মূহুর্তের জন্য মনে হলো ওও আট বছর আগের ক্রীতিকের সামনে দাড়িয়ে আছে। তারপরেই ওর ডানপিটে মস্তিস্কটা সচকিত হয়ে উঠলো ওর, মনেমনে ভাবলো,

–উনি যা বলবে সেটাই আমাকে শুনতে হবে নাকি আশ্চর্য, আমিকি এখনো ছোট আছি যে ওনাকে ভ’য় পাবো হুহ।

মনেমনেই নিজেকে মিস.সাহসী অফ দা ইয়ার এওয়ার্ডটা ছুড়ে মা’রলো অরু।

— কি হলো কথা কানে যায়নি??

— যাবোনা। এ যেন অরুর স্বঘোষিত স্নায়ু যু’দ্ধ।

ক্রীতিক নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে মেজাজ সংবরণ করলো, তারপর রুষ্ট কন্ঠে বললো,

— মুখে মুখে ত’র্ক আমার একদম পছন্দ নয় অরু। “অরু”. ক্রীতিকের ঘুমঘুম হাস্কি গলায় নিজের ছোট্ট নামটা শুনে আরও একবার বক্ষপিঞ্জরে কিছু একটা শক্ত টান অনুভব করলো অরু। কেন যেন মনে হলো অরু নামটাও অনেক ভারী আর কঠিন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই নামের অস্তিত্ব কোন কালেই ছিলোনা,পৃথিবীর সব থেকে আনকমন নাম এটা।

কিন্তু সেসবে মাথা ঘামিয়ে দমলো না অরুর আত্নঅ’হংকা’রী মন, বরং নতুন উদ্যমে ক্রীতিকের কথার কাঠকাঠ জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিলো সে। যাকে বলে এক বলেই ছক্কা হাঁকানো।

ঠিক তখনই আগমন ঘটে নিচতলার তৃতীয় ব্যাক্তির।— কিরে, দেখছিস তখন থেকে ডাকছি তবুও পকেটে হাত গুজে খাম্বার মতো দাড়িয়ে আছিস? আমাকে কি তোর মানুষ মনে হয়না?

লোকটা এগিয়ে আসতেই ক্রীতিক অরুর সামনে এসে ওকে আড়াল করে দাড়ায়। চম্বা চওড়া,গ্রীক গড সেইপ ওয়ালা বডির অধিকারী ক্রীতিকের পেছন থেকে রোগা অরুকে তো দুরে থাক ওর ছায়াটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

অতঃপর ক্রীতিক বলে,

— কি চাই??

— চাই মানে??আমেরিকান সুপার মডেল সায়র আহমেদ কি তোর ভিক্ষারী মনে হয়??

— না, তবে ছ্যাঁচরা মনে হচ্ছে।

— কিহ!

–তোরা সবকটা মিলে আবারও আমার হাউজ পাসওয়ার্ড হ্যা’ক করেছিস তাইনা।

সায়র মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললো,— এছাড়া উপায় কি?? নক করলে তো জীবনেও দরজা খুলিস না,ফোন ধরিস না, এসএমএস সিন করিস না, হুটহাট উধাও হয়ে যাস। কোন দিন দেখবো একা

একা এই ভু'তুরে বাড়িতে ম'রে পরে আছিস। আমার সন্দেহ হচ্ছে জেকে তুই আসলেই মানুষ তো? নাকি ভ্যা'ম্পায়ার টাইপ কিছু? সত্যি করে বল?

— তোর ইচ্ছা, যা খুশি একটা ভেবে নে।

সায়র বিরক্তিতে চোখমুখ খিঁচে একনাগারে অভিযোগের লিস্ট উগরে দিচ্ছে।

এদিকে ক্রীতিকের পেছনে এখনো ঠায় দাড়িয়ে আছে অরু, দৌড়ে রুমে চলে যাওয়ার উপায় নেই, কারন ক্রীতিক ওর কব্জিটা শ'ক্ত করে চে'পে ধরে রেখেছে, মুখ দিয়ে কিছু বলবে,তার সুযোগ হচ্ছে না, কারন সায়রের মুখ ননস্টপ চলছে।

একটানা, একনাগাড়ে টানা দশমিনিট ধরে ননস্টপ কথা বলে তবেই ক্ষান্ত হলো সায়র।

দশ মিনিট? হ্যা দশ মিনিটই হবে, ক্রীতিক তো চুপচাপ ঘরির দিকেই তাকিয়ে ছিল।

পেছন থেকে অরু নিজের হাত ছাড়ানোর কসরত করে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রীতিকের শ'ক্ত বাধনের কাছে সেই চেষ্টা পিপীলিকার সমতূল্য।

ওর পেছনে একটা ছায়া নড়াচড়া করছে দেখতে পেয়েই সায়র উদ্বিগ্ন হয়ে বললো,— তোর পেছনে ওটা কি জেকে?? তোর ছায়া এতো ছোট হয়ে গেলো কি করে, আর এমন নরছেই বা কেন?তোকে সত্যি সত্যি ভু'তে ধরলো নাকি?

দাড়া সবাইকে কল করে এক্ষুনি আসতে বলছি।

সায়র একটা মানুষ’ ক ‘বললে কলিকাতা বুঝে ফেলে। দেখা গেলো সত্যি সত্যি তিল থেকে তাল বানিয়ে ক্রীতিক কে প্র’টেস্ট বাই ঘোস্ট বানিয়ে ছাড়বে। তারপর শুরু হবে ওকে নিয়ে বেহুদা গবেষণা।

তাই সকল রহস্যের ইতি টেনে নিজের চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে অরুর হাতটা ছেড়ে দিলো, ক্রীতিক।

সায়র সচকিত নজরে ওর পেছনে চাইলো, দেখলো স্কার্ট আর টিশার্ট পরা গোলগাল গড়নের পিচ্চি একটা মেয়ে,বিশাল লম্বা লম্বা সিল্কি চুলগুলো দুই পাশে ঝুটি করে বুকের সামনে ফেলে রেখেছে, একে কি বলা যায় কেশবতী? নাকি এলোকেশী?সে যাই হোক মেয়েটার চেয়ারায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট, ফর্সা আদুরে মুখটা রাগে লাল হয়ে আছে, কপালেও বিরক্তির ভাজ।

লাল লাল গাল দুটো দেখেই মনে হচ্ছে একটু টেনে দেই, সেই আশাতেই হাত বাড়িয়েছিল সায়র, পিচ্চিটার গাল টেনে দেবে বলে।

কিন্তু সে আশাতে একবালতি জল ঢেলে অরুকে একপ্রকার ধা’ক্কা মে’রে রুমের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে ঠা’স করে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো ক্রীতিক। সায়র উদ্বেগ প্রকাশ করে বললো,—
এভাবে কেন ধা’ক্কা মা’রলি মেয়েটাকে? ওর নিশ্চয়ই লেগেছে, দেখেই মনে হচ্ছে তুলোর মতো শরীর।

ক্রীতিক দাঁত চেপে, ঘারের রগ ফুলিয়ে বলে,

–লাগুক, লাগার জন্যেই মে’রেছি। আর ওর শরীর তুলোর মতো নাকি লোহার মতো সেই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।

— এভাবে বলছিস কেন, পিচ্চি মানুষ তাই বলেছি। বাই দা ওয়ে কে ও??

— নো ওয়ান।

এই বলে সিরি ডিঙিয়ে ধাপধাপ করে নিচে নেমে যায় ক্রীতিক।

সায়র ক্রীতিকের পেছন পেছন নামতে নামতে বলে, ––বাই এনি চান্স তুই কি এই পিচ্চি মেয়েটার সাথে কিছু...... কথা শেষ করতে পারলো না সায়র তার আগেই ওর মুখ বরাবর একটা কুশন ছু’ড়ে মা’রে ক্রীতিক,

–মুখে লাগাম টান। তুই জানিস, আই ফা’কিং হে’ইট ওয়েম্যানস।

— তাহলে মেয়েটা কে?দেখে তো মনে হচ্ছে বাঙালি।

ক্রীতিক আরামছে ডিভানে বসে পরলো, তারপর টি টেবিলে দু’পা তুলে দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে মনিটরে ভিডিও গেইম শুরু করতে করতে বললো,— বললাম তো নো ওয়ান, ট্রিট হার লাইক এ সার্ভেন্ট।

সায়র বুঝলো ক্রীতিক মেয়েটার ব্যাপারে কথা বলতে চাইছে না।

ওদিকে মি.জায়ান ক্রীতিকের বলা প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট ভাবে কানে পৌঁছালো অরুর। ঢোক গেলার মতো করেই প্রত্যেকটা অ’পমানজনক কথ গিলে নিলো অরু। মায়ের জন্য আপা কতকিছু করছে আর ও এতোটুকু সহ্য করতে পারবে না, তা কি করে

হয়??একটু আগে লাগা ধা’ক্কাটা বেশ জোরেই ছিলো, অসমান দেওয়ালে লেগে কনুইয়ের কাছটা ছিঁ’ড়ে গিয়ে র’ক্ত বের হচ্ছে। র’ক্ত বের হয়ে টিশার্টের হাতাটাও চ্যাটচ্যাটে হয়ে গিয়েছে।

ক্রীতিকের কথা গায়ে না মেখে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওয়াশরুমের ট্যাপ ছেড়ে র’ক্তা’ক্ত যায়গাটা ধুয়ে নিলো অরু।

তারপর সামান্য এনটিসেফটিক আর অন-টাইম ব্যা’ন্ডেজ ওও লাগিয়ে নিলো।

অরু বুঝে গিয়েছে এখন থেকে ঠিক এভাবেই নিজের ক্ষ’ত নিজেকেই সারাতে হবে ওকে। যা হয়ে যাক আপাকে কিচ্ছুটি বলা যাবে না।সায়র কাউচে শুয়ে ফোন টিপছে, আর ক্রীতিক মনিটরে বাইক রাইড খেলছে,হঠাৎ করে কি মনে করে শোয়া থেকে উঠে বসে সায়র,চিন্তা গ্রস্থদের মতো কপালে ভাজ রেখে বলে,

— এলিসার বাবা জে’ল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে।

ক্রীতিকের দৃষ্টি মনিটরেই আটকে আছে এখনো, ও চুইঙ্গাম চিবুতে চিবুতে বললো,

–আই নো।

–এবার নিশ্চয়ই খারাপ কিছু হবে এলিসার সাথে।

— তুই আছিস কি করতে??

সায়র দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,

—এবার আরও বেশি সতর্ক থাকতে, এবার শুধুমাত্র এলিসা নয়, আমরা চারজনই টার্গেট।

ক্রীতিক খেলাটা পজ করে, দোতলায় অরুর ঘরটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবলো, তারপর বিরবির করে বললো,–ইফ হি ডেয়ার টু টাচ, আই সয়ার আই উ'ইল কি'ল হী'ম।

সায়র তাজ্জব বনে গিয়ে প্রশ্ন ছুড়লো

— কি বলছিস বিরবিরিয়ে কাকে মা'র'বি তুই??

ক্রীতিক ওর ভ'য়ানক শীতল চাউনি নিক্ষেপ করলো সায়রের দিকে, বাঁজপাখির নজরের মতোই তীক্ষ্ণ সে চাউনি। ওর চোখ জোড়াই যেন একটা জীবন্ত থ্রে"ড, ঠোঁটের কোনে ক্রুর হাসি ঝুলিয়ে খুব আস্তে আস্তে জবাব দিল ক্রীতিক

— এলিসার বাবাকে।সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছে, এখনো ফেরেনি অনু, অবশ্য ফেরার কথাও না, বলেই গিয়েছে ফিরতে সন্ধ্যা হবে, হঠাৎ করে বিদেশের মাটিতে পা রেখেই ওর আপার এতো ব্যাস্ততা ধরতে পারলো না অরু। এদিকে সারাদিন না খেয়ে থেকে শরীরটা কাহিল হয়ে গিয়েছে ওর। নিচে গিয়ে কিছু একটা খেতে হবে নয়তো, না খেয়ে প্রেশার ফল করে অ'সুস্থ হয়ে গেলে বিদেশের মাটিতে কে দেখবে ওকে?

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। অরু দরজাটা সাবধানে একটু ঢিলে করে উঁকি দিলো বাইরে।

তৎক্ষনাৎ নিচ থেকে সকালের পুরুষালী কন্ঠটা আবারও ভেসে এলো কানে,— এই যে এলোকেশী, খেতে এসো।

অরু দু'পা সামনে বাড়িয়ে করিডোর দিয়ে নিচে চাইলো,দেখলো, এপ্রোন পরে হাতে ফ্রাইং প্যান নিয়ে ওর দিকে তাকিয়েই হাসছে সায়র।

ফর্সা মুখশ্রীতে সেই সাবলীল হাসি বেশ ভালোই মানিয়েছে। ঠিক তার অন্য পাসে ডাইনিং এ বসে চুপচাপ কাঁটাচামচ দিয়ে কিছু খাচ্ছে ক্রীতিক, ওর ভাবভঙ্গি এমন যেন ওর আশেপাশে কোনো মানুষই নেই, সব গরু ছাগল।

অরু এবার নিচে নেমে এলো। সায়র নিজের সাবলীল হাসিটা মুখে ঝুলিয়ে রেখেই ওর দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললো,—বসে পড়ো।

অরু প্লেটের দিকে উঁকি দিতেই ওর চোখমুখ বিরক্তিতে কুঁচকে এলো, দুপুরের খাবারে এসব ঘাসপাতা কে খায়??সাথে একটুকরো মাংস ভাজা,স্টেক হবে হয়তো আর একটু খানি ম্যাসট পটেটো।

— ব্যাস এটুকুই লাঞ্চ??

গোলগোল অসহায় চোখ করে ওদের দুজনার দিকে তাকালো অরু।

সায়র একবার অরুর দিকে আরেকবার ক্রীতিকের দিকে তাকাচ্ছে।

ক্রীতিক খেতে খেতে বললো,—দেখতে তো এইটুকুনি, এতো খাবার রাখিস কোথায়???

খুব রাগ হলো অরুর,আমেরিকা এসেছে বলে এইসব ঘাসপাতা খেয়ে বাঁচতে হবে??

তাছাড়া ভাত নেই, ডাল নেই, তরকারি নেই এটা কেমন দুপুরের খাবার। ছ্যাহ। মনেমনে আমেরিকান গ্রীন কার্ডধারী বাঙালিদের হাজারটা তি'রস্কা'র জানালো অরু।দেশে থাকেনা বলে দেশের ঐতিহ্যটাও ম্যাস পটেটোর সাথেই ভর্তা বানিয়ে খেয়ে ফেলেছে এরা।

তারপর আলগোছে নিজের লম্বা চুলগুলো হাত খোঁপা করে,ওরনাটা কোমরে পেঁচিয়ে এগিয়ে গেলো রান্না ঘরের দিকে। কেবিনেট আর ফ্রীজ হাতরে, হাতের কাছে, চাল ডাল যা পেলো, সব কিছু একসাথে মাখিয়ে চুলায় বসিয়ে দিলো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই খিচুরীর মো মো গন্ধে সুবাসিত হয়ে উঠলো চারদিক।

সায়র নিজের প্লেট সরিয়ে রেখে, রান্না ঘরের দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।

ওর কান্ডে ক্রীতিক ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,— কি হলো খাচ্ছিস না কেন?? খেয়ে বিদায় হ।

সায়র দাঁত কেলিয়ে বললো,

— খিচুড়ি, কতদিন পর বাঙালি খানা, লোভ সামলাতে পারছিনা।

ক্রীতিক আবারও নিজের খাওয়ায় মন দিলো।

একটু পর এক প্লেট খিচুড়ি এনে সায়রের সামনে রাখলো অরু।

গড়ম খিচুড়ির গন্ধে ক্ষিদেয় পেট গুড়গুড়িয়ে উঠলো ওর।

অরু,বললো,

—খেয়ে বলুন তো কেমন হয়েছে।

গড়ম খিচুড়ি মুখে নিয়েই আবেশে চোখ বুঁজে এলো সায়রের, ওর মুখের এক্সপ্রেশন দেখলেই বোঝা যায় ও খাবারটা ঠিক কতটা পছন্দ করেছে।

খাবার গিলে নিয়ে, তৃপ্তমাখা হাসি দিয়ে সায়র ক্রীতিককে বললো,— তোর বোন ফাটাফাটি রান্না করে দোস্ত। এরকম রান্না খেতে পারলে আমি যখন তখন তোকে শালা বানিয়ে ফেলবো, ড্যাম শিওর।

নিজের হাত মু’ষ্টিবদ্ধ করে অ’গ্নি দৃষ্টিতে অরুর ক্লান্ত মুখশ্রীটা পরখ করলো ক্রীতিক, তারপর একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললো,

—ও আমার বোন নয়, ও আমার বোন হতেই পারেনা।

— মানে??

সায়রের মুখে কৌতুহল স্পষ্ট।

— ও আমার বাপের দ্বিতীয় বউয়ের আগের পক্ষ।

ক্রীতিকের এতো বি’শ্রী অপ’মানজনক সম্মোধনেও একটু ওও টললো না অরু, বরং মৃদু হেসে সায়রের উদ্দেশ্যে বললো,—জি উনি ঠিকই বলেছেন, আমি ওনার আপন কিংবা সৎ কোন টাইপ বোনই নই। আমার নাম অরোরা শেখ।

ক্রীতিকের কথা সায়র ওও খুব একটা গায়ে মাখলো না,ওও অরুর কথার জবাবে একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে জানায়,

—আমি সায়র আহমেদ, কিন্তু বাংলাদেশি নই ইন্ডিয়ান,আমার হোম টাউন দার্জিলিংএ।

দার্জিলিং নামটা শুনতেই আগ্রহের প্রবনতা বানভাসী হলো অরুর, দার্জিলিং আর কাশ্মীর ওর পছন্দের লিস্টে সবার আগে, জীবনে একবার হলেও যায়গা গুলোতে যেতে চায় অরু, পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা মেঘ,বৃষ্টি, বরফ,ঝড়না, সব কিছু নিজ হাতে ছুয়ে দেখতে চায়।

নিজের মন গহীনে লুকোনো ইচ্ছার খানিকটা পর্দা খুলে যাওয়ার দরুন অরু বললো, —জানেন দার্জিলিং এ ঘুরতে যাওয়া আমার অনেক দিনের সপ্ন।

— তাই কোথায় ঘুরতে চাও দার্জিলিং এ,আর কার সাথে যাবে??

— আ....অরুর মুখ থেকে কথার বহর বের হতে না হতেই, সশব্দে হাতের কাঁ'টাচামচ টা ছু'রে ফেলে উঠে দাড়িয়ে পরলো ক্রীতিক, কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে অরুর মুখোমুখি দাড়িয়ে বললো,

–আই হে'ইট বাঙালি ফুড,ইভেন এভরিথিং।সো নেক্সট টাইম আমার বাসায় এসব চিপ রান্না, চিপ আলোচনা কোনোটাই করার সাহস করবি না।আই ওয়া'র্ন ইউ।

অরু স'ঙ্কিত হয়ে দু পা পিছিয়ে গেলো,চোখের সামনে কি ঘটছে কেন ঘটছে বুঝে উঠতে একটু টাইম লাগলো, ক্রীতিক বারবার ওকে অপ'মান করছে, ভে'ঙে ফেলতে চাইছে কিন্তু কেন?? বয়সে ওর থেকে অনেক বড় বলে??

তবে,অরুও তো চুপ মে'রে যাবার মেয়ে নয়,ক্রীতিকের সুক্ষ্ম অ'পমানের জবাবে, অরু পাল্টা তী'র ছু'ড়লো,বললো,

–আমি যতদূর জানি আপনি নিজেও খাঁটি বাঙালি, তার উপর নাম করা রাজনৈতিক বংশের ছেলে।

ব্যাস এতটুকু বলারই ফুসরত পেলো অরু, এরপরই টেবিলে রাখা স্টেক কাঁ’টার সিলভার রঙের ছু’ড়ি’টা ওর গলায় চেঁ’পে ধরে ক্রীতিক।

–হোয়াট’স রং জেকে,কি করছিস এটা?

ক্রীতিকের কান্ডে সায়র হকচকিয়ে উঠে কিছু বলতে যাবে,তার আগেই ওকে হাতের ইশারাতে থামিয়ে দিলো ক্রীতিক, দাঁত দিয়ে দাঁত পি’ষে ফেলে বললো,

—আমাদের মধ্যে কথা বলতে আসিস না সায়র।ও যেভাবে “আমাদের”কথাটা উচ্চারণ করলো, মনে হচ্ছে স্বামী স্ত্রী তাদের স্টুপিড সাংসারিক ঝ’গড়া করছে,আর ওই তৃতীয় ব্যাক্তি হয়ে আগ বারিয়ে তাদের ঝগড়া থামাতে এসেছে,

কিন্তু ব্যাপারটা তো তেমন নয়, সায়র একদিনেই বুঝে গিয়েছে ক্রীতিক মেয়েটাকে অসম্ভব অপছন্দ করে। তাহলে কে রেখে গেলো মেয়েটাকে এখানে? এই জ’মের হাতে, এখন না হয় সায়র আছে, কিন্তু রাত বিরাতে হুট করে জেকে রেগে গেলে, তখন কি হবে??সায়র ভাবতে ভাবতে সটান বসে পরলো।

ক্রীতিক এখনো একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে,

ভয়ে নিজের জামা নিজে শ’ক্ত করে চে’পে ধরে রেখেছে অরু। চোখ দুটোপানিতে ছলছল করছে এই গড়িয়ে পরলো বলে।

— মুখে মুখে ত’র্ক আমার একদম পছন্দ নয়,এখন থেকে আমি যা বলবো তুই সেটাই করবি, আমার সামনে মোটেই ফা’কিং তে’জ দেখাতে আসবি না,নয়তো তোর তে’জ গলিয়ে দিতে আমার এক সেকেন্ড ও সময় লাগবে না। মাইন্ড ইট। ক্ষী’প্ত’তা সুস্পষ্ট ওর দু’চোখে,সেই সাথে মুখের কথা গুলো চ’পেটাঘা’তের মতোই শ’ক্তিশালী।

তবুও কতো নির্বিঘ্নে কথাগুলো বলে,রুমে গিয়ে শব্দ করে দরজা লাগিয়ে দিলো ক্রীতিক।

ক্রীতিক চলে যেতেই অরুর চোখের জলের বাধ ভে’ঙে যায়, অসহায়ের মতো নিজের চোখের জলকে থামাতে বারবার চোখ মুছছে অরু। অভিমানী কা’ন্নায় নাকের ডগাটা লাল হয়ে গিয়েছে।

সায়র এগিয়ে গিয়ে, নিজের রুমালটা অরুর দিকে এগিয়ে দিলো।

— মুখটা মুছে নাও অরু। অরু নিলোনা, বরং দৌড়ে হল রুম ছেড়ে দোতলার ছাঁদ বারান্দায় চলে গেলো। বড্ড আত্মসম্মানে লেগেছে ওর। একজন অপরিচিত মানুষের সামনে এতোটা অ’পমানিত এর আগে কখনো হয়নি ওও। ক্রীতিক কেন ওকে দু’চোখে দেখতে পারেনা, কেন ওর উপর সবসময় ক্ষী’প্র হয়ে থাকে তা আজও ধরতে পারেনা অরু।

এদিকে সায়র নিজেও ক্রীতিকের কান্ডে বির’ক্ত। কোন এক অজানা কারনে অ-স্বাভাবিক রা’গ ওর। কখনো কি কারনে রেগে যায় সেটা কেবল ওই যানে, আর একবার রেগে গেলেতো কথায়ই নেই, এমন সব ভ’য়াভহ কাজ করে যেগুলো স্বভাবিক মানুষের দ্বারা

সম্ভব নয়। এতো র’গচটা স্বভাব নিয়ে ক্রীতিক যে কি করে কলেজের প্রফেসর ভেবে পায়না সায়র।

—কিন্তু অরুতো রেগে যাওয়ার মতো কিচ্ছুই করেনি। এতো ছোট একটা মেয়ের সাথে , এতো বা’জে ব্যাবহার করার কি মানে আছে, আশ্চর্য।

আনমনেই বলে ওঠে সায়র। সন্ধ্যায় ক্রীতিককে বিদায় জানিয়ে চলে যায় সায়র, আজ রবিবার ছিল বলেই এসেছিল, প্রত্যেক সপ্তাহের ছুটির দিনে, এলিসা,সায়র নয়তো অর্নব কেউ না কেউ ক্রীতিকের সাথে দেখা করতে এই জনমানবহীন নিরব স্টেটে আসে। নয়তো মাসের পর মাস গেলেও ক্রীতিকের কোন খোজ মেলেনা,না কোন সোশ্যাল মিডিয়া, না কোন ইন্টারনেট, না কোন ফেস টু ফেস আলাপ। অনেকটা অস্বাভাবিক লাইফস্টাইলই বলা চলে ওর, সাভাবিক মানুষ এভাবে একাএকা থাকলে দ’মব’ন্ধ হয়ে মা’রা যাবে নিশ্চিত। প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে ও শুধু একটা কাজই করে, সেটা বাইক রাইডিং।

ক্রীতিক সায়রকে এগিয়ে দিতে গেইটের কাছে এলে,সায়র গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো, —প্লিজ ভাই মেয়েটাকে আ’ঘা’ত করিসনা। বড্ড মিষ্টি মেয়েটা, তুই ওকে রাখতে না চাইলে বলিস,আমি আমার বাসায় নিয়ে পুতুল বানিয়ে সাজিয়ে রাখবো ওকে,তবুও ওকে ট’র্চা’র করিস না। আই রিকোয়েস্ট ইউ।

সায়রের কথায়, জিভ দিয়ে গাল ঠেলে একটা তীর্যক আর রহস্যময় হাসি দিয়ে, ক্রীতিক বলে,— আর ইউ ফা”কিং কি’ডিং মি? নিজের হা’র্টবিট কে কেউ আ’ঘা’ত করে?

–উমম!কিছু বললি??

— নাথিং, তুই যা, আর দয়াকরে প্রত্যেক উইকেন্ডে তিনজন মিলে আমাকে জ্বা’লানোটা বন্ধ কর।

সায়র নিজের ছাঁদ খোলা বিএমডব্লিউতে নিয়ে উল্টো পথে যেতে যেতে পেছনে না ঘুরেই হাত নাড়িয়ে বললো, সি ইউ ইন নেক্সট উইকেন্ড। বায় বায়।সন্ধার দিকে অনুও ফিরে আসে। রুমে গিয়ে পরনের মোটা কোর্ট খুলে, চারিদিকে খুঁজতে শুরু করে অরুকে।কিন্তু কোথাও অরু নেই।

ও ডাকতে ডাকতে করিডোরের অন্য মাথায় গিয়ে দেখলো অরু চুপচাপ ছাঁদ বাড়ান্দার মেঝেতে বসে আছে। হাত দুটো দিয়ে রেখেছে ঠান্ডা রেলিংএ তার উপর চিবুক।

কাঁচ ঠেলে বারান্দায় পা রাখতেই হুহু বাতাসে হাড় হীম হয়ে এলো অনুর, এই ঠান্ডার মধ্যে অরু কি’করে বারান্দায় বসে আছে বুঝে উঠতে পারলোনা অনু।তটস্থ গতিতে অরুকে টেনে ভেতরে নিয়ে আসলো ও। অরুর ফর্সা মুখ ঠান্ডায় নীল বর্ণ ধারন করেছে, মুখটা শুকিয়ে এইটুকুনি হয়ে আছে।— ঠিক আছিস বোন? দুপুরে খেয়েছিস?

অনুর উদ্বিগ্ন প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠলো অরু,শরীরের ক্লান্তি টুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, মুখে প্রসস্ত হাসি ঝুলিয়ে বললো,

—খেয়েছি আপা, ভেতরে হাসফাস লাগছিল তাই বাইরে এসে একটু বসলাম, তুই খেয়েছিস, আর মা কেমন আছে? আমি দেখতে যাবো মাকে।

— অনু সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, মা আই সিউ তে আছেরে অরু, এখন গেলেও কাছে যেতে পারবি না, তারচেয়ে বরং কেভিনে শিফট করুক তখন না হয় যাবি।

— তোর কষ্ট হচ্ছে আপা তাইনা?

— নারে, ক্রীতিক ভাইয়া আগেভাগেই কোম্পানিকে সতর্ক করে রেখেছিল, তাই তারাই সব ঝামেলা সামলেছে, আমিতো শুধু মায়ের কাছে কাছে ছিলাম।

দু'বোন আরও অনেক সুখ দুঃখের আলাপ করছিল, তখনই নিচ থেকে কলিংবেল বেজে ওঠে। অনু বলে,–তুই দাঁড়া আমি গিয়ে দেখছি।

একটু পর কতগুলো প্যাকেট নিয়ে ভেতরে আসে অনু।

অরু, কৌতুহল নিয়ে শুধায়,

—এগুলো কি আপা।

— মনেতো হচ্ছে বিরিয়ানির প্যাকেট।

বিরিয়ানির নাম শুনতেই সারাদিন না খাওয়া অরুর পেট গুড়গুড়িয়ে ওঠে,

— কি বলিস আপা তুই অর্ডার করেছিস??

অনু এদিক ওদিক না বোধক মাথা নারায়।

— তাহলে?

অনু প্যাকেট গুলো টেবিলে রেখে বললো, তুই দাড়া আমি ক্রীতিক ভাইয়াকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

অনু ক্রীতিকের রুমে নক করে ঢুকলো, দরজাটা খোলাই ছিল। ক্রীতিক ল্যাপটপে কিছু একটা করছিল তখন।

অনু একটু ইতস্তত হয়ে গলায় বলে,—ইয়ে মানে ভাইয়া, আপনি কি কোন খাবার অর্ডার করেছিলেন।

ক্রীতিক সজোরে এদিক ওদিক মাথা নাড়ায় যার উত্তর না।

অনু নিরাশ হয়ে যেতে যেতে বললো,

,—তাহলে মনে হয়, ভুল করে।

— ইয়ে অনু।

পিছু ডাকে ক্রীতিক।

অনু ফিরে তাকায়,

— আমার মনে হয় তোরা ফার্স্টটাইম এসেছিস তো তাই কোম্পানি তোদের ওয়েলকাম গিফট হিসেবে খাবার গুলো পাঠিয়েছে। আফটার অল তোরা চেয়ারওয়েম্যানের মেয়ে।

অনু, শুনে খুশি হয়ে গেলো, উপর থেকে অরুকে ডেকে বললো,— খা অরু এগুলো কোম্পানি থেকে পাঠিয়েছে আমাদের জন্য।

অরুও আর অপেক্ষা করলো না, সারাদিনের অভুক্ত পেটটাকে আসকারা দিতে বসে পরলো পেট পুজো করতে।

খুশি মন নিয়ে অনু চলে যেতেই ক্রীতিক আবারও নিজের কাজে মন দিলো। সানফ্রান্সিসকো থেকে মাইল ত্রিশেক দুরে ছোট্ট নির্জন এই শহরতলীর আবহাওয়া বরই অদ্ভুত। সপ্তাহে বড়জোর দু-একটিবার রোদের মুখ দেখা যায়, বাকিটা সময় ঘুটঘুটে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ নয়তো কুয়াশা ঢাকা ঝাপসা প্রকৃতি,তারউপর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডাতো আছেই।

ঘরের মধ্যে কৃত্রিম তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন ব্যাবস্থা থাকায় সেই হীমধরা শীত ছুতে পারেনা মানুষের শরীর। মাইনাস জিরো ডিগ্রিতেও এদেশের মানুষের কর্মব্যাস্ত জীবন অনড়।

কিন্তু একা একা এভাবে, রুমের মধ্যে বসে বসে ঠিক কতক্ষণ থাকা যায়? গত দুদিন ধরেই এভাবে কাটাচ্ছে অরু। খাও, দাও আর ঘুমাও। আপাও সকাল হতে না হতেই হসপিটালে ছোটে। ক্রীতিক বাড়িতে থাকা না থাকা একই কথা, সে কখন আসে কখন যায় সেই ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই অরুর। তাছাড়া এই ব'দমেজাজি লোকের সাথে মুখ দেখাদেখি না হওয়াটাই ভালো, এককথায় গুড লাক।

রুমের মধ্যে এদিক ওদিক পায়চারি করছে অরু। অলস মস্তিষ্কটা ভাবছে কি করা যায়? কিভাবে সময় কাটানো যায়, তখনই গুরুদায়িত্ব মনে পরার মতোই মনে পরে যায় নিখিল ভাইয়ের কথা। গত দু'দিনে অরুতো ভুলেই গিয়েছিল নিখিল ভাইয়ের সাথে একই দেশে আছে ও।— কিন্তু মাত্র এই কয়েকদিনের দুরত্বে কিভাবে আপনাকে ভুলতে বসলাম আমি নিখিল ভাই?

ওর অবচেতন মস্তিস্ক বললো,

–ভালোবাসলে ভোলা যায়??

— তারমানে কি আমি তাকে ভালোবাসিনা? না না কি ভাবছি এসব। ভুলভাল চিন্তাদের দূরে ঠেলে দিয়ে নতুন ভাবনা সংযোজন করলো ও, —যে করেই হোক নিখিল ভাই কে খুঁজে বের করবো আমি। কিন্তু কিভাবে?

তখনই চোখ গেলো বেড সাইড টেবিলে অযত্নে পরে থাকা মুঠো ফোনটার দিকে, যেটা গত দু'দিন ধরে বন্ধই পরে আছে।

অরু এগিয়ে গিয়ে ফোনটা হাতে তুলে নিলো, মনে মনে ভাবলো এটাকে চার্য দিয়ে লাভ নেই কারণ ওর কাছে সিমকার্ড নেই।

তাহলে এবার কি হবে??

অরু পা দুলিয়ে খাটে গিয়ে বসে পরে। তারপর ভাবতে ভাবতে আনমনে বলে,— আমাকে ধাপে ধাপে এগোতে হবে, সবার আগে নিখিল ভাইয়ের ভার্সিটি খুজে বের করতে হবে, আর সেটা জানতে হলে তিথিকে কল করতে হবে, একমাত্র ওই জানবে নিখিল ভাই কোন ভার্সিটিতে হায়ার স্টাডিসের জন্য এসেছে। তারপর এড্রেস নিয়ে সোজা নিখিল ভাইয়ের মুখোমুখি।

কথাটা ভেবেই লজ্জায় নিজের মুখে দু-হাত চেপে মুঁচকি হাসে অরু।

—কিন্তু তিথির সাথে যোগাযোগ করার উপায় কি??

বুদ্ধিদীপ্তদের মতো চোখ জোড়া বড় করে অরু বললো আইডিয়া, এতোবড় বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা ল্যান্ডলাইন থাকবে? হ্যা

থাকবেই, শুধু খুজে বের করতে হবে। নিজেকেই নিজে আস্বাস দিলো ও।

তারপর আর দেরি করলো না, তৎক্ষনাৎ ডায়েরির পাতা থেকে তিথির নাম্বার টুকে রাখা পৃষ্ঠাটা ছিড়ে নিচের দিকে ছুট লাগালো নতুন কোন সুযোগের আশায়। বেখেয়ালি অরু একপ্রকার নাচতে নাচতেই নিচে নেমে এলো। তবে শেষ সিঁড়িটা পেরোতেই ওর পায়ের উদ্যম গতি থেমে গেলো,সেই সাথে হাস্যোজ্বল মুখটাও চুপসে গিয়ে থমথমে দৃশ্য ধারণ করলো।

অন্ধকার হল রুমে, কালকের মতোই ডিভানে বসে টি টেবিলের উপর দু'পা তুলে বাইক রাইডিং ভিডিও গেইম খেলছে ক্রীতিক।

অরু মনে মনে বিরক্ত হলো,—এতো বড় হয়েও সারাদিন ভিডিও গেইম খেলে এই লোক,আশ্চর্য অফিস টফিস নেই নাকি?

আবার হতেও পারে কোটি পতি বংশের একমাত্র উত্তরাধীকারী মি.কুম্ভকর্ণ।

নিজের মনের কথায় নিজেই ঠোঁট টিপে হেঁসে ওঠে অরু।

সঙ্গে সঙ্গে মনিটরের গেইমটা পজ হয়ে যায়।

ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক সেকেন্ড,তারপর গম্ভীর স্বরে বলে,

— হোয়াট হ্যাপেন্?? এভাবে হাসছিস কেন? আমি বয়সে তোর থেকে ঠিক কত বছরের বড় তুই জানিস?

অরুর হাসি থেমে যায়, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার তার সাথে নিস্তব্দ পরিবেশ, কেবল মনিটর থেকে আসা মৃদু আলো ছাড়া আর কোনো আলোই জলছে না হল রুমে। জানালা থেকে শুরু করে, কাচের দেওয়ালের পর্দাটা পর্যন্ত টেনে দেওয়া।

এমন পরিবেশে ক্রীতিকের রাগি আওয়াজ বেশ ভ'য়ানকই ঠেকলো অরুর কানে।

আর এই মূহুর্তে ক্রীতিক যে, ওর দিকে চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে আছে,ব্যাপারটা ভয়ের উপর যা থাকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। অরু এই নিরবতা ভাঙতে চাইলো,তাইতো নিস্তব্ধতা কাটিয়ে রিনরিনে আওয়াজে বললো,— আ..আপনার অফিস নেই?

— কোন অফিস??

— এমা, কি বলছেন আপনাদের কোম্পানি, জেকে গ্রুপ। ওয়েট "জেকে "তারমানে কোম্পানিটা আপনার নামে আর কালকে ওই ভাইয়াটা আপনাকেই ডাকছিল, জায়ান ক্রীতিককে ছোট করে জেকে।

আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে অরুর করা বিশ্লেষণ ক্রীতিক শুনেছে কি শোনেনি কে জানে?

ওও আবারও মনিটরে নজর দিয়ে বললো,

— আমার সামনে একদম হাসবি না তুই। তোর হাসিটা বি'শ্রী লাগে আমার। আর ওটা আমার নয়, তোর মায়ের অফিস। আর না ওখানে আমি বসি, তুই চাইলে অবশ্য বসতে পারিস।

অরু মনে মনে ভরকায়,—কি বলে এই লোক। আমি কেবল কলেজ পাশ করে এডমিশন নিলাম,উনিকি ঠাট্টা করছেন, মানুষ এতো সিরিয়াস ফেস নিয়েও ঠাট্টা করতে পারে? অদ্ভুত।

অরু আর ঘাটায় না ক্রীতিককে বেশি ঘাটালে হুট করে কি জানি কি অপ'মান করে বসে তার ইয়ত্তা নেই। তাই অরু কথা ঘুরিয়ে বলে।

— বলছি যে লাইটটা জ্বালাতাম, একটু কাজ ছিল।

— নো। সচকিত জবাব আসে ক্রীতিকের দিক থেকে।

— কিন্তু কেন?

— আমার অন্ধকার ভালো লাগে তাই,যা করার এই অবস্থাতেই করে যা। হালকা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো অরুর বুক চিড়ে, ক্রীতিক বলেছে মানে, সে কথা এক চুলও নরবে না। তাই অন্ধকার হাতরেই ল্যান্ড ফোনের সামনে গিয়ে সফেদ কার্পেট বিছানো মেঝেতে বসে পড়লো অরু। কাগজ থেকে খুব সাবধানে নাম্বারটা টুকে,কল লাগালো তিথির নাম্বারে।

কয়েকবার রিং পরতেই কল ধরেছে তিথি বাংলাদেশে তখন রাত দশটা কি এগারো তবুও কথা শুনে মনে হচ্ছে ঘুমে কাতরাচ্ছে তিথি। — তিথি আমি অরু বলছি। কেমন আছিস?

তিথি চমকায়, একেতো বিদেশি নাম্বার তার উপর দেশে থাকতেই সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল অরু, এখন হুট করেই আবার কেন কল দিলো?

তিথি কিছু বলবে তার আগেই অরু বলে,

—তিথি আমার তোর সাথে অনেক কথা আছে সব খুলে বলবো তোকে,তার আগে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দে, নিখিল ভাই কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য ইউ এস এ এসেছে?

তিথি ওপাশ থেকে কি বললো,সেটা শোনা না গেলেওও আপাতত মনিটরে এতোক্ষণ ধরে নির্দ্বিধায় চলতে থাকা বাইকটা ব্রে’ক ফে’ইল করে বি’দ্ধস্ত হয়ে পরে আছে। পর্দায় বড় বড় অক্ষরে লেখা উঠেছে “গেইম ওভার”।

কেন যেন হুট করে ফুপিয়ে কেঁ’দে উঠেলো অরু,— কাঁ’দতে কাঁ’দ’তে অসহায়ের মতো করে বলছে, তিথি তুই কি ড্রাং’ক এভাবে কেন কথা বলছিস, তুই কি কোন বা’জে ছেলেদের পাল্লায় পরেছিস??বলনা?

ওপাস থেকে টলতে টলতে তিথি বললো, —বেশ করেছি বলেছি, তুই আমার বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখিসনা। আমাদের ফ্রেন্ডশীপটাকে কোনোকালেই গুরুত্ব দিস নি তুই, উল্টে সবসময় আমাকে আর নিলীমাকে ইউজ করে গেছিস,এটা বল, ওটা বল,এটা জানা, সেটা জানা, কেনরে আমিকি তোর চাকর ?? তোর ইনফরমেশন কালেক্ট করাই কি আমার কাজ?? তারউপর সবসময় এমন ভাব করে এসেছিস যেন তুইই পার্ফেক্ট, তুইই ক্রীতিক কুঞ্জের মালকীন। আর আমরা কি? লেইম?—কি বলছিস এসব তিথি, তোর মাথা ঠিক আছে?

খানিকটা তাচ্ছিল্যে হেসে তিথি আবারও বলে –আরেহ তুইতো আসলেই কচুরিপানারে।আমার মাথা ঠিক আছে কি নেই সেটা জিজ্ঞেস করার তুই কে? আমিতো এই ভেবে তোকে বন্ধু বানিয়েছিলাম যে তুই অতবড় বাড়ির মেয়ে,পুরান ঢাকার নামকরা রিয়েলএস্টেট ফ্যামিলি বিজনেস তোদের। ওমাই গড। কিন্তু তুই তো আসলে ওবাড়ির কেউই নস, আশ্রিতা মাত্র, তোদের জন্য ওই বাড়ির একমাত্র ছেলে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী নিজ বাড়িতে পা রাখেনা পর্যন্ত।তাহলে ভাব তোরা কত নিচ। আর তোর সাহস দেখে তো আমি রীতিমত অবাক হচ্ছি,তুই কিনা নিখিল ভাইয়ের খোজ করছিস? তুই জানিস নিখিল ভাই কতবড় সাইন্টিস্ট হবে? তুই তার নখের যোগ্যতাও রাখিস না অরু। তাই তোর ভালোর জন্যই বলছি ওনার বউ হওয়ার যে দিবাস্বপ্নটা দেখছিস না? সেটা এবার বন্ধ কর।আর যাই হোক নিখিল ভাইয়ের মতো হাই স্ট্যাটাসের ছেলে অন্তত, তোকে বিয়ে করবে না।

অরু চোখ দুটো বন্ধ করে সমস্তটা শুনে গেলো। এই ভ’য়টাই তো পেয়ে এসেছিল এতো গুলো বছর ধরে। আজ এতো দুরে এসেও সেই ভ’য় থেকে পালাতে পারলো না ওও। ঠিকই মুখোমুখি হয়ে গেলো তি’ক্ততায় পরিপূর্ণ কিছু চড়ম সত্যের।

নিস্তব্দ শুনশান হল রুমে অরুর ফোঁ’পানির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

অরু কান্না ভেজা গলায় আরও একবার তিথি কে অনুরোধ করলো,— প্লিজ তিথি তুই আমাকে যা খুশি বল আমি শুনবো, শুধু নিখিল ভাইয়ের ভার্সিটির নামটা বল প্লিইইজ। তুই না বললে আমি আর কোনো দিনও নিখিল ভাইকে খুঁজে পাবোনা।

—রিডিকিউলাস

ওপাশ থেকে এতোটুকুই শোনা গেলো, তারপর শুধু কল কে'টে যাওয়ার পিঁক পিঁক আওয়াজ হলো।

অরুর কি হলো কে জানে, আশেপাশে কে আছে কে নেই, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে কল কা'টতেই হুহু আওয়াজ করে কেঁ'দে উঠলো। হয়তো নিজের ঘনিষ্ট বন্ধুর কাছ থেকে এই তিরস্কারটা মোটেই হজম করতে পারেনি ও।আধারে ঢাকা বদ্ধ ঘরে সেই কা'ন্নার আওয়াজ বরই ব্যা'থাতুর শোনালো। লম্বা সিল্কি চুল গুলো পুরো মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে আছে, দু'হাত মেঝেতে রেখে তাতে নিজের ভর ছেড়ে দিয়ে অনর্গল কাঁ'দছে অরু।কা'ন্নার তোপে শরীরটা বারবার ঝাঁকি দিয়ে উঠছে, সেই তালেতালে মৃদু রিনঝিন শব্দ করছে পায়ে আটকে থাকা নুপুর জোড়া।পেছন থেকে ওর কালো মেঘের মতো ঘন চুল দেখে যে কেউ বলবে ডিজনি প্রিন্সেস রুপাঞ্জেল তার সবচেয়ে দুঃখের সময় পার করছে।কিন্তু সবার দৃষ্টিভঙি এক নয়, ধ্যান ধারণাও এক নয়,কারও ক্ষেত্রে হৃদয়টা হয় বরফের মতোই নির্জীব আর অনুভূতিহীন।সামান্য কা'ন্নাকা'টি দিয়ে সেই বরফ গলানো দুষ্কর।

এই যেমন অরুর কান্নাকাটিও পাশের ডিভানে বসে থাকা ক্রীতিকের হৃদয় ছুতে পারলোনা। ওও হুট করেই একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো।

নিজের যায়গা ছেড়ে উঠে এসে অরুর হাতে হ্যাঁচকা টান মে’রে ওকে জো’র করে দাঁড় করিয়ে দিলো। তারপর ওই হাত ধরেই টা’নতে টান’তে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে বললো,

— আউট।

অরু কিছু বুঝে ওঠার আগেই শব্দটা উচ্চারণ করে ধাপ করে দরজা আটকে দেয় ক্রীতিক।

তারপর ভেতরে গিয়ে মেঝেতে পরে থাকা কাগজের টুকরোটা তুলে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, পকেট হাতরে ফোন বের করে কাউকে কল লাগায়,— আমি একটা নাম্বার ফরওয়ার্ড করেছি তোকে, এর এ টু জেট সব ইনফরমেশন চাই।এস সুন এস পসিবল।

বাইরে এলোপা’থারি ঠান্ডা হাওয়া বইছে। শুধু ঠান্ডা বললে ভুল হবে মা’রাত্মক ঠান্ডা। আকাশটাও মেঘাচ্ছন্ন যখন তখন বৃষ্টি চলে আসতে পারে, এতো ঠান্ডা সয়ে অভ্যাস নেই অরুর তারউপর ওর পরনে কোনো শীতের কাপড়ও নেই, এককথায় জা’ন যায় যায় অবস্থা। অরু একটু সময় নিজের কা’ন্নাকা’টি থামালো, তারপর দু’হাত দিয়ে সজোরে দরজা ধাক্কাতে লাগলো।

ক্রীতিক বয়সে অরুর চেয়ে অনেক বড়, তারউপর সম্পর্কটা এতোটাও সহজ নয় ওদের, তাই কখনোই ক্রীতিককে কিছু বলেনি

ডাকেনি অরু। কিন্তু এই মূহুর্তে একটু দ্বিধা নিয়েই ডাকতে শুরু করলো ও।

— ভাইয়া, ক্রীতিক ভাইয়া, দরজা খুলুন না, আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি তো। ভাইয়াআআ।

ওপাশ থেকে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া এলোনা।

এভাবে ঠিক কতক্ষণ ডেকেছে মনে নেই অরুর। ডাকতে ডাকতে একপর্যায়ে দরজার সামনেই ক্লান্ত হয়ে বসে পরে ঠান্ডায় নীল হয়ে যাওয়া অসহায় অরু ।হাইওয়ে ধরে এগোলে রাস্তার একপাশে পেট্রোলপাম্প আর অন্যপাশে ম্যাকডোনাল্টস এর বিশাল ক্যাফেটেরিয়া। এই ছোট্ট শহরটা বেশ নীরব, তার চেয়েও নীরব এই স্টেট টা, যে কয়েকটা ফ্যামিলি আছে তারাও বৃদ্ধ বৃদ্ধা,নয়তো ক্রীতিকের মতো একঘেয়ে।মোদ্দাকথা যারা কোলাহল মুক্ত নিরবচ্ছিন্ন জীবন পছন্দ করে তারাই এই স্টেটে থাকে,নয়তো সানফ্রান্সিসকো থেকে এতোটা দুরে এমন নির্জন পরিবেশে সারাদিন কাটিয়ে দেবার মতো অযথা সময় কারোরই নেই।

দুপুর বেলা হওয়াতে ক্যাফেটেরিয়ায় বেশ কিছু মানুষ আছে, তারা যে যার মতো ছাঁদ গোল টেবিলে বসে একটু একটু কফির সিপ নিচ্ছে আর গল্প করছে।

লাল সাদা লোগোর একটা গোল টেবিলে প্রত্যয় ওও বসে আছে। মাত্রই একটা গড়ম কফি শেষ করলো সে। এখন একটু নিকোটিনের ধোঁয়া ছাড়ার জন্য মনটা নিশপিশ করছে, তাই ঠোঁটের কোনে

সিগারেট নিয়ে বা হাত দিয়ে দিয়াশলাই জ্বালানোর চেষ্টায় আছে ও।

তখনই ম্যাকডোনাল্ড লোগোর টিশার্ট পরিহিত একটা ব্রাউন স্কিনটোনের মেয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো। ঠোঁটের ভাঁজে একগাল হাসি টেনে বললো,— সরি স্যার স্মো'কিং ইজ নট এলাউ।

প্রত্যয় মাথা তুলে একবার চাইলো,হুট একদম হুট করে চোখে চোখ রাখলো,অতঃপর হারিয়ে গেলো। মেয়েটা সাদা ফ্যাটফ্যাটে চামড়ার নয়,বরং দুধে আলতা রঙের মায়ায় ভরা চেহারা তার, প্রসস্থ হাসিতে স্নিগ্ধতা যেন উঁপচে পড়ছে ওর। ডাগর ডাগর চোখে কোন কৃতিম সৌন্দর্য নেই, চোখের নিচের সুক্ষ ডার্ক সার্কেলটাও তার সৌন্দর্যের সামিল। প্রচন্ড ঠান্ডায় ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষের যখন দিনাতিপাত করাই দুষ্কর, ঠিক তখনই প্রত্যয় আবিষ্কার করলো,এক অজানা উষ্ণতায় ছেয়ে যাচ্ছে ওর হৃদয়ের কানায় কানায়।

নিস্প্রভ তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠান্ডা হাওয়ায় ওর চোখের কোনে জল জমে গিয়েছে, তাও মনে হচ্ছে এটা শীত নয় বসন্ত। এটা বরফ গলা হাওয়া নয় বরং বাসন্তিক মনমাতানো হাওয়া।

লোকটা এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে দেখে, এবার একটু ইতস্তত হয়ে হাত নাড়লো অনু।— হ্যালো স্যার।

প্রত্যয়ের ধ্যান ভেঙে যায়,ও তৎক্ষনাৎ হুড়মুড়িয়ে সিগারেট টা ডাস্টবিনে ছু'ড়ে ফেলে দেয়।
— থ্যাংক ইউ স্যার।

মুখে একচিলতে সুশ্রী হাসি ঝুলিয়ে রেখে অনু চলে যায় অন্য কাস্টমারদের কাছে।

প্রত্যয় বলতে চাইলো,

—তুমি এমন করে আর কারও সামনে হেসোনা অপরিচিতা। তোমার এই মনোমুগ্ধকর হাসিটা আমি, হ্যা আমি কেবল একাই উপভোগ করতে চাই। কিন্তু ও পারলো না, তার আগেই অন্যপাশ থেকে ত’র্কাত’র্কির আওয়াজ ভেসে এলো।

প্রত্যয় খেয়াল করলো, অনুকে ওরা কিছু বলছে। ভারী শরীরের গু’ন্ডা মতো একটা সাদা চামরার লোক। দেখেই মনে হচ্ছে টাল হয়ে আছে,

স্মো’কিং না করতে বলায়, লোকটা ভীষণ চটে গিয়েছে অনুর উপর , অযথা ইংরেজিতে গা’লাগা’ল করছে। এক কথায় দুই কথায় সব মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছে ওদের কাছে, ক্যাফেতে এই মূহুর্তে অনু আর ওর শিফটমেট ডেইজি ছাড়া কতৃপক্ষের কেউ নেই। তারউপর অনু দুইদিন হলো জয়েন করেছে মাত্র, কিভাবে কি সামাল দেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না ও। একপর্যায়ে লোকটা রে’গেমেগে গড়ম কফির মগটা ছু’ড়ে মারে অনুর দিকে। অকস্মাৎ ঘটনায় চোখ জোড়া খিঁচে বন্ধ করে নিলো অনু। এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে যায়, শরীরের চামড়ায় গ’ড়ম বিভ’ৎস কোনো কিছুই অনুভব করতে পারলো না ও। ব্যাপারটা কি হলো বুঝে উঠতে ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে অনু। দেখতে পায়, একটু আগের সিলভার কালার শার্ট পরিহিত সেই লোকটা,

ওকে নিজের বাহুতে আড়াল করে চোখ মুখ খিঁচে দাড়িয়ে আছে।—তার মানে কফিটা কি ওনার শরীরে পড়লো?

হায় হায়।

অনু ব্যাস্ত হয়ে কিছু বলতে যাবে তার আগেই লোকটা ওর দিকে একরাশ মায়াচোখে তাকিয়ে বললো,

— আর ইউ ওকে?রিমঝিম বৃষ্টি আর বাজ পড়ার ভ’য়ানক শব্দ কানে আসতেই ঘুম ছুটে গেলো ক্রীতিকের।

হাত দিয়ে নিজের চুল গুলো ব্যাকব্রাশ করতে করতে উঠে বসলো ও, ঘরিতে তখন বিকেল চারটা।

তখন অরুকে বাইরে রেখে এসে কাউচে শুয়েই কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছিল টের পায়নি ও।

“অরু” কথাটা মাথায় আসতেই নিজের চুল নিজেই খাঁ’মচে ধরলো ক্রীতিক।

—ও’নো মাথা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা ঠিক আছেতো?

এক মূহুর্তও অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো ক্রীতিক।দরজার সামনেই দু হাটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে অরু। চেতনা আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ গতিতে থ’রথর করে কাঁ’পছে ওর ছোট্ট শরীরটা। সেই সাথে জোর তালে নিঃশ্বাস ফেলছে । দেখে মনে হচ্ছে শ্বা’স ক’ষ্ট হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় ফ্যাকাশে নীল বর্ন ধারন করেছে পুরো শরীর।

অরুর এ অবস্থা দেখে আড়ালে দীর্ঘঃশ্বাস ত্যাগ করলো ক্রীতিক, তারপর আলগোছে বাচ্চাদের মতো করেই নেতিয়ে পরা অরুকে দু-হাতে তুলে নিলো নিজের কোলে। ওর শরীর স্পর্শ করতেই চমকে ওঠে ক্রীতিক, বরফের মতোই ঠান্ডা হয়ে আছে শরীর,আরেকটু দেরী করে দরজা খুললে কি হতো কে জানে??একটানা সাতদিন তীব্র জ্বরের দাপদা'হ আর সর্দি কাশির মতো বিদঘু'টে অসু'স্থতায় ভুগে তবেই সেদিন সারাবেলা বাইরে থাকার পাঠ চোকালো অরু।

এখন জ্বর নেই মোটেই, গত কয়েকদিনের থেকে আজ শরীরটাও বেশ হালকা লাগছে, তবে খুসখুসে কাশিটা যেন পিছুই ছাড়ছে না, দিনের বেলা যেমন তেমন রয়ে সয়ে হয়। কিন্তু রাত হলে যেন, কাশির চৌদ্দ গোষ্ঠী এসে ওর ঘুম হারাম করে দেয়। স্বাধে কি আর অরু এটাকে বিদঘু'টে রো'গ বলে?

আজ মনে হচ্ছে একফালি রোদ উঠেছে পুর্বাকাশে, অরু উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সমেত কাঁচ সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বরফ শীতল ঠান্ডা হাওয়া নাক চি'ড়ে ভেতরে প্রবেশ করলো ওর। রোদের তাপ যতটা মনে হচ্ছিলো ততটাও গাঢ়ো না। মুখ ভার করে আবারও জানালার কাঁচ টেনে দিলো অরু, মনে মনে ভাবলো,—এই ঠান্ডা বাতাস লেগে যদি আবারও জ্বরটা ফিরে আসে তাহলে আপা নির্ঘাত মে'রে আলুরদম বানিয়ে দেবে।

তবে পর্দাটা আর টানলো না। রুমের কোন থেকে একটা বারস্টুল টেনে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পরলো জানালার মুখোমুখি।

প্রকৃতির আবহমান উত্থান পতন দেখতে দেখতে যখন ভাবলেশহীন হয়ে পরে অষ্টাদশীর উদাসীন মন।

তখনই রুমের বাইরে হাতের আঙুল দিয়ে দরজায় টকটক আওয়াজ তুলে কড়া নারে,অষ্টাদশীর মনে গ্রীক গড খ্যাতি প্রাপ্ত সুদর্শন যুবক।

অরু পেছনে ঘুরলো তৎক্ষনাৎ, দেখলো, পুরো ফর্মাল ড্রেসআপে স্ব পকেটে হাত গুঁজে দাড়িয়ে আছে ক্রীতিক। চুল গুলোও আজ এলোমেলো নয়,বরং হেয়ারজেল দিয়ে পরিপাটি করা। সফেদ শার্টের উপর নেভি’ব্লু কোটি আর গ্রে রঙের রিস্ট ওয়াচে তাকে অসম্ভব মানিয়েছে।অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়,প্রথম দুটো’দিন বাড়িতে সারাক্ষন গেইম খেলে কাটালেও, গত একসপ্তাহ ধরেই প্রতিদিন রেডি হয়ে কোথাও যায় ক্রীতিক। অরু জানেনা ক্রীতিক কোথায় যায়, আর জানতেও চায়না। কারন অরুর চোখে ক্রীতিক একজন নি’র্দয় মানব। কতটা অ’মানুষ হলে, একজনকে এমন প্রতিকূল আবহাওয়ায়

ঘর থেকে বের করে দিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারে মানুষ? ভেবে পায়না অরু, আর না ক্রীতিকের কাছে এর কোন জবাব আছে। এই লোক বেপরোয়া স্বভাবের জানতো অরু, তাই বলে এতোটা?? তাও বিনা কারনে।এখনো সেসব কথা ভাবলে মাথাটা জল’ন্ত লাভায় টগবগ করে ওঠে অরুর।

দ্বিতীয় বারের মতো ক্রীতিকের দরজায় টোকা দেওয়ার আওয়াজ পেয়ে সম্মোহন ফিরে পেলো অরু। তবে কোন কথা না বলে শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্রীতিকের দিকে।

জবাবে, নিজ পকেটে হাত গুঁজে রেখে একটানা কয়েক মিনিট নিস্প্রভ তাকিয়ে রইলো ক্রীতিকও। ক্রীতিকের চোখ নিস্প্রান তবে তাকালে মনে হয় কথাদের রাজ্য,এ চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়না, অরুও পারলো না, চোখ নামিয়ে সংশয় বোধ করলো, তারপর বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললো—কিছু বলবেন??

–না।

সশব্দে কথাটা বলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে গেলো ক্রীতিক।

অজ্ঞাত অরু কিছু না বুঝে,সেদিকেই তাকিয়ে বিরবিরিয়ে বললো,

—এই লোকটা এমন কেন??ভারী অদ্ভুত।–অবসেশন!

—মানে ঘোর??

—হ্যা ওটাই, তুই আমার প্রতি অবসেসট অর্নব আর কিছু নয়, অযথা নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিস না। আমার জীবনটা পদ্ম পাতার জলের মতোই আজ আছি কাল নেই, দেখা গেলো নিজ বাবার হাতেই...

বাক্যটুকু আর শেষ করতে পারলো না এলিসা, তার আগেই ফোনের ওপাশ থেকে ক’ড়া গলায় শা’সিয়ে উঠলো অর্নব।— চুপ করবি এলিসা,এই এক বাসি গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে আর কতোদিন দুরে সরিয়ে রাখবি আমাকে??

— যেদিন নিজ চোখে দেখবি, সেদিন বুঝবি আমি কোনো বাসি কিংবা বেহুদা কথা বলছি না।

— যেদিন দেখবো সেদিন তুই একা থাকবি না, আমরা তিনজনই তোর সাথেই থাকবো।নিজেকে এতোটা হেল্পলেস ভাবার কিচ্ছুই নেই।

— আমার জন্য তোরা কেন বি'পদে পড়তে যাবি?

অর্নব শীতল কন্ঠে বললো,

— তুই আর আমরা কি আলাদা বল??

এলিসা জবাব দেয়না, এই অর্নবটাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রান ও নিজেই। কাজের কথা বলতে গেলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রেম টপিকে চলে আসে,আশ্চর্য।

কিন্তু অর্নবই বা কি করবে, ভালোবাসাতো আর পরিস্থিতি বুঝতে চায়না।আর না মানতে চায় কোনো বাঁধা। নইলে এলিসার মতো নাম করা পকার প্লেয়ার কেই কেন ভালোবাসতে গেলো ও, দুনিয়াতে আর কি কোনো ভালো মেয়ে ছিলোনা??

একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে এলিসা শুধায়,— এখন কোথায় আছিস??

— গাড়িতে, আজকেই ইউ এস এ ফিরলাম, এর মধ্যে ক্রীতিক আবার কারও ডিটেইলস চাচ্ছে ওটা বের করে দিয়ে এখন বাসায় যাচ্ছি। তোদের জন্য আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির জবটা আর বৈধ থাকলো না।

—দ্য গ্রেট হ্যা’কার অর্নব সায়ন্ত যদি বেস্ট ফ্রেন্ড হয়, তবে “ফ্রেন্ড উইথ বেনিফিট “কে না চায় বল?

অর্নব উচ্ছ্বাসিত গলায় বললো,

— চলনা, আজ সিনেমা হলে গিয়ে “ফ্রেন্ড উইথ বেনিফিট “মুভিটা দেখে আসি, শুধু তুই আর আমি, হেব্বি রোমান্টিক মুভি আমি দশবারেরও বেশি দেখেছি।

–তুই একটা ন’ষ্ট।

বিরক্ত হয়ে কল কেটে দিলো এলিসা। এই ছেলের সারাক্ষণ মাখোমাখো ভাব। কি করে এতো নাম করা হ্যা’কা’র হলো ও?

তৎক্ষনাৎ ভাবনার সুতোয় টান পরলো ওর, অযাচিত মন বললো,

— ওয়েট, ক্রীতিক কার ডিটেইলস চাইলো অর্নবের কাছে? নতুন করে আবার কার সাথে ঝা’মেলা পাঁকাতে চাইছে ওও??ঘড়ির কাঁটায় ঠিক সন্ধ্যা সাতটা, ক্রীতিক মাত্রই বাড়িতে এসেছে,বেশভুসা দেখে মনে হচ্ছে বাইক রাইডিং এ গিয়েছিল সে।

পা’স’ওয়ার্ড দিয়ে দরজা খুলে হলরুমের মধ্যেখানে পা রাখতেই দু’পা নিজ গতিতে থমকে গেলো ওর। ভেতরে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পরলো অজানা লাবডুড। সেখানেই কিছুক্ষণ একইভাবে দাড়িয়ে থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো সবচেয়ে কর্নারের কাঁউচের দিকে।

ঘাড়টা সামান্য কাত করে মুখে একটা বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে রেখে দেখতে লাগলো ঘুমন্ত মেয়েটাকে । এই মেয়েটা ওর চেনা খুব চেনা। যেখানে মেয়েদের প্রতি তীব্র অনীহা ওর, সেখানে এই হাটুর বয়সী

মেয়েটার প্রতি অদম্য আসক্তি। অথচ এই অনুভূতি গুলোকে কত বছর ধরে অস্বীকার করে যাচ্ছে ও।

খুবই সন্নিকটে একজনার উপস্থিতি স্পষ্ট অথচ তখনও হল রুমের নরম গদিতে হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমাচ্ছে অরু।গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকায় জামা কাপড়েরওও হদিস নেই।প্লাজো টিশার্ট দুটোই যায়গা থেকে সরে গিয়ে শরীরের অর্ধেকাংশ উন্মু’ক্ত। হল রুমে জ্বালিয়ে রাখা বিস্তর ফকফকে সাদা আলোয় সে সব কিছুই ক্রীতিকের চোখে দৃশ্যমান।

ও না চাইতেও একঝলক পা থেকে মাথা অবধি পরখ করলো অরুকে। হুট করেই কেমন ঘোর লেগে এলো দু’চোখে। নে’শাগ্রস্তদের মতোই চোখ দুটো ঝাপসা লাগছে ওর। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।বারবার জিভ দিয়ে শুকনো অধর ভিজিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে শুয়ে থাকা অরুর লতানো নারীদেহের ভাঁজ গুলো বড্ড আকর্ষনীয় লাগছে ক্রীতিকের চোখে।

বয়সের তারতম্য, সম্পর্কের জটিলতা সব কিছু কয়েকমূহর্তের জন্য ভুলতে বসেছে দ্য গ্রেট পার্সোনালিটি খ্যাত জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী।

মেয়ে মানুষে নাকি তার এলার্জী, ভার্সিটির টিচার থেকে স্টুডেন্ট সবাই তো এটাই জানে।কিন্তু এখন এই মূহুর্তে এমন কেন হচ্ছে? আট বছর আগের তৈরী হওয়া প্রনয়াসক্তি কেনই বা হুট করে মাথা চা’ড়া দিয়ে উঠছে। তাহলে কি ক্রীতিক অরুকে নয় বরং নিজ অনুভূতি কে ঘৃ’ণা করে?? সৎ মায়ের মেয়ের প্রতি এতোটা দূর্বলতা

কোন সমাজই মেনে নেবেনা, বাঙালি সমাজ তো একদমই নয়, তাইতো নিজে বাঙালী হয়েও বাঙালিদের প্রতি এতো রা’গ ওর। ভালোবাসায় আবার সমাজ কিসের? ধর্মে যার প্রাধান্য আছে সমাজে তার সীকৃত নেই কেন?? ভেবে পায়না ক্রীতিক। এই মূহুর্তে ভাবতেও চায়না কোনো কিছু। ওর চোখে পৃথিবী এখানেই থমকে গিয়েছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে অরুর শিওরে ধপ করে বসে পরে ক্রীতিক, ফ্লোরে উরোঝুরো হয়ে পরে থাকা লম্বা চুল গুলোর দিকে একপলক গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ওর কানের কাছে এসে হিসহিসিয়ে ক্রীতিক বলে,— আবার কেন ফিরে এলি এই আধ পো’ড়া জীবনে?? বাকিটা পু’ড়িয়ে দিতে??

তারপর একটা কপট হাসি খেলে গেলো ক্রীতিকের ঠোঁটের কোনে, মুখটা আর-ও একটু সামনে বাড়িয়ে, একই সুরে বললো,

—এবার যদি সত্যিই তোর আসক্তি থেকে নিজেকে সামলাতে না পারি, তাহলে বিশ্বাস কর তুইও পু’ড়’বি। আমার দহনে পো’ড়া’বো আমি তোকে। এখন তো ছোট নেই,তাহলে তুই কেন বেঁ’চে যাবি?এবার আর আমি একা নই, আমরা দুজনে মিলে প্রনয়াসক্ত হবো।

ক্রীতিক অযাচিত ঘোরের বসে আরও কিছু বলতে যাবে তার আগেই অরু ঘুমের তালে একটু নরেচরে ওঠে। অকস্মাৎ সম্বিত ফিরে ফেলো ক্রীতিক।কি করছিল ও এটা??সঙ্গে সঙ্গে অরুর দিকে তাকিয়ে কঁপাল কুঁচকে ফেললো ও। এক ঝটকায় উঠে দাড়িয়ে

ওয়ার্ডরব থেকে একটা লম্বা চাঁদর বের করে ছু'ড়ে' মারলো অরুর উন্মুক্ত গায়ে। এমন ভাবে দুর থেকে ছু'ড়'লো যেন অরুর শরীরে কোন নোংরা লেগে আছে।

গায়ে কাথা জাতীয় কিছুর উপস্থিতি টের পেয়ে সেটাকে ভালো মতো গায়ে পেঁচিয়ে অন্যপাশ হয়ে শুয়ে পড়লো অরু।

সরু যায়গা হওয়াতে পাশ ঘুরতেই কাঁচের টি-টেবিল থেকে ছোট্ট বাইকের শো-পিচ টা পরে যাচ্ছিলো মেঝেতে, তৎক্ষনাৎ সেটাকে ক্যাচ করে নিলো ক্রীতিক। বাইকে বসা হেলমেট পরা দের ইঞ্চি সাইজের পুতুলটাকে চোখ পাকিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,

—-ডোন্ট ইউ ডে'য়ার টু মেইক এ সাউন্ড!!সেই সন্ধ্যায় গতর ডুবে যাওয়া নরম সোফাতেই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় অরু। যখন ঘুম ভা'ঙে তখন রাত নয়টা বেজে পয়ত্রিশ।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘুমের রেশ কাটিয়ে আড়মোড়া ভে'ঙে উঠে বসতেই সেদিনের মতো বিশাল মনিটরের একফালি তীক্ষ্ণ আলো এসে চোখে লাগে অরুর।

সেই আলোতে ক্রীতিকের উপস্থিতি স্পষ্ট।কানের উপর কান পট্টির ন্যায় বড় বড় হেডফোন লাগিয়ে নির্দিধায় গেমিং রিমোটকন্ট্রোলটায় হাত নাড়িয়ে যাচ্ছে সে।

পড়নে বাইকার দের মতো ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেট, যার সামনের দিকের চেইনটা পুরোপুরি খুলে ঘাড় থেকে খানিকটা নামানো। যার দরুন ভেতরে পরিহিত কালো স্যান্ডোগেঞ্জিটা ও দৃশ্যমান। তারউপর শরীরচর্চা করে কৃত্তিম উপায়ে বানানো অ্যাবস গুলোকে

এইটুকুনি স্কিনি স্যান্ডোগেঞ্জি আড়াল করতে পারছে না মোটেই। অন্ধকারে বসে বসে আড় চোখে এসবই দেখছিল অরু। ঠিক তখনই রুমের লাইট জলে সবকিছু আলোকিত হয়ে যায়, অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ আলো চোখে পরায় কপাল কুঁচকে চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে নিলো অরু।—হা করে না থেকে,মুখের লালা পরিষ্কার কর।

সামনের মনিটরে ধ্যান রেখেই বললো ক্রীতিক।

চোখ বড়বড় করে ক্রীতিকের মুখের দিকে তাকালো অরু। আগের মতোই ভাবলেসহীন মুখশ্রী।

তবে অরু আর ভাবলেসহীন হয়ে বসে থাকতে পারলো না হঠাৎ এরূপ পঁচানি খেয়ে, ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে তৎক্ষনাৎ আলগোছে চুল বাঁধতে বাঁধতে দৌড়ে উপরে চলে গেলো।

তার কয়েক মূহুর্ত্ব পরে আবারও নিচে নেমে অসহায় মুখ নিয়ে ক্রীতিকের সামনে এসে দাঁড়ায় অরু।

— কি সমস্যা?

ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন ছো'ড়ে ক্রীতিক।

অরুর চোখে মুখে অ'সহায়ত্ব, কন্ঠে কাঁদও কাঁদও ভাব,কোন মনে কান্না আটকে রেখে ও বললো,— আপা এখনো ফেরেনি।প্রতিদিন তো সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

— তো আমি কি করবো,

ভাবলেশহীন জবাব ক্রীতিকের।

— আপনার ফোনটা একটু দিন আপাকে কল করবো।

— ল্যান্ড লাইন দিয়ে কর।

— নাম্বার জানিনাতো।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, পকেট থেকে ফোন বের করে অরুর হাতে দেয় ক্রীতিক।

অরু কল করলো, একবার, দুইবার,তিনবার তাও ধরলো না অনু।

এতো রাত হয়ে গেছে আপা ফিরছে না, কল ও ধরছে না, অযাচিত ভ’য়েরা যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল অরুকে।অজস্র খারাপ চিন্তায় পেটের মধ্যে না’ড়িভু’ড়ি কেমন উগরে আসতে চাইছে। কিন্তু না সেসবের বদলে উগরে আসলো কা’ন্নারা, অনেক চেষ্টা করেও ক্রীতিকের সামনে স্থীর থাকতে পারলোনা অরু। ধপ করে মেঝেতে বসে ফুপিয়ে কেঁ’দে উঠলো।আবার সেই একই কা’ন্নার আওয়াজ। অরু কি বোঝেনা কোন এক অজানা কারনে এই আওয়াজে ভেতরটা ছিঁ’ড়ে যায় ক্রীতিকের? গলা কাঁ’টা মুরগীর মতোই ছ’টফ’ট করে ওঠে হৃদয়টা। ইচ্ছে করে সব কিছু ধ্বং’স করে ফেলতে।ভেতরে যা হচ্ছে হোক,সেসব কে পাত্তা না দিয়ে, আপাতত অরুকে রা’ম ধমক দিয়েই শুধালো ক্রীতিক।

— কি হয়েছে, ভ্যা ভ্যা করছিস কেন?

অরু কাঁদ’তে কাঁ’দতে জবার দেয়

— আপা কল তুলছে না, এখান আসার পর থেকেই আপা কেমন যেন ব্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। এখন আবার কলটাও ধরছে না।

— পার্ট টাইম জব করলে ব্যাস্ত হবেনা তো কি হবে, মুখ টিপেটিপে বললো,ক্রীতিক।

— কিছু বলছেন??

— না, তুই কা’ন্নাকা’টি অফ কর।তোর কা’ন্নার আওয়াজ বির’ক্ত লাগে।

—- আমি কাঁ’দলেও আপনার বির’ক্ত লাগে হাসলেও বির’ক্ত লাগে, করবোটা কি আমি??

—- চুপ করে থাকবি।অরু তাই করলো,চুপ হয়ে বসে রইলো। এমনিতেই ক্রীতিকের সামনে কেঁ’দে ফেলেছে, এখন ভাবতেই কেমন লজ্জা করছে ওর, ওও তো এতোটাও বাচ্চা স্বভাবের মেয়ে নয়, যথেষ্ট স্ট্রং।

অরুর ভাবনার ছেদ ঘটে ক্রীতিকের আওয়াজে

—আমি বের হয়ে আশেপাশে খুঁজে দেখছি, তুই থাক।

অরু একটু একটু হেঁচকি তুলে বললো,

— আমিও যাবো।নিয়ে যাননা।ম্যাকডোনাল্টস ক্যাফেটেরিয়ার পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে, আশেপাশের রাস্তায় হাটছে ক্রীতিক আর অরু।

ওভারসাইজ ডেনিমের পকেটে হাত ঠুকিয়ে গা ছাড়া ভাব নিয়েই হাঁটছে ক্রীতিক। দেখে মনে হচ্ছে ওর মধ্যে চিন্তার লেশমাত্র নেই।ওদিকে অরু ভেবে পাচ্ছে না হসপিটালে না নিয়ে গিয়ে ওকে এখানে কেন নিয়ে এলো পা’গল লোকটা?আপা তো হসপিটালে।

অরু বার কয়েক জিজ্ঞেস করেছে আগ বারিয়ে।

কিন্তু ক্রীতিকের সোজাসাপটা উত্তর

— আশেপাশে খোঁজ এখানেই পেয়ে যাবি।

অরু সেই তখন থেকে এদিক ওদিক হন্নে হয়ে ছুটছে, সোডিয়ামের আলোয় যতদূর চোখ যায় কোথাও কোন মানুষ নেই। ক্যাফেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে খানিকক্ষণ আগে অথচ অনুর দেখা নেই।— আচ্ছা তোর পেটের মাঝখানের তিলটা কি আসল??যখন ছোট ছিলি তখন তো দেখিনি।

পাহাড়ি আঁকাবাকা রাস্তায় অরু যখন অনুকে খুঁজতে খুঁজতে পাগল প্রায়,ঠিক তখনই ক্রীতিক জ্ঞানী ব্যাক্তিদের মতো ভাবুক হয়ে এই ছ্যাপরি প্রশ্নটা করে বসে।

এই মূহুর্তে ক্রীতিকের কথায় অরু ওর গোপন তিলকের খবর জানায় অবাক হবে,নাকি আহা'ম্মকের মতো প্রশ্ন করায় গিয়ে ঠা'টিয়ে থা'প্প'ড় মা'রবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। যত যাই হোক। বয়সে ওর চেয়ে দ্বিগুণ বড় ক্রীতিক।

তবে কিছু তো কথা শোনানোই যায়, সেই উদ্দেশ্যেই ঘুরে পেছনে এগিয়ে এলো অরু।

তখনই উল্টো দিক থেকে ডাক পরলো অনুর।— অরুউউ

অরু চকিতে পেছনে চাইলো দেখলো, খুঁ'ড়িয়ে খুঁ'ড়িয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে আপা। তার সঙ্গে লম্বা মতো একটা ভাইয়া, অনুর

হাতধরে ওকে হাঁটতে সাহায্য করছে, অনুর ছোট্ট শরীরটা লোকটার শীতের কোর্টদিয়ে আবৃত।

লোকটা কে?কি হয়?কেনইবা অনুর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে?

সে-সব নিয়ে এই মূহুর্তে একবিন্দু পরিমান মাথা ব্যাথা নেই অরুর। ও শুধু দেখছে ওর আপা ব্যা'থা পেয়েছে হাটতে পারছে না ভালো করে।

একদিক দিয়ে ক্রীতিক আর অরু এগিয়ে আসছে, অন্যদিক দিয়ে অনু আর প্রত্যয়। প্রত্যয় আর ক্রীতিকের চোখেচোখে কথা আদান-প্রদান হলো বোধ করি।

কয়েকমূহুর্তের মধ্যে অরু ছুটে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো অনুর, উৎকন্ঠা নিয়ে বললো,— আপা, আমায় রেখে কোথায় গিয়েছিলি তুই? তোর চিন্তায় চিন্তায় পা'গল হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, একমুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল এই অচেনা দেশে আমার আপন বলতে কেউ নেই।

অরুর কথায় ক্রীতিকের মেজাজ অকস্মাৎ তে'ড়ে উঠলো। এইটুকু সামান্য কথায় রাগ লাগার মতো কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না ক্রীতিক,তবুও কয়েকমূহুর্তের জন্য চোখের রঙ বদলালো ওর। আবারও সেই ভ'য়ানক তীক্ষ্ণ চাউনি।

পরক্ষনেই প্রত্যয়ের সাথে চোখাচোখি হওয়ায় আবার তা দপ করেই নিভে গেলো।

পাছে এসে জড়ো হলো ঠোঁট গলিয়ে একটা রহস্যময়ী ক্রুর হাসি। যে হাসিতে সামিল হলো সয়ং প্রত্যয় ওও।

ওরা যে কি মনে করে হাসলো সেটা কেবল ওরাই ভালো জানে।অ্যা'লকোহল আর ব্যা'থা না'শকের সংমিশ্রণে তৈরি মলমটা হাঁটুর থেঁ'তলে যাওয়া ক্ষ'ত স্থানে লাগাতেই চোখ মুখ খিঁচে মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে অনু। ব্যাথা শিথিলের উদ্দেশ্যে, অরু মলম লাগাতে লাগাতে ঠোঁট উঁচিয়ে সেখানটায় আলতো করে ফু দিচ্ছে বারবার।

— হয়েছে অরু এই টুকুনি তো ব্যাথা আর মলম লাগাতে হবেনা।

অরু মুখের আদলে সিরিয়াস ভঙ্গিমা নিয়ে বলে,

— এই টুকুনি ব্যাথা?? দুই হাঁটু থেঁ'তলে যখ'ম হয়ে গিয়েছে। কি করে এমন হলো বলতো?

অরুর প্রশ্নে অনু নিজেও খানিকটা ভাবনায় ডুবে যায়,সত্যিই তো ব্যাথা এই টুকুনি হলেও আজকে সেভিয়রের মতো ওই লোকটা সময় মতো না এলে অনেক ভ'য়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারতো। ফার্স্ট ক্লাস কান্ট্রি হওয়ার দরুন আমেরিকার যেমন অনেক অনেক ভালো দিক আছে, তেমনই ভালোর আড়ালে ঢাকা কুৎসিত দিকের ওও অভাব নেই। আজ তেমনই একটা কুৎসিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে অনুকে।সন্ধ্যা রাতে শিফট শেষ করে ক্যাফেটেরিয়া থেকে বেরিয়ে অনু গিয়েছিল মায়ের কাছে হসপিটালে। মা ,আই সি ইউ তে ভর্তি, খুব একটা পাশে থাকতে হয়না,নার্সরাই খেয়াল রাখেন সর্বক্ষন। তাইতো পার্ট টাইম জবটা অফারটা পেয়েই লুফে

নিয়েছিল অনু। কে জানতো সেই জবই কাল হয়ে এভাবে সামনে দাড়াবে ওর।

ক্যালিফোর্নিয়া আর সানফ্রান্সিসকোর মাঝামাঝি এই স্টেটে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই বললেই চলে। এখানে পার্সোনাল গাড়ি বিহীন চলাফেরা বরই দূরহ ব্যাপার। ক্যাফেটেরিয়া থেকে হসপিটাল অবধি ছোটমোটো একটা বাস স্টপেজ থাকলেও ক্রীতিকের নিরবিচ্ছিন্ন জনমানবহীন বাড়ি অবধি হেঁটেই যেতে হয় অনুকে।

যদিও প্রতিদিন সকালে কোম্পানির বরাদ্দকৃত গাড়িতেই হসপিটালে যায় অনু কিন্তু বিকালে পার্টটাইমের কারনে আর গাড়ির ড্রাইভার কে অযথা ঝামেলা দেয়না ও। বাস ধরে আর বাকিটা পথ হেটে নিজেই বাড়িতে ফিরে যায়।

আজও লাস্ট বাস ধরে কেবলই ক্যাফেটেরিয়ার সামনের স্টপেজএএ নেমেছিল অনু। তখন সন্ধ্যা রাত মাত্র। তবুও পুরো রাস্তা জুড়ে শুনশান নিস্তব্দতা বিরাজমান । অদুরে কোন এক হাইওয়ে থেকে আসা শাঁই শাঁই করে কাবার্ড ভ্যানের শব্দ ছাড়া টুকরো পাতা ঝরে পরার টুপটাপ আওয়াজটা পর্যন্ত অনুপস্থিত।চারিদিকে কেমন গা ছমছমে পরিবেশ।

অনু যত দ্রুত সম্ভব পা চালাচ্ছিল বাড়ির পথে।

ঠিক তখনই সামনে এসে দাঁড়ায় সেদিন ক্যাফেতে ঝামেলা করা গু’ন্ডামতো সেই লোকটা। আজ আর একজন নয় বরং কয়েকজন ছিল ওরা। সব গুলোই নে’শার ঘোরে বুদ হয়ে আছে। লোক গুলো

কেমন লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ে আছে ওর পানে। সোডিয়ামের মৃদু আলোয় অনুর চোখে বড্ড বি’শ্রী লাগলো সেই চাহনী। ওদের আ’ক্রো’শ দেখে মনে হচ্ছে ওরা অনুকে ধরার জন্যই ফাঁ’দ পেতে বসে ছিল।

তাছাড়া ওদের ইংরেজি একসেন্ট ছিল পুরোপুরি অন্যরকম শুনেই বোঝা যাচ্ছিল এরা আমেরিকান না, হতে পারে ব্রিটিশ।

“ব্রিটিশ”শব্দটা মাথায় ঘুরতেই অনুর শীড়দাড়া বেয়ে বয়ে যায় হীমধরা ঠান্ডা স্রোত ।ব্রিটিশরা সাভাবিকের তুলনায় অধীক উ’গ্র মেজাজের, আর প্র’তিশোধ পরায়ন হয়।

—তারমানে কি এরা রি’ভেঞ্জ নিতে এসেছে??কথাটা ভেবেই অনু একপা দুপা করে পেছাতে শুরু করে, তারপর আর এক সেকেন্ডওও সময় নষ্ট না করে চোখ খিঁচে দৌড়াতে শুরু করে পথের উল্টো দিকে।

দু’একবার পেছনে তাকালে দেখতে পায় ওই বাজে লোক গুলো এখানো ওর পিছু ছাড়েনি, বরং স্ব গতিতে ওকে ধরার জন্য ধেয়ে আসছে।

পেছনে তাকিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হুট করেই পায়ের স্যান্ডেল ছিড়ে সামনের শুকনো পিচ ঢালা কাঁচের মতো ধা’রালো রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পরে যায় ও। তৎক্ষনাৎ দুই’হাটুতে প্রচন্ত ব্যাথা পেয়ে মা’গো বলে আর্তনাদ করে ওঠে অনু।

হাঁটুর অবস্থা বেগতিক। তবুও হাঁপাতে হাঁপাতে পেছনে ফিরে তাকিয়ে অনু দেখতে পায় লোক গুলো খুব কাছে চলে এসেছে আর

দু'পা এগোলেই হয়তো ধরে ফেলবে ওকে। আর তারপর কি হবে?? অনু কি আর কখনো বেঁচে ফিরতে পারবে?

অজস্র দানাবাঁধা ভ'য়ের তোপে থরথর করে কাঁপছিল অনু। ঠিক তখনই ওর ডান হাতটা টেনে ধরে ওকে নিয়েই দৌড়াতো শুরু করলো কেউ। ওর পাঁচ আঙুলের ভাজে নিজের পাঁচ আঙুল ঢুকিয়ে সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে লোকটা। অনু নিজেও তারসাথেই দৌড়াচ্ছে, তবে পায়ের ব্যাথার কারনে তালেতাল মেলাতে পারছে না।

— কাম অন, আমি কোন সিনেমার

হিরো নই যে ওদের সাথে একা ফা'ইট করে আপনাকে বাঁচাবো। আপাতত দুজনার সেইফটির জন্য আমাদের পালাতে হবে। পরে না হয় ওদের দেখে নেবো।

দৌড়াতে দৌড়াতে সামনে তাকিয়েই কথা বলছে লোকটা।রোড লাইটের আলোয় ছুটতে থাকা লোকটাকে ভালো করে পরখ করলো অনু, মেরুন কালার শার্ট আর চোখে চিকন ফ্রেমের চশমা পরিহিত ফর্সা গড়নের এই যুবককে ও চেনে। হ্যা সেদিন ক্যাফেতে এই লোকটাই ওকে বাঁচিয়েছিল ওই গড়ম কফিটার হাত থেকে। আর আজ আবারও বাঁচালো,

কে এই লোক?? কোনো এঞ্জেল নয়তো? না হলে বিপদের সময়ই কেন পাওয়া যায় তাকে??

হালকা বাদামি চুল ওয়ালা ক্লিন সেভ করা পাতলা গড়নের লোকটা দেখতে যতটা সুদর্শন,তার কন্ঠস্বরটা তার থেকেও বেশি আকর্ষনীয় আর ডিপ।

অনুর ভাবনার ছেদ ঘটে লোকটার হ্যাঁচকা টানে।

এই মূহুর্তে একটা উডেন হাউজের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওরা। অল্প একটু যায়গায় দুজন খুব আঁটসাঁট বেধে দাড়িয়েছে। অনু চেষ্টা করছে লোকটার থেকে দুরত্ব বজায় রাখার কিন্তু লোকটা নিজের অজান্তেই শক্ত হাতে ওর কোমড় চেপে ধরে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর অনু তাকিয়ে আছে চশমার আড়ালে একজোড়া ধূসর মনির চোখের দিকে।

এভাবেই বিনাবাক্যে, শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস আদান প্রদানে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়, প্রত্যয় সস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলে,— চলে গিয়েছে ওরা।আর রি'স্ক নেই।

চোখে চোখ পরতেই অনু ধরা পরে যাওয়া চোরের মতো ওর চোখ থেকে তৎক্ষনাৎ চোখ সরিয়ে নিলো,ব্যাপারটা ঠাওর করতে পেরে প্রত্যয় দুষ্ট হেসে, হিসহিসিয়ে বলে,

— হাউ সিনেমাটিক।

সেসব কথা ভেবে আবারও এক চিলতে লজ্জা মাখানো হাসি খেলে গেলো অনুর ঠোঁটে।

অনুর এমন উদ্ভট হাসির কারন খুঁজে পায়না অরু, তাই বিভ্রান্ত হয়ে বলে,

— এ্যাই আপা, পাগলের মতো হাসছিস কেন একা একা??

অনু ভ্রু কুঁচকে নিজের পা থেকে অরুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে,কম্ফোর্টার মুড়ি দিতে দিতে বলে, —যা’তো ঘুমাবো।

অরু নিজের ঠোঁট উল্টে বলে,

— আশ্চর্য লজ্জা পাওয়ার কি হলো? আমি কি তোর শশুর না ভাসুর?দেখতে দেখতে কখন যে ক্রীতিকের এই ছোট্ট ডুপ্লেক্স বাড়িটায় একটা মাস কাটিয়ে দিলো টেরই পায়নি অরু। সময় যে কেনো এতো তারাতারি চলে যায় কে জানে??

ডাক্তার বলেছে আজমেরী শেখের ওপেন হার্ট সা’র্জারীর প্রয়োজন। তবে এতোবড় সা’র্জারীর জন্য আজমেরী হক প্রস্তুত নন, দীর্ঘদিন সুচিকিৎসার অভাবে তার শরীরে বিভিন্ন জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেগুলোর ট্রিটমেন্ট চলাকালীন ওপেন হার্ট সা’র্জারী সম্ভব নয়।

অন্যান্য শারিরীক সমস্যার উন্নতি হলে তবেই বড় সা’র্জারী করানো হবে। তাই এই পুরো প্রসেসটায় একবছর বা তার বেশিও সময় লেগে যেতে পারে।

অনু আর অরুর কিছুই করার নেই, মাকে সুস্থ করতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ দুনিয়াতে মা ছাড়া ওদের সত্যিকারে আপন বলে কেউ নেই। এরমাঝে অনু ক্রীতিক কে অনুরোধ করেছে অরুকে যাতে একটা ছোটখাটো ভার্সিটিতে এডমিশন করিয়ে দেয়, কারণ বছরের পর বছর তো আর পড়াশোনা বন্ধ করে রাখা সম্ভব

নয়। অনু না হয় নিজের সখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছে,তাই বলে কি অরুকেও দিতে হবে??

অরু ভেবেছিল ক্রীতিক একবাক্যে না করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি, উল্টে ক্রীতিক আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অরুর কোন চয়েস আছে কিনা।

গত একমাসে সব মিলিয়ে বড়জোর হলে দশদিনমতো অরুর আর ক্রীতিকের দেখা হয়েছে। ক্রীতিক বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকে, কখন আসে কখন যায় সেটাও জানেনা অরুরা। ক্রীতিক যখন হলরুমে বসে গেইম খেলতো তখনই কেবল দু'একসময় বেখেয়ালে দেখা হয়ে যেতো।এছাড়া ক্রীতিকের দেখা খুব একটা পায়নি অরু। মোদ্দাকথা, একই বাড়িতে থাকা সত্বেও সম্পর্কের মতোই ওদের তিনজনার মাঝে ছিল বিশাল জড়তার প্রাচীর।

কিন্তু এই প্রাচীর কতদিন স্থীর থাকে কে জানে?

ক্রীতিকের মতো বেপরোয়া আর একরোখা সভাবের মানুষের জন্য এই প্রাচীর ভে'ঙে ফেলা খুব কঠিন কিছু নয় বৈকি।ক্যালিফোর্নিয়ার এদিকে মাঘের আর পৌষের শীত বলে কিছু নেই, হাতে গোনা দুই তিনটে মাস ছাড়া বাকি সময়টাই শীতকাল এখানে। তারমধ্যে কখনো কখনো শীতকালকে সর্বেসর্বা হটিয়ে বর্ষাকাল নেমে আসে ধরনী জুড়ে। তখন শীত বর্ষা দু'টোর মিশ্রনে রাত দিন সমান হয়ে যায় এদেশে।

আজ তেমনই একটা দিন, গতরাত থেকেই বাইরে বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছে, খানিক বাদে বাদে পশ্চিম আকাশে গুড়গুড়িয়ে মেঘ ডাকছে, আর দফায় দফায় একপশলা বৃষ্টি। সূর্য না ওঠার দরুন ঠান্ডারাও যেন জেঁকে বসেছে একদম।

এই আলো আধারি আবহাওয়ার মাঝেও অরুর মনটা আজ ভীষণ ভালো। কেনইবা ভালো থাকবে না, সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন হয়েছে ওর। আগামী কাল থেকে আবারও নতুন করে পড়াশোনার অধ্যায় শুরু হবে ওর জীবনে।নাহ নিজের জীবনের উপর যতটা অভিযোগ করেছিল ততটাও খারাপ নয় জীবন টা।

সেই খুশিতেই, সকাল সকাল রান্না চড়িয়ে কিচেন কাউটারের উপর বা দুলিয়ে বসে, বিশাল লম্বা বেনিটাকে হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে , গুনগুনিয়ে গাইছে অরু,“এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে নাতো মন

কবে যাবো,কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ ”

ব্যাস এতোটুকুই গেয়েছিল ও তখনই বাইরের কলিং বেলটা বাঁজখাই আওয়াজ তুলে বেজে ওঠে।

অরু লাফ দিয়ে কাউন্টার থেকে নেমে তারাহুরো করে গিয়ে দরজা খুলে দেখে বাইরে কেউ নেই, তবে ফ্রন্ট ইয়ার্ডে যে বেঞ্চিটা রয়েছে তারউপর কিছু একটা রাখা।

দরজার সামনে থেকে ছাতাটা কুড়িয়ে,সেটা নিয়েই অরু বেঞ্চির কাছে এগিয়ে গেলো,গিয়ে দেখলো তাজা টকটকে লাল গোলাপের

একটা বুকে। তার মাঝখানে উইশ কার্ড। ফোঁটাফোঁটা বারিধারা জমে ফুল গুলোকে আরও বেশি সতেজ দেখাচ্ছে।

প্রথমে তাজা গোলাপে মুখ ডুবিয়ে প্রান ভরে শ্বাস নিলো অরু, তারপর উইশ কার্ডটা খুলে পড়তে শুরু করলো, যেখানে গুটিগুটি ইংরেজি অক্ষরে লেখা,**—- Many Many happy returns of the day JK Sir.**

from:"S"

ব্যাস এতোটুকুই।

উইশ কার্ডডা পড়ে ভ্রু কুঁচকে ডুপ্লেক্স বাড়িটার দোতলার কর্নারের রুমটায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অরু, যেখানে এই মূহুর্তে ক্রীতিক ঘুমিয়ে আছে।

প্রায় দুইদিন পর কাল মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছিলো ক্রীতিক। রাতে যখন অরু পানি পান করতে নিচে নেমে আসে, তখনই দেখতে পায় ক্রীতিককে। অন্ধকার রুমে কাউচের উপর বসে মোবাইলের ফ্ল্যাস জ্বালিয়ে নিজের পায়ে নিজেই ব্যান্ডেজ করছে সে।

ব্যান্ডেজ করা হয়ে গেলে গায়ের জামাকাপড় গুলো ওখানেই ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে খোঁ'ড়াতে খোঁ'ড়াতে নিজের রুমে চলে যায় ক্রীতিক।

পরে অবশ্য অরু নিজেই ক্রীতিকের জামা কাপড় গুলো লন্ড্রীতে দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষ'ত কি করে হলো সেটা আর জিজ্ঞেস করার আর সাহস হয়ে ওঠেনি। দেখা গেলো জিজ্ঞেস করতে গেলে উল্টে থা'প্প'ড় মে'রে গাল লাল করে দিলো। যেচে পরে মানসম্মান

খোয়ানোর ইচ্ছে নেই অরুর । তারউপর কথায় কথায় যে অ’পমান সহ্য করে সেই ঢের।

মনে মনে কথাগুলো ভেবে নিয়ে বুকে সমেত ঘরে চলে গেলো অরু।বেলা তখন দশটা কি এগারোটা, বাইরে বৃষ্টি নেই তবে কালো মেঘে ছেয়ে আছে চারিপাশ।

তখনই একেবারে তৈরি হয়ে একটা ব্ল্যাক বেল্টের ঘড়ি হাতে পেঁচাতে পেঁচাতে নিচে নামলো ক্রীতিক। দেখেই মনে হচ্ছে বাইরে যাবে।

তবে যাওয়ার আগে বাঁধ সাধে অরু।

তাজা গোলাপের বুকে টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে একগাল হেঁসে বলে,

— হ্যাপি বার্থডে ভা..ভাইয়া।

ভাইয়া শব্দটা উচ্চারণ করতে অরুর একটু কষ্টই হলো বৈকি।

ক্রীতিক কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারলো না, তার আগেই একেরপর একের গগন কাঁপানো হাঁচি দিতে শুরু করলো ও।

ক্রীতিক একাধারে হাঁচি দিয়েই যাচ্ছে, হাঁচি দিতে দিতে ওর নাকের ডগা লাল বর্ন ধারন করেছে, হুট করেই ক্রীতিকের এমন বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় অরু একটু ভরকে যায়, ব্যাস্ত ভঙ্গিতে বলে,

— ককি হয়েছে আপনার?ঠিক আছেন?

ক্রীতিক হাঁচির মাঝখানে জবাব দেয়,— ইডিয়ট ওটাকে সরা,রোজে আমার এলার্জি আছে।

এগেইন........হাঁচ্চু।

প্রায় মিনিট দশেক পর একটু স্বাভাবিক হয়ে ক্রীতিক যখন আবারও বাইরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়, তখনই দ্বিতীয় বারের মতো পিছু ডেকে ওঠে অরু।

ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে দাঁতেদাঁত চেপে বলে,

–হোয়াট হ্যাপেন্ড অরু,কি চাইছিস তুই?

— না মানে কোথাও যাচ্ছেন?

— ভার্সিটিতে যাচ্ছি, এক্সাম আছে। আর কিছু?

— এমা আপনিতো থার্টি প্লাস এখনো পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি?

—আমার নয় , আমার স্টুডেন্টদের এক্সাম আছে। এন্ড তুইকি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আমাকে বয়সের খোঁটা দিলি??

অরু সচকিত হয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ালো। তবে এটা বুঝতে পারলো না, এতো ধনসম্পদ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কিসের অভাবে ক্রীতিক বিজনেস ছেড়ে দিয়ে চাকরি করে।— শুনে রাখ, যদি দিয়েও থাকিস আমার লস নেই, বরং তোরই লস, দেখবি দিন শেষে তোর কপালেও একটা বুড়ো বর জুটবে।

অরু মুখ কাচুমাচু করে বললো,

–এভাবে কেন অভি’শা’প দিচ্ছেন, কি ক্ষ’তি করেছি আপনার?

ক্রীতিক একটু ব্যাথাতুর হাসি হাসলো, অতঃপর বললো,

—সিরিয়াসলি?? আমার এইজের কাউকে বিয়ে করাটা তোর কাছে অভিশা’পের মতো??

অরু মনে মনে বললো,

—অবশ্যই, আমিতো নিখিল ভাইয়ের মতো ইমিডিয়েট সিনিয়র কাউকে বিয়ে করবো।

অরু চুপ হয়ে গিয়েছে দেখে, ক্রীতিক ঘড়িতে নজর দিয়ে দ্রুত হাটা দিলো।

তখন আবারও দৌড়ে ওর সামনে গিয়ে দাড়ালো অরু।

অরুর বলা একটু আগের কথায় ক্রীতিকের মেজাজ এমনিতেই তু'ঙ্গে, তারউপর এখন বারবার পথ আটকাচ্ছে মেয়েটা, কি চাইছে ও??

রাগের তোপে দাঁত কটমট করতে করতে ক্রীতিক বলে,— কি চাই,যাবি আমার সাথে? পকেটে করে নিয়ে যাবো? উঠবি পকেটে? আয় তাহলে।

অরু এদিক ওদিক মাথা নাড়ায়।

—মাথা গড়ম হয়ে আছে অরু , রাস্তা ছাড় নয়তো তোর ওই নরম গালে ক'ষিয়ে একটা থা'প্প'ড় দেবো আমি। যেটা আমি দিতে চাচ্ছি না।

অরু শুকনো ঢোক গিলে, একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো ক্রীতিকের মুখের দিকে।

ক্রীতিক ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,

— কি এটা?

অরু ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে জবাব দেয়,— পায়েস। আজ আপনার জন্মদিন তাই, জানেন আপা বলে আমার হাতের ডেজার্ট নাকি অমৃত। সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন আপনিতো আমার ভাইয়েরই মতো,তাইনা?

অরুর বলা শেষ কথাটা তী'রের ফলার মতোই মস্তিস্কে গিয়ে আ'ঘা'ত করলো ক্রীতিককে। ও চুপচাপ প্যাকেটটা হাতে নিলো, অতঃপর দু'কদম এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা ময়লার বিনে ফেলে দিয়ে চোয়াল শক্ত করে, অরুর দিকে অা'গুনঝ'রা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,—– শেইম অন ইউর ফা'কিং সিমপ্যাথি।

তারপর হুরমুর করে বেরিয়ে গেলো, গেট ছাড়িয়ে।

অরু এখনো একই যায়গায় সটান দাঁড়িয়ে। না চাইতেও এভাবেই বারবার অপমানিত হতে হয় ক্রীতিকের কাছে। কই অনুর সাথে তো এমন আচরন করেনা, শুধু ওর সাথেই কেন?? ওর উপর কিসের এতো রাগ ক্রীতিকের?ভেবে পায়না অরু। তাছাড়া ওতো কোন সিমপ্যাথি দেখানোর জন্য ডের্জাট টা বানায়নি, বরং অনেকটা ভালোবাসা আর আন্তরিকতা থেকেই তো বানিয়েছিল। যেখানে ওর নিজেরই করুনা অপছন্দ সেখানে ও কিনা কাউকে করুনা করবে?তাও আবার জায়ান ক্রীতিককে? যার করুনায় বেঁচে আছে ওরা।হাস্যকর।

তাহলে ক্রীতিক আদতে কোন করুনার কথা বোঝালো??হট ডিড হি মিন?রাস্তার সাইডে স্থীর দাড়িয়ে থাকা চেনা পরিচিত মার্সিডিজ গাড়িটা দেখেই বেশ অবাক হলো সায়র। মনে মনে ভাবলো,

—মাঝরাস্তায় ক্রীতিক গাড়ি থামিয়ে করছে টা কি?? আশ্চর্য।

তৎক্ষনাৎ নিজের গাড়ির ব্রেক কষে, রাস্তা পার হয়ে, স্ত্রীর গাড়ির জানালার গ্লাসে আঙুল দিয়ে দু-তিনবার টোকা দিলো ও।ভেতর থেকে সায়রকে দেখতে পেয়ে জানালার কাঁচ নামিয়ে ক্রীতিক বলে,

— কি সমস্যা?

— অনেক সমস্যা,

এই বলে গাড়ির ভেতর এসে বসে পরে সায়র।গাড়িতে বসা মাত্রই ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে সায়র যা দেখলো তাতে আপাতত ওর চোখ কপালে।

গাড়িতে ঢুকে সায়র দেখতে পায় ক্রীতিক আড়াম করে বসে অন-টাইম চামচ দিয়ে পায়েশ খাচ্ছে।

সায়র সন্দিহান হয়ে চোখ ছোট ছোট করে বললো,— তুই এই রাস্তার মাঝখানে পায়েস কোথায় পেলি?

ক্রীতিক খেতে খেতে, বাম হাত উঁচিয়ে পেছনের ডাস্টবিনটার দিকে দেখিয়ে দিলো।

ক্রীতিকের কথায় সায়র চোখ মুখ কুঁচকে ফেললো, অবিশ্বাসের সুরে বললো,

— কিহ!! তুই ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলে খাচ্ছিস?

ক্রীতিক উপর নিচ মাথা নাড়ালো।

— ছিহ ক্রীতিক ছিহ,তুই এখনো এতোটাও অসহায় হয়ে যাসনি যে ওখান থেকে খাবার তুলে খেতে হবে তোর। আমরা এখনো আছি কি করতে?বাই দা ওয়ে আমাকে একটু দে, ইটস লুক ইয়াম্মি।

— সরি ব্রো, এটার এক চিমটি ভাগও আমি কাউকে দিতে রাজি নই, ইভেন কোনোদিন না।

পুরোটা আমার।

তারপর বিরবিরিয়ে অস্পষ্ট সুরে বলে,— ও পুরোটাই আমার,ওয়ানলি মাইন।

সায়র বোঝার চেষ্টা করে বললো,

— তুই আবার ডেসার্টের প্রতি এতোটা অবসেসট কবে হলি?

ক্রীতিক মনে মনে বলে,

— ঠিকই বলেছিস সি ইজ মাইন ডেজার্ট। কথাটা বলতে গিয়ে, এক চিলতে মৃদু হাসি খেলে গেলো ওর ডার্ক ব্রাউন ঠোঁট জুড়ে, তারপর আবারও তলিয়ে যায় গভীর ভাবনায় আনমনে বিরবিরিয়ে বলে,তোর আপা ঠিকই বলে হার্টবিট, তোর রান্না করা ডেজার্ট অমৃত।

ক্রীতিকের কথার টোন ধরতে পারছে না সায়র, ও কখনোই এতোটা নরম সুরে, ঠোঁটে হাসি রেখে কথা বলতে দেখেনি ক্রীতিককে।জায়ান ক্রীতিক অলওয়েজ স্ট্রং থাকতে পছন্দ করে, উইক বিহেভিয়ার ওর দ্বারা হয়না, তাহলে হুট করে হলোটা কি? ভাবছে সায়র।

একমাত্র ড্রাংক হলেই এমন আচরণ করে ক্রীতিক ।তাই উদগ্রীব হয়ে সায়র শুধালো,— আর ইউ ওকে ব্রো?

ক্রীতিক কুটিল হেঁসে জবাব দেয়,

—one day you'll meet someone sayor, and it'll literary take your br'eath away...

তখন ভালো, মন্দ ঠিক, বেঠিক উচিত, অনুচিত কোনোটাই মস্তিস্কে আটকায় না, যা এসে হৃদয়ে আটকায় সেটা হলো কাছে পাবার প্রবনতা। এট এনি কষ্ট, তাকে চাইই চাই।

ইউ নো হট, আমি জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী মাত্র ডাস্টবিন থেকে তুলে এনে খাবার খেয়েছি,ইট ওয়াজ ওয়ার্ম। এন্ড আই ফিল সো মাস হ্যাপি।

সায়র ওর কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলো না, কার কথা বলছে ওও??কেনই বা বলছে?? আগেতো কখনো বলেনি, ইভেন প্রেম ভালোবাসা এই সমস্ত কথা শুনলেও রে'গেমেগে আ'গুন হয়ে যেত যে মানুষটা তার হঠাৎ হলোটা কি আজ??

চকিতে প্রশ্ন ছুড়লো সায়র

— ব্রো ওই ডেজার্টে কিছু মেশানো ছিলোনা তো?

ক্রীতিক জবাব দেয়না,শুধু বাঁকা হেসে গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে আনমনে বলে,

—-ছিলোতো আমার হার্টবিটের "ছোঁয়া "।এন্ড ইটস মাই পার্সোনাল ড্রা"গ। সন্ধ্যা হতে না হতেই ঝুম বৃষ্টি নেমেছে আকাশ বাতাস

ছাপিয়ে। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, মোম জ্বালিয়ে রেখেছে অরু। অনু একটু আগেই কল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বৃষ্টিতে হসপিটালে আটকা পরেছে ও চিন্তা না করতে।

অরু মাত্রই কথা শেষ করে উপরে চলে যাচ্ছিলো, তখনই গেট খুলে ভেতর ঢোকে বৃষ্টিতে ভিজে জুবুথুবু হয়ে যাওয়া ক্রীতিক।

মোমের আলোয় থরথর করে কাঁপতে থাকা ক্রীতিক কে দেখে মায়া হলো অরুর, ও এগিয়ে গিয়ে কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতে চাইলো, কিন্তু তখনই সকালের সেই অপমানের কথা মনে পরতে আবারও পিছু হেটে পা বাড়ালো নিজের ঘরের দিকে।

তবে দু'পা সিঁড়ির দিকে এগোতেই পেছন থেকে কাঠকাঠ আওয়াজ ভেসে এলো ক্রীতিকের,—- দেখছিস শীতে কাঁপছি তবুও টাওয়াল এগিয়ে না দিয়ে চলে যাচ্ছিস?? আক্কেল কি পানির সাথে গুলে খেয়েছিস?

অরু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড় বলে,

— নিয়ে আসছি।

উপর থেকে টাওয়াল নিয়ে এসে চেহারায় একটু রাগি রাগি ভাব করেই এগিয়ে যায় ক্রীতিকের কাছে, অরু টাওয়াল দেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই ক্রীতিক খপ করে অরুর হাত সহ টাওয়ালটা ধরে নেয়, তারপর ওর হাত দিয়েই নিজের মতো করে চুল মুছতে থাকে। — আরে আরে কি করছেন? লাগছে তো হাতে।

— ভাত তো আমার থেকে বেশিই খাস, তাহলে লাগে কেন?

—- খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছেন??

— তুই আমার সব সম্পত্তি খেয়ে ফেললেও সেটা দেবোনা।

— কি বললেন??অরুর কথার পিঠে ক্রীতিক কিছু বলতে যাবে, ঠিক তখনই দরজা ঠেলে এলিসা,অর্নব,সায়র, ক্যাথলিন সবাই একসুরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে সারপ্রাইজ....

ওদিকে কারও উপস্থিত টের পেতেই অরুকে একঝটকায় দুরে সরিয়ে দেয় ক্রীতিক।

অরু মেঝেতে ছি'টকে পরে, আর্তনাথ করে বলে ওঠে,

–আহ...আমার কোমড়....ক্রীতিকের ডুপ্লেক্স বাড়িটা অত্যাধুনিক হলেও পরিধিতে খুব একটা বড় নয়,

নিচ তলায় হল আর গ্যারেজ ছাড়া আলাদা কোনো শোবার ঘর নেই।

আর উপর তলায় একটা মাস্টার বেডরুম যেটা ক্রীতিকের নিজের।অন্যটা গেস্টরুম সেখানে আপাতত অরুরা থাকে। এছাড়া একটা রুম রয়েছে সেটা ক্রীতিকের ব্যাক্তিগত জিমনেশিয়াম। তবে এই পুরো বাড়িতে সব থেকে যেটা সুন্দর তা হলো দুইসাইডে দু'টো টানা ছাঁদ বারান্দা, আর তার একটাতে রয়েছে মিনি সাইজের একটা সুইমিং পুল,ওই দুইতিনটা বাথটাবের সমান পানি হবে আর কি। মূলত এটা ব্যাবহারের থেকে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই বেশি তৈরি করা হয়েছে।

সন্ধ্যা রাতে ফ্র্যাগরেন্স মোমের লালচে আলোতে পুলের অগভীর নীল পানিটুকু ঝিলমিল করছে,দেখলে মনে হবে কোন যাদুকরের তন্ত্রমন্ত্রের ফল। তাতেই আপাতত পা ডুবিয়ে বসে আছে এলিসা,অর্নব,সায়র, আর ক্যাথলিন। যদিও বাইরে হুহু ঠান্ডা, তবে সেটাই উপভোগ করছে ওরা।এলিসা, অর্নব,আর সায়র হলো ক্রীতিকের বেস্ট ফ্রেন্ড, পরিবার ওও বলা চলে। ওদের সবার জীবনেই কোন না কোন অপূর্নতা দিয়ে ঘেরা। চারজনই পিছুটানবিহীন ছ'ন্নছাড়া মানুষ ।সোজা পথে না হেটে আঁকাবাঁকা পথের এডভেঞ্চারাস শিহরন পেতেই বেশি পছন্দ করে ওরা। সামনে থেকে সবকিছু সাভাবিক মনে হলেও মূলত চারজনের জীবনই একেকটা গোলকধাঁধা আর সেকারণেই হয়তো ওরা সোলমেইট।দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ওদের। ক্রীতিক এখনো ভেবে পায়না ওর মতো একগুঁয়ে, বদমেজাজি,রগচটা, মাথা গরম ছেলের সাথে ওরা এতোগুলা বছর কিভাবে কাটিয়ে দিলো?তাও উইথ আউট এনি কমপ্লেইন।ছাঁদ বারান্দার রেলিং ঘেসে দাড়িয়ে মেঘলা আকাশের পানে একনাগাড়ে নিকোটিনের ধোঁয়া উড়াচ্ছে ক্রীতিক। সেদিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে ক্যাথলিন। ক্যাথলিন হলো এলিসার কাজিন। বয়সে ওদের থেকে বেশ ছোটই, অনুর বয়সই হবে হয়তো। তবে কেন যেন ক্রীতিকের প্রতি ওর অন্যরকম দূর্বলতা। ওর কোন বাইক রাইড কম্পিটিশন মিস করেনা ক্যাথলিন। এছাড়া বাইক রেচিং ফ্যান ক্লাবের টপ ফ্যান ব্যাজ ওও ওর দখলে। আর সেখানে ক্রীতিক থাকে সবসময় নাম্বার ওয়ান ট্রেন্ডিং এ।মোট কথা রাইডার জেকের খুব বড় ভক্ত ক্যাথলিন।

যদিও ক্রীতিকের এসব বিষয়ে বিন্দু মাত্র ধারনা নেই। ওতো কেবল নিজের ছন্নছাড়া হৃদয়টাকে একটুখানি প্রশান্তি দেওয়ার জন্যই জীবনটাকে অযাচিত বি'পদের মুখে ঠেলে দেয়। কেন যেন এই ব্যাপারটায় এক পৈচাশিক আনন্দ পায় ক্রীতিক।

ক্যাথলিনের ভালো লাগার ব্যাপারটা এলিসা সহ বাকি দুজনও জানে, তবে বয়সের দোহাই দিয়ে কেউই খুব একটা পাত্তা দেয়না।

আজ ক্রীতিকের জন্মদিন বলেই কেঁ'দেকে'টে হাজারও অনুরোধ করে তবেই এলিসার সাথে এসেছে সে। সাথে করে ক্রীতিকের জন্য জন্য গিফট ও এনেছে। তবে সে গিফট এ জীবনে ক্রীতিক খুলে দেখবে কিনা বলা বাহুল্য। বৃষ্টিতে আটকে গিয়ে অনু এখনো ফেরেনি বলে সারা সন্ধ্যা অরুও আর নিজের রুম থেকে বের হয়নি। তবে এখন তো বৃষ্টি কমেছে আপা ফিরলো কিনা তা দেখতে কেবলই রুমের বাইরের করিডোরে পা রেখেছিল অরু। ঠিক তখনই ছাঁদ বারান্দা থেকে হাক ছেড়ে ডেকে উঠলো এলিসা,

— এই যে শোনো আমাদের সবার জন্য হট কফি বানিয়ে নিয়ে এসোতো।

এলিসার কথায় বাদ সাধে সায়র,খানিকটা গলা নামিয়ে বলে,

— – ওই!কাকে কি বলছিস, ও কি সার্ভেন্ট নাকি?ও ক্রীতিকের স্টেপ সিস্টার।

অবাকের চড়ম সীমানায় গিয়ে এলিসা বললো,

— কি বলিস কিন্তু ক্রীতিক যে বললো, ট্রিট হার লাইক আ সার্ভেন্ট?

সায়র কটমটিয়ে ক্রীতিকের দিকে চাইলো, যে এখনো ভাবলেশহীন হয়ে একই ভাবে দাড়িয়ে আছে, তারপর চোখ ঘুরিয়ে এলিসাকে বলে,— আমাকেও একই কথা বলেছে বাঁদর টা। বোন কে বোন বলে পরিচয় দেয় না,কতটা খারাপ ভাবতে পারছিস?

ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে, তখনই অরুকে নিষেধ করার জন্য করিডোরে উঁকি দিলো এলিসা, কিন্তু দেখলো অরু সেখানে নেই।

নিজের কথায় এই মূহুর্তে নিজেই লজ্জিত ও,তাই ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে কটমটিয়ে বললো,

— দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি ওকে।

ওদের কথা শুনতে না পেয়ে অর্নব গোয়েন্দাদের মতো সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন ছুড়লো,

— এ্যাই, কি বলছিস তোরা ফিসফিসিয়ে? আমার নামে কিছু নয়তো? আমাকে নিয়ে কিছু বললে কিছু একদম পার পাবিনা বলে দিলাম,সব বের করে ফেলবো।

সায়র বিরক্ত হয়ে চোখ উল্টে বললো,

—ভুলে যাসনা অর্নব তুই একজন হ্যা’কার,কোন ম্যাজিশিয়ান নস, যে মনের কথা বের করে ফেলবি।

ওদের কথার বহরে ক্রীতিকও এবার ঘুরে দাড়ালো। তৎক্ষনাৎ কথা ছু'ড়লো এলিসা,

—জেকে অরু তোর বোন হয় আগে বলিস নি তো?

ক্রীতিকের সোজাসাপটা জবাব,— বোন হয়না তাই বলিনি, তাছাড়া ও কেন আমার বোন হতে যাবে? আমার বোন হওয়ার কি যোগ্যতা আছে ওর?

এলিসা পাল্টা প্রশ্ন করবে তার আগেই ট্রেতে করে সবার জন্য গরম গরম কফি নিয়ে হাজির হয় অরু। অরুর অবশ্য কফি চাওয়াতে তেমন একটা ইগোতে লাগেনি, কফিই তো চেয়েছে, তাছাড়া বাড়ি বয়ে আসা সবাই তো মেহমান এতোটুকু নিঃসংকোচে করাই যায়।

কিন্তু অরুকে একজনার মোটেই ভালো লাগেনি, আর সেটা হলো ক্যাথলিন। মানে ও এই ব্যাপারটা নিতেই পারছে না,যেখানে ও হাজার চেষ্টা করে তবেই ক্রীতিককে একটু চোখের দেখা দেখতে পায় সেখানে এই ব্রাউন স্কিন, লম্বা চুল ওয়ালা মেয়েটা কিনা ক্রীতিকের বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা থাকে। দিনরাত ক্রীতিকের মুখো মুখি হয়, ওর সাথে কথা বলে, হাসাহাসি করে। ব্যাপার ভাবতেই ক্যাথলিনের কেমন গা জ্বলে উঠলো। কোন এক অজানা কারনে হুট করেই মেয়েটার প্রতি রা'গ উগরে আসছে ওর। অরুর ঠোঁটের কোনে লেগে থাকা হালকা আন্তরিকতা মাখা হাসিটা দেখে একান্তে ফোঁসফাঁস করছিল ক্যাথলিন। তখনই ওর দিকে কফির কাপটা এগিয়ে দেয় অরু। কিন্তু ক্যাথলিন তো এটা নিবে না, সবার সামনে ফিরিয়েও দিতে পারবে না, তাই ইচ্ছে করেই গরম কফিটা উল্টে

ফেলে দেয় ও। তবে অসাবধানতায় পুরো কফিটাই অরুর হাতে ছিটকে পরলো।

কফিটা ছিল ধোঁয়া ওঠা আ’গুন গরম। তবুও অরু চেঁচালো না, কেবল আহ.. শব্দের মৃদু আতর্নাদ বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

তৎক্ষনাৎ ওর কাছে ছুটে এলো সায়র, অন্যরাও ব্যাস্ত হয়ে পরেছে ও ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য শুধু ক্রীতিক ছাড়া, ও এখনো নিজের যায়গাতেই স্থীর দাড়িয়ে সবটা দেখছে। নিজের অজান্তেই কখন যে হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলেছে হদিস নেই তার। সায়র তারাহুরো করে অরুর হাতটাকে টেনে উল্টে পাল্টে দেখে নিলো,হাতের অনেকটা যায়গা ধরে লালচে বর্ন ধারন করেছে। অরু চোখ মুখ এখনো খিঁচে বন্ধ করে বসে আছে, মুখে কোনো রা নেই,কেবল চোখ দিয়েই টুপটুপ করে ঝরে পরছে ব্যা’থাতুর নোনাজল। — আর ইউ ওকে বেবি?

উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো সায়র।

অরু জবাব দিলোনা, বসে রইলো একই ভাবে।

ওর হাতে জ্বা’লা করছে ভেবে পুলের শীতল পানিতে হাতটা ডুবিয়ে দিলো সায়র। কয়েক মূহুর্ত পরেই পিটপিট করে চোখ খুললো অরু, ঠান্ডা পেয়ে সত্যিই বেশ আড়াম লাগছে এখন।

ওদিকে এলিসা ক্যাথলিনের দিকে চেয়ে চোখ পাঁকাতেই। ক্যাথলিন এসে ক্ষমা চাইলো অরুর নিকট।

—আ’ম সরি অরু, আই ডিডন্ট মিন ইট।

অরুর যে রাগ নেই তেমন না,ও দেখেছে ক্যাথলিন ইচ্ছা করে কফিটা ফেলছে, মেয়েটার কর্মকান্ডে রাগও লাগছে খুব, তবুও সবার সামনে মনুষ্যত্ব আর চক্ষু লজ্জার খাতিরে বললো,— ইটস ওকে।

— অনেক তো হয়েছে , অরু ভেতরে যা,আমি মলম নিয়ে আসছি তোর জন্য।

অরুর চোখের দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব সাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বললো,ক্রীতিক।

এই আ’গুন ঝ’ড়া লে’লিহান দাবানলের মতো চোখে কোন মায়া কিংবা কাতরতা ছিলোনা অরু নিশ্চিত, তাহলে কি ছিল? হিং’স্র’তা? কিন্তু কেন?

এতো ভাবার সময় নেই, যেতে বলেছে চলে যাওয়াটাই উত্তম। শুধু শুধু তাদের কোয়ালিটি টাইমে কাবাব মে হাড্ডি হয়ে গেলো ও। ব্যাপারটা ভেবে লজ্জায় মাথা নিচু করে ছাঁদ বারান্দা ত্যাগ করে অরু।অরু রুমে পা রেখেছে কি রাখেনি তার আগেই ওর রুমে ঢুকে ধাপ করে দরজা বন্ধ করে দেয় ক্রীতিক।এর আগে কখনোই এমনটা করেনি ও,তাই এমন হটাৎ আগমনে অরু একটু ভয়ই পেলো। দু’কদম পিছিয়ে পিঠ ঠেকালো শক্ত দেওয়ালে। ফুল স্লিভ টিশার্টের দু’হাতা উপরে তুলতে তুলতে ধীর পায়ে ওর দিকেই এগিয়ে এলো ক্রীতিক।

অন্ধকারের মধ্যে সামান্য ফ্ল্যাশের আলোয় ক্রীতিকের ভ’য়ংকর অ’গ্নিমূর্তি দেখে ভ’য়ার্ত ঢোক গিললো অরু, গলায় কথা আটকে আসছে, তবুও আমতা আমতা করে রিনরিনিয়ে বললো,

— ক..ককি করছেন? ভ..ভ’য় লাগছে আমার।

— হাউ ডেয়ার ইউ??

একটা কোল্ড আর ডমিনেটিং কন্ঠস্বর কানে এলো অরুর। অজানা অধিকার বোধ উপচে পড়ছে প্রত্যেকটা শব্দে।

— ককি করেছি? ভ’য়ে ভ’য়ে শুধায় অরু।

ক্রীতিক এগিয়ে এসে, অরুর ছ্যা’কা লাগা লালচে হাতটা শ’ক্ত করে চেঁ’পে ধরলো।

এবার ভীষ’ণ ব্যা’থা পেলো অরু, ব্যা’থায় অনেকটা জোড়েই চেঁচিয়ে উঠলো,— আহহ... লাগছে আমার।

ক্রীতিক থামলো না, ওই হাতটা ধরেই টা’নতে টান’তে ওয়াশরুমে নিয়ে ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে শাওয়ার জেল লাগিয়ে ইচ্ছে মতো ঘ’সতে থাকলো অরুর দ’গদগে পো’ড়া হাতটাকে।

বিস্ময়,আ’তংক আর ব্যা’থায় জর্জরিত অরুর আপনা আপনি হাত চলে গেলো মুখের উপর।

ঠোঁট কা’মড়ে কা’ন্না আটকে বললো,

— কি করছেন আপনি??কোন সাভাবিক মানুষ কি এতোটা ব্যা’থা দিতে পারে??

খুব মনোযোগ দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করার মতোই অরুর হাতটাকে ঘসতে ঘসতে ক্রীতিক জবাব দেয়,

— আমি সাভাবিক তোকে কে বললো?

একেতো পু'ড়ে চাম'ড়া নরম হয়ে আছে, তারউপর এতোক্ষণ যাবত একনাগাড়ে ঘষামাজার ফলে হয়তো সেটাও উঠে গিয়ে রক্তা'ক্ত হয়ে গিয়েছে, তাইতো অরুর কা'ন্নায় এবার জোয়ার এলো।

কাঁদ'তে কাঁদ'তে নিচে বসে পরলো ও।—- পারছি না ছাড়ুন দয়া করে, ব্যাথায় কলিজা ছি'ড়ে যাচ্ছে।

এবার ক্রীতিক ওর হাত ছে'ড়ে দিলো, অতঃপর ফ্যানায় ভর্তি হাতটা দুগালে চে'পে ধরে বললো,

—-নেক্সট টাইম এমন করলে শুধু হাত নয়,বাথটাবে ছু'ড়ে ফেলে পুরো শ'রীর ধুয়ে তবেই ছা'ড়বো, আই রিপিট পুরো শ'রীর।

কান্নারত অরু বলে,

— আমি করেছিটা কি??

ক্রীতিক একটা বিরক্তি মাখা হাসি ছুড়লো অরুর পানে, তারপর দাঁতেদাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বললো,

— ইন ফিউচার, ডোন্ট ডেয়ার টু টাচ এনি ওয়ান এলস।আজ সারা রাতেও হয়তো বিদ্যুৎ আসবে না, না এখনো অনু ফিরেছে, একেতো অনুর জন্য চিন্তায় মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, তারউপর সন্ধ্যা রাতের ঘটে যাওয়া অমিমাংশিত ঘটনা গুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বারংবার।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে নিজের ব্যা'ন্ডেজ প্যাচাঁনো হাতটার দিকে উদাসীন হয়ে তাকিয়ে আছে অরু। তখন ক্রীতিক ব্যা'থা তো দিয়েছিল ঠিকই আবার নিজ হাতে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজও করে রেখে গিয়েছে। এই লোককে ঠিক কি বলবে ভেবে পায়না ও পাগ'ল নাকি ভিনগ্রহ বাসিন্দা?

অরুর আনমনা ভাবনার ছেদ ঘটে দরজায় কড়ানাড়ার আওয়াজ পেয়ে। এভাবে অপরিচিতদের মতো নক করায় অবাক হয় অরু নিশ্চয়ই আপা নয়। তাই একটু ঠিক ঠাক হয়ে বসে বললো,

— আসুন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে এলিসা। এলিসা মেয়ে, তবে চলন বলন কোনোটাই মেয়েদের মতো নয়, ওর পড়নে সেটে আছে কালো স্কিনি প্যান্ট আর ক্রপ টপ তার উপর শীতের ওভারকোর্ট। বব কাঁটা চুল গুলো গাড়ো বাদামি রঙে রাঙানো, সুন্দর ঠোঁট গুলোতে ম্যাট ন্যুড শেডের লিপস্টিকের আস্তরন। এক ঝলক দেখলে মনে হবে মাত্রই টিভি থেকে বেড়িয়ে এসেছে সে। এলিসার কৃত্রিম সৌন্দর্যের কাছে, অরুর অপার্থিব সৌন্দর্যকে নিছকই সাদামাটা আর ফিকে লাগছে। অরুর নিজেরও কেমন যেন সংকোচ বোধ হচ্ছিল।

কিন্তু এলিসার সম্মোহনী হাসি,আর স্নেহ জড়ানো কন্ঠস্বরে কয়েকমূহুর্তের মধ্যেই তা উবে গেলো। পাছে তৈরি হলো ভিন্নধারনা, এলিসা মেয়েটা মোটেই খারাপ না।

এলিসা রুমে ঢুকেই প্রথমে অরুর হাতটা সাবধানে উল্টে পাল্টে দেখলো তারপর বললো,— ব্যান্ডেজ করার মতো তো অতোটাও লাগেনি, তাহলে ব্যান্ডেজ কে করলো??

অরুর কথা ঘুরিয়ে বললো,

—আমিই করেছি, যাতে তারাতাড়ি কমে যায় ব্যাথা।

এলিসা শব্দ করে হেসে বললো,

—তোমার অনেক বুদ্ধি বুঝেছি।

এলিসার কথায় অরু হেসে দেয়। তারপর বলে

— আমি জানি, আপনি মজা করছেন।

— এ্যাই মেয়ে,আপনি করে কাকে বলছো? আমি ক্রীতিকের বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারি,কিন্তু আমি এখনো সুইট সিক্সটিন, আমাকে তুমি করে বলবে বুঝলে?

— ঠিকাছে আপু, বলবো। কিন্তু বেস্ট ফ্রেন্ড বানানোর জন্য আর মানুষ পেলেনা? ওই হনুমানটাকে, না মানে ক্রীতিক ভাইয়াকে?

এলিসা ঠোঁটের কোনে হাসি নিয়ে জবাব দেয়,— মানুষ হিসেবে ক্রীতিক কেমন আমার জানা নেই অরু, তবে ফ্রেন্ড হিসেবে ওদের তিনজনারই জুড়ি মেলা ভার। আমি খুব লাকি জানো ?ওদের মতো বন্ধু পেয়েছি। আমাদের চারজনার কারোরই টাকা পয়সা কিংবা অর্থবিত্তের অভাব নেই, আমাদের যেই জিনিসের সবথেকে অভাব তা হলো একটা পরিবারের। ,সার্থহীন উষ্ণ ভালোবাসার মানুষের অভাব। আমরা চারজনই ভালোবাসার কাঙাল, পরিবারের

কাঙাল। তাই হয়তো উপরওয়ালা আমাদেরকে বন্ধুত্বের মতো সুন্দর একটা সম্পর্কে বেধে দিয়েছেন।

এলিসার কথার পাছে অরু নিঃশব্দে ভারী নিঃশ্বাস নেয়।

একটু থেমে এলিসা আবারও বললো,

—অর্নব আর সায়রের তাও বাবা মা নেই। কিন্তু আমার ক্রীতিকের তো থেকেও নেই।

অরু মেকি হেসে জানার ভান ধরে বললো,

— না আপু ভুল ভাবছেন, ক্রীতিক ভাইয়ারও বাবা মা কেউ নেই।

এলিসা অবাক চোখে অরুর পানে চাইলো, মনে মনে ভাবলো,— তারমানে এই মেয়ে কিছুই জানে না।

—কি হলো আপু কিছু ভুল বললাম?

— ক্রীতিকের মা বেঁচে আছে অরু, সি ইজ কম্পলিটলি অ্যালাইভ, এন্ড লিভিং উইথ অ্যানাদার ম্যান।

এলিসার কথায় অরু যেন আকাশ থেকে পরলো, তাহলে কি এতোদিন ধরে ও ভুল জানতো, ক্রীতিকের মা মা'রা যায়নি?

এলিসা আরও খানিকটা জটলা খুলবে,তাঁর আগেই ক্যাথলিনের বিকট চি'ৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে যায় এলিসা। পেছন পেছন এগিয়ে যায় অরুও।

হলরুমের মধ্যিখানে বসে থরথর করে কাঁ'পছে ক্যাথলিন। ওকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখে অর্নব আর সায়র, ক্রীতিক সেদিকে তাকিয়েই কাউচে বসে বসে আপেল খাচ্ছে।

এলিসা দোতলার করিডোর দিয়ে একনজর পরখ করে দৌড়ে নিচে নামলো। অরু সেখানেই দাড়িয়ে সবটা বোঝার চেষ্টা করলো।—কি হলো হটাৎ ক্যাথলিনের?

নিচে গিয়ে এলিসা জিজ্ঞেস করতেই অর্নব জানায়, ক্যাথলিন হাতে ইলেক'ট্রি'ক শ:ক খেয়েছে। হাতের অবস্থা বেগতিক। সেই সাথে পুরো শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে।

এলিসা বললো,

—-কি করে হলো এসব ক্যাথ?ঘরে তো বিদ্যুৎই নেই।

ক্যাথলিন কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, আমি জানিনা, জেকে ভাইয়া বলেছিল স্প্রেসো পান করবে, সেটা বানাতেই কফি মেকারের কাছে এসেছিলাম। তখনই.... কথাটুকু শেষ করে আবারও হুহু করে কা'ন্নায় ভেঙে পরে ক্যাথলিন।

—জেকে তুই আবার কবে থেকে স্প্রেসো খাস? আগেতো দেখিনি।

নিঃসংকোচে আপেলে কাম'ড় বসাতে বসাতে ক্রীতিক বলে,

— আরে ইয়ার ঠান্ডার মধ্যে একটু তেঁতো কফি খেতে ইচ্ছে করছিল, তাছাড়া আমিতো আর ক্যাথলিনকে বলিনি, ও নিজেই বললো। আমি ভাবলাম কফি মেকারটা তো এনালগ, ব্যাটারীতে চলে রি:স্কে'র তো কিছুই নেই।

এলিসা আড়ালে নিঃশ্বাস ছেড়ে কিচেন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো,—কোন কফি মেকার আমি দেখিতো?

সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত টেনে ধরে অর্নব,সচকিত হয়ে বলে,

— একদম না,তোর কিছু হয়ে গেলে আমি শেষ।

— আশ্চর্য শেষ মানে? তাছাড়া আমার হবেটা কি?

—- তোকে নিয়ে আমি কোন রি’স্ক নেবোনা ব্যাস।

এলিসা নিজের দিকে হাত টেনে বলে,

— অর্নব হাত ছাড়।

—না ছাড়বো না।

অর্নব এই মূহুর্তে খুবই সিরিয়াস, অন্যসময় হলে হয়তো এলিসার কথাই শুনতো।

সায়র এদের সিনম্যাটিক কাহিনি দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো,

— গাইস প্লিজ, গভীর রাত হয়ে যাচ্ছে, ক্যাথলিন বেচারীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল, ওকে চেকআপ করাতে হবে।ওরা সবাই চলে গিয়েছে কয়েকমূহর্ত্ব মাত্র। অরু এখনো করিডোরেই দাড়িয়ে আছে। ক্রীতিক ওকে লক্ষ না করেই বাইরে গিয়ে মেইন সুইচবোর্ডটা অন করে দিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে মাঝারি সাইজের অত্যাধুনিক হল রুমের চারিপাশ।

অরু, ভ্রু কুঞ্চিত করে মনে মনে আওড়ালো,

— তার মানে বি’দ্যুৎ অনেক আগেই এসেছে, উনিই সুইস বোর্ড অফ করে রেখেছিলেন, কিন্তু কেন???ভোর হতে না হতেই গোল্ডেন গেইট ব্রীজ দিয়ে ছুটছে গাড়ির বহর। কেবল গাড়িই নয় ফরেইনার টুরিস্ট থেকে শুরু করে স্থানীয় পথচারী, সবাই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পা চালাচ্ছে আপন গতিতে। সানফ্রান্সিসকোর ছোট্ট

শহরতলী ছাড়িয়ে মূল শহরে পা রাখলেই কেবল মনে হয় যান্ত্রিক গাড়ি ছাড়া মানুষ পায়ে হেটেও পথ চলে। এছাড়া যায়গাটা টুরিজম এরিয়া হওয়ায় সর্বক্ষনই লোকে লোকারন্য হয়ে থাকে।

ছাঁদ খোলা মার্সিডিজে বসে দিকভ্রান্তের মতোই এদিক ওদিক তাকিয়ে, মানুষ দেখছে অরু। যেন হাজার বছর পরে এই প্রানীকূলের দেখা পেলো সে। আর এমনটা হবে নাই'বা কেন?গত একমাস ধরে ওই নির্জন, শুনশান বাড়িতে থেকে থেকে বিরক্তি ধরে গিয়েছে ওর। ঘরকুনো হওয়ার দরুন টিকতে পেরেছে বৈকি অন্য কেউ হলে আলবাত পাগল বনে যেত।

তবে অরুও এই মূহুর্তে পা'গলের মতোই উদ্ভট চাহনি ফেলে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। যেন পৃথিবীর মাটিতে আজই ওর প্রথম দিন।অরুর কাহিনি দেখে ক্রীতিক হুট করে গাড়ির বাটনে প্রেস করে ছাঁদটা তুলে দিলো।

ক্রীতিকের এমন কান্ডে অরু মুখ কালো করে ওর পানে চাইলো।

সুন্দর ফর্সা চেহারার সাথে এটে থাকা তীক্ষ্ণ চোয়ালটা শ'ক্ত হয়ে আছে বরাবরের মতোই, চোখের সৌন্দর্যে সামিল হয়ে আছে কালোরঙা চৌকো রোদচশমাটা। রাস্তার দিকে একধ্যানে তাকিয়ে থাকা থেকে শুরু করে একহাত দিয়ে ড্রাইভ করা প্রত্যেকটা কাজেই উপচে পরছে নজর কারা আভিজাত্য আর পুরুষত্ব। এই পুরুষের প্রতি যে কেউ এক দেখায় ফিদা হতে বাধ্য, তবে তার আচার আচরণ এমন অ'মানবিক কেন? ভাবছে অরু। কারন এই বাহ্যিক

সৌন্দর্য্যের সাথে ভেতরের মানুষটার যে কোনোরূপ মিলই খুজে পায়না ও।— আমাকে দেখা বন্ধ কর, আমি ডিসট্রাক্ট হচ্ছি।

তৎক্ষনাৎ চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে চাইলো অরু। সফেদ রঙা ব্যা'ন্ডেজ হাতে নিয়েই আজ প্রথম দিন ভার্সিটিতে যাচ্ছে ও। আর এই ব্যান্ডেজ করা ক্ষ'তটা অন্য কারও নয় বরং ওর পাশের মানুষটার দ্বারাই তৈরি।

যদিও ক্রীতিক সবসময় গোমড়া মুখেই থাকে তবুও রাতের সেই ভ'য়ানক, কোল্ডহার্ট আর অ'গ্নিদৃষ্টিরত ক্রীতিকের সাথে এখন কার ক্রীতিকের দিন রাত তফাৎ।

আজ প্রথম দিন তাই ক্রীতিকের সাথেই যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে অরু,কারণ ক্রীতিক ওই একই ভার্সিটির প্রফেসর। তবে ক্রীতিক এটাও সাফসাফ জানিয়ে দিয়েছে আজই ফার্স্ট আর আজই লাস্ট এরপর আর ও কখনো অরুকে নিয়ে যেতে পারবে না। তার বদলে অরুর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে একটা ছোট্ট সাইজের প্যাডেল বাইক বা সাইকেল।

সফেদ ব্যা'ন্ডেজটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতেই অরু যখন নানান অযাচিত চিন্তায় বিভোর , ঠিক তখনই আপন সুরে বেজে উঠলো ওর মুঠো ফোনটা। কোন এক কারণে অনেকটা তরিঘরি করেই ফোনটা কানে তুললো অরু,ওপাশের ব্যাক্তিকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই অরু বললো,— হ্যালো নিলীমা, অবশেষে ফোন করলি তুই, জানিস কাল সারারাত তোকে ফোনে কতবার ট্রাই করেছি, একবারও কল তুলিস নি তুই।

অরু যতটা উচ্ছ্বাস নিয়ে কথাগুলো বললো, নিলীমার কন্ঠস্বর ছিলো ততটাই নির্জীব আর ক্লান্ত ও বললো,

— আমি বুঝতে পারিনিনি এটা তুই, তাছাড়া কাল সারারাত হসপিটালে ছিলাম ফোন হাতের কাছে ছিলোনা।

অরু জিজ্ঞেস করে,

— কেন কি হয়েছে? তুই ঠিক আছিস??

— হ্যা’রে আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তিথি।

তিথি নামটা শোনা মাত্রই অরুর মনে পরে যায় সেদিনের তিথির করা অজস্র অ’পমানের কথা, পাছে এসে ভর করে তিথির প্রতি একরাশ ঘৃ’ণা আর বির’ক্তি। তবুও কথা আগাতে জিভ দিয়ে সামান্য ঠোঁট ভিজিয়ে অরু শুধায়,— কি হয়েছে?

নিলীমা কাঁ’দো কাঁ’দো গলায় বলে,

—জানিনা অরু, হুট করে আমাদের তিথির মতো চঞ্চল হাসি খুশি মেয়েটার সাথেই এরকমটা কেন হলো।

— কি হয়েছে সেটাতো বল?

— মাত্র একদিনে ওর সাথে অনেক কিছু হয়েছে অরু, কিছু তুচ্ছ কারনে ভার্সিটি তিথির ছাত্রত্ব বাতিল করে দিয়েছে, আর ঠিক সেদিনই হুট করে ওর বাবার এতোবড় পজিশনের জবটাও চলে গিয়েছে, একদিনের ব্যাবধানে ওর ক্যারিয়ার ওর বাবার ক্যারিয়ার সব শেষ হয়ে গিয়েছে, তাহলে ওর মনের অবস্থাটা একটাবার ভাব। আর সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হলো তিথির বাবা জেকে

গ্রুপের মার্কেটিং ডিমার্টমেন্টের কর্মকর্তা ছিলেন, বহু বছরের ক্যারিয়ার হুট করেই শেষ। বলতে বলতে অনেকটা কা'ন্নাই করে দেয় নিলীমা।— তাহলে হসপিটালে কেন ছিলি?

—- এতো গুলো শকট একসাথে নিতে পারেন নি তিথির আম্মু,এসব ঘটনায় কাল রাতে হুট করেই উনি স্টো'ক করে বসেন ,তাই সেখানেই ছিলাম সারারাত ।

কথাগুলো শুনে অরুরও খারাপ লেগেছে, কিন্তু ওর তো এখানে কিছুই করার নেই, তাই অরু চাঁপা নিঃশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করল ,

— আন্টি এখন কেমন আছেন?

— হুম, আগের চেয়ে বেটার। এখন বল তোর খবর কি অরু?

নিলীমাকে তৎক্ষনাৎ থামিয়ে দিয়ে অরু বলে,— আমার কথা পরে বলবো ক্ষন,তার আগে তুই আমাকে বল নিখিল ভাই কোন ভার্সিটিতে এডমিশন হয়েছে নিলীমা?

অরুর মুখ থেকে কথাটা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে আকস্মিক ব্রেক কষলো ক্রীতিক।

হঠাৎ করে এমন হওয়াতে কম্পিত হয়ে উঠলো অরুর বক্ষপিঞ্জর। সামনের দিকে হুমরি খেয়ে পরতে পরতেও যেন বেঁচে গেলো ও। আ'তংকে চোখ দুটো বড়বড় করে ঘুরে তাকালো ক্রীতিকের পানে। তখনও মোবাইল ফোনটা অরুর কানেই ছিল।

তবে খুব বেশিক্ষণ সেটা আর কানে স্থীর রইলো না, অরু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফোনটাকে অরুর কান থেকে ছি'নিয়ে নিয়ে

সেটাকে সজোরে মাঝরাস্তায় ছু’ড়ে মা’রে ক্রীতিক। কয়েক মূহুর্তের মধ্যে সুন্দর চকচকে হ্যালো কিটি কাভার দিয়ে মোড়ানো ফোনটা পরিনত হয় ধ্বংসাবশেষ এ।

নিজের শখের ফোনের এমন করুন দশা দেখে আঁত’কে উঠলো অরু, হিং’স্র বা’ঘিনীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করলো ক্রীতিকের পানে। তবে মুখ দিয়ে কিছু বলার অবকাশ দিলোনা ক্রীতিক,

বরং তার আগেই গাড়ির দরজা খুলে গ’র্জে উঠে বললো—গেট আউট।

অরু চমকে উঠে বললো,

— কি বলছেন, এই মাঝ রাস্তায় কোথায় নামবো আমি??

— গেট আউট,

ক্রীতিক একই বাক্য পুনরায় উষ্চারণ করে,একপ্রকার হাত ধরে ঠেলেই মাঝরাস্তায় নামিয়ে দিলো অরুকে। তারপর ওয়ালেট থেকে একটা একশো ডলারের নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললো,

—সামনেই বাস স্টপেজ, নেক্সট বাস সোজা ভার্সিটির সামনে গিয়ে থামবে।গো এহেইড।

অরু বেচারি না পারতে টাকা’টা হাতে নিলো।

ক্রীতিক তৎক্ষনাৎ ঠা’স করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়।

যাওয়ার আগে নিজের শরীরের কালো রঙের কোর্টটা খুলে জানালা দিয়ে ছু’ড়ে মা’রে অরুর মুখের উপর।

কোর্টটাকে উল্টে পাল্টে দেখে ক্রীতিকের গাড়ির দিকে প্রশ্ন সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো অরু।

ক্রীতিক যেতে যেতে লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে বলে,—হাতে নিয়ে সং এর মতো দাড়িয়ে থাকার জন্য দেয়নি, গায়ে পরতে দিয়েছি।

ব্যাস এইটুকুই তারপর শাঁই শাঁই করে হাজারো অচেনা গাড়ির ভিরে হারিয়ে গেলো একমাত্র চেনা মার্সিডিজটা।

অজ্ঞাত অরু ভাবলেশহীন চোখে সেদিকেই তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ , মাথায় তখন একটাই প্রশ্ন খেলে গেলো ওর, ক্রীতিক কি আদৌও মানুষের কাতারে পরে?মনের মাঝে একরাশ হতাশা আর ক’ষ্ট নিয়ে কোন মতে ভার্সিটিতে এসেছে অরু। শীত নিবারক হিসেবে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে ক্রীতিকের ব্র্যান্ডেট ব্ল্যাক কোর্ট।

গেইট দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে ঢুকতে অরু ভাবছে,

এভাবে ভে’ঙে পরলে চলবে না,যত যাই হোক পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতেই হবে তাকে। তবে সে ভাবনারা বেশিদূর এগোতে পারলোনা। নিজেকে নিজেই মোটিভেশন দিতে দিতে কখন যে হাজারও অচেনা অপরিচিত মুখের ভীরে কাঙ্খিত, পরিচিত,শ্যাম পুরুষের মুখ খানা চোখের সামনে চলে এলো, সে কথা ঠাওর করতে পারলো না অরু। ঠিক আগের মতোই ক্যাম্পাসের প্রসস্থ সিঁড়িতে আসন পেতে কানে হেড ফোন লাগিয়ে বই পড়ছে সে।হঠাৎ করেই কি জানি কি হয়ে গেলো, ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ তুলে জোয়ার আসার মতোই বানভাসি হলো মনের নদী,মুখ থেকে

অজান্তেই বেরিয়ে এলো খুব পরিচিত সেই চেনা নাম,— নিখিল ভাই?

চারিদিকে কে আছে কে নেই কিছুই আর চোখে পরলো না অরুর,বরং নিস্পলক হয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলো সেই চেনা মুখের মানুষটির দিকে। তবে পুরো পুরি কাছে যাওয়া হলোনা,তার আগেই নিখিলের কাছে পৌঁছে গেলো ভিনদেশী দুজন সুন্দরী আগন্তুক রমনী। কয়েকমূহুর্তের মধ্যেই তাদের সাথে হাসি ঠাট্টায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন নিখিল। তাই অরুর আর সেদিকে পা বাড়ানোর সাহস হলোনা, বরং দূর থেকেই নিখিলের হাস্যোজ্জল মুখের পানে চেয়ে শুধালো,

— আপনি ভালো আছেন নিখিল ভাই?

অরুর থেকে কয়েক মিটার দূরত্বে দাড়িয়ে এই পুরো ব্যাপারটা দু’হাত মু’ঠিবদ্ধ করে স্ক্যান করে নিলো আরেকজন। তবে সেটা অন্য কেউ নয়,অরুতে ভীষন ভাবে আসক্ত এক ছ’ন্নছাড়া পুরুষ মি.জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী।

অরু বাসে আসলেও অরুর পরেই ভার্সিটিতে প্রবেশ করেছে ক্রীতিক,কারণ ও গাড়ি নিয়ে বাসের পেছন পেছনই এসেছে। তারপর ক্যাম্পাসে ঢুকতেই এই কাহিনি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই মূহুর্তে ক্রীতিকের চোখে মুখে কোন গম্ভীরতার লেসমাত্র নেই। বরং ঠোঁটের কোনে আটকে আছে একটা রহস্য জনক কপট বাঁকা হাসি। কপট হাসিটা ধরে রেখেই ক্রীতিক অস্ফুটে বলে,

— আমার বোকা পাখি। সত্যিটা জানলে কতোই না ক’ষ্ট হবে তোর জান। বাট আ’ম ওকে উইথ দ্যাট। কজ তুই শুধু আমার। অরু আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে? প্রথম দিন ভার্সিটিতে আসার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই আছে পেছনে। প্রথমে ক্রীতিকের মতো ব’দমেজাজি লোকের সাথে বের হতে হলো, অতঃপর রাস্তায় বিশাল অ’ঘটন, একটু আগে নিখিল ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েও হলোনা, আর এখন ক্লাস থেকেই বের করে দিলো ক্রীতিক ওকে।

এখন অবশ্য দোষটা ক্রীতিকের নয় অরুরই বেশি ছিলো। ক্লাসের মধ্যে বাইরে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে নিখিল ভাইকে খুজতে গিয়েই বেজেছে বিপত্তি। ভরা ক্লাসে সবার সামনে ক্রীতিক এক রাম ধ’মক দিয়ে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে অরুকে। কিন্তু অরু এটা ভেবে পায়না, বাংলা ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে ইকোনমিকস কে নেয়??

কেনইবা ক্রীতিক বেছে বেছে এই বিদঘু’টে সাবজেক্টেই ভর্তি করালো ওকে? এটা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ফরেইনার স্টুডেন্টদের অভাব নেই এখানে,সেই সাথে সাবজেক্টেরও। তাহলে ইকোনমিকসই কেন???

এখন তো তিনদিন অন্তর অন্তর মাইক্রোকোনমিক্স ক্লাসে ক্রীতিকের মুখোমুখি হতে হবে, সাথে হাজারটা ফ্রী অ’পমান তো আছেই। ক্লাসের বিপরীত করিডোরের মাঝখানে, উঁচু থেকে শুরু করে সবুজ ঘাস অবধি বিছানো সিঁড়িতে বসে বসে অরুর মনের

সাথে মস্তিস্ক যখন বিশাল দ্বন্দে লিপ্ত ঠিক তখনই ল্যাপটপ ব্যাগ হাতে আগমন ঘটে নিখিলের।

— অরোরা না?

পরিচিত কন্ঠস্বর শুনে হকচকিয়ে পেছনে চাইলো অরু। দেখলো গালের মাঝে টোল পরা হাসি মুখ নিয়ে দাড়িয়ে আছে নিখিল ভাই। এতোদূর এসে, বিদেশের মাটিতে নিখিল ভাইকে দেখতে পেয়ে অরুর ভীষণ আনন্দ হলো। ও বসা থেকে উঠে দাড়িয়ে দু'কদম এগিয়ে গেলো নিখিলের কাছে, তবে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারলো না আগের মতো জড়তাটা রয়েই গিয়েছে।

এবার নিখিলই প্রশ্ন করলো প্রথমে,

— অরোরা তুমি হঠাৎ এখানে? জানো ওই যে দেখছো তিনতলার ল্যাব ওখান থেকে তোমাকে দেখেই ছুটে এসেছি আমি।বারবার মনে হচ্ছিলো আমি ঠিক দেখছি তো?

মাত্রাতিরিক্ত খুশিতে অরুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, তবুও খানিকটা কষ্ট করে মিনমিনিয়ে জবাব দিলো,

— জ্বি আমি এখানে, ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট ইয়ার।সঙ্গে সঙ্গে আবারও প্রশ্ন করে নিখিল,

— আচ্ছা অরোরা,তিথি কেমন আছে? ওর ফোন কেন বন্ধ বলতে পারবে??

তিথিকে নিয়ে নিখিলের এতোবেশি কৌতুহল আর উদ্বেগ দেখে ফাটা বেলুনের মতোই চুপসে গেলো অরুর হাস্যোজ্জল মুখটা।

অন্যদিকে,ক্লাসের বিশাল থাই লাগানো জানালার ফাঁক দিয়ে এক পলক ওদের দিকে চাইলো ক্রীতিক, অতঃপর অর্নব কে কল করে নরম সুরে, একদম সফ্ট টোন যাকে বলে, সেভাবেই বললো,

— আমাদের ভার্সিটির সি'সিটিভি কন্ট্রোল সিস্টেমটা হ্যা'ক করতে হবে দোস্ত। বেশি না ওয়ানলি ফর ফাইভ মিনিটস। তিথি সম্মন্ধে কথা বলতে মোটেই আগ্রহী নয় অরু। কেন যেন ভেতর থেকেই আসছে না কোন কথা, কি বলবে তাহলে ও??

কিন্তু নিখিল দ্বিতীয়বার আবারও একই প্রশ্ন করলো ওকে,

— কি হলো অরোরা, জানো তিথি সম্মন্ধে কিছু?

অরুর মন বলছে, আমি এতদূর কিভাবে আসলাম, কেন আসলাম, সেসব কথা আপনার একটা বারও জানতে ইচ্ছা করলো না নিখিল ভাই? তাছাড়া আপনি হঠাৎ তিথিকে নিয়েই বা কেন এতো আগ্রহী?

— হ্যালো,অরোরা, কি ভাবছো এতো?

নিখিল হাত নাড়িয়ে ইশারা করতেই সম্বিত ফিরে পেলো অরু। এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই ফোন চলে আসে নিখিলের।

ওপাশ থেকে কি বললো, কে জানে, নিখিল আর এক মূহুর্তের জন্যও দাঁড়ালো না ওখানে বরং দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগলো তিনতলার ল্যাব রুমের উদ্দেশ্যে।

অযাচিত অরু পেছন থেকেই প্রশ্ন ছুড়লো,— কি হয়েছে নিখিল ভাই, এনিথিং রং?

নিখিল যেতে যেতে জবাব দিলো

— সাম হাউ ক্যা’মিক্যা’ল পরে গিয়ে আমার সব রিচার্জ রিপোর্ট গুলো পু’ড়ে গিয়েছে।

এমন দু’র্ঘটনার কথা শুনে অজান্তেই মুখে হাত চলে গেলো অরুর। বিরবিরিয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন ছুড়লো,

— আজ হচ্ছেটা কি এসব?

ক্লাস শেষে অরুকে এভাবে থ হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে ওর কাছে এগিয়ে আসে উজ্জ্বল শ্যাম বর্নের মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত একটি মেয়ে। কারও উপস্থিতি টের পেয়ে অরু পেছনে চাইলে মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বলে,

—হ্যালো আ’ম সায়নী, সায়নী মুখার্জি। আ’ম ফ্রম ইন্ডিয়া।

দুর দেশে হাজারো সাদা চামড়া ওয়ালা বিদেশি মানুষের ভীরে প্রতিবেশি দেশের কাউকে দেখতে পাওয়াটা পাশের বাড়ির প্রতিবেশির মুখ দেখতে পাওয়ার মতোই অনেকটা। অরুরও সে-রকমই ঠেকলো, ও জলদি সায়নীর হাতে হাত মিলিয়ে বললো,— আমি অরোরা শেখ, আই মিন অরু।

— অরু? হাউ সুইট।

তারপর আঙুল দিয়ে ইশারা করে সায়নী বলে চলো ক্যান্টিনে যাই, তোমাকে ভার্সিটি ক্যান্টিনের সবচেয়ে বেস্ট খাবারটা টেস্ট করাবো আজ, লেটস গো।

অরু সম্মোহনী হাসি দিয়ে বললো,

— আচ্ছা চলো।

নরম ঘাসের আস্তরণ মাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা দুজন, যেতে যেতে সায়নী শুধায়,

— আচ্ছা আজ জেকে স্যার তোমাকে ওভাবে বক’লো কেন বলোতো? উনি সাধারণত কারোর সাথেই আনপ্রফেশনাল আচরণ করেন না এটলিস্ট আমিতো দেখিনি।

অরু ঠোঁট উল্টে বললো,

— কি জানি।

তবে মনে মনে বললো,—তোমার জেকে স্যারের বকু’নি খেয়ে আমার অভ্যেস আছে।

সায়নী প্রতিউত্তরে উৎকন্ঠা নিয়ে বললো,

— জানো? জেকে স্যার ইজ আ ভেরি গুড রাইডার। ভার্সিটিতে তাকে যতোটা কুল লাগে, বাইক রাইডার জেকে স্যারকে ঠিক ততটাই ডেস্পারেট আর ড্যাসিং মনে হয়। যেন আস্ত একটা চকোলেট বয়।

অরু জানতো যে ক্রীতিক একজন রাইডার তবে সেটা মনিটরের ভিডিও গেইমে। কিন্তু বাস্তবেও যে ক্রীতিক বাইক রাইডিং করে সেটা ওর অজানাই ছিল। তাই চকিতে বলে,

— কি বলছো তুমি? আমিতো জানতাম না।

সায়নী হাত দিয়ে মাঁছি তাড়ানোর মতো করে বললো,

— আরে তুমি কি করে জানবে? নতুন এসেছো না। দাঁড়াও আমার কাছে টিকেট আছে।

এই বলে ব্যাগ থেকে দুইটা টিকেট বের করে একটা অরুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সায়নী বললো,

— আগামী কাল ভার্সিটির হান্ড্রেড ইয়ার সিরিমনি, তাই কোন ক্লাস নেই, সারাদিন কোন না কোন প্রোগ্রাম হবে। তারপরের দিনই জেকে স্যারের রাইডিং ম্যাচ, টিকেটটা রাখো আমি তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো, কেমন?

অরু হ্যা না কিছুই বললো না, সায়নী বলার অপেক্ষাও করলো না , অনেকটা অধিকার খাটিয়েই ওর ব্যাগে টিকেটটা ঢুকিয়ে দিলো। এদেশে সন্ধা হওয়ার জন্য খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন পরে না, বিকেল চারটার পরে এমনিতেই সূর্যের হদিস পাওয়া বাহুল্য।

আধারের কালচে আস্তরনে গোধূলির ম’রা রোদ টুকু ঢেকে গিয়েছে বহু আগেই।

আবছা আঁধারের মাঝেই ভার্সিটির গেইট দিয়ে ধীরগতিতে বের হয়েছে অরু।

ওদিকে গেইটের বাইরে গাড়িতে হেলান দিয়ে সটান দাড়িয়ে আছে ক্রীতিক।

আপাতত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অরুর গতিবেগ গননা করাটাই ওর মোক্ষম কাজ মনে হচ্ছে।

অরু যখন একদম সামনে এসে দাঁড়ায়, ঠিক তখনই ঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে ক্রীতিক বললো,

— হোয়াই সো লেট?

অরু জবাব দেয়না, উল্টে অবিশ্বাসের নজরে ক্রীতিকের মুখশ্রী পরখ করে মনে মনে বলে,— এই গো'মড়া মুখো লোকটা,এতো মেয়েদের ক্রাশ? সব মেয়েরা রাইডার রাইডার করে নাঁচে। কি এমন রাইড করেন উনি?

অরুর এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করা দেখে ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,

— হোয়াট??

অরু লাফিয়ে উঠে দূরত্ব বাড়ালো।

—কি হলো দূরে সরে কেন গেলি? কাছে আয়।

— ক..কাছে কেন আসবো?

ক্রীতিকের নির্লিপ্ত জবাব,

— আমি আসতে বলেছি তাই আসবি, আয় বলছি। প্রতিউত্তরে অরু কিছু বলবে তখনই গেইটের কাছে আগমন ঘটে দা ক্রাশ বয় নিখিলের।

হাতে সাইকেল নিয়ে দাড়িয়ে আছে সে। অরুকে দেখা মাত্রই নিখিল আন্তরিক হেসে বললো,

— আরে অরোরা, বাসায় যাবে নাকি? চলো তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি আমি।

অরু তো খুশিতে বাকরুদ্ধ, এ যেন মেঘ না চাইতে জল। ও ক্রীতিকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বললো,

— ইয়ে.. ভ..ভ..ভাইয়া।আসলে।

— কি?

তী'রের ছিলার মতো একটা ভ্রু উঁচিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করে ক্রীতিক।

অরু বলতে ভ'য় পাচ্ছে ক্রীতিককে, তবে এই মূহুর্তে নিখিলের সাথে বাড়ি যাওয়ার মতো এতো বড় সুযোগটাও হাত ছাড়া করতে চাইছে না মোটেই, তাই বুকের মাঝে অনেকটা সাহস জুগিয়ে বললো,

— আ..আমি নিখিল ভাইয়ের সাথে যেতে চাই।

—ইয়াহ সিওর।একেবারে একবলে ছক্কা হাঁকানোর মতোই ভেতরটা ইয়াহু বলে চেঁচিয়ে উঠলো অরুর। খুশিতে এখানেই লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর।কিন্তু সেটা বড্ড বেমানান দেখায়,তাই চুপচাপ গিয়ে সাইকেলের পেছনে উঠে পরলো ও।

ক্রীতিক সেদিকে অনুভূতি শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাড়িয়ে আছে, হাত দিয়ে এমন ভাবে নিজের লং হেয়ার গুলোকে ব্যাক ব্রাশ করছে যেন কিছুই হয়নি। এভরিথিং ইজ অল রাইট।

সাইকেল চলতে শুরু করলেই ক্রীতিক মাটির দিকে তাকিয়ে গুনতে শুরু করলো,

— ফাইব, ফোর, থ্রী, টু,ওয়ান এন্ড জিরো।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার মাঝখানে ঝনঝন করে কিছু একটা পরার শব্দ হলো। তৎক্ষনাৎ ওর ঠোঁটে খেলে গেলো অদ্ভুত সেই ক্রুর হাসি। হুট করেই সাইকেলের টায়ার কিকরে পা'ঞ্চার হয়ে গেলো বুঝে উঠতে পারলো না নিখিল,অবশ্য এই মূহুর্তে সে বোঝার মতো অবস্থাতেও নেই, হাত পা ছিলে ছুলে যা-তা অবস্থা হয়ে গিয়েছে।

অরু নিজেও অনেকটা ব্যা'থা পেয়েছে। ক্রীতিক দ্রুত এগিয়ে এসে ব্যাস্ত ভঙ্গিতে শুধালো,

— আর ইউ অল রাইট মি. নিখিল?

প্রতিউত্তরে নিখিল আদৌও জবাব দিলো কি দেয়নি, তার জন্য একমূহুর্ত ও অপেক্ষা না করে, ক্রীতিক দ্রুত অরুকে কোলে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে,

— ওকে বায়, দেন।

অরুকে কোলে তুলতেই অরু, অবাক হয়ে জোরে জোরে বললো,–আরে আরে নিখিল ভাই পরে আছে আর আপনি আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন?

ক্রীতিক হাঁটতে হাঁটতে জবাব দেয়,

— হ্যা, কারন আমি তোর নিখিল ভাইয়ের প্রতি একটুও ইন্টারেস্টেড না, আমি যার প্রতি ইন্টারেস্টেড তাকে সাথে করেই নিয়ে যাচ্ছি।

— কি বললেন? কার প্রতি আগ্রহী?

ক্রীতিক দু'হাতে আগলে রাখা অরুর দিকে তাকিয়ে কটমটিয়ে বললো,— বিলিভ মি অরু, তুই আর একটাও বাড়তি কথা বললে, আমি তোকে এখানেই ফেলে চলে যাবো। আর তুই ভালো করেই জানিস আমি যেটা বলি সেটাই করে ছাড়ি। কারণ তোর পেছনে ওয়েস্ট করার মতো বেহুদা টাইম আমার নেই।সো মুখে ফুলস্টপ টান।

ক্রীতিকের কথার পাছে অরুও আর কথা বাড়ানোর সাহস পায়না, মুখে দাড়ি,কমা,ফুলস্টপ সবকিছু টেনে দিয়ে, মাথা এলিয়ে পরে থাকে ক্রীতিকের প্রসস্থ বাহুডোরে।

ফকফকে পরিস্কার আকাশ আর রোদ্রজ্জল দিনের আগমনী বার্তা নিয়ে,সূচনা হয়েছে আরও একটি সুন্দর সকালের। আজকের আবহাওয়াটা প্রান জুড়ানোর মতোই সুন্দর ,চারিদিকে তাকালেই কেমন মন ভালো হয়ে যায়। কুসুম গরম সূর্য কীরণ আর ভোরের বাতাস গায়ে মাখাতে আজ বহুদিন বাদে ফ্রন্ট ইয়ার্ডের বেঞ্চিতে এসে বসেছে ক্রীতিক।দু'হাতে মুঠি বদ্ধ হয়ে আছে,কফির কাপ আর আইপ্যাড। তবে আপাতত আইপ্যাডে চোখ নেই ওর, বরং দুচোখ নিষ্পলক বিচরন করছে চারিদিকের সবুজে ঘেরা

অরন্যে। কোনোদিন দেশে ফিরবে না বলে, বছর তিনেক আগেই ছোটমোটো এই অত্যাধুনিক ডুপ্লেক্স বাড়িটা কিনেছিল ক্রীতিক। তখন কি আর ও জানতো?যে তিন বছরের মাথায় এসে ওর অষ্টাদশী পিচ্চি এলোকেশী এই বাড়িতেই প্রথমে পা রাখবে,দিনরাত যাপন করবে। জানলে হয়তো বাড়িটাকে মনমতো ঢেলে সাজাতে পারতো। অরুর তো আবার হ্যালো কিটি খুব পছন্দ,বাড়িটা হ্যালো কিটি থীমে তৈরি করলে কেমন হতো? কথাটি ভাবতেই এক মনে হেসে ওঠে ক্রীতিক।
ঠিক তখনই ওর আজগুবি ভাবনার সুতো ছিড়ে যায় সামনের ফ্রেঞ্চ গেইট থেকে আসা কলিং বেলের টিংটং আওয়াজে। কে এসেছে দেখার জন্য ক্রীতিক উঁকি দিতে যাবে, তারআগেই মেইন ডোর খুলে বেড়িয়ে আসে অরু। তারপর ফ্রন্ট ইয়ার্ড পেরিয়ে সোজা এগিয়ে যায় গেইটের কাছে। অরুর পড়নে ছিল হোয়াইট পিঙ্ক কম্বিনেশনে সিল্কের পাজামা,রেশমের মতো হাটু অবধি লম্বা চুল গুলো ছিল পুরো পুরি বাঁধন হারা। অরুর পরনে নিজের কিনে দেওয়া পাজামা সেট দেখে ক্রীতিকের বেশ ভালো লাগলো। এই প্রথম ক্রীতিক কারোর জন্য কিছু নিজের হাতে কিনেছে,অরু আজ আবার সেটা পরেছেও। ভালো লাগারই কথা।
এইতো কালকেরই ঘটনা, সন্ধ্যা বেলা ভার্সিটি থেকে ফিরে,একাই খু'ড়িয়ে খু'ড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমেছিল অরু। তবে গাড়ি থেকে নামতেই খুব বড়সড় একটা ঝটকা খেয়ে অগত্যাই বিস্ময়ে আপনা আপনি দু'ঠোঁট আলাদা হয়ে গিয়েছিল ওর ।এই বাড়ির গ্যারেজে এখনো আসা হয়ে ওঠেনি অরুর আজকেই প্রথম ছিল। তাই

ক্রীতিকের যে এতো এতো রাইডিং বাইকের কালেকশন আছে সেটাও ওর অজানাই ছিল।
পুরো গ্যারেজে চার চাকা বলতে একটা মার্সিডিজই রয়েছে কেবল। বাকি সব নামি-দামি ব্র্যান্ডেড বাইক কালেকশন। অরু মনেমনে ভাবলো এটাকে কোনো বাইকের শোরুম বললে মন্দ হবেনা বৈকি। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অরু যখন অবিশ্বাসের নজরে ক্রীতিকের পানে চাইলো, ক্রীতিকের মুখ ভঙ্গি তখন খুবই সাভাবিক, ও নিজ হাতের আঙুলে চাবির রিংটা ঘুরাতে ঘুরাতে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো,—গাড়িতে একটা প্যাকেট আছে নিয়ে যাস।
অরু,ভ্রুকুটি করে শুধায়,
— কার প্যাকেট, আমার?
ক্রীতিক না ঘুরেই জবাব দিলো
— তো কার??
— কিন্তু, আমার জন্য হঠাৎ??
ক্রীতিক হাটার গতি থামিয়ে, প্রথমে নাক টেনে বুক ভরে বাতাস নেয়, অতঃপর বলে,
— তুই ঘুমালে যে অ'র্ধন'গ্ন হয়ে থাকিস সেটা আদৌও জানিস?
— কিহ!
লজ্জা আর বি'রক্তির চ'রম সীমানায় গিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করলো অরু।
ক্রীতিক আবারও স্ব স্থানে দাড়িয়ে থেকেই বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে বললো,— আমিতো জানি,আর তাছাড়া আমার আমানতের খেয়ানত করার কোন অধিকার তো তোর নেই,তাই ঢেকে রাখার

ব্যাবস্থা করেছি মাত্র,সময় হলে নিজের জিনিস নিজে ঠিক বুঝে নেবো,তখন আর তোকে জ্বালাতে আসবো না, নিজের হাত দিয়েই ঢাকবো সবটা।আর দরকার পরলে.... বাক্যটা কেন যেন শেষ করলোটা ক্রীতিক, বরং তারাহুরো করে অরুর সামনে থেকে চলে গেলো।

আমানত, খেয়ানত,কিংবা ক্রীতিকের ঘোরানো প্যাঁচানো কথা কোনোটাই তখন আর মাথায় ঢোকেনি অরুর। ও তো স্রেফ উপহারটুকু গ্রহন করেছে। এক টা দুটো নয়, পুরো দশ কালারের দশটা পাজামা সেট ছিল প্যাকেটে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল পাজামা গুলো খুব দামি, গায়ে চড়ালেই কেমন চোখ ভার হয়ে ঘুম চলে আসে।

কালকের কথা আজও মনে করে মুখের কোনে আঙুল ঠেকিয়ে ঠোঁট কামড়ে একমনে হাসছে ক্রীতিক। আশ্চর্য।

মনে মনে ভাবছে,— সত্যি যদি দিশেহারা হয়ে কাল কিছু করে বসতাম? অধিকার খাটাতে গিয়ে দূরত্বের প্রাচীর ভে'ঙে ফেলতাম?তাহলে কি খুব বেশি বারাবারি হয়ে যেত???

ওদিকে অরু নিজের কোলের মধ্যে ছোট্ট বিড়াল ছানা ডোরা কে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গেইট খুলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো চেনা পরিচিত সেই সুদর্শন মুখখানা,তবে এই মুখটা অরুর থেকে বেশি অনুর পরিচিত।

অরু একপলকে উপর থেকে নিচ পরখ করে নিলে তার। একগুচ্ছ শুভ্র রঙা টিউলিপ হাতে নিয়ে ফর্মাল গেটআপে দাড়িয়ে আছে প্রত্যয়। চোখে অপরিবর্তিত চিকন ফ্রেমের চশমা, দেখে তো মনে হয় পাওয়ার আছে। প্রায় কয়েক মিনিট বিনাবাক্যে অতিবাহিত হয়ে

যায়,তবুও অরুর ধ্যান ভাঙলো না,তাই অরুর দিবাস্বপ্নকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে হাত নাড়িয়ে ডেকে উঠল প্রত্যয়,— হ্যালো!
তৎক্ষনাৎ ধ্যান ভেঙে গেলো অরুর, সচকিত হয়ে বললো,
—-হ্যা!! আপার কাছে এসেছেন তাইনা?
আপা বাসাতেই আছে, আসুন আসুন।
প্রত্যয় গেইট দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললো,
— এ্যাকচুয়ালি্য আমি,অনুর কাছে নয়,ক্রীতিক ভাইয়ের কাছে এসেছি, কিছু ফাইলে আর্জেন্ট সিগনেচার লাগতো। ওহ ওইতো ভাই।
হাত কয়েক দুরে কালো রঙা বেঞ্চিটাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালো প্রত্যয়। তারপর অরুকে রেখেই এগিয়ে গেলো সেদিকে।
অন্যদিকে অরু, দৌড়ে গিয়ে অনুকে বাইরে নিয়ে এলো।
অরুর টানাটানিতে অনেকটা হন্তদন্ত হয়েই বেরিয়ে এলো অনু।
একটা লং কুর্তি আর লেগিংস পরিহিত অনু তাকিয়ে আছে প্রত্যয়ের পানে।ওদিকে কাজের ফাঁকে প্রত্যয়ের ওও চোখ সরেনি ঘুমু ঘুমু অনুর মায়াবী মুখশ্রী থেকে।
অরু টানাটানি করছে দেখে, অনু বিরক্ত হয়ে বললো,— উফফ ছাড়না অরু। ক্রীতিক ভাইয়া বসে আছে, তার সামনে তুই যদি এমন বাচ্চামো করিস। কি বলবে বলতো?
—আরে কিচ্ছু বলবে না আয় তো তুই।
অরুর একহাতে তখনও ঘাপটি মেরে বসে আছে বিড়ালের বাচ্চা ডোরা।
অনু সামনে এগোতে এগোতে ভাবছে সেদিন রাতের কথা। সেদিন বৃষ্টির অজুহাতটা তো নিছকই বাহানা ছিল। কারণ সেদিন

হসপিটাল থেকে বের হতেই দেখা মেলে ছাতা হাতে দাড়িয়ে থাকা প্রত্যয়ের।
প্রত্যয়কে দেখে অবাকের চরম সীমানায় গিয়ে অনু তখন শুধালো,—আপনি এখানে?
প্রত্যয় মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল,
—- আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।
আর তারপর?? বৃষ্টি ভেজা মনোমুগ্ধকর একটা সিম্পল কফি ডেট। একজন আরেকজনের পরিচয় তো দূরে থাক নামটুকু পর্যন্ত জানতো না, তবুও মন গহীনে কোথাও ঘন্টী বেজেছিল দুজনারই। অনুর মনে হয়েছিল,যে মানুষটা এতোবার করে সাহায্য করেছে তার সাথে এককাপ কফি তো পান করাই যায়। পরিচয় দিয়ে কি আসে যায়???
তবে আজ এই মূহুর্তে প্রত্যয়ের কর্মকান্ড দেখে মনে হচ্ছে, সে পরিচয় দিতেই একে বারে আঁটঘাঁট বেধে সকাল সকাল বাড়ি বয়ে এসেছে। বাড়ির ফ্রন্ট ইয়ার্ডটা নরম সবুজ ঘাস, আর বিভিন্ন সৌন্দর্য বর্ধক গাছ গাছালি দিয়ে ভরা, সেই গাছেরই ফাঁক ফোকর গলিয়ে আলো ছড়াচ্ছে একটু একটু সূর্য কীরণ। আর সেই আলোছায়ার মাঝেই মুখো মুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যয় ও অনু। অনুর পেছনে অরু আর ডোরা। অন্যদিকে ওদের থেকে খানিকটা দুরে এখনো আইপ্যাডে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা করছে ক্রীতিক।
প্রত্যয় নিজের হাতে থাকা টিউলিপ গুচ্ছ এগিয়ে দিয়ে বললো,
— শুভ সকাল মিস. অনন্যা শেখ, আমি প্রত্যয় এহসান” সি এফ ও” অফ জেকে গ্রুপ।

অরু হকচকিয়ে অনুর দিকে এগিয়ে এসে মিনমিনিয়ে বললো,
— আপা উনিই প্রত্যয় এহসান, উনিই মনে হয় আমাদের জন্য ভিসা টিকেটের সব ব্যাবস্থা করেছিলেন।
প্রত্যয় চোখ সরিয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে বললো,
— হ্যা ঠিক বলেছো তুমি।
অনু কথা ঘুরিয়ে বললো,
— তাহলে আপনি আমাকে চিনতেন তাইতো?
প্রত্যয় মৃদু হেসে জানায়,
— কিছুটা।
অনু সহসা হেসে টিউলিপ ফুল গুলোকে গ্রহন করে বলে,
— ধন্যবাদ।
—ওয়েলকাম।
প্রত্যয়ের ঘোর লাগানো চোখ দুটো ছিলো তখনও অনুর নিস্প্রভ চোখে নিবদ্ধ। ওদিকে ক্রীতিকের চোখ দুটো অরুর চোখে, একই ঘোর, একই কামুকতা, ক্রীতিকের চোখে খানিকটা বেশিই হবে। ক্রীতিকের সেই ঘোর লাগা চোখে চোখ পরতেই,কেঁপে উঠলো অরু, হুট করেই কেন যেন শরীরের প্রত্যেকটা লোমকূপ দাড়িয়ে গেলো। সেই সাথে তলপেটের মধ্যে অনুভব হলো অজানা এক গুরগুরানি। এটা মোটেই খিদের পূর্বাভাস নয়, তাহলে এটা কেমন অনুভূতি?? আগেতো কখনো হয়নি এমন। সামান্য চাহনিতেও কারও এতো জোর থাকে? চোখের চাউনি দিয়ে, পুরো ঝ’ড় বইয়ে তু’লকালাম বাধিয়ে দিলো শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তবুও সবটা গতানুগতিক উপেক্ষা করে গেলো অরু, পেছন থেকে অনুদের চোখে চোখে কথা আদান-প্রদানের মাঝে বাম হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অরু বলে

উঠলো,—এ্যাই আপা, অনেক তো হয়েছে তোদের আলাপ পরিচয়, এখন চল ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে আবার খেয়ে ভার্সিটি যেতে হবে, তাছাড়া তুই তো হসপিটালে মায়ের কাছে যাবি।
অরুর কথায় সম্বিত ফিরে পেলো অনু, সেই সাথে অজানা একরাশ লজ্জারা প্রজাপতির ন্যায় ঘিরে ধরলো ওকে। ও তারাহুরো করে ভেতরে যেতে যেতে বললো,
—খাবার দিচ্ছি দ্রুত আয়।
পরিবেশটা থমথমে আর অসাভাবিক, প্রত্যয়ের নিজেরও কেমন লজ্জা লজ্জা পাঁচ্ছে। তাই পরিস্থিতি সাভাবিক করতে প্রত্যয় অরুর কোলে ঝিমুতে থাকা ডোরাকে দেখিয়ে বললো,
— ব..বিড়াল কোথায় পেলে? না মানে আগেতো ছিলোনা।
অরু ডোরার মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে বলে,
— কাল রাতে ব্যাক ইয়ার্ডে কুড়িয়ে পেয়েছি ঠান্ডায় কাঁপছিল, তারপর ঘরে নিয়ে এসেছি আর তারপর....
প্রত্যায় জিজ্ঞাসু হয়ে শুধালো,—তারপর?
অরু ক্রীতিকের দিকে দাঁত কটমটিয়ে তাকিয়ে বললো,
— কিচ্ছুনা।
—বাই দা ওয়ে, নাইস ক্যাট।
অরু প্রত্যয়ের কথায় বাঁধ সেধে বলে,
— ও ক্যাট না, ও আমার বাচ্চা ডোরা।
— মাথা খারাপ, আমি কেন বিড়ালের বাচ্চা জন্ম দিতে যাবো?
পেছন থেকে ভেসে আসা ক্রীতিকের অযাচিত বাক্যে অরু, প্রত্যয় দুজনই বোকা বনে গেলো।
অরু মুখে ভেংচি কেঁ’টে মিনমিনিয়ে বললো,

— আপনার বাচ্চা কেউ বলবেও না, ভালোবাসা,দরদ বলতে কিছু আছে নাকি হৃদয়ে? থাকলে আমাকে আর ডোরাকে অমন মাঝরাতে বাইরে বের করে দিতে পারতেন না। ওর ভাবনার মাঝেই ক্রীতিক ওদের কাছে এগিয়ে এসে, আই প্যাডটা অরুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,

— অরু এটা নিয়ে ভেতরে যা, আমার প্রত্যয়ের সাথে কিছু পার্সোনাল কথা আছে।

অরু ঠোঁট উল্টে ভেতরে যেতে আইপ্যাডটা খুলে দেখতে লাগলো। আর প্রথমেই যেটা সামনে আসলো সেটা অডিও বুক। হা’ন্টিং এডলিন।

বইয়ের নামটা দেখেই চোখ মুখ কুঁচকে গেলো অরুর। মিনমিনিয়ে বললো,

— উনি হা’ন্টিং এডলিনের মতো ডার্ক রোমান্টিক বই পড়েন? ইউউ!! তারমানে কি উনিও ওইসব বেপরোয়া হিরোদের মতো অতিরিক্ত রোমান্টিক?? হায়হায় ওনাকে সামলাতে তো ওনার বউয়ের বারোটা তেরোটা বেজে যাবে।

পরক্ষণেই নিজের মাথায় নিজেই চাটি মে’রে দাঁত দিয়ে জিভ কেঁ’টে অরু বলে,

—ছিহ!কি সব ভাবছি আমি। তওবা তওবা। ইউনিভার্সিটিতে আজ হান্ড্রেড ইয়ার সিরিমনি, মানে শতবর্ষপূর্তি উদযাপন হচ্ছে। আজ কোন ডিপার্টমেন্টেরই কোন ক্লাস নেই। সব কিছু জানাই ছিল অরুর। তবুও একবুক আশা নিয়ে ভার্সিটিতে এসেছিল ও। আকাঙ্খা একটাই নিখিল ভাইয়ের একটা নজর দেখা পাওয়া,ঠিক আগের মতোই। কিন্তু সেটা আর হয়নি, সিনিয়রদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে

জানতে পেরেছে,নিখিল ভাই আজ আর ভার্সিটিতে আসেনি। আসেনি বললে ভুল হবে,আসতে পারেনি,গতকাল সব রিপোর্ট ন’ষ্ট হয়ে যাওয়ায় আজ আবারও সেগুলো নতুন করে রেডি করতে হচ্ছে তাকে। নয়তো সামনের সেমিস্টারে পুরো দমে ফে’ইল। অরু অসহায়ের মতো মনম’রা হয়ে বললো,
— নিখিল ভাইয়ের মতো ভালো মানুষের সাথে,এমন খারা’প কাজটা কে করলো ??
সে যাই হোক, নিখিল ভাই যেহেতু আসেনি অরু চিন্তা করলো ওও বাড়িতে ফিরে যাবে, কাল সারারাত বাইরে বের করে রেখেছে ক্রীতিক ওকে,তাই ঘুমটাও চোখে তাজা। না ঘুমানোর দরুন কেমন ঝিঁমুনি চলে আসছে দুচোখে। চারিদিক ঝাপসা লাগছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি পরে যাবো মাথা ঘুরে। অরু আর বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকলো না হাটা ধরলো বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে, তবে দু’কদম এগোতেই পথ আটকায় সায়নী,ওর হাতটা শক্ত করে ধরে উচ্ছ্বাসিত মুখে বলে,
— এ্যাই অরু,কোথায় যাচ্ছো?? গ্যালারীতে বাস্কেট বল খেলা হচ্ছে,বিশাল টূর্নামেন্ট তারাতাড়ি চলো।
যদিও অরুর এসবে বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ নেই, তবুও অগত্যাই যেতে হলো সায়নীর সাথে। যেতে যেতে সায়নী জানালো
— সবাই এই ম্যাচ দেখার জন্য গত একমাস ধরে বসে আছে, আর তুমি বাড়ি যাচ্ছো? এই ভার্সিটির প্রাক্তন ছাত্র ভার্সেস পাশের ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ছাত্ররা।
সায়নীর উচ্ছ্বাসে জোয়ার দিতে অরু নরম সুরে বললো,
— ওহ তাই নাকি?

গোলাকার বিশাল গ্যালারীতে গিয়ে সায়নী সিটে বসতে বসতে বললো,
— হুম, তার চেয়েও বড় কথা কি জানো?জেকে স্যারও এই ভার্সিটির সিনিয়র ছিলেন। আর স্যারও আজ ম্যাচে খেলবেন।
তৎক্ষনাৎ সায়নীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে সামনে চাইলো অরু। দেখতে পেলো শুধু ক্রীতিক একা নয়, সায়র আর অর্নব ওও আছে। তাছাড়া ওদের পাশের গ্যালারীতেই বসে বসে নিজের প্রিয় বন্ধুদের চিয়ারআপ করে যাচ্ছে এলিসা,সাথে ক্যাথলিনও।
চেনা পরিচিত সবাইকে একঝলক দেখে নিয়ে অরু মনে মনে বললো,—তারমানে ওনারা সবাই এই ভার্সিটিরই প্রাক্তন শিক্ষার্থী।
— অরু,কি ভাবছো খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে তো।
সায়নীর কথায় এবার সত্যি সত্যি খেলা দেখায় মন দিলো অরু।তখন খেলার প্রথম হাফ শেষ হয়েছে মাত্র, সবার মুখেই বিজয়ের হাসি লেগে আছে, কারন প্রথম হাফেই বাজিমাত করে দিয়েছে ক্রীতিকেরা। প্রতিপক্ষ টীম বাকি অর্ধেক সময়ে এই রেকর্ড ভা'ঙতে পারবে কিনা সন্দেহ। এখন দশ মিনিটের বিরতি।
বিরতি পেয়ে সবাই যে যার মতো এক নম্বর, দুই নম্বর সারতে চলে গেলো। কেউ কেউ গিয়ে দাঁড়ালো স্ব টীমের মানুষের কাছে, বাকি অর্ধেক খেলার জন্য পরামর্শেরও তো একটা ব্যাপার আছে।
শুধু মাত্র ক্রীতিক সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে এলো জনসমাগম পূর্ন গ্যালারী। ক্রীতিক গ্যালারীতে উঠতেই সবাই একযোগে চিল্লিয়ে উঠলো।
তবে কোন কিছু শোনা, কিংবা দেখার চেষ্টা না করেই ও সোজা গিয়ে বসে পরলো অরুর পাশে। অতঃপর একটান দিয়ে অরুর

গলায় পেচানো স্কার্ফটা টেনে নিয়ে তোয়ালের মতো করে নিজের চুল আর কপালের ঘাম মুছতে লাগলো নির্বিঘ্নে।
বিস্ময়ে বি'পর্যয়ে হা হয়ে আছে পুরো গ্যালারী ভর্তি মানুষ। যেন এখানে কোন বাস্কেট বল ম্যাচ না বরং রোমান্টিক সিনেমার শুটিং হচ্ছে। অর্নব সায়র ওরাও খানিকটা অবাক। সায়র যতটুকু জানে মেয়েটা ক্রীতিকের দু-চোখের বি'ষ। তাহলে গ্যালারী ভর্তি মানুষের সামনে ক্রীতিক এসব করছেটা কি?ওদিকে অরু পারছেনা লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে। মানে সকলের ক্রাশ বয় রাইডার জেকে স্যার এই মূহুর্তে পুরো ক্যাম্পাসের সামনে ওর শরীরের ওড়না দিয়ে নিজের মুখমন্ডলের ঘাম মুছছে,এমন কাহিনীতে চারিদিকের জোড়া জোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে অরুর আর্তনাদ করে বলতে ইচ্ছে করলো,
—বিশ্বাস করো আমি কিছু জানিনা, এই লোকটা পা'গল, মাথায় সমস্যা আছে তাইতো হুটহাট এমন করে আমাকে ফাঁ'সায়।
ওর ভেতরের কা'ন্নাকা'টিকে দু'পয়সা পাত্তা না দিয়ে গমগমে আওয়াজে ক্রীতিক বলে,
—-পানিটা দে।
অরু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো,
— আমারটা খাবেন?
—এখানে আর কেউ আছে?অরু দ্রুত এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে ব্যাগ থেকে বের করে মাম পট টা এগিয়ে দেয়।
ক্রীতিক এক নিঃশ্বাসে পুরোটা পানি শেষ করে আবারও নেমে যায় গ্যালারী থেকে।

ক্রীতিক চলে গেলে অরু নিজের ওড়নাটা ঠিকঠাক করতে ব্যাস্ত হয়ে পরে, ওড়নার একাংশ ক্রীতিকের ঘামে ভিজে আছে, সেখান থেকে খুব সুন্দর একটা চন্দন কাঠ জাতীয় ঘ্রান আসছে। ঘ্রানটা কিসের ভালোভাবে বোঝার জন্য অরু ওড়নাতে নাক ছোঁয়ালো। হ্যা যা ভেবেছিলো তাই স্যান্ডালউড পারফিউমের একটা মাতাল করা সুবাস। গন্ধটা নাকে লাগতেই অজানা শিহরণে শরীর ছেয়ে গেলো অরুর।

তখনই অপর পাশ থেকে কর্কশ আওয়াজ ভেসে এলো সায়নীর,

—তুমি জেকে স্যারকে চেনো?

—নাহ,না..মানে..হ্যা..মানে।

অরু চোরের মতো মুখ কাচুমাচু করছে। দেখে সায়নী বললো,

—কি না মানে হ্যা মানে করছো? চিনে থাকলে বলো?

অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বলে,

— উনি আমার ভ..ভাই হয়,মানে স্টেপ ব্রাদার।

সায়নী বোধ হয় অরুর জবাবে খুশিই হলো,তাই ওর হাত জড়িয়ে ধরে বললো,

— ইটস ওকে অরু, আগে বলবে না এ কথা, আমি আরও ভাবলাম কি না কি। খাওয়া দাওয়া হই’হুল্লোরে সারাদিনটা ভালোই চলে গিয়েছে , সবার সাথে অরুও আজ বেশ ভালোই আনন্দ করেছে, এতোগুলো দিন পর আজকেই প্রথম অরুর মনে হয়েছে যে ও আসলেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তবে বিপত্তি ঘটেছে বিকেল নাগাদ।

ক্যাম্পাসে রাতে কনসার্ট আর পার্টি থাকলেও অরু সেসবে একদম অভ্যস্ত না, তাই ও সায়নীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে যাওয়ার

প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। অরু শুধু একা নয়,অনেকেই যাচ্ছে আসছে। করিডোরে শিক্ষার্থীদের উপচে পড়া ভীর। তাই ও ঠিক করলো বাইরের দিক থেকে তারাহুরো করে বেরিয়ে যাবে,কিন্তু হঠাৎই ওর মনে হলো ও ভীরের মাঝে নিখিল ভাইকে দেখলো,নিখিল কে দেখা মাত্র অরু আনমনে বললো,—আশ্চর্য নিখিল ভাই সারাদিনে ভার্সিটি এলেন না, আর এখন এই সন্ধ্যা বেলা এলেন? আর সাথে ওটা কে? অরু দূর থেকেই আরেকটু ভালো ভাবে পরখ করে ওদেরকে দেখলো,হাজারো ভীরের মাঝে এক বিদেশিনীর কোমরে হাত রেখে তার সাথে হাসাহাসি করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে নিখিল ভাই, দেখলে মনে হবে তারা জনম জনমের প্রেমিকযুগল।
তবে এখন আর অরুর থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওরা বরং অনেক কাছে।
হুট করেই তখন, অরুর কি হলো কে জানে? চক্রাকার ঘুরতে থাকা বলয়ের মতোই ঘুরছিল ওর মাথাটা। চোখের সামনে সুবিশাল ক্যাম্পাসটাকে মনে হচ্ছিলো মহাবিশ্বের সবথেকে অন্ধকারতম ব্ল্যাক হোল। ক্ষনিকের মধ্যে মানুষের গিজগিজ,হাসাহাসি, কথার বহর, সব কিছু ছাপিয়ে কর্ণকূহরে বেজে উঠলো ঝিনননন ধরা এক বিরক্তি কর আওয়াজ। আর তারপর হুট করেই মাথা ঘুরে ওখানেই অচেতন হয়ে পরলো ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বাঙালি মেয়ে অরু। দীঘল কালো নজরকাড়া ফ্রেঞ্চ বিনুনিটা তখন মাটি ছুঁই ছুঁই প্রায়।
তবে মাটি আর ছুঁতে পারলো না,তার আগেই ওকে শক্ত বাহুডোরে আবদ্ধ করে নিলো নিখিল।
জনসম্মুখে হুট করে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এহ মূহুর্তেই মোটামুটি ক্যাম্পাসের সবাই অরু আর নিখিল কে ঘিরে ধরেছে।

সবার চোখের দৃষ্টিই আবর্তিত হয়ে আছে অজানা কৌতুহল দ্বারা। সবার মুখেই একটাই প্রশ্ন— কি হলো মেয়েটার।
নিখিল যখন অরুকে কোলে তুলে কেবল দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই মূহুর্তে ভীরের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠলো,
—ডোন্ট টাচ হার।
ভেলভেট মেঘের ন্যায় স্মুথ কন্ঠস্বর, তবে প্রতিটি শব্দতেই উপচে পড়ছে অগাধ কতৃত্ব,যেন ওর কোন একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসকে অন্যকেউ হাত দিয়ে ছুঁয়েছে।
অজ্ঞাত কন্ঠস্বর শুনে ভীরের মাঝে উঁকি দিলো নিখিল, তৎক্ষনাৎ এগিয়ে এসে শি’কারী বাঁজপাখির ন্যায় নিখিলের হাত থেকে ছো মে’রে অরুকে নিয়ে গেলো ক্রীতিক।
নিখিল কিছু বুঝে উঠতে পারলো না, তাই অবাক দৃষ্টিপাত করলো ক্রীতিকের পানে,
তবে ক্রীতিকের দৃষ্টি ছিল গভীর আর অ’গ্নিস্ফু’লিং এর মতোই জ্বলজ্বলে,যেন চোখদুটো দিয়েই ভ’স্ম করে দেবে নিখিল কে।
ক্রীতিকের মুখের উপর কথা বলাতো দুরে থাক, ওর চোখের দিকেই কয়েক সেকেন্ডের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারলো না নিখিল।
অজান্তেই শুষ্ক ঢোক গিলে চোখ নামিয়ে নিলো নিচে। ভার্সিটিতে ইমারজেন্সি ট্রিটমেন্টের জন্য যে ক্লিনিক থাকে। তারই একটা কেভিনের ছোট্ট করিডোরে দাড়িয়ে আছে ক্রীতিক। পড়নে কনুই অবধি হাতা গুটানো সফেদ শার্ট আর ব্ল্যাক ডেনিম। মাথার লম্বা চুল গুলো এলোমেলো হয়ে পর আছে কপালে, ফর্সা মুখটা জি’দের তোপে টকটকে লাল হয়ে আছে। এই মূহুর্তে ওকে উদভ্রান্তের মতোই ছ’ন্নছাড়া লাগছে।

ক্রীতিক যখন করিডোরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বুকের উপর দু’হাত ভাজ করে নিস্প্রভ চোখে কেভিনের দিকে তাকিয়ে ছিল ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সায়র, ক্রীতিকের মুখোমুখি দাড়িয়ে উদ্বীগ্ন হয়ে প্রশ্ন ছু’ড়ে বলে,
— কি হয়েছে অরুর?
—-, ঘুম আর খাওয়া দাওয়ার অনিয়মের জন্য প্রেশার ফল করে সে’ন্সলেস হয়ে গিয়েছে।
ক্রীতিকের নির্লিপ্ত জবাব।
সায়র ওর দিকে তি’রস্কার করে হাসলো,তারপর তাচ্ছিল্যের ধ্বনিতে বললো,—সিরিয়াসলি জেকে? মাত্র এই কয়দিনে মেয়েটাকে ট’র্চা’র করে করে আধম’রা বানিয়ে ফেললি?তোর অ’ত্যাচা’রের মাত্রা এতোই বেশি ছিল যে মেয়েটা ক্যাম্পাসের মধ্যে সে’ন্সলেস হয়ে গিয়েছে, ভাব তুই কতটা জ’ঘন্য। আচ্ছা এই পিচ্চি মেয়েটার সাথে তোর কিসের এতো শ’ক্রু’তা বলতো আমায়?তাছাড়া যেভাবেই হোক না কেন ও তো তোর বোন নাকি??
সায়র কথাটা বলতে বাকি, শ’ক্ত থা’বায় সায়রের কলারটা চেঁপে ধরতে দেরি হলোনা ক্রীতিকের।
বোন কথাটা শোনা মাত্রই দ’গ্ধ গলিত লাভা যেন হিরহির করে ছড়িয়ে পরলো ক্রীতিকের মাথার মধ্যে। ও করিডোরের বিপরীত দেওয়ালে সায়রকে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে দাঁত পি’ষে বললো,— খবরদার সায়র ওকে আমার বোন বলবি না, ও আমার বোন নয়। নিজ বোনের যায়গায় ওর চেহারাটা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনা।

আমার কাছে ও পৃথিবীর সবার থেকে ইম্পর্টেন্ট। ও আমার কি, সেটা আমি নিজেও জানিনা, তবে এটুকু জানি, বাকিটা জীবন ওকে ছাড়া আমি দম নিতেও ভুলে যাবো।
সায়র চোখ বড়বড় করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রীতিকের বিভ'ৎস মুখের পানে।
ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে আগমন ঘটে নিখিলের।
ক্রীতিক একপলক নিখিলের দিকে তাকিয়ে, সায়রকে বললো,— ওটাকে এক্ষুনি বিদেয় কর।
সায়র সামনের দিকে যাচ্ছে ঠিকই তবে ওর মনে চলছে অন্য কিছু, আজ সায়র উপলব্ধি করলো ওর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল,ক্রীতিক অরুকে সবচেয়ে বেশি অ'পছন্দ নয় বরং উ'ন্মাদের মতো পছন্দ করে। এই পছন্দ কে কি নাম দেওয়া যায়?শুধুই আসক্তি? নাকি সঙ্গিন প্রনয়াসক্তি?মেঘ আর কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে ধরনী।উদীয়মান সূর্যের নিয়ন আলোয় চারিপাশ একটু হলেও পরিষ্কার দেখাচ্ছে। নয়তো আজ মোটেই রোদ্রজ্বল কোন দিন নয়। সাভাবিক হাইওয়ে রাস্তার থেকেও কয়েকগুণ প্রসস্থ পিচ ঢালা কুচকুচে কালো রাস্তার মাঝ বরাবর এক নাগারে সাদা রঙের ব্রোকেন লাইন রোড মার্কিং টানা।ঠিক তার দুইপাশে পাহারাদারের মতো মাথা উঁচিয়ে দাড়িয়ে আছে ছোট বড় সারিসারি ম্যাপল গাছ।ম্যাপল গাছের ছোট ছোট বিশেষ আকারের রঙিন পাতাগুলি যেন একেক'টা শিল্পের নান্দনিক কারুকাজ। দেখলে মনে হবে রোদহীন মেঘে ঢাকা দিনে রাস্তার পাশের এই লাল কমলা ম্যাপল লিফ গুলোই আলো ছড়াচ্ছে পুরো রাস্তা জুড়ে,ইভেন উইথ আউট এনি সিঙ্গেল প্যানি...পথচারীদের যাতায়াত সুবিধার্থে সুন্দর

আকর্ষনীয় ম্যাপল গাছের অন্যপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে আরও একখানা তকতকে সরু রাস্তা।
সেই রাস্তা ধরেই পায়ে পায়ে এগুচ্ছে সায়নী আর অরু। চাশমিশ আর এক্সট্রোভার্ট সায়নী বরাবরের মতোই এক মনে কথার দোকান খুলে বসেছে, ওদিকে ওর একটা কথাও অরু ভালোমতো মন দিয়ে শুনছে কিনা সেটা বোধ করা দুষ্কর। সায়নীর কথা মন দিয়ে না শোনার অবশ্য যথাযথ কারন আছে বৈকি।
ধবধবে শুভ্র রঙা চিকনকারী চুড়িদার সেই সাথে গ্রে রঙের উলের পাতলা সোয়েটার পরে পুরোদমে বাঙালি সেজেই ঘুরে বেরাচ্ছে অরু। ওদিকে সায়নীর পরনে স্কিনি জিন্সের সাথে ভারী কালো কোর্ট।
আজ রবিবার, মানে উইকএন্ড। এই মেঘলা শীতল উইকএন্ডের সকাল বেলা কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে কেবলই এপাশ থেকে ওপাশ ঘুরে শুয়েছিল অরু। তখনই শুরু হয় সায়নীর একের পর এক কল। যেহেতু অরুর মোবাইলটা ক্রীতিক ভে’ঙে ফেলেছে তাই অনুর নাম্বারেই আপাতত কলের ঝড় তুলে ফেলেছে সায়নী।শেষ মেশ না পেরে বিদেশী আদলের একমাত্র বাঙালী বান্ধবীর কথা রাখতেই সকাল সকাল ক্যাম্পাসে চলে এসেছে অরু। সায়নীর আর্জি একটাই আজ বাইক রেসিং ক্লাবে রাইডিং কম্পিটিশন আছে, জেকে ও থাকবে সেখানে। আর সায়নী অরুকে সাথে করে সেখানে নিয়ে তবেই যাবে।
প্রথমে একটু গাইগুই করলেও পরক্ষণে ক্যাম্পাসে এসে সায়নীর কথা রক্ষার সার্থকতাটা ধরতে পেরেছে অরু। মনে মনে অনেকটা খুশিও হয়েছে সায়নীর প্রতি, তার কারণ সকাল সকাল ক্যাম্পাসের

গেইটেই দর্শন মিলেছে পছন্দের শ্যাম পুরুষের।অরুই নিখিল কে আগে দেখেছে, তবে কথা বলার সাহস পায়নি, কিন্তু নিখিল যখন অরুকে দেখলো, তৎক্ষনাৎ হাক পেরে নাম ধরে ডেকে উঠল সে,— এই যে, অরোরা?

অরুকে আর পায় কে,দ্রুত পেছন ঘুরে সামনে গিয়ে দাড়ালো নিখিল ভাইয়ের,

অরু কাছে আসতেই নিখিল শুধালো,

— অরোরা তুমি ঠিক আছো? না মানে কালকে ওভাবে।

কালকের কথা মনে পরতেই,ওর দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে নিখিল ভাই আর সেই বিদেশিনীর একান্ত ব্যাক্তিগত উপচে পড়া হাসিখুশি মূর্হুতের ঘটনা। কেন এতো হাসছিল ওরা দুজন?আর মেয়েটাই বা কে? নিখিল ভাইয়ের বন্ধু? শুধুই কি বন্ধু?অপার্থিব কিছু অপরিপক্ক প্রশ্ন আর কিছু অনাকাঙ্খিত মূহুর্তের কথা মাথায় কড়া নাড়ছে বারংবার। যার দরুন অরুর হাস্যোজ্জ্বল মুখটা চুপসে এইটুকুনি হয়ে গেলো মূহুর্তেই।নিখিল ভাইয়ের এতোটা আগ্রহী প্রশ্নের জবাবটাও আর মুখ ফুটে দেওয়ার ইচ্ছে জাগলো না মনে।

কিন্তু নিখিলের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তখন একটুও প্রস্তুত ছিলোনা অরু। ও ভাবেনি,এরপর নিখিল যেটা বলবে তাতে ওর এসব অযাচিত ছেলেমানুষী দুশ্চিন্তা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে ক্ষনিকের মাঝে। তবে কথায় আছেনা বাস্তবের চেয়ে ভাবনারা একধাপ পিছিয়ে থাকে, সেসময় তাই হলো,

অরু কথার কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে নিখিল আগ বাড়িয়েই বললো,—নেক্সট উইকএন্ডে আমাদের ব্যাচের একটা ছোটখাটো রিচার্জ টীম যাবে পাহাড়ে। বেশি দূরে নয় কাছেই এক দিনের ট্যুর।

ফ্রিতে এডভেঞ্চার আর ঘোরাঘুরির সুযোগটা কেউ মিস করতে চাচ্ছে না তাই অনেক জুনিয়ররাও যাবে। তুমিও চাইলে যেতে পারো। আমি ব্যাবস্থা করে দেবো।

লাজুক অরু ঠাস করে বলে দিতে পারলো না যে হ্যা হ্যা নিখিল ভাই, আমিও যেতে চাই আপনার সাথে। তার বদলে ছোট্ট করে হুম শব্দটা উচ্চারন করে শুধু একপাশে মাথা কাত করে সম্মতি জানালো ও ।

অরুর সম্মতি জানাতে যতক্ষণ, তারপর আর এক দন্ডও দাঁড়ালো নিখিল। প্রচন্ড বেগে একপ্রকার তাড়া দেখিয়ে তৎক্ষনাৎ যায়গা ত্যাগ করলো সে।সেই তখন থেকে জেকে স্যারের গুনগান করে যাচ্ছে সায়নী, মাঝেমধ্যে নিজের কথার সামিল করতে দুএকবার অরুকেও বলছে,

—তাই না বলো?

অরু সায়নীর কথা মতো হুম, হা করছে ঠিকই তবে ওর মনে চলছে অন্যকিছু। সেটাও অন্যকাউকে নয় সয়ং ক্রীতিককে নিয়েই। ও ভাবছে ট্যুরের কথাটা আপা জানলে যেমন তেমন, বকা ঝকা করে হলেও শেষমেশ যেতে দিতে রাজি হবে। কিন্তু ক্রীতিক? এই ঘার ত্যারা লোকতো জীবনেও রাজি হবেনা। উল্টে এমন ভাবে চোখ রাঙাবে,যে ভ'য়ে অরুর ছোট্ট হৃদপিন্ডটা ওখানেই কাজ করা বন্ধ করে দেবে। তাহলে সাধ করে নিখিল ভাই কে যে আশ্বাস দিয়ে এলো তার কি হবে??—এ্যাই অরু, শুনতে পাচ্ছো আমার কথা??

হুট করে সায়নীর কনুইয়ের গুঁতোয় সম্বিত ফিরে পেলো অরু, ও কাঠেল পুতুলের ন্যায় উপর নিচ হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,

— হ্যা হ্যা, শুনছি বলো বলো,তারপর?

সায়নী ভ্রু কুচঁকে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে বলে,
—কিসের তারপর?? দেখো আমরা চলে এসেছি, অলরেডি রেসিং শুরু হয়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি এসো।
রাস্তার দু’ধারে থ্রি’লিং প্রিয় মানুষদের শ’য়ে শ’য়ে ভীর। সেই গাদাগাদি আর ভীরের ফাঁক গলিয়ে ওরা দুজনও যায়গা করে নিলো রাস্তার এক কোনে। ওরা যতক্ষণে এসেছে ততক্ষণে বাইকার’রা ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতায় ব্যাস্ত।
অডিয়েন্সদের পাশে এসে দাড়াতে দাড়াতে অরু শুনতে পেলো জেকে নামের উচ্ছ্বাস। তারমানে সায়নী শুধু একা নয় এরাও রাইডার জেকের ভক্ত।
আচ্ছা এরা কেন এতো পাগল ক্রীতিকের জন্য? এরা কি আদৌও জানে ক্রীতিক কতোটা নির্দ’য়? ক্রীতিক মোটেই এই জনপ্রিয়তা ডিজার্ভ করেনা, চারিদিকে জেকের জয়জয়কার শুনে এসব উল্টোপাল্টা কথায়ই ভাবছিল অরু। তখনই সায়নী আবারও অরুকে ডেকে বলে,— ওমাই গড, ওমাই গড দেখো দেখো এ্যাগেইন চ্যাম্পিয়ন।
অরুও এবার সচকিত হয়ে বাইক গুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সকালের উরন্ত পেজা তুলোর মতো শুভ্র মেঘ এতোক্ষনে কালো মেঘে পরিনত হয়েছে। চারিদিকে মেঘ ভেজা দমকা হাওয়া আর ঝিরঝিরি বৃষ্টিতেই বাইক রাইডিং এর শেষ রাউন্ড শেষ হয়েছে মাত্র। রেচিংএর মেইন পয়েন্ট ওদের থেকে খানিকটা দুরে হবার কারণে চোখ উঁচিয়ে দেখতে হয় সেখানটা। তবে এতোটা দূর থেকেও স্ট্যান্ড করানো বাইক গুলোর মধ্যে সারির প্রথম

বাইকটাতে বসা ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেট আর ব্ল্যাক হেলমেট পরিহিত বাইকার টাই যে ক্রীতিক সেটা বুঝতে বাকি নেই অরুর। কারণ জেকের বডি স্ট্রাকচার সবার থেকে আলাদা। কাল্পনিক গ্রীক গডের বাস্তব চিত্র বলা চলে। এক ঝলকে দেখলে মনে হবে উপরওয়ালার শখের কারুকাজ এই জায়ান ক্রীতিক নামক সুদর্শন পুরুষটা। তবে ক্রীতিকের সৌন্দর্য নিয়ে অরুর এসব অগভীর ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলোনা, তার আগেই চোখের সামনে দৃশ্যমান হলো এক অপ্রীতিকর নি'ন্দনীয় ঘটনা। অরুদের থেকে বেশ অনেকটা দুরে রাস্তার ঠিক মাঝখানে ফেলে অন্য এক প্রতিযোগিকে হ'কিস্টিক দিয়ে ইচ্ছে মতো মার'ছে ক্রীতিক। ওর মা'রে'র গতিবেগ এতোটাই বেশি যে লোকটা উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ টুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না। কিন্তু এভাবে মা'রা'র কারন কি??ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ইতিমধ্যে মুশল বারিধারায় রুপ নিয়েছে। আশেপাশের জটলা পাকানো ভীর ছাড়িয়ে অনেকেই যায়গা করে নিয়েছে কোনো না কোন শুকনো ছাউনি অথবা ছাতার নিচে। তবে অরুর আপাতত বৃষ্টিতে খেয়াল নেই আর না আছে ক্রীতিকের। ঝুম বৃষ্টিতে কথা শোনার যো নেই মোটে,তবুও অরুকে উদ্দেশ্য করে সায়নী চেঁচিয়ে বললো,
— অরু, দ্রুত চলো, ভিজে যাচ্ছি। কোন একটা ছাউনি খুজে তার নিচে গিয়ে দাঁড়াই।
অরুর কান অবধি সে কথা পৌঁছালো কি না সন্দেহ, আর না'তো ও কোন ছাউনির নিচে গিয়ে আশ্রয় নিলো। বরং ঝুম বৃষ্টির মাঝেই দ্রুত এগিয়ে গেলো সামনের প্রসস্থ রাস্তার দিকে। এগিয়ে যেতে শুনতে পেলো, অনেকেই বলাবলি করছে,

জ্যাকসন নামক বাইকারটা জেকের মায়ের নাম করে কিছু একটা বাজে গা'লি দিয়েছে, আর তাই লোকটা সেই ছোট্ট একটা গা'লি দেওয়ার মাশুল চোকাচ্ছে গত আধঘন্টা যাবত এক নাগাড়ে হ'কিস্টিকের মা'র খেয়ে। আশ্চর্যের বিষয় হলো কেউ ক্রীতিককে থামাচ্ছে না পর্যন্ত। এইসব দৃশ্য কি এদেশের মানুষের কাছে এতোটাই সাভাবিক আর উপভোগ্য?
— দয়ামায়'হীন নি'র্দয় আমেরিকান।
নিজের আ'ক্রোশ দমিয়ে রেখে মনে মনে কথাটা ছাড়লো অরু।.ওদিকে নিজের সর্ব সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জ্যাকসনের শরীরে একের পর এক হ'কিস্টিক ভা'ঙছে ক্রীতিক।মা'রতে মা'রতে ওর নিজ হাতের অবস্থাও বেগতিক, কিন্তু সেইসবে বিন্দুমাত্র নজর নেই ওর। আপাতত নিজের দমিয়ে রাখা জি'দ আর তপ্ত মস্তিষ্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ব্যাস্ত ও। কেন যেন মনে হচ্ছে এই মা'রটা জ্যাকসনের বহু দিনের পাওনা। রেসিং ক্লাবে ক্রীতিককে টেক্কা দেবার মতো রাইডার যদি কেউ থেকে থাকে সেটা জ্যাকসন। রাইডিং-স্ট্যান্ডিং সব কিছুতেই বেশ পারদর্শী জ্যাকসন। তবে এ যাবত কোন ম্যাচেই জেকে কে হারাতে না পারার জি'দটা ভেতরে ভেতরে ওর রয়েই গিয়েছে বরাবর। সামনা সামনি বুঝতে না দিলেওও,নিজ দেশের রেচিং ক্লাবে ফরেইনার একটা ছেলের এতোটা জনপ্রিয়তা জ্যাকসন মোটেই সহ্য করতে পারতো না, সেই যের ধরেই পেছনে পেছনে নানা কৌশলে বিভিন্ন ভাবে ক্রীতিকের ক্ষ'তি করার ফন্দি এঁটেছে বহুবার। তবে একটা স্ট্রং বন্ধু মহল আর ক্রীতিকের সুকৌশলী বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্কের কাছে সেগুলো বরাবরই ফে'ইল করে গেছে। ক্রীতিক ভালোভাবেই জানতো কাজ গুলো কে

করছে, বা কার দ্বারা ঘটছে। তবে এসব খুব একটা গায়ে লাগাতো না ও। বরং পিঠ পিছনেই দিয়ে যেতো একের পর কৌশলী দাবার চাল। কারণ ক্রীতিকের কাছে ওর করা ফন্দি গুলো হাস্যকর ঠেকতো বরাবরই। সেইসাথে মা'রাত্নক ইনটারেস্টিং ও মনে হতো। কারন ক্রীতিক,অর্নব,এলিসা,আর সায়র এর থেকেও বড়বড় দাবার চাল চেলে অভ্যস্ত।

তবে আজ এই মূহুর্তে জ্যাকসন অস্ফুটে যেই শব্দটা উচ্চারণ করেছে তার মূল্য তো ক্রীতিক ওকে হাড়েহাড়ে বুঝিয়েই ছাড়বে। আজ মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল ক্রীতিকের, ওই জন্যইতো ক্লাবের কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল জোস একটা রাইড করতে। সবার উচ্ছ্বাসে জোয়ার দিতে বাইক রাইডও করেছিল প্রায় দু'শো কিলোমিটারের আঁকাবাকা অমসৃণ রাস্তা এবং শেষমেশ প্রতিবারের মতো আজও চ্যাম্পিয়ন তকমাটাও ওর গায়েই লেগেছিল। সব কিছু সাভাবিক,ক্রীতিকের মুড ও ঠিকঠাক। তখনই ব্যাথর্তা হটাতে জ্যাকসনের মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে অনাকাঙ্ক্ষিত দুটো শব্দ।—
মা*** ফা'কিং বা'স্টা'র্ড।

জ্যাকসন নিজেও বুঝতে পারেনি যে ক্রীতিক কথাটা শুনে ফেলবে। তবে ওর ব্যাড লাক, ক্রীতিক কথাটা স্পষ্ট ভাবে শুনতে পায়, ব্যাস, তৎক্ষনাৎ ক্লাবের মধ্যে থেকে হ'কিস্টিক এনে উইথ আউট এনি ওয়া'র্নিং ওকে ইচ্ছে মতো মা'রতে শুরু করে ক্রীতিক। না নিজে মুখ দিয়ে কোন একটা শব্দ করেছে আর না জ্যাকসনকে করতে দিয়েছে। একেএকে ওর পি'ঠে ভে'ঙে'ছে চারখানা সরু ধাঁচের মজবুত কাঠের হ'কিস্টিক। তবুও যেন মস্তিষ্কটা শান্ত হবার নাম নিচ্ছে মোটেই। তবে ওর অ'শান্ত মস্তিষ্ক খুব বেশিক্ষন আর

অ’শান্ত রইলো না। বেশ খানিকটা পরেই চলমান উত্ত’প্ত রা’গের বহিঃপ্রকাশে খুব বড়সড় একটা বাঁধা প্রাপ্ত হলো ক্রীতিক।
খুব পরিচিত আর আপন একটা রিনরিনে মায়াভরা কন্ঠস্বর ভেসে এলো ক্রীতিকের দুই’কর্ণকুহরে।
ওর আ’ক্রম’নাত্তক পেশিবহুল বাহুটা দুইহাত দিয়ে আগলে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে অরু বললো,
— কি করছেন,মে’রে ফেলবেন নাকি লোকটাকে?ক্রীতিক তরিৎ গতিতে ঘুরে তাকালো। কেবল পরিচিত নয়, শুধু আপনও নয়, বক্ষপিঞ্জনের গহীনে লুকিয়ে রাখা আকাশসম অনুভূতির ছড়াছড়ি, আর অজনা বেসামাল উন্মাদনা যে মেয়েটাকে নিয়ে, বয়স,সম্পর্ক সব কিছুর মাথা খেয়ে বছর ত্রিশের হৃদয়টা যার অনুপস্থিতিতে আনচান করে,যাকে দেখলে সবার অগোচরে অবাধ্য, অপ্রতিরদ্ধ ইচ্ছেরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বারংবার এখন এই মূহুর্তে সেই পিচ্চি অষ্টাদশীকে দেখেই, মস্তিষ্কে হলহলিয়ে বইতে থাকা জল’ন্ত আ’গ্নেয়গি’রির লাভাটা মূহুর্তেই দপ করে নিভে গেলো জায়ান ক্রীতিকের।
ধরনীতে ঝুম বৃষ্টি তখনও একই গতিতে বহমান। অরুর চোখ,নাক, ঠোঁট সব কিছু চুইয়ে চুইয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি কনারা। সফেদ রঙা চুড়িদারটা ভিজে একাকার। ঠান্ডার তোপে তিরতির করে কাঁপছে সরু চিবুক আর গোলাপি রঙা ওষ্ঠাধর। বৃষ্টি ভেজা অরুকে দেখে কয়েকমূহুর্তের জন্য থমকে গেলো ক্রীতিক। সব ছেড়ে ছু’ড়ে হুট করেই রা’গ হতে লাগলো বহমান বৃষ্টি কনাদের উপর। যেগুলো ও আজ পর্যন্ত ছুয়ে দেখতে পারলো না।সেগুলো কিনা বৃষ্টি কনারা এতো সহজে ছুঁয়ে দিচ্ছে? আশ্চর্য ।বৃষ্টির সাথে ক্রীতিকের

ক্রো'ধ বেশিক্ষণ টিকলো না বৈকি। কারন তার আগেই অরু আবারও কথা ছু'ড়লো ওর পানে।
— কেন এভাবে মা'রছেন ওনাকে? আপনার দয়ামায়া নেই?
অরুর কথায় ক্রীতিক পেছনে ঘুরলো, দেখলো একটা বি'শ্রী কপট হাসি ঝুলিয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাকসন। জ্যাকসনের হাসিটা চোখে পরতেই এতোক্ষণের ভ্রম ছুটে গেলো ক্রীতিকের। ও তৎক্ষনাৎ ক্ষী'প্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো অরুর দিকে। যেন চোখ দিয়েই ঝ'লসে দেবে অরুকে। ক্রীতিকের অ'গ্নিমূর্তি দেখে অরু আড়ালে শুষ্ক ঢোক গিলে থেমে গেলো।
ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে বললো,
— তুই এখানে কি করছিস? কে নিয়ে এসেছে তোকে?? ক্রীতিকের কপাল জুড়ে হাজারো চিন্তার ভাঁজ।
অরু এবার পুরোপুরি নিশ্চুপ, মানবতা দেখাতে গিয়ে যে নিজেই ফেঁ'সে গিয়েছে এতোক্ষণে তা বোধগম্য হলো ওর।
ক্রীতিক কিছু একটা ভেবে ক্লাবের একজন কে দিয়ে একটা হেলমেট আনালো, তারপর ওটা অরুকে পরিয়ে বাইক স্টার্ট দিতে দিতে বললো,—দ্রুত বাইকে ওঠ।
অরু করুন দৃষ্টিতে জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে মিনমিনিয়ে বললো,
— ওনাকে এভাবে, ফেলে রেখে, না মানে যদি কিছু হয়ে যায়।
— ওর ব্যাবস্থা প্রত্যয় করবে, আমি বলে দেবো, তুই ওঠ।
বৃষ্টির মাঝেই চারদিকে তাকিয়ে সবাইকে একবার পর্যবেক্ষন করে নিলো অরু। আশেপাশে যত মানুষ, যে যেখান থেকে পারছে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই নিশ্চয়ই অরুর উপর বেজায় চটে গিয়েছে, কিন্তু এই মূহুর্তে ওর হাতে কিছুই নেই, এখন কথা না

শুনলে নির্ঘাত এখানে দাঁড়িয়েই ক্রীতিকের হাতে মা'র খেতে হবে, তাই অপারগ অরু, চুপচাপ উঠে পরে বাইকের ব্যাক সিটে। মেয়েদের মতো করেই কাঁচুমাচু হয়ে বসেছে ও। তখনই নিজে হেলমেট পরতে পরতে ক্রীতিক বলে,—ধরে বস।
অরু, খুব সংকোচে ক্রীতিকের জ্যাকেটটা একটু খা'মচে ধরে। কিন্তু বাইক তার যায়গা পরিবর্তন করতেই ও এক প্রকার হুমড়ি খেয়ে পরলো ক্রীতিকের পিঠের উপর।
— ধরে বসতে বলেছিনা?
ক্রীতিকের ধম'ক খেয়ে এবার সত্যিই ওর কাঁধে হাত রাখলো অরু। অরুর হাতের আর কানের ছোট্ট অলংকার গুলো থেকে রিনঝিন আওয়াজ হচ্ছে। খুব কাছাকাছি বসাতে সেই আওয়াজ সোজা গিয়ে ক্রীতিকের হৃদয়ে লাগছে, সেই সাথে অরুর বৃষ্টি ভেজা চুল আর শরীর থেকে ভেসে আসা মেয়েলী সুঘ্রানে কেন যেন ওর দমব'ন্ধ হয়ে আসছে। ইচ্ছে করছে অরুকে একান্তে কাছে পেতে খুব কাছে।যতটা কাছাকাছি এলে অরুর আর ক্রীতিকের মাঝে সেন্টিমিটার দূরত্ব ও ঘুচে যাবে, ঠিক ততটা। কিন্তু এই মূহুর্তে সেটা সম্ভব নয়, আর না অরুকে এতো কাছে বসিয়ে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব।তাই মনের মধ্যে একান্ত গোপনে বেড়ে ওঠা অবাধ্য বাসনা গুলোকে দূর করার উদ্দেশ্যে, রাইড করতে করতেই নিরবতা ভা'ঙে ক্রীতিক,একটু আগের সেই গমগমে রা'গি আওয়াজের পরিবর্তে নরম আওয়াজে অরুকে শুধায়,— আচ্ছা অরু, আমি যে এতোগুলা বছর দুরে ছিলাম তোর আমাকে মনে পরেনি কখনো?

ক্রীতিকের কথার পিঠে অরু কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না, কারন ক্রীতিক যখন দেশ ছাড়ে তখন অরু নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে, কতইবা বয়স হবে দশ কি এগারো।
অরু নিশ্চুপ দেখে ক্রীতিক আবারও শুধায়,
— বাবার মৃ'ত্যুতে যখন গিয়েছিলাম, তুই আমাকে দেখেছিলি?
এবার অরু সময় নষ্ট না করেই উত্তর দিলো।
—কি করে দেখবো, আপনিতো বাড়িতে যাননি।
ক্রীতিক জবাবে একটু বাঁকা হেসে বললো,
— আমি কিন্তু তোকে দেখেছি, ঠিক আজকের মতোই একটা সাদা ড্রেস পরেছিলি। তোর মা আমার বাবার জন্য কাঁ'দছিল খুব। তুই আর অনু তার পাশেই দাড়িয়ে ছিলি।
ক্রীতিকের কথায় অরু চমকালো, কারন ওর দেওয়া একটা বর্ননাও ভুল নয়। অরুর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো,—আপনি কি করে দেখলেন?
কিন্তু ও জিজ্ঞেস করতে ভ'য় পাচ্ছে, পাছে না আবার ক্রীতিক রে'গে গিয়ে এই বৃষ্টির মাঝেই ওকে বাইক থেকে নামিয়ে দেয়। ওদিকে অন্তহীন কৌতুহল গুলো মাথার মধ্যে কিলবিল করছে অযথাই। তবুও জিজ্ঞেস করার সাহস নেই। কি বলতে কি বলবে আবার রেগে মেগে আ'গুন হয়ে যাবে। তার থেকে চুপচাপ থাকাই শ্রেয়।
অরুর কূলহীন ভাবনার মাঝেই মাঝ রাস্তায় বাইকের ব্রেক কষলো ক্রীতিক। ক্রীতিকের এহেন কান্ডে অরুর আত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। মনে মনে ভাবছে,

— এই রে চুপ থেকেও ভুল করলাম নাকি? এই ঝুম বৃষ্টিতে মাঝরাস্তায় গেট আউট বলে নামিয়ে দিলে , কোথায় যাবো আমি?—কি হলো নাম! কাঁধ হালকা পেছনে ঘুরিয়ে বলে ওঠে ক্রীতিক।
জবাবে অরু মুখ চোখ কালো করে বললো,
— না মানে এই বৃষ্টির মাঝে...
অরু কথা শেষ করার আগেই ক্রীতিক বলে,
— হ্যা বৃষ্টির জন্যই তো, সামনে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, তারউপর এতো ভিজলে জ্বর চলে আসবে নিশ্চিত।
— না না আমি ঠিক আছি।
— আমি তোর কথা বলিনি, আমার কথা বলেছি।
এই বলে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটা ক্যাফের করিডোরে গিয়ে আশ্রয় নিলো ক্রীতিক। অরু পেছন পেছন যেতে যেতে ঠোঁট উল্টে মিনমিনিয়ে বললো,— আমার কথা কেনইবা বলবেন? নিজেকে ছাড়া আর কিছু বোঝেন নাকি আপনি? সা'র্থপর লোক।
অরু এগিয়ে গিয়ে ক্রীতিকের পাশেই দাঁড়ালো। বৃষ্টি আর বাতাসের গতিবেগ এতোই বেশি দেখলে মনে হবে দিন দুপুরে রীতিমতো ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে।
কাচেঁর দরজার ভেতরে ঝিঁমুতে থাকা স্টাফ ছাড়া পুরো এরিয়াটাই ফাঁকা পরে আছে। চারিদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে অরুর চোখ পড়লো ক্রীতিকের হাতের দিকে,বৃষ্টি আর র'ক্ত একাকার হয়ে টুপটুপ করে হাত দিয়ে ঝরে পরছে র'ক্ত ভেজা পানি।

অরু সেদিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে মনেমনে বললো,— আশ্চর্য এই লোকের অনুভূতি শক্তি নেই নাকি? কতক্ষণ ধরে এভাবে র'ক্ত ঝরছে কে জানে??
কিছু একটা ভেবে ব্যাগ থেকে নিজ হাতের নকঁশি কাজ করা শুকনো রুমালটা বের করে একটু সাহস করেই ক্রীতিকের র'ক্তা'ক্ত হাতে বেধে দিলো অরু। ব্যাথা যায়গাতে একটু আরাম অনুভব হতেই নিজ হাতের দিকে চোখ দিলো ক্রীতিক। দেখলো সুতোয় কাজ করা একটা মেয়েলি রুমাল ওর ক্ষ'তস্থানে খুব সাবধানে বেধে দিচ্ছে অরু।
ক্রীতিক বাধা দিলোনা, এমনকি টু শব্দ ও উচ্চারণ করলো না, বরং অরু নিজের কাজ শেষ করে উপরে মাথা তুলতেই চোখ রাখলো অরুর মায়াবী চোখ জোড়ায়।
ক্রীতিকের চোখের ভাষা আপাতত পড়তে পারছে না অরু, ক্রীতিক রে'গে গেলো কিনা সেটাই আপাতত ভাবছে ও। ক্রীতিক ধীর গতিতে নিজের মাথাটা অরুর মুখের সামনে নিয়ে এলো। অনেকটা কাছে, যতটা কাছে এলে অরুর শরীরের মিষ্টি সুঘ্রানটা ক্রীতিক খুব সহজে অনুভব করতে পারে।
অরু ভ'য় পেয়ে একটু অস্পষ্ট সুরে বললো,—রর..র'ক্ত ঝরছিল তাই ভাবলাম। আপনার আনইজি লাগলে খুলে ফেলতে পারেন, ক..কোন সমস্যা নেই।
অরুর কথায় পাত্তা না দিয়ে চোখে একরাশ মাদকতা নিয়ে অরুর দু'চোখে চোখ রেখে, নিজের মুখটা অরুর কানের খুব কাছে নিয়ে ক্রীতিক হাস্কি স্বরে বললো,

— এতো বেশি দূর্বল করে দিসনা অরু। নয়তো ক্ষ’তিটা তোরই হবে। আমার হাত থেকে নিজেকে বাঁচা’তে পারবি না। বিশ্বাস কর, আমি খুব করে চাইছি, আজকে অন্তত আমার হাত থেকে বেঁচে যা তুই। ক্রীতিকের নেশা ধরা কন্ঠস্বর আর তপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে কাঁপছে অরু। কনকনে ঠান্ডার মাঝে হুট করেই কেমন গড়ম হয়ে উঠলো শরীরটা। জীবনে প্রথম কোনো ছেলে এভাবে এতোটা কাছাকাছি এসেছে অরুর যার দরুন ভেতরে তোলপার হয়ে যাচ্ছে অজানা অনুভূতির দল। এই মূহুর্তে অরুর জন্য মেয়েলী অনুভূতি গুলো সামলানো বেশ মুশকিল। এককথায় দূর্বিসহ। একটা নরম ভেজা অনুভূতি হৃদয় ছুয়ে যাচ্ছে বারংবার , এমন অনুভূতি গুলো আগে কখনোই হৃদয়ে অনুভব করেনি অরু। হুট করেই ক্রীতিকের কাছ থেকেই কেন? কই নিখিল ভাই সামনে এলেতো এমনটা হয়না। তলপেটে হুটহাট প্রজাপতি উড়াউড়ি করেনা। তাহলে জায়ান ক্রীতিকের মতো অপছন্দের লোকটার সান্নিধ্যেই কেন এমন হয়? এটাতো ঠিক নয়, মোটেই ঠিক নয়। ও এই নিস্তব্ধতা আর বেসামাল অনূভুতি গুলোকে মাথা থেকে ঠেলে সরিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো,— আপনি কেন আমাকে মা’রতে যাবেন, কি করেছি আমি??

— কখন বললাম আমি তোকে মা’রবো?

— এই যে বললেন, আপনার হাত থেকে নিজেকে বাঁ’চাতে পারবো না।

অরুর কথায় ক্রীতিকের ঠোঁটে খেলে গেলো একটা চমৎকার বাঁকা হাসি। ও অরুর থেকে নিজের দূরত্ব খানিকটা বারিয়ে হট করেই অরুকে হ্যাচকা টানে পেছনে ঘুরিয়ে দিলো, তারপর একটানে ওর

লম্বা চুল থেকে গার্ডারটা খুলে নিলো নিজ হাতে। সঙ্গে সঙ্গে অরুর দীঘল কালো একঝাঁক ভেজা চুল আঁচড়ে পরলো সমস্ত পিঠ জুড়ে। অরু সাবধানে পেছনে ঘুরে বললো,

— চুল কেন খুললেন??

ক্রীতিক ভাবলেশহীন কন্ঠে জবাব দিলো,

—বৃষ্টির দিনে সাদা কেন পরেছিস??

ক্রীতিকের কথার মানে বুঝতে পেরে প্রচন্ড লজ্জায় নিজের দু-হাত ভাঁজ করে নিলো অরু। তারপর বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো,

— আর অপেক্ষা করতে হবে না, চলুন বাসায় যাবো।

ক্রীতিক আর কিইবা করবে,মনে মনে ভাবলো, অরুকে এভাবে সরাসরি লজ্জা দেওয়াটা তার উচিৎ হয়নি, যতই হোক অরু ওর থেকে বয়সে অনেক বেশি ছোট।যা বলেছে বলেছে এখন আর করার কিছুই নেই, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ও নিজেও এগিয়ে গিয়ে বাইকে বসে পরলো।বাড়িতে আসতেই অরু সোজা চলে গেলো নিজের রুমে। রুমে ঢুকতেই দেখতে পেলো অনু ব্যালকনিতে দাড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে আর মুঠো ফোনে কারও সাথে কথা বলছে। অরু সেদিকে খুব একটা নজর দিলোনা, কারণ অরু জানে ফোনের ওপাশের লোকটা কে।তাই সোজা চলে গেলো ওয়াশরুমে।

একটা আরামদায়ক হট বাথ শেষে চুল মুছতে, মুছতে বের হয়ে দেখলো, মাত্রই কথা শেষ করে রুমে এসেছে অনু। আজ রবিবার তাই ওর পার্টটাইম নেই, তারউপর আবহাওয়ার জন্য হসপিটালেও যেতে পারেনি সকালে। তাইতো আজ অসময়ে বাসায় আছে অনু। অরু বেরুতেই অনু শুধায়,— এভাবে ভিজেছিস কিকরে?

অরু খাটে বসতে বসতে বললো,
— সে অনেক কথা পরে বলবো। তার আগে তুই বলতো আপা, ক্রীতিক ভাইয়ার মা কোথায়??
অরুর অযাচিত প্রশ্নে অনুর চোখ বড়বড় হয়ে গেলো, ও সচকিত হয়ে অরুকে বললো,
—- তুই হঠাৎ এসব কথা নিয়ে কেন পরলি, তারউপর ক্রীতিক ভাইয়া এখন বাড়িতেই আছেন, উনি ওনার মায়ের নামটাও শুনতেও পারেননা।
অরু মনে মনে বললো, সত্যিই কি শুনতে পারেননা না? তাহলে মাকে নিয়ে কথা বলায় আজ লোকটাকে ওভাবে মা'রলো কেন?— কিরে কি ভাবছিস?
— আপা, বলনা ওনার মা কোথায়?
অনু একটু ভাবুক হয়ে বললো,
—- আমি খুব বেশি কিছু জানিনারে অরু, মায়ের কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি, ওনার মা বাঙালি নন, আমেরিকান বংশভূত কোন বিদেশিনী। শুধু বিদেশিনীই নন শোবিজ জগতের কোন নামকরা তারকা। যৌ'বন কালে ক্রীতিক ভাইয়ার বাবা যখন বিদেশে পড়াশোনা করতে আসেন তখনই নাকি ভালোবেসে বিয়ে করেন তারা।
অরু কৌতূহল নিয়ে শুধালো,
— তাহলে উনি চলে গেলেন কেন??
অনু দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে বলে,
— উনি ভালোবেসে বিয়ে সংসার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার কিংবা ফ্যান্সি লাইফস্টাইল কোনোটারই মায়া ছাড়তে

পারেননি পরবর্তীতে, তাই খুব ছোট বেলাতেই ক্রীতিক ভাইয়াকে রেখে আবারও নিজ গন্তব্যে পারি জমান তিনি।
অরু, জ্ঞানীদের মতো মাথা দুলিয়ে বললো,— ওই জন্যই ক্রীতিক ভাইয়া দেখতে পুরোপুরি বাঙালিদের মতো না। মনে হয় নানা বাড়ির চেহারা পেয়েছে।
অনু ঠোঁট উল্টে বললো,
— হবে হয়তো, কিন্তু তুই হঠাৎ এসব নিয়ে পরলি কেন??
ততক্ষনে বিড়াল ছানা ডোরা এসে অরুর পায়ের কাছে লেজ নারছে।
অরু ডোরাকে কোলে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো,
— তুই থাক আমি একটু আসছি।
— আরে কোথায় যাচ্ছিস? চুল থেকে পানি ঝরছে তো, আয় মুছিয়ে দিই। ঠান্ডা লেগে যাবে তো।
পেছন থেকে হাক পেরে যাচ্ছে অনু। তবে অরু আর তাতে কান দিলো না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। ডোরাকে কোলে নিয়েই হল রুমে এলো অরু। কিন্তু যখন দেখলো হল রুমে কাউচের উপর ক্রীতিক বসে আছে,তৎক্ষনাৎ ডোরাকে কোল থেকে নামিয়ে অন্যদিকে ভাগিয়ে দিলো ও। ডোরাকে বিদেয় করতে করতে অরু খেয়াল করলো ফাস্টএইড বক্স নিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে ক্রীতিক।
দেখে মনে হচ্ছে একটু আগেই শাওয়ার নিয়েছে, পরনে ব্লু হোয়াইট কম্বিনেশনে টিশার্ট আর থ্রী কোয়ার্টার। মাথার স্টাইলিস্ট চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালে লেপ্টে আছে। একটু আগে আপার বলা কাহিনি আর ক্রীতিকের ক্ষ’তযুক্ত হাত দেখে কোথায় যেন বড্ড

মায়া হলো অরুর। কেন যেন হুট করেই মনে হলো ক্রীতিকের এমন বেপরোয়া, র’গচটা, আর খামখেয়ালি সভাব গুলো নিতান্তই সাভাবিক।
অনেকক্ষণ ধরে অরুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিজের গলায় ঝোলানো তোয়ালেটা ওর মুখের উপর ছু’রে মা’রলো ক্রীতিক, ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলো,—- এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন, আমার কি রূপ বেরিয়েছে?
অরু মুখের উপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ক্রীতিকের পাশে বসে হাত বাড়িয়ে বললো,
—-দিন আমি অসুধ লাগিয়ে ব্যা’ন্ডেজ করে দিচ্ছি।
— তোর অনেক সা’হস বেড়ে গিয়েছে অরু। আজকাল আমাকে ভ’য় পাসনা দেখছি।
— তা বলতে পারেন।
ক্রীতিকের যা বলার ইচ্ছে হয় তাই বলতে দিয়ে, নিজের ছোট ছোট হাত দিয়ে ওর পুরুষালী হাতটাকে ধীরে ধীরে সফেদ রঙের ব্যা’ন্ডেজে মুড়িয়ে দিতে ব্যাস্ত হয়ে পরলো অরু।পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ধীরে ধীরে। গোধূলির আকাশ সিদূর রাঙা হয়ে আছে। গর্জে ওঠা সাগরের উত্তাল ঢেউ আর শঙ্খচিলের চিউ চিউ গলা ফাটানো আওয়াজ ভেসে আসছে ক্ষনে ক্ষনে। খানিক বাদে বাদে এলোমেলো বাতাসে বালু আস্তরিত সাগর কোল ভিজে যাচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের পানিতে। মাঝে মধ্যে সেই পানি পার ছাপিয়ে এসে আঁচড়ে পরছে মোমের মতো ফর্সা দু’পায়ে। পায়ের সাথে সাথে চিকচিকে বালুতে ভরে যাচ্ছে সুন্দর কারুকাজ করা রুপোলী নুপুর জোড়া। অনু সাগরের কোল ঘেষে নরম বালুতে , “দ” আকারে বসে

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাত দিয়ে ভেজা নুপুরটা নাড়াচাড়া করছে সেই কখন থেকে। এতোক্ষণ একাই বসেছিল। তবে একটু আগেই ওর পাশ ঘেঁষে বসে পরে প্রত্যয়। হাতে দুটো বাবল টি এর জার।
একটা বাবল টি'তে স্ট্র ঢুকিয়ে অনুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে প্রত্যয় বলে,— এখানকার বাবল টি অনেক ফ্যামাস,টেস্ট ইট।
অনু হাত বাড়িয়ে সেটা গ্রহন করে নিঃশব্দে একটা সিপ নেয়, আসলেই মজার চা টা। কিন্তু এতো বড় জারে চা কে খায়? ভাবছে অরু।
নিস্তব্ধতা কাটিয়ে প্রত্যয় বললো,
— এবার বলুন, হঠাৎ করে এই অধমের তলব কেন করলেন?
—- তার আগে আপনি বলুন, এতদূরে কেন নিয়ে এলেন? আমিতো স্রেফ হসপিটালের সামনে ওয়েট করতে বলেছিলাম।
অনুর জবাবে প্রত্যয় হেসে বলে,
— আপনি কি করে ভাবলেন যে, শুধু মাত্র দেখা করেই আমি ক্ষান্ত হবো?
প্রত্যয়ের কথার জবাবে, অনু একটু ব্যাথাতুর হেসে বললো,— আমার জীবনটা সামনে থেকে দেখতে যতটা সহজ আর সাবলীল মনে হয় ততটাও সহজ নয়,প্রত্যয় সাহেব। হুটহাট ডেটে যাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে একাকী সময় কাটানো কোনোটাই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।
আপনি হয়তো আরও একটা জিনিস জানেন'না আমি আন্ডার গ্রাজুয়েট। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি আমার।
— এগুলো আমাকে কেন বলছেন?

অনু রোবটের মতো জবাব দেয়,
— আমি নিজেও জানিনা আপনাকে কেন এসব বললাম, শুধু মনে হলো বলা উচিৎ।
প্রত্যয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো,
— তারমানে আপনি বুঝতে পারেন আমি আপনার জন্য কি ফিল করি তাইতো?
অনু জবাব দিলো না, বরং আগের ন্যায় মাথাটা এলিয়ে দিলো দু'হাটুর উপর, অহেতুক তাকিয়ে রইলো অন্যদিকে। তখনই কানে এসে পৌঁছালো প্রত্যয়ের ডিপ ভয়েস।—- আমাকে সময় দিতে হবেনা, আমার সাথে সারাদিন কথা বলতে হবে না,আমাকে প্রেমিক ভাবতে হবেনা, প্রেমিকার মতো আবদারও মেটাতে হবেনা, আমার খোঁজও নিতে হবে না, শুধু একটা শর্ত।
প্রত্যয়ের কথায় বেশ কৌতুহল বোধ করলো অনু, তাই এবার ঘাড় ঘুরিয়ে চাইলো প্রত্যয়ের পানে।
প্রত্যয় আগের মতোই সাগরের পানে চেয়ে বললো,
—- একজীবনে আমি ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের কথা কল্পনাতেও ভাবা যাবেনা।
— ব্যাস এইটুকুই?প্রত্যয়, অনুর হাটুতে এলিয়ে দেওয়া মুখের পানে চাইলো, সূর্যের নিংড়ানো শেষ আলোটুকু ধ'নুকের ন্যায় তীর্যক হয়ে আঁচড়ে পরছে অনুর চোখে মুখে। ঘন পল্লব বিশিষ্ট আঁখি দু'টো টল-টল করছে অশ্রু জলে। সোনালী আলোর ছটা আঁচড়ে পরে ছলছলে চোখ দুটো ঝিলিক দিচ্ছে বারবার, কয়েক সেকেন্ডের জন্য প্রত্যয়ের মনে হলো, এগুলো কোন চোখ নয়, বরং গহীন অভ্যায়রন্যের মাঝে দুটো জংলা দিঘী, কাঁচের মতোই স্বচ্ছ সেই

দিঘীর মায়াবী জল। এই দিঘীর মায়াতে হারিয়ে যাওয়া যায় অনায়সে অকপটে। প্রত্যয়ও নিজেকে হারিয়ে ফেললো অনুর দীঘির মতো টলটলে চোখে, অতঃপর অনুর প্রশ্নে আস্তে করে জবাব দিলো,
— ব্যাস এটুকুই।
অনু এবার সার্থপরের মতো বললো,
— বিপরীতে আমি কি পাবো??
— যা চাইবেন তাই।
অনু আড়ালে চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে বুক ভরে সাগর পারের স্নিগ্ধ বাতাস ভেতরে টেনে নিয়ে কিছুক্ষন চুপ করে রইলো। তারপর জিভ দিয়ে নিজের শুকনো অধর ভিজিয়ে বললো,— আমি আপনার শর্তে রাজি আছি প্রত্যয় সাহেব। বিনিময়ে আমারও যে কিছু চাই।
—কি চাই?
—- আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিবেন?এখন এই মূহুর্তে?
অনুর মুখশ্রী জুড়ে অসহায়ত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। খুব অল্প বয়সে অনেক বেশি ভারী দায়িত্ব বহন করতে করতে ক্লান্ত মেয়েটা। অথচ এতো কিছুর পরেও দিনশেষে নেিজর ছেলেমানুষী, নিজের আবদার কোনোটাই তুলে ধরার যায়গা ওর নেই। মা বোন থেকেও পৃথিবীর বুকে বড্ড একা এই অনু। ওর স্নেহের প্রয়োজন, দিন শেষে ক্লান্ত শরীরটাকে আগলে রাখার জন্য দুটো বাহুর প্রয়োজন। আর এই মূহুর্তে ও সেটাই চায়। অন্য কিছুই নয়, না কোনো শারীরিক চাহিদা, না কোনো কমিটমেন্ট, না সারপ্রাইজ, না কোন আয়োজন। কিচ্ছু না, ওর শুধু একটা বাহুডোর আর একটুখানি স্নেহের পরশ প্রয়োজন। আশ্চর্যজনক হলেও প্রত্যয় অকপটে তা দিতে সায় জানালো, তৎক্ষনাৎ উপর নিচ মাথা দুলিয়ে অনুকে নিজের

বাহুডোরে আবদ্ধ করে নিলো সে,পরম আবেশে একহাত বুলিয়ে দিলো অনুর মাথায়, আর তারপর আরো খানিক টা গভীর ভাবে ছুয়ে দিলো ওর ছোট্ট কপালটাকে। কপালের মাঝ বরাবর একটা উষ্ণ আর গভীর চুমু এঁকে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হলো প্রত্যয়।
তখনও সাগরের ঢেউয়ের তালেতাল মিলিয়ে বাড়ছিল অনুর কা'ন্নার গতিবেগ ।ড্রেসিং টেবিলের সামনে মুখ কালো করে অসহায়ের মতো বসে আছে অরু। ওর ঠিক সামনে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে দক্ষ হাতে, সুন্দর ফর্সা গালে একে একে প্রাইমার,ফাউন্ডেশন, কনসিলার,ব্ল্যাশ আর হাইলাইটারের আস্তরণ লাগিয়ে যাচ্ছে এলিসা।
অরু মেকআপ বলতে ওই সান্সক্রীন আর লিপস্টিক ছাড়া তেমন কিছু ব্যাবহার করেনি কখনো। করতে যে খুব ভালো লাগে তেমনটাও নয়। ওর কাছে সাজুগুজুর চেয়ে স্কিন কেয়ার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাইতো এতো ক্যা'মিক্যাল মিশ্রিত মেকআপ লাগানো হয়না কোনো কালেই।তবে আজ যখন এলিসা নিজে থেকে এসে বললো সাজিয়ে দিবে, তখন আর না করতে পারেনি অরু। চুপচাপ ভদ্রমেয়ের মতো গিয়ে বসেছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। মনেমনে ভাবছে ক্রীতিক আদৌও জানেতো যে ও এলিসার বার্থডে পার্টিতে যাচ্ছে।
এই খানিকক্ষণ আগের কথা। ভার্সিটি থেকে ফিরে মাত্রই ফ্রেস হয়ে বেরিয়েছিল অরু। বাড়িতে আপাতত ক্রীতিক, অনু কেউই নেই।অনু আজকাল দেরি করে ফিরলে অরু তেমন একটা ভাবেনা, কারন ওর দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যয় ভাইয়া অনুকে ঠিক দেখে রাখবে,কোনো অযাচিত বিপদে পরতেই দেবেনা। আর ক্রীতিকের

চিন্তা করে লাভ নেই, সে তো কখন ফেরে আবার কখন বেরিয়ে যায় তার কোন হদিসই জানেনা অরু।
কেউ নেই দেখে অরু একাই কিছু একটা সহজে বানিয়ে খাবে বলে কিচেনে পা বাড়িয়েছিলো কেবল। ঠিক তখনই আগমন ঘটে এলিসার। ভেতরে এসে এলিসা জানায়, আজ তার জন্মদিন। অরু সম্মোহনী হাসি দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালে,এলিসা বলে ও অরুকেই নিতে এসেছে। অর্নব নাকি এলিসার জন্য ছোটখাটো একটা পার্টির এ্যারেঞ্জ করেছে।
অর্নব পার্টি এ্যারেঞ্জ করেছে কথাটা মাথায় আসতেই খানিকক্ষন আগের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে, চট করে এলিসাকে প্রশ্ন করে বসে অরু,—- অর্নব ভাইয়া তোমাকে পছন্দ করে তাইনা আপু?
অরুকে খুব যত্ন করে আই শ্যাডো লাগিয়ে দিতে দিতে এলিসা বলে,
— পছন্দ টছন্দ কিছুইনা, পাগলটা হুদাই আমার পেছনে পরে আছে।
—- পছন্দ করে দেখেই পিছনে পরে আছে আপু,আর তাছাড়া তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে কে না পছন্দ করে?
— তুমি আমার থেকে কোনো অংশে কম নও অরু, বরং অনেকটা বেশি। তুমি ন্যাচারাল বিউটি, আর আমিতো সবসময় মেকআপে ঢেকে থাকি। তাছাড়া তোমার চুল দেখেই তোমার স্বামী তোমার প্রেমে পরে যাবে, আ'ম ড্যাম সিওর।
অরু লাজুক হেসে বলে,—আপসোস কেউ পরলো না।
—-পরবে পরবে, আর একটু বড় হও ঠিক পরবে, তখন ক্রীতিকের নিজের বোনকে পাহারা দেওয়ার জন্য পেছনে হাজারটা বডিগার্ড লাগিয়ে রাখতে হবে।

— উনি আমাকে বোন হিসেবে পরিচয় দিতে চায়না আপু, তাই আমিও চাইনা যেচে পরে কারও বোন হতে।
নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব আসে অরুর দিক থেকে।
— ওর কথা বাদ দাও, জেকে সব সময়ই এমন করে,বেশি ভাব দেখায়। আসো তোমার চুল গুলো ঠিক করে দিই।
অরু বুঝলো ক্রীতিকের কোনো খারাপ অভ্যাসই, এদের কাছে দোষের নয়। তাই আড়ালে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেকে আয়নায় দেখতে লাগলে ও।
নিজের পরিপাটি চেহারাটা আয়নায় দেখে, অরু বলে,— অর্নব ভাইয়া তো ভালো মানুষ, তাহলে তাকে কেন ক’ষ্ট দিচ্ছো আপু।
অরুর চুলে হেয়ারব্রাশ চালাতে চালাতে এলিসা বলে,
— আমারও এই একটাই আপসোস জানোতো। অর্নবের মতো ছেলে আমার মতো একটা মেয়েকেই কেন পাগ’লের মতো ভালোবাসে দুনিয়াতে কি ভালো মেয়ের অভাব ছিল?
অরু চকিতে পেছনে ঘুরে শুধালো,
— মানে?
— তুমি প’কার প্লেয়ার মানে বোঝো?
অরু অজ্ঞাতদের মতো এদিক ওদিক মাথা নাড়ালো।
— জু’য়া চেনো নিশ্চয়ই ? কার্ড দিয়ে যে খেলে?
একটা শুষ্ক ঢোক গিলে, অরু এবার হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বলে,
— হ্যা!টট…টিভিতে দেখেছি।
আমি ওটাই খেলতাম অরু। ইভেন যেমন তেমন নয়,আজ পর্যন্ত প’কার খেলে আমাকে কেউ বিট করতে পারেনি। প’কার প্লেয়ারদের কাছে আমি সেলিব্রিটিদের মতোই। ওরা আমার একটা

অটোগ্রাফের জন্য তৃষ্ণার্থ চাতকের মতোই অপেক্ষা করে থাকে। আর যে সেটা একবার পেয়ে যায়, তার ডিমান্ডও বেড়ে যায়।
অরু পেছনে ঘুরে এলিসার হাত ধরে বললো,
— আপু এটাতো খা'রাপ কাজ তাহলে বেরিয়ে কেন আসছো না??
এলিসা জোরপূর্বক হেসে জবাব দেয়,
— আমি ছাড়তে চাইলেও এই বিভীষিকা ময় খেলার জগত আমার পিছু ছারছে না অরু। স্ফটিকের লাল,নীল, সবুজ আলোয় ঝিকমিক করছে পুরো হল রুমটা। কিছু কিছু নজর কাড়া লাইট সফ্ট মিউজিকের তালেতালে জ্বলছে আবার নিভছে। আর্টিফিশিয়াল বেবি পিংক কালারের থীমটা ভালোই মানিয়েছে লাইটিং এর সাথে। এককথায় চোখ ধাদানো ব্যাপার স্যাপার। হলরুমটা মানুষদ্বারা পরিপূর্ণ , বেশিরভাগই জোড়ায় জোড়ায়। তবে এতো এতো চিকচিক আলোয় কারোরই মুখ দেখে চেনার জো নেই। না এই মূহুর্তে অরু কারো মুখ দেখার মতো অবস্থায় আছে, এর কারন, ওর দৃষ্টি আড়াল করে শক্ত চোয়াল আর অ'গ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপন করে তাকিয়ে আছে ক্রীতিক।
দেখে মনে হচ্ছে পাবলিক প্লেস না হলে এই মূহুর্তে খুব বড়সড় সিনক্রিয়েট করতো সে।
অরু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এলিসা ওকে রেখে কই যে উধাও হয়ে গেলো সেটাই ভাবছে আপাতত।
— চুপ করে থাকিস না অরু, কথা বল ? আমাকে না জানিয়ে এখানে কোন সাহসে এলি তুই?
ক্রীতিকের আকস্মিক ধ'মকে অরু, মাথা তুললো,একটা ব্ল্যাক ভেলভেট পার্টি জ্যাকেট পরে আছে ক্রীতিক। ঘার অবধি চুল গুলো

জ্যাকেটের সাথে ম্যাচিং করেই সেট করা। মনে হচ্ছে কোন হেয়ারস্টাইলিস্ট এর সূক্ষ্ম হাতের কাজ এটা।
তবে ক্রীতিককে দেখতে যতটা ড্যাশিং লাগছে, ওর সুন্দর হ্যান্ডসাম রাগী চেহারাটা দেখতে ততটাই ভ'য়ানক লাগছে। সুন্দর বড়বড় ছোট দুটি যেন জ'লন্ত অ'ঙ্গার।
অরু ভেবে পায়না ও করেছেটা কি? এলিসা নিতে গিয়েছে দেখেই তো এলো। তাহলে এতো রাগের কি আছে, আর সব ব্যাপারেই কেন ক্রীতিককে জানাতে হবে? কি হয় ক্রীতিক ওর? এইরকম শাসন করার মতো এতোটাও তো ক্লোজ ওরা নয়, তাহলে?? মনে মনে ক্রীতিকের উপর খুব বি'রক্ত হলো অরু। অজানা কারনে জিভটা নিম পাতার মতোই তেঁতো ঠেকলো ওর। তাই ইচ্ছে করেই মৌনতা পালন করলো ক্রীতিকের হাজারটা প্রশ্নের জবাবে।— অরু আমাকে রাগাস না, তুই এখানে কি করছিস? এভাবে আমাকে না জানিয়ে আর কোথায় কোথায় যাস তুই ?কি হলো জবাব দে?
অরু চুপ রইলো এবারও। কিন্তু ক্রীতিক আর নিজের রা'গ সংবরণ করে রাখতে পারলো না, পকেট থেকে হাত বের করে চেপে ধরলো অরুর নরম চিকন হাতটা। তৎক্ষনাৎ পেছন থেকে কথা ছুড়লো এলিসা,
—- কি করছিস জেকে।
ক্রীতিক অরু সমেত এলিসার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতেদাঁত চেপে বললো,
— ওকে এখানে নিয়ে এসে কাজটা তুই একদম ঠিক করিস নি এলিসা? তুই ভালো করেই জানিস আজকে পার্টির পেছনে আমাদের

অন্য উদ্দেশ্য আছে, আর সেখানে তুই আমার দূর্বলতা টেনে নিয়ে এলি? হোয়াই?
এলিসা লম্বা একটা শ্বাস টেনে অরুকে ক্রীতিকের থেকে ছাড়িয়ে বললো,
— যদি কিছু হয়, সেটা আমার সাথে হবে, অরুর সাথে নয়,তাছাড়া, কিছু যে হবে তাও তো সিওর না, তাহলে আমার বার্থডে টাকে নরমাল বার্থডে পার্টি কেন ভাবতে পারছিস না? আর সবচেয়ে বড় কথা অরু ছোট বাচ্চা নয়, তুই সবসময় ওকে এভাবে ডমিনেট করিস কেন বলতো?
ক্রীতিক তীক্ষ্ণ কন্ঠে জবাব দিলো,
— কারণ ও আমার।
— বলা হয়েছে? এবার আমরা আসছি।
এলিসা কিংবা অরু কেউই ক্রীতিকের কথায় খুব একটা গুরুত্ব না দিয়েই ওখান থেকে চলে গেলো।
দু'হাত মুঠি বদ্ধ করে রেখে পেছন থেকে বিড়িবিড়িয়ে ক্রীতিক বললো,
— সাবধানে এলিসা, সি ইজ মাই হার্টবিট। পার্টিতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছুই ঘটেনি, বরং সবাই জমিয়ে আনন্দ করেছে, কেক কে'টেছে খাওয়া দাওয়া হৈ-হুল্লোড় করে অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছে। পুরোটা সময়ই অরুকে সাথে সাথে রেখেছে এলিসা, সেই সাথে চোখে চোখে রেখেছে অন্য আরেকজন।
আজ প্রথমবার ক্রীতিক বোধ করলো ও খুব দূর্বল হৃদয়ের, অন্তত অরুর ক্ষেত্রে তো তাই। পুরো পার্টিতে ঘুরে ফিরে ওর দুচোখ অরুতেই নিবদ্ধ ছিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্যেও যদি অরু চোখের

আড়াল হয়েছে তো ক্রীতিকের মনে হচ্ছিলো এই বুঝি দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হৃদয়টা এক্ষুনি ব্লা'স্ট করবে।
কিন্তু এখন এই মূহুর্তে ক্রীতিক নিশ্চিন্তে ডিভানে গা এলিয়ে দিয়ে ড্রিংক করছে, কারন অরু ওর চোখের সামনেই বসে আছে, যদিও ওদের মাঝে দূরত্ব বেশ অনেকটা, তবুও চোখের সামনে তো আছে।
ক্রীতিক যখন নির্বিঘ্ন বসে বসে এসব ভাবছিল,তখনই বল ড্যান্সের ঘোষনা করা হয়। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বল নাচ খুবই জনপ্রিয়। আজকাল বাংলাদেশেও বিভিন্ন পার্টি কিংবা অনুষ্ঠানে কপোত-কপোতীদের বল নাচের আয়োজন করা হয়। কিন্তু অরু কিভাবে নাচবে? একেতো পার্টনার নেই তার উপর বোকার মতো জরজেট শাড়ি পরে এসেছে। তাই বসে বসেই সবার পারফরম্যান্স দেখতে লাগলো ও।
ঠিক তখনই ক্রীতিকের দৃষ্টি আড়াল করে অরুর সামনে এসে দাঁড়ালো সায়র। রাজকুমার দের মতো করে মাথাটা হালকা নুইয়ে ডানহাত বাড়িয়ে দিয়ে অরুকে শুধালো,
— লেটস হ্যাভ আ ডান্স। অরু না করতে চাইলো, কিন্তু না করাটা মূর্খতার লক্ষন, সবার সামনে না করে দিলে সবাই ওকেই আনস্মার্ট ভাববে, তাছাড়া সায়র ও অনেকটা লজ্জিত হবে। সেই ভেবে ও নিজেও হাত বাড়ালো বল নাচের উদ্দেশ্যে। তবে সায়রের হাতের মাঝে আর হাত রাখা হলোনা ওর, তার আগেই মসৃণ হাতটা ঈগলের মতো ছোঁ মে'রে নিজের হাতে নিয়ে এলো ক্রীতিক। সায়রকে ইচ্ছা করেই ধা'ক্কা মে'রে দাড়িয়ে পরলো অরুর সামনে।

হুট করে একদম হুট করে, চোখের পলকে ঘটনাটি ঘটায়, কিচ্ছুই ঠাহর করতে পারলো না অরু, শুধু দেখতে পেলো ওর হাতটা সায়র নয় ক্রীতিক ধরে আছে।
অরু সচকিত হয়ে কিছু বলতে চাইলো, তবে তার ফুরসত দিলোনা ক্রীতিক। টেনে নিয়ে গেলো বল নাচের স্টেজে।
অরুর এক হাত নিজের কাধে রেখে, নিজের শক্ত হাতটা ছোঁয়ালো অরুর লতানো কোমড়ে। অন্যহাত ঢুকিয়ে দিলো অরুর পাঁচ আঙুলের ভাঁজে। বল নাচের মঞ্চটা ছিল পুরো পুরি অন্ধকার। ফেইরী লাইটের ম্যাজিকাল আলো ছায়ায় কোন কিচ্ছুই খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছেনা। অরুও দেখতে পেলো না, ক্রীতিকের আ'গুন ঝরা চোখ জোড়া ওর শরীরের স্পর্শ পেয়ে মূহুর্তেই কতোটা কামুকতায় ডুবে গিয়েছে।
ব্যাকরাউন্ডে তখন সবার প্রিয় বাংলা গানের দুটো লাইন বাজছিল,“হালকা হাওয়ার মতোন চাইছি এসো এখন..
করছে তোমায় দেখে.. অল্প বে'ঈমানী মন
বাঁধবো তোমার সাথে… আমি আমার জীবন। ”
ওরা দুজনও তখন সফ্ট মিউজিকের তালে তালে পা মেলাচ্ছে নির্দ্বিধায় । কি জানি হুট করে কোথায় হারিয়ে গেলো দুজন। এতো জড়তা, এতো দূরত্ব, এতো প্রতিকূলতা সব কেমন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। পাছে শুধু পরে রইলো দু'টো অশান্ত মন।
ক্রীতিক নাচের তালে তালে অরুকে ঘুরিয়ে নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়ে বললো,
—তুই সত্যিই অসাধ্য সাধন করতে পারিস অরু, আমাকে দিয়ে কেমন ডান্স করিয়ে ছাড়লি।

অরু নাচের মুদ্রা অনুসরন করতে করতে ক্রীতিকের পেশিবহুল ঢেউ খেলানো বুকে দুহাত রেখে বললো,— কেন এলেন? আপনার সাথে নাচতে আমার ভ'য় করছে বড্ড ।
ক্রীতিক এবার অরুকে নিজ বাহুতে ছেড়ে দিয়ে, আবারও কাছে টেনে নিয়ে এলো, খুব কাছে । হুট করে টান দেওয়াতে অরুর রেশমের মতো লম্বা খোলা চুল গুলো আঁচড়ে পরলো ক্রীতিকের চোখে মুখে। অরুর মাতাল করা চুলের সুবাস ছড়িয়ে পরলো ক্রীতিকের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
ক্ষনিকের নিরবতা ভে'ঙে ক্রীতিক অরুকে আঙুলের মাথায় ঘোরাতে ঘোরাতে বলে,
— আজকের পার্টিতে না এলে হতোনা? তুই কি ঠিক করেই নিয়েছিস?আমাকে এ জীবনে টেনশন ফ্রী থাকতে দিবিনা?
অরু দু'হাতে ক্রীতিকের গলা জড়িয়ে নাচের তালে তালে বললো,— আমি আপনাকে একদম বুঝতে পারিনা।আপনি কি আসলেই জায়ান ক্রীতিক?
ক্রীতিক এবার অরুকে টেনে একটু খানি আলোতে নিয়ে এসে ওর চোখে চোখ রেখে বললো,
— কি করে পারবি, বুঝতে চেয়েছিস কখনো আমায়?
—কি'করে বুজবো? আপনি যে রহস্যময় মানব।
অরুর কথা বিপরীতে কোনো জবাব দিলোনা ক্রীতিক। তার বদলে নিজ হাতে অরুর গাড়ো নীল জরজেট শাড়িতে লাগানো ব্রোঞ্জটা খুলে দিলো একটানে, সঙ্গে সঙ্গে পাতলা আঁচলটা কোমর ছাড়িয়ে নিচে পরে গেলো।

ক্রীতিক ওর আঁচল গলিয়ে উন্মুক্ত কোমরে আলতো হাত ছুঁয়িয়ে বললো,— আমার জিনিস অন্য কাউকে দেখানোর কোন অধিকার তোর নেই।
অরু সেই কখন থেকেই ক্রীতিকের নেশালো চোখে তাকিয়ে আছে। হয়তো ওর চোখের ভাষা পড়তে চাইছে। কিন্তু জায়ান ক্রীতিক চৌধুরীর চোখের ভাষা পড়া কি এতোটাই সহজ?
অরু পড়তে পারলো না, উল্টে হুট করেই মনে পরে গেলো সেদিন বৃষ্টি ভেজা দুপুর বেলার কথা। সেই একই চোখ, একই হাস্কি কন্ঠস্বর, একই ভেজা অনুভূতি। অরুর হৃদমাঝারে আবারও তোলপাড় শুরু হয়েছে খুব। পেটের ইতিউতি উড়ছে অবাধ্য প্রজাপতির দল।
ক্রীতিক ওর সাথে কি করেছে,কি বলেছে কিছুই মস্তিষ্ক অবধি পৌঁছায়নি অরুর। ও তো ক্রীতিকের চোখেই ডুবে ছিল। ডুবে থাকতে থাকতেই উপলব্ধি করলো ক্রীতিকের চোখ দুটো বড্ড নে'শা ধরানো আর কাতরতা জড়ানো। কোন এক অজানা চৌম্বকীয় শক্তির দ্বারা ক্রীতিকের চোখ দুটো ওকেখুব করে টানে,হৃদয়টা বেসামাল করে তোলে বারবার। কিন্তু কি এমন আছে ওই ভাসমান গোলগোল চোখে? ভেবে পায়না অরু।—- অরু?
ক্রীতিকের হঠাৎ ডাকে কম্পিত হয়ে উঠলো অরুর শরীর,নিজের হুশ খেয়াল ফিরে পেয়ে কোথায় যাবে কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না খানিকক্ষণ। এখনো ক্রীতিকের বাহুতেই সিটিয়ে আছে অচল শরীরটা। চোখ মুখ লজ্জায় র'ক্তবর্ণ ধারন করেছে। কপালে বসানো স্টোনের বিন্দির আশেপাশে বিন্দু বিন্দু ঘামের ছড়াছড়ি।

কার চোখের দিকে এতোক্ষণ তাকিয়ে ছিল ও? ক্রীতিকের? যে কিনা সম্পর্কে ওর মায়ের সৎ ছেলে ছি ছি।
ক্রীতিক নিজেও এই মূহুর্তে কৌতুহলী আর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছে ওর পানে।
অরু একঝলক ক্রীতিকের ফর্সা ড্যাসিং চেহারার দিকে তাকিয়ে শুষ্ক ঢোক গিলে বিড়বিড়িয়ে বললো,— দয়া করে এভাবে তাকাবেন না, আমার কেমন যেন লাগে, আপনি যতই সুদর্শন হোননা কেন এটা কখনোই সম্ভব নয়।
নিজের মনে কিছু একটা বলে, ক্রীতিকের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে ওই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলো অরু।
পেছনে ক্রীতিকের জন্য শুধু খুলে পরে রইলো অরুর এক পায়ের চিকন রুপোলী নুপুর। শীত পেরিয়ে সেই কবেই বসন্ত নেমেছে ধরনী জুড়ে। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার জগাখিচুড়ী আবহওয়ায় সেই বসন্ত খুব একটা উপভোগ্য নয়। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে দু কদম বাইরে দিলেই যেন যত্রতত্র শীত বুড়ি এসে জড়িয়ে নিচ্ছে আষ্টেপৃষ্টে। দীর্ঘদিন ধরে বইতে থাকা শীতের সেই দাঁত কাঁপানো কনকনে হাওয়াকে হটিয়ে , আজ সকাল সকাল বাসন্তিক হিমেল হাওয়া বইছে পুরো ক্যালিফোর্নিয়া টু সানফ্রান্সিসকো জুড়ে। নাক চেনে বুক ভরে বাতাস নিলে মনে এটা শহুরে জনবহুল স্টেট থেকে আসা কোন দূষিত বাতাস নয়,বরং প্রশান্ত মহাসাগর ছাপিয়ে আসা বিশুদ্ধ দক্ষিনা বাতাস। বাতাসের তালে তাল মিলিয়ে ভেসে আসছে চেরিব্লোসমের দারুণ মিষ্টি সুবাস। হাইওয়ে বা জনবহুল কোনো ফুটপাত কিংবা নামি দামি কর্পোরেট অফিস, চেরিব্লোসমের কারনে আজকাল সব যায়গাকেই কেমন ফুলের বাগান মনে হয়। বছর

তিনেক আগে কেনা ক্রীতিকের ডুপ্লেক্স বাড়িটার ফ্রন্ট ইয়ার্ডেও দু'টো চেরিব্লোসম গাছ রয়েছে। কালো ফেঞ্চ গেইটটার দুইধারে পাহারাদারের মতোই সর্বক্ষন পাহাড়ায় দাড়িয়ে তারা। বসন্ত হওয়ার দরুন চেরিব্লোসমের ভারে কেমন নুয়িয়ে পরেছে গাছ দুটো। অরু একঝলক গেইটের দু'পাশে ব্লোসম সজ্জিত গাছের দিকে তাকাচ্ছে, তো পলক ফেলে আবার ক্রীতিকের দিকে।
যে এই মূহুর্তে কপাল কুঁচকে রেখে, শক্ত মুখে অরুর দিকেই তাকিয়ে আছে।
ফর্মাল ড্রেসআপ, হাতে ম্যাকবুক, চোখে মুখে কঠিন বিরক্তির ছাপ, গত পাঁচ মিনিট যাবত এভাবেই চলমান মূর্তি হয়ে হলরুমে দাঁড়িয়ে আছে ক্রীতিক।
আর অরু চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে ক্রীতিকের মুখের পানে, যেন ক্রীতিক জাদুঘরে সংরক্ষিত কোন বিশেষ বস্তু, সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলেই নয়।
তবে ক্রীতিকের মতো রগচটা মানুষের কাছে ব্যাপারটা বেশ বিরক্তি কর। কথা নেই বার্তা নেই পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেইঞ্জ। একটানা একই যায়গায় বিনা বাক্যে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে এতোক্ষণে সেই বিরক্তি কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে পৌঁছালো সপ্তম আসমানে, ক্রীতিক নিজের তীক্ষ্ণ চোয়ালে আরও খানিকটা তীক্ষ্ণতা ধারণ করে বললো,— সেই কখন থেকে পথ আটকে থাম্বার মতো দাড়িয়ে আছিস,কি সমস্যা?
চোখে কয়েকবার পলক ফেলে, ঢকাত করে এটা শুকনো ঢোক গিলে অরু শুধায়,

— ভাবছি, আপনি কি আসলেই কালকের সেই মানুষটা?? যে ওভাবে বল নাচ…
— শাট আপ।
ক্রীতিকের ধ’মকে অরুর কথা মাঝ পথেই আটকে গেলো।
—আমি বয়সে তোর থেকে কত বড় তা খেয়াল না রেখেই যা মুখে আসছে তাই বলে দিচ্ছিস,স্টুপিড একটা।
ধ’মক খেয়ে অরু মুখ কাচুমাচু করে বললো,
— আপনি বড় সেতো আমিও জানি, আর তাইতো আরও বেশি আশ্চর্য হচ্ছি, কালকের আপনাকে তো আমি চিনতেই পারছিলাম না,জানেন? কেমন কেমন যেন লাগছিল আপনাকে, আর ওই চোখ গুলো।
অরু হাত উচিয়ে ক্রীতিকের চোখে ইশারা করতেই ক্রীতিক ওর হাতটা খপ করে ধরে ফেলে, তারপর গমগমে আওয়াজে বলে,— জ্ব’রটা এখনো আছে তাই ভুলভাল বকছিস, আজ আর ভার্সিটি যেতে হবে না।
অরু নিজ ভ্রুকুঞ্চিত করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে, মুখে বির’ক্তির ছাপ টেনে ক্রীতিকের আদেশের ঘোর বিরো’ধীতা করে বললো,
— ভার্সিটি যাবোনা মানে? দেখছেন সকাল সকাল রেডি বেরিয়েছি, তাও বলছেন ভার্সিটিতে যাবোনা?
— তোর শরীরটা ভালো নেই তাই বলছি, নয়তো তুই কোথায় যাবি, না যাবি সেসবে আমার বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই।
অরু নিজের গাল গলায় হাত ছুয়িয়ে বললো,
— এতোটুকু জ্বরে কিছু হবেনা। সরুন তো আমি ভার্সিটি যাবো, আজ নিখিল ভাইয়ের সাথে ট্যুরের ব্যাপারে দরকারি কথা বলার

আ…তপ্ত গালে খরখরে হাতের শ'ক্ত চা'প অনুভব করতেই অরুর কথা মাঝ পথেই আটকে গেলো,ক্রীতিকের হঠাৎ আ'ক্রমনে স্ব স্থান থেকে কয়েককদম পিছিয়ে অরুর পিঠ গিয়ে ঠেকলো কাঁচ লাগানো প্রসস্থ দেওয়ালে,ক্রীতিক এমন ভাবে চোয়াল চে'পে ধরেছে যেন মনে হচ্ছে এখনই গাল ফেটে র'ক্ত বেরিয়ে আসবে।
ক্রীতিক নিজ হাতের বাধন ঢিলে না করেই রুষ্ট কন্ঠে বললো,
— আমি বলেছি,” না” তার মানে না'ই।কথার উপর পাল্টা যুক্তি আমার একদম পছন্দ নয় অরু। একদিন একটু নরম বিহেভিয়ার দেখেছিস বলে এইনা যে, আমি প্রতিদিন সেটা কন্টিনিউ করবো। এখন যেটা দেখছিস এটাই আমি, রুড,উ'গ্র, বেপরোয়া। আর এই রুড মানুষটাকেই সারাজীবন সহ্য করতে হবে তোর। এন্ড দিস ইজ মাই সেকেন্ড টাইম ওয়া'র্নিং। নেক্সট টাইম আর ওয়া'র্নিং দিতে আসবো না ডিরেক্ট একশন নেবো,মার্ক মাই ওয়ার্ড।
অরুর মুখ থেকে অস্পষ্ট সুরে কথা বেরুলো এতোক্ষণে,— উমম লা..লাগছে আমার..
ক্রীতিকের হঠাৎ প্রতিক্রিয়াটা ভেতর থেকে এসেছিল,তাই নিজেও বুঝতে পারেনি ও অরুকে নিজ হাত আর কথার দ্বারা ঠিক কতটা ব্যাথা দিচ্ছে।
তবে খানিকক্ষণ আগে অরুর বলা,” লাগছে আমার” কথাটাই যথেষ্ট ছিল ক্রীতিকের গ'র্জে ওঠা অ'গ্নিস্ফু'লিঙ্গতে শীতল জলের ছাট দেওয়ার জন্য। ক্রীতিক নিরবে অরুর গালটা ছেড়ে দিতেই অরু নিজের নরম গাল দুটোতে হাত বুলাতে বুলাতে বিরক্ত সুরে অস্ফুটে বললো,

— সারাজীবন তো দূরে থাক, উপরওয়ালার ইচ্ছায় মা সুস্থ হয়ে গেলে, আপনার মতো মানুষের সাথে এক ছাদের তলায়, তারপর আর এক মূর্হুত ও নয়।
অরুর বিড়িবিড়িয়ে বলা বাক্যটা ক্রীতিক খুব ভালো ভাবেই শুনলো, অতঃপর নিজ পকেটে দুহাত গুঁজে রেখে সটান দাড়িয়ে ঘাড়টা একটু কাত করে জবাব দিল,
— বিলিভ মি অরু, তুই শুধু আমার সাথে এক ছাঁদ নয়,আরও অনেক কিছু শেয়ার করবি। তাও নিজ ইচ্ছাতে, আই সয়ার।
অরু এবার আর মুখে কোনো কথায়ই উচ্চারণ করলো না,বরং মনে মনে বললো,— এই জীবনে অন্তত তা হবে না। মা সুস্থ হয়ে গেলেই দেশে ফিরে যাবো আমরা। তারপর আপনি আর আপনার বোরিং জীবন, দুটোর হাত থেকেই রেহাই পাবো আমি আর আপা।
অরু এখনো দাড়িয়ে আছে দেখে ক্রীতিক বললো,
— এবার পথ ছাড়, নয়তো কাঁ’ধে তু’লে গেইটের বাইরে ফে’লে রেখে আসবো।
অরু তৎক্ষনাৎ সরে দাঁড়ায়। অরু সরতেই ক্রীতিক গটগট পায়ে দরজা খুলে বেড়িয়ে যায়, যাওয়ার আগে শেষ বারের মতো পেছনে তাকিয়ে অরুর উদ্দেশ্যে বলে,
— টেইক সাম রেস্ট,ইউ আর উইক।
ভার্সিটি যেতে দেয়নি দেখে অরুর মেজাজ এমনিতেই সপ্তম আসমানে চড়ে ছিল, ক্রীতিকের দরদী কথায় তাতে যেনো আগু’নে ঘি ঢালার উপক্রম হলো,ও তেতিয়ে উঠে বললো,

— মোটেই আমি উইক না বুঝেছেন, মেয়ে মানুষ বলে এতো স’স্তা ভাববেন না, লাগতে আসলে আপনাকেও দু’হাতে তুলে গেইটের বাইরে ফে’লার ক্ষমতা আমি রাখি।
ক্রীতিক পেছনে না তাকিয়েই চোখের উপর সানগ্লাস বসাতে বসাতে বিড়বিড়িয়ে বললো,
— সময় হলে সে ক্ষমতা নিশ্চয়ই দেখবো জান।
কথাটা বলার সময় ক্রীতিকের ঠোঁটের কোনে দৃশ্যমান ছিল সেই মনোমুগ্ধকর বাঁকা হাসি। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়েছে। সকালের পর থেকে অরুর জ্ব’রটা বেড়েছে দিগুণ অথচ পুরো বাড়িতে কেউ নেই। কি করে থাকবে? অনু ডাক্তারের আর্জেন্ট কলে সেই সকাল সকাল হসপিটালের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে এখনো ফেরার নাম নেই। আর ক্রীতিকের থাকা না থাকা অরুর জন্য সমান কথা। কারন আর যাই হোক অরু জ্বরে জ্ঞান হা’রিয়ে পরে থাকলেও ক্রীতিকের মতো মানুষ অন্তত ওকে সেবা করতে আসবেনা,নিশ্চয়ই?
সেই সকাল থেকে হল রুমের কাউচে কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে অরু, শরীরের প্রচন্ড দাপদাহে সারাদিনে কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও হয়নি আর। ক্রীতিকের ভ’য়ে ভার্সিটি না গিয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ভার্সিটিতে বসে এমন জ্ব’র বেড়ে গেলে তো মহা মসিবত হতো। পাছে না আবার সেদিনের মতো ভরা ক্যাম্পাসে সবার সামনে অজ্ঞান হয়ে পরে গিয়ে মানসম্মানের বারোটা বেজে যেতো ।জ্বর ওঠার মূহুর্তটা রোমাঞ্চকর,আপাতত সেই রোমাঞ্চকর সময়টাই পার করছে অরু। গড়ম কম্ফোর্টারের মাঝে শুয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাথায় কিলবিল করছে হাজার খানেক প্রশ্ন। কখনো অজান্তেই মনে পরে যাচ্ছে বাংলাদেশের আঁকাবাকা

মেঠোপথ, তো কখনো আরাম প্রিয়, সংস্কৃতি মনা, নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারি নিজ দেশের সরলমনা মানুষ গুলোর কথা। বাঙালি, সংস্কৃতি এসব ভাবতেই অরুর মনে পরে যায়, কাল পার্টিতেও কোনো একটা বাংলা গান বাজছিল, তারপর ক্রীতিকের মাঝেই যেন অন্য কেউ হানা দিলো, একজোড়া মাদকতা জড়ানো বেসামাল নিস্প্রভ চোখ। যে চোখে কয়েকমূহুর্তের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল অরু। আর তারপর? তারপর ওর সাথে যে ভ'য়ং'কর আর বা'জে কাহিনিটা ঘটলো। যার
ফলস্বরুপ এখন এই মূহুর্তে একশো তিন ডিগ্রি ফারেনহাইট জ্ব'রে ঝ'লসে যাচ্ছে অরু।জ্বরে পুড়'তে পুড়'তেই হঠাৎ বোধ হলো,কালকে ক্রীতিকের অনুমতি ছাড়া পার্টিতে যাওয়া মোটেই উচিৎ হয়নি ওর। হাজারো চিন্তার মাঝেই অরুর বুক চিড়ে বেড়িয়ে এলো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। ঠিক তখনই কানে ভেসে আসে পাসওয়ার্ড টিপে মেইনডোর খোলার পিকপিক আওয়াজ। কে এসেছে দেখার জন্য অরু কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়েই উঠে বসলো, তৎক্ষনাৎ ক্রীতিকের নাম করে হাঁক ছেড়ে ডাকতে ডাকতে ভেতরে প্রবেশ করলো এলিসা।
এলিসার চোখে মুখে রা'গের ছাপ স্পষ্ট।রা'গের তোপে এই মূহুর্তে নাকের ডগাটা তিরতির কাঁপছে ওর। অরু এলিসার অ'গ্নি মূর্তি দেখে খানিকটা ভরকালো,অতঃপর সাহস জুগিয়ে শুধালো
— কোন সমস্যা আপু?
এলিসা দোতলার করিডোর থেকে চোখ সরিয়ে অরুর পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাঠকাঠ আওয়াজে জিজ্ঞেস করল ,
— জেকে কোথায় অরু?

— সকালেই ভার্সিটিতে গেলো।
মিনিমিনিয়ে জবাব দেয় অরু।অরুকে ভারি কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে থাকতে দেখে এলিসা নিজের রা'গী ভাব আড়াল করে নরম কন্ঠে শুধায়,
— তুমি ঠিক আছো অরু, কাল শুনলাম তুমি নাকি সে'ন্সলেস হয়ে গিয়েছিলে? কিন্তু কেন? আমিতো তোমাকে সাথে সাথেই রেখেছিলাম সারাটাক্ষন মাত্র কয়েক মূহুর্তের জন্য ক্লাবের বাইরে গিয়েছিলাম তাও অত্যাধিক প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে। এর মাঝে তুমি কি এমন দেখলে যে এভাবে জ্ঞা'ন হারালে? বলো আমাকে?
অরু হাসার চেষ্টা করে বললো,
— আমি বদ্ধ কিংবা আটকানো যায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারিনা আপু,দ'ম ব'ন্ধ হয়ে আসে। সে কারনেই তো প্রতিদিন মায়ের কাছে যাই না, সপ্তাহে একবার করে যাই।
এলিসা সচকিত হয়ে বললে,— কে আটকে রেখেছিল তোমায়??
এলিসার প্রশ্নে অরুর মুখটা পাংশুটে রূপ ধারণ করলো।ও কেন যেন জবাব দিতে চাইলো না।
এলিসা আবারও অরুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে তার আগেই ফোন কল চলে আসাতে জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের এখানেই ইতি ঘটে। এলিসা ফোন কানে তুলে মেইনডোর দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে অরুর উদ্দেশ্যে বললো,
— আমি একটু তাড়ায় আছি অরু। নেক্সট টাইম এসে শুনবো।
এলিসা চলে যাওয়াতে অরু যেন হাফ ছেড়ে বাচঁলো। জ্ব'রের ঘোরে এটা ওটা এতো প্রশ্নের মোটেই উত্তর দিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না অরুর,এলিসা চলে গিয়েছে ভালোই হয়েছে।

মুখে আটকে রাখা দমটা এক নিঃশ্বাসে বের করে দিয়ে, আবারও সাবধানে কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পরলো অরু। ঠিকঠাক হয়ে শুতে শুতে অস্ফুটেই বললো,

— এলিসা আপু হঠাৎ ক্রীতিক ভাইয়ার খোজ করছে কেন? তাও বাড়ি বয়ে এসে?ফোন করলেই তো হয়, অদ্ভুত মানুষ। ভার্সিটির গেইটে এসে দাড়াতেই সিকিউরিটি গার্ডটা এলিসার পথ আটকে দাঁড়ালো। অতঃপর প্রশিক্ষন প্রাপ্ত রোবটের ন্যায় একনাগাড়ে বললো,

— সরি ম্যাম, আইডি কার্ড ছাড়া ভেতরে প্রবেশ এলাউ না।

এলিসা মাথা নিচু করে কথাটা শুনলো, অতঃপর নিজের এ্যাথলেটিক পাঁচ আঙুল মু'ঠিবদ্ধ করে সিকিউরিটি গার্ডের নাক বরাবর একনাগাড়ে দুই তিনটা পা'ঞ্চ বসিয়ে কটমটিয়ে বললো,

— কে আটকাবে আমায়??বল কে আটকাবে?

এলিসার শক্ত হাতের ঘু'ষি খেয়ে সিকিউরিটি লোকটা সেখানেই পরে রইলো, আর এলিসা ঢুকে গেলো ক্যাম্পাসের ভেতর।

ভার্সিটিতে নিজের অফিস রুমে বসে ম্যাকবুকে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছে ক্রীতিক। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার দরুন, সুন্দর চোখ দুটো স্ক্রীনেই আটকে আছে,সেইসাথে খানিক বাদে বাদে অজান্তেই দাঁত দিয়ে নিজের অধর কা'মড়ে ধরছে ও। ব্যাপারটা বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। এই দৃশ্যটা এক পলক দেখলে যে কোন মেয়ের মুখ থেকেই বেরুবে একটা বাক্য,— হাউ ম্যানলি।

তবে এলিসা তো কোন সাধারন মেয়ে নয়,বরং আস্ত একটা ডে'ঞ্জার। তাই ওর এসবে খেয়াল ও কম।আর এই মূহুর্তে এলিসা নিজের মেয়েলি চেহারার নিচে আসল রুপটা দেখিয়েও দিলো, ও

ক্রীতিকের কেভিনের দরজাটা সশব্দে খুলে, জেকে বলে চেঁচিয়ে উঠলো ।
ক্রীতিক ওর দিকে চোখ না ঘুরিয়েই শান্ত স্বরে বললো,
— হোয়াটস রং চেচাচ্ছিস কেন? এটা বিদ্যাপিঠ ভুলে গিয়েছিস?
এলিসা ধাপধাপ পায়ে দু'কদম এগিয়ে এসে বললো,
— তুই ক্যাথের সাথে এটা কেন করেছিস ক্রীতিক?
— কি করেছি?
ক্রীতিকের দায়সারা উত্তর শুনে বিরক্ত লাগছে এলিসার। তবুও চোখ বন্ধ করে নিজেকে খানিকটা সংবরণ করে বললো,
— তুই ক্যাথলিনের চুল কেন কে'টে দিয়েছিস?তাও এমন ভাবে কে'টেছিস মেয়েটার ন্যাড়া হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।
এলিসার কথায় আপাতত ক্রীতিকের কোনো হেলদোল নেই, ও মনদিয়ে ম্যাকবুকে কিছু একটা টাইপ করে যাচ্ছে এক নাগারে।
এলিসা এবার রে'গে ক্রীতিকের ডেস্কের উপর সজোরে বারি মেরে দাঁত খিঁচিয়ে বললো,— পা'গলামির একটা সীমা থাকে ক্রীতিক। তুই যখন যা করিস আমরা তোকে সবসময় সাপোর্ট করে যাই।হোক সেটা ভালো কাজ কিংবা খারাপ। তাই বলে এতোটা জ'ঘন্য কাজ? তুই কি আদৌও জানিস একটা মেয়ের কাছে তার চুল কতোটা মূল্যবান? চুল হারানোর দুঃখে মেয়েটা লিটরেলি সুই'সা'ইড করতে গিয়েছিল। ক্যান ইউ ইমাজিন?
এবার ম্যাকবুক থেকে চোখ সরিয়ে কথা পারলো ক্রীতিক,
— একজ্যাকলি আই ক্যান ইমাজিন। এন্ড দ্যাটস হোয়াই আই ডিড ইট। কারণ ক্যাথলিনেরও বোঝা উচিৎ অন্যকারও চুল আমার কাছেও ঠিক কতোটা মূল্যবান।

মখমলের ন্যায় মসৃণ কন্ঠস্বর অথচ কথার পরতে পরতে তীব্র রা'গের বহিঃপ্রকাশ।
এলিসা বি'রক্ত হয়ে বললো,
—তোর কথার আগামাথা কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার জেকে। প্লিজ এই হাইড এন্ড সিক গেইমটা এবার অফ কর।
ক্রীতিক কপালে ভাঁজ ফেলে বলে,
— খুলেই তো বললাম, আমিই ক্যাথলিনের চুল কে'টে দিয়েছি।
— কেনো কে'টেছিস?
কারণ ক্যাথলিন অনেক বড় ভুল করতে যাচ্ছিলো। থ্যাংকস টু সায়র এন্ড অর্নব ভুলটা করার আগেই ওরা ঘটনাস্থলে চলে আসে। ক্যাথলিন যে ভুল করার সাহস দেখিয়েছে তারজন্যই স্রেফ ছোট্ট একটু শা'স্তি দিলাম।
ক্রীতিকের ঘুরানো প্যাঁচানো কথার জট খুব বেশি খোলা হলোনা এলিসার, তার আগেই কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড এসে ক্রীতিককে আর্জি জানিয়ে বলে,
— স্যার উনি, গেইটের সিকিউরিটি গার্ডকে মে'রে ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। কতৃপক্ষ থেকে ওনাকে ধ'রে ক্যাম্পাসের বাইরে বের করে দেওয়ার অর্ডার এসেছে ।
এলিসা চোখ ছোটছোট করে ক্রীতিকের তাকিয়ে ইশারা করে বললো,
— কিরে বল আমি তোর ফ্রেন্ড?
ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে একবার এলিসার ইশারা'রত মুখের পানে চাইলো তারপর সিকিউরিটির পানে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বললো,— যা বলা

হয়েছে তাই করুন, টেনে টুনে নিয়ে যানতো। সেই কখন থেকে এসে কানের মাথা খাচ্ছে, পা'গল মনে হয়।
এলিসা ক্রীতিকের দিকে তে'ড়েমে'রে এসে বললো,
— জেকের বাচ্চা আমাকে তোর পা'গল মনে হয়?
তবে খুব বেশি কাছে আসার আগেই সিকিউরিটিরা সবাই মিলে ধরে ওকে টান'তে টান'তে নিয়ে গেলো একেবারে ক্যাম্পাসের শেষ মাথায় গেইটের কাছে।
ক্রীতিক থাই লাগানো জানালার সামনে দাড়িয়ে কফি পান করতে করতে সে দৃশ্য দেখেই ঠোঁট কাম'ড়ে হাসছে। হাসতে হাসতেই চোখ মুখের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো ওর। এতোক্ষণের হাস্যোজ্জ্বল গৌড়বর্ণ মুখটা ক্ষনিকের মাঝেই কাঠিন্যতায় ছেয়ে গেলো, মস্তিষ্কে ভেসে উঠলো কাল সিসিটিভি ক্যামেরায় ব'ন্ধি অযাচিত মূহুর্ত গুলো।সেই সাথে কালকের পার্টিতে ঘটে যাওয়া ছোট বড় প্রত্যেকটা ঘটনা।কাল বল নাচের সময় অরুকে এতোটা কাছে পেয়ে ক্রীতিক নিজের মধ্যে ছিলনা। অজান্তেই আটকে গিয়েছিলো অরুরময় ভ্রমের গোলকধাঁধায়। সবসময়ের বাধ্য মস্তিষ্কটাও তার তাল হালিয়ে চলে গিয়েছিল অ'বাধ্য মনের বশে।
তারপর অরু যখন ওভাবে দৌড়ে চলে গেলো,তখনই সম্বিত ফিরে পায় ক্রীতিক, ফিরে আসে কঠিন বাস্তবতায়।তবুও কোন এক অযাচিত বি'পদ থেকে অরুকে প্রটেক্ট করতেই পিছু নিয়েছিল ওর। কিন্তু অরু স্টেজের পেছনে চলে গেলেও ক্রীতিকের আর যাওয়া হয়নি সেদিকে, তার আগেই ওকে ডেকে ক্লাবের বাইরে নিয়ে যায় এলিসা। নিয়ে যাওয়ার অবশ্য যথাযথ কারন ছিলো, তাই মনের মাঝে হাজারটা দিধা থাকা সত্বেও ক্রীতিকের যেতে হয়েছিল

এলিসার সাথে। ওদিকে অর্নব আর সায়র এলিসাকে খুঁজতে খুঁজতেই ব্যাক স্টেজে এসেছিল। কারণ এই পার্টিতে ওদের একমাত্র মিশন আর ভীষণ এলিসাকে প্রটেক্ট করা,কিন্তু আপসোসের বিষয় এলিসা ওদের থেকে ক্রীতিককে বেশি ভরসা করে। সায়র আর অর্নব যখন ব্যাকস্টেজের অন্ধকার করিডোর দিয়ে পা টিপে টিপে এগুচ্ছিলো, তখনই পাশের রুম থেকে কারও গো’ঙানির আওয়াজ শুনতে পেয়ে হকচকিয়ে সেদিকে দৌড়ে যায় ওরা,
রুমটা তখন পুরোপুরি অন্ধকার ছিলোনা, ভেন্টিলেটরের থেকে আসা বাইরের মৃদু আলোতে ওরা ভালোভাবেই দেখছিল ফ্লোরে অগোছালো হয়ে পরে মৃদু আওয়াজে কাতরাচ্ছে কেউ। দেখে মনে হচ্ছে খুব চো’ট পেয়েছে কিন্তু কোথায় পেয়েছে?? ব্যাপারটা বোঝার জন্য ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাতেই অরুর মুখটা দেখে আঁ’তকে ওঠে সায়র। সায়র কে এভাবে শকট হতে দেখে অর্নব শুধালো,— কিরে আঁ’তকে উঠলি কেন?
সায়র চোয়াল শক্ত করে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো,
— অর্নব এটাতো অরু, ক্রীতিকের স্টেপ সিস্টার।
— হ্যা তাই তো দেখছি, কি হলে বলতো মেয়েটার?
সায়র অর্নবের কলার চে’পে ধরে হিসহিসিয়ে বললো,
— তাইতো দেখছি মানে? খবরদার এটা যাতে জেকের কান অবধি না পৌঁছায়,তাহলে তোর এ্যারেঞ্জ করা এই পার্টি ফা’র্টি ল’ন্ডভন্ড করে দিতে ও এক সেকেন্ডও ভাববে না, এখন চল তারাতারি ওকে সারিয়ে তুলতে হবে।
অর্নব সায়রের হাত টেনে থামিয়ে দিয়ে,

— ওয়েট, তুই এতো প্যানিক হচ্ছিস কেনো? তাছাড়া ও স্টেপ সিস্টার হয় জেকের। আ...
সায়র ওকে মাঝে পথেই থামিয়ে দিলো, দেওয়ালেরও কান আছে এমন মুখভঙ্গিমা করে বললো,
— তুই ভুল ভাবছিস অর্নব, ওসব সিস্টার ফিস্টার কিচ্ছুইনা। জেকে এই মেয়েটার প্রতি লিটরেলি অবসেশট। এই মেয়েটার জন্য ওর পা'গলামি তুই নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না, ও সবার সামনে এমন ভাব দেখায় যেন, হি ডিডন্ট ফা'কিং কেয়ার,বাট এক্সুয়ালি হি কেয়ার, নো নো কেয়ার ইজ আ লেইম ওয়ার্ড এর থেকেও বেশি কিছু।
অর্নব সায়রের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো,— আজ বোধ হয় তুই একটু বেশিই খেয়েছিস সায়র, ক্রীতিক? হাটুর বয়সই একটা মেয়ের প্রতি অবসেশট?তাও যার সাথে কিনা সম্পকের দিক দিয়ে ওর দা-কুমড়া সম্পর্ক।আর তুই এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছিস?হাহ!
একটা উপহাসের হাসি বেড়িয়ে এলো অর্নবের ঠোঁট গলিয়ে। তবুও যদি তুই হতি তাহলে একটা কথা ছিল। ক্রীতিকের মতো পার্সোনালিটিতে কোনোরূপ কম্প্রোমাইজ না করা মানুষ কিনা নিজের অর্ধেক বয়সী স্টেপ সিস্টারের প্রতি অবসেশট হাহাহা,ভেরি নাইস জোক্স।
অর্নবের যুক্তির পেছনে সায়র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, আচ্ছা তোকে বিশ্বাস করতে হবে না, এটলিস্ট আমার কথাটা রাখ ব্যাপারটা ক্রীতিককে জানানো যাবেনা, কোন ভাবেই না।
— কি জানানো যাবেনা আমাকে সায়র?

পেছনের দরজা থেকে ক্রীতিকের চমৎকার পুরুষালী কন্ঠস্বর ভেসে আসতেই সায়রের চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম। আড়ালে শুকনো ঢোক গিলে সায়র শুধালো,—জজেকে তুই এখানে হঠাৎ?
ক্রীতিক এগিয়ে আসতে আসতে জবাব দিল,
— হুম একজন কে খুজছি। অর্নব সরতো,কে পরে আছে ওখানে?
এতোক্ষণ সায়রের কথায় মজা নিলেও এখন কেন যেন অর্নবের ও একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে। তাই ও নিঃশব্দে সরে গেলো। অর্নব সরতেই অরুর মলিন অবচেতন মুখটা দৃশ্যগত হলো ক্রীতিকের। খানিক্ষন আগে একটু একটু কাতরালেও এখন পুরোপুরি নিস্তব্ধ অরু। মায়বী,কোমল গোলগাল মুখটায় ফ্যাকাশে ছাপ সুস্পষ্ট। ক্রীতিক টু শব্দও না করে, চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে আলগোছে কোলে তুলে নিলো অরুর তুলতুলে নরম অসার শরীরটাকে। অর্নব সায়র কেউই ক্রীতিকের নিস্তব্ধতা নিতে পারছে না,এ যেন ঝ’ড়ের পূর্ব লক্ষন।
— কে করেছে এটা?
ক্রীতিকের আওয়াজ পেয়ে সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে সায়র জবাব দিলো,
— জানিনা, হঠাৎ কারও গো’ঙানির আওয়াজ পেয়ে ছুটে এলাম আর এসে দেখলাম অরুকে।
ক্রীতিক অরুকে নিয়ে ওই রুম ত্যাগ করতে করতে রু’ষ্ট কন্ঠে অর্নবকে আদেশ করার মতোই বললো,
— পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ গুলো সেন্ড করবি আমাকে। কোনো অন্ধকার রুমের ফুটেজও যাতে বাদ না থাকে। ঘড়ির কাঁটা তখন এগারোর ঘর ছুঁই ছুঁই। বাইরে

হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। রাস্তাটা পুরোপুরি নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে। একের একের সোডিয়ামের নিয়ন আলো পেছনে ফেলে সামনে এগুচ্ছে ক্রীতিকের কালোরঙা মার্সিডিজটা। নিজে ড্রাইভিং সিটে বসে,খুব সাবধানে প্যাসেঞ্জার সিটে অরুকে বসিয়ে সিট বেল্ট লাগিয়ে দিয়েছে ক্রীতিক। মাথাটা সাবধানে রেখে দিয়েছে গাড়ির ব্যাকসিটে।
যাতে অরুর কোনোরূপ কষ্ট না হয় তাই হাইওয়ে রাস্তাতেও খুব অল্প স্পিডে ড্রাইভ করছে ক্রীতিক। কিন্তু ভেতরের কুন্ডলী পাঁকানো ক্রো'ধের তোপে বারবার নিজের অজান্তেই সেই স্পিড বেড়ে যাচ্ছে দিগুণ। পরক্ষণেই অরুর মলিন অচেতন মায়া মায়া মুখের পানে তাকিয়ে সে স্পীড কমিয়ে আনছে পুনরায়।
এমন ভাবেই মেজাজের তারতম্য চলছিল পুরো রাস্তা জুড়ে, কিন্তু হঠাৎ করেই ফোনের ভাইব্রেট আওয়াজ পেয়ে পুরোপুরি গাড়ি থামিয়ে দিলো ক্রীতিক। অতঃপর ব্লুটুথ কানে লাগিয়ে ফোনের ভিডিওস চেইক করতে করতে বললো,— হ্যা বল অর্নব।
অর্নব ক্ষীণ আওয়াজে বলে,
— বলছি যে, যে এই কাজটা করেছে তার সাথে কি করবি?
ক্রীতিকের ফোনে ততক্ষণে আসল কা'র্লপিটের চেহারা ভেসে উঠেছে,
— তাকে তার কাজের পারিশ্রমিক দেবো।
চোয়াল শ'ক্ত করে কথার জবাব দিয়ে,কল কেটে, ভিডিওতে মনোযোগ দিলো ক্রীতিক,যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ক্যাথলিনের মুখের সামনে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানো, ও প্রথমে অরুকে রে'খেমে'গে কিছু বলে তারপর জামার আড়াল থেকে কিছু একটা বের করে

অরুর মুখের সামনে স্প্রে করতেই অবচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো অরু। অরু যখন পুরোপুরি অচেতন ঠিক তখনই এর থেকেও ভ'য়ংকর কাজ করতে উদ্যত হয় ক্যাথলিন। ও কোথা থেকে যেনো একটা কাঁ'চি এনে অরুর চুল গুলো মু'ঠিবদ্ধ করে ধরে সেগুলো কা'টার জন্য উদ্যত হবে, ঠিক তখনই সায়র আর অর্নব চলে আসে ওখানে, আর ক্যাথলিন লুকিয়ে পরে ডেকোরেশনের স্তুপাকার কাপড় চোপরের আড়ালে।
ক্রীতিক পুরো ভিডিওটা দেখে বিড়বিড়িয়ে বললো,— তারমানে ক্যাথলিন এখনো পার্টিতে উপস্থিত।
অতঃপর মোবাইলটা আগের যায়গায় রেখে অবচেতন অরুর দিকে খানিক ঝুঁকে গিয়ে মৃদু আওয়াজে ক্রীতিক বলে,
—আমার কথা কেন শুনিস না বলতো? কে আছে এই দুনিয়ায়, যে আমার মতো করে তোকে প্রটেক্ট করবে?
ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাসটাকে বের করে দিয়ে ক্রীতিক অরুর মুখটা তীক্ষ্ণ চোখে খুব কাছ থেকে পড়খ করে বলে,
— আ'ম সরি হার্টবিট। বাট আই উইল টেইক রি'ভেঞ্জ। গতকাল রাতের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে হাতের কফিটা শেষ হয়ে গিয়েছে টের পায়নি ক্রীতিক। কিন্তু যখন টের পেলো মগটা পুরোপুরি খালি হয়ে গিয়েছে তখন ও কফি হীন চ্যাটচ্যাটে মগটার দিকে তাকিয়ে কপট হেঁসে বললো,— সরি ক্যাথলিন, তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের কাজিন, কিন্তু তুমিতো খুব বড় ভু'ল করেছো, আমার দূর্বলতায় হাত দিয়ে ফেলেছো, তাই ছোটখাটো শা'স্তি তো তোমাকে পেতেই হতো।

ক্রীতিক নিজ কথা শেষ করে সিরামিকের কফির মগটা আস্তে করে ফেলে দিলো মেঝেতে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট ঝনঝন আওয়াজে মুখরিত হলো পুরো অফিস রুম। এতোকিছুর পরেও ক্রীতিকের মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন গেঁথেই রয়,
সব কিছু রেখে শুধুমাত্র অরুর চুলই কেন কা'ট'তে গিয়েছিল ক্যাথলিন?দিনের অন্তিম প্রহর চলমান। সূর্য পশ্চিম আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে সেই কবেই। তাও সূক্ষ্ম সোনালী মিয়িয়ে যাওয়া আলোর ছঁটা দেখে মনে হয় রাত নামেনি,এখনো সন্ধা বেলাতেই আটকে আছে প্রকৃতি। পশ্চিম আকাশে সূর্যের শেষ আলোটুকু হানা দিলেও পুব আকাশে ঠিক তার বিপরীত।সেথায় ঘন-কালো মেঘ গুরগুর করছে, এক পলক তাকালে মনে হয় এখনই তুফান ধেয়ে আসবে।
ভর সন্ধ্যা বেলা মেঘমল্লার গুরগুরানি আর দমকা হাওয়া পেছনে ফেলেই বাসায় ফিরেছে ক্রীতিক। সাধারণত সপ্তাহে তিনদিন ম্যাক্রোকোনোমিক্স এর উপর ক্লাস থাকে ক্রীতিকের। এছাড়া বাকিটা সময়, পাহাড়ি দূ'র্গম কোন রাস্তায় বাইক রাইডিং নয়তো অন্ধকার রুমে শুয়ে বসে অডিও বুক শুনে কাটিয়ে দেয় ও। নিজের একঘেয়ে জীবনটা বর'ই অপ্রীতিকর ক্রীতিকের কাছে।মাঝেমধ্যে ই মনে হয়, এমন জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়।সোনার চামচ মুখে নিয়ে বিত্তশালী পরিবারে জন্ম নেওয়া ক্রীতিকের আশেপাশে মানুষের অভাব ছিলোনা কোনো কালেই।তবুও সে ছিল চিরাচরিত একা। এতো টাকা, পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স ক্ষমতা সব কিছুই ওর কাছে মূল্যহীন ছিল বরাবরই, বুঝ হবার পর থেকে কোনদিন কোনো আবদার অপূর্ণ থাকেনি ক্রীতিকের। হোক সেটা ন্যায়

আবদার কিংবা অন্যায়। এই সোনায় মোড়ানো জীবনে ক্রীতিক আজন্ম যেটা পায়নি সেটা হলো, ভালোবাসা,আদর, স্নেহ আর পরিবার নামক অদৃশ্য বন্ধন। যার দরুন ছোট থেকেই নরম হৃদয় তৈরি হওয়ার জন্য সকল উপকরণ সর্বেসর্বা বাদ দিয়ে, স্কুল, কলেজ,ভার্সিটি সব খানে তৈরি করেছে নিজের ক্ষমতা আর নেতৃত্বের প্রভাব। নেতৃত্ব আর কতৃত্বের মাঝে র'ক্ত মাং'সের হৃদয়টা কবেই যে পাথর রুপ ধারণ করেছে তা টের পায়নি ক্রীতিক। ঢাকা দক্ষিণের প্রাক্তন মেয়র তারউপর বর্তমান মন্ত্রী জামশেদ জায়ান চৌধুরীর একমাত্র ছেলে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। পাবলিক ভার্সিটির বাঘা বাঘা ছাত্র নেতা থেকে শুরু করে এলাকার ছোট বড় পাতি নেতা,সবাই সমীহ করে চলতো নর্থসাউথে পড়া অবাঙালি চেহারার ক্রীতিককে। পুরান ঢাকার অলিতে গলিতে যে কোন চায়ের আড্ডা কিংবা মিছিল মিটিং ক্রীতিকের নাম ছিল সবার মুখে। দিন আর রাত নেই, মা'রামা'রি কা'টাকা'টি, মিছিল মিটিং থেকে শুরু করে সব কিছুতে ক্রীতিকের এক ইশারায় সবাই তৎক্ষনাৎ হাজির হতো বিনাবাক্যে। সে সসময়ে পুরান ঢাকার রাস্তাঘাটে সবাই একই বুলি আওরাতো,—-জামশেদ জায়ানের বডিগার্ডের দরকার নেই ,তার ছেলে একটাই একশো।
একটা অপারগ, অনিশ্চিত, হৃদয় নিংড়ানো অদম্য কষ্টকে হটাতে হৃদয়টাকে পাথর বানিয়ে, নেতৃত্বের জয়জয়কারে তখনও ভালোই ছিল ক্রীতিক। উঠতে বসতে দলের লোকেদের ভালোমন্দ খেয়াল রাখতে রাখতে সময় কে'টে যেত ওর। কিন্তু আটবছর আগে হঠাৎ করে হৃদয়ে অরুর আগমন, আর অরুর সাথে করা সেই ছোট্ট

একটা ভুলের জন্য সব ছাড়তে হয়েছিল ওকে। নিজের বাড়ি,নিজের দেশ,নিজের কতৃত্ব, নিজের দল, নিজের লোক সব,সবকিছু। সবকিছু ছেড়ে হাজার মাইল দূরে এসে,ধরাবাধাহীন ক্রীতিক কে বন্ধী হতে হয়েছিল আমেরিকার মতো নিয়মতান্ত্রিক সমাজে। তখন থেকেই মানুষের উপর ক্রীতিকের চরম বি'রক্তি। তখন থেকেই ওর কাছে ভালোবাসার মানেই স্বার্থ হাসিল। স্বার্থের পৃথিবীতে নিঃস্বার্থে ভালোবেসে বুকে টেনে নেওয়ার মানুষের উপস্থিতি কল্পনা বইকি কিছুই না। প্রথম দিকে আমেরিকার দিন গুলো ক্রীতিকের জন্য ছিল, ভ'য়ংক'র ক:ষ্টদায়ক আর বিভৎস। যে ক্রীতিক ডানে বামে, পেছনে, মানুষ ছাড়া এককদম বাইরে পা বাড়াতো না, সে নিজের জন্য একটা হাউজ মেইড কিংবা সার্ভেন্ট পর্যন্ত নিয়োগ দেয়নি। আমেরিকা আসার পরেই যোগাযোগ ছিন্ন করেছে দেশের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা শুভাকাঙ্খীর সাথে। এমন কি নিজের বাবার সাথেও। দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে কক্ষব'ন্ধী দূর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে ও । এভাবে দিন মাস যেতে যেতে একটা পর্যায়ে এসে উ'গ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে ক্রীতিক। হুট করে রে'গে যাওয়া, যাকে তাকে একটুতেই আ'ঘাত করে বসা, দিকভ্রান্তের মতো বাইক রাইড করা থেকে শুরু করে নিজেই নিজের হা'ত কাঁ'টা কি করেনি ও। ক্রীতিক যখন নিজেই নিজের জন্য অনিরাপদ হয়ে পরে,তখনই এঞ্জেল এর মতো আবির্ভাব ঘটে ওরই মতো ছ'ন্নছাড়া আরও তিনজন মানুষের। তাদের জীবনেও ভালোবাসার বড্ড অভাব। একেকজনার জীবন যেন একেকটা ট্রা'জেডী। এলিসা, অর্নব আর সায়রই পরক্ষনে সাইক্রিয়াটিস্টের পরামর্শে একটু একটু করে, সাভাবিক করে তোলে ক্রীতিককে। ওই জন্যই তো ক্রীতিকের

হাউজ পাসওয়ার্ড প্রতিবার হ্যা'ক করে ওরা। আর সাইক্রিয়াটিস্টের পরামর্শ মতেই প্রত্যেক উইকএন্ডে একজন না একজন চলে আসে জনমানবহীন শুনশান এই শহরতলীতে।
আর অরু? সেতো তখন খুব ছোট ক্রীতিকের পুরুষালী হৃদয়ে হঠাৎ করে জন্মানো অজানা মায়া, অজানা অনূভুতি, অজানা আসক্তি কিছুই ওর বোধগম্য নয় তখন। তবুও ক্রীতিকের অরুর উপর আকাশসম রা'গ,জি'দ আর অভিমানের ছড়াছড়ি। আট বছর পরে এসেও না ও অরুকে ভুলতে পেরেছে আর না নিজের রা'গটা অরুর উপর ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে।এতোবছর পর আবারও আটকা পরেছে বহুদূরে ফেলে রেখে আসা সেই পুরনো মায়াডোরে।কেনইবা পরবে না? অরুর প্রতি ক্রীতিকের আসক্তি টা যে এক দুদিনের নয়, তারউপর অরু এখন সদ্য যৌবনে পা রাখা অষ্টাদশী রমনী। ক্রীতিক যখন মায়ায় পরেছিল তখন নিতান্তই কিশোরী অরু, গরন বরন ও তেমনই ছিল।আর এখন, সর্বাঙ্গে রূপের ছড়াছড়ি তার।
কি নেই? ভালোবাসা হীন একাকী হৃদয়ের ক্রীতিকের অদম্য বাসনা পূরনের জন্য সব কিছুই উপস্থিত ওর মাঝে। তাহলে ক্রীতিক কেন পারছে না খুব সহজে অরুকে আপন করে নিতে? ক্রীতিক তো সমাজের নিয়ম কিংবা নি'ন্দা কোনোটাতেই পরোয়া করেনা কোনোকালেই , তবুও হৃদমাঝারে কেন এই পাহাড়সম দূরত্ব ?
আপাতত নিজ মন গহীনের অযাচিত প্রশ্নের কোন উত্তরই নেই ক্রীতিকের কাছে। তাই পেছনের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ভেতরের দীর্ঘশ্বাস নিংড়ে বের করে পাসওয়ার্ড টিপে মেইন ডোরের লক খুলে ঘরের দিকে পা বাড়ায় ক্রীতিক।পুরো হলরুম

না,পুরো বাড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তিমিরে ঢাকা ঘরের দুয়ারে পা রাখা মাত্রই, পায়ের কাছে নরম কিছুর অনুভূতি হতে, ভ্রুকুঞ্চিত করে নেয় ক্রীতিক। তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে জ্বলতে থাকা সবুজ চোখ জোড়া দেখে বুঝতে পারে এটা অরুর নেউটে বিড়ালটা। বিড়াল এখানে তাহলে অরু কই? তাছাড়া বিড়াল সব যায়গায় গেলেও ঘুনাক্ষরেও ক্রীতিকের সামনে আসেনা, তাহলে আজ হলোটা কি? আশ্চর্য। বিড়ালের এমন আকষ্মিক গায়ে মাথামাথি ভাব দেখে ভাবনায় পরে গেলো ক্রীতিক। তাই দেরি না করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো লাইটের সুইচবোর্ডের কাছে। অন্ধকারে ক্রীতিক নতুন হাটছে না, তাই সুইচবোর্ড পর্যন্ত যেতে মোবাইলের আলো জ্বালানোর আর প্রয়োজন পরেনি ওর।একযোগে পুরো বাড়ির প্রত্যেকটা রুমের আলো জ্বালিয়ে ডোরাকে খুজতে দরজার দিকে চোখ রাখলো ক্রীতিক,কই দরজার কাছেতো নেই,তাহলে? চারিদিকে হাতরিয়ে একটু পর খেয়াল করলো বিড়ালটা ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। বিড়ালের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে ক্রীতিক বললো,
— হোয়াটস রং? কাপড় নোংরা করছিস কেন? এক্ষুনি দুরে যা বলছি। নয়তো তোকেও তোর মালকিনের মতো চ’ড়ি’য়ে গাল লাল করে দেবো।
ক্রীতিকের বাংলা ইংরেজি মিলানো ধমকেও কাজ হলোনা,ডোরা আগের ন্যায়ই দাঁড়িয়ে আছে। সেই দেখে ক্রীতিক দুকদম পিছিয়ে গিয়ে বললো,—- ইউজলেস ক্যাট, কথা না শুনলে একদম ঘর থেকে বের করে দেবো। যেমন মালকিন তার তেমন পোষা বিড়াল, নিজে

সারাদিন বে'য়াদবি করে করে, বিড়ালটাকেও বে'য়াদবি শিক্ষা দিয়েছে। ইচ্ছে করছে দুটোকেই ধরে আ'ছাড় মা'রি।
ডোরার দিক থেকে পাকাঁনো চোখ সরিয়ে ক্রীতিক দোতলার করিডোরের দিকে তাকিয়ে চেচাঁতে লাগলো,
—- কোথায়, তোর বে'য়াদব মালকিনটা? কতবার বলেছি আমার চোখের সামনে যাতে এই নেউটে বিড়ালটা না আসে। একে দেখলে আমার ইরেটেটিং হয়। অরু,এ্যাই অরু এক্ষুনি নাম নয়তো তোর বিড়ালকে ঘাড় ধরে বের করে দেবো আমি। অরু???
ডোরা কাঁউচের সামনে গিয়ে মিঁয়াও মিয়াঁও করছে দেখে ক্ষী'প্ত ক্রীতিকের চোখ গেলো সেদিকেই। দেখলো কাউচের উপর জুবুথুবু হয়ে কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে অরু। হাটু সমান লম্বা খোলা চুল গুলো মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর I দেখে মনে হচ্ছে চেতনা নেই।
অরুকে এমন অসার হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে ক্ষনিকের মাঝে হৃদপিন্ড ধরাক করে উঠলো ক্রীতিকের। এতোক্ষণ ধরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মেজাজটা দপ করে নিভে গিয়ে অজানা ভয়ে ছেয়ে গেলো মস্তিষ্ক। ও এক পা দু'পা করে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে কাউচের সামনে অরুর মুখোমুখি হয়ে বসে পরলো, অতঃপর মৃদু আওয়াজে ডেকে উঠলো,— অরু?
অরু নিশ্চুপ।
গলার মাঝে কাঁ'টার মতো তীক্ষ্ণ কিছু বিঁধছে মনে হচ্ছে গলার স্বর বের হওয়ার যো নেই,ক্রীতিক সেটাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে আবারও ডাকলো অরুকে।
—- অরু,

এবার গলার স্বরটা আরও খানিকটা নরম শোনালো ওর।
এক বার, দুইবার, তিনবারের সময় ব্যাস্ত হয়ে পরলো ক্রীতিক, ভেতরে জমিয়ে রাখা দূরত্ব, জরতা,অভিমান,আক্রোশ সব কিছুকে সাইডে সরিয়ে, দু'হাতে আঁজলা করে ধরলো অরুর জ্বরে লাল টকটকে হয়ে যাওয়া মুখটা।অতঃপর উদগ্রীব হয়ে ওর মুখমন্ডল ঝাঁকিয়ে উঠে বললো,
—- অরু,এই অরু, হার্টবিট, ক্যান ইউ হেয়ার মি?
এই প্রথম মনে মনে নয় বরং মুখ ফুটে অরুকে আদুরে নামে ডাকছিল ক্রীতিক। যদিও ক্রীতিকের আপাতত কোনোকিছুতেই খেয়াল নেই। ও তো স্রেফ অরুকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে।অবশেষে প্রায় আধঘন্টার প্রচেস্টায় ঢুলুঢুলু করে চোখ খোলে অরু, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তীব্র জ্বরে কি যেন বিড়বিড় করছে অস্পষ্ট আওয়াজে। অরু চোখ খুলেছে দেখে সস্থির নিঃশ্বাস ছাড়ে ক্রীতিক। মনে মনে ঠিক করে এখনই একবার ডক্টর কে কল করে আনতে হবে।
কিন্তু ওর ভাবনার ছেদ ঘটে তপ্তদুটো নরম হাতের ছোঁয়া পেয়ে। জ্বরের ঘোরেই দুহাতে ক্রীতিকের গলা জড়িয়ে ধরেছে অরু।
ক্রীতিক সে অবস্থাতেই স্থীর হয়ে বসে আছে,যেন নড়াচড়া করতেই ভুলে গিয়েছে ও। এবার পাশঘুরে শুয়ে নিজের হাতদুটো আরও শক্ত করে নিলো অরু। সঙ্গে সঙ্গে অরুর দিকে ঝুঁকে পরলো ক্রীতিক, অরুর তপ্ত প্রশ্বাস, কাঁপা কাঁপা অধর আর নিঃশ্বাসের তালে তাল মিলিয়ে বারবার ওঠানামা করা ধনুকের মতো শরীরটা এক ঝলক পরখ করে দ্রুত চোখ নামিয়ে নেয় ক্রীতিক।অরু জ্বরে পুড়ছে, এই সময় নিজের মস্তিষ্কের অযাচিত কামুক চিন্তা ধারা গুলো একধাক্কায়

সরিয়ে দিয়ে ও জ্বরের ঘোরে থাকা অরুকে শুধালো,—- অরু, ক্যান আই টাচ ইউ?
অস্পষ্ট সুরে কিছু একটা বিড়বিড়ালো অরু,ক্রীতিকের কান অবধি তা পৌঁছায় নি। তাও নিজের কোর্ট আর টাইয়ের নট’টা খুলে সেগুলোকে একপ্রকার ছু’ড়ে ফেলে, কাউচের উপর উঠে বসে, কম্ফোর্টার সহ’ই আলগোছে অরুকে কোলের মাঝে নিয়ে নিলো ক্রীতিক।
কম্ফোর্টার আর ক্রীতিকের শরীরের ওমে, মূহুর্তেই মুখের বিড়বিড়ানি বন্ধ হলো অরুর,মনে হয় শীত কমেছে।
ক্রীতিক অরুর মুখের পানে তাকিয়ে বলে,
—- এমন কেন করিস অরু? আমাকে কি একটু আপন ভাবা যায়না? একটা কল দিলে কি হতো? আমি নাহয় খুব খারাপ, অনুকে কি কল দেওয়া যেত না? এতো বেখেয়ালি কেন তুই?? তুই এমন করলে আমার অগোছালো জীবনটা কে সাজাবে বল?
অরুর কাছ থেকে জবাব আসেনা, আসার কথাও না, অরুতো এখন নিজের মাঝেই নেই।
ক্রীতিক একটু থেমে আবার বলে,—- এখন তুই জ্বরের ঘোরে আছিস,কিছু বললেও মনে থাকবে না তোর, রাইট??এখন যদি আমি বলি,
ক্রীতিক কয়েক সেকেন্ড চুপ রইলো তারপর বললো,
—- কিছুনা। তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে বোঝার,আর আমাকেও তোর বুঝেই নিতে হবে। নেক্সট টাইম নিখিল নিখিল করলে তোকে চি’বিয়ে খাবো আমি। সেই সাথে ওই ধূর্ত নিখিলকেও পুঁ’তে রেখে দিয়ে আসবো ।

. বেশ অনেকটা সময় পর অরুকে কোলে তুলে রুমে শুয়িয়ে দিয়ে আবারও নিচে নামে ক্রীতিক। ফর্মাল শার্টের উপরেই এ্যাপ্রোন পরে পুরো রুম গুছিয়ে ফেলে সে। তারপর কিচেনে গিয়ে হোয়াইট পোরিজ বানিয়ে নিয়ে যায় অরুর কাছে। মাথার জলপট্টিটা উল্টে দিয়ে অরুর মুখে একটু একটু পোরিজ দিতে দিতে ক্রীতিক আহত সুরে বলে,

—— আমি খুব খারাপ তাইনা? সব সময় কষ্ট দিই তোকে। কথার আ'ঘাতে হৃদয়টা বিষিয়ে দিই। কি করবো বল? তোর জন্যই আমি এমন....ক্যাফের সর্বশেষ কাস্টমারকে বিদায় জানিয়ে মাত্রই পার্ট টাইম শেষ করে বেরিয়েছে অনু। আজ কাজের অনেক চাপ ছিল, তার উপর সেই সকালে বেরিয়েছে,আসার আগে দেখে এসেছে অরুর শরীরটা ভালো নেই,তাই দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে ফোন বের করে ডায়াল করলো ক্রীতিকের বাসার ল্যান্ডলাইনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলটা কেউ তুললো না, বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। অনু অবশ্য ছাতা নিয়েই এসেছে সাথে করে, তাই আর বৃষ্টি কমার অপেক্ষা না করে ছাতা মাথায় বেড়িয়ে পরলো বাড়ির উদ্দেশ্যে।

রাতের বেলায় ঝুম বৃষ্টিতে পিচ ঢালা রাস্তা গড়িয়ে গড়িয়ে পানি পরছে গিয়ে ঢালু জমিনে। কুর্তি আর স্কিনি ডেনিম পরিহিতা অনু,সেই বৃষ্টির পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে হাটছে ঠিক ছোট বেলার মতো। এভাবে কিছুক্ষণ হাটতে হাটতে অনু খেয়াল করে ও একা নয় ওর পাশে আরও একজন ওর সাথে তাল মেলাচ্ছে। বিস্ময়ে, বিহ্বলিত হয়ে অনু ছাতা তুলতেই দেখতে পায় পরিচিত সেই হাসি মুখখানা। প্রত্যয়ের মুখটা একবার পরখ করে আবারও ছাতা

নামিয়ে নিয়ে অনু বলে,—— আপনি সবসময় রাতের বেলা উদয় হোন কেন বলুনতো?
—-- কারন আমি চাঁদ।
অনু একই ভাবে ছাতা তুলে শুধালো,
—— কি বললেন?
প্রত্যয় এবার নিজের ছাতাটা উঁচিয়ে বলে,
—-- দিনের বেলা অফিস থাকে ম্যাডাম।
নিজের কাজ জেকে ভাইয়ের কাজ দু'টো একসাথে সামলাতে হয়।
—-- আপনি ক্রীতিক ভাইয়াকে ভাই ডাকেন কেন?
প্রত্যয় জবাব দেয়,—-- সে আমার বহু পুরোনো বড় ভাই। সে জন্য।
—-- আর আপনার পরিবার?
—— সবাই আছে বিডিতে।
অনু বুঝতে পারার মতো উপর নিচ মাথা নাড়ালো।
ততক্ষণে উল্টে প্রশ্ন ছু'ড়লো প্রত্যয়,
—-- আপনার মা তো কোম্পানির চেয়ার ওয়েম্যান, তাহলে এতো কষ্ট করে পার্ট টাইম কেন করেন?
অনু হাসার চেষ্টা করে বললো,
—— আমাদের আর ক্রীতিক ভাইয়ার সম্পর্কের জটিলতা তো জানেনেই। উনি মায়ের চিকিৎসার জন্য এতোএতো খরচ বহন করছে সেই অনেক। তাছাড়া মায়ের অধিকার থাকলেও আমাদের তো এসবে কোনো অধিকার নেই, তাই নিজের আর অরুর হাত খরচ মেটানোর জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটার ব্যাবস্থাই করা আর কি।

অনুর আত্মসম্মান প্রগার, নিতান্তই ঠ্যাকায় পরে মাকে নিয়ে এতোদূর এসেছে, অনুর কথার টোনে তা স্পষ্ট বোধগম্য হলো প্রত্যয়ের। তাই ও এসব ফিন্যান্সিয়াল কথার বাইরে গিয়ে শুধালো,—- আপনার মা এখন কেমন আছেন?
অনু হাসি মুখে জবাব দেয়,
—- ভালো আছেন। ডাক্তার বলেছেন শারীরিক উন্নতি হচ্ছে দ্রুত। এরকম হলে খুব শীঘ্রই অপা'রেশন করানে সম্ভব হবে।
প্রত্যয় সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
—- আপনাকে খুশি দেখতে ভালো লাগছে। আপনার হাসিটা আমার হৃদয় ছুয়ে যায়। দেখলে মনে হয়,হৃদপিন্ডে ছো'ড়া তরতাজা তী'রের ফলা।
অনু হাটার গতি পুরোপুরি থামিয়ে দিয়ে প্রত্যয়ের পানে চেয়ে বললো,—- প্রত্যয় সাহেব, বৃষ্টিতে ভিজবেন? বসন্তের বৃষ্টিতে?
প্রত্যয় তৎক্ষনাৎ নিজের ছাতা ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো,
—— আপনার এই খুশিটুকু ধরে রাখার জন্য জান কোরবান।
প্রত্যয়ের সাথে সাথে অনুও নিজের ছাতাটা নামিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বরফ শীতল বারিধারা এসে ছুঁয়ে যায় দুটো উচ্ছ্বাসিত,রোমাঞ্চকর প্রান।অন্ধকার বদ্ধ রুমে আটকে থাকার ফলস্বরুপ, অরুর শরীরে যে জ্বরের দাপদাহের সূচনা হয়েছিল,আজ প্রায় পাঁচ দিনের মাথায় তা একটু একটু কমেছে। জ্বর পুরোপুরি না কমলেও অরু যেচে পরে সবার কাছে নিজের সুস্থতা প্রমান করতে চাইছে, কারণ আগামীকাল নিখিলদের ট্যুর।

ধরনীতে নতুন সূর্য উদীয়মান। সুন্দর ঝকঝকে সকাল। ছাঁদবারান্দার ফাঁক গলিয়ে সূর্যের তীক্ষ্ণ মোলায়েম আলো এসে হানা দিচ্ছে দোতলার সরু করিডোরে। রুম থেকে বেরিয়ে, করিডোর ধরে সামনে এগুচ্ছে অরু, সাথে পিছু নিয়েছে ওর ছায়াটাও। গন্তব্য ক্রীতিক সাহেবের রুম। ক্রীতিকের রুমটা করিডোরের শেষ প্রান্তে। হাতে একটা ম্যাক্রোকোনোমিক্সের বই আর ডোরাকে কোলে নিয়ে ক্রীতিকের রুমের দরজায় এসেই থামলো অরু। সেই যে প্রথম দিন এসে ক্রীতিকের বেডে ঘুমিয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওর রুমের চৌকাঠ অবধি মাড়ায়নি অরু। কিন্তু আজ তো আসতেই হতো, যে করেই হোক ক্রীতিককে রাজি করিয়ে, আগামীকাল ভার্সিটিতে যাওয়ার ব্যাবস্থা করতেই হবে, আর তার পর ভার্সিটি থেকে সোজা নিখিল ভাইয়ের সাথে ট্যুরে।
সেই কখন থেকে দরজার সামনে সটান দাড়িয়ে আছে অরু। নক করতে কেমন যেন ইতস্তত লাগছে ওর। রুমের দরজা লাগিয়ে ক্রীতিক কি না কি করছে, কি করছে কে জানে? দেখা গেলো নক করতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে অকস্মাৎ থাপ্প:ড় লাগিয়ে দিলো দু'গালে। সেসব হাবিজাবি ভেবে শুষ্ক একটা ঢোক গিলে বুকের মাঝে অনেকটা সাহস জুগিয়ে শেষমেশ দরজায় টোকা মে'রেই দিলো অরু। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কাঠকাঠ আওয়াজ ভেসে এলো ক্রীতিকের,— কি চাই?
অরু বাইরে থেকেই জবাব দিল,
— কিছু চাইনা, একটু একটু....
অরু কথা শেষ করার আগেই ক্রীতিক বললো,
— দরজা খোলাই আছে।

ক্রীতিকের জবাব শুনে অরু তারাহুরো করে ডোরাকে কোল থেকে নামিয়ে নিজের শরীরটা ঝেড়েঝুরে ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে ঢুকতেই অরু দেখতে পায় ক্রীতিক তোয়ালে দিয়ে চুল মুচ্ছে,পড়নের ট্রাউজার আর টিশার্ট দুটোর রঙই কালো। মনে হচ্ছে শাওয়ার শেষে মাত্রই বেরিয়েছে সে। পুরোরুম জুড়ে স্যান্ডালউড পারফিউম আর মাতাল করা পুরুষালী গন্ধ মো মো করছে। ক্রীতিকের রুমে, ক্রীতিকেরই সামনে দাড়িয়ে, অরু বেহায়াদের মতো মনে মনে ভাবছে,— আচ্ছা, রুম থেকেই এতো সুন্দর সুঘ্রাণ বের হচ্ছে। তাহলে ওনার শরীরের গন্ধটা কেমন? ওনার বউতো মনে হয়, ওনার শরীরের সুঘ্রানেই পাগল হয়ে যাবে।
আপন মনকে দাঁত খিঁচিয়ে অরুর অন্যমনটা বলে ওঠে,
—ছি ছি আবারও ভুলভাল ভাবছি। তওবা তওবা।
অরুকে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে থাকতে দেখে ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,
—কিছু বলার না থাকলে যেতে পারিস। আমি রেডি হবো, ম্যাচ আছে।
অরু তৎক্ষনাৎ ভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে বললো,
— ইয়ে মানে, একটু পড়া বুঝতে এসেছিলাম কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।
অরু পড়া বুঝতে এসেছে তাও ক্রীতিকের কাছে?ব্যাপারটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়,নিশ্চয়ই ঘাবলা আছে,সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে ক্রীতিক, তবুও অরুর উদ্দেশ্য ধরার জন্য বললো,

— আমি যখন ক্লাসে লেকচার দিই,তখন মন কোথায় থাকে তোর? বিশ্বাস কর অরু ফার্স্ট সেমিস্টারে ফেইল করলে তোকে আর পড়াবো না আমি।
অরু ঠোঁট উল্টে বললো,— এতোকথা কেন শোনাচ্ছেন, দিননা একটু বুঝিয়ে, টিচার হোন আপনি আমার,স্টুডেন্টের প্রতি এইটুকুনি কর্তব্য তো আছে, নাকি?
— তোর আমাকে কর্তব্য শিখাতে হবে না।এসব কর্তব্য টর্তব্যের ধারধারিনা আমি।
অরু জানে ও কিছুতেই ক্রীতিকের সাথে তর্কে পেরে উঠবেনা, তাই দমে গিয়ে নরম সুরে অনুনয় করে বললো,
—- দিননা প্লিজ।
অরুর অনুরোধে বোধ হয় কাজ হলো,ক্রীতিক অরুর মুখের উপর নিজ তোয়ালেটা ছু'ড়ে মে'রে বললো,
— ঠিকাছে বুঝিয়ে দিবো, তার আগে কাজ শেষ কর।
অরু কয়েক কদম এগিয়ে এসে ক্রীতিকের মুখ বরাবর দাঁড়িয়ে ওর চুল ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, পা উঁচু করে, দু আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে ক্রীতিকের চুল মুছতে যাবে, তার আগেই ক্রীতিক ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো,— হয়েছে আর লাগবে না, এইটুকু কাজ সেটাও ঠিক মতো করতে পারিস না, বিয়ে হয়ে গেলে তখন কি করবি?
অরু মিনমিনিয়ে বললো,
— খাম্বার মতো দাড়িয়ে ছিলেন কেন?মাথাটা একটু নোয়ানো যেতো না?
— কিছু বললি?

অরু না সূচক মাথা নাড়ালো।
— কোন টপিকটা দেখিয়ে দিতে হবে?
অরু বই সমেত ক্রীতিকের দিকে এগিয়ে এলেই ওকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে ক্রীতিক বলে,
— খবরদার কাছে আসবি না, যা বলার ওখানে দাঁড়িয়ে বল।
— কাছে না এলে, পড়া বুঝবো কি করে?
— সে আমি জানিনা, তুই আমার কাছে আসবি না ব্যাস। অরু অসহায় মুখে ক্রীতিকের পানে তাকিয়ে আছে, আর ক্রীতিক তীর্যক চোখে অরুর আগা গোড়া পরখ করছে,কালো ফ্রক আর লেগিংস, সেই সাথে মেঘের মতো ঘন কালো লম্বা চুল। সব কিছু কালোরঙ দিয়ে মুড়িয়ে রাখায় ফর্সা শরীরটা যেন জলজল করছে ওর। দেখলেই কেমন চোখ ধরে যায়। হৃদয়টা নিসপিস করে।
কিছু একটা ভেবে ক্রীতিক অরুর উদ্দেশ্যে বলে,
— তুই স্টাডি টেবিলে গিয়ে বস, আমি এখান থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছি।
অরু ক্রীতিকের কথা মতো তাই করলো। গিয়ে বসলো ক্রীতিকের অত্যাধুনিক টেবিল চেয়ারে। এরপর শুরু হলো ক্রীতিকের প্রফেশনাল আচরণ। একে একে পুরো চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা টপিকের উপর টানা একঘন্টা লেকচার দিয়ে তবেই থামলো সে। এই একঘন্টায় অরু পাঁচ মিনিট ঠিক মতো শুনেছে কিনা সন্দেহ। ও কতক্ষণ নিখিল ভাইয়ের কথা ভেবেছে, তো কতক্ষণ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রীতিকের রুমটা পর্যবেক্ষন করেছে। পুরো রুমটা গ্রে থীমে সাজানো। সবকিছুতেই কেমন অন্ধকার অন্ধকার ভাব। দেখলে

মনে হবে,রুমের সব আসবাবপত্র মুখ গোমড়া করে বসে আছে। যেমন মালিক তেমন তার ঘর বোরিং।— কি বোরিং?
ক্রীতিকের হঠাৎ ছোঁ'ড়া প্রশ্নে কম্পিত হয়ে উঠলো অরু, মুখ ফসকে কখন যে কথা বেরিয়েছে সে খেয়াল নেই ওর। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে,তারাহুরো করে উত্তর দিল,
— আআপনাকে বলিনি, রুমের কথা বলেছিলাম।
ক্রীতিক নিজের কপালে গম্ভীরতার ভাজ টেনে এগিয়ে এসে অরুর গাল চেপে ধরে বললো,
— আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছিস কেন? কি চাই, সত্যি করে বল?
ক্রীতিকের র'ক্ত চক্ষুর দিকে একপলক তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে অরু বলে,— আমি কাল ভার্সিটিতে যেতে চাই।
— কেন, কাল কি আছে?
নিখিলের ব্যাপারটা পুরোপুরি এরিয়ে গিয়ে অরু বলে,
— এএ..একদিনের একটা ট্যুর আছে, শুধু আমাদের ব্যাচ। সবাই যাবে, তাই আমিও যেতে চাই।
ক্রীতিক কিছুক্ষণ নিস্প্রভ তাকিয়ে রইলো অরুর মুখের পানে, তারপর বেশ সাবলীল ভাবে জবাব দিলো,
— ওকে ফাইন।ইউ ক্যান গো।ক্রীতিকের সম্মতি পাওয়ার সাথে সাথে অরুর বুক থেকে যেনো পাথর নেমে গেলো। চোখ দুটো চিকচিক করে উঠলো খুশিতে। সবচেয়ে কঠিন কাজ সম্পাদন করার মতোই আনন্দ হতে লাগলো ভেতরে ভেতরে। ও আর ক্রীতিকের রুমে বসে থাকলো না,কারণ এখানে তো ওর আর কোনো নেই,তাই নাচতে নাচতেই বেরিয়ে গেলো রুম থেকে।

বুকে দু'হাত গুঁজে টেবিলে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে অরুর যাওয়ার পানে তাকিয়ে ক্রীতিক বললো,
— কি সুন্দর মিথ্যা কথা বলতে শিখেছিস জান।
কথাগুলো বলার সময় অ'গ্নিস্ফুলিঙ্গের মতোই চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল ওর। বিকেল বেলা এলিসা আর অর্নব এসেছে ক্যাথলিনের ডরমেটরিতে। গত একসপ্তাহ ধরে মেয়েটার কোন হদিস নেই। এলিসার বাবা জে'ল থেকে ছাড়া পেয়েছে কয়েকমাস হলো। সেই থেকেই বিভিন্ন পকার ক্লাব থেকে একেরপর এক হু'মকি আসছে ওর নিকট। সবাই নাকি ওর বাবার কাছ থেকে টাকা পায়, ওর বাবা বারবার জু'য়ায় হেরে মোটা অঙ্কের ঋণগ্রস্থ। এখন এলিসাকেই সেইসব টাকা পকার খেলে শোধ করতে হবে। নয়তো ওর বাবাকে শ্যু'ট করে মে'রে ফেলা হবে। এলিসা কখনোই চায় না ওর বাবা টাকার জন্য মা'রা যাক, কিন্তু আগের বার ঠিক একই কৌশলে এলিসাকে ওই পাপের খেলায় সামিল করেছিল ওর বাবা। এবারও যে একই নোংরা কাজ করবে না তার গ্যারান্টি কি?
কারন ওর বাবার কাছে এলিসা মেয়ে নয়, কেবলই টাকা বানানোর মেশিন মাত্র। সেবার ক্রীতিক, অর্নব আর সায়রের সাহায্যে জুয়ার জগত থেকে বের হতে পেরেছিল এলিসা, অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার সেই একই পিছুটান ওকে তাড়িয়ে বেরাচ্ছে যত্রতত্র। এলিসা জানে এবার আর এতো সহজে সবটা সমাধান হবেনা,এবার হয়তো সত্যিই ওর বাবা জু'য়ারিদের হাতে মা'রা পরবে। মা'রা পরলে পরুক,তবুও আর ওই পাপের খেলা খেলবে না এলিসা। নিজের মধ্যে গুমোট হয়ে কুন্ডলী পাকানো এতো এতো দুশ্চিন্তার মাঝেই ক্যাথলিনের সাথে কি থেকে কি হয়ে গেলো। ওরই

বেস্টফ্রেন্ড এই নিন্দনীয় কাজটা করেছে, ভাবতেই লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে এলিসার।
—ক্যাথলিন মেয়েটা জেকে কে চোখে হারাতো অথচ জেকে এটা কি করলো?বিরক্তিতে ফোসফাস করছে এলিসা।
পাশ থেকে অর্নব বললো,
— ক্যাথলিনের আগেই বোঝা উচিৎ ছিল,ও যার লেজে পা দিয়েছে সে কোনো ডোড়া সাপ না,বরং বি'ষ দিয়ে ভরা ড্রাগন।
এলিসা ভ্রু কুঞ্চিত করে অর্নবের দিকে তাকিয়ে বললো,— কি এমন করেছে আমার ছোট্ট বোনটা? আর যদি কিছু করেও থাকে সেটা কি মুখে বলে সমাধান করা যেত না?? এরকম একটা অ'পমান জনক কাজ করতে হলো? একটা মেয়ের জন্য চুল ঠিক কতোটা ইমোশন ধরে রাখে তোরা ছেলেরা আদৌও তা বুঝিস? ভালো বলিস আর খারাপ বলিস জেকে একটা হার্টলেস, একটা মেয়ের চুল কে'টে দিতে ওর বুক কাঁপলোনা একবারও?
—- ক্যাথলিন যখন অরুর চুল কা'টতে গিয়েছিল তখন ওর বুক কেঁপেছিল?
অর্নবের কথায় ডরমিটরির গেইটে এসে হাটার গতি থেমে যায় এলিসার।
— কিহ! কার চুল কে'টেছে?
— কা'টেনি কা'টতে চেয়েছিল, তাছাড়া ক্যাথলিনই অরুকে ব্যাকস্টেজের বেজমেন্টে আট'কে রেখেছিল।
আরও একবার চমকালো এলিসা, মুখ ফুটে বললো,
— ক্যাথ হঠাৎ এসব কেন কেন করতে যাবে?
অর্নব এলিসার হাতটা ধরে যেতে যেতে বললো,

— সেটা তো আমারও প্রশ্ন। চল এবার ক্যাথলিনকে দেখে আসি।
এলিসা এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে বললো,
— হাত ধরেছিস কোন অধিকারে? হাত ছাড়।
অর্নব পুনরায় ওর হাতটা শক্ত করে ধরে বললো,
— তোকে আমি ভালোবাসি, বিয়ে করবো, তুই আমার ভবিষ্যত বাচ্চার মা, সেই অধিকারে ধরেছি, এখন চুপচাপ চল। ডরমিটরিতে এসে একটানা আধঘন্টা যাবত ডাকাডাকির পরে রুমের দরজা খুললো ক্যাথলিন। ওর চোখ মুখের অবস্থা বি'ভৎস দেখেই বোঝা যাচ্ছে সারাদিন রাত একাকার করে কেঁ'দেছে। বাদামি রঙের বেনি হ্যাট দিয়ে পুরো মাথাটা ঢেকে রেখেছে বলে, চুল আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। এলিসাকে দেখে পুনরায় আরও এক দস্তুর কেঁদে ভাসালো ক্যাথালিন। কাঁদতে কাঁদতে বললো,
— আপু জেকে ভাইয়া আমার সাথে এসব কেন করলো বলোতো?
এলিসা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শুধালো,
— এসব মানে?
ক্যাথলিন হেঁচকি টেনে জানায়, শুধু চুল কা'টা নয়, সেদিন ক্রীতিকের বাসায় ইলেকট্রিক্স শকট টাও ক্রীতিক ইচ্ছা করেই দিয়েছে।
ক্যাথলিনের কথায় এলিসা অর্নবের চোখ কপালে। এলিসা উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালো,
— তুই কি করে জানলি কাজটা ক্রীতিক করেছে?
— জেকে ভাইয়া নিজ মুখে বলেছে।
পেছন থেকে অর্নব শুধালো,

—কি বলেছে?— বলেছে তুমি আমার হৃদয়ে আ'ঘাত করেছো তাই তোমাকে সেদিন ইলেকট্রিক্স শক টা আমিই দিয়েছি। আর আজ আবারও একই ভুল করেছো, তাই আজও শা'স্তি দেবো। জানো আপু, তখন আমি জেকে ভাইয়াকে চিনতেই পারছিলাম না,কি ভ'য়ানক দেখতে লাগছিল,আর তারপর....কথাটুকু শেষ করার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠলো ক্যাথলিন।
অর্নব দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বিড়বিড়িয়ে বললো,
— সায়র ওয়াজ কমপ্লিটলি রাইট।হি ইজ অবসেশট উইথ হিজ স্টেপ সিস্টার। হলি শীট...মন মস্তিষ্কের আন্দোলন তীব্র বেদনাদায়ক।তারউপর মনের মানুষটার মন যদি হয় অন্যকারও দখলে। এতোদিন ধরে ক্রীতিক যেটা আড়ালে অনুভব করে এসেছে। আজ তা সরাসরি অনুভব করলো অরু। সকাল সকাল এতো এক্সাইটমেন্ট এতো আনন্দ সব কিছু পু'ড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এতোক্ষণে। হবে নাই'বা কেন? আনন্দঘন দিনের শুরুতেই বুঝতে পেরেছে নিখিল ভাই আসলে ওকে কথার কথা ট্যুরে ইনভাইট করেছিল। আসলে ওর যাওয়া না যাওয়ায় নিখিলের কিছুই আসে যায়না।
সকাল সকাল বাসে উঠে অরু যখন নিজের পাশের বে'দখল সিটটা নিখিলের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল, তখনই বাসের লুকিং গ্লাসে অরু দেখতে পায়, নিখিল ভাই আর তার বিদেশিনী বান্ধবী ইতিমধ্যে বাসে উপস্থিত। তারা কি নিয়ে যেন উল্লাসে মেতে আছে ঠিক সেদিনের মতোই। অরু এসেছে কি আসেনি সেদিকে বিন্দু মাত্র খেয়াল নেই নিখিলের। অরু যখন অসহায়ের মতো ঠোঁট কামড়ে পেছনে তাকিয়ে ছিল তখনই ওর পাশে এসে বসে পরে সায়নী।

সায়নীকে দেখে অরু, দ্বিধাগ্রস্থ কন্ঠে শুধায়,— আচ্ছা সায়নী, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যদি সারাক্ষণ একসাথে থাকে, একসাথে হাসাহাসি করে, তাহলে কি তারা শুধু বন্ধু?
ওপাশ থেকে সায়নীর নির্লিপ্ত জবাব আসে,
— হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।
অরু ভেতরে ভেতরে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পরে, এমনটা নয়তো,এই বিদেশিনীই নিখিল ভাইয়ের প্রেমিকা? এমনটা হলে অরুর হৃদয়টা ভে'ঙে যাবে পুরোপুরি। কিন্তু এই মূহুর্তে সকালের সেই অযাচিত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব অরুর সামনে। সন্ধ্যা রাতে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, সউচ্চ চূড়া থেকে নেমে আসা ঝরনাকে সাক্ষী রেখে অ'ন্তরঙ্গ সময় পার করছে নিখিল আর তার বান্ধবী। অরু সকাল থেকেই নিখিল কে চোখে চোখে রেখেছিল। সারাদিন ওরা কি করেছে না করেছে সবই আড়ালে খেয়াল রেখেছে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগে আগে হঠাৎ করে সবার চোখের আড়াল হয়ে যায় ওরা দুজন। তবে অরুর নজর তো নিখিলের দিকেই ছিল, তাই চুপিচুপি পিছু নিয়েছিল ওদের। খুজেও পেয়েছিল খুব সহজে। কিন্তু এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে দেখতে হবে তা কল্পনাতেও ভাবেনি অরু।সেই জগন্নাথে পা রাখার পর থেকে নিখিল ভাইয়ের পিছনে ছুটেছে ও।মায়ের অসুখ, আপার বকুনি কিংবা ক্রীতিকের অ'পমান কোনো কিছুই দমাতে পারেনি ওকে। সেই একই নিখিল ভাইয়ের পেছনে ছুটতে ছুটতে আজ এতোদূর চলে এসেছে ঘর কুনো মেয়ে অরু। অথচ আজ মনে হচ্ছে,এখানেই থেমে যেতে হবে ওর, আর কোনো আশা নেই,নিখিল ভাই নিজ হাতে ওর ছোটার রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে।

শরীরের জ্বরটা বোধ হয় হুহু করে বারছে। নিরব অস্রু জ্বলে ভিজে যাচ্ছে গ্রীবা। মেয়েটাকে করা নিখিল ভাইয়ের একেকটা চুম্বন অরুর শরীরে যেন বিষা'ক্ত তী'রের মতো বিঁধ'ছে, এই দৃশ্য কতক্ষণই বা দাড়িয়ে থেকে দেখা যায়? অরুও দাড়িয়ে রইতে পারলো না। কাঁ'দতে কাঁ'দত ধপ করে বসে পরলো অসম ভূমিতে। ঘাস আবৃত জমিনে দু'হাত চাপরাতে চাপরাতে বললো,— কেন এমন করলেন নিখিল ভাই? আপনি যদি অন্য কাউকেই ভালোবাসবেন তাহলে আমাকে কেন নিয়ে এলেন? আমি তো কোনো কালেই ট্যুরে আসতে চাইনি, কেবল আপনার একটা কথাতে সবাইকে মিথ্যা বলে,অসুস্থ শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছি আমি, তাহলে এটা কি দেখালেন আপনি? আমার হৃদয়ে ফোঁটা প্রথম প্রেমের ফুলটাকে আপনি এভাবে পা দিয়ে পিষি'য়ে দিলেন।কেন?
— প্রেমে পরা কি এতোই সহজ?
পরিচিত,চমৎকার পুরুষালি কন্ঠস্বরটা কর্ণকূহরে পৌঁছাতেই অকস্মাৎ থেমে গেলো অরু।তরিৎ গতিতে পেছনে তাকিয়ে দেখলো পকেটে দুহাত গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। মাথায় বাকেট হ্যাট, পরনে হোয়াইট ওভার সাইজ টিশার্ট। অরু বুঝতে পারছে না ক্রীতিককে দেখে ও কি খুশি হবে নাকি,লজ্জা পাবে।
— কি হলো আর কতো কাঁদবি, ক্রাশের জন্য?
অরু নাক টেনে জবাব দিলো,
— ভুল ভাবছেন উনি আমার ক্রাশ না।
তারপর হুট করেই বললো,— আপনি সবটা জানতেন তাইনা? সব জেনে শুনেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাইনা? কিভাবে পারলেন আপনি?

ক্রীতিক এগিয়ে গিয়ে অরুর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে দাঁড় করায়,অতঃপর দাঁতে দাঁত পিষে বলে,
— বিশ্বাস কর অরু, এই মূহুর্তে তোকে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে একটা থা'প্পড় দিতে ইচ্ছা করছে আমার। কিন্তু কি জানিস তো? সেটা আমি পারবো না। কারন আমার হাত অগ্রসর হওয়ার আগে আমার কলিজা কেঁপে উঠবে।
অরু ক্রীতিকের কথায় খানিকটা ভরকে গিয়ে আবারও নিখিলদের দিকে তাকালো, যারা এখন গভীর চুমুতে মত্ত।
— হি ইজ আ প্লেবয়, ওই যে মেয়েটা দেখছিস,ও আর ওর বান্ধবী দুইজনার সাথেই একত্রে লিভ টুগেদারের আছে বা'স্টার্ডটা।
অরু চমকে গিয়ে বোকার মতো শুধালো,—দুইজনার সাথে, একই সাথে কিভাবে কি?
অরুর প্রশ্নে ক্রীতিক ঠোঁট টিপে হাসলো, কষ্ট পেয়ে মেয়েটা বোধ বুদ্ধি সব খেয়ে ফেলেছে মনে হয়। তবুও ক্রীতিক ওর কথার জবাব দিয়ে বলে,
— ট্রিও রিলেশনশীপ, এর বেশি বুঝাতে পারবো না, ব্যাপারটা তোর আর আমার বয়সের সাথে যায়না। তাছাড়া তোর বান্ধবী তিথির সাথেও দীর্ঘদিন ফিজিক্যাল রিলেশনে ছিল ও।
একদিনে ঠিক কতোগুলো শক নেবে বুঝতে পারছে না অরু, ওর মাথাটা ভঁনভঁন করে ঘুরছে, সেইসাথে নিখিলের প্রতি জমাট বাঁধা অভিমানটা পরিনত হয়েছে তীব্র ঘৃণায়। মনে মনে ভাবছে তাইতো সেবার তিথি এতোটা বা'জে ব্যাবহার করেছিল ওর সাথে।— তুই বসে বসে তোর প্লেবয় নিখিল ভাইয়ের জন্য কাঁদতে থাক আমি গেলাম।

বাইকের চাবির রিংটা আঙুলে ঘুরাতে ঘুরাতে যেতে যেতে কথাটা বললো,ক্রীতিক।
অরুর ভ্রম ভেঙে গেলে ও ছুটে এসে ক্রীতিকের সাথে হাঁটতে হাঁটতে নাক টেনে বললো,
— আমি কি করে যাবো?
—কেন তোর নিখিল ভাইয়ের সাথে যাবি।
ক্রীতিকের কথায় অরু আবারও অসহায় দৃষ্টিতে নিখিলদের দিকে তাকালো, পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে গলার আওয়াজ শক্ত করে বললো,
— কক্ষনো না।
— তাহলে কিভাবে যাবি?
অরু মুখ ফুলিয়ে বললো,
— আপনার সাথে।
ক্রীতিক বাইকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো,
— আমি মেয়ে মানুষ বাইকে নেইনা।
অরু দুকদম এগিয়ে এসে বললো,
— প্লিজ নিয়ে যান, আমি ওই বাজে লোকটার মুখোমুখি হতে চাইনা এজীবনে।
ক্রীতিক অরুর চোখে চোখ রেখে বললো,— নিয়ে যাবো, বিনিময়ে আমি কি পাবো?
— যাই চাইবেন তাই দেবো, এখন চলুন।
ক্রীতিক বাঁকা হেসে শুধায়,
— আর ইউ সিওর যা চাইবো তাই?
—হ্যা তাই, শুধু আমাকে আর ডোরাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইবেন না দয়া করে।

অরুর কথায় ক্রীতিক অন্যদিকে ঘুরে হাসি সংবরণ করলো,মনে মনে ভাবলো,
— পিচ্চি মেয়ের মায়ায় পরলে এই হয়।
—কি হলো, চলুন। ক্রীতিক নিজের বাকেট হ্যাট, ওয়ালেট, সিগারেট সবকিছু বের করে অরুর হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললো,
— ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কান্নাটা বন্ধ কর, নয়তো ফেলে চলে যাবো।
অরু নাক টেনে ক্রীতিকের জিনিস গুলো নিজের ব্যাগে ভরে নিলো। যেন ওই বহু বছর ধরে ক্রীতিকের গিন্নি দায়িত্ব পালন করে আসছে।
ক্রীতিক বাইকে বসে নিজে হেলমেট পরে আরেকটা হেলমেট বাড়িয়ে দেয় অরুর দিকে,
অরু করুন সুরে জিজ্ঞেস করে,
— এটাও ব্যাগে রাখতে হবে?
ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিজ হাতে অরুকে হেলমেট পরিয়ে দিতে দিতে বলে,
— স্টুপিড কি তোকে সাধে বলি???নিশুতি রাতে পাহাড়ি আঁকাবাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাইকটা। ঝিরিঝিরি মিষ্টি বাতাসে এতোক্ষণে বুকটা হালকা লাগছে অরুর। যদিও ভেতরের ক’ষ্টটা আকাশসম,তবুও ক্রীতিকের ভ’য়ে জোর করে কা’ন্না থামিয়ে রেখেছে ও। যার দরুন হেঁচকি ওঠাটাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন। অরুর দুইহাত ক্রীতিকের কাঁধের উপর নিবদ্ধ । রাস্তার মোড় ঘুরতেই সেই হাতের বাধন বারেবারে শক্ত হয়ে ওঠে দিগুন তালে। এভাবেই যেতে যেতে একপর্যায়ে বহু সময়ের নিরবতা ভেঙে অরু শুধায়,

—-- আপনি হঠাৎ পাহাড়ে কেন এলেন?
ক্রীতিক জবাব দেয় না, মনে মনে বলে,
— শুধু তোর জন্য.....একতরফা ভালোবাসা বরাবরই বিরহের।
নিজের অস্তিত্ব জানান না দিয়ে তাকে দিনের পর ভালোবেসে যাওয়া, তার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অভ্যাসটাকে চুপিচুপি আপন করে নেওয়া। কিংবা পুরো মানুষটাকে ঘিরেই অজানা সুখের সপ্নজাল বোনা, এমন আশাতীত সপ্ন বিলাশ সবাই করতে পারেনা। কারন সবাই তো আর ভালোবেসে কষ্ট সইতে চায়না। তাছাড়া হৃদয়ে লুকোনো ভালোবাসার অস্তিত্বের খোজ সচারাচর কয়জনই বা করে? তবে সেই অস্তিত্ব, সেই সপ্ন যদি এক নিমিষে গুড়িয়ে যায়?অন্তরের অন্তস্থলে থাকা মানুষটা যদি সবচেয়ে জঘন্য আর ঘৃণিত মানুষে পরিনত হয়? তাহলে ভুলটা কার? যে ভালোবেসেছিল সেই মানুষটার নিশ্চয়ই? তাইতো অরুও আজকাল নিজেকে অপরাধী ভাবে। ভালোবাসার দোষে অপরাধী। কিন্তু অরু যেটাকে একপাক্ষিক ভালোবাসা ভেবে বসে আছে সেটা কি আদৌও ভালোবাসার অনুভূতি ছিল? নাকি নিতান্তই টিনএজ ফ্যান্টাসি? যদি তা নাই হবে,তবে নিখিলের বাইরে দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে ক্রীতিকের কাছে আসাটা কেন এতো রোমাঞ্চকর?কেন ডানা ঝাপটানো বন্য পাখির ন্যায় বেসামাল, আর ব্যাতিগ্রস্থ।
আজ আবহাওয়াটা বেশ ভালো। মাথার উপর তীর্যক আলো ছড়াচ্ছে সূর্য কীরন। তবুও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাতাসে ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা। ঠান্ডা থাকা সত্বেও অন্যান্য শীতল দিনের সাথে তুলনা করলে বলা যায় আজ গড়ম পরেছে বেশ। নিয়ন সূর্যতাপ গায়ে মাখাতে মাখাতে রাস্তার ফুটপাত ধরে এলোমেলো পা

ফেলে হাটছে অরু। পরনে লংস্কার্ট আর ডেনিম টপস তারউপর পাতলা কালো কোর্ট। হাতের ভাজে পোকেমোন আঁকা কালো রঙা টেটো ব্যাগ।
মাত্রই বাস ধরে হসপিটাল থেকে ফিরেছে সে। আর এখন গন্তব্য ক্রীতিকের জনমানবহীন শুনশান শহরতলী। আজ প্রায় সপ্তাহ খানিক পর বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখলো ও। তাও আপার জোরাজোরি তে। গত একসপ্তাহে ভার্সিটি যায়নি অরু, আর নাতো যাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে মনে। সারাদিন কক্ষবন্ধী হয়ে থাকে বলে,আজ জোর করেই অনু হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। মায়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। আজকালের মধ্যেই অপারেশন হবে। আর তারপর হয়তো সব কিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে। অরু অনুর দুঃখের দিন ঘুচে যাবে। কিন্তু আদতে কি ঘুচবে? ভেবে পায়না অরু। কিকরেই বা পাবে? মাত্র কয়েকমাসের ব্যাবধানে ওর হৃদয়টা যে ভে'ঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। একটা জঘন্য চরিত্রের মানুষকে দিনের পর দিন অন্ধের মতো মনেমনে ভালোবেসে গিয়েছে ও,অথচ তার ওই নোংরা চোখের ভাষা টা অবধি বুঝতে পারেনি,ছিহ। নিজের উপর আরও একবার রাগের নদীতে তে জোয়ার এলো অরুর। ও যে কতবড় আহাম্মক সেটা ভেবে নিজেকেই নিজে হাজারটা চ'ড় থা'প্পড় আর গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছে ওর।
অরু যখন হাজারটা দোষী সাব্যস্ত করে বারবার নিজেকেই নিজে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। ঠিক তখনই রাস্তার বিপরীত পাশ থেকে জেব্রা ক্রসিং পার হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো একজন। পুরো শরীর তার কালো দিয়ে আবৃত। এমন কি মুখটাও মাংকি টুপি দিয়ে

আটকানো। চোখ দুটোতে হিং’স্রতা জ্বলজ্বল করছে লোকটার। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা বিশ্রী ভাবে হাসছে।
লোকটাকে দেখে ভাবনায় পরে গেলো অরু, ওর মনে হচ্ছে এই চোখ দুটো এর আগেও কোথায় যেন দেখেছে ও। দেখলে দেখেছে কিন্তু এভাবে পথ আটকে দাড়ানোর মানে কি?
নিজ ভ্রু কুঞ্চিত করে অরু বিরক্ত সুরে লোকটার উদ্দেশ্যে বললো,— আপনি আবার কোন ক্ষেতের মুলা? এমনিতেই ভারী অশান্তিতে আছি পথ ছাড়ুন তো।
লোকটা বোধ হয় অরুর কথা বুঝলো না,বিদেশি হবে হয়তো। তাই ও ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করলো,
—- হু? হু আর ইউ??
লোকটা জবাব দিলো না নিঃশব্দে, নির্লিপ্ত কপট চোখ দুটো নিক্ষেপ করলো নিজের হাতের দিকে। অরু ও তার চোখ অনুসরণ করলো, আর যা দেখলো তাতে পিলে চমকে উঠলো ওর। লোকটার কালো রঙের গ্লোভস পরা হাতে বেশ বড়সড় একটা ধারালো ছু’রি। দেখে মনে হচ্ছে অরুকে আঘাত করার জন্যই অগ্রসর হচ্ছে তার হাতটা। কিন্তু কেন? আমেরিকার মতো একটা অচেনা, অজানা দেশে অরুর মতো একটা তুচ্ছ দু পয়সার মেয়ের সাথে কিসের এমন শ’ত্রুতা এই ভ’য়ানক লোকটার?সে যে শ’ত্রুতাই হোকনা কেন,আপাতত এই লোকটার থেকে পালিয়ে প্রানে বাঁচাটা জরুরি। নয়তো এই শুনশান নিরব রাস্তায় ওকে বাঁচানো তো দূরে থাক,ওর লা’শটাও খুঁজতে আসবে না কেউ। অজস্র কুন্ডলি পাঁকানো দুশ্চিন্তারা ঘীরে ধরেছে অরুর মন মস্তিষ্ক। ভেতরের ভয়টা দলা পাকিয়ে গলায় আঁটকে এসেছে। অরু যেন শ্বাস প্রশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছে। তবে ওর

এসব ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলো না লোকটা। বরং তার আগেই ক্ষীপ্ত গতিতে তেড়ে এসে ছু'রিকাঘাত করতে অগ্রসর হলো অরুর পানে। ঘটনাটা এতোই দ্রুত ঘটছে যে, কিছুই ঠাহর করতে পারলো না অরু। লোকটা এগিয়ে আসতেই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে প্রানপনে উল্টো দিকে দৌড় লাগালো ও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো লোকটা ওর পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে না, বরং সাইকোপ্যাথ দের মতো চা'কু হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে লোকটা জানে অরুর শেষ গন্তব্য কোথায়?একটানা দিগ্বিদিক দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে উঠেছে অরু। শেষমেশে আর দৌড়াতে না পেরে রাস্তার মাঝেই হাটুতে দু'হাত ভর করে দাঁড়িয়ে পরলো ও। হাঁপাতে হাঁপাতে পেছনে তাকিয়ে খুব সাবধানে পরখ করে নিলো রাস্তার অদূর পর্যন্ত। নাহ, দু একটা চলন্ত গাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে অরু ভাবছে,

—- আহ!তার মানে এ যাত্রায় প্রানে বেঁচে গিয়েছি।

ঠিক তখনই ওর খুব কাছ থেকে ভেসে এলো একটা অচেনা অপ্রিতীকর কন্ঠস্বর,

— জেকে স বেবি গার্ল, আই কট ইউ।আচমকা এমন একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনে চমকে উঠে সামনে তাকালো অরু, দেখলো তখনকার লোকটা ওর সামনেই, কিচ্ছু বদলায় নি।আগের মতোই বিশ্রী চাহনি দিয়ে ওর পানে তাকিয়ে আছে সে। হুট করে আবারও ওই লোকটাকে দেখে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে পেছনের পিচ ঢালা রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পরে গেলো অরু। শুষ্ক ঢোক গিলে চারপাশে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলো এতোক্ষণ দৌড়াতে দৌড়াতে ঘুরে ফিরে গোলকধাঁধাঁর মতো আবার আগের যায়গাতেই ফিরে এসেছে ও।

নিজের মূর্খামির ফল সরূপ আরও একবার ফেঁ'সে গেলো অরু। আপা কতো করে বলেছিল আমি এগিয়ে দিয়ে আসি, অথচ অরু শোনেনি। আর এখন সামনে মৃ'ত্যু খেলা করছে ওর। এছাড়া তো কোনো উপায় নেই।
লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অরুর দিকে। অরু যে উঠে দাড়িয়ে আবারও দৌড়ে পালাবে সেই শক্তি নেই ওর শরীরে, উল্টে হাত পা কন্ঠ সব কিছু রোধ করে রেখেছে এক অজানা আ'তংক।
অরুকে ভয় পেতে দেখে লোকটা খিকখিক করে হেঁসে বললো,— এ্যান্ড আ'ল কি'ল ইউ, প্রিন্সেস।
অরু এবার ঠোঁট চেপে ডুকরে কেঁদে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতেই দু'হাতে ভর করে পেছাতে লাগলো কুচকুচে পিচঢালা রাস্তা ধরে । তবে লোকটার গতিবেগ ছিল দিগুন। সে এতোক্ষণে ওর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে পরেছে। মাথাটা এদিক ওদিক কাত করে ঘাড় ফুটিয়ে,তীব্র আক্রোশে উদ্যত হয়েছে অরুকে ছু'ড়িকাঘাত করার জন্য। লোকটার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভেবেই অরু চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে ফেললো , এই মূহুর্তে প্রিয়জনের মুখগুলো ভাসছে ওর মানসপটে, মা, আপা, আর তো কেউ নেই। অথচ মানসপট জুড়ে দুটো নয়, বরং তিন তিনটে মুখ ভেসে উঠছে। মা আপা আর সব শেষে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। ওর স্টেপ ব্রাদার, যে ওকে সব সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, সবার কাছে বাড়ির চাকর হিসেবে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়, ওর গা'য়ে হা'ত তোলে, ওকে শীতের রাতে ঘরে থেকে বের করে দেয়, মাঝ রাস্তায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়, হুটহাট রেগে গিয়ে সবার সামনে অপমান করতেও দু'বার ভাবে না। অথচ এই মূহুর্তে হৃদয়টা তাকে ঘৃণা করতে চাইছে না,মনে হচ্ছে

ক্রীতিক নিজেকে ঠিক যতটা খারাপ প্রমান করতে চায়, ততটাও খারাপ সে না, নয়তো তিঁতে হয়ে যাওয়া হৃদয়টা তাকেই কেন স্বরণ করছে বারবার তাও এমন একটা মূহুর্তে? ক্ষনিকের জন্যে হলেও মনে হচ্ছে আজ ক্রীতিক থাকলে ওকে এতোটা বি'পদে পরতে হতো না। কোনো না কোনো ভাবে ঠিক বাঁচিয়ে নিতো সে। অরু সেই কখন থেকে আজগুবি চিন্তায় বিভোর, অথচ লোকটা ওকে আ'ঘাত না করে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে, তা কি করে হয়?
কপালের উপর তরল জাতীয় কিছু অনুভব হতেই, ভাবনার সুতো ছিড়ে যায় অরুর। জিনিসটা কি তা দেখার জন্য, হাত দিয়ে কপালটা স্পর্শ করে সেটা চোখের সামনে এনে ধীরে ধীরে চোখ খুললো ও । দেখলো ওর হাত ভর্তি তরতাজা র'ক্ত। তাহলে কি লোকটা ওকে আঘাত করেছে? কই ব্যাথা লাগলো না তো? নাকি ইতিমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছে অরু?
ব্যাপারটা ঠিক ভাবে আন্দাজ করার জন্য আচমকা মাথা তুলে চাইলো অরু। আর যা দেখলো তাতে ওর দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হলো। বিশ্বাস করতেও খানিকক্ষন কষ্ট হলো। কিন্তু চোখের সামনে ঘটতে থাকা ঘটনা তো আর মিথ্যা হতে পারেনা। তাই চোখে কয়েকবার পলক ছেড়ে আবারও খেয়াল করে তাকালো ও,দেখলো ওই ধারালো ছু'রিটাকে নিজ হাতে মুঠিবদ্ধ করে রেখেছে ক্রীতিক। এতো জোরেই সেটাকে চেপে ধরেছে যে, ক্রীতিকের হাত কে'টে টুপটুপ করে র'ক্ত অরুর কপাল আর নাক বেয়ে চুয়িয়ে চুয়িয়ে পরছে। কারণ ওই লোকটা ক্রীতিকের মধ্যেখানে বসে আছে অরু।

ক্ষনিকের মধ্যে ক্রীতিকের ঝরে পরা র’ক্তে অরুর জামা কাপড়ও র’ক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে,তবুও ছু’ড়ি কিংবা ওই মুখ ঢাকা ছদ্মবেশি লোকটাকে কিছুতেই ছাড়ছে না ক্রীতিক। এক পর্যায়ে অরু সচকিত হয়ে উঠে দাড়িয়ে ক্রীতিকের ছু’ড়ি চেপে ধরা হাতটা টানতে শুরু করলো, আর্তনাদ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,— কি করছেন ? এটাকে ছাড়ুন, আপনার হাত কে’টে যাচ্ছে তো।

ক্রীতিকের অরুর কথায় কান নেই একটুও। ও তো ওই লোকটার মুখোশ উন্মোচনে ব্যাস্ত। এক পর্যায়ে টানতে টানতে লোকটার মাংকি টুপিটা খুলেই ফেললো ক্রীতিক। এভাবে নিজের ছদ্মবেশ খুলে যেতেই লোকটা নিজের ছু’ড়ি আর টুপি ফেলে রেখেই দু’হাতে মুখ ঢেকে তরিৎ গতিতে দৌড়ে পালালো।

লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে দেখে ক্রীতিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সেদিকে। মনে হচ্ছে ও আজ লোকটাকে ধরেই ছাড়বে। কিন্তু সেসব চিন্তার ইতি ঘটিয়ে অরু ওর হাত টেনে ধরে কাঁপা কাঁপা কন্ঠে বললো,

— আ..আমার ভয় করছে, যাবেন না দয়াকরে।

ক্রীতিকের পূর্ন দৃষ্টি এবার অরুর দিকে চলে গেলো, যে এই মূহুর্তে ওর র’ক্তে মাখামাখি হয়ে দাড়িয়ে আছে। র’ক্তে ভেজা অরুকে দেখে ক্রীতিকের চোখ জ্বলে উঠলো, কপালে তৈরি হলো দুশ্চিন্তার কয়েক খানা ভাঁজ। ও দ্রুত হাতে অরুর বাহু চেপে ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে, আহত সুরে শুধালো,— কোথায় লেখেছে তোর? এতো র’ক্ত কেন?

অরু কাঁদতে কাঁদতে বিস্ময়ে বিমূর্ত হয়ে জবাব দিলো,

— এগুলো আপনার র'ক্ত। হাত কেটে গিয়েছে আপনার। ভুলে গেলেন?
অরুর কথায় ক্রীতিক সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে ওকে হুট করেই বুকে চেপে ধরে বললো,
— ওহ, থ্যাংকস গড।
এবার আর দূর থেকে নয়, ক্রীতিকের শরীরের স্যান্ডালউড পারফিউমের মারাত্মক পুরুষালী গন্ধটা খুব কাছ থেকে এসে সুরসুরি দিলো অরুর নাকে। তবে ও আপাতত এসব কিছু ভাববার মতো মানসিক অবস্থায় নেই। তাই ক্রীতিকের বাহুতে আগলে ধরাটা নিতান্তই সাভাবিক আর আন্তরিকতার চোখেই দেখলো অরু।অরুকে পাঠিয়ে দিয়ে সারাদিন হসপিটালেই ছিলো অনু। আজ আর পার্ট টাইমেও যাওয়া হয়নি ওর।খুব শীঘ্রই অপারেশন হবে মায়ের। অনুর জন্য এই মূহুর্তে হসপিটালে থাকাটা খুব জরুরি। তাই অনু ভেবেছে পার্ট টাইম থেকে কয়েকদিন ছুটি নিয়ে, পুরো সময়টা হসপিটালে কাটাবে ও। এখন সন্ধ্যারাত, অনু কেবলই হসপিটাল থেকে বেরিয়েছে, সারাদিন কিছু না খাওয়ার দরুন শরীরটা বড্ড ক্লান্ত লাগছে ওর। হসপিটাল থেকে কিছুদূর হেটে গেলেই একটা গ্রোসারি শপ পাওয়া যায়। অনু হাটতে হাটতে গ্রোসারিতে গিয়ে কিছু খাবার কিনে নিলো। তারপর গিয়ে বসলো রাস্তার পাশের একটা খালি বেঞ্চিতে, সেখানে বসেই খেতে আরম্ভ করলো শুকনো খাবার গুলো I ওর মনটা আজ বড্ড ফুরফুরে,সেই সাথে ভেতরটাও হালকা লাগছে কয়েকগুণ। মনে হচ্ছে এতোদিনের কষ্ট, পরিশ্রম, ত্যাগ কোনোটাই বিফলে যায়নি। অবশেষে সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার দারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে ওরা। হাতে থাকা বাবল

টিতে একটা লম্বা সিপ টেনে মুচকি হেঁসে অনু আনমনে বলে ওঠে,—
আপনাকে খুব মিস করছি। প্রত্যয় সাহেব।
তারপর আবারও একটা লম্বা সিপ.... তবে এবার অনু চা’য়ের সিপ নিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা আর গলা থেকে নামাতে পারলো না, তার আগেই ওর দৃষ্টিগত হলো অনাকাঙ্ক্ষিত এক দৃশ্য।
গ্রোসারি শপের সামনেই প্রত্যয় একটা মেয়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে , ওর হাতেও দুটো বাবল টি এর জার। মেয়েটার ভাবভঙ্গিমা এমন যেন এখনই লাফ দিয়ে কোলে উঠে পরবে প্রত্যয়ের।
অনু বড্ড আত্মসম্মানী, একনজর দেখেছে বলে সারাক্ষণ হ্যাংলার মতো তাকিয়ে তাদের কান্ডকারখানা দেখবে এতোটাও নির্লজ্জ মেয়ে ও নয়। তাই প্রত্যয়ের চোখ এদিকে আসার আগেই অনু হাটা দেয় উল্টো পথে। হাটার সময় রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে ছুড়ে মা’রে হাতে থাকা বাবল টি ভরতি জারটাকে। অনুর মতে এটা বারাবাড়ি নয়, এটাই ওর আত্মসম্মান। যা ও খুব সহজে খেলার জন্য কারও হাতে তুলে দেবেনা। যদিও প্রত্যয়কে সেটা তুলে দেওয়ার জন্য ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে উঠেছিল হৃদয়টা। তবে এখন মনে হচ্ছে সেটা নিতান্তই ভুল সিদ্ধান্ত
হতো। অন্যান্য দিনের মতো আজও হল রুমের কাউচে বসে নিচের ক্ষ’ত সারাতে বসেছে ক্রীতিক।
তখন অরু খেয়াল করেনি, ক্রীতিক আগে থেকেই আ’হত ছিল, ওর দু’পা,কপালের কিছুটা অংশ, সব খানেই র’ক্তা’ক্ত ক্ষত ছিল। সেই সাথে বাইকার লেদার জ্যাকেটটাও ছিল ছেড়া।
জামা কাপড় পাল্টে নিজেকে পরিষ্কার করে মাত্রই নিচে এসেছে অরু। আপা বাড়িতে ফেরেনি, বিকেলের ঘটনার পর থেকেই

ভেতরে অজানা আ'তংকটা জেনো জেকে বসেছে দিগুণ হারে। রুমের মধ্যেও একাএকা থাকতে কেমন যেন গা ছমছম করছে ওর। তাইতো রুমের কাজ সেরে দ্রুত নিচে নেমে এসেছে অরু। ক্রীতিক আজও ফার্স্টএইড নিয়ে বসে আছে। তবে ওর মুখ ভঙ্গিমা কেমন যেন অন্যরকম, নিজের শরীরের এতো এতো ক্ষত তে কোনোরূপ খেয়াল নেই ওর। মনে হচ্ছে কোন কিছু নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে ক্রীতিক। অরু সেদিনের মতো করে ক্রীতিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে আগ বাড়িয়ে বললো,— দিন আমি ট্রিট করে দিচ্ছি।

হঠাৎ, অরুর আওয়াজে ধ্যান ভাঙে ক্রীতিকের। ও বিরক্ত হয়ে বলে,

— তুই পারবি না, যাতো নিজের কাজ কর গিয়ে।

অরু পাত্তা দিলোনা ওর কথায়। উল্টে গিয়ে বসলো ক্রীতিকের পায়ের কাছে। মেঝেতে বসে তুলার মধ্যে এন্টিসেফটিক লাগিয়ে ক্রীতিকের হাটুর উপর চেপে ধরতেই চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে নিলো ক্রীতিক। তবে মুখ দিয়ে একটা টু শব্দও বের হলোনা ওর। অরু বিরক্ত হলো, লোকটার অনুভূতি বলে কিছু নেই নাকি? ও কেন যেন ধূর্ততা অবলম্বন করলো। হুট করেই, হাতের তুলাটা আরও শক্ত করে চেপে ধরলো ক্রীতিকের ক্ষতস্থানে। এবারও চুপচাপ নির্বিঘ্ন সে।

শুধু চোখ বুঝেই হাস্কি স্বরে বললো,— আমাকে ব্যাথা দিয়ে শান্তি পাস?

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো অরু, তারমানে ক্রীতিকেরও ব্যাথা লাগে, শুধু মুখে প্রকাশ করে না। ও পুনরায় এন্টিসেফটিক লাগাতে লাগাতে বললো,
— কি করে ব্যাথা পেলেন?
ক্রীতিক জবাব দেয়,
— যাস্ট এ মাইনর বাইক এ'ক্সি'ডেন্ট।
— বাইকে আপনার এতো আসক্তি?এতো ব্যাথা পাওয়ার পরেও বাইক রাইডিং ছাড়েন না।
ক্রীতিক ঠোঁট কামড়ে একটু হেসে বলে,
— তোর থেকে বহুগুন কম। তাহলে ভাব তোকে কিভাবে ছাড়ি?
পায়ের ক্ষতগুলোতে অন-টাইম ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিয়ে,ক্রীতিকের পাশে বসে ওর হাতটা দেখতে দেখতে অরু বললো,— কি বললেন? শুনিনি।
— নাথিং, আমি যখন কথা বলি তখন কান কোথায় থাকে তোর?
অরু ঠোঁট উল্টে বললো,
— আমি ভাবছি হাতের ক্ষ'তটা অনেক গভীর, এটা আমি কিভাবে ব্যান্ডেজ করবো? দেখেতো মনে হচ্ছে সেলাই লাগবে।
ক্রীতিক নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো,
— না পারলে, দুরে সর। নিজেই তো পাকনামি করে এসেছিস সাহায্য করতে।এখন বলছিস পারবো না।আমি বলেছিলাম আসতে?
অরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্রীতিকের হাতটা আবারও টেনে নিয়ে সেখানটায় ব্যাথা নাশক লাগাতে লাগাতে বললো,
— আপনি এমন কেন?

— কেমন আমি?
— ঝগরুটে, তিল কে তাল বানিয়ে ফেলেন, আপনার বউয়ের কপালে দুঃখ আছে।
অরুর কথায় ক্রীতিকের ঠোঁট বাঁকা হাসিতে প্রসস্থ হয়। তারপর হুট করেই চোখ মুখ কুঁচকে সামনের মনিটরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্রীতিক বলে,— ঠিকই বলেছিস, আমার কথা না শুনলে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।
— হ্যা সেতো জানিই, আপনি ক্রীতিক কুঞ্জের ছোট সাহেব কিনা, দুঃখ তো থাকবেই। আচ্ছা তখন হঠাৎ ছু'ড়িটা চেপে ধরতে গেলেন কেন শুনি?
— চেপে না ধরলে তো তোর আ'ঘাত লাগতো।
ক্রীতিকের হাতের ক্ষ'তটা অনেক বেশি গভীর, অরুর ভেতর ভেতর অনুশোচনা হচ্ছে ওর জন্যই আজ এমনটা হয়েছে। তাই ও ক্রীতিকের ক্ষতস্থানে হালকা ফু দিয়ে এনসেফটিক লাগাতে লাগাতে নরম সুরে শুধালো,
— বেশি ব্যাথা লাগছে?
নিজের শরীরটাকে কাউচে উপর ছেড়ে দিয়ে ক্রীতিক চোখ বন্ধ করে বললো,
— এখন কম লাগছে। মাঝরাত চলমান.... দিনের আলো শেষ হতেই তাপমাত্রা নেমে গিয়ে চারিদিকে কনকনে শীতল হাওয়া বইছে, অনু আর অরু বোধ হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অথচ ছাঁদ বারান্দায় এখনো টিমটিমিয়ে ফেইরী লাইট জ্বলছে। সেখানে গোল হয়ে বসে আছে অর্নব, সায়র, এলিসা। ক্রীতিক ওদের থেকে খানিকটা দুরে দাড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ব্যাস্ত। ওরা সবাই

সারারাত ধরে কিছু একটা পরামর্শ করেছে, অর্নব কোলের উপর ল্যাপটপ নিয়ে এখনো কি যেন করছে। এলিসা দ আকারে বসে অর্নবকে বললো,
— তুই কবে এসব বন্ধ করবি অর্নব?
অর্নব ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
— বন্ধ করবো মানে? তোর বাবাকে ওরা আটকে রেখেছে, ভিডিও প্রুফ পাঠিয়েছে, তুই না গেলে ওরা তোর বাবাকে মে’রে ফেলবে, আর তুই ভাবছিস তোকে আমরা ওই রিস্কি যায়গায় একা যেতে দেবো?
সায়র পাশ থেকে বললো,— আচ্ছা আমরা পুলিশ কে কেন বলছি না?
অর্নব দাঁত কিরমিরিয়ে বললো,
— গর্ধব পুলিশকে জানালে এলিসাও ফেঁসে যাবে, তাছাড়া ক্লাবটা ইউ এস এ’র নয় থাইল্যান্ডের।
ওদের বাকবিতন্ডার মাঝে ক্রীতিক না ঘুরেই বললো,
— অর্নব প্রাইভেট জেট বুক কর, অরুর ফ্লাইট ফোবিয়া আছে ওকে নিয়ে বিজনেস ক্লাসে যেতে পারবো না।
আশ্চর্য্যের শেষ সীমানায় গিয়ে সায়র, অর্নব, এলিসা সবাই একই সুরে বললো,
— অরু???
তীরের ছিলার মতো এক ভ্রু উঁচিয়ে ক্রীতিক জবাব দেয়,
— ইয়েস অরু।
সায়র ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে বললো,

— লাইক সিরিয়াসলি জেকে? আমরা একটা মিশন নিয়ে থাইল্যান্ড যাচ্ছি, আর তুই সেখানে বিপ’দের মধ্যে অরুকে নিয়ে যাবি?— আমি যেখানে থাকবো, সেখানে অরুর কোন বি’পদ নেই।
এলিসা শুধালো,
— কিন্তু হঠাৎ অরুকে, এভাবে?
ক্রীতিক সিগারেটের শেষ অংশটা পায়ে পিষ্ট করে দাঁত চেপে বললো,
— ইয়েসটারডে সাম ওয়ান ট্রাইড টু এ্যা’টার্ক হার।
এবারও সবাই তারস্বরে বলল,
— কিহ?
ক্রীতিক হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—ঠিকই শুনেছিস, কাল ওই বা’স্টা’র্ড টার ভাগ্য ভালো ছিল যে আমি উইক ছিলাম। তবে চিন্তা নেই খুব শীঘ্রই নিজ কর্ম ফল ভোগ করবে সে। কিন্তু এই মূহুর্তে আমি অরুকে একা রেখে দেশের বাইরে গিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না।— কিন্তু অনু?ওর উপর কোনো এ্যা’টার্ক আসবে না তার কি গ্যারান্টি?
এলিসার প্রশ্নের জবাবে ক্রীতিক বলে,
— অনুর জন্য চিন্তার কারন নেই কারন ও বেশির ভাগ সময়ই হসপিটালে থাকে। তাছাড়া প্রত্যয় থাকতে অনুর সাথে খারাপ কিছু হওয়ার চান্স নেই।
এতোক্ষন পর সায়র উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললো,
— ভালোই হবে, তোরা তোদের মিশন, ফিশন শেষ করবি, সেই ফাঁকে আমি আর অরু, একটু ব্যাংককের সমুদ্র বিলাশ সেরে আসবো। নট আ ব্যাড আইডিয়া ।

তৎক্ষনাৎ ওর পশ্চাৎদেশ বরাবর লা'থি মে'রে, কনকনে বরফ শীতল ঠান্ডা পানিতে ফেলে দিয়ে ঠোটের কোনে একটা কপটতা মিশ্রিত হাঁসি ঝুলিয়ে ক্রীতিক বলে,

— নো চান্স ব্রো, শি ইজ মাইন .....আমেরিকার আবহাওয়া মানেই আধুনিক ভাষায় মুড সুইং। এদেশে আলাদা করে বর্ষা মৌসুম নামে কিছু নেই বলে পুরো বছরের যখন তখনই প্রকৃতি ধারণ করে তীব্র বর্ষারূপ। বিশেষ করে শীতে প্রকান্ড কুয়াশা আবৃত ধরনীকে আরও খানিকটা শীতল কনকনে ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে দিতে নেমে আসে এক পশলা ঝুম বৃষ্টি। আজও তেমন করে অপ্রত্যাশিত ভাবেই প্রকৃতিতে হানা দিয়েছে তীব্রাকার বর্ষাকাল। সকাল সকাল তো ভালোই রোদ উঠেছিল,আর এখন দিনের আকাশ মেঘে ঢেকে ঢুকে সন্ধ্যারাতে পরিনত হয়েছে। জানালার কাঁচ গলিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে আচঁড়ে পরছে রুমের মেঝেতে। অনু হাতের কাজ রেখে দ্রুত এগিয়ে দিয়ে জানালার কাঁচটা পুরোপুরি টেনে দিলো। এখন ঠান্ডাও কম লাগছে খানিকটা। সেই কখন থেকে অনুর ডাকাডাকির ফলস্বরূপ এতোক্ষণে উঠে গিয়ে রোবটের মতো সকালের কাজ গুলো সেরে নিলো অরু।

খানিকবাদে ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এসে ঘ্যানঘ্যান করে অনুকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো,—- কি দরকার আপা, আমি যেতে চাইনা ওনাদের সাথে, তুই কেন অযথা জামা কাপড় গোছাচ্ছিস?

অরুর জামাকাপড় গুলো গুছিয়ে সযত্নে ট্রলি ব্যাগে রাখতে রাখতে অনু বলে,

—- যেতে চাস না মানে? সারাদিন তো ঘরে মনমরা হয়ে বসে থাকিস, ভার্সিটিতেও যাচ্ছিস না কিছুদিন ধরে, আমার তো আর তোকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার সময় হয়ে ওঠেনা,তারচেয়ে বরং ক্রীতিক ভাইয়াদের সাথে ঘুরে আয়। মন ভালো হয়ে যাবে। তাছাড়া ক্রীতিক ভাইয়ার মেয়ে বান্ধবী কি যেন নাম?
অরু ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দেয়,
—- এলিসা আপু।
— হ্যা, উনি তো তোকে অনেক আদর করে তাহলে তোর চিন্তা কিসের?
নিজের অলস শরীরটাকে বিছানায় ছেড়ে দিয়ে অরু বলে,—— আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি আপা, কারও আদর করা না করা নিয়ে আমার কোন সমস্যা নেই।
অনু সব কিছু ঢুকিয়ে লাগেজের চেইন লাগাতে লাগাতে বললো,
—- তাহলে অযথা যাবোনা যাবোনা বলে কেন ঢং করছিস? দেখ অরু, আগামী কয়েকদিন হসপিটালে অনেক ব্যাস্ত থাকবো আমি, ঠিক মতো বাসায় আসতে পারবো কিনা সন্দেহ। তারচেয়ে বরং তুই এই ফাকে ঘুরে আয়, এসে দেখবি আমাদের মায়ের অপারেশন সাকসেসফুল। তাছাড়া ক্রীতিক ভাইয়াতো বলেছে তারা ঘুরতেই যাচ্ছে।
অরু মুখ ফুটে আর জবাব দিলো না, শুধু মনে মনে ভাবলো,
—- সমস্যাটা তো ওই ক্রীতিক ভাইয়াকে নিয়েই। সে তো এলিসা আপু টাপু কাউকেই মানে না, আর এখন এতো দুরে তার সাথে গেলেতো মাথার উপর উঠে তান্ডব নৃত্য চালাবে। কথার মাথায় উঠাবে আর বসাবে। সারাক্ষণ অর্ডার আর হুকুম, এসব আমি

একদম নিতে পারিনা।— কিরে কি ভাবছিস? ঘুরে আয় এতে তোরই লাভ। আমার সুযোগ থাকলে তো আমিও যেতাম। তাছাড়া মা সুস্থ হয়ে গেলেতো আবার আগের মতো জীবন কাটাতে হবে, তুইতো জানিস মা ঘোরাঘুরি একদম পছন্দ করেন'না।
অনুর কথায় অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে, দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললো,
—— তুই বেস্ট আপা। ইশশ তুই যদি আমার মা হতি?
অনু অরুর দু'হাতের উপর নিজের হাত রেখে বলে,
—— হয়েছে আর তেল দিতে হবে না, এখন দ্রুত রেডি হয়ে নে, ক্রীতিক ভাইয়া ভার্সিটিতে গিয়েছে সেখান থেকে ফিরে তোকে পিক করে সোজা এয়ারপোর্ট যাবে।
কয়েকমূহুর্ত কথা থামিয়ে আবারও সচকিত নয়নে অনু বলে,—— তুই একটা জিনিস খেয়াল করেছিস অরু?
—— কি জিনিস।
—— ক্রীতিক ভাইয়া বোধ হয় এতোবছর পর অবশেষে আমাদের বোন হিসেবে মেনেই নিয়েছে,নাহলে তোকে সাথে করে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা কেন বলবে?
—— অরু নিজ পায়ে স্লিপার পরতে পরতে বললো,সে আমি জানিনা,বাদ দে তো ওনার কথা, এই ভালো এই খারাপ। কই কোনো দিন তো বলতে শুনলাম না," অরু বোন আমার এদিকে আয়"। ওসব করুনা বুঝেছিস?
অরুর কথার পাছে অনুর বুক চিড়ে বেরিয়ে আসে অজানা দীর্ঘশ্বাস।

অরু উঠে গিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরের বৃষ্টি ভেজা তকতকে রাস্তায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো,
তৎক্ষনাৎ মনে পরে গেলো কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া সেই ভ'য়ানক গা ছমছমে ঘটনার কথা, সেদিন ক্রীতিক সময় মতো না এলে কি হয়ে যেতো? ভাবলে এখনো শরীরের সবকটা লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায় অরুর। আচ্ছা, সেদিনের সবটাই কি ক্রীতিকের করুনা ছিল? নাকি অন্যকিছু? অন্যকে করুনা দেখাতে গিয়ে, মানুষ কোনোদিনও নিজেই আঘাত প্রাপ্ত হয় ?উত্তর জানা নেই অরুর।
চোখের সামনে কালো মার্সিডিজটা দেখেই অরুর ভাবনার সুতোতে টান পরে। তারমানে ক্রীতিক চলে এসেছে, ওদিকে অরু এখনও রেডি না হয়ে আকাশ পাতাল কল্পনায় বিভোর। আনমনা মেয়ে একটা……খারাপ আবহাওয়া আর ঝুম বৃষ্টির মাঝেই ইউ এস এ ছেড়েছে ওদের প্রাইভেট জেট'টা। তবে ভৌগোলিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতেই ধীরে ধীরে আবহাওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে এখন।
সেই সন্ধ্যা রাত থেকেই নিজ ক্যাভিনে পরে পরে ঘুমাচ্ছে অরু। এছাড়া অবশ্য করার কিছুই নেই ওর, কারণ চোখ খুললেই কেমন মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। পেট থেকে উগরে বেরিয়ে আসে সব খাবার। অরুর মতে সবার সামনে বমি করে ভাসিয়ে নিজের মানসম্মান খোয়ানোর চেয়ে ঘুমিয়ে থাকাই শ্রেয়, তাতে যে যা ভাবে ভাবুক।
তখন মাঝরাত, আরেকটু পরেই থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে ল্যান্ড করবে ওরা। অরু সারারাত ঘুমিয়ে কাটালেও ওরা চারজনের একজনও ঘুমায়নি, সবাই মিলে রাত জেগে একটা বড়সড় প্রি-প্ল্যান

তৈরি করেছে ওরা। মাঝরাত্তিরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষ করে, ক্রীতিক এসেছে অরুকে একনজর দেখার জন্য। অরুর কেবিনের দরজাটা হাট করে খোলা ছিলো,যার ফলে নক করতে হয়নি আর, ক্রীতিক সোজা ঢুকে গিয়েছে ভেতরে। অরু তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ড্রিম লাইটের নীল আলোতে আজও ওর সুন্দর লতানো শরীটা দৃশ্যমান। এলোমেলো হয়ে ঘুমানোর দরুন পাজামা উঠে আছে হাঁটুর কাছে, মোমের মতো সুন্দর পা দুটোর একটাতে নুপুর নেই। কি করে থাকবে? সেটাতো বহু আগেই পার্টিতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে অরু।পায়ের দিক থেকে চোখ সরে গিয়ে ক্রীতিকের দৃষ্টিগত হলো অরুর মেদহীন দুধে-আলতা বর্ণের লতানো পেট। পেটের মাঝখানে সেই কুচকুচে কালো তিল। দেখলে মনে হবে অরুর নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই তার এমন মাঝ বরাবর অবস্থান।
ঘোর লাগা চোখে খানিকক্ষণ ওই তিলটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরবে শুষ্ক ঢোক গিললো ক্রীতিক।
কোন এক অজানা সংযমের কারনে ওর হাত দুটো মুঠি বদ্ধ হয়ে আছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কেভিনের মধ্যেও ঘেমে যাচ্ছে শরীরটা। ক্রীতিকের পরনে ছিল ব্ল্যাক টিশার্ট আর ট্রাউজার,হাতে ক্রোকোডাইল স্কিনের ব্ল্যাক বেল্ট ঘড়ি। জিভ দিয়ে অধর জুগল ভিজিয়ে, এ-সির পাওয়ার আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলো ও। নাহ তবুও ঠান্ডা লাগছে না।
ওদিকে প্রচন্ড ঠান্ডা পেয়ে অরু নরেচরে আরও খানিকটা গুটিশুটি মেরে শুয়েছে। এবার শুধু পেট নয়, পেট পিঠ দুটোই দৃশ্যমান। উন্মুক্ত ফর্সা পিঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রেশমের মতো লম্বা চুল

গুলো। ক্রীতিক নিজের অবাধ্য বাসনা গুলোকে বারবার মাথা থেকে দূর করতে চাইছে। মনটাকে রাম ধমক দিয়ে বারবার বলছে,
—-ওর পেটের দিকে নয় ওর মুখের দিকে তাকা কি ইনোসেন্ট,মায়ামায়া ঘুমন্ত মুখটা।
অথচ চোখ দুটো আটকে আছে ধবধবে ফর্সা পেটে। ইচ্ছে করছে সেখানটায় আঙুল ঘুরিয়ে হাজারটা আঁকিবুঁকি করতে। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়।ক্রীতিক খারাপ,রগচটা,বদমেজাজি হতে পারে তবে ক্যারেক্টার লেস কিংবা মেয়েবাজ ছিলোনা কোনোকালেই। ওর হৃদয়ে অরুর প্রতি এই অবাধ্য অনূভুতি গুলো কাজ করা নিতান্তই সাভাবিক। তবে এসব অদম্য অনুভূতিকে এই মূহুর্তে প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক হবে না মোটেই, তাই ঘুমন্ত অরুকে কয়েকদফা ঝারি দিয়ে দ্রুত ওর কেভিন ত্যাগ করে ক্রীতিক।
অতঃপর মনসংযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য, কেভিনের বাইরে চলে গিয়ে বসে পরে ল্যাপটপ নিয়ে। কিন্তু একি, ল্যাপটপেও একটু আগের দৃশ্য ভাসমান। ক্রীতিক তৎক্ষণাৎ ঠাস করে ল্যাপটপ বন্ধ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, ছোট্ট জানালা ভেদ করে তিমিরে ঢাকা আকাশ পানে।
তখনই একজন কেভিন ক্রু এসে,খুবই নমনীয় সুরে শুধালো,—-স্যার ঘন্টা খানিকের মধ্যেই ল্যান্ড করবো আমরা, কোন কোল্ড ড্রিংকস অথবা স্ন্যাক্স খাবেন?
—- পেট।
ক্রীতিকের কথাটা ঠিক বোধগম্য হলোনা লোকটার,তাই তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন,
—- ইয়ে মানে স্যার,কি খাবেন?

ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে জানালা থেকে চোখ সরিয়ে বলে,
—- বললাম তো পেট খাবো।
ক্রীতিকের জবাবে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওর দিকে আশ্চর্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাড়িয়ে আছে। লোকটার কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাহনি দেখে এতোক্ষণে ক্রীতিকের ও বোধগম্য হলো যে ওর জিহ্বা স্লিপ কে'টে ভুল যায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। আর এই মূহুর্তে এমন একটা কথা বলায় কেমন যেন অসস্থি ও হচ্ছে ওর নিজের, তাই তারাহুরো করে বললো,
—- কিছু নেবোনা, ইউ ক্যান গো।
লোকটা বো করে সম্মান জানিয়ে দ্রুত চলে যেতেই। ক্রীতিক দুহাতে নিজের চুল টেনে কটমটিয়ে অস্পষ্ট সুরে বললো,
—- তোর জন্যে কবে যেন আমি, সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাই অরু। দুনিয়াতে আর মানুষ পেলিনা, তোকে আমার স্টেপ সিস্টারই হতে হলো? না পারছি তোকে ধরতে, আর না পারছি ছাড়তে। ল্যান্ডিং এর পর আরও ঘন্টা খানিক গাড়ির পথ অতিক্রম করে ভোর রাতের দিকে হোটেলে এসে পৌঁছালো ওরা পাঁচ জন।
এটা হোটেল কম রিসোর্ট বেশি মনে হচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই রিসোর্টের বিশাল জানালা দিয়ে চাইলে স্পষ্ট চোখে সি-বিচ দেখা যায়। সেই সাথে অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আছে।
ওরা দুইটা ভিলা বুক করেছে, একটাতে দু'টো রুম। অন্যটাতে পাশাপাশি তিনটা। কিন্তু কে কোন রুমে থাকবে সেই নিয়েই বাধলো বিপত্তি। এলিসা কিছুতেই অর্নবের ধারে কাছে থাকবে না, ওদিকে এলিসার মতামতে অর্নবের ঘোর আপত্তি। এলিসার পাশের রুম ছাড়া কিছুতেই অন্যত্র রুম গ্রহন করবে না সে।

সায়র ওদের লাভ বার্ডের মধ্যে থাকতে নারাজ, এদিকে ক্রীতিকও সায়র কে কোনো মতেই অরুর ধারে কাছে থাকতে দেবেনা। শেষ পর্যায়ে কোনো উপায় না পেয়ে এলিসা, অর্নব, আর সায়র রক পেপার সিজার খেলেই রুম ভাগাভাগি করে নিলো।
অরু এখানে সবার চেয়ে ছোট, তারউপর ক্রীতিকের সাথে এসেছে তাই নিরব দর্শকের মতোই যে রুমটা ওর জন্য বরাদ্দ করা হলো তাতেই গিয়ে ঢুকে পরলো। সারারাতের জার্নিতে বড্ড ক্লান্ত লাগছে শরীরটা, এখন একটু ঘুমানো দরকার, তাই দেরি না করে জামাকাপড় ছেড়ে আবারও এক দস্তুর ঘুমিয়ে নিলো অরু।ভোর রাতে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে রুমে এসে এলিসাও ঘুমিয়ে গিয়েছিল দ্রুতই। তবে ভিডিও গেইমের গো’লাগু’লির কর্কষ আওয়াজে মাত্র কয়েকঘন্টার ব্যাবধানেই সেই ঘুম দৌড়ে পালালো ওর। ঘুম ভেঙে যাওয়ার দরুন একরাশ বিরক্তি নিয়ে ভ্রু কুঞ্চিত করে পাশ ফিরে তাকালো এলিসা।
তখনই দেখতে পায়, অর্নব ওর রুমের ডিভানে শুয়ে শুয়ে ফোনে গেইম খেলছে। অর্নব কে দেখেই এলিসার জিভটা তেঁতো হয়ে উঠলো, ভেতরটা চিড়বিড়িয়ে ফেটে পড়লো রাগে। ও চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো,
—- এখানে কি করছিস তুই?
অর্নব নরম কন্ঠে বললো,—- আরে আরে আস্তে, আশেপাশে সবাই ঘুমাচ্ছে।
—— হ্যা তো? আমিওতো ঘুমাচ্ছিলাম, তাহলে তুই এখানে কেন?

—— যদি ক্লাবের লোকজন তোর খোঁজ পেয়ে তোকে ধরে নিয়ে যায়? তাই পাহারা দিতে এসেছি। আমার ঘুমের প্রয়োজন নেই তুই গিয়ে বরং ঘুমা।
—— আমি ওদের সোনার ডিম পারা হাঁস অর্নব ।ধরে নিলেও কোনো ক্ষতি করবে না আমার।
অর্নব ভ্রু কুঁচকে বললো,
—- তোর এতো তেজ কেন বলতো? আমি বলে তোর এতো তেজ সহ্য করছি, অন্য কেউ কোনোদিন সহ্য করবে না দেখিস।
এলিসা ঝাঁঝ নিয়ে বললো,—- কে বলেছে তোকে সহ্য করতে? দূর হ তুই।
—- আমাকে এতো বিরক্ত লাগে তোর?
—- হ্যা তোর এসব এক্সট্রা কেয়ার আমার বিরক্ত লাগে। কই সায়র আর জেকে তো এমন করেনা,তাহলে তুই কেন?
অনর্ব উঠে এসে এলিসার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললো,
—— ওরা তোকে বন্ধুর চোখ দিয়ে দেখে তাই, কিন্তু আমি তোকে ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখি।
এলিসা একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললো,
—— ভালোবাসার আর মানুষ পেলিনা?
এলিসার আহত কন্ঠস্বরে অর্নবের রা'গে ফেটে পরা চোখ দুটো মূহুর্তেই যেন অসহায় হয়ে গেলো। ও একটানে এলিসাকে বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরে বললো,
—— ভালোবাসা কি এতো গুনে বেছে হয় বল?তোর অতীত যেমনই হোক আমি তবুও তোকে ভালোবাসি, ভবিষ্যতেও ভালোবাসবো। তুই অবহেলা করলেও বাসবো। তুই যতবার আমায় দুরে সরিয়ে

দিবি ঠিক ততবার আমি চুম্বকের মতো তোর টানে চলে আসবো। তুই যদি কখনো আমাকে কাছে টেনে নিস, আমি আরও কাছে গিয়ে তোর অন্তর্আত্নায় মিশে যাবো, তাও কোনোদিন তোর পিছু ছাড়বো না। শুধু একটা অনুরোধ আমার ভালোবাসা নিয়ে কখনো প্রশ্ন তুলিস না জান। ভালোবাসতে কারন লাগেনা। এটা ম্যাজিকের মতোই হুট করে হয়ে যায়। আমি শুধু তোর জীবন সঙ্গি হয়ে সারাটাজীবন তোর পাশে থাকতে চাই,এটা কি খুব বেশি চাওয়া বল?

অর্নবের একরাশ ভালোবাসার সীকারোক্তির মাঝেও এলিসা নিশ্চুপ। অথচ অর্নবের শার্টের ভাঁজে অশ্রু ভেজা নয়ন দুটো মুছে যাচ্ছে বারংবার, নিঃশব্দে নির্লিপ্তে……প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ে আসা প্রচন্ড পেটের ব্যাথায় কাতরাতে কাতরাতে ঘুম ভেঙেছে অরুর। ঘুমের ঘোরেই অস্পষ্ট সুরে অনুকে ডাকছে ও।

—- আপা পেট ব্যাথা করছে, এবার মনে হয় ম’রেই যাবো আমি।

কিন্তু আজ আর বিপরীত দিক থেকে কোন আওয়াজ এলোনা। খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করেও অনুর সারা না পেয়ে অরু যখন চোখ মেলে তাকায়,তখনই মনে পরে যায় ওতো ব্যাংককে আছে, আপা কিকরে আসবে এখানে ? উপয়ান্তর না পেয়ে দু-হাত পেটে চেপে ধরে, অরু নিজেই উঠে গিয়ে ব্যাগ হাতরে প্রয়োজনীয় জিনিস খুজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে পুরো ব্যাগ তন্নতন্ন করে ফেলেছে অরু। কিন্তু সেসব কিছুই নেই। অরুর মনে আছে, আসার সময় অনু ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছিলো, অরু আঁতকে উঠে, অসহায় কন্ঠে বলে উঠলো,

—— তারমানে কি আপা সেসব কিছুই দেয়নি? এখন কি করবো আমি? কাকে গিয়ে বলবো?
ওদিকে পেটের ব্যাথাটা ক্ষনিকের মাঝেই হলহলিয়ে ছড়িয়ে পরেছে সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কোমড় আর পা দু'টো অসার হয়ে আসছে। অপারগ অরু প্রচন্ড পেটের ব্যা'থায় মেঝেতে শুয়েই গড়াগড়ি শুরু করে দিয়েছে। এলিসা অন্য ভিলায় আছে, পাশের রুমে কে আছে সেটাও জানা নেই অরুর। সময়ের ব্যাবধানে এতোক্ষণে হয়তো পরনের কাপড় চোপরের অবস্থাও বেগতিক ওর। কোনোরূপ উপয়ান্তর না পেয়ে এভাবে মেঝেতে পরে থেকে ঠিক কতক্ষন যাবত কাতরাচ্ছিল তা মনে নেই অরুর। তখন দুপুর হয়ে এসেছে, দরজায় সজোরে কড়া নাড়ার ঠকঠক আওয়াজ হতেই কম্পিত হলো অরুর শরীর। মেঝেতে শোয়া অবস্থাতেই দৃষ্টিপাত করলো দরজার দিকে। বাইরে থেকে ক্রীতিকের গভীর কন্ঠ ভেসে আসছে,—— অরু দরজা খোল।
ক্রীতিকের আওয়াজ পেয়ে অরু আরও বেশি গুটিয়ে গেলো, এমন একটা অপ্রিতীকর পরিস্থিতিতে ক্রীতিকের মুখোমুখি হতে চায়না ও। যতই হোক ক্রীতিক ওর চেয়ে গুনেগুনে বারো বছরের বড়। আজ এভাবে দেখে নিলে,এরপর ক্রীতিকের চোখের দিকে চাইবে কিভাবে ও? ওদিকে ক্রীতিক ডেকেই যাচ্ছে একনাগাড়ে ।
—— অরু দরজা খোল, নয়তো আমি পাসওয়ার্ড চেপে ভেতরে চলে আসলে গুনেগুনে শ খানেক থা'প্প'ড় খাবি তুই।
ক্রীতিকের অতিব মাত্রার হু'মকির মুখে পরে,
অরু মিনমিনিয়ে কাতর কন্ঠে বললো,
—- কিভাবে খুলবো?

ওপাশ থেকে বিরক্তির চড়ম সীমানায় গিয়ে ক্রীতিক বলে
—- কিভাবে খুলবি মানে? হাত দিয়ে খুলবি।
অরু কাঁদো কাঁদো সুরে জবাব দিলো,—- আপনি ফিরে যান দয়াকরে।
অরুর কথাটা বলতে বাকি তার আগেই পাসওয়ার্ড চেপে ভেতরে প্রবেশ করে ক্রীতিক।
—— তুই নাকি ব্রেকফাস্ট করতে যাসনি? কেন যাসনি?
শাসাতে শাসাতে ভেতরে ঢুকে অরুকে এভাবে মেঝেতে পরে থাকতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এলো ক্রীতিক। ওর মাথার কাছে হাটু গেড়ে বসে উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালো,
—-কি হয়েছে তোর? এভাবে মেঝেতে শুয়ে আছিস কেন?পেট ব্যাথা করছে? শরীর খারাপ লাগছে খুব? ডাক্তার কে কল করবো?
অরু কাচুমাচু হয়ে চোখ খিঁচে বললো,
——— আপনি দয়াকরে চলে যান।
—— যাবো মানে? তুই হুকুম করবি আর আমি চলে যাবো? আমি কি তোর সার্ভেন্ট?
অরু জবাব দিলোনা,একেতো পেটের অসহনীয় ব্যাথা,তার উপর এই লোকের মাথা খারাপ করা ধ’মকা ধ’মকি,না পেরে নিরবে কাঁদছে অরু।
ক্রীতিক অরুকে কোলে নেওয়ার জন্য দু-হাত বাড়াতে যাবে তখন আবারও ঘোর আপত্তি জানিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে
অরু,—-নাআআ,ছোবেন না আমায়। অনুরোধ করছি।
ক্রীতিক এবার অ’গ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো অরুর পানে,অতঃপর চোয়াল শক্ত করে বললো,

—- তোর অনুরোধ কিংবা নিষেধ কোনোটারই ধার ধারিনা আমি, সেটা ভবিষ্যতে আরও ভালো করে বুঝতে পারবি।
কথা শেষ করে একটানে অরুকে কোলে তুলে নিলো ক্রীতিক। সঙ্গে সঙ্গে ওর একহাত হাত ভিজে এলো তরল জাতীয় কোন পদার্থে।
ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে অরুকে কোলে রেখেই নিজের হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করলো।
এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে এ জীবনে পরেনি অরু।তাই করনীয় কিছু না পেয়ে ক্রীতিকের কলার চেঁপে ধরে চোখ দুটো খিঁচিয়ে বন্ধ করে রেখেছে ও। লজ্জায়, ভয়ে মনে হচ্ছে মাটিটা ফাঁক হয়ে যাক,আর অরু তাতে ঢুকে আশ্রয় নিক। এ দুনিয়াতে আর কোন কাজ নেই ওর।
—- ওহ শীট,আমাকে কেন বলিস নি? আমি আরও ভাবলাম কি না কি।
নিজের হাতে নজর বুলিয়ে কথাটা বলে,ক্রীতিক অরুর মুখের দিকে চাইলো, যে এখনো চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে রেখেছে,—— তুই কি এখনো ছোট্ট বাচ্চা অরু? তোর কি ফার্স্ট টাইম পিরিয়ড হয়েছে?
অরু চোখ বুঝে এদিকে ওদিক মাথা নাড়ালো।
ক্রীতিক দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—— তাহলে সারাদিন কেন এভাবে কষ্ট সহ্য করলি? কেন আমাকে বললি না? কি হলো উত্তর দে?
অরুর জবাব নেই, জবাব কি দিবে ওর তো লজ্জায় গলার আওয়াজই নেই।
ক্রীতিক নিজের রাগ সংযত করে অরুকে বিছানায় শুয়িয়ে দিয়ে এলিসাকে কল করে আসতে বললো।

অরু বিছানায় শুয়ে একচোখ সামান্য খুলে ক্রীতিককে দেখতে চেষ্টা করলো, যার সফেদ রঙা শার্টটা খানিকক্ষণ আগেই নষ্ট করে দিয়েছে অরুর নারী সত্তা। অথচ ক্রীতিকের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। সে তো এখনো তার বোকা অরুকে বকাঝকা দিতেই ব্যাস্ত। পরন্ত বিকেলে জোয়ার এসেছে সুবিশাল সমুদ্র তটে। সমুদ্রের নীলাম্বর জল ভলভলিয়ে ফুলেফেঁপে উঠেছে দিগুণ। জোয়ারের তালেতালে নীলরঙা স্বচ্ছ পানির ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ এসে আঁচড়ে পরছে বিস্তার বেলাভূমি জুড়ে। ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে মহাসমুদ্রের গহীন থেকে উঠে তীরে এসে ঠাই নিয়েছে রঙবেরঙের ঝিনুকের দল। হুট করে একনজর দেখলে মনে হবে নীল রঙা অমৃতের মাঝে কেউ চকচকে হীরে-জহরত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। সুক্ষ্ম পায়ে এক কদম করে এগোতে এগোতে সেই অতিব মূল্যবান হিরে জহরতই কুড়িয়ে হাতে থাকা প্লাস্টিকের থলেতে ভরে নিচ্ছে অরু। শীপ থেকে নামার পরেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওর এই কর্মকান্ড। ওদিকে বাকি সবাই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে একাই পিছিয়ে পরেছে অরু। পরনে ওর ল্যাভেন্ডার কালারের ফিনফিনে লং ফ্রক, যা গোড়ালি অবধি নেমে এসে গাউনে পরিনত হয়েছে। একহাতে মুক্তা আর ঝিনুক দিয়ে তৈরি কিছু ব্যাংঙ্গলস। হাঁটু সমান লম্বা সিল্কি চুল গুলো শুধু একটা পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে আটকানো। এক ঝলকে দেখলে মনে হবে, এই জনমানবহীন ছেড়া দ্বীপের আধিপত্য শুধুই ওর। ওই যুগযুগ ধরে সমুদ্রে বসবাসরত রূপকথার সেই সাগর কন্যা। যে কিনা এখন ঝিনুক কুড়াতে গভীর মনোযোগী।

অরু পিছিয়ে পরেছে দেখে এলিসা পেছন ঘুরে হাঁক ছেড়ে ডেকে উঠল ওকে,— অরু তারাতারি এসো, এতো পিছিয়ে গেলে কি করে?
এলিসার কথার মাথায় ক্রীতিকও এবার সামনে থেকে পেছনে একঝলক চোখ ঘোরালো। চোখে তার বিশাল আকৃতির রোদচশমা, লম্বা স্টাইলিস চুল গুলো সাগর তীরের ঝড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়ছে, বারবার ব্যাকব্রাশ করেও ঠিক রাখা যাচ্ছে না মোটেই। পরনে সাদা টিশার্টের উপর কেলভিন ক্লাইন খচিত ডেনিম ট্রাকস্যুটে গ্লোভাল সুপারস্টার দের মতোই সুপুরুষ লাগছে তাকে ।
এলিসার ডাকে অরু ঝিনুক কুড়ানো বাদ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ওদের থেকে দূরত্ব কমালো। পেছন পেছন হাটতে হাটতে সুক্ষ্ম চোখে পরখ করতে লাগলো সাথে আসা সবাইকে, এলিসা আল্ট্রা মর্ডান ধাঁচের মেয়ে, এরকম জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপে সমুদ্র বিলাশ করতে এসেও তার ফ্যাশনের পরিবর্তন হয়নি একটুও। স্কিনি লেদার প্যান্ট,পায়ে বুট, গায়ে ট্যাং টপ তার উপর লাল রঙা লম্বা কোটি।
এলিসার সাথে রঙ মিলিয়ে অর্নব ও লাল রঙের শার্ট পরেছে। যা নিয়ে সেই কখন থেকে সায়র হাসাহাসি করে খিল্লি উড়াচ্ছে।ওদের থেকে চোখ সরিয়ে অরুর চোখ গেলো ক্রীতিকের দিকে, যে সমুদ্র বিলাশে এসেও এক মনে ফোন ঘাটছে। তবে মজার বিষয় হলো, সাদা কালো ছাড়া অন্য কোনো রঙে ক্রীতিককে এই প্রথম দেখলো অরু। এমন ব্যাতিক্রম স্টাইলে মানিয়েছেও তাকে বেশ। এই গ্রুপের মধ্যে সায়রই একমাত্র মানুষ যে কিনা পুরোপুরি অরুর মনের মতো।সায়রের মাথার স্ক্রু ওও সবগুলো ঠিক আছে মনে হচ্ছে।
সায়র একজন গ্লোভাল মডেল তাই ওর ফ্যাশন আইডিয়াও বেশ

ভালো, থ্রী কোয়ার্টারের সাথে ফ্লোরাল প্রিন্টেট শার্ট পরে এসেছে সে। সবাইকে একে একে পরখ করা শেষ হলে অরুর চোখ গেলো বিস্তার বেলাভূমি ছাপিয়ে গহীন অরন্যের দিকে। প্রথমে কয়েক ধাপে সারিসারি নারিকেল গাছ তারপর থেকে শুরু হয়েছে গহীন জঙ্গল। লোকালয় থেকে কয়েকক্রোশ সমুদ্রপথ পারি দিয়ে তবেই হদিস মেলে অপার সৌন্দর্য বেস্টিত এই ছেঁড়া দ্বীপের। সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত এখানে দেশি-বিদেশি মানুষের তুমুল জমজমাট লক্ষনীয়। যে যার মতোন করে নিংড়ে নিচ্ছে সমুদ্র তীরের ধুলো ময়লা বিহীন পরিস্কার অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ু। কেউ কেউ আবার মেতে উঠেছে ঢেউ খেলানো সমুদ্র স্নানে। চিরাচরিত একঘেয়ে জীবন থেকে খানিকটা ফুরসত পেয়ে চারিদিকের সবাই কেমন শিশু সুলভ আচরণ করছে। তবে এতোক্ষন যাবত একনাগাড়ে হেঁটে হেঁটে ওরা ঠিক কোথায় যাচ্ছে সেটাই এখন আপাতত দেখার পালা ।—
আমাদের হাতে সর্বোচ্চ সময় থাকবে দশ মিনিট। এই দশ মিনিটে ওদের ক্লাবের ওয়াইফাই, ইলেকট্রেসিটি,ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর ওদের নিজস্ব ওয়েবসাইট সবগুলো একই সাথে হ্যা'ক করবো আমি। জেকে বাইক নিয়ে ক্লাবের বাইরে থাকবে, আর সায়র, তুই হবি এলিসার এসিসট্যান্ট। যখন সবগুলো সাইট একযোগে হাতছাড়া হয়ে যাবে, তখন ওরাই নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল লাগাবে,সেই ফাঁকে তুই এলিসা আর ওর বাবাকে গিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরে বেরিয়ে আসবি। এইটা হলো শর্টকাট রাস্তা। জেকে ঠিক এই পজিশনে ওয়েট করবে। কথাটুকু শেষ করে সায়রের দিকে ল্যাপটপ এগিয়ে দিলো অর্নব।

সায়র ল্যাপটপে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর কন্ঠে বললো,— সবই বুঝলাম কিন্তু আমি কেন এলিসার এসিসট্যান্ট হতে যাবো, তুই হ,আফটার অল তোর পেয়ারে লাল হলো এলিসা।
এলিসা তখন উত্তাল সাগরের ঢেউয়ের মালা দেখায় ব্যাস্ত। সেদিকে একনজর তাকিয়ে
দাঁত কটমট করে অর্নব বললো,
— তাহলে হ্যা'কিং এর কাজটা বরং তুই কর, দেখি কোন ঘোড়ার ডিম পারিস।
ক্রীতিক ল্যাপটপে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা করতে করতে বললো,
— বাচ্চাদের মতো সিল্যি ঝগড়াঝাটি বন্ধ করে আমার জন্য KTM 390 রেন্ট করার ব্যাবস্থা কর। যেনতেন বাইক রাইড করে মজা পাইনা আমি।
অর্নবের বিরক্তি মাখা চোখ দুটো এবার সায়রের দিক থেকে ঘুরে ক্রীতিকের দিকে গেলো। হেলদোলবিহীন ক্রীতিককে উদ্দেশ্য করে অর্নব তেতে বলে উঠলো,— তুই কোনো রাইডিং কম্পিটিশনে আসিসনি জেকে, যে তোকে পছন্দের বাইকটাই রাইড করতে হবে।
— ক্রীতিক ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে ভাবলেশহীন মুখে বললো,
— দুটো জিনিসে আমি কম্প্রোমাইজ করিনা অর্নব,আর কোনোদিন করবোও না, তারমধ্যে একটা হলো বাইক।
সায়র আগ বারিয়ে জিজ্ঞেস করল,
— আরেকটা?
ক্রীতিক এবার নিঃশব্দে অরুর দিকে তাকালো, যে এই মূহুর্তে খুবই মনোযোগ সহকারে ভেজা বালুর আস্তর দিয়ে ক্যাস্টল বানাতে

ব্যাস্ত। অরুকে বালু দিয়ে ক্যাস্টল বানাতে দেখে সায়রও এগিয়ে গেলো সেদিকে, অরুর পাশে গিয়ে বসে আগ্রহীস্বরে বললো,— আমি হেল্প করবো?

অরু উল্টো প্রশ্ন করে শুধালো,

— সত্যিই করবেন?

সায়র হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে অরুর হাতে হাত লাগায়। অরুকে সাহায্য করতে করতে সায়র খেয়ালই করেনি যে, কেউ একজন ওকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে। সেই সাথে অরুকেও।

বালুর ক্যাস্টলটা তখন প্রায়ই তৈরি হয়ে গিয়েছে, দুজন মিলে মিশে করায় বেশ সুন্দর ভাবেই ফুটে উঠেছে ডিজাইনটা,এবার ফিনিশিং এর পালা। বালুর আস্তরে আলতো করে হাত বুলাতে গিয়ে অরুর হাতে একটুখানি স্পর্শ লেখেছে কি লাগেনি তৎক্ষনাৎ কয়েক মিটার দূর থেকে কর্কষ কন্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রীতিক।

— সায়রের বাচ্চাআআ।আচমকা চিৎকার শুনে লাফিয়ে উঠে পেছনে চাইলো সায়র, কয়েক মিটার দূরত্বে হাত মুঠি করে দাড়িয়ে থাকা ক্রীতিকের মুখ ভঙ্গিমা দেখেই ওর গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ক্রীতিকের রাগে র’ক্তিম হয়ে যাওয়া চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ও গত আধঘন্টা যাবত সুক্ষ্ম নজরে এদিকেই তাকিয়ে ছিল। আর এই মূহুর্তে সায়রের খবর আছে, নিজেকে বি’পদ মুক্ত করতে সায়র তৎক্ষনাৎ বাম হাত দিয়ে টোকা মে’রে এতোক্ষণ ধরে একটু একটু করে সযত্নে তৈরা ক্যাস্টলটা ঠাস করে ভেঙে ফেললো। এবার শুধু ক্রীতিকের নয় অরুর মেজাজও সপ্তম আসমানে চড়ে গেলো। এক ঘু’ষিতে সায়রের নাক ফা’টিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো শালা ভিতুর ডিম একটা।

সায়র ভয়ার্ত চাহনি নিয়ে একবার ক্রীতিকের দিকে তাকালো তো আরেকবার চোখ ঘুরিয়ে অরুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিকের আওয়াজ ভেসে এলো,— আবার ওইদিকে চোখ দিয়েছিস?
এদের কাহিনি দেখে অরু বিরক্ত হয়ে ধাপ ধাপ পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেলো। রাগে দুঃখে কান্না পাচ্ছে ওর, সবাই সব সময় ওর মনটাই কেন ভে'ঙে দেয় কে জানে?
আকাশে সূর্যের তীর্যক আলো মিয়িয়ে গিয়ে গোধূলি নেমেছে। সোনালী আলোর ছটায় ঢেউ খেলানো সমুদ্রের পানিগুলো চিকচিক করছে, সাগরের পার ধরে হাটতে হাটতে ওদের থেকে অনেকটা দুরে চলে এসেছে অরু, তবুও হাটার গতি থামায়নি। ভালো লাগছে না ওর,সবাইকে কেমন পর পর লাগছে,ছোট্ট বাচ্চারা যেমন আম্মুর কাছে যাবো বলে বায়না ধরে, অরুরও তেমন বলতে ইচ্ছে করছে আপার কাছে যাবো। কিন্তু ও তো এখন আর ছোট নয়, তাই সেসব বলে নিজের আত্মসম্মানের বারোটা বাজানোরও কোনো ফুরসত নেই।
ওদিকে সায়র কে ইচ্ছেমত কতগুলো ঝাড়ি দিয়ে, অনেকটা দূরত্ব রেখেই অরুর পিছু নিয়েছে ক্রীতিক। মনে মনে বলছে—দেখি কতদূর যেতে পারিস, আমি আটকাবো না, আটকাতে গেলে তোর খবর আছে আজ।
এরমাঝেই ক্রীতিক মোবাইল চেইক করে দেখতে পায় ওরা নেটওয়ার্কের বাইরে চলে এসেছে,ওদিকে সন্ধ্যা নেমে আসছে তাই ও এবার দ্রুত পা চালাতে লাগলো অরুকে নিয়ে আসবে বলে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই একটা অযাচিত দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলো ক্রীতিক, দেখলো অরু একটা অচেনা থাই লোকের সাথে একটা পার্স

ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করছে। টানাটানি বললে ভুল হবে একপ্রকার জোর জ’বরদস্তি করছে লোকটার সাথে। অরুর পাশেই দাড়িয়ে আছে অদ্ভুত দেখতে একটা কুঁজো বৃদ্ধা মহিলা,যার বিনুনি করা সাদা চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কুচকুচে কালো চুল। মহিলার ভাবভঙ্গিমাও ভারী অদ্ভুত। ক্রীতিক খানিকক্ষণ দূর থেকে দাড়িয়েই সবটা বোঝার চেষ্টা করলো, তারপর এগিয়ে গিয়ে ফট করে অরুর হাত টেনে ধরে ব্যাগটা থাই লোকটার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো,

— আ’ম এক্সট্রিমলি সরি,ইউ ক্যান গো নাও।লোকটা ক্রীতিককে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতেই, ক্রীতিক তীক্ষ্ণ নজরে ছদ্মবেশী বৃদ্ধার দিকে তাকালো। ওর বাঁজপাখির মতো ধারালো চোখে এক পলক চোখ পরতেই শুষ্ক ঢোক গিলে উল্টো পথে হাটা দিলো বৃদ্ধা। তৎক্ষনাৎ হিং’স্র বাঘিনীর ন্যায় তেতে উঠলো অরু, কন্ঠে একরাশ বিরক্তি আর ঝাঁঝ নিয়ে বললো,

— আপনি কেমন লোক বলুন তো? একটা হাইজ্যা’কারের হাতে ওই বৃদ্ধা মহিলার সব টাকা পয়সা তুলে দিলেন? এতোটা নির্দয় কেন আপনি? উনি আপনার মা হলে এই কাজটা করতে পারতেন কখনো? মায়ের শাষণ বারণ ছাড়া উশৃংখল জীবনে বড় হলে এই হয়।

রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে কি থেকে কি বলে ফেলছে অরু তা নিজেও জানেনা। তবে কথার মাঝ পথেই ক্রীতিকের শক্ত হাতের চপেটা’ঘাত এসে আঁচড়ে পরলো ওর নরম তুলতুলে গালে। চ’ড়ের আ’ঘাতটা এতোই জোরে ছিল যে অরুর মনে হলো ওর গালটা এক্ষুনি খসে পড়বে। উরন্ত অ’গ্নিস্ফুলিঙ্গ বি’স্ফোরণের মতোই

ব্যাথায় ঝলসে যাচ্ছে গালটা।— আগে মানুষ চিনতে শেখ, পরে জাজ করতে আসিস ইডিয়েট।
নিজ গালে হাত দিয়ে ছলছলে নয়নে ক্রীতিকের অ'গ্নিমূর্তির দিকে তাকালো অরু। অস্ত যাওয়া সূর্যের সিঁদুর রাঙা আলোয় ওর মুখটা ভ'য়ানক দেখাচ্ছে। ফর্সা আকর্ষনীয় গৌড় মুখটা মূহুর্তেই কেমন লালচে বর্ন ধারন করেছে। তীক্ষ্ণ চোয়ালটা জিদের তোপে তিরতির করে কাঁপছে।অরু মুখ উঁচিয়ে ওর কথার পাছে কিছু বলতে যাবে তার আগেই ক্রীতিক দাঁতে দাঁত পিষে বললো,
— আমার চোখের সামনে থেকে যা অরু, নয়তো আরও মা'র খাবি।এই মূহুর্তে তোর মুখটাও আমি দেখতে চাইনা।
ক্রীতিকের কথায় পারদের মতো তেজ ছড়িয়ে পরলো অরুর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মাথার মধ্যে আ'গ্নেয়গিরির জলন্ত লাভার মতোই রাগ উগরে উঠছে ভলভল করে, রাগের তোপে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওর কথা শেষ হতে না হতেই হনহন করে উল্টো পথে হাটা দিলো অরু। ক্রীতিকেরও মাথায় আকাসম জিদ চড়ে আছে, তাই ও নিজেও অরুর কথা চিন্তা না করেই হাটা দিলো অরুর বিপরীত দিকে ।পুরো একটা দিনের ইতি ঘটেছে হাসপাতালের ছোট্ট কামরায় বসে বসে। সারাদিনের ছোটাছুটি শেষে সন্ধ্যা হতেই ঝরঝরিয়ে ক্লান্তি নেমেছে র'ক্ত মাং'সের তৈরি যন্ত্রের মতো শরীরটায়। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে অনু,গন্তব্য ক্রীতিকের ছোট্ট ডুপ্লেক্স বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে ঘুমালে হয়তো ক্লান্তি কাটবে খানিকটা। বাস স্টপেজ থেকে নেমে দ্রুত হেটে ক্যাফিটেরিয়া পর্যন্ত এলেও ক্লান্তিতে এখন হাঁটার গতি ধীর হয়ে গিয়েছে ওর। মনের মাঝে জমে থাকা একরাশ অভিমান,ক্লান্ত

পরিশ্রান্ত শরীর, প্রতিদিন ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মতো হসপিটালে টু বাড়ি সব কিছু ছাপিয়েও ওর মনে ভেসে বেরাচ্ছে খুশির লাবড়ুড। আর তো মাত্র কিছুদিন, তারপর মা ঠিক আগের মতো,হাটবে,চলবে,কথা বলবে ওদের দু'বোনকে শাসন করবে, আদর করবে। ও আর অরু আবারও বয়সের মাপকাঠি ভুলে মায়ের আদুরে বাচ্চা হয়ে যাবে। এর চেয়ে খুশির আর কিইবা হতে পারে। এতোসব ভাবনার মাঝেও অনুর অযাচিত মনে এক সুক্ষ্ম কৌতুহল হানা দেয়, মনেমনে ভাবে,— আচ্ছা মায়ের সুস্থতার পর সব কিছু একই রকম থাকবে তো?
অনু যখন সোডিয়ামের আলো ছায়াকে পেছনে ফেলে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো,তখন আবারও সেদিনের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত মুখ দু'টো সামনে চলে আসে ওর। রাস্তার পাশেই গাড়ির ডিকিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যয়,তার মুখোমুখি সেদিনের সেই সুন্দরী মেয়েটা। বেশভুসা তার অত্যাধুনিক। কার্ল করা ঢেউ খেলানো চুল গুলো বাদামি রঙের হলেও দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা পশ্চিমাদেশের কোনো সাদাচামড়া নয়, বরং এশিয়ান কোনো দেশের হবে হয়তো, প্রত্যয়ের সাথে যেহেতু দাড়িয়ে আছে বাংলাদেশীও হতে পারে।
অনু কয়েকমূহুর্ত দাড়িয়ে সবটা পরখ করলো,তারপর এমন ভাবে ওদের অতিক্রম করে চলে গেলো যেন প্রত্যয়কে ও চেনেই না। কিন্তু প্রত্যয় অনুকে দেখা মাত্রই ওর পিছু নিয়েছে। প্রত্যয় পেছন পেছন এগিয়ে আসছে দেখে অনু হাটার গতি দিগুন বাড়িয়ে দেয়, তবুও প্রত্যয়ের পুরুষালী কদমের সাথে পেরে উঠলো না অনুর ক্লান্ত শরীরটা, এক পর্যায়ে পেছন থেকেই ওর বাহু টেনে দাঁড় করিয়ে

দিলো প্রত্যয়। অনু ঝাড়ি মে'রে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে বললো,— কি সমস্যা?
— আপনার কি সমস্যা? ইগনোর কেন করছেন?
পাল্টা প্রশ্ন ছোড়ে প্রত্যয়।
অনু একটু তাচ্ছিল্য হেসে নিজের ভেতরের অজ্ঞাত বেড়ে ওঠা রাগটাকে কৌশলে আড়াল করে বললো,
— আপনার কেন মনে হলো আমি আপনাকে ইগনোর করছি? আপনাকে ইগনোর করার কি যোগ্যতা আছে আমার?
— কথা এড়াচ্ছেন?
— মোটেই না, অনন্যা শেখ এতোটাও ভীতু নয়।
প্রত্যয় তীর্যক হেসে বললো,
— আই লাইক ইট।
অনু আবারও সামনের দিকে হাটা ধরলো, প্রত্যয় ওর পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে শুধালো,
— ফোন না ধরার কারনটা জানতে পারি?
— ইচ্ছে করেনি তাই ধরিনি।
— আপনার ইচ্ছেরা তো খুব বাজে,এই বলে অনুর পাঁচ আঙুলের ভাঁজে নিজের আঙুল ঢুকিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো প্রত্যয়।
অনু হাটা থামিয়ে আবারও বিরক্তি নিয়ে বললো,— আবারও হাত ধরেছেন কেন?
প্রত্যয়ের নির্লিপ্ত জবাব
— ইচ্ছে হয়েছে তাই ধরেছি , আমার ইচ্ছেরাও খুব একটা সুবিধার না বুঝলেন।

প্রত্যয়ের কথার পিঠে অনু লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নরম কন্ঠে শুধালো,
— প্রত্যয় সাহেব, আপনি শুধু আমার, তাইতো?
প্রত্যয় হেসে জবাব দেয়,
— হান্ড্রেড পার্সেন্ট।
অনুর ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখটায় এতোক্ষণে হাসির ঝলক দেখা দিলো, নিজ হাতটা প্রত্যয়ের আঙুলের ভাজ থেকে বের করে, দুহাতে ওর বাহু আঁকড়ে ধরে মাথাটা এলিয়ে দিলো প্রত্যয়ের কাঁধের উপর। প্রত্যয় তার গমগমে পুরুষালী হাস্কি স্বরটা কিছুটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল,
— টায়ার্ড লাগছে?অনু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ওকে দু'হাতে উঁচিয়ে কোলে তুলে নিলো প্রত্যয়। পাকিস্তানি প্লাজো আর কামিজ পরেছিল অনু, দোপাট্টা দিয়ে টেনে রাখা মাথার আধখানা ঘোমটা টা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো ওর। মাঝরাস্তায় প্রত্যয়ের হঠাৎ কর্মকান্ডে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অনু লজ্জিত কন্ঠে মিনমিনিয়ে বললো,
— বাড়ির কাছে চলে এসেছিতো,নামিয়ে দিন কেউ দেখে ফেলবে।
প্রত্যয় বাঁকা হেসে জবাব দেয়,
— বাড়িতে কেউ নেই ডিয়ার।
সেই হাসিতে চিকন ফ্রেমের চশমা পরিহিত প্রত্যয়কে আবারও একদফা নতুন রুপে আবিস্কার করলো অনু। রাত নয়টা বেজে পয়ত্রিশ, রাতের খাওয়ার সময় হয়েছে। এরপর আবার ঘুমানোর পালা,পরেরদিন সকাল সকাল উঠতে হবে , অথচ অরু এখনো খেতেই আসেনি। অরু যে রুমটায় থাকে তার পাশের রুমটাই

ক্রীতিকের। এলিসা অর্নব আর সায়র অন্য ভিলাতে থাকে। তবে খাবারের সিস্টেম বুফে বলে, খাবারের সময় হলে সবাই একই ডাইনিং এ জমায়েত হয় ওরা।
এখন ডিনারের টাইম, ডাইনিং এ সবাই উপস্থিত অথচ অরু নেই। চারদিকে চোখ বুলিয়ে অরুকে না দেখে এলিসা বললো,— অরু কোথায়? এখনো খেতে আসেনি?
এলিসার কথায় ক্রীতিকও চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললো,
— তোরা শুরু কর আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি, মনেমনে ভাবলো,
— আমি ধ'মক দিয়ে না ডাকলে জীবনেও আসবেনা এই ঘার ত্যারা মেয়ে।
অরুকে ডাকতে গিয়ে ক্রীতিক ভিলায় প্রবেশ করতেই ওর ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেলো, পুরো ভিলা অন্ধকারে ছেয়ে আছে, বিচ থেকে ফিরে সারা সন্ধ্যা আর রুমে আসেনি ক্রীতিক। বাইক ভাড়া করে ব্যাংককের হাউওয়েতে রাইড করে বেড়িয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা। অথচ এতো রাত হয়ে গেলো এখনো লাইট জ্বালায়নি অরু আশ্চর্য। ক্রীতিক দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা রুমের লাইট জ্বালালো, অতঃপর অরুর রুমের সামনে গিয়ে ওকে ডাকতে আরম্ভ করলো। ভেতর থেকে কোন সারাশব্দ না পেয়ে ক্রীতিক বিস্মিত হয়ে পরলো, মনে মনে ভাবলো,— কালকের মতো কিছু হয়নিতো আবার? কালকের কথা মনে পরতেই পাসওয়ার্ড টিপে তৎক্ষনাৎ ভেতরে প্রবেশ করলো ক্রীতিক। ভেতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ওর শীরদাড়া বেয়ে যেনো শীতল স্রোত নেমে গেলো। মনে হলো কলিজাটা কেউ খাঁ'মচে ধরেছে। পুরো রুম ফাঁকা, তাহলে অরু কোথায়?এলিসা,

অর্নব,সায়র কালকের ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছে আর খাবার খাচ্ছে, এলিসা ভুক্তভোগী অথচ টেনশনে মাথা ফেটে যাচ্ছে অর্নবের। সেই নিয়েই কখন থেকে হাসছে সায়র। সায়র যখন অর্নবকে নিয়ে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খাবে খাবে ভাব সেই মূহুর্তেই ছো মে'রে ওর কলার চেপে ধরে, ক্রীতিক হুংকার দিয়ে শুধালো,

— অরু কোথায়?

সায়র অসহায়ের মতো বললো,

— অরু কোথায় মানে? সেই যে বিকেলে উত্তম মাধ্যম দিলি তারপর আর আমি অরুর ধারে কাছেও যাইনি, বিলিভ মি, গড প্রমিস। নিজের কন্ঠানালীতে হাত ছুয়িয়ে কথাটা বললো সায়র। ক্রীতিক আস্তে করে সায়র কে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাড়ায়, কপালের সবগুলো রগ ফুলে আছে ওর। চোয়াল হয়ে আছে ইস্পাতের ন্যায় শক্ত, সেভাবে থেকেই ক্রীতিক সবার উদ্দেশ্যে বললো,

— অরুকে তোরা নিয়ে আসিস নি?

এলিসা আর অর্নব চোখাচোখি করে মিনমিনিয়ে বললো,— তুইতো আমাদের আগেই চলে এসেছিস, আমরা আরও ভাবলাম অরুকেও সাথে করে নিয়ে এসেছিস।

–ড্যাময়েট।

সশব্দে শক্ত কাঠের ডাইনিং এ পাঞ্চ বসিয়ে দিলো ক্রীতিক। অতঃপর চেয়ারে ঝুলানো নিজের হুডিটা টা গায়ে চড়িয়ে সায়রের উদ্দেশ্যে বললো,

— সায়র কয়টা বাজে চেইক করতো। আমি দ্বীপে যাবো।

সায়র দ্রুত ঘড়ি দেখে বললো,
— প্রায় দশটার কাছাকাছি, এ সময় অতদূরের দ্বীপে কোন শীপই যেতে রাজি হবেনা। তাছাড়া দ্বীপের শেষ ফেরী সন্ধ্যা সাতটায়।
— তাহলে ইমারজেন্সী হেলিকপ্টার বুক কর।
সায়র একটু আমতাআমতা করে বললো,
— ইয়ে মানে, এতো রাতে হেলিকপ্টার বুক করাটা কিছুটা কস্টলি হয়ে যাবে।
ক্রীতিক তৎক্ষনাৎ সায়রের দিকে অ’গ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
— সো হোয়াট? টাকা কি তুই দিবি?তিমিরে ঢাকা গভীর অরন্যে পথ হাড়িয়ে পায়ে কাঁ’টা ফুটিয়ে জটলা পাকানো দানবাকৃতির বট গাছের নিচে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অরু। তখন রাগের তোপে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে একমনে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় এসেছে, কোন রাস্তা দিয়ে এসেছে কিছুই মনে নেই ওর। যখন মস্তিষ্কে নাড়া দিলো যে ও গহীন জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছে তখন ঘোর আধারে ছেয়ে গিয়েছে ধরনী। আমাবস্যার রাতে জঙ্গলের মধ্যে এতোই অন্ধকার যে নিজের হাত পা পর্যন্ত খালি চোখে দেখার যো নেই। অরু যখন বুঝেছে যে ও পথ হারিয়ে ফেলেছে, তখন মতিভ্রম হারিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দিগ্বিদিক ছুটেছে ও। যার ফলে বনবিঁচুডিতে বেধে জুতো সহ পায়ের বিভিন্ন অংশ ছি’ড়ে র’ক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে পা দুটো। হাটতে না পেরে অন্ধকারের মাঝেই অসহায়ের মতো গলা ফাটিয়ে ডেকেছে সবাইকে। অথচ নিরব বেলাভূমিতে একটা মানুষের আওয়াজ ও শোনা যায়নি, বরং ওর ডাকের বিপরীতে ভেসে এসেছে রাত জাগা বন্য প্রানী আর হুতুম পেচাঁর গা গুলানো ভ’য়ানক আওয়াজ। এক পর্যায়ে ডাকতে

ডাকতে গলার স্বর ভে'ঙে গিয়েছে ওর। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে শরীর আর মনের জমাট বাঁধা ব্যাথা নিয়েই গাছের নিছে বসে পরেছে অরু। ফুপিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছে নিস্তব্ধ অরন্য। কান্নার তালেতালে কেঁপে উঠছে ওর ছোট্ট শরীরটা।এভাবেই কিছু সময় অতিবাহিত হয়, অরু এখনো হাটুতে মুখ গুঁজে কাদঁছে।চারিদিকে তাকাতেও কেমন গা ছমছম করছে ওর, সেসময় হঠাৎ শুকনো পাতার মরমর আওয়াজ পেয়ে মাথা তুলে সামনে চাইলো অরু, চারিদিকে অন্ধকার সামনে পেছনে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা অথচ পায়ের কাছে কোনোকিছুর উপস্থিতি সুস্পষ্ট। কিন্তু কি? ব্যাপারটা বোঝার জন্য নিজের একপায়ের ছেড়া জুতোটা দুরে ছুড়ে মারলো অরু, সঙ্গে সঙ্গে ফনা তুলে হিসহিসিয়ে উঠলো, জংলী এক সরীসৃপ। হঠাৎ করে নিজের এতো কাছে সাপের উপস্থিতি টের পেয়ে ক্রন্দনরত মুখটাকে দু-হাতে চেপে চোখ মুখ খিঁচে দৌড় লাগালো অরু। অন্ধকারে দৌড়াতে গিয়ে বনবিচুঁড়িতে বেধে বারবার হুমড়ি খেয়ে পরছে ও,তবুও শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পুনঃরায় দৌড়াতে লাগলো অরু। একপর্যায়ে চোখের সামনে জলন্ত দুটো চোখের উপস্থিতি টের পেয়ে সে ছোটার গতি আবারও থমকে গেলো ওর। হঠাৎ করে অন্ধকার জঙ্গলে এমন জলন্ত চোখ দেখে, ভ'য় আ'তঙ্কে জর্জরিত হয়ে গগন কাঁপিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো অরু। মনে মনে ভাবলো,—এটা আবার কি? কোনো বাঘ ভাল্লুক নয়তো? এবার আমি কোন পথে যাবো? কাল সকাল অবধি আদৌও বেঁচে থাকবো তো?
ওই ভয়'ঙ্কর চোখ দুটো ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে , ব্যাপরটা বুঝতে পেরে আবারও উল্টো পথে ছুট লাগালো অরু।

দৌড়াতে গিয়ে গাছের সাথে লেগে জামার হাতাটা ছিড়ে পিঠ অবধি নেমে এসেছে, তবুও থামলো না অরু, জীবন বাজি রেখে দৌড়াতে লাগলো যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকে। এভাবে ছুটতে ছুটতে মাঝপথে হঠাৎ করেই আলোর ঝলকানিতে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো ওর। দ্রুত বেগে দুহাত চলে গেলো চোখের উপর। তীব্র ঘূর্ণন বাতাসে হাটু সমান লম্বা চুল গুলো উড়ে যেতে চাইছে যেন। এতোবেশি তীব্র বাতাস আর শব্দতে মনে হচ্ছে, শুধু চুল নয়, রোগা পাতলা গড়নের অরুও বোধ হয় উড়ে যাবে উচ্ছিষ্ট আবর্জনার ন্যায়।
কিসের এতো বাতাস, আর শব্দ?সাগর পারে কি ঘূর্নিঝড় শুরু হলো কিনা, বোধগম্য হলোনা অরুর, এতোক্ষণ অন্ধকারে থাকা চোখ দুটো হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যেন এখন পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বেশ কিছুক্ষন বাদে একটু রয়েসয়ে চোখ দুটো খুললো অরু, আর চোখ খোলা মাত্রই মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে যেন ধরেপ্রান চলে এলো ওর।হেলিকপ্টারের নিয়ন আলোতে অরু দেখলো, ওর থেকে বেশ অনেকটা দুরে বিশাল হেলিকপ্টারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা মতো একজন। পরনে তার কালো হুডি। নিস্প্রভ চোখ দুটো অাহতদের মতো অরুর দিকেই নিবদ্ধ তার। চারিদিকে ভালোভাবে তাকিয়ে এতোক্ষনে অরু খেয়াল করলো ও দৌড়াতে দৌড়াতে সাগরপাড়ে চলে এসেছে। আর চোখের সামনে যে মানুষটা নিস্প্রভ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে আর কেউ নয় সয়ং ক্রীতিক। ওর সেভিয়র। মানুষটা ক্রীতিক এটা বোধগম্য হতেই দৌড়ে গিয়ে ওর বুকে ঝাপিয়ে পরে শব্দ করে কেঁদে উঠলো অরু। অরু এতোটা জোরেই ক্রীতিকের বুকে ঝাপিয়ে পড়েছিল যে

ক্রীতিকের পেশিবহুল শরীরটাও কম্পিত হয়ে ওঠে। কা'দঁতে কা'দঁতে একহাতে ক্রীতিকের হুডি খামঁচে ধরে অন্যহাত দিয়ে ক্রমাগত ওর বুকে আ'ঘাত করে যাচ্ছে অরু। বিপরীতে ক্রীতিক টু শব্দও করছে না, চুপচাপ চোখ বন্ধকরে দাঁড়িয়ে আছে। কারন এই মূহুর্তে উপরওয়ালার কাছে ওর চেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ হয় আর কেউ নেই।ক্রন্দনরত অরু এখনো ওকে ইচ্ছে মতো কি'লঘু'ষি দিয়ে যাচ্ছে, ক্রীতিক তাতে নজর না দিয়ে আলতো হাত বুলিয়ে দিলো অরুর নরম তুলতুলে গালে, যেখানটায় ওর পাঁচ আঙুলের ছাপ এখনো দৃশ্যমান। ইচ্ছেতো করছে আরও গভীর ভাবে আদর করে দিতে।কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, তাই নিজের হুডিটা খুলে, সেটা দ্বারা অরুর পুরো শরীর ঢেকে দিয়ে,ওকে কোলে নিয়েই উঠে গেলো চলন্ত হেলিকপ্টারে।

অরু এখনো ক্রীতিকের কলার ছাড়েনি, একইভাবে ধরে রেখেছে, ওর বোধ হয় বিশ্বাস ছিল ক্রীতিক ওকে রেখে দ্বীপ ছেড়ে যাবেনা,কিছুতেই যাবেনা।পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দোচালা আলিশান ভিলার গা ডাবিয়ে দেওয়া নরম বিছানাতে এপাশ ওপাশ করেও কিছুতেই ঘুম নামছে না দু'চোখের পাতায়। অবাধ্য মনটা ক্রমাগত অন্যকারো নাম জপে যাচ্ছে বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার পর থেকেই। রুমের এক পাশে স্থীর মূর্তির মতো দাড়িয়ে থাকা দক্ষিণের জানালাটা হাট করে খোলা। সেথা থেকে পাতলা ফিনফিনে সফেদ পর্দা ছাপিয়ে হুহু করে বাসন্তিক হিমেল হাওয়া এসে শরীর নাড়িয়ে দিচ্ছে বারংবার , তবুও ঘুম কুমারীর দেখা নেই।

হুট করে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে আকর্ষনীয় স্টাইলিশ চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করতে করতেই দক্ষিণ জানালার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো

ক্রীতিক। কপালে তার গভীর চিন্তার ভাঁজ।ঠোঁটের ভাঁজে সিগারেট ধরিয়ে, মুখে বিড়বিড়ানো অস্পষ্ট আওয়াজ,— কি করবো আমি?দিনে দিনে আমার আনহেলদি্ অবসেশনে পরিনত হচ্ছিস তুই। পাশ ফিরেই তোকে দেখতে পাবো এমন দিনের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমায়?তোকে যে আমার চাইই চাই।
এইটুকু বলেই ক্রীতিকের সাভাবিক মুখভঙ্গিমা অনেকটা কাঠিন্য রুপ ধারণ করে, ব্লে'ডের মতো তীক্ষ্ণ চোয়ালটা শক্ত করে পুনরায় বিড়বিড়ালো সে,
— যেই মূহুর্তে মনটাকে আর মানাতে না পারবো, ঠিক সেই মূহুর্তে এসব ফা'কিং বয়সের পার্থক্য, সম্পর্কের জটিলতা কিংবা এর চেয়েও আরও বড় কোনো বাধা, সব কিছুকে জাস্ট উপড়ে ফেলে দেবো আমি। মাইন্ড ইট অরোরা শেখ। সেদিন আমার কাছে কেঁদে কেটেও লাভ হবেনা, আমি এতোটাও সদয় নই। নিজের জিনিস আমি চেয়ে নয় কেড়ে নিই।
একমনে হাজারো কথা আওড়ে কাবার্ড থেকে শার্ট বের করে সেটাকে টিশার্টের উপর পরে, শার্টের হাতাদুটো ভাজ করতে করতেই রুম থেকে বেরিয়ে যায় ক্রীতিক।গভীর আমাবস্যা রাত। মাথার উপর আজ আর চাঁদের দেখা নেই। ছোট বড় তারকারাজিরাও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে। চারিদিকে ঘুম ঘুম পরিবেশ বিরাজমান। এই মূহুর্তে সবাই হয়তো ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে ঘুমের দেশে পারি জমিয়েছে।কিংবা কেউ কেউ মেতে উঠেছে ভালোবাসা আদান প্রদানের চড়ম প্রতিযোগীতায়। অথচ অরুর রুমে চকচক করছে ইলেকট্রনিক বাল্বের চোখ ধাঁধানো আলো, শরীরটা ক্লান্তিতে ভার হয়ে আসছে,চোখ জোড়াও ঘুমাতে যাওয়ার

জন্য নিসপিস করছে সেই কখন থেকে, কিন্তু তার উপায় কোথায়? এই অবস্থায় ঘুমাতে গেলে হাত পায়ের কাঁটা ছেড়া যায়গা গুলোতে মলম কে লাগাবে? তাছাড়া জঙ্গলে দৌড়াতে গিয়ে পিঠের কাছেও অনেকটা কেঁ’টে গিয়েছে। সেখানটাতেই আপাতত কটন দিয়ে একটু একটু করে এন্টিসেফটিক লাগাচ্ছে অরু, আর খানিকবাদে বাদে চোখ ঘুরিয়ে জানালা গলিয়ে নিশুতি আধার রাতে হাতড়ে বেড়ানো জোনাকিপোকা পরখ করছে ,যাতে কাজ করতে করতে ঘুম না পেয়ে যায় আবার। অরু যখন নিজেকেই নিজে সারিয়ে তোলার কাছে প্রচন্ড মনোযোগী ঠিক তখনই কোনোরূপ নক না করেই পাসওয়ার্ড টিপে ওর রুমের ভেতর প্রবেশ করে ক্রীতিক।এতো রাতে আচমকা কারও উপস্থিতি টের পেয়ে অসাবধানতায় লাফিয়ে ওঠে অরু, মাথা তুলে ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে ব্যাস্ত ভঙ্গিতে দ্রুত নিজের কাধ থেকে জামাটা তুলে ফেলে মিনমিনিয়ে বলে,

— মেয়ে মানুষের রুমে নক করে ঢুকতে হয়,সেটাও জানেন না? ম্যানারলেস লোক কোথাগার।

— তোর রুমে আবার আমাকে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে? পিচ্চি মেয়ে একটা, দেখি কোথায় লেগেছে?

কথা বলতে বলতেই অরুর কাছে এগিয়ে যায় ক্রীতিক। হাত বাড়িয়ে দেয় অরুর ঘাড়ের কাছে। অরু দ্বিধা গ্রস্থ হয়ে নিজের জামাটা চেপে ধরে বললো,

— আপনার চেয়ে ছোট হতে পারি,তবে বয়সের দিক দিয়ে আমি অতোটাও ছোট নই।

নিজের গোপনীয় ক্ষতটা ক্রীতিককে দেখাতে অরু সংকোচ বোধ করছে বুঝতে পেরে, ক্রীতিক হাঁটু গেড়ে অরুর মুখোমুখি হয়ে বসে

ওর এক পা তুলে নেয় নিজের উরুর উপর,তারপর সেটাকে মনোযোগ সহকারে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বলে,— তাই নাকি? বিয়ের বয়স হয়েছে?

–কিহ!

ক্রীতিক চোখ তুলে অরুর চোখে চোখ রেখে পুনরায় শুধালো,

— বিয়ের বয়স হয়েছে? বরকে সামলাতে পারবি?

ক্রীতিকের হঠাৎ করা ছো’বলের মতো প্রশ্নে অরুর লজ্জায় চোখ বুঝে আসছে, ও দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে বলে,

— ব্যাথা পায়ে হাত কেন দিয়েছেন?

— আরো ব্যাথা দেবো বলে।

ক্রীতিকের উত্তরে চোখ মুখ কুঁচকে গেলো অরুর,অবিশ্বাস্য কন্ঠে নিজের পা’টা ক্রীতিকের থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, ও বললো,— সত্যিই আবার ব্যাথা দেবেন?

অরুর কথাটা বলতে যতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে পুরোরুমে ঝঙ্কার তুলে শব্দ করে হেসে উঠলো ক্রীতিক। ক্রীতিককে এভাবে হাসতে দেখে আপনা আপনি ফাঁক হয়ে গিয়েছে অরুর ওষ্ঠাধর। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে হাঁসের ডিমের মতো গোল গোল। ও কি সত্যি দেখছে,নাকি সবই স্বপ্ন বুঝে উঠতে পারছে না অরু। অরু কে সেই কখন থেকে হা হয়ে থাকতে দেখে ক্রীতিক নিজের চিরাচরিত রুপে ফিরে এসে, গম্ভীর মুখে বলে,

— হা করে আছিস কেন? মাছি খাওয়ার শখ হয়েছে?

ক্রীতিকের কথার পাছে অরু অবিশ্বাসের সুরে বলে ওঠে,

— আপনি হাসতেও পারেন?

অরুর কথায় কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না করে ক্রীতিক হাত বাড়িয়ে বলে,
— ওই পা দেখি। অরু সামান্য উঁকি দিয়ে দেখলো, ওর একটা পায়ে খুব সুন্দর করে ব্যান্ডেজ বেধে ফাস্টএইড করে দিয়েছে ক্রীতিক, এরপর আরেকটা পা-ও নিজের উরুর উপর রেখে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললো,
— এই পায়ের নুপুর কোথায়?
অরু ঠোঁট উল্টে অসহায় সুরে বললো,
— হারিয়ে ফেলেছি। এই নুপুরটা আমার খুব পছন্দের ছিল জানেন, তাইতো একটা হারিয়ে যাওয়ার পরেও আরেকটা খুলিনি।
নুপুরের প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য পায়ে ব্যান্ডেজ লাগাতে লাগাতে হঠাৎ করেই ক্রীতিক শুধালো,
— আচ্ছা অরু, সেদিন ক্যাথলিন তোকে রেগেমেগে কি এমন বলেছিল?
প্রথমে অরু একটু সময় নিয়ে ভাবে,তারপর মনে পরার মতো চট করেই মিনমিনিয়ে ঠোঁট টিপে হেঁসে ওঠে ও।
— কি ব্যাপার হাসছিস কেন?
অরু হাসতে হাসতেই জবাব দেয়,— হাসবো না? এলিসা আপুর কাজিনতো তো আপনার জন্য এক কথায় ফিদা, রাগে গজগজ করতে করতে আমাকে কতোকথাই না শোনালো সেদিন। বলে কিনা, আমাকে যাতে আপনার ধারে কাছেও আর না দেখা যায়। আমি আসার পর থেকে নাকি আপনি বদলে গিয়েছেন।
কথাটুকু বলে আবারও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অরু, হাসতে হাসতে বলে,

— উনিতো আর জানেনা, আমি আপনার চিরাচরিত শ'ত্রু, জানলে বোধ হয় এসব কথা জীবনেও বলতো না। আমার কি মনে হয় জানেন? এলিসা আপুর কাজিনের মাথা নির্ঘাত সমস্যা আছে।
ক্রীতিক নিজের হাতের কাজ থামিয়ে বললো,
— এমন কেন মনে হলো তোর?— তো মনে হবে না? আপনার সাথে আমাকে গুলিয়ে ফেলছে আপুর কাজিন,আর মানুষ পেলোনা আমি আর আপনি?সাপ আর বেজি, নানা দা আর কুমড়ো!!কথা বলতে বলতে আবারও কুটকুটিয়ে হেসে ওঠে অরু।
এতোক্ষণ ধরে বসে বসে অরুর কথার বহর শুনে গেলেও ওর শেষ কথাটা বোধ হয় পছন্দ হয়নি ক্রীতিকের। অরুর হাসি মুখের দিকে এক নজর বি'ভৎস চাহনি নিক্ষেপ করে সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যান্ডেজ করা ক্ষ'ত পা'টা শক্ত হাতে চেপে ধরলো ক্রীতিক। ক্রীতিকের হাতের বাধনটা এতোটাই বেশি শক্ত ছিল যে হুট করেই অরুর মনে হলো, ওর কলিজা ধরে টান দিয়েছে কেউ, হঠাৎ করে এমন প্রচন্ড ব্যাথায় আঁতকে উঠে শব্দ করে চিৎকার দিয়ে উঠলো অরু,
— আহহহ, কি করছেন?ব্যাথা কেন দিচ্ছেন?ক্রীতিক ওর পা'টা ধা'ক্কা মে'রে সরিয়ে দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বলে,
— আমি তোর নার্স কিংবা সার্ভেন্ট নই যে রাত যেগে বসেবসে তোর ক্ষ'ততে মলম লাগাবো।
ধা'ক্কা লেগে ক্ষত থেকে পুনরায় তরতাজা র'ক্ত বেরিয়ে এসে সাদা ব্যান্ডেজ র'ক্তরাঙা হয়ে ভিজে উঠেছে, অরু সেখানটায় হাত দিয়ে চেপে ধরে চোখ খিঁচে রেখেছে। বন্ধ চোখ জোড়া থেকে নিঃশব্দে গড়িয়ে পরছে অস্রুসিক্ত নোনাজল।

ক্রীতিক তাতে নজর না দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে যায়, যাওয়ার আগে শেষবারের মতো পেছন ঘুরে মনেমনে আওড়ায়,
— তোর ভুল ধারনা খুব শীঘ্রই ভেঙে যাবে অরু। তুই আমার না হলে, অন্য কারোর না। সন্ধ্যা হতে না হতেই স্ফটিকের লাল,নীল, বেগুনি আলোর ঝলকানিতে চিকচিক করছে সুবিশাল ক্লাবের চারিদিক। ভেতর থেকে ডিজে গানের ধিমধিম আওয়াজ ভেসে আসছে রাস্তা পর্যন্ত। একে একে ভেতরে প্রবেশ করছে,ক্যাডিলাক,মার্সিডিজের মতো নামি দামি গাড়ির বহর। পৃথিবীতে হাতে গোনা নামি-দামি যে কয়েকটা ক্যা'সিনো ক্লাব রয়েছে তার মধ্যে ব্যাংককের কিং ক্লাব একটি। বছরের বিভিন্ন সময়ই পৃথিবীর নামি-দামি পকার প্লেয়াররা জু'য়ায় টাকা জেতার জন্য জমায়েত হয় এখানে। একের পর বেট ধরে জিতে নেয় কোটি কোটি টাকা। এলিসাও তাদের মধ্যে একজন,সবার প্রিয় নাম্বার থার্টিন। এই নামেই সবাই ওকে চেনে। সবার ভালোমতোই জানা যেই ক্লাব ওকে নিতে পারবে তারাই তরতর করে সবচেয়ে ধনী ক্যা'সিনো ক্লাবে পরিনত হবে। কিন্তু এলিসাতো আর এসবে জড়াবে না,আজকেই এই পা'পের দুনিয়াতে ওর শেষ দিন। শুধু একবার ভালোয় ভালোয় বাবাকে নিয়ে ফিরতে পারলেই হলো। স্ফটিকের আলোতে জ্বলজ্বল করতে থাকা কিং ক্লাবের নেইম-প্লেটের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা চারজন।
চারিপাশের পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে এলিসার বেশভূষা ও চোখ ধাঁধানো আজ। ঝিকিমিকি টপস আর লেগিংসের সাথে পায়ে এটে আছে কয়েক ইঞ্চি লম্বা পেন্সিল হীল। মেকআপের আস্তরনের সাথে ম্যাচিং করে ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক,চোখে কালো সানগ্লাস।

ওর পাশেই স্যুট বুট পরে ফর্মাল লুকে দাড়িয়ে আছে সায়র,চোখে পরেছে মোটা ফ্রেমের চশমা। দেখতে তাকে পুরোপুরি এ্যাসিসট্যান্টের মতোই লাগছে। সায়রের পাশেই বাইকে হ্যালান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেদার জ্যাকেট আর হেলমেট পরিহিত জেকে। চারিদিকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে সবটা পরখ করে, অর্নব এগিয়ে এসে বললো,— গাইস সব ঠিকঠাক, এলিসা তুই সায়রকে নিয়ে ফ্রন্ট গেইট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ কর। আমি বেজমেন্টে ঢোকার সাথে সাথেই কাজ শুরু করবো, মনে রাখিস হাতে মাত্র দশমিনিট সময়।আই রিপিট মাত্র দশমিনিট। এরপর আর এতোগুলা সার্ভার একসাথে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারবো না আমি।আর জেকে তুই এখানেই ওয়েট কর, এলিসা ওর বাবাকে নিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে তুই এলিসাকে নিয়ে চলে যাবি, ওর বাবাকে আমরা ম্যানেজ করবো।
কথাটুকু শেষ করে সবার কানে একটা করে ব্লুটুথ লাগিয়ে দিলো অর্নব।
— নাও গো….দশমিনিট প্রায় শেষ হতে চললো, ক্রীতিক সুক্ষ্ম নজরে কাচের দেওয়াল বেস্টিত ক্লাবের দিকে তাকিয়ে আছে, এতদূর থেকে ভেতরের কোনো কিছুই ঠাহর করার উপায় নেই, শুধু বোঝা যাচ্ছে এতোক্ষণ ধরে জ্বলতে নিভতে থাকা ঝিকিমিকি আলোর বহর হুট করেই পুরোপুরি নিভে গিয়েছে। ভেতরের মিউজিক আলো দুটোই নিভে যাওয়ার দরুন ক্রীতিক সচকিত হয়ে ব্লুটুথে মনোযোগ দিলো, কিন্তু না ওপাশ থেকে কোনো আওয়াজ নেই। তৎক্ষনাৎ কোথা থেকে যেন দৌড়ে এলো অর্নব, আশেপাশে একনজর চোখ বুলিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালো,

— দশ মিনিট শেষ হতে চললো, ওরা কোথায়?
ক্রীতিক ঠোঁট কামড়ে বললো,
— ঠিক বুঝতে পারছি না, কোনো বড় বি’পদ হওয়ার আগে আমাদের ভেতরে যাওয়া দরকার, সায়র যা ভীতুর ডিম ওকে ভরসা নেই।
ক্রীতিকের কথায় সায় জানিয়ে অর্নব তৎক্ষনাৎ ক্লাবের দিকে হাটা দেয়, পেছন থেকে ক্রীতিক আবারও ডেকে ওঠে ওকে,ক্রীতিকের ডাকে সারা দিতে অর্নব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে চাইলে, ওর দিকে একটা রি’ভলবার ছুড়ে দিয়ে ক্রীতিক বললো,— ক্যাচ ইট।
অর্নব রি’ভলবারটা ক্যাচ করে, হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ক্রীতিকের চোখের দিকে চাইলো, নিজের কোমড়ের খাঁজে আরও একটা রি’ভলবার গুঁজতে গুঁজতে হালকা চোখ টিপে ক্রীতিক বলে,
— ফর সেইফটি পারপাস, আফটার অল ভেতরের সবার কাছেই এটা আছে। এলিভেটর দিয়ে ওরা দুজন যখন ক্লাবের সবচেয়ে বড় হলরুমটাতে প্রবেশ করে,তখন চারিদিকে নিস্তব্ধতায় ঘেরা, এতো মানুষ এতো হইহট্টগোল সব কেমন হাওয়ায় উবে গিয়েছে, বাইরে থেকে আসা নিয়ন আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারিদিকের টেবিল চেয়ার গুলো উল্টেপাল্টে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, অর্নব আর ক্রীতিক ভ্রু কুঞ্চন করে চোখাচোখি করলো, অর্নব নিচু স্বরে বললো,
— হোয়াটস রং? সবাই কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো?
— যে যেখানে খুশি যাক, এলিসার বাবাকে আমার মোটেও সুবিধার মনে হয় না, লোকটা চরম ধূর্ত। এই মূহুর্তে এলিসা আর সায়রকে সেফ রাখাই আমাদের মেইন টার্গেট।

ক্রীতিকের কথায় অর্নব হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো। তখনই ওর পায়ের সাথে ধাক্কা লেগে একটা কাঁচের ক্যা'সিনো সাজানো টেবিল ঝনঝন করে মেঝেতে পরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হল রুমের লাইট জ্বলে ওঠে, ভেতরের রুম থেকে একে একে বেরিয়ে আসে সবাই। সায়র আর এলিসার কপালে ব'ন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছে সয়ং এলিসার বাবা। ওদের দুজনকে দেখা মাত্রই খু'নখুনিয়ে কেঁদে ওঠে সায়র,
অর্নব ওর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত সুরে বলে,— মেয়েদের মতো কাঁদছিস কেন হাদারাম, তোদের বাঁচাতেই তো এলাম।
ক্রীতিক এগিয়ে গিয়ে এলিসার বাবার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললো,
— আবারও নিজের মেয়ের সাথেই নোংরা চাল চাললেন মি.ত্রিপিটক।
ক্রীতিকের কথায় লোকটা কপট হেঁসে বললো,
— এতো কথা ভাল্লাগছে না, চলো সহজ ডিলে আসি, তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে চলে যাও, আর আমার মেয়েকে আমার কাছে রেখে যাও, ওকে ছাড়া আমার ক্যাসিনো বিজনেসটা একেবারে নড়বড়ে হয়ে আছে।
লোকটার কথায় ক্রীতিক ঠোঁট কামড়ে একটু তাচ্ছিল্য করে হাসলো, অতঃপর ঘাড় কাত করে বললো,
— গেলে আমরা চারজনই যাবো। প্রয়োজন পরলে আপনাকে উপরে পাঠিয়ে যাবো,কারন আপনাদের মতো মানুষের প্যারেন্টস হওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই।

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলিসাকে টান দিয়ে ওর মাথায় রি'ভলবার ঠেকালো ক্রীতিক। ক্রীতিকের কান্ডে এবার অর্নব ও কিছুটা ভরকে গিয়ে বললো,
— জেকে কি করছিস ?
অর্নবের কথায় কান না দিয়ে ক্রীতিক এলিসার বাবাকে বলে, আপনি ওকে মা'রতে পারতেন না ত্রিপিটক , কারন এলিসা আপনার সোনার ডিম পারা হাঁস, বাট আমি পারবো,কারন ও আমার দুই পয়সার কাজেও আসেনা,ইভেন নিজেকে বাঁচানো জন্য শুধু এলিসা কেন ওদের সবাইকে মা'রতেও আমার এক মিনিটও টাইম লাগবে না। যাস্ট পয়েন্ট আর তারপর শ্যু'ট।
এলিসার বাবা হেঁসে বললো,— ভয় দেখাচ্ছো?
ক্রীতিক তৎক্ষনাৎ সায়রের পা বরাবর একটা গু'লি করে দেয়, গু'লির আওয়াজে গগন কাঁপিয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে সায়র। এলিসা অর্নব ওরাও ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে ক্রীতিকের দিকে। নিজের বন্ধুকে এভাবে উইথআউট ও'য়ার্নিং গু'লি করাতে এলিসার বাবাও খানিকটা ভরকে গিয়েছে মনে মনে ভাবছে,
— এই ছেলে যে যখন তখন এলিসাকে গু'লি করে দেবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই।
চারিদিকে গুমোট পরিবেশ বিরাজমান। ক্রীতিক এলিসাকে নিয়েই এক পা দু'পা করে মেইন গেইটের কাছে চলে এসেছে। সায়র এখনো বসে বসে কাঁদছে, ক্রীতিক অর্নবকে চোখ দিয়ে ইশারা করতেই অর্নবও ধীরে ধীরে দরজার কাছে চলে যায়, ওদিকে এলিসার মাথায় গা'ন পয়েন্ট করে রাখায় এলিসার বাবা নরতেও পারছে না চরতেও

পারছে না, অর্নব কাছে এগিয়ে আসতেই ক্রীতিক স্পষ্ট বাংলায় বলে,— দরজার গুপ্তমন্ত্র বদলে ফেল অর্নব।
ক্রীতিকের কথার আগামাথা বুঝতে না পেলে, অর্নব ভ্রু কুঁচকে বললো,
— কি বদলে ফেলবো?
— গুপ্তমন্ত্র, গুপ্তমন্ত্র, দরজার গুপ্তমন্ত্র।
অর্নব বিরক্ত হয়ে বললো,
— আরে ভাই গুপ্তমন্ত্রটা আবার কি?
ক্রীতিক দাঁত কটমটিয়ে বললো,
— ইংলিশে যদি বলি দরজার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ কর তাহলে তো ওরা বুঝে যাবে ছাগল।
ক্রীতিকের কথায় অর্নব দ্রুত পাসওয়ার্ড বদলানোর কাজে লেগে পরে, ওদিকে অর্নব কে বুঝাতে গিয়ে, এলিসার বাবা সহ সকলেই ক্রীতিকের পালানোর উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে, তাই তারাও ধীর পায়ে ওদের ধরার জন্য এগিয়ে আসছে, সায়র এখনো পা ধরে বসে বসে কাঁদছে।— ডান।
অর্নব শব্দটা উচ্চারণ করতেই দ্রুত দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় ওরা তিনজন, যাওয়ার আগে দরজা ঠেলে সায়রের উদ্দেশ্যে ক্রীতিক চেঁচিয়ে বললো,
— দ্রুত আয় গাঁধা তোর পায়ে কিছু হয়নি, তাকিয়ে দেখ গু'লিটা প্যান্টে লেগেছে।
ক্রীতিকের কথা কানে পৌঁছাতেই সচকিত হয়ে তখনি তরিৎ বেগে দৌড়ে দরজার বাইরে চলে এলো সায়র। এবং আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা না করে দরজাটা সশব্দে লাগিয়ে দিলো ক্রীতিক। যেহেতু

অর্নব পাসওয়ার্ড বদলে দিয়েছে তাই এলিসার বাবা সহ ক্লাবের সবাই কক্ষের মধ্যেই আটকা পরে গিয়েছে। বাইরে এসে এলিসাকে ধা'ক্কা মে'রে অর্নবের বুকে ঠেলে দিয়ে সায়রের হাত টেনে, ওকে নিয়ে দৌড়াতে লাগলো ক্রীতিক।
হঠাৎ এলিসাকে এতো কাছে আবিষ্কার করে ওর গালে টুপ টুপ করে কয়েকটা চুমু খেয়ে নিলো অর্নব। এলিসা বিরক্ত হয়ে কটমটিয়ে কিছু বলবে তার ফুরসত না দিয়েই ওর হাত ধরে অর্নব ও দৌড়াতে লাগলো স্ব গতিতে ।
পেছনে একবার চোখ ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষন করে দৌড়াতে দৌড়াতেই ক্রীতিক বললো,— তারাতারি চল, অরু ভিলাতে একা আছে।
সায়র ছোটার গতি কমিয়ে দিয়ে বললো,
— তারাতারি যাওয়ার কি আছে ভাই, অর্নব তো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিয়ে এলো।
ক্রীতিক অর্নবের দিকে তাকিয়ে শুধালো,
— অর্নব কঠিন পাসওয়ার্ড দিয়েছিস তো?
দৌড়াতে দৌড়াতেই অর্নব মিনিমিনিয়ে জবাব দিল, তারাহুরোয় মাথায় কিছু আসেনি তাই এলিসার নাম দিয়ে এসেছি।
অর্নবের কথায় ওরা সবাই আহাম্মক বনে গেলো, ক্রীতিক দাঁত কিরমির করে বললো,— ইডিয়েট, আগে বলবি না? জলদি দৌড়া।
ক্লাবের নিচেই বাইক রাখা ছিল, একটা বাইকে ক্রীতিক আর সায়র উঠে পরে, অন্যটাতে এলিসা আর অর্নব। অর্নব রাইড করতে পারেনা,তাই এলিসাই ওদের বাইকটা রাইড করছে।
রাইড করে কিছুদূর যেতেই পুলিশে কল দিয়ে সায়র নিজের নাম পরিচয় গোপন করে ক্যা'সিনো ক্লাবের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে। ওরা

এখন পুরোপুরি আশঙ্কা মুক্ত ব্যাপারটা বুঝে আসতেই, বাইকে বসেই গুনগুনিয়ে গান ধরেছে সায়র। ক্রীতিক রাইড করতে করতেই বললো,

— কিরে, এমন একটা সময় তোর গানও মনে পরছে? একটু আগেই তো ভ্যা ভ্যা করে মেয়েদের মতো কেঁদে ফেলেছিলি।

— তা কাঁদবোনা? তুই কিভাবে পারলি আমাকে পয়েন্ট করে গু'লি ছু'ড়তে?

— তোর গায়ে তো আর লাগেনি। আমার নিশানার উপর আমার কনফিডেন্স আছে।

— কি করে শিখলি এতো ভালো গান পয়েন্টিং?

ক্রীতিক মৃদু হেসে বললো,— মন্ত্রীর ছেলে বলে সেল্ফ প্রটেকশনের জন্য বাবা স্পেশাল ট্রেইনার দিয়ে শিখিয়েছিলেন।

ক্রীতিকের কথায় সায়র ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ালো।

বাংলাদেশের কথা মনে পরতেই সব রেখে ক্রীতিকের মস্তিষ্কে হানা দেয় শুধু মাত্র অরু, অরুর কথা মাথায় আসতেই ক্রীতিক বলে,

— সায়র ধরে বস।

— আমাকে কি তোর মেয়ে মনে হয়? যে সিনেমাটিক ওয়েতে ধরে বসবো?

— না ধরলে নাই। আমি জাস্ট ওয়া'র্ন করলাম।

কথাটা বলেই হাওয়ার বেগে বাইকের স্পীড বাড়িয়ে দিলো ক্রীতিক। সঙ্গে সঙ্গে ওর কোমড় চেপে ধরে সায়র কাঁপতে কাঁপতে বলে,

— একটু স্পীড কমা ভাই, ভয় করছে। বমি করে দেবোতো।

— পসিবল না অরু একা আছে। এই বলে আবারও ফ্লাই ওভারে টার্ন নিলো ক্রীতিক। সামনে পেছনে চারিদিকের সবকিছু ঘোলাটে লাগছে, মাথাটা চলন্ত ফ্যানের ন্যায় ভনভন করে ঘুরছে। পেটের মধ্যে নাড়িভুড়ি দলা পাকিয়ে গলার কাছে চলে এসেছে। হাত পা থরথরিয়ে কাপছে। বাইক থেকে নেমে হেলেদুলে কেবলই নিজের রুমে এসেছে সায়র, তবুও এখনো হৃদপিন্ডটা কেমন ধুকপুক করছে ওর। হাই স্পীডে বাইক রাইড দিয়ে ওকে এক প্রকার রোগী বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ক্রীতিক। রুমে এসে মনেমনে ক্রীতিকের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে সায়র, হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে জোরে শ্বাস নিতে নিতেই কটমট করে সায়র বললো,

—কোন অলক্ষুণে ওর মতো মানুষ আমার বন্ধু হয়েছিল কে জানে? কখনো ঠাস করে গু'লি মে'রে দিচ্ছে, তো কখনো বাইকে চড়িয়ে কলিজা হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, সাইকো একটা। সায়র কথাটা শেষ করতে পারলো না, তৎক্ষনাৎ ধাপ ধাপ করে দরজা ঠেলে রুমে ঢুকে ওর কলার চেপে ধরে ক্রীতিক দাঁতে দাঁত পিষে বললো,— আমার অরু কই?

আচমকা আ'ক্রমণে লাফিয়ে উঠে বসলো সায়র কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বললো,

— তোর সমস্যা কি জেকে? অরু হারিয়ে গেলেই তুই সব সময় আমাকে তে'ড়ে আসিস, কেন ভাই? আমিকি তোর অরুকে পকেটে লুকিয়ে রাখি? তারপর নিজের পকেট ক্রীতিকের চোখের সামনে ধরে বললো,

— দেখ, এই দেখ কোথাও তোর অরু নেই।

সায়রের ফাজলামো গায়ে না মেখে ক্রীতিক পুনরায় শুধালো,

— দেখেছিস কিনা সেটা বল।
ক্রীতিকের অ’গ্নিমূর্তি লক্ষ্য করে, শুষ্ক ঢোক গিলে এদিক ওদিক মাথা নাড়ালো সায়র।
ক্রীতিক সায়রকে ছেড়ে এলিসা আর অর্নবের দরজায় গিয়ে সশব্দে কড়া নাড়লো। ওরা ও মাত্রই রুমে প্রবেশ করেছিল, ক্রীতিকের ডাকে দ্রুত বেরিয়ে এসে এলিসা শুধালো—কি হয়েছে জেকে?
এলিসার মুখটা মলিন, নিজের বাবার বি’পদের কথা চিন্তা করতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ঠকেছে মেয়েটা, বাবার হাতেই ম’রতে ম’রতে কোনো মনে বেঁচে ফিরেছে আজ। তাই নিজের রাগ ঢাক ভেতরে পুরে শান্ত স্বরে ক্রীতিক বললো,
— অরুকে দেখেছিস এলিসা?
এলিসা ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
— কেন রুমে নেই? এতো রাতে কোথায় যাবে?
— কোথাও নেই দেখেই তো তোদের জিজ্ঞেস করছি।
ততক্ষণে অর্নবও নিজের রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে, সবটা শুনে ও বললো,
— চল রিসিপশনে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি, কোথাও বেরোলে তো ওখান থেকেই বেরিয়েছে।
অর্নবের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করে, হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেলো ক্রীতিক।ওরা চারজন রিসিপশনে এসে জানতে পারে খানিকক্ষণ আগেই বেরিয়েছে অরু, কোথায় বেরিয়েছে সেটা তারা জানেনা।

রিসিপশনিস্টের কথায় মাথায় র’ক্ত চড়ে গিয়েছে ক্রীতিকের, মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছে আজ অরুকে পেলে ওর হাতের মা’র খেতে খেতে অরুর খবর আছে।
অর্নব, সায়র এগিয়ে এসে বললো,
— এখন কি করবি?
ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে বললো,
— ইডিয়েট একটা আমাকে চিন্তায় না রাখলে শান্তি হয়না মেয়েটার ,আজ খুঁজে পেলে খবর আছে ওর।
নিজের অর্ধেক বয়সী স্টেপ সিস্টারের জন্য ক্রীতিকের এমন বেসামাল, উদ্বিগ্নতা দেখে আবারও নতুন করে প্রশ্ন জাগে ওদের তিনজনার মনে, কেন এতো উন্মাদনা,কিসেরই বা এতো আসক্তি?প্রায় ঘন্টা খানিক সি-বিচের এ মাথা ওমাথা হাতরে বেরিয়েছে ক্রীতিক। সেই সাথে সায়র অর্নবও অরুকে খুঁজেছে হন্যে হয়ে, রাত তখন প্রায় দশটা ছুঁই ছুঁই। চারিদিকের ঘুটঘুটে আঁধার ছাপিয়ে সাগরের তীর আলোকিত হয়ে জ্বলছে সোডিয়ামের নিয়ন আলো, নিস্তব্ধতায় ঘেরা সমুদ্রতীরে ঢেউয়ের গর্জন ভেসে আসছে বারেবারে, রাত গভীর হয়ে যাওয়ায় একে একে মানুষ ফিরে গিয়েছে স্ব গন্তব্যে, ক্রীতিকের বেজায় অস্থির লাগছে চোখ দুটো বারবার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এভাবে ঘুরপাক করতে গিয়েই ওর চোখ আটকে যায় অদূর থেকে হেঁটে আসা লম্বা চুলের মেয়েটার দিকে। ক্রীতিক চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে ওই মেয়েটাই অরু। তাই ও আর স্থীর না থেকে হনহনিয়ে হাঁটা ধরলো অরুর পানে। অনেকটা দূরত্ব ঘুচে গিয়ে ক্রীতিক যখন পুরোপুরি অরুর মুখোমুখি,ঠিক তখনই ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো

চমকে উঠলো অরু। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো অজানা আ'তঙ্কে। মনেমনে ভাবলো,— আজ আমি শেষ। রিপ অরোরা শেখ।
অরুর পেছনে আরও দুইটা থাই মেয়ে ছিল হাতে তাদের ঘুড়ি আর লাটাই। ক্রীতিক তাদেরকে এক নজর পরখ করে অরুর কাছে এসে ওকে সজোরে চ'ড় মা'রতে উদ্যত হয়েও থমকে যায়, উল্টে দু'হাত দিয়ে টান মে'রে আচমকা টেনে নেয় নিজ বুকের মধ্যিখানে। এক্ষুনি গালে চ'ড় হামলে পরবে, সেই ভ'য়ে চোখ মুখ খিঁচেই রেখেছিল অরু। কিন্তু কিছু সময় যেতেই শরীরে শিহরণ জাগানো সেই স্যান্ডাল উড পারফিউমের ঘ্রানটা নাকের খুব কাছে অনুভব হতেই পিটপিট করে চোখ খুললো ও।আবারও একই ঘোর লাগানো অনুভূতি, ক্রীতিকের শরীরের শুকিয়ে যাওয়া ঘাম, পারফিউম, ধুলোবালি মিশ্রিত এই মাতাল মাতাল পুরুষালি সুঘ্রাণটা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনা অরু, হাত পা কেমন অসার হয়ে আসে, কান গাল সব কিছু ছুঁয়ে যায় অজানা উষ্ণতায়। বারবার বেসামাল হয়ে ওঠে ভেতরের সুপ্ত নারীসত্তাটা। অথচ ক্রীতিক ওকে নিজের বুকের মাঝে এমন ভাবে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে যে ক্রীতিকের শরীরের নেশা ধরানো সুঘ্রাণটা ক্রমাগত অরুর হৃদয়ে গিয়ে ঠেকছে। খানিকক্ষণের নিরবতা ভেঙে ক্রীতিক উদ্বিগ্ন সুরে শুধালো,— অরু তোর বয়স কতো?
কোথায় গিয়েছিলি, কেন গিয়েছিল, কিভাবে গিয়েছিলি কোনোরূপ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করে এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করায়, অবাক হয়ে মুখ উঁচিয়ে ক্রীতিকের চোখের দিকে চাইলো অরু। পরক্ষণেই ওর চোখ গেলো ক্রীতিকের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আরও তিন জোড়া চোখের দিকে, যারা এই মূহুর্তে রিয়েলিটি শো দেখার মতো করে

অষ্টাদশীর প্রেমে বেসামাল হয়ে ওঠা জায়ান ক্রীতিক চৌধুরীকে দেখছে।
সবাইকে এভাবে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে অরু মুখ কাচুমাচু করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে বললো,
— ছাড়ুন সবাই কি ভাবছে।
— আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি অরু।
ক্রীতিকের স্পষ্ট আদেশে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরু বলে,
— আঠারো বছর, ছয়মাস, তেরোদিন। এবার ছাড়ুন।
— পার্ফেক্ট। নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে অরুর চোখ গেলো এবার ক্রীতিকের পায়ের দিকে, গোড়ালি থেকে খানিকটা উপরে ফোল্ড করা ডেনিম প্যান্ট পরে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রীতিক। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে অরু বলে ওঠে,
— একি আপনার জুতা কোথায়?
পেছন থেকে হাঁক পেরে একজোড়া স্নিকারস দেখিয়ে সায়র বলে,
— এই যে আমার হাতে। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা একটু পা'গল পা'গল হয়ে গিয়েছিলাম কিনা।
অরু দ্রুত সায়রের সামনে গিয়ে মিনতির সুরে বললো,
— সরি ভাইয়া আপনারা কেউ ছিলেন না বলে, না বলেই বেরিয়ে এসেছিলাম। আমি রিসিপশনিস্ট কে বলে এসেছিলাম কিন্তু উনি আমার ইংলিশ পুরোপুরি বুঝতে পারেনি বোধ হয় ।— অরু যা, এলিসার সাথে রিসোর্টে গিয়ে ঘুমিয়ে পর।
এমনিতেই মাঝরাতে সবাইকে চিন্তাগ্রস্থ করে ছেড়েছে, তাই ক্রীতিকের কড়া আদেশে আর নাকোচ করতে পারেনি অরু চুপচাপ চলে গিয়েছে এলিসার হাত ধরে।

ওদিকে সায়র, অর্নব আর ক্রীতিক বসে পরেছে উত্তাল ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়ে, আজ বোধ হয় ওরা আর ঘুমাবে না। নিশুতিরাতে জোয়ার ভাঁটার উদ্যম গতি আর সামুদ্রিক ঢেউয়ের বিশাল গর্জনে চারিদিক অপার্থিব লাগছে। মাঝরাতের পরও কেটে গিয়েছে আরও কয়েক প্রহর। রাত জাগা পানকৌড়ি গুলো এখনো চিঁউচিঁউ করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পুরো বেলাভূমি জুড়ে। চোখের সামনে জ্বলছে ফায়ারপ্লেসের দাউদাউ অ'গ্নিশিখা, সেখা থেকেই কাঠকয়লা পো'ড়ানো মটমট আওয়াজ ভেসে আসছে। ক্রীতিকের ভাসা ভাসা চোখ দুটোতে জলন্ত অ'গ্নিশিখার প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। সায়র ফায়ারপ্লেসের আ'গুনে আরও কয়েকটা কাঠের টুকরো দিয়ে ক্রীতিক আর অর্ণবের মুখোমুখি হয়ে বসে পরলো। অতঃপর নিজেদের মনের হাজারো কৌতুহল মেটাতে সায়র যখন ক্রীতিককে কিছু প্রশ্ন করতে যাবে, ঠিক তখনই অর্নব ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বোঝায়,— আমি জিজ্ঞেস করছি।

ক্রীতিক তখনও আপন মনে জ্বলন্ত অ'গ্নিশিখার হেলদোল পরখ করায় ব্যাস্ত। অর্নব ওকে ডেকে বলে,

— সবাইকে রেখে অরুর প্রতিই এতো অবসেশট কেন তুই?

ক্রীতিক নিস্প্রভ চোখে জবাব দেয়,

— আই ডোন্ট নো!

অর্নব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

— আচ্ছা কবে থেকে এসব শুরু হয়েছে সেটা তো বল? তাছারা ওর জন্যে যদি তোর এতোই টান তাহলে বাংলাদেশে যাসনা কেন তুই?

ক্রীতিক একটু উপহাস করে হেঁসে বললো,

— কে বলেছে ওর জন্য আমার টান? ও আমার আসক্তি। মানুষ জানে নে'শা খারাপ জিনিস, তবুও নে'শাগ্রস্থরা নে'শা ছাড়তে পারেনা, অরুও আমার কাছে নে'শার মতোই , আমি জানি ওর আমার সম্পর্কে আগুন পানি সম জটিলতা তবুও ওকে আমার চাই। এট এনি কস্ট।
সায়র পাশ থেকে বলে ওঠে,— তাহলেতো তুই অরুর প্রেমে পরেছিস।
ক্রীতিক কপট হেসে জবাব দেয়,
— এগারো বছরের বাচ্চা মেয়ের প্রেমে কে পরে ভাই?তবে হ্যা,আ'ম সিওর, আমি বাংলাদেশে থাকলে এতোদিনে অরু আমার বাচ্চার মা হয়ে যেতো । ওই জন্যই তো দেশে যেতাম না, কারণ ওর কাছে গেলে নিজেকে সামলানো, উত্তাল সাগরে পাল তোলা ডিঙি নৌকা সামলানোর মতোই মুশকিল।
সায়র আর অর্নব হতভম্ব হয়ে ক্রীতিকের পানেই চেয়ে আছে, দু'জনের মনেই একই প্রশ্ন কি বলছে এই ছেলেটা?
ওদের চোখে হাজারো কৌতুহলের ছড়াছড়ি দেখে, ক্রীতিক ভাবতে থাকে, ঠিক কবে নাগাত শুরু হয়ে ছিল সবকিছু, তারপর খানিকক্ষণের নিরবতা ভেঙে বলতে শুরু করে,— অরু যখন প্রথম ক্রীতিক কুঞ্জে আসে, তখন আমি সবে সবে কলেজ পাশ দিয়ে ভার্সিটিতে উঠেছি মাত্র। তখন আমার কাছে জীবন মানে, আভিজাত্য, কতৃত্ব,পাওয়ার এসবই। কারণ ছোট বেলা থেকেই আমাকে এটাই শিখানো হয়েছে, যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে গেলে পূর্ব পুরুষদের পথ অনুসরণ করো। আমিও তাই করেছি। ছোট বেলা থেকেই ন্যানি, ট্রেইনার,মাস্টার এদের কাছে লালিত পালিত হতে

হতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম পরিবার বলে কিছু হয়,তারপর যখন একটু ম্যাচিউর হই, তখন প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার জোরে আশেপাশের সবাইকে নিজেই কন্ট্রোল করতে শুরু করি, আমার হাতের ইশারাতে সবাই যখন পুতুলের মতো নাচতো তাতে আমার অন্তরে পৈচাশিক আনন্দ হতো। তখন থেকেই ডমিনেটিং স্বভাবটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, যা এখনো বদলাতে পারিনি আমি।কলেজে ওঠার পর পারিবারিক সূত্রেই আমার রাজনৈতিক হাতেখড়ি হয়। প্রথম প্রথম বাবা বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান,সভা সমাবেশে নিয়ে গেলেও পরক্ষণে বাবার হয়ে আমারই যেতে হতো,একপর্যায়ে বাবা নয় সয়ং আমার জন্যই আমাকে যেতে হতো। ততদিনে প্রফেসর হওয়া, বিজনেস সামলানো কিংবা আমার শখের রাইডিং সব কিছুই ছিল দিবাস্বপ্ন মাত্র। কারন আমার ধ্যান,জ্ঞান সবকিছুই তখন রাজনীতিতে নিবদ্ধ।তখন মনে হতো, নিজে প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়েও ক্ষমতার জোরে পাবলিক ভার্সিটিতে লিড দেওয়ার মতো পৈশাচিক তৃপ্তি আর কিছুতে নেই।বাইরের জগতে এতো সুনাম, এতো জনপ্রিয়তা, এতো স্বজনপ্রীতি লোকেদের ভীড়েও দিন শেষে আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ , যার উদরে আমার জন্ম হয়েছিল, যে খুব ছোট্ট বেলায় আমাকে ফেলে নিজের আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নিজ দেশে পারি জমিয়েছিল,সেই বিদেশিনী মাকে বরাবরই ঘৃণা করে এসেছি আমি, তার সাথে মায়ের জাতি টাকেও। কেনো যেন আত্মিক টান কখনোই ছুঁতে পারেনি আমাকে, হয়তো ছোট থেকেই মায়ের মমতাহীন বেড়ে ওঠা সেজন্য। এভাবেই হাজারো মানুষের বেস্টনে একাকী, বিষন্ন জীবনটা ভালোই যাচ্ছিল। অনায়াসে দিন পার করে দেওয়ার মতো অনেক ব্যাস্ততাই ছিল তখন আমার কাঁধে। কখন

বাড়িতে ফিরতাম, কখন বেরিয়ে যেতাম কেউ তার হদিস জানতো না। বলতে গেলে আমাদের পরিবারটা দিনকে দিন রাজনীতি প্রাঙ্গনে পরিনত হচ্ছিল, একই বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও কেউ কারও খোজ নিতাম না আমরা।এক পর্যায়ে পরিবারের এরূপ ভাঙন লক্ষ করে দাদাসাহেব মৃ'ত্যু সজ্জায় এসে বাবাকে আবারও বিয়ে করতে বলেন। দাদার কথা রাখতে বাবাও সেই বয়সে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঠিক তখনই আমার সৎ মায়ের সাথে পরিবারে আগমন ঘটে আরও দুই সদস্যের অরু আর অনু।
ওদের বাবার সম্মন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। জানা থাকার কথাও না, কারণ বাবার বিয়ে নিয়ে আমার কোনোরুপ মতামত ছিল, না আমার এসবে কিছুই আসে -যেত।আর কিভাবেই বা আসবে? পরিবার কি জিনিস সেতো আমি জানিই না। ওরা ওদের মতো দিন কাটাতো,পড়াশোনা করতো আর আমি আমার মতো। ওই সময় অরুর দিকে ঠিক করে কখনো তাকিয়েছিলাম কিনা সেটাই বলা মুশকিল। যদিও বা কখনো সামনে পেয়েছি ধরে ঠাস ঠাস করে থা'প্পড় মেরেছি। তবুও আমার রুমে সারাক্ষণ উঁকি ঝুঁকি দিতো মেয়েটা, সুযোগ পেলেই রুমে এসে এটা-ওটা ধরতো। মাঝেমধ্যে তো বিরক্ত হয়ে খুব মা'রতাম।
ক্রীতিকের কথার মাঝে হুট করেই সায়র ফোড়ন কেটে বলে,— তুই কিরে, এখন যার জন্য দিওয়ানা হয়ে ছটফট করিস, তখন তাকে এভাবে মা'রতিস?
ক্রীতিক মৃদু হেসে বলে,
— আই উইশ, অরু আগের মতো এখনো আমার রুমে উঁকি ঝুঁকি দিতো।

— আর তুই ওঁকে ঠাস ঠুস করে মা’রতিস।
অর্নব সায়রকে থামিয়ে দিয়ে বললো,
— আহা! থামতো তুই, জেকে তারপর কি হয়েছিল?
ক্রীতিক পুনরায় বলতে শুরু করে,
— অরুর মা সুদক্ষ এবং স্মার্ট মহিলা ছিল, যার জন্য বাবার সাথে ব্যাবসায়িক কাজে বিভিন্ন যায়গায় যেতেন তিনি, বলতে গেলে বাবাকে সাহায্য করার জন্যই, তবে আমার সাথে তার খুব একটা সাভাবিক সম্পর্ক ছিলোনা,যার দরুন সপ্তাহে একবারও আমাদের মুখ দেখাদেখি হতোনা, যদি হতো সেটাও অরুর জন্য, অরুকে মা’রলে সেটা নিয়ে নালিশ যেত বাবার কাছে। বিপরীতে বাবার থেকে পেতাম হাজারটা তিরস্কার আর ভ’ৎসনা। এসবের কারনে মনে মনে জিদ হতো অরুর প্রতি,জিদের বসে দ্বিতীয়বার আমার রুমে এলে আরও বেশি করে মে’রে দিতাম ওকে।
এরকম যেতে যেতে বছর খানিক চলে যায়, তারপর একদিন, এটুকু বলে থেমে যায় ক্রীতিক,
সায়র, অর্নব দুজনই উৎকন্ঠা নিয়ে শুধালো –তারপর একদিন?
এবার ক্রীতিক নিজেও ভাবতে থাকে সে রাতের কথা,
পূর্নিমা রাত,আকাশে রুপোর থালার মতো মস্তবড় চাঁদ উঠেছে। চাঁদের নিয়ন আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিপাশ। ক্রীতিক কুঞ্জের মহলের ছাঁদটার আয়তন ছোট্টখাটো ফুটবল খেলার মাঠের মতোই বৃহৎ। জোছনা রাতে মায়ের অনুমতি সাপেক্ষ ছাঁদের পাঁচিল থেকে আচারের বয়াম গুলো ঘরে আনতেই ছাঁদে এসেছিল অরু। তখনই পাঁচিল ঘেষে দাড়িয়ে থাকা পুরো দস্তুর কালো দিয়ে আবৃত লম্বা মতো কাউকে দেখতে পেয়ে, অকস্মাৎ ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে

অরু। তবে গলার স্বর বাইরে বেরোনোর আগেই শক্ত হাতে ওর মুখ চে'পে ধরে ক্রীতিক। অরু থেমে গিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকাতেই ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বলে,— তুই এখানে কেন?
ক্রীতিকের কথায় উত্তর না দিয়ে অরু,মিনিমিনিয়ে বলে,
— আপনার তো জ্বর এসেছে, হাতটা কেমন আ'গুনের গোলার মতো গড়ম হয়ে আছে।
ক্রীতিক অরুর শরীরে একপ্রকার ধা'ক্কা দিয়ে বলে,
— জ্বর আসলে তোর কি? যা করতে এসেছিস সেটা করে নেমে যা, জ্ব'রের ঘোরে তোকে দেখতে ইচ্ছা করেনা।
ক্রীতিকের রগচটা সভাব চরিত্র সবকিছুই অরুর জানা, তাই ও আর না বারিয়ে চুপচাপ আচারের বয়াম নিয়ে ছাঁদ থেকে নেমে যায়। মাঝরাত, কারেন্ট থাকা সত্বেও রুমের চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জ্বরের ঘোরে অন্ধকার রুমে শুয়েই থরথর করে কাঁপছে ক্রীতিক। সন্ধ্যা রাতে দুই দুইটা প্যারাসিটামল খেয়েও কাজ হয়নি,উল্টে হাড়কাঁপিয়ে দিগুণ তালে জ্ব'র উঠেছে। পার্টির লোকেদের থেকে বারবার কল আসাতে মোবাইলটাও বন্ধ করে রেখেছে ও। অনেক বেশি জ্বরের তোপে অন্ধকার রুমের মাঝেই জোনাকিপোকা দেখছিল ক্রীতিক। ঠিক তখনই গভীর তিমিরকে হটিয়ে একটা মোমবাতি সমেত রুমে প্রবেশ করে কিশোরী অরু। পরনে তার কালো রঙের কামিজ মাথায় আধটানা ঘোমটা।
ক্রীতিক তখনও জ্বরের তোপে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল, অরু মোমটা নিয়ে রুমের মাঝে এগিয়ে এসে নিজে থেকেই বললো,— বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে, জেনারেটর ও নস্ট হয়ে পরে আছে, আপনার তো জ্বর তাই ভাবলাম মোমবাতি নিয়ে আসি।

— মোমবাতির প্রয়োজন নেই আমি অন্ধকার ভালোবাসি, তুই যাতো।
ক্রীতিকের এহেন ধমকেও অরু যায়না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ওর পাশ ঘেঁষে। অরুকে অনেকক্ষন যাবত দাড়িয়ে থাকতে থেকে ক্রীতিক হাস্কি স্বরে নাক টেনে বলে,
— কি হলো যাচ্ছিস না যে? আবারও মা'র খাওয়ার শখ জেগেছে? শখ জেগে থাকলে কাছে আয় থা'প্পড় দিচ্ছি।
অরু মুখ কাঁচুমাচু করে বলে,
— মা আঙ্কেলের সাথে শহরের বাইরে গিয়েছে,মামির অসুখ শুনে সকাল সকাল আপাও নানা বাড়ি গিয়েছে, বলেছিল বিকেলের মধ্যে ফিরবে কিন্তু ফেরেনি, এখন আবার কারেন্টও নেই, আমার অন্ধকারে ভয় করছে ভাইয়া, এখানে একটু দাঁড়িয়ে থাকি, কারেন্ট এলেই চলে যাবো। অরুর আকুতিভরা টলটলে চোখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিজে একটু সরে গিয়ে অরুর জন্য বিছানাতেই যায়গা করে দিলো ক্রীতিক। অরুও টু শব্দ না করে ভয়ে ভয়ে সেখানটায় গিয়ে বসে পরে।
ক্রীতিক চোখ দুটো বন্ধ রেখেই অরুর উদ্দেশ্যে বলে,
— ভালো করে বস মা'রবো না।
অরু এবার ভালোভাবেই বসে, হাতে থাকা জলপট্টিটা ক্রীতিকের কপালে রেখে দেখে দেয়।
ক্রীতিক ভ্রুকুটি করে চোখ উল্টে সেটার দিকে তাকিয়ে বললো,
— এটা কি দিয়েছিস?

অরু জানায়,— জ্বর হলে মা আমাদের মাথায় এটা দিয়ে রাখে, এতে অনেকটা আরাম লাগে,আপনি অন্ধকারে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, মনে হলো আপনার এটা প্রয়োজন তাই নিয়ে এসেছি।
অরুর কথা শুনে ক্রীতিক ওর মুখের পানে চাইলো,গত দের বছরে আজই বোধ হয় প্রথম ঠিকভাবে অরুর মুখের দিকে চাইলো ক্রীতিক,
সদ্য কিশোরীতে রুপ নেওয়া কচি একটা চেহারা। টিমটিমিয়ে জ্বলতে থাকা মোমের হলদে আলোও ওর চেহারাটা অস্পরীর মতোই সুন্দর লাগছে তীব্র জ্বরের ঘোরে থাকা ক্রীতিকের নেশালো চোখ দুটোতে। হুট করেই কেন যেন মনে হচ্ছে অরুর মতো মায়াবী মুখ পৃথিবীতে আর দুটো নেই।
ক্রীতিককে চুপচাপ তাকিয়ে থাকতে দেখে অরু ঠোঁট কামড়ে একটু এগিয়ে এসে জলপট্টিটা আবারও উল্টে দিলো।
— আমার জন্য কেন করছিস এসব?
ক্রীতিকের অজ্ঞাত প্রশ্নের উত্তর নেই অরুর কাছে, কিইবা বলবে ও? দেখছে মানুষটা জ্বরে পু'ড়ে যাচ্ছে, অথচ কাউকে মুখ ফুটে বলছেনা অবধি , একা একাই কষ্ট সহ্য করছে, তাইতো হাতে করে জলপট্টিটা নিয়ে আসা।— কি হলো, কিছু বল?
অরু আস্তে করে জবাব দেয়,
— আপনার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তাই।
ক্রীতিকের মতো পরিবারচ্যুত, বেপরোয়া, বেখেয়ালি, মায়ার বাঁধনহীন ছেলের কাছে অরুর অযাচিত মনে মুখ ফসকে বলা এই বাক্যটা ছিল আকাশসম আন্তরিকতা। অরুর কথায় অধিক তাপমাত্রায় দা'উদাউ করে জ্বলতে থাকা হৃদয়টা হঠাৎ করেই কেমন

শীতল হয়ে গেলো, উল্টে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো দিগুন তালে। হুট করেই মনে হতে লাগলো অরু ওর আপন, খুব আপন।
অরুর দিকে তাকিয়ে হিজিবিজি ভাবতে ভাবতেই কখন যে বিদ্যুৎ চলে এসেছে টের পায়নি ক্রীতিক,টের পাওয়ার কথাও নয়,কারন এই রুমে এখনো আলো জ্বলছে না, বাইরের ঘরে মৃদু আলো জ্বলতে দেখে অরু বলে,— বিদ্যুৎ চলে এসেছে, এবার আমি যাই।
ক্রীতিক অরুর হাত টেনে ধরে, ঘোর অসম্মতি জানিয়ে বলে,
— কোত্থাও যাবিনা তুই, এখানে বসে থাক আমার সামনে।
— ককেন?
ক্রীতিক হাস্কি স্বরে জবাব দেয়,
— তোকে দেখবো তাই।
ক্রীতিক শক্ত করে অরুর হাত ধরে রেখেছে,
উপায়ন্তর না পেয়ে অরু সেখানেই বসে থাকে সারারাত, একপর্যায়ে ঝিমুতে ঝিমুতে কখন যে ক্রীতিকের বুকের উপরই ঘুমিয়ে পরেছে সেটা অরুর অজানাই রয়ে যায়, অথচ ক্রীতিকের চোখে একফোটাও ঘুম নেই, ও সারারাত জেগে ঘোর লাগা চোখে অরুকে দেখেছে, সময়ের সাথে সাথে মোমের আলো ফুরিয়ে গিয়েছে, তবুও দেখেছে, শেষমেশ অরু যখন ক্রীতিকের বুকেই ঘুমিয়ে পরে, তখন দ্বিতীয়বারের মতো আবারও হৃদস্পন্দন গতি হারায় ক্রীতিকের। ও চোখ দুটো বন্ধ করে হিসহিসিয়ে বলে,
— তুই আমার অরু, খুব তারাতাড়ি বড় হয়ে যা, তোকে আমি দেখবো, সারাজীবন ধরে দেখবো।সেদিন রাতের পর থেকেই ক্রীতিকের হৃদয়ে বাসা বাধে অরুর প্রতি অজানা এক আসক্তি। যার কোনো নামদাম নেই, শুধু হৃদ মাঝারে বয়ে চলা এক সুপ্ত,

গভীর, আর বেসামাল অনুভূতির ছড়াছড়ি । ধীরে ধীরে সবার আড়ালে শুরু হয় অরুর প্রতি নিজের দখলদারি। অরু যে রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতো সেই রাস্তায় সবসময় দুজন লোক লাগানো থাকতো। অরু কার সাথে মিশছে কার সাথে ঘুরছে,বন্ধু মহলে কোনো ছেলের আনাগোনা আছে কিনা সব কিছুরই পাই টু পাই খবর নিতো ক্রীতিক, অরু আম পারতে গিয়ে গাছ থেকে পরে ব্যাথা পেয়েছে বলে,সেদিনই বাপ দাদার আমলের ঐতিহ্যবাহী আম গাছকে কে’টেকুটে বাড়ি থেকে বিদায় করে ক্রীতিক । বাড়ির ঐতিহ্য,বাবা দাদার স্মৃতিকে এভাবে কেটে ফেলায় ছেলের বেপরোয়া কান্ডে জামশেদ জায়ান চৌধুরী ও হতবাক হয়েছিলেন, কিন্তু বলার মতো কিছু নেই তার। কিইবা বলবেন?ছেলে কি তার কথা শোনে?এভাবে সময়ের পরিবর্তনে সেই আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে দিগুণ হারে, স্কুল ব্যাতিত ক্রীতিক কুঞ্জের বাইরে পা রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যায় অরুর জন্য। কিশোরী অরুর মাথায় ঢোকেনা, হঠাৎ করেই ক্রীতিক কেন তার উপর এতো অধিকার দেখাচ্ছে। আগেতো কখন আসতো কখন যেত তারই হদিস থাকতো না, আর এখন বাড়িতে কেউ না থাকলেই ক্রীতিককে দেখতে পায় অরু। শুধু দেখতে পায় বললে ভুল হবে, ওকে জোর জ’বরদস্তি করে নিজের সামনে বসিয়ে রাখে ক্রীতিক,চোখের সামনে থেকে সরলেই গালে এসে আঁচড়ে পরে শক্ত হাতের থা’প্পড়। থা’প্পড় খেয়ে অরু কাঁদলে পুনরায় থা’প্পড়। এভাবেই দিন যাচ্ছিল, সবার অগোচরে ভেতরের সুপ্ত অনুভূতি গুলো তরতর করে বাড়ছিল ক্রীতিকের মাঝে। ক্রীতিকের হুটহাট করা পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে আজকাল আর আগের মতো ওর রুমের ধারে কাছেও ভেরে না অরু।

মাঝেমধ্যে ওকে একনজর দেখে চলে যাবে বলে,ওর নাম করে ক্রীতিক জোরে জোরে ডাকে, তবুও সেদিকে পা বাড়ায় না অরু। তবে আজকে দুরুদুরু বুকে সেই আসতেই হলো ক্রীতিকের রুমের সামনে। বাড়ির অফিস রুমে পার্টি অফিসের মিটিং চলছে, সবাই উপস্থিত, অথচ ক্রীতিকের খবর নেই,মোবাইল বন্ধ করে অন্দরমহলে বসে সে কি করছে কে জানে? মিটিং এর মাঝে সবাই তর্ক বিতর্কে ব্যাস্ত, তাই জামশেদ জায়ান চৌধুরী অরুকে ডেকে বলে,

— তোমার ক্রীতিক ভাইয়াকে ডেকে দাওতো অরু।

তার কথা রাখতেই আপাতত ভর সন্ধ্যাবেলা ক্রীতিকের রুমে কড়া নেড়েছে অরু।

অরু কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ওকে হ্যাঁচকা টানে ভেতরে নিয়ে গেলো ক্রীতিক, ভেতরে নিয়ে গিয়ে চোখ রাঙিয়ে অরুর উদ্দেশ্যে বলে,— গত দুদিন ধরে ডাকছি তোকে?সামনে আসছিস না কেন কি সমস্যা?

অরু মুখ ঝামটি দিয়ে বলে,

— সবসময় বকাঝকা করেন, গায়ে হা'ত তোলেন আপনাকে আমার বিরক্ত লাগে।

— আগেতো মা'রলেও পেছনে ঘুরঘুর করতি তখন বিরক্ত লাগতো না?

— তখন তো বুঝতাম না যে আপনি আমায় এতো অপছন্দ করেন, এখন তো বুঝি আমি আপনার সৎ বোন,তাই আমাকে দু-চোখে দেখতে পারেন না আপনি।

অরুর কথা শেষ হতে দেরি হলো, তবে ওর শরীরে ক্রীতিকের হাত পরতে দেরি হলোনা। ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
— এটা কেন দিয়েছি জানিস? নিজেকে আমার সৎ বোন দাবি করার জন্য, তুই আমার বোন না, আমার বোন হওয়ার কোনো যোগ্যতাই তোর মাঝে নেই। আর না আমি তোকে বোনের নজরে দেখি।
মা'র খেয়ে গালে হাত দিয়ে মেঝেতে বসেই ফুপিয়ে কাঁদছে অরু। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ক্রু'দ্ধ মস্তিষ্কটাকে স্থীর করে অরুর মুখোমুখি হয়ে বসে পরে ক্রীতিক, তারপর আলতো হাতে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে,—আ'ম সরি অরু,খুব লেগেছে? কেন আমাকে এভাবে য'ন্ত্রনা দিস বলতো? তুই যখন আরেকটু বড় হবি তখন আমার আজকের কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারবি, ততদিন শুধু তোকে একটু দেখে দেখে রাখতে হবে আমার।
ক্রীতিকের মুখে আদুরে আওয়াজ শুনে অভিমানে অরু এবার শব্দ করেই কেঁদে উঠলো,
এভাবে নাক ফুলিয়ে কাঁদায় ওকে অনেক বেশি আকর্ষনীয় আর মায়াবী লাগছিল ক্রীতিকের চোখে, তাই নিজেকে সংযত না রাখতে পেরে হুট করেই ওর গালে সশব্দে চুমু খেয়ে বসলো ক্রীতিক। তবে ওদের বসার ধরনটা এমন ছিল যে, যে কেউ পেছন দিক থেকে দেখলে ভুল বুঝতে পারে, হলোও তাই।
মিসেস আজমেরী শেখ বাড়িতেই ছিলেন সেদিন, ক্রীতিকের রুম থেকে মেয়ের ক্রন্দনরত আওয়াজ শুনেই তিনি বুঝে গিয়েছেন আবারও হয়তো তার ছোট মেয়েটাকে মে'রেছে ক্রীতিক।

তৎক্ষনাৎ তিনি মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য ক্রীতিকের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন, তবে রুমে প্রবেশের আগেই পা দুটো আটকে গেলো তার, সন্ধ্যা রাতের আবছা আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখেলের তার ছোট্ট মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠ সময় পার করছে ক্রীতিক। পার্টি অফিসের ছোট বড় সবার সামনে, পরপর অনর্গল থা'প্পড়ের আ'ঘাতে র'ক্তাক্ত হয়ে উঠেছে ক্রীতিকের গৌড় মুখমন্ডল। আর দুটো থা'প্পড় দিলেই হয়তো নাক ফে'টে ফিনকি দিয়ে র'ক্ত বেরিয়ে আসবে। তবুও কিছুতেই থামানো যাচ্ছেনা জামশেদ জায়ান চৌধুরীকে। রা'গের তোপে থরথর করে কাঁপছেন তিনি, হাতের পাশাপাশি মুখ দিয়ে যা আসছে সেটা বলেই আ'ঘাত করছেন নিজের একমাত্র ছেলেকে। অরু অনু ওর মায়ের আঁচল ধরে রুমের এককোণে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে।
জামশেদ জায়ান চৌধুরী ওকে মা'রতে মা'রতে ক্লান্ত হয়ে বললেন,— আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল কোনো আমেরিকান নাচনেওয়ালীর ছেলের চরিত্র এর চেয়ে ভালো আর হবে না।
বরাবরই নিজের মায়ের কথা শুনলে ক্রীতিকের মাথায় র'ক্ত উঠে যায়, উগ্রতার চড়ম সীমানায় পৌঁছে যায় ও,এবারও তাই হলো, চিৎকার দিয়ে নিজের বাবার মুখের উপর বললো,
— তুমিই সেই আমেরিকান নাচনেওয়ালীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে,যার ফল আমি।
সঙ্গে সঙ্গে জামশেদ জায়ান আবারও ওকে সজোড়ে চ'ড় মারলেন, অতঃপর আশেপাশের চ্যালাপ্যালাদের ডেকে বললেন,— প্রাইভেট জেটের ব্যাবস্থা করো,আজ এই মূহুর্তে ও দেশ ছাড়বে, স্বাধীনতা পেতে পেতে ওর ভেতরের পুরোটাই নর্দমার মতো কালো হয়ে

গিয়েছে, ওকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন, তারজন্য সবার আগে ওর স্বাধীনতা হর'ন করতে হবে। আজ এই মূহুর্তে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরীর রাজনৈতিক পদ বাতিল করা হলো, তোমার রাজনৈতিক জীবন এখানেই সমাপ্ত। বিদেশে গিয়ে মানুষ হয়ে ফেরো।
বাবার কথার পিঠে ক্রীতিক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ছু'ড়ে মা'রে, দলের লোকেদের হাত থেকে নিজের পাসপোর্ট আর ব্যাগটা ছো মে'রে নিয়ে, ছোট্ট অরুর দিকে একপলক তাকিয়ে আবারও চোখ সরিয়ে বলে,
— ফিরবো না, কোনো দিন ফিরবো না এ দেশে, শুধু একটা গুরুত্বপূর্ন জিনিস রেখে গেলাম, সময় হলে সেটাও নিয়ে যাবো। কারণ ক্রীতিক কোনো জিনিস হাত পেতে নেয়না, কে'ড়ে নেয়। ক্রীতিক যখন গাড়ি করে বেড়িয়ে যাচ্ছিলো, তখন দোতলার দেওয়াল জোড়া জানালা দিয়ে ওর পানেই অসহায়ের মতো তাকিয়ে ছিল অরু। ক্রীতিকও তাই,ও গাড়িতে বসে ছিল ঠিকই তবে হিং'স্র দপদপে চোখদুটো ছিল দোতলার জানায় নিবদ্ধ।
একপর্যায়ে গাড়িটা যেতে যেতে চোখের আড়াল হয়ে যায়, তবুও সেদিকে তাকিয়ে রয় অরু, কি নিয়ে এতো ঝামেলা হলো সেসব মাথায় না ঢুকলেও এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে ও, আজ ওর জনই বাড়ি ছাড়া হয়েছে বাড়ির একমাত্র রাজপুত্র, জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী।
ওদিকে যেতে যেতেই ক্রীতিকের কে'টে যাওয়া ঠোঁট দুটো বাঁকা হাসিতে প্রসারিত হলো, ব্যাক সিটে গা এলিয়ে দিয়েই বিড়বিড়ালো সে,—love is temporary but obsession is permanent. and I'm da'ngerously obsessed with you aurora

seikh. খুব বেশি না, আমাকে সামলানোর মতো একটুখানি বড় হ, আমি অপেক্ষার প্রহর গুনছি.....ক্যালিফোর্নিয়াতে আজ বেজায় ঠান্ডা পরেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় কনকনে ঠান্ডা হাওয়া এসে একেবারে নাক মুখ চিড়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। এলোমেলো বাতাসের তীব্রতায় ঝড়ে পরা আকর্ষনীয় ম্যাপল পাতায় ভরে উঠেছে রাস্তাঘাট। আজকে আর যেন-তেন শীতের পোশাক পরে শীত নিবারন করার সুযোগ নেই, তাইতো উষ্ণ কোর্ট, গ্লোভস,পায়ে বুট,মাথায় উলের বিনি হ্যাট পরে, একেবারে রয়েসয়ে বাইরে বেরিয়েছে অনু। আজ বাইরে না গিয়ে ভেলভেট কম্ফোর্টারের মধ্যে শুয়ে আরাম করে ঘুমালে হয়তো সবচেয়ে বেশি ভালো হতো। কিন্তু আগামী কাল মায়ের অপারেশন, আজ না গেলে কেমন করে হবে? গত দুদিন ধরে অরু আর ক্রীতিক বাড়িতে নেই, এই দুদিনে ওর যথেষ্ট খেয়াল রেখেছে প্রত্যয়, সব সময় ফোন করে খোঁজ নেওয়া, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে এগিয়ে দেওয়া, কিংবা নার্সিংহোমের কোনোরূপ জরুরি প্রয়োজনে ছুটে আসা। কি না করেছে?
এতো যত্ন, এতো মূল্যয়নে অনুর মতো কঠোর হৃদয়ের মেয়েটাও আজকাল প্রত্যয়ের প্রতি দূর্বলতা অনুভব করে। ইচ্ছে তো করে হৃদয়টা বের করে হাতে তুলে নিয়ে প্রত্যয়কে উপহার দিয়ে দিতে,আফটার অল হি ডিজার্ব ইট। প্রত্যয়কে নিয়ে অসংখ্য দানাবাঁধা স্বপ্ন আর ভাবনারা মাথায় কিলবিল করছে অনুর। মাঝে মাঝেই অযাচিত মনে একাই ফিক করে হেসে উঠছে ঠোঁট জোড়া। একমনে প্রত্যয়কে নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে বাস স্টপেজের কাছে চলে এসেছে তা টেরও পায়নি অনু। যখন টের পেলো তখন দেখলো বাস এখনো আসেনি, অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষন, তাই

এগিয়ে গিয়ে একটা শিশিরে ভেজা বেঞ্চি হাত দিয়ে সামান্য পরিস্কার করে সেখানটায় বসে পরলো ও। বেঞ্চিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় চোখের সামনে দৃশ্যগত হলো পূর্বের ন্যায় একই ঘটনা। এই নিয়ে পরপর তিনদিন ওই মেয়েটাকে প্রত্যয়ের সঙ্গে দেখেছে অনু। রাস্তার ওপাশেই ক্যাফেটেরিয়াতে দাড়িয়ে আছে ওরা দুজন। প্রত্যয় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে কিছু একটা বলে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। প্রত্যয় চলে যেতেই হুট করে, একদম হুট করে অজ্ঞাত মেয়েটার চোখে চোখ পরলো অনুর। এভাবে চোখাচোখি হওয়ায় ভেতরটা কেমন আঁতকে উঠল ওর। তৎক্ষনাৎ তরিৎ গতিতে চোখ নামিয়ে নিলো অনু। জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে বিড়বিড় করে বললো,— কে এই মেয়ে? সব সময় প্রত্যয় সাহেবের সাথেই কেন দেখা যায় তাকে? ওনার বোন? কই চেহারাতে তো মিল নেই।

— এই যে!!

অনুর অস্পষ্ট বিড়বিড়ানির মাঝেই স্পষ্ট বাংলায় ওকে ডেকে উঠল কেউ। অনেকদিন পর অচেনা মুখে বাংলা আওয়াজ শুনে চট করে মাথা তুলে চাইলো অনু, তবে সেই মানুষটিকে দেখে খুশি হওয়ার বদলে উল্টে ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে গেলো ওর। এতো একটু আগে প্রত্যয়ের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বাঙালি মেয়েটা, এখানে কি করছে সে? অনু চুপচাপ তাকিয়ে আছে দেখে মেয়েটা পুনরায় বললো,

— কানে শুনতে পাওনা নাকি?

মেয়েটার কথায় চড়ম ক্রো’ধের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। কওয়া নেই বলা নেই হুট করে এসে এভাবে খিটখিটে আওয়াজে কথা বলাটা মোটেই পছন্দ হলোনা অনুর, মেয়েটার আচরনে সুন্দর মেজাজটা

হঠাৎ করেই কেমন বিগড়ে গেলো, তবুও যতটুকু সম্ভব নিজেকে সংবরণ করে কাঠকাঠ আওয়াজে অনু বললো,— কি চাই?
অনুর থেকে বোধ হয় এতোটা কাঠিন্য আশা করেনি মেয়েটা, তাই ওকে চোখ পাকিয়ে গলার স্বর কঠিন করে সে বললো,
— এ্যাই মেয়ে, কাকে কি বলছো তুমি?
অনু এবার বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলো, দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রেখে ,ভ্রু উঁচিয়ে সাভাবিক ভঙ্গিমাতে বলে,
— আপনাকে বলছি, কি চাই?
মেয়েটা এবার তাচ্ছিল্য করে হেসে বললো,
— প্রত্যয়ের সাথে যে এতো ঢলাঢলি করছো, আমি কে সেটা নিশ্চয়ই বলেছে?
— না বলেনি, হয়তো সেরকম ইম্পর্ট্যান্ট কেউ না তাই বলার প্রয়োজনবোধ করেনি, আপনার খুব বেশি বলার ইচ্ছে থাকলে আপনিই বরং বলুন, আমি শুনছি, আর হ্যা একটু জলদি বলবেন প্লিজ, আমার তাড়া আছে।
মেয়েটা খিটখিট করে বলে উঠলো,
— বেশি স্মার্ট সাজার চেষ্টাও করোনা,তাহলে পস্তাবে, হি ওয়াজ জাস্ট ইউজিং ইউ,টু ফরগেট সামওয়ান, এন্ড দ্যাট ওয়াজ মি। আমি ওর বিগত সাত বছরের ভালোবাসা।
মেয়েটার কথায় অনু শুষ্ক ঢোক গিললো, মনের ভেতর বিশ্বাস হারানোর ভয়টা কুন্ডলী পাঁকিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তবুও ভেতরের শ’ঙ্কাটাকে নিঃশব্দে আড়াল করে বললো,

— আপনাদের ভালোবাসা যদি এতোই পিওর হয়, এতোই দৃঢ় হয়,তাহলে আমার কাছে কি চাইতে আসে আপনার বয়ফ্রেন্ড, ধরে রাখতে পারেন না?
অনুর কথায় মেয়েটার আত্নবিশ্বাসে ভাঁটি পরলো, সে কয়েকবার চোখের পলক ফেলে বললো,
— আমি ওকে চিট করেছি, বাট আই স্টিল লাভ হিম। আর আমি এও জানি ও আমার কাছেই ব্যাক করবে। কারণ সাতদিনের ভালোবাসা, সাত বছরের ভালোবাসার কাছে কিছুই না।
অনু ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো,— স্টুপিড।
অনু শব্দটা উষ্চারণ করার সাথে সাথেই ওর চুল থাম'চে ধরলো মেয়েটা, তারপর প্রচন্ত ক্রো'ধে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটা বললো,
— তুই আমার প্রত্যয়ের ধারে কাছেও আসবি না, নয়তো আমার সুগার ড্যাডিকে দিয়ে তোর খবর করিয়ে ছাড়বো। আমার হাত যে কতটা লম্বা সেটা তোর ধারণারও বাইরে।
অনু বিপরীতে কিছু বলবে তার আগেই কোথা থেকে যেন ছুটে এসে এক ঝটকায় ধা'ক্কা মে'রে মেয়েটার হাত সরিয়ে দেয় প্রত্যয়, অন্য হাতে অনুকে আগলে ধরে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে,
— আর ইউ ক্রে'জি? রাস্তার মধ্যে কি করছো এসব? নেক্সট টাইম এভাবে পেছনে পরে থাকলে আমি তোমার নামে পুলিশে কমপ্লেইন করতে বাধ্য হবো তিন্নি।এতোক্ষণে বাস এসে পরেছে পাবলিক প্লেস হওয়াতে চারিদিকে মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছে মূহুর্তেই। সবার দৃষ্টি এখন ওদের তিন জনের দিকে। কেউ কেউ তো সুযোগ পেয়ে ভিডিও করা আরম্ভ করা দিয়েছে, অনু এতোক্ষণ যাবত চুপ করেই ছিল কিন্তু এই মূহুর্তে প্রত্যয়ের এসব আগলা দরদ ওর মোটেই

ভালোলাগছে, গা ঘিনঘিন করছে, ইচ্ছেতো করছে প্রত্যয়কে সপাটে একটা চ'ড় মে'রে দিতে,কিন্তু পাবলিক প্লেসে নাটক করে কারোর হাসির পাত্র হতে চায়না অনু, তাই যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে প্রত্যয়ের বাহু থেকে নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে, হাঁটা ধরলো রাস্তার উল্টো পথে, ওকে এভাবে চলে যেতে দেখে প্রত্যয়ও হাটা দিলো অনুর পিছু পিছু। প্রত্যয় পেছনে আসছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনু ঘাড় ঘুরিয়ে কাঠকাঠ গলায় বললো,— ওখানেই দাঁড়ান, আর আসবেন না। অনুরোধ নয়,নিষেধ করছি।
অনুর নিম পাতার মতোন তেঁতো কথায় প্রত্যয় আর এগোতে পারলোনা, অগত্যাই দাঁড়িয়ে পরলো রাস্তার মাঝখানে, অনু চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত পায়ে হেটে চলে গেলো সেখান থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুকে দেখা যায়, ঠিক ততক্ষন ওর যাওয়ার পানে নিস্প্রভ চোখে তাকিয়ে রইলো প্রত্যয়। এক পা ও নড়লো না। খুব ভোর নয়, সকাল পেরিয়ে বেলা গড়িয়েছে অনেকটা। চারিদিকে সূর্যের সোনালী আলোর ঝলকানি, অরু সেই কখন থেকে ক্রীতিকের রুমের সামনে দাড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে পায়চারি করছে। মনে মনে ভাবছে,
— শুনেছি ভোর রাতে রুমে ঢুকেছে এখনো ঘুমিয়ে আছে কিনা কে জানে? নক করবো কি করবো না? করবো কি করবো না? না থাক চলে যাই, না একবার করেই দেখি।
অরু যখন কি করবে না করবে ভেবেই কুল পাচ্ছিল না, তখনই ভেতর থেকে ডেকে ওঠে ক্রীতিক,
— তোর পায়চারি তে মাথা ঘোরাচ্ছে আমার ভেতরে আয়।
অরু চট করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো,

— আপনি কি করে বুঝলেন আমি দাঁড়িয়ে আছি?
কথাটা বলে ভেতরে ঢুকতেই চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে দ্রুত পেছনে ঘুরলো অরু। ক্রীতিক গায়ে শার্ট চড়াচ্ছে, ওর জিম করে কৃত্তিম উপায়ে বানানো ভি শেইপ পৃষ্ঠদেশ স্পষ্ট দৃশ্যমান অরুর চোখে। এভাবে অসময়ে এসে পরে নিজেই লজ্জিত হলো ও। অরুর কথার জবাবে ক্রীতিক সামনে ঘুরে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললো,— মেইবি, আমি তোর শরীরের গন্ধ পাই।
অরু এখনো পেছনে ঘুরে দাড়িয়ে আছে দেখে ক্রীতিক পুনরায় বলে,
— হয়ে গিয়েছে তাকাতে পারিস।
অরু যেন কিচ্ছুই বোঝেনি, লজ্জাও পায়নি, সেভাবে করেই মুখ ভঙ্গিমা সাভাবিক রেখে ঘুরে বললো,
— আপনি কি ভ্যাম্বায়ার? না মানে শুনেছি ভ্যাম্পায়াররা মানুষের গন্ধ পায়।
ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ব্ল্যাক বেল্ট ঘড়িটা হাতে পরতে পরতে ক্রীতিক বলে,
— বেশি বেশি ফ্যান্টাসী বই পড়লে এই হয়, মাথার মধ্যে সব ভুত প্রেত ভর করে বসে আছে, ক্লাসের বই তো খুলেও দেখিস না, এবার ইউ এস এ ফিরে তোকে দেখে নিচ্ছি আমি।
পড়াশোনার কথা আসতেই অরু দ্রুত কথা ঘুরিয়ে কাজের কথায় চলে এলো, মিনমিনিয়ে বললো,— আপনার ফোনটা একটু দিবেন আপাকে কল করতাম।
— রাতের ফ্লাইটে তো ফিরেই যাচ্ছি কল করার কি আছে?
জবাবে অরু ঠোঁট উল্টে বলে,
— আপার জন্য মন খারাপ লাগছে, আমি কথা বলতে চাই।

ক্রীতিক নিজের হাতের কাজ করতে করতে বললো,
— জ্যাকেটের পকেটে আছে খুঁজে দেখ, আর হ্যা, আমার সামনে বোনের সাথে একদম ন্যাকামি করবি না, যা কথা বলার নিজের রুমে গিয়ে বল।
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে ফোন নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। তারপর আবারও কি ভেবে যেন ফিরে এসে বলে,— ফোনের পাসওয়ার্ডটা…
— তোর আর আমার বার্থডে।
অরু হতবাক হয়ে পুনরায় শুধালো
— কিহ?
ক্রীতিক ঘাড় ঘুরিয়ে ধমকের সুরে বললো,
— কানে কম শুনিস?
অরু ভয়ে তটস্থ হয়ে এদিক ওদিক ঘাড় নাড়িয়ে,আবারও দৌড়ে চলে যায়। যেতে যেতেই লক খুলে কল লাগায় অনুর নাম্বারে। একবার, দু'বার, তিনবার,গিয়ে চারবারের মাথায় কল তুললো, অনু।— হ্যালো আপা!
এপাশ থেকে অরুর উৎসুক গলা শুনেই তেতে উঠলো অনু, গলারস্বরে হাজারো বিরক্তি টেনে এনে ঝাঁজ নিয়ে বললো,
— কি সমস্যা কল দিয়েছিস কেন? আমাকে একা রেখে সৎ ভাইয়ের টাকায় থাইল্যান্ড গিয়েছিস,ঘুরছিস,ফিরছিস, খাচ্ছিস, এনজয় করছিস, তবুও স্বাধ মিটছে না? নাকি আমাকে ইউজ করে আমার ঘাড়ে পা দিয়ে জীবন কাটানোর শখ এখনো মেটেনি?
অনুর তিক্ত কথায় চড়াৎ করে মস্তিষ্কটা ঝাঁজিয়ে উঠলো অরুর, ও নিজেও তেজি স্বরে বললো,

— মুখে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছিস তখন থেকে, কি হয়েছে কি করেছি আমি?
অনু উল্টো ক্রো'ধ দেখিয়ে বললো,
— যা বলেছি একদম ঠিক বলেছি, বুঝেশুনে বলেছি, তোরা সবাই আমাকে ব্যাবহার করিস নিজেদের প্রয়োজনে। কেন বলতো? সব সময় তোদের চিন্তাই আমার কেন করতে হবে? আমার কি ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই?
অরু এবার নরম সুরে শুধালো,
—কি হয়েছে আপা?
অরুর প্রশ্নের কিঞ্চিত পরোয়া না করে,অনু মুখে যা আসছে উন্মাদের মতো তাই বলে যাচ্ছে, অরু জানে আপার রা'গ উঠলে মাথা ঠিক থাকেনা, পরে আবার নিজেই সব সামাল দেয়, তাই এতোএতো তিক্ত কথার বিপরীতে
অরু নিজের রাগ সংবরন করে আবারও জিজ্ঞেস করল,
— কি হয়েছে বলনা আপা? কে কি বলেছে তোকে? মা ঠিক আছে, আমি…
ওর একাধারে প্রশ্নের একপর্যায়ে অনু নিজের খেইর হারিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো,
— তুই এবার আমাকে বিচারকদের মতো প্রশ্ন করা বন্ধ কর অরু, আমি বিরক্ত তোর এসব প্রশ্নে, তোর এতো আনন্দ আমার সহ্য হচ্ছেনা, আমার ঘাড়ে পা দিয়ে এভাবে জীবন কাটাতে লজ্জা হয়না তোর? আর কতদিন আমার উপর ভরসা করে বাঁচবি? তোদের দেখভাল করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি, এবার একটু রেহাই

দে, এবার অন্তত আমাকে ইউজ করা বন্ধ কর।— আমি তোকে ইউজ করি?
— হ্যা করিস, তোরা সবাই মিলে আমাকে নিজেদের সার্থে ইউজ করিস, এবার আমাকে আমার মতো বাঁচতে দে অরু, একনাগাড়ে চোখ খিঁচে কথাগুলো বলে মুখের উপর ফোন কেটে দিলো অনু। ওদিকে অনুর বলা শেষ কথায় মাথার মধ্যে অ'গ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুভব হলো অরুর,কষ্টের সীমানা পেরিয়ে, মেজাজ চড়ে এসেছে সপ্তম আসমানে। ইচ্ছে করছে আশেপাশের সব কিছুর ভে'ঙে গুড়িয়ে ফেলতে,নিজের অজান্তেই ধপ করে মেঝেতে বসে পরে দু'হাতে নিজের লম্বা চুল গুলো মু'ঠিবদ্ধ করে, নিরবে চোখের জ্বল ফেলতে ফেলতে অস্পষ্ট সুরে অরু বললো,
— তারমানে মায়ের অবর্তমানে আপাও আমাকে করুনা করে এসেছে। কোনো ভালোবাসা নেই সবটা করুনা, সবাই করুনা করে আমাকে।এলিসার বাবাকে থাই পুলিশ এ্যা'রেস্ট করেছে, এবার আর প্রমান ছাড়া নয় সুস্পষ্ট প্রমান সমেত তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
—যেহেতু ওর বাবা জেলে আছে সেহেতু এলিসাকে ব্ল্যা'কমেইল করার মতো আপাতত কেউ নেই, বলতে গেলে এলিসা এখন পুরোপুরি নিরাপদ।
সায়রের কথায় অর্নব আর ক্রীতিক হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো। অর্নবের হ্যা সূচক সম্মতি শুনে সায়র এবার উচ্ছ্বাসিত সুরে বললো,
—তাহলেতো আমাদের মিশন কম্পিলিট, আজ রাতে পার্টি করলে কেমন হয়?
এবার অর্নব বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বললো,

— তুই কি পা'গল? এলিসার মন ভালো নেই, আর তুই আছিস তোর পার্টি নিয়ে।
ক্রীতিক কিছু একটা ভেবে পায়ের উপর পা তুলে বললো,
— আমার হাতে সময় নেই কাল ভার্সিটিতে এক্সাম ফিরতে হবে।
সায়র হতাশ হয়ে বললো,—তোরা না থাকলে আমি কি জ্বিন ভুতের সাথে পার্টি করবো নাকি?চল রাতেই ফিরে যাই তাহলে।
কথাটা শেষ করে সায়র কেবলই বসা থেকে উঠে দাড়িয়েছে, ওর সামনের ডিভানটাতে এখনো ক্রীতিক পায়ের উপর পা তুলে বসা, তখনই কোথা থেকে যেন অরু এসে এক প্রকার হামলে পরলে সায়রের উপর, ওর চেহারা বি'ভৎস, চুল গুলো এলোমেলো, চোখদুটো টলছে, সেথা থেকে গড়িয়ে পরছে অস্রুসিক্ত নোনাজল।
অরু আশেপাশের কারোর দিকে নজর না দিয়েই, সায়রের কলার দুটো শক্ত করে চেপে ধরে কান্না মিশ্রিত কন্ঠে বললো,
— সায়র ভাইয়া! বিয়ে করবেন আমায়? আপনার তো কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই, তাছাড়া আপনার মাথার সবগুলো তাড় ও ঠিকঠাক আছে, আমার আপনাকে বিয়ে করতে কোনো আপত্তি নেই, আমি কারও বোঝা হয়ে থাকতে চাইনা,কারও করুনার পাত্রীও হতে চাইনা আর এক মূহুর্ত ও না, বিয়ে করবেন আমাকে? হতে পারে আমি আপনার চেয়ে বয়সে একটু বেশিই ছোট তাতে কি আসে যায়?ভালো করে তাকিয়ে দেখুন আমি সুন্দরী।
এদিকে সায়র অরুকে কি দেখবে, অরুর পেছনে দাড়িয়ে থাকা ক্রীতিককে দেখেই ওর গলা শুকিয়ে এসেছে। ক্রীতিকের জ'লন্ত আ'গ্নেয়গিরির দাবানলের মতো চোখ দুটো দেখেই ওর হাত পা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে, চোখ দিয়ে বারবার ক্রীতিককে ইশারা

করে বোঝাচ্ছে,— ভাই আমি কিছু জানিনা,তোর জানের জান পরানের পরান অরুই আমাকে ইচ্ছে করে ফাঁসা'চ্ছে।
ক্রীতিক একনজর সায়র কে পরখ করে কপালে দু আঙুল ঠেকিয়ে কিছু একটা ভাবলো, তারপর হুট করেই উঠে দাড়িয়ে, অরুর হাতটা শ'ক্ত করে চেপে ধরে ওকে ইচ্ছে মতো টানতে টানতে বেডরুমে নিয়ে ছু'ড়ে মা'রলো, অকস্মাৎ টাল সামলাতে না পেরে অরু হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পরে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। দাঁড়ানো থেকে এভাবে হুট করে মেঝেতে পরায় কনুই আর হাঁটুর অবস্থা বেগতিক। কাঁদ'তে কাঁ'দতে অরু নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে খুব , কিন্তু প্রচন্ড আ'ঘাতে হাত পা গুলো যেন অসার হয়ে পরেছে ওর। ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রীতিক নিজের দু'পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কন্ঠে বললো,
— আমি আসছি ততক্ষণ এখানেই পরে থাক, অন্যকারও শরীরে হাত ছোঁয়ানোর শা'স্তিটা সময় হলে টের পাবি। অরুকে নিজের রুমে আটকে রেখে ক্রীতিক আবারও ওদের কাছে ফিরে আসে, অর্নব,সায়র, এলিসা তিনজনই ভ'য়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রীতিকের পানে। সবাইকে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে দেখে সায়র একটু সাহস করে বলে ওঠে,
— কি করেছিস ওর সাথে?
সা'পের ফনা তোলার মতো তরিৎ গতিতে সায়রের দিকে হিং'স্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্রীতিক বলে,
— যা ইচ্ছে করেছি, আমাদের প্রাইভেট কথাও তোকে শেয়ার করতে হবে?

সায়র কিছু বলতে যাবে, তার আগেই অর্নব ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো,
— আর একটাও কথা বলবি না সায়র। নয়তো ক্রীতিকের হাতে আজই তোর খেল খতম।
বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্রীতিক নিজের পকেট থেকে একটা পেনড্রাইভ বের করে অর্নবের হাতে দিয়ে বলে,—ডকুমেন্টস গুলো যত দ্রুত সম্ভব বের কর।
পেনড্রাইভটা হাতে নিয়ে,সেটাকে উল্টে পাল্টে দেখে,অর্নব নিজের ঠোঁট কা'মড়ে বললো,
— একটু বেশি তারাহুরো হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?
অর্নবের কথায় ওর দিকেও অ'গ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্রীতিক। ক্রীতিকের চোখের হিং'স্রতা দেখে অর্নব চোখ নামিয়ে নিলে, এলিসা এগিয়ে এসে অর্নবের কাধে হাত রেখে বললো,
— জেকে যা করতে চাইছে,সেটা ওকে করতে দে অর্নব।
অর্নব এলিসার দিকে তাকিয়ে ছলছল নয়নে বলে ওঠে,
— তুই বললে, আমি সব কিছু করতে রাজি জান, তুই শুধু একবার বল জেকের সাথে আমারটাও...
অর্নব আর কিছু বলবে তার আগেই নিজের তিন ইঞ্চি হাই হিল নিয়ে অর্নবের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পরলো এলিসা, অতঃপর ওর কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে মেকি হেসে এলিসা শুধায়,
—- কি যেন বলছিলি? আবার একটু বল। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়েছে, সূর্যের আলো পুব আকাশ থেকে পশ্চিমে গিয়ে ঠেকেছে। অরু এখনো মেঝেতে বসে বিছানায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। অনেকক্ষন ধরে একটানা কাঁ'দার ফলে ক্ষনে ক্ষনে কেঁপে

উঠছে ওর ক্রন্দনরত ছোট্ট শরীরটা। তখন আপার সাথে রাগ করে কি বলতে কি বলেছে, কাকে বলেছে কিছুই মাথায় ঢোকেনি। অথচ এখন সেসব কথা মনে পরলেই ইচ্ছে করছে নিজের মাথায় নিজেই বা'রি মে'রে বেহুস হয়ে যেতে। সবার সামনে কতোটা নির্লজ্জের মতো সায়রকে গিয়ে বিয়ের কথা বলছে ও। এখন ভাবলেও বিরক্তিতে শরীরটা চিড়বিড়িয়ে উঠছে, সবাই কি ভেবেছে, কে জানে? যে যা ভাবার ভাবুক, তবে অরু ঠিক করেই নিয়েছে সায়রের মুখোমুখি আর এ জীবনে হবে না ও। কি করেই বা হবে, সায়রকে দেখলেই তো নিজের করা মস্তবড় বোকামির কথা বারবার মনে পরে যাবে। সকালের কর্মকান্ডের কথা ভেবেই হাত পা ছড়িয়ে আরও এক দস্তুর কেঁদে ভাসালো অরু।তারপর মনে মনে ভাবলো,—আপাকে আরেকবার কল করে দেখলে কেমন হয়?এখন তো রাগ কমেও যেতে পারে।
যেই ভাবা সেই কাজ অরু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বিছানার আসেপাশে ক্রীতিকের মোবাইলটা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু মোবাইলের যায়গায় অন্যকিছু হাতে এলো ওর, নরম বিছানায় মাথার পাশেই যে কুশনটা রাখা থাকে তারপাশেই ওর রুপোলি নুপুরটা আঁকাবাকা হয়ে পরে আছে, এতো বছর ধরে পায়ে পরে থাকা নিজের সুপরিচিত নুপুরটা দেখে অরু দ্রুত গিয়ে সেটাকে হাতরে নিলো,হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বললো,
— আরে এটাতো আমার নুপুর, এলিসা আপুর জন্মদিনের পার্টিতে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এটা ওনার কাছে কি করে এলো? আর ওনার কাছে যদি থাকবেই তাহলে সেদিন কেন জিজ্ঞেস করলো, আমার নুপুর কোথায়? আশ্চর্য মানুষ তো, আমার নুপুর দিয়ে ওনার কি

কাজ?একমনে কথাগুলো বলে অরু পা বাড়িয়ে দেয় নিজ হাতে নুপুরটা পরার জন্য। ঠিক তখনই বাইরে থেকে আগমন ঘটে ক্রীতিকের, ও হুর মুড়িয়ে রুমে প্রবেশ করে বেডসাইড টেবিল থেকে কিছু কার্ড নিজের ওয়ালেটে ভরে নেয়, অতঃপর অরুর হাতে হ্যাচকা টান মে'রে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে,
— চল।
অরু ভ্রু কুঞ্চন করে বললো,
— চল মানে, কোথায় যাবো?
ক্রীতিক জবাব দেয়না কোনোরূপ, বরং ওকে জোর জ'বরদস্তি করে টা'নতে টান'তে বাইরে নিয়ে যায়,
— হাত ছাড়ুন লাগছে আমার, আরে আমার নুপুরটা ফেলে এসেছিতো, ছাড়ুউউন।
কে শোনে কার কথা, ক্রীতিকের স্থবির চোখমুখ আর ভাবমূর্তি দেখে মনে হচ্ছে এই মূহুর্তে ওর শ্রবনশক্তিই হারিয়ে গিয়েছে। একমনে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগরের সামনে এসে দাড়িয়েছে তার হদিস নেই অনুর। মাথার উপর গোল্ডেন গেইট ব্রীজ। তাতে হাজারো মানুষের ঢল আর তার নিচে সুবিশাল সমুদ্র তট। এখানেই তো প্রথমবার প্রত্যয়ের বুকে মাথা রেখেছিল অনু, কতটা প্রশান্তি, আর কতটা আবেগাপ্লুত হয়ে প্রত্যয়ের উপর নিজের ক্লান্ত শরীরের ভার ছেড়েছিল, প্রত্যয়ের আন্তরিকতা মাখা হাসি, মাথায় বুলানো আদুরে হাতের পরশ, রাতের আধারে একান্তে বৃষ্টিস্নান, সব কিছুই কি তাহলে মিথ্যা ছিল? প্রত্যয় তার সাত বছরের ভালোবাসা ভুলে যেতে, কেবলমাত্র ওকে ইউজ করছে এটাই কি সত্যি? তিন্নি নামক মেয়েটা কি সত্যি

বলছে? অনু কি তবে শুধুই অন্য একজনার যায়গা পূরন করে ইউজ হয়েছে মাত্র ? “ইউজ” শব্দটা সেই সকাল থেকেই মাথার মধ্যে গেড়ে বসে আছে ওর। কিছুতেই শব্দটাকে সরানো যাচ্ছে না মাথা থেকে। ইউজ শব্দটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই অনুর মনে পরে যায় সকালের কথা, নিজের ব্যাতিগ্রস্থ হৃদয়কে সামাল দিতে না পেরে সকাল বেলা যা নয় তাই বলেছে অরুকে। নিজের ছোট্ট বোনের প্রতি এরূপ জঘ’ন্য আচরণ করে, প্রত্যয়ের উপর জমে থাকা রাগ অরুর উপর ঢেলে এখন অনুশোচনায় বুক ফেটে কা’ন্না আসছে অনুর। কি করছে অরু?ঠিক আছেতো? নাকি আপার উপর অভিমান করে ভুলভাল কিছু করে বসেছে ওর ডানপিঠে বোনটা? হাজারো অজানা প্রশ্ন এসে বারি খাচ্ছে অনুর মস্তিষ্কে, ও আর ভেবে সময় নস্ট করতে পারলো না, তৎক্ষনাৎ অরুর সাথে কথা বলার জন্য দ্রুতই ফোন বের করে কল লাগালো ক্রীতিকের নাম্বারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বারবার ফোন করার পরেও কেউ ফোনটা তুলছে না, কি করে তুলবে? ফোনটা যে সেই সকাল থেকেই মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।
এদিকে অরুকে কলে না পেয়ে শব্দ করে কাঁ’দতে কাঁ’দত অনু বসে পরে বালু আস্তরিত স্যাতস্যাতে বেলাভূমিতে। সন্ধ্যা রাতে রিসোর্টের সামনে বাইক থামিয়ে, অরুর বাহু ধরে একপ্রকার টে’নে বাইক থেকে নামালো ক্রীতিক। অরুর চোখ মুখ বিমর্ষ। ওর গালে পাঁচ আঙুলের দা’গ সুস্পষ্ট। মাথাটা নুইয়ে রেখেছে সেই কখন থেকে। ক্রীতিক নিস্প্রভ চোখে অরুর দিকেই ধ্যানমগ্ন হয়ে চেয়ে আছে। ওর কাছে এই ফোলা ফোলা চোখের অরুকে বরাবরই সুন্দর লাগে, আজ মনে হচ্ছে আরও একটু বেশি সুন্দর লাগছে। অরুর পরনে ছিল

সুতির ঘাগড়া আর ওভার সাইজ টপস,টপস এর উপর বানজারা কারুকাজের কোটি, লম্বা হাটুসম চুল গুলো ঢিলেঢালা করে হাতখোঁপা বাধা, এতোক্ষণ ধরে হেলমেট পরে থাকায় খোঁপাটা মনেহচ্ছে আরও ঢিলে হয়ে গিয়েছে, এখনই খুলে পরবে পরবে ভাব। দুধে আলতা রাঙা মুখটা কেঁ'দে কে'টে লাল বর্ণ ধারণ করেছে, তবে সন্ধ্যারাতের হ্যাজাকের আলোয় এই লাল লাল চেহারায় বরই মায়াবী লাগছে তাকে। যে কেউ দেখে বলবে নতুন বিয়ের ছিড়ি জেগেছে মেয়ের মুখে।খানিকক্ষণ বাদে ওদের পেছন পেছন উবার থেকে নেমে এলো এলিসা, অর্নব আর সায়র ও। কারও মুখে টু শব্দ নেই ওদের | চারিদিকে পিনপতন নীরবতা। অরু চুপচাপ মাথা নুয়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই তখন থেকে , গলায় রজনীগন্ধা আর গোলাপ দিয়ে তৈরি তাজা ফুলের মালা, হাতেও একটা ঝুলানো, এটা বোধ হয় ক্রীতিকেরটা। অরুর মলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে এলিসা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, বন্ধুর বেলাতে বরাবরই ওরা সার্থপর হয়ে যায়, আজও তাই হয়েছে। তবে এখন অরুকে ভেতরে নিয়ে কিছু খাওয়ানো উচিৎ মেয়েটা সারাদিন না খেয়ে আছে। তাই চারিদিকের নিরবতা ভেঙে এলিসা বলে ওঠে,— তোরা কি সারারাত এখানে দাড়িয়ে থাকার প্ল্যান করেছিস? যদি তাই হয়, তাহলে দাড়িয়ে থাক, আমি আর অরু ভেতরে গেলাম।
ওরা সবাই এখনো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এলিসা অরুকে সাথে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালে, পেছন থেকে ক্রীতিক ডেকে ওঠে ওদের,
— এলিসা শোন।

এলিসা ঘুরে দাড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর পানে চাইলে, ক্রীতিক একটা সাইন করা চেকের পাতা এলিসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,— এটা অরুর মোহরানার টাকা, ওকে দিয়ে দিস।
এলিসা হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে চেক টা হাতে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। ওদিকে ক্রীতিকের কান্ডে সায়র আর অর্নব অবাকের চড়ম সীমানায় গিয়ে চোখাচোখি করে দুজনে একই সুরে বলে উঠলো, — পৃথিবীতে এটাই বোধ হয় প্রথম বিরল ঘটনা, যেখানে স্বামী তার বউকে মাঝরাস্তায় দাড়িয়ে মোহরানা উশুল করে দিলো। ওদের কথায় ধ্যান নেই ক্রীতিকের, ওতো সেই কখন থেকে বাইকে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে , অরুর যাওয়ার পানে তাকিয়ে আছে। অরু চলে গিয়েছে বহুক্ষণ আগে, তবুও তাকিয়ে আছে। অদুরে কোনো এক বাঙালি ক্যাফে থেকে তখনও কানে ভেসে আসছে বেসুরো দুটো লাইন,
“আমার কাছে তুমি অন্যরকম
ভালোবাসি বেশি, প্রকাশ করি কম”চারিদিক জনমানবশূন্য হয়ে আছে, বিস্তৃত তিমিরে ঢাকা কালো রাতের ইতি টেনে সবে সবে ভোরের আলো ফুটেছে ধরনীতে। সূর্য এখনো তার তে’জস্ক্রিয়তা ছড়ায়নি পুরোপুরি ,প্রকৃতিতে হীম ধরা শীতল পরিবেশ বিরাজমান।
হাইওয়ে রাস্তার অদূর থেকে ভেসে আসছে দু একখানা কাভার্ড ভ্যানের শাঁইশাঁই আওয়াজ। রাস্তার দু’পাশে স্থীর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারিসারি বৈদ্যুতিক খুঁটির মাথায় বসেছে জোড়ায় জোড়ায় বন্য পাখিদের ঝাঁক। একের পর এক বন্য পাখিদের চোখের আড়াল করে নিভু নিভু ভোরে ফাঁকা রাস্তার মাঝ দিয়েই আপন গতিতে

এগিয়ে যাচ্ছে ক্রীতিকের চার চাকা ব্ল্যাক মার্সিডিজ। গন্তব্য সানফ্রান্সিসকো ছাড়িয়ে নিজের নির্জন ছোট্ট বাড়িটা। এখন অবশ্য শুধু নিজের বলা যায়না, যেহেতু ও একজনের সারাজীবনের দায়িত্ব নিয়েছে,সেহেতু ক্রীতিকের যা তাতো তারও বটে।এই হীম ধরা ঠান্ডার মাঝেও গাড়ির জানালার গ্লাস খুলে তাতে দু'হাত রেখে তারউপর চিবুক ঠেকিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে অরু। যদিও ক্রীতিক কা'ন্নাকাটি একদম পছন্দ করেনা, কিন্তু তাতে আপাতত অরুর হেলদোল নেই, জীবনটাই যেখানে এলোমেলো করে ছেড়ে দিয়েছে,সেখানে পছন্দ অপছন্দ দিয়ে কি আসে যায় আর?ক্রীতিক কি ভাববে সেসব কথা মাথায় না ঢুকিয়ে, এয়ারপোর্ট থেকে বেড়িয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়িতে ওঠার পর থেকেই কেঁদে ভাসাচ্ছে সে। মুখমন্ডল জুড়ে তার আকাশসম দুঃখের ছড়াছড়ি।

অরু প্যাসেঞ্জার সিটে বসা সত্ত্বেও পা'দুটো তুলে রেখেছে সিটের উপর । ও আরাম করে বসে আছে দেখে ক্রীতিকও বুঝে শুনেই গাড়ি ড্রাইভ করছে আপাতত, যাতে অরুর কোথাও না লাগে। অরুর বাধনহারা রেসমের মতো লম্বা সিল্কি চুলগুলো ক্রমাগত উড়ে এসে আঁচড়ে পরছে ক্রীতিকের চোখে মুখে, মাঝেমধ্যে ড্রাইভ করতেও অসুবিধা হচ্ছে খুব, তবুও ক্রীতিক কোনো কিছুরই পরোয়া করছে না, কারন ওর কাছে এই চুলের মিষ্টি গন্ধটা হৃদয় জুড়িয়ে দেওয়ার মতোই প্রশান্তিদায়ক। দরকার পরলে এক ঘন্টার রাস্তা দুই ঘন্টায় অতিক্রম করবে তবুও নিজের শরীর থেকে অরুর চুল সরাবে না।কিন্তু অরুতো সেই ভোর রাত থেকেই বাইরে মুখ দিয়ে বসে আছে, বাইরের হীম ধরা পুরো ঠান্ডাটা ওর চোখেমুখে এসে হা'মলে পরছে, এরকম ঠান্ডার মধ্যে বাইরে মুখ দিয়ে আরও কিছুক্ষন বসে

থাকলে বাড়িতে যেতে যেতেই অরুর নিউ'মোনিয়া হয়ে যাবে নিশ্চিত। তাই ক্রীতিক এবার একহাতে ড্রাইভ করতে করতেই অন্যহাত দিয়ে জানালার কাঁচ টা তুলে দিলো।
জানালার কাঁচ টেনে দেওয়াতে একটু পিছিয়ে বসেছে অরু, তবুও কা'ন্না থামায়নি। চোখ দিয়ে তার এখনো গঙ্গা যমুনা বয়ে যাচ্ছে।
অরুকে এখনো কাঁদ'তে দেখে সামনে ফোকাস করেই বিরক্ত ভঙ্গিতে কথা ছো'ড়ে ক্রীতিক,— কাঁদছিস কেন এভাবে? মে'রেছি তোকে?
ক্রীতিকের কথার পেছনে অরু মৌনতা পালন করে, শুধু মনেমনে বলে,
— এর থেকে মা'রলে বেশি ভালো হতো।
একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, সেই কখন থেকে চুপ হয়ে আছে অরু, আদৌও উত্তর দেবে বলেও মনে হচ্ছে না। গতকাল থেকেই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে মেয়েটা। ক্রীতিক জানে কাকে কিভাবে কথা বলাতে হয়, তাই ও খানিকটা কৌশলী পন্থা'ই অবলম্বন করলো। হুট করেই মাঝরাস্তায় গাড়ির ব্রেক কষলো। এভাবে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অরু হকচকিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো,— এসে গেছি?
কথাটা বলে বাইরে তাকিয়ে যেই দেখলো এটাতো মাঝরাস্তা, তৎক্ষনাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রীতিকের পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অরু। ওর চাহনিকে পাত্তা না দিয়ে,গাড়ির ড্রয়ার থেকে একটা রুপোর নুপুর বের করে সেটাকে চোখের সামনে ধরে ক্রীতিক শুধালো,
—এটা তোর?
ক্রীতিকের প্রশ্নে অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ায়।

— চাই এটা?
এবারও অরু উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে হ্যা বললো।
— তাহলে গাড়ি থেকে নাম।
ক্রীতিকের শেষ বারের কথায় অরু চোখ কপালে তুলে বললো,
— নামবো মানে? এই অচেনা রাস্তায় আপনি আমায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন?
— ইডিয়েট।
অস্ফুটে কথাটা বলে ক্রীতিক নিজেই গাড়ি থেকে নেমে গেলো। অরু ক্রীতিকের যাওয়ার পানে চোখ রেখে বুঝলো এটা একটা পেট্রোল পাম্প। তারপাশেই ছোটখাটো একটা মার্ট, হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু কিনতে গিয়েছে সে। খানিকক্ষণ বাদে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল হাতে নিয়ে ফিরে এলো ক্রীতিক। অতঃপর গাড়িতে বসে সেটা অরুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,
— বাইরে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে আয়, তোকে পেত্নীর মতো দেখাচ্ছে, আমি রীতিমতো ভ'য় পাচ্ছি।
ক্রীতিকের কথাটা অরুর মোটেই পছন্দ না হলেও, এই মূহুর্তে চোখে মুখে আদতে একটু পানি ছিটানো প্রয়োজন, তাই গাইগুই না করে লম্বা চুল গুলোকে হাত খোঁপা বেধে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো অরু। চোখে মুখে ইচ্ছে মতো পানির ঝাপটা দিয়ে, নাক টেনে নিজেকে একটু সাভাবিক বানিয়ে পুনরায় গাড়িতে ফিরে এলো ও। অরু গাড়িতে বসতেই ওর দিকে টিস্যু এগিয়ে দিলো ক্রীতিক। অরু টিস্যু দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো,— এবারতো দিন, নুপুরটা আমার ছোট বেলার স্মৃতি ।
— নুপুরটা নিয়ে যাওয়া কি খুব দরকার? পরে নিলে হয়না?

ক্রীতিকের কথায় অরু আচমকা দৃষ্টিপাত করলো ওর চোখের দিকে, মনেমনে বললো,

— আশ্চর্য, আমার নুপুর দিয়ে ওনার কাজটা কি?

অরুর ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে একটানে ওর পা দুটো নিজের উরুর উপর তুলে নিলো ক্রীতিক। এভাবে পা তুলে ফেলায় অকস্মাৎ পেছনে ঝুঁকে গেলো অরু, পুরো গাড়ি জুড়ে তখনও পিনপতন নীরবতা বিরাজমান । যার দরুন অরুর তীব্র শ্বাসপ্রশ্বাস আর হঠাৎ বেড়ে যাওয়া হৃদস্পন্দনের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ক্রীতিক ।অরুর এহেন পরিস্থিতিকে গ্রাহ্য না করে, আলতো হাতে ওর পায়ে নুপুর পরানো শুরু করে সে। নিজ পায়ে ক্রীতিকের হাতের নরম স্পর্শ অনুভব হতেই ঠোঁট কামড়ে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে অরু । নিজের এলোমেলো অজানা অনুভূতিতে বিরক্ত ও। যা সম্ভব নয় তাই সম্ভব করে ছেড়েছে ক্রীতিক। কিন্তু অরুকেই কেনো ব'লির পাঁঠা বানিয়ে এইরকম একটা অসাভাবিক সম্পর্কে জড়ালো সে?কেন অরুর সাথে সাথে নিজের জীবনটাকেও অগ্রহনযোগ্য সম্পর্কের মাঝে ঠেলে দিলো?কি চাইছে ক্রীতিক? এভাবে অরুর জীবনটা নষ্ট করে কোন ভুলের শোধ নিলো সে? একটা দু'টো নয়, অরুর মনে হাজারো দানা বাঁধা প্রশ্নের ছড়াছড়ি। কিন্তু কে দেবে এতো প্রশ্নের উত্তর?ক্রীতিক তো উত্তর দেওয়ার মতো ছেলেই নয়, অরুর প্রশ্নের তো মোটেই নয়। অথচ এখন এই মূহুর্তে কি সুন্দর করে মনোযোগ দিয়ে অরুর পায়ে নুপুর পরাচ্ছে সে। দেখে মনে হচ্ছে এর চেয়ে প্রয়োজনীয় আর সুক্ষ্ম কাজ কোনোদিন করেনি ক্রীতিক। অরু তখন থেকে হিজিবিজি চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে, চারিপাশে ওর খেয়াল নেই মোটেই । ক্রীতিক নিজের হাতের কাজটা

শেষ করে একপলক ভাবুক অরুর চোখের দিকে তাকালো, অতঃপর নিজের হাতের বাধনটা আরও শক্ত করে, ওর পায়ে অকস্মাৎ হ্যাচকা টান মে'রে অরুকে নিজের কাছাকাছি টেনে নিয়ে এলো। আচমকা পায়ে টান দেওয়াতে সুতির ঘাগড়াটা অনেকটা উপরে উঠে গিয়ে মোমের মতো সুন্দর পা'দুটো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ক্রীতিকের চোখের সামনে। ক্রীতিক শুষ্ক ঢোক গিলে সেদিকে একবার পরখ করে, চোখ ঘুরিয়ে অরুর অশ্রুসিক্ত নয়নে চোখ রাখলো,তারপর আরেকটু কাছে এগিয়ে গিয়ে, নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ওর চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিতে দিতে মাদকতায় নিবিষ্ট চাহনী নিক্ষেপ করে, দু'ঠোঁট নাড়িয়ে হাস্কি স্বরে বললো,— "বউ" ক্রীতিক খুব আস্তে করে শব্দটা উচ্চারণ করলেও অরুর শ্রবনেন্দ্রীয়তে তা স্পষ্ট ভাবে পৌঁছেছে, কথাটা শোনা মাত্রই অজানা শিহরণে শরীর ছেয়ে গেলো অরুর। কাটা দিয়ে উঠলো শরীরের প্রত্যেকটা লোমকূপ। অজান্তেই তলপেটের মাঝে ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দিলো অসংখ্য প্রজাপতির দল। ইশশ কি অসস্থিদায়ক অনুভূতি। অরুর কেমন কেমন লাগছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে মূহুর্তেই। ক্রীতিক এখনো একই ভাবে তাকিয়ে আছে। অরু আমতা আমতা স্বরে বলে উঠলো,

— আআমি পানি পান করবো।

অরুর কথায় ক্রীতিকের ঘোর কেটে যায়, ও মূহুর্তেই অরুর থেকে দুরত্ব বাড়িয়ে ড্রাইভিং এ মনোযোগ দেয়, ড্রাইভ করতে করতে মনেমনে ক্রীতিক ভাবছে,

—যাক কান্নাকাটি তো অন্তত থেমেছে।

ওদিকে অরু এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে পানি পান করে পুরো বোতল খালি করে ফেলেছে। তবুও কোনো কিছুর তৃষ্ণাতে হাসফাস করছে ভেতরটা, কি অদ্ভুত এই অনুভূতি, ক্রীতিক কি জাদু জানে?অনু ফ্রন্ট ইয়ার্ডেই দাড়িয়ে ছিলো। অরু অনুকে দেখা মাত্রই ফেঞ্চ গেইট ঠেলে ভেতর প্রবেশ করে দৌড়ে গিয়ে অনুর গলা জড়িয়ে ধরে হাউমা'উ করে কেঁ'দে ওঠে। অনু জানে অরুর এমন কান্নার কারন ও নিজেই। তাই নিজের কাজে বড্ড অনুতপ্ত অনু। অরুর এমন হৃদয় নিংড়ানো কা'ন্নার গতিবেগে অনুও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না,বোনকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে , ডুকরে কেঁ'দে উঠে অনু বলে,
—আপার উপর অভিমান করে এভাবে কাঁদিস না সোনা, আপা খুব সরি, আর কখনো তোকে এভাবে বকবো না, আমার ঘাট হয়েছে।
অনুর কথায় ক্রদনরত অরু এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়ায়। অরুর ভাব ভঙ্গিমা অনুর বোধগম্য হয়নি, তাই অনু পুনরায় নরম সুরে বললো,— বলেছিতো আর কখনো বকবো না এভাবে, এসেছিস থেকে কেঁদেই যাচ্ছিস, কি হয়েছে ক্রীতিক ভাইয়া কিছু বলেছে, দেখি আমার দিকে তাকা?
অরুর গাল দুটো আঁজলা করে ধরে, মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে অনু আবারও শুধায়,
—- ক্রীতিক ভাইয়া কিছু বলেছে?
অনুর প্রশ্নে অরু পেছনে দৃষ্টি নিক্ষেপন করে, তাকিয়ে দেখে ক্রীতিক নেই, হয়তো ভেতরে চলে গিয়েছে অনেক আগেই। তারপর পুনরায় অনুর দিকে তাকিয়ে না সূচক মাথা নাড়িয়ে নাক টেনে অরু বলে,
— কেউ কিচ্ছু বলেনি।

অনু নিশ্চিন্ত হয়ে অরুর দু’চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললো,
— মায়ের অ’পারেশন হয়ে গিয়েছে, এখন
আই সি ইউ তে আছে, দু’একদিনেই হয়তো চোখ খুলবে মা, তারপর আমরা মায়ের সাথে কথা বলতে পারবো, মাকে নিয়ে দেশেও ফিরে যাবো আর দুঃখ নেই।এতো বড় একটা খুশির খবরেও কেন যেন খুশি হতে পারলো না অরু, কি করে পারবে? গতকাল রাতেই নিজের সবটা সৎ ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে এসেছে। এসব কথা জানা জানি হলে মা আপা কেউই ওকে মেনে নেবেনা। ভালোবাসবে না। উল্টে নোংরা বলে আখ্যায়িত করবে। এতোগুলো দিন পরে একটু খানি খুশির মুখ দেখেছিল ওর পরিবারটা, অথচ অরু সবার আড়ালে সেটা ধূ’লিসাৎ করে মাটিতে মিশিয়ে এসেছে। ক্রীতিক কেন করলো এমনটা?
নিজের ভাবনার মাঝেই,অরু তৎক্ষনাৎ মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ক্রীতিককে ও প্রশ্ন করবেই করবে, তাতে যা খারাপ হওয়ার হোক। তাছাড়া ক্রীতিক তো ওর সাথে খারাপ কোনো কিছু করার বাদ রাখেনি, তাহলে এতো ভ’য় কিসের?
অরুর অজ্ঞাত ভ্রমকে ভাঙিয়ে দিয়ে ফ্রেঞ্চ গেইট ঠেলে আগমন ঘটে প্রত্যয়ের। প্রত্যয়কে দেখে অরু এক নজর অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হেটে বাসার ভেতরে চলে যায়। অরু চলে গেলে অনু নিজেও পা বাড়ায় ভেতরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই মূহুর্তে প্রত্যয়ের সাথে কথা বলাতো দূরে থাক, ওর মুখটাও দেখতে ইচ্ছে করছে না অনুর।
কিন্তু পেছনে ঘুরে কয়েক কদম পা বাড়াতেই প্রত্যয় ওকে টেনে ব্যাক ইয়ার্ডে নিয়ে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে। প্রত্যয়ের এমন

কান্ডে অনু রেগেমেগে ঝাঁজিয়ে উঠে বলে,— কি অস’ভ্যতা শুরু করেছেন, বাড়িতে ক্রীতিক ভাইয়া আছে।
প্রত্যয় ওর মুখটা শ’ক্ত হাতে চেপে ধরে বললো,
— শুউউ, ওই জন্যই তো বলছি আস্তে কথা বলো।
অনু ওর হাতটা ঝটকা মে’রে সরিয়ে দিয়ে বললো,
— কি চাই আপনার, আমাকে ইউজ করে স্বাধ মেটেনি? নাকি তিন্নির সাথে আজ দেখা হয়নি? তাই রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমার কাছে এসেছেন।
প্রত্যয় চটে আছে খুব, মেয়েটার তেজের সাথে কিছুতেই পেরে ওঠেনা সে, কিন্তু এই মূহুর্তে অনুর ব্লে’ডের মতো ধারা’লো কথার আ’ঘাতে র’ক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে হৃদয়টা, সেইসাথে মস্তিষ্ক হয়ে উঠেছে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। প্রত্যয় নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে, চড়াৎ করে তুঙ্গে উঠে যাওয়া মেজাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো তৎক্ষনাৎ, অনুর হাতদুটো মাথার উপরে তুলে দেওয়ালের সাথে চে’পে ধরে, ওর গলার কাছে মুখ নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে প্রত্যয় বলে,— কথা না শুনলে জা’নে মে’রে ফে’লবো। গত দুদিন ধরে কু’কুরের মতো পিছনে পরে আছি, কিছু একটা এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছি। একবারও সুযোগ দিয়েছো আমায়? এতো তেজ কেনো তোমার?
প্রত্যয় এই প্রথমবার অনুকে তুমি করে অধিকার খাটিয়ে কথা বললো। প্রত্যয়ের মুখের তুমি আওয়াজটা যে এতোটা সুমধুর তা অজানাই ছিল অনুর। প্রত্যয়ের মুখে তুমি শুনে হতবাক হয়ে ওর চশমার আড়ালে ধূসর চোখ জোড়ার দিকে বিনাবাক্যে তাকিয়ে আছে অনু।
একটুখানি থেমে প্রত্যয় পুনরায় কঠিন সুরে বললো,

— আর কি যেন বললে, ইউজ। ইউজ করা কাকে বলে সেটা কি আদৌও বোঝো তুমি? নাকি বুঝেই যাকে তাকে গিয়ে এসব বলো?অনু এবারও পুরোপুরি নিশ্চুপ, ও ধ্যানমগ্ন হয়ে চেয়ে আছে প্রত্যয়ের চোখে।
অনুকে তখন থেকে এভাবে অবাক নয়নে চেয়ে থাকতে দেখে রা'গী আওয়াজটা মূহুর্তেই নিচু হয়ে গেলো প্রত্যয়ের, চোখ দুটোতে হিং'স্রতার জ্বল'ন্ত অ'ঙ্গার দপ করে নিভে গিয়ে তাতে জড়ো হলো একরাশ মুগ্ধতা। এলোমেলো অনুভূতি গুলো উথাল-পাতাল ঢেউ তুলে আঁচড়ে পরছে মনের তটে। অনু এতোটা কাছে দাড়িয়ে আছে, এতোটা কাছে,যে ওর তপ্ত নিঃশ্বাস গুলো প্রত্যয়ের মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পরছে বারেবারে ।এবার আর কোনো কথা নয় অনুর নিস্প্রভ চোখে একপলক চোখ রেখে প্রত্যয় নিজের খেইর হারিয়ে ফেললো। মূহুর্তেই নিজের ওষ্ঠাগত করে নিলো অনুর তিরতির করে কাঁপতে থাকা অধর যুগল। অনুর ঠোঁটের ছোঁয়ায় হঠাৎ করেই যেন উন্মাদনা ছড়িয়ে পরলো প্রত্যয়ের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অনুর দিক থেকে কোনোরুপ বাঁধা না আসাতে, পরম আবেশে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো আপনা আপনি।
এদিকে প্রত্যয়ের নরম ঠোঁটের স্পর্শে অনুর জান যায় যায় অবস্থা। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে স্থীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও পরক্ষণেই দু'হাত দিয়ে প্রত্যয়কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তরিৎ গতিতে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালো অনু। অনুর ধাক্কায় প্রত্যয় নিজের সম্বিত ফিরে পেয়ে, নিজের কর্মকান্ডের জন্য লজ্জিত হয়ে নরম সুরে বললো,— আ…আ'ম সরি।আসলে..
অনু ওকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে না ঘুরেই জবাব দিলো,

— সরি বলতে হবে না আপনি যান এখন।
আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই অনু, একান্তে, আমায় কি একটু খানি সময় দেওয়া যায়না?
অনু এবার ঘুরে দাড়িয়ে প্রত্যয়ের মুখোমুখি হয়ে শুধালো,
— প্রত্যয় সাহেব, আপনি শুধু আমার তাইতো?
প্রত্যয় সেদিনের মতোই কন্ঠে দৃঢ়তা টেনে বললো,
— হান্ড্রেড পার্সেন্ট।
—আগামী কাল বিকেলে সি-বিচে অপেক্ষা করবো।
অনুর এইটুকু আস্কারা পেয়ে প্রত্যয় যেন চাঁদ হাতে পেয়েছে। খুশির ঝিলিক ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। প্রত্যয়কে এভাবে নিঃশব্দে ঠোঁট কামড়ে হাসতে দেখে, অনু ভেতরে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে আবারও পেছনে তাকিয়ে বললো,
— আর হ্যা, বাবল টি আনতে ভুলবেন না যেন।
প্রত্যয়ের নরম হাসি এতোক্ষণে পুরো ঠোঁট জুড়ে প্রসারিত হলো, ও পেছন থেকে হাঁক পেরে বললো,
— যথাআজ্ঞা মহারানী। মাঝরাতে ফেইরী লাইটের নিভু নিভু আলো আর সুইমিং পুলের নীলচে পানির কলকলানি মিলেমিশে পুরো ছাঁদ বারান্দা জুড়ে ম্যাজিক্যাল আলোছায়া তৈরি করেছে। মাথার উপর খোলা আকাশ, আকাশে রুপোর থালার মতো মস্তবড় চাঁদ উঠেছে । কখনো কখনো সেই চাঁদ ঢেকে যাচ্ছে, পেঁজা তুলোর মতো উড়ো মেঘে। আবার কখনো তীর্যক রুপোলী আলো ছড়াচ্ছে,পুরো ভুবন জুড়ে। চাঁদের দিকে নিকোটিনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেটাই তখন থেকে বেশ আগ্রহ নিয়ে পরখ করছে ক্রীতিক। রাত প্রায় দু'টো বেজে পয়ত্রিশ তাও চোখের পাতায় ঘুম আসার নাম নেই,

তাইতো রুম থেকে বেরিয়ে ছাঁদ বারান্দায় এসে সিগারেট ধরিয়েছে সে। সিগারেটের কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়ার সাথে সাথে উড়িয়ে দিচ্ছে নিজের মনে জমানো অজস্র অযাচিত ভাবনা গুলোকে, অবশ্য এখন আর ভেবে লাভটাই বা কি?অরু তো সারাজীবনের জন্য ওর।
অরু নামটা ভাবতে যতটা দেরি হলো অরুর সেখানে উপস্থিত ততটা হতে দেরি হলোনা। নিশুতি রাতে কারও নিস্তব্ধ পায়ের আওয়াজ পেয়ে ক্রীতিক পেছনে ঘুরে দেখলো অরু দাঁড়িয়ে আছে।
পরনে খয়েরী রঙের সুতির চুড়িদার লম্বা চুল গুলো দিয়ে টুপটাপ করে পানি ঝড়ে শরীর ভিজে যাচ্ছে, তাতেও হেলদোল নেই অরুর, চোখে মুখে চড়ম বি'ষন্নতার ছাপ স্পষ্ট। হাত পায়ের ফর্সা ত্বকগুলো ফ্যাকাসে হয়ে কুঁচকে আছে, মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে পানিতে ভিজেছে, অরুর এমন উদভ্রান্তের মতো মুখশ্রী দেখে ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে শুধালো,— এতো রাতে শাওয়ার কেন নিয়েছিস? কি প্রয়োজনে?
অরু জবাব দেয়না, চুপচাপ গিয়ে দাঁড়ায় ক্রীতিকের মুখোমুখি হয়ে, ক্রীতিকের পরনে কালো হুটি আর ওভার সাইজ ডেনিম। অরু নিস্প্রভ চোখে ক্রীতিকের কালো কুচকুচে হুডিটার দিকে চেয়ে আছে চুপচাপ , ওর কর্মকান্ড দেখে ক্রীতিক বিরক্ত ভঙ্গিতে বললো,
— এতো রাতে না ঘুমিয়ে এখানে কি? আমার সাথে ঘুমাবি? ঘুমালে চল আমিও একটু আরাম করে ঘুমাই।
ক্রীতিকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত দিয়ে ওর পেশিবহুল বুকের উপর ধা'ক্কা দিয়ে অরু কাঁদতে কাঁদত বললো,— কেন করলেন এটা? কি দোষ করেছি আমি? কোন দোষের শা'স্তি সরুপ

আমার জীবনটা এভাবে তছনছ করে দিলেন আপনি? বলুন কেন? কি হলো বলুন?
এবার, দু'বার, তিনবার যখন ক্রীতিকের বুকের উপর অরু ধা'ক্কা দিতে যাবে, তখনই ওর দু'হাত শক্ত করে চেপে ধরে ক্রীতিক। চেহারায় গাম্ভীর্য টেনে এনে, কঠিন সুরে বলে,
— যা করেছি, খুব ভেবে চিন্তে ঠান্ডা মাথায় করেছি, এবার এটা যত তারাতাড়ি মেনে নিবি ততই তোর জন্য মঙ্গল।
ক্রীতিকের কথায় অরু ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
— আপনি কি পা'গল? আপনার বাবা জামশেদ জায়ান চৌধুরী আমার মায়ের প্রয়াত স্বামী। সে হিসেবে আপনি আমার সৎ ভাই, কিভাবে ভুলে গেলেন এটা?
অরু কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক টান মে'রে একহাতে ওর কোমড় জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে শ'ক্ত করে ওর গালদুটো চে'পে ধ'রে বললো,— খবরদার নিজেকে আমার বোন বলবি না, একদম মে'রে ফে'লবো, তুই আমার বিয়ে করা বউ, তোর সব কিছু আমার, তোর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এভরিথিং ইজ বিলোংস টু মি।
তীব্র রা'গে কাঁপতে কাঁপতে কথাটুকু শেষ করে অরুকে ধা'ক্কা মে'রে সরিয়ে দেয় ক্রীতিক।
ক্রীতিক ছাড়তেই অরু কাঁ'দতে কাঁ'দতে মেঝেতে বসে পরে, অতঃপর হেঁচকি তুলে অস্পষ্ট সুরে বলে,
—-সমাজ কোনোদিনও এই বিয়েকে সীকৃতি দেবেনা। উল্টে আমাকে নোং'রা বলে ধি'ক্কার দেবে। তখন নিশ্চয়ই খুশি হবেন আপনি?

ক্রীতিক হাঁটু গেড়ে ওর মুখোমুখি হয়ে বসে বললো,— আমি সমাজ মানিনা, আর যে সমাজ আমার বউয়ের দিকে আঙুল তুলে কথা বলবে আমি সেই সমাজই ধ্বং’স করে দেবো। আই রিপিট ধ্বং’স করে দেবো।
ক্রীতিকের কথা শুনে ওর চোখে চোখ রাখলো অরু, চোখ তো নয় যেন জ্ব’লন্ত আগ্নে’য়গিরির দাবানল। যে তাকাবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে। অথচ ফর্সা পুরুষালী তীক্ষ্ণ চোয়াল জোড়া মুখশ্রীটা কতোটাই না সুদর্শন। এক মূহুর্তের জন্য অরুর মনে হলো, এই অসম্ভব সুদর্শন মানুষটা ওর স্বামী, হুট করেই কেমন ক্রীতিককে অন্য নজরে আবিষ্কার করছে অরু। কয়েক মূহুর্তের জন্য নিজেকে বসিয়ে দিলো ক্রীতিকের বাম পাশে তার পত্নী রুপে। পরবর্তীতেই অন্যমনটা লাফিয়ে উঠে বললো,—না না এটা কি করে সম্ভব? এমন একটা রা’গী বদ মেজাজী, বেপরোয়া লোকের সাথে সারাজীবন কাটানো অসম্ভব।
কারন আর যাই হোক সারা জীবন ক্রীতিকের হাতে মা’র খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই অরুর।
— কি হলো?
হঠাৎ করে ক্রীতিকের কথায় ধ্যান ভাঙে অরুর, বেরিয়ে আসে নিজের দিবাস্বপ্ন থেকে। ছোট্ট করে জবাব দেয়,
–কিছু না।
ক্রীতিক ওর ভেজা চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে আসস্থ করে পুনরায় বলে,
— অনেক রাত হয়ে গিয়েছে ঘুমিয়ে পর। চিন্তা নেই পুরো দুনিয়া আমি দু’হাতে সামলে নেবো, তোর গায়ে কল’ঙ্কের আঁচও আসতে দেবোনা, এটুকু ভরসা রাখতেই পারিস,হার্টবিট।

ক্রীতিকের শেষ কথাতে অরু চকিতে মাথা তুলে বললো,— কিহ!
—বলেছি তুই আমার হার্টবিট।
…আআ, অরু কিছু বলবে তার আগেই ওর দিকে চোখ পাকিয়ে ক্রীতিক বললো,
— আর একটাও প্রশ্ন করবিনা, তাহলে মা’র খাবি।
অপারগ অরু আর কিইবা করবে, মা’রের ভয়ে চুপচাপ পা বাড়ায় নিজের জন্য বরাদ্দকৃত রুমের দিকে।
ক্রীতিক অরুর যাওয়ার পানে তাকিয়ে দ্বিতীয় বার বিড়বিড়ায়,
— হার্টবিট। নির্ঝঞ্জাট বিদ্যাপিঠ সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি। সানফ্রান্সিসকোর মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত এবং নামকরা হওয়াতে এই ভার্সিটিতে ফরেইনার শিক্ষার্থীদের অভাব নেই। সেই সাথে সাথে ফরেইনার প্রফেসরদেরও। তবে আজ ভার্সিটি ক্যাম্পাসে খুব একটা শিক্ষার্থীদের আনাগোনা নেই। এর কারন শীতের শেষ ভাগ চলছে যার দরুন সবাই সি’বিচ, জঙ্গল, পাহাড়, এথায় সেথায় ক্যাম্পিং এ গিয়েছে।
এখানকার শিক্ষার্থীরা বইয়ের পাতায় নয়, হাতে কলমে, কিংবা পর্যবেক্ষন করেও অনেক কিছু শেখে। সারাবছর তাদের ক্লাসরুমের বাইরেও অনেক কার্যক্রম থাকে। অরুও বিগত কয়েকমাসে অনেক কিছুই শিখেছে, অনেক কিছু লক্ষ করেছে,ভালোমন্দ দুটোই। আমেরিকার সংস্কৃতির মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যা শুনলে বা দেখলে গা ঘিনঘিন করে ওঠে, তার মধ্যে নিখিল ভাইয়ের রিলেশন শীপ অন্যতম। এখনো ক্রীতিকের বলা কথাগুলো মনে পরলে নাক সিকোয় উঠে যাচ্ছে অরুর। ভার্সিটির গেইট পেরিয়ে, নরম সবুজ ঘাসগুলোকে পায়ে মারাতে মারাতে হিজিবিজি ভাবনায় বিভোর

হয়ে আছে অরু। ওর পরনে চিকন কারীর সফেদ রঙের লং কুর্তি আর লেগিংস। কুর্তির উপরে এটে আছে লেডিস ডেনিম জ্যাকেট। লম্বা চুলগুলো পোনিটেল করে গার্ডার নিয়ে বাঁধা। ধীরগতিতে হাঁটার জন্য মাথাটাও নিচু হয়ে আছে সেই কখন থেকে।ওই জন্যইতো সায়নী যে সেই কখন থেকে ওর সাথে সাথে হাঁটছে অরুর তাতে হদিস নেই। এতোক্ষণ ধরে পাশেপাশে হাঁটার পরেও মেয়েটা একবার মাথা তুলে তাকালো না অবধি, কি এমন ভাবছে ও? মনেমনে বিরক্ত হয়ে, সোজা গিয়ে অরুর সামনে দাড়িয়ে খানিকটা গাল ফুলিয়ে সায়নী জানালো,
— কি এমন ভাবছো বলোতো? সেই তখন থেকে তোমার সাথে সাথে হাঁটছি খেয়ালই করছো না।
অরু চট করে ভ্রম থেকে বেরিয়ে মাথা তুলে বললো,— আরে সায়নী যে, কেমন আছো বলো?
— এতোক্ষণে জিজ্ঞেস করার সময় হলো?
— আ'ম সরি, একটু বেখেয়ালে ছিলাম।
সায়নী এবার বুঝতে পারার মতো করে হ্যা সূচক মাথা দুলিয়ে বললো,
— ইট'স ওকে, কিন্তু তুমি এতোদিন কই ছিলে?
কতদিন ক্যাম্পাসে আসোনা বলোতো?
সায়নীর কথায় অরুর মনে পরে যায়, সেই নিখিল ভাইয়ের সত্যি জানার পর থেকেই আর ভার্সিটির গেইট মারায়নি ও, তারপর আরও কত কিই'না হয়ে গেলো,জীবনটাই এখন এলোমেলো।— আবার কি ভাবতে বসলে?
অরু না সূচক মাথা নাড়িয়ে ছোট্ট করে বললো,

— কিছু না।
সায়নী এবার হাসির দ্বারা ঠোঁট প্রসারিত করে বললো,
— এ্যাই অরু, জেকে স্যারের কি খবর?
অরু ঠোঁট উল্টে বললো,
— ওনার কথা আমি কি করে জানবো, ওনাকে গিয়েই বরং জিজ্ঞেস করো।
সায়নী এবার ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো,
— তুমি ওনার স্টেপ সিস্টার ,তুমি জানবে নাতো কে জানবে? ঢং।
সায়নীর কথায় অরু কিঞ্চিত ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো, পরক্ষণেই সায়নী আবারও শুধালো,— বলোনা একটু, এতোদিন স্যার ভার্সিটিতে কেন আসেনি?
— আমি যতদূর জানি উনি ব্যাংকক গিয়েছিলেন।
অরুর উত্তর শুনে সায়নী বেশ খুশি হয়ে যায়, খুশি হয়ে অরুর হাত জড়িয়ে ধরে বলে,
— এই না হলে আমার ননদিনী, তুমি জানো জেকে স্যারকে আমি অনেক পছন্দ করি, কিন্তু বলার সাহস হয়ে ওঠেনা, শুনেছি ব্যাক্তি জীবনে উনি অনেক বেশি রাগী,আসলেই কি তাই?
সায়নীর কথার বিপরীতে অরু কিছু বলতে যাবে তার আগেই ওর চোখ আটকে যায় ক্যাম্পাসের অন্যপাশে পুলসাইডে কিছু মানুষের ভীরের মাঝে, সেখানে নিখিল ভাই ও উপস্থিত। তারা সবাই কোনো কিছু একটা নিয়ে বেশ উল্লাসে মেতে আছে। কিন্তু কি নিয়ে?
অগত্যাই সায়নীর দিকে তাকিয়ে উল্টে প্রশ্ন ছোড়ে অরু,
— আচ্ছা সায়নী ওখানে কি হচ্ছে?

সায়নী অরুর দৃষ্টিপাত অনুসরণ করে,সেদিকে একবার তাকিয়ে বললো,
— সাইন্টিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাংলাদেশী নিখিল ভাই ওদের গ্রুপের টীম লিডার হয়েছে, সেটারই সেলিব্রেশন করছে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে।— ওহ আচ্ছা।
অরুর কথার মাথায় সায়নী অবিশ্বাসের সুরে বলে,
— হি ইজ আ ভেরি ট্যালেন্টেড গাই। কত অল্প সময়েই কেমন টীম লিডার হয়ে গেলো। তারউপর দুই দুইটা সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড সবদিক থেকে সোনায় সোহাগা, আহা।
অরু মুখ ভঙ্গিমায় বিরক্তির ছাপ টেনে বললো,
— একজন মানুষের আবার দুইটা গার্লফ্রেন্ড হয় কেমন করে?
সায়নী কুটকুটিয়ে হেঁসে বললো,
— হয় হয়, আমেরিকাতে সব হয়, চাইলে তুমিও....
সায়নীর কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই,পেছন থেকে ডেকে উঠল কেউ,— অরোরা!
অরু জানে এটা কে হতে পারে, এই পুরো ক্যাম্পাসে অরোরা বলে ওকে একজনই ডাকে। কিন্তু ও এখন কিছুতেই এই মানুষটার মুখোমুখি হতে চায়না, তাই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে, না শোনার ভান করে চোখ খিঁচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই।
সায়নী পেছনে ঘুরে বললো,
— আরে নিখিল ভাই যে আপনি অরুকে চেনেন?
নিখিল হ্যা না কোনো উত্তর না দিয়ে স্মিত হেসে অরুর দিকে তাকিয়ে পুনরায় ডাকলো,
— অরোরা?

সায়নী সামনে দাড়িয়ে আছে,নিখিল ও এগিয়ে এসেছে, এবার আর ইগনোর করার সুযোগ নেই পেছনে ঘুরতেই হবে, কিছু করার নেই ভেবে নিখিলের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল অরু, এখনো পেছনে ঘোরেনি, ঘুরবে ঘুরবে ভাব, ঠিক তখনই কোত্থেকে যেনো বাজখাঁই কর্কষ আওয়াজ কানে ভেসে এলো ওর,

— অরুউউউ। আচমকা ক্রীতিকের আওয়াজ পেয়ে কেঁপে উঠলো অরু, তরিৎ গতিতে চোখ দুটো খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগলো তাকে, খানিক্ষন খোজাখুজির পর দেখলো ভবনের দোতলার অফিসরুমের করিডোরে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই কটমট করে তাকিয়ে আছে ক্রীতিক। ক্রীতিকের চোখের দিকে একপলক তাকিয়ে একটা শুষ্ক ঢোক গিলে সায়নীকে উদ্দেশ্য করে অরু বলে,

— চলো ক্লাসে যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এই বলে সায়নীর হাত ধরেই দ্রুত ক্লাসের দিকে পা বাড়ায় অরু। পেছন থেকে নিখিল ডেকে বললো,

— আরে অরোরা কথাটাতো শুনে যাও। নিখিল এখনো অরুর যাওয়ার পানে তাকিয়ে আছে, তখনই অন্যদিক থেকে একজন এসে নিখিলের উদ্দেশ্যে বলে,

— আরে ভাই তুমি এখানে, তোমার গার্ল ফ্রেন্ডদের কেউ ধা’ক্কা মে’রে পুলে ফেলে দিয়েছে। একটাও তো সাঁতার জানেনা, দু’টোই হাবুডুবু খাচ্ছে ।

নিখিল আশ্চর্য হয়ে বললো,

— কি বলছো? কে ফেললো?

—তাতো জানিনা, ভীরের মাঝে কে কাকে ধা’ক্কা দিয়েছে বলা মুশকিল, তুমি তারাতাড়ি যাও।

নিখিল হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে, দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করে। অরু, সায়নী, নিখিল সবাই যে যার মতো চলে গিয়েছে, যার ফলে নরম ঘাস আবৃত্ত যায়গাটা শূন্যই পরে আছে, দোতলার করিডোর দিয়ে ক্রীতিক এখনো সেই শূন্যস্থানের দিকে তাকিয়েই ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে। পায়ের স্যান্ডেল দুটো আঙুলের ভাঁজে নিয়ে খালি পায়ে সাগরের কোল ঘেঁষে হাটছে অনু। প্যান্টটা একটুখানি গুটিয়ে গোড়ালি থেকে উপরে তুলে, প্রত্যয়ও অনুর পাশাপাশি হাঁটছে। সাগর পারের চারিদিকে শঙ্খচিল আর পানকৌড়ির চিউ চিউ আওয়াজ, অনু বাবল টিতে একটা করে সিপ নিচ্ছে আর চোখ বন্ধ করে পাখির কলরব শুনছে। সেই কখন থেকে ওদের মাঝে নিরবতা বিরাজমান, অনেকক্ষণের নিরবতা ভেঙে সর্বপ্রথম প্রত্যয়ই বলে ওঠে ,

— তুমি না মানে আপনি, ভারী অদ্ভুত জানেন? কখন যে রে'গে যান, আর কখন যে ঠান্ডা হয়ে যান আমি নিজেই বুঝতে পারিনা, এতো মুড সুইং কেন হয়?

প্রত্যয়ের কথায় অনু শব্দ করে হেসে বললো,— ইউ ক্যান কল মি "তুমি"। এতো ইতস্তত কেন হচ্ছেন? আফটার অল উই কিসে'স ইচ আদার।

অনুর কথায় কালকের দৃশ্যপট ভেসে উঠলো প্রত্যয়ের চোখে, ও তৎক্ষনাৎ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললো,

— ইয়ে মানে তোমার কিছু জানার নেই?

অনু গম্ভীর গলায় বললো,

— হুম আছেতো, অনেক কিছু জানার আছে,

প্রত্যয় শুধালো,

— বলো কি জানতে চাও? সব বলবো তোমায়।নো লুকোচুরি।
—আমাকে ইউজ করা কেন হলো শুনি?আপনার লং টাইম লাভ হিস্ট্রি। তাহলে আমার প্রতি দূর্বলতা অনুভব করারই বা কারনটা কি?
অনুর অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর একসাথে দেওয়ার জন্য প্রত্যয় একটু রয়েসয়ে বললো,—প্রথমত তিন্নি আমার সাথে ভালোবাসার হাজারো প্রতিস্রুতি দিয়ে বছরের পর বছর চি'ট করেছে, জামাকাপড়ের মতো সুগার ড্যাডি চেঞ্জ করেছে, তাহলে ওর প্রতি আমার ভালোবাসাটা রইলো কোথায়? তাছাড়া ও হাইলি ড্রা'গ এডিক্টেড। এক কথায় বলতে পারও ওর জীবনে শুদ্ধ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এসবের কারনে তিন্নির প্রতি আমার ঘৃ'ন্য মনোভাব তৈরি হয়েছে আরও কয়েকবছর আগেই। আর এখন তো ওকে মনে রাখার প্রশ্নই ওঠেনা। ওকে মাঝে মধ্যেই আমার পা'গল মনে হয়, জানো? এতোদিন খবর ছিলোনা, যেই আমি বছর খানিক ধরে একটু মুভ অন করেছি। এখন আবার আঠার মতো পেছনে লেগে আছে। ওর কাজই বোধ হয় আমার জীবনটাকে অগোছালো করে দেওয়া। তবে হ্যা এরপর ও যদি দ্বিতীয়বার এমন কিছু করে আমি যথাযথ ব্যাবস্থা নেবো, আই প্রমিস।
একটুখানি থেমে বুকের ভেতরের চাপা নিঃশ্বাসটা উগড়ে দিয়ে, প্রত্যয় আবারও বলে,—এবার তুমি যদি বলো তুমিই কেন? সেটার উত্তর আমার জানা নেই। তোমাদের ভিসা টিকেট প্রসেসিং এ অসংখ্যবার তোমার ছবি দেখেছি আমি, তেমন কিছুই ফিল হয়নি, কিন্তু সেদিন ক্যাফেতে তোমার এক ঝলক হাসির মাঝে হারিয়ে

গিয়েছিলাম আমি। উত্তাল ঢেউয়ের পানে চেয়ে একমনে কথাগুলো বলে অনুর দিকে তাকিয়ে প্রত্যয় শুধালো,
— প্রেম তো অনেকের সাথেই হয়, ভালোবাসার মানুষ কয়জন হতে পারে বলো? অনু, তুমি কি আমার শেষ ভালোবাসা হবে?
— জানিনা।
প্রত্যয়ের মুখের উপর কথাটা বলে সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ঠোঁট কামড়ে মুখ টিপে হাসছে অনু।
প্রত্যয় ওর পেছন পেছন হেঁটে এসে বললো,
— এ্যাই মেয়ে, এতো মুড সুইং হয় কেন তোমার?
অনু পেছনে ঘুরে শুধালো ,— কেন ভ’য় করছে? সামলাতে পারবেন না?
প্রত্যয় ওর হাতের মাঝে হাত ঢুকিয়ে বললো,
— তুমি বিশ্বাস হয়ে থেকে গেলে, আমি নিঃশ্বাস দিয়ে হলেও সামলে নেবো।গোধূলি বেলা চলমান, তবে আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমাবস্যা রাত। পুরো আকাশ ঘুটঘুটে কালো মেঘে ছেয়ে আছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে ক্ষনে ক্ষনেই পশ্চিম আকাশ র’ক্তিম হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তারসাথে বাতাসের তান্ডব তো আছেই। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পরছে সেই বিকেল থেকেই রাতে বোধ হয় ঝড় আসবে।
ভার্সিটির গেইটের সামনে একটা কাক পক্ষিও অবশিষ্ট নেই। সবাই যে যার মতো চলে গিয়েছে। শুধু মাত্র অরুই ছাতা হাতে নিয়ে সেই কখন থেকে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বাসের এখনো সময় হয়নি, কিন্তু এই ঝড়ের মাঝে শেষ বাস আসবে কিনা সন্দেহ। ওদিকে বৃষ্টির তোপ ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে, হাতে ছাতা থাকা

সত্ত্বেও পায়ের দিকটা ভিজে গিয়েছে। অরু হাত দিয়ে জামা কাপড় থেকে বারবার বৃষ্টির পানিগুলো ঝেড়ে সরাচ্ছে। তখনই বিকট আওয়াজে হর্ন বাজিয়ে ভার্সিটির গেইট থেকে বের হয়, ক্রীতিকের কালোরঙা মার্সিটিজ। বাইরে ততক্ষণে ঝুম বৃষ্টি। ক্রীতিক অরুর সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, জানালার কাঁচ নামিয়ে নির্লিপ্ত কন্ঠে বললো,— উঠে আয়, রাত হলে ঝড় আরও বাড়বে আজ আর বাস আসবে বলে মনে হচ্ছে না।
থাইল্যান্ড থেকে আসার পর থেকেই ক্রীতিকের উপর মহা বিরক্ত অরু, না পারতে কথা বলেনা। এখনো বলতে ইচ্ছে করছে না। তাই ও দাঁড়িয়ে না থেকে চুপচাপ হাঁটা ধরে বৃষ্টিস্নাত রাস্তার ফুটপাত ধরে। কেন যেন মনের মাঝে জিদ চেপে বসেছে, ক্রীতিকের কথাটা কিছুতেই শুনবে না আজ। সবসময় ক্রীতিকের জিদের কাছে পরাজিত হয়ে ক্লান্ত অরু। ক্রীতিকের জিদের বসে করা কর্মকান্ড মনে পরতেই হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলো ও। পায়ের জুতা পানিতে ভিজে জপজপ আওয়াজ হচ্ছে, তবুও হনহনিয়ে হাঁটছে অরু। তবে বেশিদূর এগোনোর আগেই পেছন থেকে ওর ছাতাটা টান মে’রে নিয়ে নেয় ক্রীতিক। মাথার উপর থেকে ছাতা সরে যাওয়ায় কয়েকমূহুর্তের মাঝেই ঝুম বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে যায় অরু। ক্রীতিক ও তাই, ফর্মাল ড্রেসআপ, ব্ল্যাক সুজ,রিস্টওয়াচ সবকিছু ভিজে একাকার। হুট করে ছাতা কেড়ে নেওয়াতে অরু, ভ্রু কুঁচকে পেছনে ঘুরে দেখতে পায়, ওর হ্যালো কিটি ছাতাটার বেহাল দশা করে ছেড়েছে ক্রীতিক। সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভে’ঙে ডাস্টবিনে ছু’ড়ে মে’রে ক্রীতিক বললো,— এবার যা।

অরুও কম যায়না, ক্রীতিকের বাক্য শ্রবনের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মাঝেই হাটা ধরে সামনের দিকে, তবে দ্বিতীয়বার স্পর্ধা দেখিয়ে আর পার পেলোনা অরু, সামনের দিকে এককদম দিয়েছে কি দেয়নি তার আগেই ওর বুকের কাছের জামাটা খামচে ধরে ক্রীতিক। এভাবে হঠাৎ আ'ক্রমণে কেঁপে উঠে অরু হকচকিয়ে বলে,
— কি করছেন জামাটা ছিড়ে যাবে তো।
ক্রীতিক ওর কথায় পরোয়া না করে, অরুর চোখের দিকে নিজের বাঁজপাখির মতো তীর্যক চাহনি নিক্ষেপ করে বললো,
— কথা শুনছিস না,অনেক সাহস বেড়ে গিয়েছে দেখছি,আমার সামনে তেজ দেখাতে এলে, সোজা গাড়িতে নিয়ে বাসর সেরে ফেলবো। আর তুই এটা ভালো করেই জানিস, আমি যা বলি তাই করি, তাই নিজের ভালো চাইলে চুপচাপ গাড়িতে গিয়ে বস।
ক্রীতিকের লাগামহীন কথার পাছে গলার স্বর মূহুর্তেই ক্ষীণ হয়ে এলো অরুর। বরাবরের মতো এবারও ক্রীতিকের জিদের কাছে হেরে গিয়ে ভেজা শরীর নিয়ে চুপচাপ গাড়িতে বসে পরলো ও। অরু গাড়িতে বসতেই ক্রীতিক এসে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দেয়। বাইরের বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজ গাড়ির হাই কোয়ালিটির জানালা ভেদ মোটেই ভেতর আসতে পারছে না। চারিদিকে পিনপতন নীরবতা, শুধু একটু পরপর নিরবতা ভেঙে সশব্দে হাঁচি দিচ্ছে ক্রীতিক। হাঁচি দিতে দিতে চোখ, নাক লালচে বর্ণ ধারণ করেছে তার। সেই কখন থেকে মানুষটা একাধারে হাঁচি দিচ্ছে দেখে অরু একটু আগ বাড়িয়ে বলে,
— বৃষ্টিতে ভিজে আপনার ঠান্ডা লেগে গেলো বোধ হয়।
ক্রীতিক আবারও হাঁচি দিতে যেয়ে নিজেকে সংবরণ করে বলে,

— গত দুদিন ধরে জ্বর। তাই হয়তো বৃষ্টির পানিতে পুনরায় ঠান্ডা লেগে গিয়েছে।
ক্রীতিকের কথায় অরু বেশ অবাক হয়, একই বাড়িতে থাকে ওরা তিনজন, অথচ একটা মানুষের গত দুদিন ধরে জ্বর, ওরা সেটা জানেই না। আর ক্রীতিকই বা কেমন,জ্বর হলে মানুষ এতোটা সাভাবিক কি করে থাকতে পারে? মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে মানুষটার শরীর খারাপ, সবসময় সেই রা’গী রা’গী ভাব।উত্তাল প্রকৃতি রাত বাড়ার অপেক্ষা করেনি আর।সন্ধ্যা রাতেই শুরু করে দিয়েছে তীব্র ঝড়ের তা’ন্ডব। অনুর সাথে মাত্রই কথা হলো অরুর, সেও ঝড়ের মাঝে কোনো এক ক্যাফেতে আটকা পরেছে,সাথে অবশ্য প্রত্যয় আছে চিন্তা করার কারন নেই।
অনুর সাথে কথা হওয়ার পরপরই বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে। এভাবে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় অরু একটু ভরকে গেলো। অন্য সময় বিদ্যুৎ গেলেও বাইরে থেকে আসা সোডিয়ামের আলোয় আলোকিত থাকে হলরুম। অথচ আজ নিকোশ কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার। ব্যাপারটা বোঝার জন্য কাঁচের দেওয়ালে উঁকি দিতেই অরু দেখতে পায়, বাড়ির বাইরের রাস্তায় কোথাও একফোঁটা আলো নেই। হয়তো ঝড় বৃষ্টিতে কোথাও বৈদ্যুতিক তাড় বিচ্যুত হয়ে এমনটা হয়েছে। কিন্তু এই মূহুর্তে চারিদিকের এমন তীব্র অন্ধকারে অরুর কেমন গা ছমছম করছে। ও কোনোমতে অন্ধকারে সিঁড়ি হাতরে ক্রীতিকের রুমের দিকে পা বাড়ায়। ক্রীতিক রুমেই আছে, অথচ ওর রুমটাও পুরোপুরি তিমিরে ঢাকা। একটু সময় নিয়ে খুজতে খুজতে ক্রীতিকের রুমের দরজার বাইরে কয়েকবার টোকা মে’রে অরু

মিনমিনিয়ে বললো,— একটু ফোনের ফ্ল্যাশটা অন করবেন ভ'য় করছে।
অরু বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক মোবাইলের ফ্ল্যাশ অন করে বললো,
— ভেতরে আয়।
অরু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই মৃদু আলোতে দেখতে পায় ক্রীতিক কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর গতানুগতিকের চেয়ে একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অরু জানে ক্রীতিক কখন এমনটা করে, তাই ও এগিয়ে গিয়ে শুধালো
— জ্ব'র বেড়েছে? আমি কি একটু চেক করে দেখবো?
ক্রীতিক হাস্কি স্বরে জবাব দিলো,— নিষেধ করেছি?
অরু এবার একটু সংকোচ নিয়ে ক্রীতিকের কপালে হাত ছোঁয়ায়,অতঃপর বলে,
— আপনার অনেক জ্বর কি করে ঠিক আছেন বলুন তো?
কথাটা বলে অরু মোবাইল হাতে নিয়ে উঠতে নিলে, ক্রীতিক নিজের তপ্ত হাত দিয়ে অরুর হাত টেনে ধরে শুধায়,
— কোথায় যাচ্ছিস?
অরু পেছন ঘুরে বলে,
— কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে আসছি, মাথায় জলপট্টি দিলে ভালো লাগবে ততক্ষণ একটু অন্ধকারে থাকুন। সন্ধ্যারাত গড়িয়ে ঘড়ির কাটা গিয়ে ঠেকেছে রাত দশটার কোঠায়। বিদ্যুৎ এখনো আসেনি। আর না অনু ফিরেছে। অরু সেই যে ক্রীতিকের শিওরে বসেছে এখনো বসেই আছে। বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজে চোখদুটো ভার হয়ে এসেছে ঘুমে। এবার মনে হচ্ছে যাওয়া দরকার, তাই ও ক্রীতিকের মাথার জলপট্টিটা উল্টে দিয়ে বললো,

— আমি এখন যাই, ঘুম পেয়েছে।
তৎক্ষনাৎ ওর হাতটা শ’ক্ত করে চেপে ধরে চোখ বন্ধ রেখেই ক্রীতিক বলে,
— কোথাও যাবিনা, এখানেই বসে থাক।
— বৃষ্টি কমেছে, বিদ্যুৎ, আপা দুটোই চলে আসবে। তাছাড়া আমার ঘুম পেয়েছেতো।
ক্রীতিক অরুর কথায় তোয়াক্কা না করে বললো,
— ঘুমাতে হবেনা।আমি বলেছি তুই যাবিনা, তার মানে যাবিনা, নয়তো সবাইকে বলে দেবো তুই আমার বউ।
অরু দাঁত কিরমির করে বিরক্ত হয়ে বললো,
— ব্লা’কমেইলটা আপনি খুব ভালোই করতে পারেন, সব আমাকে শা’স্তি দেওয়ার ধান্দা।
ক্রীতিকের সাথে কথায় না পেরে, অগত্যাই অরু ঘুমু ঘুমু চোখ নিয়ে টলতে টলতে ক্রীতিকের কাছেই বসে থাকে।একটা শ্বাসরু’দ্ধ কর পরিস্থিতিতে পরে খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে অরুর। কেমন যেন গরম লাগছে সবকিছু, গলার কাছে গরমটা একটু বেশিই লাগছে। চোখ দুটো তখনও খোলেনি ও। তবে আশেপাশের সুঘ্রাণটা বারবার নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, চন্দনকাঠের স্নিগ্ধ মন মাতানো সুবাস। একটা লম্বা শ্বাস টেনে সুবাসিত বাতাসটা ভেতরে পুরে নিয়ে নড়েচড়ে ওঠে অরু। কিন্তু একি নড়াচড়ার করার কোন উপায়ন্তর নেই। মনে হচ্ছে হাত পা কেউ বে’ধে রেখেছে। কিন্তু কে দেখাবে এই দুঃসাহস?নিজেকে এভাবে বাঁধনে আবিষ্কার করে, আচমকাই চোখ খোলে অরু। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া দুলে ওঠে ওর।

অরু ক্রীতিকের বিছানায়, ক্রীতিকের সাথে ঘুমিয়ে আছে। ক্রীতিক নিজের হাত পা দিয়ে অরুকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। অরুর লম্বা চুলগুলো ক্রীতিকের কালো টিশার্টের সাথে মিলেমিশে একাকার। এভাবে ক্রীতিকের পাশে নিজেকে আবিষ্কার করে অরু ঘাবড়ে গিয়েছে। মনেমনে ভাবছে,— আপা জানলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে, আমার এক্ষুনি চলে যাওয়া উচিৎ।

ক্রীতিকের পিঠের নিচ থেকে নিজের চুলগুলো আস্তে করে টেনে বার করতে করতেই অরুর চোখ চলে যায় ক্রীতিকের ঘুমন্ত মুখের দিকে, এতো রা'গ, এতো জিদ, এতো বেপরোয়া সভাব কোনোকিচ্ছুর লেশমাত্র নেই ঘুমন্ত মুখটাতে। এখন যা রয়েছে সেটা কেবলই আকর্ষন, যে কেউ এই ঘুমন্ত মুখটা দেখলে তীব্র আকষর্ন অনুভব করবে। কি সুন্দর চেহারা, মাসআল্লাহ। ঘুমের মাঝে ক্রীতিক খানিকটা নড়েচড়ে উঠতেই ভ্রম ছুটে যায় অরুর। ও দ্রুত বিছানা ছেড়ে চুল গুলো হাত খোঁপা করতে করতে বেড়িয়ে যায়। যাওয়ার আগে কি ভেবে যেনো আরও একবার ফিরে এসে, ঘুমন্ত ক্রীতিকের কপালে হাত ছোঁয়ায়। অতঃপর মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে,

— যাক তীব্র জ্ব'রটা কমে গিয়েছে, এখন আমি দ্রুত ভাগি। রুমে আসতেই পা'দুটো থমকে যায় অরুর, আপা এখনো ঘুমিয়ে আছে, এই ফাঁকে কিছু একটা অজুহাত বানাতে হবে, কিন্তু বানানো যায়? অরু যখন অজুহাত ভাবতে ভাবতে দাঁত দিয়ে নখ কাঁ'টায় ব্যাস্ত, তখনই আড়মোড়া ভেঙে অনু বলে,

— কিরে এতো সকালে আবার কোথায় যাচ্ছিস?

অরু ধরা পরে যাওয়া চো'রের মতো আমতা আমতা করে বলে,

— ককোথাও না এখন আবার কোথায় যাবো।
অরুর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে অনু পুনরায় শুধালো,
— হ্যারে, কাল কখন এসেছিলি ঘুমাতে?
অরু ভ্রু কুঁচকে বলে,— কোথা থেকে আসবো?
— আরে তুই'তো কাল রাতে ক্রীতিক ভাইয়ার মোবাইল থেকে ম্যাসেজ দিলি আমায়, তুই নাকি পড়ছিস, খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক ঘুমাতে দেরি হবে। ওই জন্যই তো তোকে আর ডিস্টার্ব করিনি, রুমে এসে ঘুমিয়ে পরেছি।
অরু এতোক্ষণে বুঝলো ওর হয়ে ক্রীতিক ম্যাসেজ করেছে অনুকে। এবার ও একটু সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
— হ্যারে আপা, অনেক কঠিন পড়া ছিল, ওই জন্যই তো ক্রীতিক ভাইয়ার রুমে গিয়েছিলাম পড়া বুঝতে। বাড়িতে স্যার থাকলে যা হয় আরকি।এক নিঃশ্বাসে কথাটুকু শেষ করে নিজের শরীরের গন্ধ নিলো অরু। পুরো শরীর জুড়ে স্যান্ডাল উড পারফিউমের গন্ধ মো মো করছে। যে কেউ কাছে কাছে এলে বুঝতে পারবে এটা ক্রীতিকের শরীরের গন্ধ। অরু উপায়ন্তর ভেবে না পেয়ে দ্রুত ওয়াশরুমে ঢুকে অনুর উদ্দেশ্যে বললো,
— আমি একটু শাওয়ার নিয়ে আসছি তুই থাক।
অনু হাই তুলে আবারও ঘুমাতে ঘুমাতে বললো,
— এতো সকালে শাওয়ার নেওয়ার কি আছে? পা'গল মেয়ে।রোববারের সকাল। যান্ত্রিক জীবনে অভস্ত্য মানুষগুলোর আজ ছুটির দিন। বাইরে প্রখর রোদের পূর্বাভাস। গত কয়েকদিনের বৃষ্টি শেষে আজই বোধ হয় সূর্যের মুখ দেখতে পাবে ধরনী। ভেজা স্যাতস্যাতে পরিবেশ উবে গিয়ে শুকিয়ে যাবে পিচঢালা ঝকঝকে

রাস্তাঘাট। তবে সেই রাস্তায় পদচারণার তাড়া আজ খুব একটা কারোরই নেই। ছুটির দিন বলে কথা।যেহেতু ছুটির দিন সেহেতু আজ ভার্সিটি নেই। অরু আজ বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছে। এতো বেলা করে উঠেও আজকাল চোখদুটো থেকে ঘুম কাটানো বড্ড দায়।কোনোমতে ঢুলুঢুলু পায়ে রোবটের মতো নিজের সকালের কাজ গুলো সেরে অরু চলে এসেছে হলরুমে। বাড়িতে অরু ব্যতিত কেউ নেই। শুধুমাত্র হলরুমের ডিভানে বসে লেজ নাড়ছে ডোরা। ডোরাকে এভাবে ডিভানের উপর বসে থাকতে দেখেই একঝটকায় ঘুম ছুটে গেলো অরুর। চোখের পাতায় কয়েকবার পলক ফেলে দাঁত দিয়ে জিভ কে'টে এগিয়ে গিয়ে ডোরাকে উদ্দেশ্য করে অরু বললো,
— কি করেছিস ডোরা? এটা জায়ান ক্রীতিকের বসার যায়গা। তুই এখানে বসেছিস জানলে,তোকে আমাকে দুজনকেই ঘাড় ধা'ক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে প্রফেসর জেকে। ঘর বাড়ি হারিয়ে বনবাসী হতে না চাইলে তাড়াতাড়ি নাম।
অরুর তীব্র চোখ রাঙানো ধমকে বোধ হয় কাজ হলো, তৎক্ষনাৎ লেজ নাড়তে নাড়তে যায়গা ত্যাগ করলো ডোরা। ডোরা মুখ কাচুমাচু করে চলে যাওয়াতে অরু সেদিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,— রাগ করার কি আছে?আমিতো যা সত্যি তাই বললাম। প্রফেসর জেকে কে তো আর তুই চিনিস না, তাই ওমন রাগ দেখাচ্ছিস। আমি চিনি,চিনবো নাই বা কেন বল? ক্লাসে ম্যাক্রোইকোনমিক্স পড়ায় তো।
ডোরা অরুর এতো হাবিজাবি কথা বুঝলো কি বুঝলোনা তা বোধগম্য নয়,সে চুপচাপ গিয়ে লেজ গুটিয়ে অন্যত্র যায়গা দখল

করে নিলো।বসে পরলো কিচেন কাউন্টারের একপাশে। ডোরার কার্যক্রম খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষন করে অরুর চোখ গেলো দোতলায় ক্রীতিকের ঘরের দিকে। আজ উইকএন্ড অথচ ক্রীতিক সকাল সকাল বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছে সেটাও অরু জানেনা। জানার কথাও নয়, তবুও চোখ দুটো আজকাল হুটহাট তার খোজ করে বসে, কেন করে তা জানা নেই অরুর, মন মস্তিষ্কও তাতে একযোগে সায় জানায়,হৃদয়ের কোনোদিক থেকে কোনো বাঁধা নেই। তবুও অরুর ভ’য় হয় ভীষণ ভ’য়, সেই সাথে ক্রীতিকের উপর একরাশ বিরক্তি আর অভিমান তো আছেই,কি করে পারলো ওকে এভাবে জোর করে বিয়ে করতে? ওর মতামতের কি কোনোদাম নেই?

পরক্ষণেই মনে পরে যায় সেদিন রাতে ক্রীতিকের দেওয়া, গম্ভীর হৃদয় নিংড়ানো আশ্বাসটুকু,—চিন্তা নেই পুরো দুনিয়া আমি দু’হাতে সামলে নেবো। তোর শরীরে কল’ঙ্কের আঁচ ও লাগতে দেবোনা। কথাগুলো ছিল ভেলভেট মেঘের মতোই মসৃণ , অথচ প্রত্যেকটা কথায় উপচে পরছিল কি ভীষন পুরুষত্ব্য আর কতৃত্ব। যেন ক্রীতিকের জন্মই হয়েছে অরুকে দু-হাতে আগলে রাখার জন্য।সেদিনের বলা প্রত্যেকটা শব্দ তীব্র ঝঙ্কার তুলেছিল অরুর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মাথার মধ্যে উপচে পড়া চিন্তার জলোচ্ছাসেরা মূহুর্তেই গতিপথ বদলেছিল। চোখ বন্ধ রেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল মানুষটা যা বলছে ঠিক বলছে। বিয়েটা যখন জোর করে করেছে তখন দায়িত্ব অবহেলা করার পাত্র জায়ান ক্রীতিক নয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আবারও মনে হতে লাগলো তাতে কি আসে যায়? ক্রীতিক যতই বলুক।ধর্মে যতই প্রাধান্য থাকুক সং

ভাইয়ের সাথে বিয়ের সম্পর্ক কোনো সমাজই ভালো চোখে দেখবে না,কোনোদিন না, তারউপর মা আর আপাতো আছেই। অরু যখন নিজের অনিশ্চিত বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে, তখনই ল্যান্ড ফোনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে ওর ভাবনার সুতো ছি'ড়ে যায়, ক্রীতিকের শূন্য ঘরের দিক থেকে চোখ নামিয়ে অরু তাকায় সেদিকে, মনেমনে ভাবে,— ল্যান্ড লাইনে কল এসেছে তারমানে আমার কল। কিন্তু এই সময় কে কল দিলো?

অরু ঠোঁট কামড়ে ফোনের ওপাশের মানুষটাকে আন্দাজ করতে না পেরে সহসা এগিয়ে গিয়ে ফোন কানে ধরলো, ফোন কানে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে এলো অনুর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনরত আওয়াজ, গলায় অসম্ভব খুশি আর চোখে অস্রুসীক্ত নোনাজল ধরে রেখে অনু বললো,

— অরু দ্রুত নার্সিংহোমে চলে আয়, মা তোকে দেখতে চাইছে।

অনুর কথায় চোখ দুটো বড়বড় করে, অরু অবিশ্বাসের সুরে দ্বিতীয়বার শুধায়,

— কি বলছিস আপা? সত্যিই মা আমাকে খুজছে?

— হ্যারে বোন মা তোকে খুঁজছে, এলেই দেখতে পাবি।

অনুর সঙ্গে সঙ্গে অরুও এবার ব্যাথাতুর খুশিতে ডুকরে কেঁদে উঠলো , হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,

—আমি এক্ষুনি আসছি আপা। এক্ষুনি আসছি।

ওর কথায় সায় জানিয়ে অনু কল কেটে দিলে, অরু দ্রুত ব্যাস্ত হয়ে পরে রেডি হওয়ার জন্য। অ'পারেশনের পরে মায়ের জ্ঞান ফিরেছে বেশ কয়েকদিন আগেই, তবে তখনও এতোবড় অপা'রেশনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে কথা হয়ে ওঠেনি মায়ের

সাথে। আজ বোধ হয় মা পুরোপুরি সুস্থ হলো। অসম্ভব খুশিতে পা'গল পা'গল লাগছে অরুর, আজ আবারও কতগুলো দিন পর মাকে সেই আগের মতো দেখতে পাবে অরু, না আর অপেক্ষা করা যাচ্ছেনা, কোনো মতে পরিপাটি হয়ে, হাতের পার্সটা নিয়ে, দরজা লক করে অরু দৌড়াতে দৌড়াতে বেড়িয়ে গেলো ক্রীতিকের আলীশান বাড়ি থেকে।হসপিটালে এসে দৌড়াতে দৌড়াতে করিডোর পেরিয়ে মায়ের কেভিনের সামনে এসেই পা দু'টো থমকে গেলো অরুর। ভেতরে মা কথা বলছে, সুস্পষ্ট আওয়াজ, কতদিন পর মায়ের কথা কানে আসছে, হৃদয়টা গুমোট আবহওয়ার মতোই হাসফাস করছে ওর।মনে পরে যাচ্ছে শুরু থেকে সবকিছু। অতোবড় ক্রীতিক কুঞ্জে দিনের পর দিন দু'বোনের কষ্ট করা, প্রতিদিন ইমেইল পাঠানো, ইমেইলের রিপ্লে না আসার একরাশ আক্ষেপ, গুছিয়ে নেওয়া,মানিয়ে নেওয়া, মামির ছুরিকা'ঘাতের মতো কথার ছোবল,শেষমেশ জায়ান ক্রীতিকের জোরজ'বস্তিতে রাজি হওয়া। এতোকিছুর বিপরীতে এখন এই মূহুর্তে মায়ের দুটো আওয়াজ শুনে মনে হলো সব দুঃখ ভ্যানিস। এ জীবনে দুঃখের কিছুই ঘটেনি। এই যে কেমন সুখ উপচে পড়ছে দুচোখের কার্নিশ বেয়ে। কাঁধ দুটো অসম্ভব হালকা লাগছে, বয়স কমে গিয়ে নিজেকে মায়ের ছোট্ট বাচ্চা মনে হচ্ছে। আর কি চাই?
খানিকক্ষণ কেভিনের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ভলভলিয়ে ওঠা অশান্ত হৃদয়টাকে শান্ত করে তবেই দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো অরু। চোখদুটো তখনও অভিমানী জলে টইটম্বুর ওর। কয়েকমিটার দুরত্বে বসে আছে মা, পরনে তার হসপিটালে বরাদ্দকৃত আসমানী রঙের পাজামা সেট। হাতের ক্যানোলা এখনও

খোলা হয়নি, তবে চোখে মুখে স্নিগ্ধতার ছড়াছড়ি তার। এমন সুস্থতা দেখে মনে হচ্ছে নতুন করে জন্ম হলো তার। অরুর অবশ্য এমন মনে হওয়ারই কথা, কারণ ও খুব বেশি মায়ের ধারে কাছে থাকেনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুর, ত্যাগ তিতিক্ষার কাছে, অরুর এই সামান্য কষ্ট কিছুই না। আজমেরী শেখ বরাবরই রাশভারি গোছের মানুষ। খুব একটা আবেগ তিনি দেখাতে পারেননা। কিন্তু এরকম একটা মূহুর্তে নিজেকে ধরে রাখা দায়। তিনিও পারলেন না, একহাতে অনুকে আগলে রেখে অন্যহাত এগিয়ে দিলেন অরুর উদ্দেশ্যে। অরুও আর অপেক্ষা করলো না, ছুটে এসে জাপ্টে ধরলো মাকে।
তিন মা মেয়ের কান্নার রোল পরে গেলো পুরো কেভিন জুড়ে, এতোগুলো দিন পর অনুর মনে হচ্ছে ও আর একা নয়, ওকেও স্নেহ করার মানুষ আছে। এর চেয়ে প্রশান্তির আর কিইবা হতে পারে। আজমেরী শেখ দুই মেয়ের মাথায় চুমু খেয়ে বললেন,
— সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, সব। আর দুঃখ নেই তোমাদের মা সুস্থ হয়ে গিয়েছে দেখো।
জবাবে অনু কাঁদতে কাঁদতে বললো,—তুমি আবারও আমাদের বুকে টেনে নিয়ে আদর করছো এর চেয়ে সুখের আর কিই হতে পারে মা? আমরা পেরেছি, আমি আর অরু হাল ছাড়িনি, আমরা তোমাকে ফিরে পাবার আশা ছাড়িনি। ভবিষ্যতেও ছাড়বো না, তোমার শরীরের একটু ত্রুটিও হতে দেবোনা আমরা।
ওদের কা’ন্নাকাটির মাঝেই চেক-আপের উদ্দেশ্যে কেভিনে প্রবেশ করেন ডক্টর এডওয়ার্ড। ডক্টরের হঠাৎ আগমনে তিনজনেরই কা’ন্নাকাটিতে ভাটি পরলো এতোক্ষণে। তৎক্ষনাৎ ডক্টরকে যায়গা

করে দিয়ে দুইবোন দুইদিকে সরে দাড়ালো ওরা।অতঃপর আজমেরী শেখকে ভালোমতো চেকআপ করে, ঠোটের কোনে একটা আন্তরিকতা জড়ানো হাসি ঝুলিয়ে ডক্টর বলেন,
— কনগ্রাচুলেশন, মিসেস, আজমেরী। আপনার অপা'রেশনের পর আপনি এখন পুরোপুরি ফিট আছেন। আজ বা কালকের মধ্যেই আপনাকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে। তবে হ্যা, প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহে এবং পরবর্তীতে প্রতিমাসে একবার করে নার্সিংহোমে এসে হার্টের কন্ডিশন চেক-আপ করতে হবে আপনার , অন্তত ছয়মাস এটা ধারাবাহিক ভাবে করতে হবে। তাই অনুরোধ করবো আগামী ছয়মাসে দেশে না ফেরার। ছয়মাস পরে যখন আপনার হার্টের কন্ডিশন পুরোপুরি স্ট্যাবল হয়ে যাবে, তখন আপনি যে কোনো সময় দেশে ফিরতে পারবেন।
আজমেরী শেখ বরাবরই যথেষ্ট স্মার্ট এবং দক্ষ মহিলা, ইংরেজিতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। জামশেদ জায়ানের সাথে দেশবিদেশ ঘুরে ব্যাবসা সামলেছে পারদর্শী হওয়ারই কথা। তাই তিনি নিজ থেকেই ডক্টরকে শুধালেন,— ডক্টর এডওয়ার্ড ? ছয়মাসই থাকতে হবে?
ডক্টর এডওয়ার্ড স্মিত হেঁসে জবাব দিলেন,
— উমম ডিপেন্ড অন ইউর হার্ট। হার্ট যত তারাতাড়ি আপনার শরীরের সাথে খাপখাওয়াতে পারবে, আপনি তত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।
ডক্টরের কথায়, আজমেরী শেখ হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, ডক্টর অনুকে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে কেভিন থেকে চলে যায়।
ডক্টর বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মাথাতেই একটা ফ্লাওয়ার বুকে নিয়ে কেভিনে ঢুকলো প্রত্যয়। অনু তখনও বসে বসে ডক্টরের

বলা কথাগুলো নোট করছিল ডায়েরিতে, অরু মায়ের জন্য কমলার খোসা ছাড়াচ্ছিল। প্রত্যয় এক ঝলক অনুর দিকে তাকিয়ে সোজা গিয়ে আজমেরী শেখের সামনে দাড়িয়ে পরে, হাতের বুকেটা সম্মানের সাথে এগিয়ে দিয়ে বলে,— কনগ্রাচুলেশন ম্যাম, আমি প্রত্যয় এহসান সি এফ ও অফ জেকে গ্রুপ।
আজমেরী শেখ বুকেটা গ্রহন করে বললেন,
— হ্যা জানি, জামশেদ আপনাকে ক্রীতিকের জন্য আমেরিকা পাঠিয়েছিল।
আজমেরী শেখের কথায় অরু অনু দু'জনেই প্রত্যয়ের মুখপানে দৃষ্টিপাত করলো। অনু প্রত্যয়কে দেখে একটু ইতস্তত হলো, কেমন যেন লজ্জা লাগছে ওর। ওদিকে অরু বেচারি ক্রীতিকের নামটা শোনা মাত্রই ভাবছে সারা সকাল ক্রীতিকের দেখা নেই, কোথায় গেলো লোকটা?
আজমেরী শেখের কথায় প্রত্যয় সম্মোহনী হাসি দিয়ে বললো,
— ইয়েস ম্যাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি ক্রীতিক ভাইয়ের এসিসট্যান্ট। ওনার হয়ে কোম্পানির সকল দায়-দায়িত্ব আমিই সামলাই। উনি কখনোই জেকে গ্রুপে হস্তক্ষেপ করেননা। আর না উনি কোম্পানি থেকে কোনোরূপ সম্মানি গ্রহন করেন।
আজমেরী শেখ কিছু একটা ভেবে বললো,— যাই হোক, আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে, আমার জন্য ইমিডিয়েট একজন এ্যাসিসট্যান্টের ব্যাবস্থা করুন, আর হ্যা হসপিটালের আসেপাশে একটা এপার্টমেন্ট রেন্ট করুন,যেহেতু আরও ছয়মাস থাকতে হচ্ছে সেহেতু আমি আমার মেয়েদের নিয়ে সেখানেই উঠবো, জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী আমার অবর্তমানে, আমার মেয়েদের সাহায্য

করেছে, থাকতে দিয়েছে, আমি তার প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞ, তবে তার সাথে একই ছাঁদের নিচে থাকতে আমি আগ্রহী নই।
প্রত্যয় রোবটের মতো দাঁড়িয়ে আজমেরী শেখের সকল হুকুম শুনে গেলো। অতঃপর ছোট্ট করে —ওকে ম্যাম।আমি সব কিছুর ব্যাবস্থা করছি।
বলে কেভিন থেকে বেরিয়ে যায়।
আজমেরী শেখের হুট করেই এতোগুলা সিদ্ধান্তে অনুর কোনোরূপ ভাবান্তর না হলেও, অরুর কেমন যেন ভেতরে ভেতরে সুক্ষ্ম চিনচিন ব্যাথা অনুভব হচ্ছে। চারদিকে সুখের জোয়ারে পরিপূর্ণ, তবুও কিসের অসম্পূর্ণতায় হৃদয়ের এই চিনচিন ব্যাথা জানা নেই অরুর।দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যা হতেই বাইক রাইডিং ক্লাবগুলো পরিনত হয় নাইট ক্লাবে। উচ্ছনে যাওয়া বড়লোকের বাউন্ডলে ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় যায়গা এটি। কলেজ, ভার্সিটি ফাঁকি দিয়ে সারাদিন রাইডিং এর মতো থ্রি’লিং গেইম উপভোগ করে সন্ধ্যা হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় ডিস্কো পার্টি। সাদা ফকফকে আলো নিভিয়ে দিয়ে লাল,নীল, হলুদ ফেইরী লাইটের আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে চারিপাশ, এক সাইডে বিভিন্ন দেশ থেকে আনা সারিসারি কাঁচের বোতলে সজ্জিত ব্রান্ডেট বার কাউন্টার। আর অন্যসাইডে ডিজে গানের ধুপধুপ কম্পিত আওয়াজের তালে তালে সকলের ডান্স পার্টি, অবশেষে সারারাত ধরে ম’দ্যপান আর নাচের শেষে ভোর রাতে চড়ম আনন্দে গা ভাসানো। আমেরিকানদের জন্য এরচেয়ে চিয়ারফুল যায়গা আর কোথাও নেই বোধ হয়।

এদের মাঝে ক্রীতিক হলো রাইডিং ক্লাবের সুপার স্টারের মতো, কখন আসে কখন যায় কেউ তা জানেনা। ও সাধারণত ম্যাচ শেষ হতেই নিজের ইচ্ছামতো চলে যায়, কিন্তু আজ কোনো এক অযাচিত কারনে, সন্ধ্যার পরেই ক্লাবে প্রবেশ করেছে ক্রীতিক। ওর সাথে অর্নবও রয়েছে। অর্নবের মুখ ভঙ্গিমা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এইরকম একটা ফালতু যায়গায় ওকে জোর করে টেনেটুনে নিয়ে এসেছে ক্রীতিক। চারিদিকের মিউজিক আর হৈ-হুল্লোড়ে কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অর্নব বিরক্ত হয়ে ক্রীতিককে বললো,— এখানে কেন নিয়ে এলি? তোর যদি এতোই নাচার শখ হয়ে থাকে তো তোর বউকে নিয়ে আসতি, আমি কি তোর সাথে নাচবো নাকি?
— চুপ কর শালা।
ক্রীতিক অর্নবকে চুপ করিয়ে টান’তে টা’নতে নিয়ে গেলো বার কাউন্টারে। ওকে বার স্টুলে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পরলো পাশের টাতে। সামনে দাড়িয়ে থাকা ওয়েটারকে দুটো হুইস্কির অর্ডার দিয়ে ক্রীতিক ক্লাবের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললো,
— এই ক্লাবের সিসিটিভি সিস্টেমটা হ্যা’ক করতে হবে অর্নব।
ক্রীতিকের কথায় অর্নব, ভ্রু কুঁচকে বললো,
— কিহ তুই আবারও ঝামেলা পাকাবি?
ক্রীতিক ঠোঁট কামড়ে অর্নবের চোখে তীর্যক দৃষ্টিপাত করে বললো,
— ঝামেলাতো পাকাতেই হবে ব্রো, রিভেঞ্জ নেওয়াটা যে এখনো বাকি। এই ক্লাবেরই একজন খুব দুঃসাহস দেখিয়ে আমার দূর্বলতায় হা’মলা করেছিল। তাঁকে একঝলক নিজের পৈশাচিক রুপটা না দেখালে হয় বল? আমিতো এতোটাও ভদ্রলোক নই।

অর্নব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,— তুই কি বলছিস আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, কি দেখাবি,কাকে দেখাবি?
অর্নবের কথার পাছে ক্রীতিক কিছু বলতে যাবে,তার আগেই সেখানে আগমন ঘটে ক্লাবের অন্যতম সদস্য জ্যাকসনের। যাকে মাসখানেক আগেই রাস্তায় ফেলে ইচ্ছে মতো মে’রেছিলো ক্রীতিক। তারপর অবশ্য সব সমস্যার সমাধান হয়েছে, ক্লাবের ম্যানিজিং কমিটি ওদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছে, জ্যাকসন ক্ষমাও চেয়েছে নিজের কর্মকান্ডের জন্য। এখন সম্পর্কটা মোটামুটি ঠিকঠাক। তাইতো ক্রীতিককে দেখা মাত্রই এগিয়ে এসেছে সে। এগিয়ে এসে আরেকটা বারস্টুল টেনে বসতে বসতে ঠোঁটের ভাঁজে সুক্ষ্ম হাসির রেখা টেনে, অবাক হয়ে জ্যাকসন শুধালো,
— আরে জেকে ব্রো, আপনিতো কখনোই নাইট ক্লাবে থাকেন না, আজ হঠাৎ?
জ্যাকসনের কথায় ক্রীতিক নিজেও ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে বললো,
— তোমাদের সাথে ড্রিংকস করতে মন চাইলো তাই থেকে গেলাম। ভালো করিনি?
— ওহ,দ্যাটস রিয়েলি গুড ব্রো। লেটস এনজয়।ওদের মধ্যে জ্যাকসনই প্রথমে পান করা শুরু করে, এক পেগ, দু পেগ, তিন পেগ, অতঃপর অগনিত পেগ। ক্রীতিক আর অর্নব ও কিছুটা টাল হয়েছে, তবে জ্যাকসনের অবস্থা পুরোপুরি টালমাটাল। দুচোখ ঝাপসা, চোখের সামনে বসে থাকা একটা ক্রীতিককে দশটা মনে হচ্ছে, কি রোমাঞ্চকর।

— লেটস ডু আ রাইড জ্যাকসন। আ'ম শিওর এবার তুমিই চ্যাম্পিয়ন হবে।
জ্যাকসন যখন টলতে টলতে আরও হার্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিচ্ছিল, তখনই ক্রীতিক ওকে অফারটা করে বসে। জ্যাকসনের মাথা ঠিক নেই, ওর মাথায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভুত বহু আগে থেকেই চড়ে বসে আছে, এই মূহুর্তে নিজের শরীরে একটা আলাদাই জোশ অনুভব করছে জ্যাকসন, মনে হচ্ছে ওর উপরে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ নেই, কেউ থাকতেও পারেনা, জেকে কে আজ ও সেটা দেখিয়েই ছাড়বে। ক্রীতিক বলার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পরে জ্যাকসন, নিজের শার্টের কলারে একটা ঝাড়া দিয়ে বাইকের হেলমেট নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলে,— লেটস গো।
ক্রীতিক বাঁকা হেসে বললো,
— ওয়াও, এতো জলদি?
জ্যাকসন চলে গেলে, ক্রীতিকও নিজের হেলমেট নিয়ে ওর পেছনে পেছনে হাঁটা দিলে, অর্নব ওকে টেনে বলে,
— তুই কি পা'গল? ও তো পুরাই টাল হয়ে আছে, বাইক স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে এ'ক্সি'ডেন্ট করবে।
ক্রীতিক দাঁতে দাঁত চেপে বললো,
— সেটাই চাইছি। চল এবার।
পেছন থেকে অর্নব বললো,
— আর তুই? তুই নিজেও তো ড্রাংক।
— নিজের উপর কন্ট্রোল আছে আমার অর্নব,তুই চল।
.

নিজেদের সুপরিচিত রাইডিং ম্যাচের রাস্তায় এসে দুজনেই বাইক স্টার্ট করলো ওরা, চারিদিকে রাস্তাটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়, আবার খুব আলোকিত ও নয়, সোডিয়ামের নিয়ন আলোয়, পুরোরাস্তা জুড়ে আলো ছায়া বিরাজমান। জ্যাকসনের মাথায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভুত কুন্ডলী পাকিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, আজ ও দেখিয়েই ছাড়বে জ্যাকসন কি জিনিস। ওদিকে ক্রীতিক প্রথমেই খুব ধীরগতিতে বাইক স্টার্ট দেয় ।

বাইক স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকসন হাওয়ার বেগে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যায়। এই দেখে অর্নব ভয়ার্ত নজরে তাকিয়ে মনেমনে আওড়ায়,

— হয় ম'রবে, না-হয় মৃ'ত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে আসবে। কেন যে জেকের মতো পাগ'লের সাথে লাগতে এসেছিল। হু নোজ?

যেহেতু ক্রীতিক নিজেও ড্রাংক ছিল, তাই ও নিজেও কিছুদূর যেতেই উল্টে পরে যায়। পরে গিয়ে সেখানে বসেই শব্দ করে হাসতে থাকে ও। ক্রীতিক পরে গিয়েছে দেখে অর্নব ওর দিকে ছুটে এগিয়ে এসে বললো,— আর ইউ ওকে? এটা কেন করলি ভাই? ছেলেটা খুব খা'রাপ ভাবে আ'হত হবে।

ক্রীতিক বাইকটাকে শরীরের উপর থেকে সরিয়ে আস্তেধীরে উঠতে উঠতে বললো,

— ওই বা'স্টা'র্ডটা আমার অরুকে মাঝরাস্তায় এ্যা'টা'র্ক করেছিল, শুধু মাত্র আমার উপর জিদ ফলাতে গিয়ে ও অরুকে ছু'ড়ি নিয়ে তাড়া করেছে। ইভেন আমি সময় মতো না এলে, কি না কিই হয়ে যেতো, সেটা একমাত্র উপর ওয়ালাই ভালো জানে। তাহলে তুই কি করে ভাবলি? এতো বড় একটা দুঃসাহস দেখানোর পরেও আমি

ওকে এতো সহযে ছেড়ে দেবো। কখনো না। তাছাড়া আমি আর কিইবা করলাম, ও নিজেই তো বাইক নিয়ে চলে গেলো। এখন যদি ভালোয় ভালোয় বেঁচে যায় তো যাক। আর যদি না যায়, তাহলে ধরে নেবো ওর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেশাই ওকে খোয়ালো।
শেষ কথাটা বলতে বলতেই একটা তীর্যক কপট হাসিতে প্রসারিত হলো ক্রীতিকের ডার্ক ব্রাউন ঠোঁট জোড়া।অরুর বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা রাতে গিয়ে ঠেকেছে। অনু আজ আর ফিরবে না,সে মায়ের কাছেই থাকবে। অরুও ফিরতে চায়নি, অনু জোর করেই পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে। বলেছে, একটা রাতই তো তারপর থেকে তো সবাই একসাথেই থাকবে ওরা, এখন কষ্ট করে হসপিটালে থাকার প্রয়োজন নেই।
অরুর মনটা বেশ ফুরফুরে, হাতের পার্সটাকে আঙুলে ঘুরাতে ঘুরাতে মাত্রই পাসওয়ার্ড টিপে ঘরে প্রবেশ করেছে ও। তবে হলরুমের কাউচে ক্রীতিককে বসে থাকতে দেখেই হাঁটার গতি থমকে যায় অরুর , এই তো সেই মানুষটা সারাদিন এতো আনন্দের মাঝেও যার কথা হুটহাট মনে পরেছে , বারবার মনে হয়েছে কোথায় সে?
কাউচের উপর গা ছড়িয়ে দিয়ে দু'পা টি-টেবিলের উপর রেখে বসে আছে ক্রীতিক। নির্ঘুম, নিস্প্রভ, কামুক চোখ দু'টো অরুর পানে নিবদ্ধ। ক্রীতিকের মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে অরু দৃষ্টিপাত করে ওর পায়ের দিকে। থ্রী কোয়ার্টার প্যান্ট পরে আছে ক্রীতিক, যার দরুন ফর্সা লোমশ পা দুটোর এথায় সেথায় থেঁ'তলে গিয়ে র'ক্ত জ'মাট বাঁধা অংশ গুলো দৃশ্যমান, এমন দ'গদগে অবস্থা দেখে যে

কারও হৃদয় কেঁপে উঠবে। অথচ ক্রীতিক কতোটা ভাবলেসহীন হয়ে র'ক্ত নিয়েই বসে আছে, যেন কিছুই হয়নি।
অরুকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ক্রীতিক হাস্কি স্বরে বললো,— তোর জন্যই ওয়েট করছি, ট্রিট করে দে।
ক্রীতিকের পা দু'টো পর্যবেক্ষন করে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এগিয়ে এসে অরু শুধালো,
— নিশ্চয়ই বাইক থেকে পরে গিয়েছেন?
ক্রীতিক দু'হাত দিয়ে নিজের চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করতে করতে বললো,
— ঠিকই ধরছিস।
— ফাস্ট এইড বক্স কোথায়?
ক্রীতিক আঙুল দিয়ে নিজের রুমের দিকে দেখিয়ে দিলো। অরু নিজের পার্স্টটা রেখে বললো,
— থাকুন, নিয়ে আসছি।
এই যাবত ক্রীতিকের রুমে দুএকবার এসেছে অরু, সেদিন ক্রীতিকের রুমে কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছিল টের পায়নি ও নিজেও। তবে তখন তো ঘরময় অন্ধকার ছিল, কিছুই দেখার উপায় ছিল না, ওই জন্যই তো এখন ফাস্ট এইড বক্স খুঁজতে খুঁজতে হাঁপিয়ে উঠেছে অরু। রুমের কোথাও খুজে না পেয়ে একটানে ক্রীতিকের জামাকাপড়ের কাবার্ড খুলে ফেললো ও,কাবার্ডের ড্রয়ারেই ফাস্টএইড বক্স রাখা ছিল। অরু সেটাকে হাতে নিয়ে আরও একটা ছোট বক্স দেখতে পায়, সুন্দর কারুকাজ করা কাঠের বক্সটা ,—কি আছে এর মধ্যে?

প্রশ্নটা মনের মাঝে উঁকি দিতেই, এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেকটা বিস্ময় আর কৌতুহল নিয়েই বক্সটা খুললো অরু, অরু ভেবেই নিয়েছে এতো সুন্দর বক্সে হয়তো কোনো হিরে-জহরত থাকবে নিশ্চিত । কিন্তু অরুকে পুরোপুরি ভুল প্রমান করে দিয়ে বক্স থেকে বেড়িয়ে এলো একটা লম্বা চুল। অরু আশাহত নজরে চুলটাকে দেখে নাক সিটকে বললো,

— ইউউ! এটা আবার কি?

পরক্ষণেই ওই চুলটাকে নিজের চুলের সাথে মিলিয়ে অরু বললো,

— আরে এটাতো মনে হচ্ছে আমার চুল, উনি কি কালো জা'দুটাদু করেন নাকি?

— অরুউউউউ!

নিচ থেকে ভেসে আসা ক্রীতিকের ঝাঁজালো চিৎকারে লাফিয়ে উঠলো অরু। কোনোমতে যায়গার জিনিস যায়গায় রেখে ফাস্ট এইড বক্স নিয়ে সহসা নেমে গেলো নিচ তলায়। তারপর দৌড়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পরলো ক্রীতিকের পাশে।

— এতোদিন ধরে এ বাড়িতে আছিস। এখনো একটা বক্স খুজতে এতোক্ষণ সময় লাগে ?

ক্রীতিকের কথায় অরুর মনে পরে যায় ও আর এই বাড়িতে নেই। কথাটা ভাবতেই ঈশান কোনে মেঘ জমার মতোই মনের কোনে সুপ্ত হাহাকার জমে ওঠে অরুর।

অরু নিশ্চুপ বসে বসে ক্রীতিকের পায়ে হাত চালাচ্ছে দেখে ক্রীতিক ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,— কি ভাবছিস?

অরু তার ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে অন-টাইম ব্যান্ডেজ গুলো লাগাতে লাগাতে বললো,

— ভাবছি আজকে যা বলার বলুন, আমিতো কাল চলেই যাচ্ছি।
ক্রীতিক ডিভানের গায়ে নিজের মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বললো,
— আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি তুই?
অরু এবার সিরিয়াস হয়ে ক্রীতিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,
— কাল চলে যাচ্ছি আমরা, মা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, আমাদের জন্য সানফ্রান্সিসকোতে এপার্টমেন্ট রেন্ট করা হয়েছে।
অরুর কথাটা বলতে দেরি হলো, শ'ক্ত হাতে ওর গালদু'টো চে'পে ধরতে দেরি হলোনা ক্রীতিকের। হটাৎ চড়াও হওয়া তীব্র রা'গে বেশ শক্ত করেই অরুর গাল দুটো চে'পে ধরেছে ক্রীতিক। এতোক্ষণের শান্ত মসৃণ রুপটা মূহুর্তেই ধারণ করেছে ভয়'ঙ্কর অ'গ্নিমূর্তি। অরুর মনে হচ্ছে ওর গালের হাড়গোড় এক্ষুনি ভে'ঙে যাবে। অসহিষ্ণু ব্যাথায় চোখ দুটো টলমলে হয়ে উঠলো ওর। তৎক্ষনাৎ অস্পষ্ট সুরে ক্রীতিককে বললো,—খুব ব্যা'থা লাগছে ছাড়ুন।
ক্রীতিক ছাড়লো না, উল্টে ওকে কাছে টেনে নিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,
— আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কি জানিস? তোর প্রেমে পরা। সেই শুরু থেকে য'ন্ত্রণা দিতে দিতে লাইফটাকে হেল বানিয়ে ছেড়েছিস। এখনো দিচ্ছিস।
কথাটা বলে পায়ের নিচে থাকা টি-টেবিলটায় সশব্দে লা'থি মারলো ক্রীতিক। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন আওয়াজ করে টেবিলটা উল্টে পরলো অন্যপাশে। বোধহয় কাচগুলো ভে'ঙে গু'ড়িয়ে গিয়েছে। ক্রীতিক সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে, অরুর এতোক্ষণ ধরে করা ব্যান্ডেজ গুলোকে টেনে হিঁচড়ে তুলে ফেললো। এভাবে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার

কি মানে হয়, অরু চেচিয়ে উঠলো,— আরে কি করছেন, আবারও র’ক্ত বের হবেতো?
ক্রীতিক অরুর কথায় কর্ণপাত না করে ব্যান্ডেজ গুলো ছু’ড়ে ফেলে ওকে এক প্রকার ধা’ক্কা মে’রে সরিয়ে, হনহন করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়।
ক্রীতিক চলে যেতেই অরু ধপ করে মেঝেতে বসে পরে। নিজেকেই নিজে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে,— উনি কি বললেন? উনি আমার প্রেমে পরেছেন, কবে, কোথায়, কখন? যেই মানুষটা আমাকে দুই চোখে সহ্যই করতে পারেনা, সে কি করে আমার প্রেমে পরলো? আমিকি ঠিক শুনেছি?
আপনমনে কথাগুলো বলতে বলতেই অরুর হাত চলে যায় বুকের বাম পাশে। আবারও সেই তীক্ষ্ণ চিনচিন ব্যাথা, এটা কি তাহলে জায়ান ক্রীতিকের জন্যই হচ্ছে?আরও একটা ব্যস্ত দিনকে বিদায় জানিয়ে সন্ধ্যা তিমিরে মুড়িয়ে গিয়েছে চারিপাশ। বাইরে বৃষ্টি নেই, তবে প্রবল বেগে হাওয়ার তান্ডব চলমান। ক্রীতিকের বাড়িটা ক্যালিফোর্নিয়া আর সানফ্রান্সিসকোর মাঝামাঝি শহরতলীতে হওয়ায় আশপাশের নির্জন পরিবেশ ছাপিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আগত ঝিরিঝিরি হাওয়ার তান্ডবটা বরাবর একটু বেশিই মনে হয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যার ঝড়ো হাওয়াটা তার চেয়েও দিগুণ মনে হচ্ছে। হঠাৎ করেই কেন এই ঝড়ো হাওয়া কে জানে?সারাদিন পরে মাত্রই ভার্সিটি থেকে বাড়িতে ফিরেছে ক্রীতিক। পরনে ইতালিয়ান দের মতো আঁটোসাটো ফর্মাল স্যুট। স্যুট গলিয়ে পুরুষালী শরীরের পেশিগুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান। হাতে সিলভার রঙের রোলেক্স ঘড়ি, মাথার চুল গুলো ব্যাকব্রাশ করে সেট করা। এই ক্রীতিককে দেখলে

কেউ ভুলেও বলবে না, যে সে ছন্নছাড়া, বেপরোয়া, আর উদভ্রান্তের মতো বাইক রাইড করে। যার কাছে নিজ জীবনের দু'পয়সার মায়াটুকু নেই। ওর ভেতরের মায়া আসক্তি যেটুকুই আছে তা একমাত্র অরুকে ঘীরে।হুহু বাতাসের মাঝেই ক্রীতিক গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে সোজা ঢুকে গিয়েছে বাসার মধ্যে। পাসওয়ার্ড টিপে হলরুমে পা রাখতেই একটা শুষ্ক ঢোক গিললো ক্রীতিক। পুরো বাড়ি অন্ধকারে ছেয়ে আছে, কোনোরুপ মানুষের আওয়াজ নেই, একটা নিঃশ্বাসের শব্দও নেই। তাহলে অরু, অনু ওরা কোথায়? সকালেই তো ক্রীতিক অরুকে বাড়িতে দেখে গিয়েছে,তাহলে এখন কোথায়? অরুকি সত্যিই চলে গেলো?
মস্তিষ্কের ভেতর একের পর এক হা'মলা দিতে থাকা দানাবাঁধা অসহিষ্ণু প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গিয়েই সুদর্শন তীক্ষ্ণ চোয়ালটা আরও আরও খানিকটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ক্রীতিকের, দাঁত গিয়ে ঠেকলো দাঁতের সাথে। ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সুইচবোর্ড চেপে হলরুমের আলো জ্বালালো। আলো জ্বালাতেই কিচেনের ওপাশ থেকে মিয়াঁও মিয়াঁও আওয়াজ করে গা ঢাকা দিলো ডোরা, ক্রীতিক ডোরার দিকে এক নজর দৃষ্টিপাত করে চেঁচিয়ে অরুর নাম করে ডেকে উঠল,
—অরুউউউ! অরুউউ! এক্ষুনি নিচে নাম, নয়তো আমি উপরে গেলে তোর খবর আছে।নাহ দোতলার ঘর থেকে কোনোরুপ আওয়াজ ভেসে আসলো না, অরুও হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলোনা। রাগে ফোঁস ফাঁস করতে করতে এবার ক্রীতিক নিজেই সোজা দোতলায় গিয়ে অরুদের রুমে ঢুকে যায়। রুমে ঢোকা মাত্রই দুচোখ খিঁচে বন্ধ করে ফেললো ক্রীতিক। যা ভেবেছিল তাই, অরু ওকে না জানিয়েই

বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে, রুমের মধ্যে এখন আর অরুর একটা সুতোও অবশিষ্ট নেই। থাকলে হয়তো সেটাকেও চুলের মতো বাক্সবন্ধি করে রাখতো ক্রীতিক। এই মূহুর্তে মস্তিষ্কের রাগ, জিদ,হিং'স্রতা সবকিছু ছাপিয়ে ভেতরটা তীব্র দহনে পু'ড়ছে খুব। অরু ক্রীতিককে না জানিয়েই চলে গেলো, কি করে পারলো এটা?বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলে বুকের ভেতরে অনেকটা অক্সিজেন মিশ্রিত বাতাস ভরে নিয়ে চোখ খোলে ক্রীতিক। চোখ খুলতেই আবারও সেই অজানা হাহাকার, অরু নেই, অরুর পায়ের নুপুরের রিনঝিন আওয়াজ নেই, অরুর শরীরের গন্ধ নেই, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। এই মূহুর্তে পুরো বাড়িটাকেই মৃ'ত্যুপুরি ঠেকছে ক্রীতিকের নিকট, ওর কেন যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে এখানে, শরীরের মাঝে কুন্ডলী পাকিয়ে ওঠা তীব্র অস্থিরতা দমাতে একেএকে কোর্ট, টাই, ঘড়ি সবকিছু খুলে মেঝেতে ছু'ড়ে মা'রে ক্রীতিক। আজ আবারও বহুদিন বাদে সেই পুরনো বিষন্নতা এসে হানা দিয়েছে মস্তিষ্কে, মনে হচ্ছে এমন দম বন্ধকর পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃ'ত্যুই শ্রেয়।
যেহেতু ক্রীতিক অনেক দিনের চলমান চিকিৎসার প্রভাবে আগের চেয়ে ভালো আছে, তাই আপাতত নিজেকে সামলে নিতে পারছে। তবুও এসব কু'চিন্তা ভাবনা গুলোকে দূরে ঠেলতে চায় ও। কিন্তু এই বদ্ধ রুমের ভেতরে এক ফোটা দম নেওয়ার উপায় নেই। তাহলে কি করা যায়?অতঃপর কিছু একটা ভেবে দ্রুত দোতলা থেকে নেমে আসে ক্রীতিক। নিচে গিয়ে বাইকের চাবি আর হেলমেট নিয়ে বেড়িয়ে পরে কোনো এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।ছোট মতো জীর্নশীর্ন কোনো ফ্ল্যাট নয়, অরুদের জন্য রেন্ট করা হয়েছে

বিলাসবহুল এক এপার্টমেন্টাল ভবন। অরুদের এপার্টমেন্টটা ভবনের তিন তলায় অবস্থিত। আজমেরী শেখ হার্টের রোগী তাই খুব বেশি উপরে নেওয়া হয়নি বাসাটা। সন্ধ্যা থেকে সবকিছু গোছগাছ করতে করতে প্রায় রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। ওরা তিনজন ছাড়াও আজমেরী শেখের নতুন এসিস্ট্যান্ট রাজ হাতে হাতে অনেকটা সাহায্য করেছে সব কিছুতে। ছেলেটা বাঙালি, দেখতে শুনতেও বাঙালিদের মতোই শ্যাম বর্নের। সভাব চরিত্র মোটেও গুরুগম্ভীর নয়, কথায় কথায় হাসে, অন্যকেও হাসায়। আজমেরী শেখের মতো বিচক্ষণ মহিলাও তার কথায় হাসতে বাধ্য হয়, রাজকে পেয়ে অনুও অনেকটা নিশ্চিন্ত, ছেলেটা মায়ের ভালোই খেয়াল রাখতে পারবে,সেটা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। রাজ প্রথমেই এসে যে কাজটা করেছে অরুকে নিক নেম দিয়ে দিয়েছে পিচ্চি পাখি। রাজের এমন লুতুপুতু ডাকে অরু বেশ বিভ্রান্ত, তাছাড়া সে পিচ্চিটা কোথায়? একটা বিবাহিত মেয়েকে পিচ্চি বলে,আশ্চর্য? অরু যখন হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে দাড়িয়ে থেকে রাজের কর্মকান্ড পরখ করছিল, তখনই ওর পাশে এসে দাঁড়ায় অনু, কাঁধের উপর কনুই ঠেকিয়ে বলে,— ছেলেটা বেশ স্মার্ট, কি বলিস? আসার পর থেকেই কেমন সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।
অরু মুখ ভেঙিয়ে বলে,
— স্মার্ট না ছাই আমাকে বলে কিনা পিচ্চি পাখি? তুইই বল আপা আমাকে কি পিচ্চি মনে হয়?
অনু অরুর মাথায় চাটি মে'রে বললো,
— বোকা মেয়ে, তুই আমাদের মধ্যে সবার ছোট তাই আদর করে পিচ্চি বলেছে, এতে গাল ফুলানোর কি আছে?

অরু অনুকে সরিয়ে দিয়ে বলে,
— ও তুই বুঝবি না আপা। মন ভালো নেই, দূরে যা।
— এখানে না বোঝার কি হলো? আজিব!
অনু আর কথা না বারিয়ে, ঠোঁট উল্টে বিড়বিড় করতে করতে কিচেনের দিকে চলে যায়। অনু যেতেই রাজ অরুর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে,
— এই যে পিচ্চি পাখি দাঁড়িয়ে না থেকে একটু হেল্প করলেও তো পারো। একা হাতে এতোগুলা ওয়ালবোর্ড লাগানো যায়?
রাজের কথায় অরু তেঁতে উঠে মুখ ঝামটি দিয়ে রুমে যেতে যেতে বললো,
— পারবো না, করলে করুন না করলে ভাগুন।
অরু চলে যেতেই রাজ মুচকি হেঁসে বলে,
— হাউ কিউট।
.
রুমে এসে লাইট নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো অরু, অরুর উদাস উদাস লাগছে খুব, কালকে তৈরি হওয়া বুকের মাঝের চিনচিন ব্যথাটা এখন তীব্রাকার রূপ ধারণ করেছে। ঘুমানোর আশায় চোখ দুটো বন্ধ করলেই একটা অসম্ভব সুদর্শন রাগী রাগী মুখ এসে হানা দিচ্ছে চোখের পাতায়। কি চায় সে? কেন ঘুমাতে দিচ্ছে না? কেনইবা বুকের বা পাশে তীব্র ব্যথার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে? ক্রীতিকের কথা ভাবতে গিয়েই অরুর অকস্মাৎ মনে পরে যায় ডোরার কথা। এখন অরু নেই, ক্রীতিক নির্ঘাত ডোরাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।
— না না।

ডোরার কথা চিন্তা করে অরু শোয়া থেকে উঠে বসলো, মনেমনে ঠিক করলো, কাল ভার্সিটি হয়ে ক্রীতিকের বাড়িতে গিয়ে ডোরাকে যতদ্রুত সম্ভব নিয়ে আসতে হবে।
— কিন্তু রাতই বা কখন শেষ হবে? আর আগামীকালই বা কখন আসবে?
অস্ফুটে কথাটা উচ্চারণ করতেই আবারও চোখ মুখ বিষন্নতায় ছেয়ে গেলো অরুর। বুকের ভেতর সেই এক তীক্ষ্ণ চিনচিন ব্যথা, অরুর কষ্ট হচ্ছে, অজানা কষ্ট, কিন্তু কার জন্য? বারবার মনে পরছে ক্রীতিকের মুখ থেকে উগড়ে আসা স্পষ্ট কথাগুলো,—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কি জানিস? তোর প্রেমে পরা।
গুনেগুনে বারো বছরের বড় হয়েও ক্রীতিক অরুর প্রেমে পরেছে, কথাটা ভাবতেই শিহরিত হয়ে উঠছে অরুর হৃদয় মন সব কিছু l হাজার চেষ্টা করেও ক্রীতিকের কথা মাথা থেকে সরানো যাচ্ছে না। না চাইতেও ওই মুখটাই মনে পরছে বারবার। এ যেন মন মস্তিষ্কের এক তীব্র দোটানা। আর ভালো লাগছে না,এই উদাসীনতা, মনটা যে কি চাইছে নিজেও জানেনা অরু।
ওই জন্যই তো ক্রীতিককে না জানিয়ে চুপিচুপি চলে আসা, নয়তো ক্রীতিক সবার সামনে জিদের বসে কি না কি করে বসতো কে জানে?ক্রীতিককে নিয়ে অহেতুক ভাবতে ভাবতেই অরুর চোখ যায়, রুমের পাশে টানা বারান্দার দিকে। অরু ভাবলো একবার বারান্দায় গিয়ে দাড়াবে, তাহলে যদি ভেতরের কষ্ট কষ্ট ভাবটা একটু কমে আসে। যেই ভাবা সেই কাজ, একটু খানি সস্থির আশায় এগিয়ে গিয়ে কাঁচ ঠেলে বারান্দায় গিয়ে দাড়িয়ে পরলো অরু, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ দমকা হাওয়া এসে চোখেমুখে আঁচড়ে পরলো ওর। এই

রুমের বারান্দাটা ভবনের একেবারে পেছন দিকে। পেছনের রাস্তাটাও নির্জন। সোডিয়ামের মৃদু আলো ব্যতিত খুব বেশি আলো এখানে নেই। মানুষ জনের আনাগোনাও তাই বেশ কম।যাকে বলে নিরিবিলি পরিবেশ। নিরিবিলি পরিবেশের সাথে আজ বাইরে তীব্র বাতাসের তান্ডব নৃত্য চলছে, কি জানি ক্রীতিক কি করছে? মনের মাঝে প্রশ্নটা উঁকি দিতেই অরু মিনমিনিয়ে বললো,

— কি আর করবে, হয় কানে হেডফোন গুঁজে ডার্ক রোমান্টিক অডিও বুক শুনছে, নয়তো বাইক নিয়ে রাইডে বেড়িয়েছে, বোরিং লোক একটা।বিড়বিড়িয়ে কথাটা বলে, হাত দিয়ে বারান্দার কার্নিশে ভর করে মাথা নুয়িয়ে সোজা নিচের দিকে চাইলো অরু। নিচে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে উঠলো ওর। নিজেকে ভুল প্রমান করতে সোজা হয়ে দাড়িয়ে কয়েকবার চোখের পলক ছেড়ে পুনরায় নিচের দিকে তাকালো অরু।দেখলো, অরুর দৃষ্টি বরাবর বাইকে হেলান দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ক্রীতিক।

চুল গুলো অগোছালো। ফর্মাল শার্টের হাতাটাও গুটানো, গলায় টাই নেই, সামনের দিকের কয়েকটা বোতাম অবাধে খুলে রাখা যার ফলে ঢেউ খেলানো ফর্সা বক্ষদেশ স্পষ্ট দৃশ্যমান। ক্রীতিককে বড্ড এলোমেলো লাগছে।ঘোলাটে দৃষ্টিটাও কেমন বেসামাল, এতো দুর থেকেও ক্রীতিকের আহত দৃষ্টিতে বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো অরুর। কেন যেন মনে হচ্ছে ক্রীতিক আর কারোর জন্য নয়, বরং ওর জন্যই দাঁড়িয়ে আছে এতো রাতে।অরুও আর বারান্দায় চুপ হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারলো না।হুট করেই কি ভেবে যেন ওড়নাটা নিয়ে সবার আড়ালে ছুটে বেড়িয়ে গেলো এপার্টমেন্ট থেকে। মাথায় ভালোমতো ঘোমটা টেনে ছুটে এলো ক্রীতিকের

কাছে। অরু নিচে নেমে এসেছে, তাও ক্রীতিক একই ভাবে তাকিয়ে আছে অরুর পানে, কোনো রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, বিরক্তি নেই, দু'চোখে যা আছে তা হলো একরাশ মাদকতা।
অরু সুতি থ্রীপিচ পরে আছে, মাথায় ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা। লম্বা সিল্কি চুলগুলো পুরোপুরি বাঁধনহারা। অরু ক্রীতিকের কাছে এগিয়ে আসতেই ক্রীতিক দু'হাতে ওর কোমড় আঁকড়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,
— তোকে হুট করেই বউ বউ লাগছে জান।
ক্রীতিকের কথা স্পষ্ট নয়, মাথাটাও কেমন টলছে, মুখ দিয়ে অ্যা'লকোহলের বি'শ্রি গন্ধ বের হচ্ছে। অরু চোখ মুখ কুঁচকে বললো,— আপনি অ্যা'লকোহল খেয়ে বাইক রাইড করে এতোদূর চলে এসেছেন?
ক্রীতিক হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে,অরু পুনরায় বলে,
— যদি কিছু হয়ে যেত?
ক্রীতিক ওর কথায় তোয়াক্কা না করে নিভু নিভু চোখে বললো,
— তুই আমায় ছেড়ে কেন চলে এলি? এখন কি করে থাকবো আমি? একটু তো চোখের সামনেই দেখতাম, সেটাও তোর মায়ের সহ্য হলোনা?
অরুর কাছে ক্রীতিকের এই রূপ পুরোপুরি নতুন, ও কখনো ক্রীতিককে এমন নরম সুরে কথা বলতে শোনেনি, আজই প্রথমবার। ক্রীতিকের বলা প্রত্যেকটা কথা অরুর শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বুকের মাঝে জমতে থাকা সেই তীব্র চিনচিন ব্যথাটা হুট করেই কেমন উবে গিয়েছে, পাছে এসে ভর

করেছে অজানা এক প্রশান্তি। কি নাম দেওয়া যায় এই প্রশান্তির? জানা নেই অরুর।
অরু চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ক্রীতিক অরুর ওড়নাতে নাক ঘষে দু'হাতে ওকে আরও খানিকটা কাছে টেনে বললো,— হার্টবিট, ফিরে চল আমার সাথে, তুইতো আমার। তোকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হচ্ছে তো। বল যাবি?
ক্রীতিকের প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই অরুর কাছে। ও তো এখনো ক্রীতিককে নতুন রূপে আবিষ্কার করায় ব্যস্ত, এ কোন ক্রীতিককে দেখছে ও? অরু যখন ক্রীতিকের বাহুডোরে দাড়িয়েই ক্রীতিককে নিয়ে হাজারো চিন্তায় বিভোর, তখনই কানে ভেসে আসে অনুর গলার কর্কষ আওয়াজ, উপর থেকেই হাঁক পেরে পেরে ওকে ডাকছে অনু, বারবার বলছে,
— রাতের বেলা কোথায় গেলো মেয়েটা?
রুমে দাঁড়িয়ে অনু ডাকছে বুঝতে পেরে অরু নিজের মাথার ঘোমটাটা আরও ভালো করে টেনে নিয়ে ক্রীতিককে উদ্দেশ্য করে বলে,— মোবাইল কোথায় আপনার?
— মোবাইল দিয়ে কি করবি?
— দরকার আছে দিন?
ক্রীতিক অরুর ওড়নাতে নাক ঘষতে ঘষতে বললো,
— পকেটে মনে হয়।
ক্রীতিক টলছে, তাই অরু নিজেই ওর পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে কল দিলো প্রত্যয়ের নাম্বারে, প্রত্যয় ফোন রিসিভ করে ওপাশ থেকে কিছু বলার আগেই অরু এক নিঃশ্বাসে বললো,

— ওনাকে, না মানে ক্রীতিক ভাইয়াকে আমাদের বাসার সামনে থেকে নিয়ে যান, উনি ড্রাং’ক হয়ে আছেন।
প্রত্যয় চমকে গিয়ে বললো,
— কি বলছো কোথায় আছে ভাই?
অরু মিনমিনিয়ে বললো,
— আমাদের নতুন বাসার পেছনের রাস্তায়।
প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,— ওয়েট, আমি এক্ষুনি আসছি।
প্রত্যয় কল কাটার আগে অরু একটু আগ বাড়িয়ে বললো,
— ইয়ে ভাইয়া, আপাকে কিছু বলবেন না দয়া করে।
প্রত্যয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানায়,
— যদিও বা ক্রীতিক ভাই এসবে পরোয়া করেনা, তবুও তুমি যখন বলেছো তখন বলবো না।
অরু সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে ফোন কেটে দিয়ে ক্রীতিককে বললো,
—- আপনি থাকুন, আমি আসছি। আপা তখন থেকে ডাকছে, দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।
ক্রীতিক এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলে,
— উহু কোথাও যাবিনা , তুই আমার সাথে ঘুমাবি এখন, ঠিক সেই রাতের মতো তোকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুমাবো আমি।
ক্রীতিকের কথায় অরু মনেমনে বলে,
— আপনি সাভাবিক থাকলে এমন আচরণ করেন না কেন বলুন তো?এমন ব্যাবহার করলে তো আমি কবেই আপনার প্রেমে পরে যেতাম। নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে ধরনীতে, ক্রীতিকের বাড়িটা যেমন পুরোপুরি নির্জন নিরিবিলি, ঘুম থেকে উঠলে মনেহয় মৃ’ত্যু

পুরি। এখানে মোটেও তেমনটা নয়, সকাল সকাল বেশ ভালোই গাড়ি-ঘোড়া মানুষ জনের শোরগোল শোনা যায়।
নতুন পরিবেশ তাই খুব সকাল সকালই ঘুম ভেঙেছে অরুর, ঘুম ভেঙেছে কথাটা অবশ্য পুরোপুরি মিথ্যে। কালরাতে এক ফোটাও ঘুম হয়নি অরুর, সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিয়েছে, আর এখন ঘুম থেকে উঠেই রেডি হচ্ছে ভার্সিটিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।
রেডি হয়ে বের হওয়ার সময় মায়ের হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে ওকে, কোথায় যাচ্ছো,কখন ফিরবে, কতদূরে ভার্সিটি আরও কত কিই। প্রথমে তো সয়ং রাজকেই ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলো কাঁধের মধ্যে। পরে অবশ্য কোনো মতে কথা কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে অরু। এপার্টমেন্ট থেকে বেড়িয়ে মেট্রো ধরে সোজা ভার্সিটিতে যাওয়া যায়, কিন্তু আজকেতো মঙ্গলবার, ক্রীতিকের ক্লাস নেই। সেটা মনে করতেই অরু পিছুপা হাটে, আজ আর ভার্সিটিতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই ওর। বরং উল্টো পথে গিয়ে ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে পরে ওর চেনা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।চেনা পরিচিত অত্যাধুনিক ডুপ্লেক্স বাড়িটার সামনে দাড়িয়ে আছে অরু। সকাল সকাল যে আত্নবিশ্বাস নিয়ে এখানে এসেছিল, বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতেই সেই আত্মবিশ্বাস কর্পূরের মতো কেমন হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এই মূহুর্তে মুখগহ্বরে একটুও তরল অবশিষ্ট নেই শুষ্ক গলাটাকে ভেজানোর জন্য। ঠান্ডা আবহাওয়ার মাঝেও হাতের তালু কেমন ঘেমে উঠেছে, পা'দুটো কেমন ঝিনঝিন করছে। তবুও সকল চিন্তা, ভাবনা,ভয়'ডর কে পিছু হটিয়ে ঘরের দরজার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো অরু।

প্রথমে ভেতরে গিয়ে ক্রীতিককে কি বলবে, না বলবে, সেই কথাগুলো হাজার বার প্রাকটিস করে নিয়েছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই। অতঃপর পাসওয়ার্ড টিপে সোজা বাসার মধ্যে। হলরুমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে চোখ দুটো কুঁচকে এলো অরুর। দেখলো বরাবরের মতো ঘরময় অন্ধকার করে কানে মস্তবড় হেডফোন লাগিয়ে, কাউচে আধশোয়া হয়ে বসে বাইক রাইডিং গেইম খেলছে ক্রীতিক। অরুকে না দেখেই ওপাশ থেকে তার গমগমে আওয়াজ ভেসে এলো,— কি চাই?

অরু কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগটা হাত দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বললো,

— ডোরাকে নিতে এসেছি।

তৎক্ষনাৎ কানের হেডফোন খুলে পেছনে তাকিয়ে, ক্রীতিক দাঁত কটমটিয়ে বললো,

— ডোরা কি তোর বাপের কেনা সম্পত্তি? যে চাইলেই নিয়ে যাবি।

অরু মিনমিনিয়ে বললো,

— ডোরা আমার মেয়ে, ও আমার সাথেই থাকবে।

ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,

— আমাকে কি তোর বিড়াল মনে হয়? আমি কেন বিড়ালের বাচ্চা জন্ম দিতে যাবো শুনি?

অরু মাথা তুলে বললো,

— আপনাকে তো কিছু বলিনি।

— মুখে মুখে তর্ক করছিস? কাছে আয়।

দিনের বেলাতেও পুরো বাড়ি রাত হয়ে আছে, অরু একটা শুষ্ক ঢোক গিলে শুধালো,

— কাছে এলে কি করবেন?
— আমার যা খুশি তাই করবো, এখন চুপচাপ কাছে আসবি, নাকি আমি উঠে টেনে হিঁ’চড়ে, থা’প্পর দিয়ে কাছে টেনে আনবো সেটা তোর ইচ্ছা, ডিপেন্ডস অন ইউ।
এই বলে আবারও পেছনে ঘুরলো ক্রীতিক। অরুর অজানা এক বিশ্বাস ক্রীতিক ওকে কাছে গেলে কিছুই বলবে না, সেই বিশ্বাস থেকেই পা টিপে টিপে ক্রীতিকের কাছে এগিয়ে গেলো অরু। ও পাশে এসে দাঁড়াতেই ক্রীতিক পুনরায় হুকুম করলো,— পাশে বস।
অরু তাই করলো, চুপচাপ ক্রীতিকের থেকে দুরত্ব বজায় রেখে পাশে গিয়ে বসলো। অরু বসেছে কি বসেনি,তৎক্ষনাৎ ওর কোলের উপর মাথা দিয়ে সটান শুয়ে পরলো ক্রীতিক। ক্রীতিকের এমন অকস্মাৎ কান্ডে অরুর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলো। এতোক্ষণ ধরে ছোট্ট মেদহীন পেটটা শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে যে ওঠানামা করতো সেটাও পুরোপুরি বন্ধ। অরু এমন স্ট্যাচু হয়ে আছে দেখে ক্রীতিক চোখ খুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,
— কিরে শ্বাস করছিস না কেন? ম’রে যাবি তো।
— কককরছি।
ক্রীতিক পুনরায় চোখ বন্ধ করে অরুর হাতটা মাথায় রেখে বললো,
— কাল সারারাত ঘুমাতে পারিনি, মাথাব্যাথা করছে, এখন ঘুমাবো, যতক্ষণ ঘুমাবো হাত যাতে মাথা থেকে না নড়ে।
ক্রীতিকের কথায় অরুর খুব বেশি অসস্থি হলোনা, ওর মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অরু ঠোঁট টিপে হেঁসে মনেমনে বললো,— কাল রাতে যা পাগলামি করেছেন তাতে মাথা ব্যাথা হওয়ারই কথা।

অরুর হাতের স্নিগ্ধ পরশে ক্রীতিক ঘুমের দেশে পারি জমাতে জমাতে হাস্কিস্বরে বললো,
— অরুউউ,
— হুম।
ক্রীতিক এবার উপর হয়ে শুয়ে বললো,
— তুই পুরোপুরি আমার হয়ে যা, বিলিভ মি আমি তোকে মাথায় করে রাখবো, একটুও বকবো না, একটুও মা'রবো না।
ক্রীতিকের করা অস্পষ্ট সীকারোক্তি আদৌও অরু শুনেছে কি শোনেনি কে জানে?মায়ের মাথায় বিলি কেটে তেল মালিশ করে দিয়ে, মাকে ঘুম পারিয়ে মাত্রই রুমে এসেছে অনু। রুমে আসা মাত্রই অনু দেখতে পায় ভাইব্রেড মুডে থাকা ফোনটা সেই তখন থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনু এগিয়ে গিয়ে ফোন কানে তুলতেই প্রত্যয় অসহায় সুরে বললো,
— তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে অনু।
অনু মৃদু হেসে বললো,
— কি করে দেখবেন? এখন তো আর হসপিটালে যেতে হয়না, ক্যাফের জবটাও মায়ের ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি, মা এসব একদম পছন্দ করেননা।
প্রত্যয় ত্যাক্ত হয়ে বললো,
— আমি তোমাকে দেখতে চাই ব্যাস, কিভাবে দেখা করবে সেটা আমি জানিনা।
অনু একটু ভেবে বললো,
— দেখি গ্রোসারীর কথা বলে বের হতে পারি কিনা, পারলে জানাবো আপনাকে। হয়তো সাথে করে অরুকেও ধরিয়ে দেবে মা।

প্রত্যয় হেঁসে জবাব দিল,
— নো প্রবলেম।
মনেমনে বললো,
— ভাইকে ম্যানেজ করে নিয়ে আসতে পারলে, অরু অটোমেটিক ম্যানেজ। সারাদিন পার করে গোধূলি লগ্নে ঘুম ভাঙলো ক্রীতিকের। আড়মোড়া ভেঙে চোখ খুলতেই, চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ঘুমন্ত এক মায়াপরীর স্নিগ্ধ মুখশ্রী। এটা অরু, ক্রীতিকের ব্যাক্তিগত অরু, যে এই মূহুর্তে ক্রীতিকের মাথাটা কোলে নিয়েই, কাউচে হেলান দিয়ে গুটিসুটি মে'রে ঘুমাচ্ছে। ওর নরম তুলতুলে হাতটা এখনো ক্রীতিকের চুলের ভাজেই নিবদ্ধ। আজকাল অরুর একটু একটু আ'ত্নসমপর্নে বেশ খুশি ক্রীতিক। অরুকে দেখতে দেখতেই ক্রীতিকের ঠোঁট দুটো প্রসারিত হলো আন্তরিকতা জড়ানো হাসিতে। পরক্ষনেই হাতের কব্জিতে এটে থাকা ঘড়িতে একনজর চোখ বুলিয়ে উঠে বসে ক্রীতিক। অন্যপাশ থেকে একটা পাতলা ফিনফিনে চাদর এনে অরুর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সোজা চলে যায় দোতলায়। অরুর যখন ঘুম ভাঙে তখন সন্ধ্যা প্রায়, কোনমতে ঘুমু ঘুমু চোখে উঠে বসে, চারিদিক পর্যবেক্ষন করে আঁতকে ওঠে অরু। দাঁত দিয়ে জিভ কে'টে তারাহুরো করে উঠতে উঠতে বলে,
— এই রে, আমার তো ফিরতে হবে, কখন ঘুমিয়ে পরলাম আমি? উঠে দাড়িয়ে হাতের ঘড়িতে সময় দেখতে দেখতেই অরুর চোখ যায় কিচেন কাউন্টারের দিকে, সেখানে বসে বসে কফি পান করছে ক্রীতিক। তার পড়নে লেদার জ্যাকেট, আর ব্ল্যাক ডেনিম, পাশের স্টুলে হেলমেট রাখা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাইক নিয়ে বের হবে ।

সেই সকালে এসে এমন সন্ধ্যা বাঁধিয়ে ফেলবে ভাবতে পারেনি অরু, এই মূহুর্তে মায়ের করা হাজারটা প্রশ্নের ভয়ে তটস্থ হয়ে গিয়েছে ও। তাই কোনো কিছু না ভেবেই দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে ক্রীতিকের জামা টেনে ধরে কাঁদো কাঁদো সুরে অরু বললো,
— সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তো, বাসায় কিভাবে ফিরবো?
ক্রীতিক নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দেয়,
— ফিরতে হবে না,থেকে যা।
— মজা করবেন না, আমাকে যেতে হবে, মা আছে তো।
— আমার ম্যাচ আছে, প্রত্যয়কে কল দিয়ে আসতে বলেছি ও তোকে নিয়ে যাবে।
ক্রীতিক দিয়ে আসবেনা শুনে অরুর কি একটুও অভিমান হলোনা? হলোতো বটে। তবুও ও বাচ্চাদের মতো ক্রীতিকের জ্যাকেট টানতে টানতে বললো,— কখন আসবে সে? আমাকে এক্ষুনি ফিরতে হবে।
ক্রীতিক এবার অরুকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে বললো,
— কতবার বারণ করেছি আমার কাছে আসবি না, আমাকে ধরবি না, কথা শুনিস না কেন?
ক্রীতিকের কথায় অরুও তেতে উঠে ঝাঁজ নিয়ে বললো,
— কেন বারণ করেছেন?আমার শরীরে কি নোংরা লেগে আছে?
ক্রীতিক এবার উঠে দাড়িয়ে অরুর দিকে এগোতে এগোতে বললো,
— তোর শরীরে কি লেগে আছে সেটা কেবল আমিই জানি।
ক্রীতিকের হটাৎ করেই পরিবর্তন হয়ে যাওয়া গলার আওয়াজে খানিকটা ভরকে গেলো অরু। মাথা উঁচু করে একনজর ক্রীতিকের দৃষ্টি পরখ করে, ওর এগিয়ে আসার তালে তালে পেছাতে পেছাতে শুষ্ক ঢোক গিলে অরু শুধায়,— ককি লেগে আছে?

ক্রীতিক বাঁকা হেসে বললো,
— এভাবে পিছিয়ে যাচ্ছিস কেন?
অরু কাঁপা কাঁপা কন্ঠে জবাব দিল,
—আপনি এগুচ্ছেন তাই, ভ'য় করছে।
—নিজের স্বামীকে এতোটা ভয় পেলে হবে?
ক্রীতিকের মুখে "স্বামী" শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অরুর পিঠ গিয়ে ঠেকলো কাঁচের দেওয়ালে।
ক্রীতিক ধীর পায়ে অরুর খুব কাছে এগিয়ে এসে ওকে একটানে ঘুরিয়ে দিলো, অরু এখনো কাচের দেওয়ালের সাথে সিঁটিয়ে আছে। তীব্র হৃদস্পন্দনের তালে ক্রমাগত ওঠানামা করছে ওর ছোট্ট নারীদেহটা, ক্রীতিক একহাতে অরুর রেশমের মতো লম্বা চুল গুলো পিঠ থেকে সরিয়ে ঘাড়ের পাশে রেখে দিলো, অন্যহাত দিয়ে একটানে খুলে ফেললো, পিঠের উপর ফুল বানিয়ে বাঁধা টপস এর লম্বা ফিতেটা। হঠাৎ করেই ফিতে খুলে ফেলার দরুন জামার গলাটা একেবারে ঢিলে হয়ে গিয়েছে। অরুর হাত পা অজানা লাবডুবের দরুন অবশ হয়ে আছে, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বলে, মুখ ফুটে কথা বলার বাক শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই ওর মাঝে।
শরীরের তোরনে তোরনে কুন্ডলী পাকিয়ে ওঠা নারীসত্ত্বার কাছে হেরে গিয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে কাচের দেওয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে আছে অরু। ক্রীতিক ঘোর লাগা চোখে অরুর ফর্সা কামুক পৃষ্ঠদেশে তাকিয়ে একটা শুষ্ক ঢোক গিললো, অতপর এক হাতদিয়ে ওর বাহু চেপে ধরে, মুখ বাড়িয়ে দিলো পিঠের মাঝ বরাবর। তবে ঠোঁট দিয়ে ঘাড় স্পর্শ করার আগেই ওদের মাঝে ধূমকেতুর হলকার

মতো হটাৎ জ্বলে ওঠা অবাধ্য অনুভূতিকে শিথিল করে দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে প্রত্যয়।— ভাই, অরুকে আম.......
প্রত্যয় ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চুল দিয়ে অরুর পিঠটা ঢেকে দিলো ক্রীতিক। অতঃপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর গলায় বললো,
— তুমি গাড়িতে ওয়েট করো, আমি অরুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলে, ক্রীতিক আবারও অরুর জামার ফিতেয় হাত দেয়। এবার অরু সংকুচিত হয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললো,— কি করছেন।
ক্রীতিক জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আবারও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— কিচ্ছু করবো না, পেছনে ঘোর ফিতেটা লাগিয়ে দিই, তোর না লেট হয়ে যাচ্ছে?
অরু এবার হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে পেছনে ঘুরে দাড়ায়, ক্রীতিক আলতো হাতে ফিতেটা লাগিয়ে দিতে দিতে বললো,
— রাতে বারান্দায় আসবি, আমি নিচে ওয়েট করবো।অরুর আপাতত হ্যা না কিছু বলার মতো অবস্থা নেই। গোল গোল গাল দুটো র'ক্তরাঙা হয়ে মনে হচ্ছে এক্ষুনি ফেটে পরবে। কান দুটো উষ্ণতার শিখরে পৌছে গিয়েছে সেই কখন। মুখ তুলে আর ক্রীতিকের চোখের দিকে চাওয়ার সাহস হলোনা ওর। কোনো মতে ব্যাগটা হাতরে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। তারপর সোজা গাড়ির মধ্যে।
অরু বেরিয়ে যেতেই ডোরা ক্রীতিকের পায়ের কাছে এসে মিয়াঁও মিয়াঁও লাগিয়ে দিয়েছে। ক্রীতিক ডোরাকে দেখে উপহাস করে হেঁসে বললো,

— তোর মালকিন তো তোকে না নিয়েই চলে গেলো। শেইম অন ইউ ডোরা।হাহ!সানফ্রান্সিসকো মূল শহরে রাতকে রাত মনে হয়না মোটেই। রাস্তার দু'ধারে ক্যাফে,নাইট ক্লাব,বিলবোর্ড, মার্ট সবখানে স্থানীয় মানুষজন, ফরেইনার,টুরিস্ট দের আনাগোনায় জমজমাট এই যায়গাটা। ক্রীতিকের শহরতলীর মতো রাতের নিকোশ কালো আধার মোটেই ছুতে পারেনা এই ব্যস্ত নগরীকে। মনুষ্য সজ্জিত ঝিকঝিক করে ওঠা স্ফটিকের লাইট আর হ্যাজাকের আলোয় এখানকার দিন আর রাত দু'টোই সমান।

খুব বেশি রাত যে হয়েছে এমনটা ও নয়, ঘড়ির কাটায় বেজেছে আটটা কি সারে আটটা। তবুও ঘরে ফেরার চিন্তায় ঘাম ছুটে যাচ্ছে অরুর। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শুষ্ক অধরযুগল বারবার ভিজিয়ে নিচ্ছে জিভ দ্বারা। ক্রীতিকের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতেই অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে, তারউপর এখন আবার আকাশে গুড়গুড়িয়ে মেঘ ডাকছে। ওদিকে মা নিশ্চয়ই রে'গে বো'ম হয়ে আছে,ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার প্রশ্ন ছু'ড়ে মা'রবে কে জানে?

তখন একসঙ্গে এতোগুলা মিথ্যে কথা কি করে বলবে অরু? ক্রীতিকের বাড়িতে গিয়েছিল সেটাই বা কিভাবে বলবে?মা আর ক্রীতিকের সম্পর্ক তো অতোটাও সাভাবিক নয়। অরু যখন হাজারো চিন্তায় মশগুল হয়ে চুপচাপ বসে আছে, তখনই নিরবতা ভেঙে পাশ থেকে প্রত্যয় বলে,— এসে গিয়েছি।

প্রত্যয়ের কথায় ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায় অরুর। গাড়ির জানালা দিয়ে একঝলক উঁকি দিয়ে নিজের সল্প চেনা লাক্সারিয়াস এপার্টমেন্টাল ভবনটার দিকে তাকিয়ে,পুনরায় চোখ ঘুরিয়ে প্রত্যয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় অরু। এগিয়ে গিয়ে গেইট

খুলে লিফ্টের সামনে গিয়ে দেখতে পায়, লিফট এখনো ছাব্বিশ তলায় আটকে আছে। ব্যতিগ্রস্থ অরু মনেমনে ভাবলো,
— আমিতো কেবল তিন তলায় যাবো, এই লিফটের জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে বরং সিড়ি দিয়ে এক দৌড়ে চলে যাওয়াটাই উত্তম।
ভাবনার সাথে কাজের মিল রেখে অরু দ্রুত উঠে গেলো সিঁড়ি বেয়ে, তবে সিঁড়ির মাঝবরাবর আসতেই ঘটলো বিপত্তি, তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে কারও শরীরের সাথে ধাক্কা লেগে প্রায় পরেই যাচ্ছিল অরু,তার আগেই ওকে দু'হাতে দিয়ে সামলে নেয় লোকটা, অস্ফুটেই মুখ দিয়ে বলে,— ঠিক আছো,পিচ্চি পাখি?
চেনা পরিচিত পুরুষালি কন্ঠস্বর শুনে, পরে যাওয়ার ভয়ে খিঁচিয়ে রাখা চোখ দুটো অকস্মাৎ খুলে গেলো অরুর, তাকিয়ে দেখলো ওর মায়ের নিউ এ্যাসিসট্যান্ট রাজ ওকে সামলে রেখেছে। রাজকে দেখা মাত্রই কেমন মেজাজ চড়াও হয়ে গেলো অরুর, সেই সাথে রাজের দেওয়া অসহ্য নিক নেম, ও কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে কাটকাট গলায় বললো,
— আমি ঠিক আছি, ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি এখানে রাতের বেলা কি করছেন? ধান্দা কি সেটা বলুন?
রাজ সম্মোহনী হাসি দিয়ে বললো,
— কোনো ধান্দা নেই ম্যাডাম,এই পুরো ভবনের বেশির ভাগ এপার্টমেন্ট গুলোই বাঙালিদের। সেই সাথে দুইতলার কর্নারেরটা আমাদের। আব্বু,আম্মুকে নিয়ে ছোটবেলা থেকে এই ফ্ল্যাটেই থাকি আমি। সে হিসেবে বলতে গেলে, আমার আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিৎ, ধান্দা কি?

ছেলেটা হেঁসে হেঁসে কথা বলে ঠিকই, কিন্তু কথার মাথায় খোঁচা দিতে একচুলও ছাড় দেয়না,বড্ড শেয়ানা। রাজের কথায় অরু চোখ মুখ কুঁচকে অবিশ্বাসের সুরে বললো,— কিহ!
রাজ পুনরায় ঠোঁট গলিয়ে হেঁসে বললো,
— ইয়েস ম্যাডাম, ফ্রম নাও অন, উই আর নেইবর। হ্যাপি নেইবর হুড।
অরুর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ, কপালটা সেই কখন থেকে কুঁচকে আছে,মনেমনে ভাবছে,
—নেইবর হুড না ছাই, এখন থেকে এই কার্টুনটাকে সারাক্ষণই সহ্য করতে হবে। কি দেখে যে এই ভবনেই উঠেছিল মা, কে জানে?
— এই যে পিচ্চি পাখি,কিছু ভাবছো?
রাজের কথায় অরু না বোধক মাথা নাড়িয়ে, সিড়ি ডিঙিয়ে উপরে যেতে বিরক্তির সুরে বললো,
—আপনার ঢংগী ডাক শোনার সময় নেই। তাড়া আছে আমার। অযথা কথা না পেঁচিয়ে যে কাজে যাচ্ছিলেন সেখানে যানতো,আজাইরা।
অরু চলে যেতেই রাজ আরেকদফা হেঁসে বললো,
— রাগ দেখালেও কিউট লাগে। একরকম দৌড়াতে দৌড়াতেই হন্তদন্ত হয়ে বাসার ভেতর প্রবেশ করলো অরু, অনু তখনো ড্রয়িং এ বসা ছিল। অরু ভেতরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে কালবিলম্ব না করে অনুকে শুধালো,
— আপা, মা কোথায় রে?
অনু অবাক হয়ে বললো,

— মা তো সেই বিকেল থেকে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু তুই এমন করে হাঁপাচ্ছিস কেন?
অনুর কথায় অরু সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে, মনেমনে বললো,
— যাক এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম, নয়তো মা যেই বিচক্ষণ ঠিক কোনো না কোনো ভাবে ধরে ফেলতো আমি ভার্সিটিতে নয় অন্য কোথাও গিয়েছিলাম।
অরুকে চুপ হয়ে থাকতে দেখে, অনু ভ্রু কুঁচকে বললো,— তোর কি হয়েছে বলতো? আজকাল হুটহাট স্ট্যাচু হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাস। কাহিনি কি সত্যি করে বল?
অরু হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে বললো,
— আরে দূর কোনো কাহিনি নেই, দেরি হয়ে গিয়েছে তাই ভয়ে ছিলাম আর কি, যাই একটু পানি খাই।
নিজের বেড়ে যাওয়া শ্বাসপ্রশ্বাস কে খানিকটা সামাল দিতে অরু ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে পানি পান করছিল, তখনই ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে অনু বলে ওঠে,
— অরু তোর জামার ফিতেয় এমন গিট্টু মা'রা কেন?এখন এটা বলিস না যে, জামার ফিতেয় এমন গিট্টু মে'রে তুই সারা ভার্সিটি ঘুরে বেরিয়েছিস। কথা শেষ করে অট্টহাসিতে ফেটে পরে অনু। এদিকে অরু অবুঝের মতো নিজের পেছনে হাত দিতেই মনে পরে যায় এটা ক্রীতিকের কাজ। তখন ক্রীতিকই ওর জামার ফিতেটা টান মে'রে খুলে ফেলেছিল, তারপর নিজেই বেধে দিয়েছিলো। কিন্তু এই ভাবে গিট্টু মে'রে জামার ফিতা কে লাগায়?লজ্জা,সংকোচ, বিরক্তি তিনের সংমিশ্রণে অরুর চোখ মুখ বুঁজে এসেছে। তখনকার কথা মনে পরলে এখনো শরীরটা কেমন কম্পিত হয়ে উঠছে অজানা

শিহরণে। ওদিকে একটা ফিতে বাঁধতে না পারার অযোগ্যতায় ক্রীতিকের উপর রাগও লাগছে খুব।
অনু সেই কখন থেকে একাধারে দাঁত কেলিয়ে যাচ্ছে। অরু নিজের মূর্খতা এড়াতে কোনোমতে অনুকে পাশ কাটিয়ে রুমে চলে যায়, অরু মাথা নুয়িয়ে চলে যাচ্ছে দেখে অনু টিপ্পনী কেটে বললো,
— এই যে পিচ্চি পাখি, পরের বার ফিতে না বাঁধতে পারলে, আমাকে বলিস কেমন,আমি লাগিয়ে দেবো, তবুও এমন গিট্টু মে'রে মান সম্মান খোয়াস না।
অরু পেছনে ঘুরে নাক সিকোয় তুলে বললো,— আপা তুইও?
অরুর অসহায় বাক্যে অনু আবারও ভেতরের কষ্ট করে আটকে রাখা হাসিটা উগরে দিলো।
অরুর আর কিইবা করবে, ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মিনমিনিয়ে বলে,
— তুই ভুল ভাবছিস আপা, এটা আমার নয়, প্রফেসর জেকে'র কাজ। সাইন্সল্যাবের সবচেয়ে আধুনিক আর ব্যয়বহুল রুমে বসে, মাইক্রোস্কোপ মেশিনে চোখ লাগিয়ে কিছু একটা তরল জাতীয় পদার্থ সুক্ষ্ম নজরে পর্যবেক্ষন করছে নিখিল। সামনে থাকা তরল পদার্থের দিকে এতোটাই গভীর মনোযোগ যে বারবার অজান্তেই নিজের দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরছে সে। নিখিল বরাবরই ছাত্র হিসেবে একশো তে একশো। নিজের মধ্যে থাকা হাজারটা খারাপ অভ্যেস কিংবা খারাপ চর্চা কোনোকিছুই ওর পিছুটান হয়ে দাঁড়ায়নি ওর মেধাবী মস্তিষ্কের কারনে। শুধু মাত্র তুখোড় মেধাবী হওয়ার দরুন সবকিছু ঢাকা পরে গিয়েছে লোক চক্ষুর আড়ালে, অরুর মতো সহজ সরল মেয়েরাই তার ভুক্তভোগী। নিখিল একটা দুটো নয়, একসাথে অনেকগুলো গার্লফ্রেন্ড রেখে অভ্যস্ত, মেয়েদের

প্রতি ওর অন্যরকম নেশা, যার ফলে কোনো মেয়েকেই না করতে পারেনা ও। আশ্চর্যের বিষয় হলো ওর বেশিরভাগ গার্লফ্রেন্ডই টিনএজ। অরুর বয়সই কিংবা তার চেয়ে একটু কমবেশি।
তবে নিজের কাজের বেলাতে বরাবরই নিখিলের পুরোপুরি ভিন্নরূপ লক্ষ্যনীয়। কাজের ক্ষেত্রে নিখিলের থেকে মনোযোগী আর ডেডিকেটেড মানুষ বোধহয় দুটো নেই। ওই জন্যইতো মেয়েরা নিখিলের প্রতি এতোটা আকর্ষন অনুভব করে। যদিও বা নিখিলের অনেক বেশি নারীআ'সক্তি, তবে সেটা এই সাইন্সল্যাবের বাইরে গিয়ে, কারন কাজের ক্ষেত্রে কখনো কম্প্রোমাইজ করেনা নিখিল। এই যেমন এই মূহুর্তে নিখিলের পাশে সেই কখন থেকে ওরই আফ্রিকান ফ্রেন্ড লিও দাঁড়িয়ে আছে, সেটা গভীর মনোযোগী নিখিলের দৃষ্টিগত হয়নি এখন পর্যন্ত। কি করে হবে নিখিল তো সেই কখন থেকে একধ্যানে মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষন করে চলেছে, কিন্তু যখন মনে হলো কেউ ওর পাশে দাঁড়িয়ে তখনই দ্রুত হাতে কিছু একটা লুকিয়ে ফেললো নিখিল। লিও খানিকটা অবাক হয়ে শুধালো,
— কি লুকালে তুমি? কি আছে ওই বোতলে, দেখি?
নিখিল আড়ালে শুষ্ক ঢোক গিলে, না জানার ভান করে বললো,
— কই কিছুনা তো, মনে হয় ভুল দেখেছো তুমি।
— মোটেই না, কাঁচের বোতলে তরল জাতীয় কিছু, আমি স্পষ্ট দেখেছি।
নিখিল এবার এগিয়ে এসে লিওর ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে বললো,
— বুঝেছি সকাল থেকে না খেয়ে সারাদিন ল্যাবে পরে আছো তাই চোখে ভুলভাল দেখছো, আমিও খাইনি কিছু, চলো ক্যান্টিনে গিয়ে লাঞ্চ করে আসি, আমার ট্রিট।

ট্রিটের কথা শুনতেই খাদক লিও একগাল হেঁসে বললো,
— ওকে ব্রো লেটস গো।
নিখিলও লিওর সাথে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলো,যাওয়ার আগে খুব সাবধানে চোখ ঘুরিয়ে ,লুকিয়ে রাখা কাচের ছোট্ট বোতলটাকে আরও একবার পরখ করে নিলো সে। রাত জেগে অপেক্ষার প্রহর গোনার মতো ধৈর্যের কাজ আর বোধ হয় কিছুতে নেই,তা গত দুদিনে হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে অরু। সেদিন ক্রীতিক বলেছিল বারান্দায় অপেক্ষা করতে,সে আসবে। অরু না চাইতেও মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে গিয়ে অপেক্ষাতো করেছিল ঠিকই, তবে নির্দয় ক্রীতিক তার কথা রাখেনি।
এদিকে দুদিন ধরে ক্রীতিককে না দেখতে পেয়ে বুকের ভেতরের সুপ্ত চিনচিন ব্যথাটা কেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অরুর। আজকাল খেতে, ঘুমাতে, কথা বলতে কিংবা ভার্সিটি যেতে কোনোকিছুই ভালোলাগেনা ওর। সারাদিন দরজা আটকে শুয়ে বসে দিন কাটায় । নয়তো ওয়াশরুমে গিয়ে সারাদিন শাওয়ার ছেড়ে ভিজতে থাকে। এখন তো মাঝেমধ্যেই বারান্দা গলিয়ে চোখ দুটো হাতরে বেরায় কংক্রিটের ভবনের পেছন থেকে চলে যাওয়া নির্জন রাস্তায়,কেবল বুকের মাঝে অদম্য এক আসক্তি সেদিনের মতো হুট করে দেখা হলেও তো হতে পারে। রগচটা, ছন্নছাড়া, বেপরোয়া মানুষটা ওর জন্য আবারও একইভাবে দাড়িয়ে অপেক্ষায় থাকলেও তো থাকতে পারে। কিন্তু না, পরপর দুইদিন অরুর ভাবনা মিথ্যে প্রমানিত হলো। ক্রীতিক আর এমুখো হলো না। মনেমনে আশাহত হয়ে অরু ভাবতে লাগলো,— আমি আসলেই একটা বোকা, জায়ান ক্রীতিকের মতো মানুষ একদিন দাঁড়িয়েছে বলে প্রতিদিন এসে দাড়িয়ে থাকবে,

এটা ভাবাও ভুল, চড়ম ভুল। আর না আমি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ। আমি সব সময় একটু বেশিই আশা করি। ধ্যাত!
গত দুদিন মন মস্তিষ্কের দোটানায় পরে নির্ঘুম রাত পার করে দেওয়ার পর। আজ একটু তাড়াতাড়ি করেই ঘুমাতে গেলো অরু। অযথা, অপারগ ভাবনাদের মাথা থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে গা এলিয়ে দিলো বিছানায়। গত দুদিন ধরে না ঘুমানোর দরুন বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝরিয়ে ক্লান্তি নেমে এলো শরীরে, চোখের পাতা ভার হয়ে এলো অজস্র ঘুমে।
তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ দুটো কেবলই বুঁজে যাবে, তখনই দরজায় সশব্দে কড়া নাড়লো অনু। এমন হঠাৎ আওয়াজে আচমকা লাফিয়ে উঠে বসলো অরু, তন্দ্রা ভাবটা কেটে যেতেই, বুঝতে পারলো বাইরে থেকে আপা ডাকছে ওকে, অরু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই অনু নিজের ফোন এগিয়ে দিয়ে বললো,
— প্রত্যয় সাহেব,কিছু বলবে তোকে, হয়তো ভার্সিটির বিষয়ে, দেখতো কি বলে, আমাকে মা ডাকছে আমি এক্ষুনি আসছি। যদিও অনুর কথার আগামাথা কিছুই অরুর বুঝে আসলো না, প্রত্যয় আবার কি বলবে এতো রাতে?তবুও হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে ফোন কানে ধরলো অরু, এপাশ থেকে হ্যালো বলতেই প্রত্যয় বললো,
— ভাই কনফারেন্সে আছে কথা বলো।
ক্রীতিকের কথা শোনা মাত্রই অরুর পিলে চমকে গেলো। এতোক্ষণ স্থীর থাকা হাতটা হুট করেই কাঁপতে শুরু করলো, হৃদয়ের সুপ্ত চিনচিন ব্যথাটা মূহুর্তেই দিগুণ হয়ে উঠলো। অরু দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে রুমের দরজাটা সপাটে লাগিয়ে দিয়ে, চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলো ওপাশের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য। তৎক্ষনাৎ

বিপরীত পাশ থেকে ভেসে এলো, সুপরিচিত চমৎকার সেই পুরুষালি কন্ঠস্বর,
— বারান্দায় আয়।অরুর মনে হলো কতগুলো দিন পর এই রাগি রাগি আওয়াজটা আবারও শুনতে পেলো ও। “হ্যা” বা “না” কোনোকিছু না বলেই ফোন কানে নিয়ে অরু ছুটে গেলো বারান্দায়। বারান্দার কার্নিশে ভর করে নিচের দিকে অবলোকন করতেই দেখতে পেলো সেই সুদর্শন, গম্ভীর, নির্দয় মানুষটাকে, যাকে একনজর দেখার জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষার প্রহর গুনছিল হৃদয়টা, চোখ দুটো হয়ে উঠেছিল অসহায় আর বেসামাল, অথচ এখন এই মূহুর্তে তার চোখে চোখ পরতেই কেমন ক’র্তন করা ডগার ন্যায় নেতিয়ে পরেছে অরু। লজ্জা আর সংকোচে মুড়িয়ে গিয়েছে পুরোটা শরীর।
ক্রীতিকের ওই ভাসা ভাসা কামুক চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার শক্তি নেই অরুর। তাই ও চোখ ঘুড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে বারবার, তখনই ক্রীতিক পুনরায় বলে ওঠে,— নিচে আয়। তোকে দেখবো।
অরু ক্রীতিকের পানে সচকিত দৃষ্টিপাত করে বললো,
— কি বলছেন? এতো রাতে নিচে কিভাবে আসবো? মা আপা দুজনেই জেগে আছে।
ক্রীতিক ভাবলেশহীন কন্ঠে জবাব দিল,
— আমি এতোকিছু জানিনা, হয় তুই নিচে আসবি, নয়তো আমি উপরে আসছি।
— নাহ!

একটু আওয়াজ করেই চেঁচিয়ে উঠলো অরু, অতঃপর দরজার দিকে একবার উঁকি দিয়ে আবারও ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে বললো,— কেন এমন করছেন? মা জানলে বি’পদ হয়ে যাবে।
— তোর লিগ্যাল গার্জিয়ান কে?
অরু নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দিল,
— আআপনি।
ক্রীতিক এবার নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো,
— তাহলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিচে আয়, যদি এক মিনিটও লেইট করিস, তাহলে আজকেই তোকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো। কেউ আটকাতে পারবেনা। কারণ প্রতিদিন ভার্সিটি শেষ করে, নিজের বউয়ের মুখ দেখার জন্য এতোদূর রাইড করে আসতে ভালোলাগেনা আমার।
অরু মুখ কাচুমাচু করে বললো,
— আসছি, একটু অপেক্ষা করুন। মা আর আপাকে ম্যানেজ করে আসতে একটু সময় লাগবে।
মূহুর্তেই গলার আওয়াজ পরিবর্তন করে, ক্রীতিক হাস্কিস্বরে বললো,
— দ্রুত আয়। পাঁচ মিনিটের মাথায় না এলেও, দশমিনিটের মাথায় ঠিকই নেমে এলো অরু, মাথায় আজকেও সেদিনের মতো ঘোমটা টানা তার। ক্রীতিক বাইকে হেলান দিয়ে অরুর দিকেই তাকিয়ে আছে, অরু এগিয়ে আসতেই মাথার অবিন্যস্ত চুল গুলোতে হাত বুলিয়ে ক্রীতিক বলে,
— পাঁচ মিনিট লেইট।
অরু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

— এভাবে কেন বলছেন, কত কষ্টে লুকিয়ে চুরিয়ে বের হয়েছি আপনি তা জানেন?
— কতদিন লুকোবি এভাবে?
অরু মাথা নত রেখে ছোট্ট করে বললো,
— জানিনা।
ক্রীতিক অরুর হাত টেনে নিজের কাছে নিয়ে এসে শুধালো,— আমাকে মিস করিসনি?
অরু জবাব দিলো না।
ক্রীতিক এবার ওর দিকে একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললো,
— দেখতো পছন্দ হয় কিনা?
অরু প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শুধালো,
— কি আছে এতে?
— খুলে দেখ।
ক্রীতিকের কথা মতো প্যাকেটটা খুলতেই বেড়িয়ে এলো একটা অ্যাপেল খচিত ব্র্যান্ডের লেটেস্ট মোবাইল ফোন। ফোনটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখেই অরুর চক্ষু চড়কগাছ। ও তৎক্ষনাৎ অবাক হয়ে ক্রীতিককে বললো,
— এতো দামি ফোন আমাকে কেন দিচ্ছেন? আমি এটা নিতে পারবো না।
ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে কপাল কুচঁকে বললো,— এটা তোর মায়ের রেডিমেড কোম্পানির টাকায় কেনা নয়। তোর স্বামীর উপার্জনের টাকায় কেনা। নিতে পারবি না মানে?
অরু মুখ কাচুমাচু করে বললো,
— এভাবে কেন বলছেন?

ক্রীতিক নিজেকে খানিকটা শান্ত করে, নরম সুরে বললো,
— আর বলবো না, কাছে আয়।
ক্রীতিক অরুর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করলো না,বরং নিজ হাত দিয়ে অরুকে অনেকটা কাছে টেনে নিয়ে এলো।
গভীর রাত, চারিদিক নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে, আবছা আলোয় অরুর সুন্দর, কোমল মুখশ্রীটা নিস্প্রভ চোখে পরখ করছে ক্রীতিক। দূরত্ব খুব একটা নয়, তবুও ওর কোমড় চেপে ধরে আরও খানিকটা দূরত্ব ঘুচিয়ে নিলো ক্রীতিক। অরু এবার পুরোপুরি ক্রীতিকের বাঁধনে।পশ্চিম আকাশে গুড়গুড়িয়ে মেঘ ডাকছে, মেঘ ভেঁজা দমকা বাতাসে চারিদিক মুখরিত। শেষ রাতে বোধ বৃষ্টি নামবে, ক্রীতিক আর অরুর মাঝে সেই তখন থেকে নিরবতা বিরাজমান। দুজনার মাঝে যে শব্দটুকু হচ্ছে সেটা কেবলই হৃদস্পন্দনের গতিবেগ। ক্রীতিক আলতো হাতে অরুর গালে হাত ছুয়িয়ে হিসহিসিয়ে বললো,— আই মিসড ইউ,হার্টবিট।
এতোক্ষণের নিরবতা ভেঙে হঠাৎ ক্রীতিকের এমন সীকারোক্তিতে কেঁপে উঠলো অরু, শরীরের সাথে সাথে সেই কম্পন ছড়িয়ে পরলো সমগ্র মুখমন্ডলে। অরুর তিরতির করে কাঁপতে থাকা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে শুষ্ক ঢোক গিললো ক্রীতিক। ভাবতে লাগলো কি করবে ও এখন?নিজের অদম্য ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেবে নাকি অরুর কথা ভাববে। ক্রীতিক নিশ্চুপ হয়ে আছে দেখে অরু নিজেকে ক্রীতিকের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো,
— রাত বেড়েছে, আমি এখন আসছি।
কথা শেষ করে অরু দু'কদম পা বাড়াতেই পেছন থেকে ওর ওড়না টেনে ধরে ক্রীতিক। অরু ঘাড় ঘুরিয়ে শুধালো,

— ওড়না কেন টেনে ধরেছেন?
ক্রীতিক অরুর ওড়নাটা হাতে পেঁচিয়ে ওকে নিজের দিকে টানতে টানতে বললো,
— কাছে আয় বলছি।
অরু না চাইতেও পুনরায় ক্রীতিকের কাছাকাছি এলে , ক্রীতিক একটানে ওকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে হাস্কিস্বরে বললো,
— হার্টবিট, রাইট নাও, আমি এমন কিছু করবো যেটা তোর পছন্দ নাও হতে পারে। বাট আই কান্ট কন্ট্রোল মাই সেলফ,বি পেশেন্ট ওকে?
ক্রীতিকের কথায় অরু আমতাআমতা করে বললো,— ককি করবেন?
ক্রীতিক আর জবাব দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলো না, একহাত অরুর ঘাড়ের পেছনে দিয়ে, ওকে নিজের দিকে টেনে এনে চোখ বন্ধ করে ঠোঁট ছোঁয়ালো অরুর তুলতুলে নরম গোলাপি অধরে।
ক্রীতিকের সাথে সাথে অরুও এবার অকস্মাৎ দুচোখ খিঁচে বন্ধ করে নিলো। দু'হাত দিয়ে খামচে ধরলো ক্রীতিকের শার্ট। ভেতরের দীর্ঘশ্বাস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রীতিকের ঠোঁটের স্পর্শে ধূমকেতুর হলকার মতো শিহরণ ছড়িয়ে পরছে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অনুভূতি শক্তি তুঙ্গে, যার দরুন ভালোমন্দ কিছুই অনুভব করতে পারছে না অরু। খানিকবাদে ক্রীতিক ঠোঁটের দূরত্ব বাড়িয়ে, একঝলক অরুর মুখটা পরখ করে নিলো, বিরক্তির লেশমাত্র নেই ওর মুখে চোখে। যা আছে তা কেবলই ভ'য়াতুর অনুভূতি। অরুর মুখভঙ্গিমা আর মৌনতার দৃশ্য দেখে, একটুখানি তীর্যক হেসে, দিগুণ আগ্রহ নিয়ে অরুর তুলতুলে অধর গুলোকে পুনরায় ওষ্ঠাগত করে নেয়

ক্রীতিক।এবার আর রয়েসয়ে নয়, অনেকটা গভীর ভাবেই মিলিত হয় দুইজোড়া অধর। কোনো এক অজানা কারন বশত অরুর বুজে থাকা চোখ দিয়ে গড়িয়ে পরছে অশ্রুশিক্ত নোনাজল। যা টুপটাপ করে গিয়ে সযত্নে ঠাই নিচ্ছে ক্রীতিকের শার্টের উপর। ক্রীতিকের চুম্বনের গতিবেগের তালে তাল মিলিয়ে অরুর ছোট্ট ছোট্ট হাতের বাধন শক্ত হয়ে উঠেছে দিগুণ। ওর খা'মচে ধরা হাতের টানে ক্রীতিকের শার্টের বোতাম গুলো বোধহয় এবার ছিড়েই চলে আসবে। মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনায় হৃ'দপিন্ড তখন ফে'টে পরার উপক্রম, শরীরের সবটুকু ভার পরে আছে ক্রীতিকের দখলে, এলোমেলো ঝড়ো বাতাসের তান্ডবে অরুর মাথায় তুলে রাখা ঘোমটাটা খুলে গিয়েছে সেই কখন। ভেতরের উথাল পাথাল অনুভূতিতে অরুর প্রান যায় যায়, তবুও একচুলও ছাড় দিচ্ছে না ক্রীতিক। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কংক্রিটের ভবন থেকে অস্পষ্ট সুরে তখনও ভেসে আসছে বেসামাল দুটো গানের লাইন,

“বাতাসে গুন গুন,এসেছে ফাগুন
বুঝিনি তোমার, শুধু ছোঁয়ায়
এতো যে আগুন............”—আদা, রসুন,কাঁচামরিচ,পেয়াজ, লবন,ঢেঁড়স, মূলা,ফুলকপি,বাঁধাকপি চাল,ডাল,তেল। উফফ এতো গ্রোসারী দিয়ে কি করবে তুমি অনু? তোমাদের বাসায় কি বিয়ে লেগেছে?

প্রত্যয়ের কথায় অনু মানে লাগার মতো মুখ গোমড়া করে বললো,
— এভাবে কেন বলছেন, আপনার জন্যই তো এতো বড় ফর্দ বানালাম।

— আমার জন্য মানে?
— আপনার সাথে বের হতে গেলেতো হাতে একটু সময় নিয়ে বের হতে হতো, তাই মাকে বলেছি অনেক কিছু কিনতে হবে।
প্রত্যয় ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
— বুঝলাম, তারপর আঙুলের ইশারা করে পেছনে অরুর পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে থাকা রাজ কে দেখিয়ে বললো, কিন্তু ওটাকে কেন নিয়ে এসেছো?
অনু মুখ কালো করে বললো,
— মা জোর করে ধরিয়ে দিয়েছে।— কাজকর্ম তো সব চামচাদের মতো আপনার নাম রাজ কে রেখেছে শুনি?
— তুমি তো পিচ্চি, তাহলে এতো ঝাঁজ কোথা থেকে আসে শুনি?
রাজের কথায় অরু তেতে উঠে বললো,
— আমাকে কোন দিক দিয়ে পিচ্চি মনে হয়, আশ্চর্য?
— পিচ্চি নয়তো কি? দেখো এখানে সাইজে সবার থেকে ছোট তুমি। আমার তো মনে হয় তোমার বিয়ের উপযুক্ত ছেলে পাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে।
অরু বিরক্তিতে ভেংচি কেটে বললো,
— আমার বিয়ে নিয়ে আপনার মাথাটা না ঘামালেও চলবে, আমার স্বামী আপনার থেকে লম্বা আর সুদর্শনই হবে, তাই আপাতত নিজের টা নিয়ে ভাবুন।কথা শেষ করে অরু মুখ ঝামটি দিয়ে অন্য দিকে ঘুরতেই দেখলো, ক্রীতিক এসে বাইক থামিয়েছে ওদের সামনে। কোনোরূপ বাইকার জ্যাকেট বিংবা ফর্মাল স্টাইলে নয়, একটা ব্ল্যাক স্কিনি টিশার্ট আর ওভারে সাইজ ডেনিম পরে আছে, পায়ে নাইক খচিত স্নিকার্স।চোখে কালোরঙা রোদ চশমা। হেলমেট খুলে

এদিকেই আসছে। ক্রীতিককে দেখে অরু ছুটে গিয়ে অনুর ওড়না টেনে ধরে বললো,
— এ্যাই আপা, উনি এখানে কি করছেন?
অনু একবার ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে প্রত্যয়কে উদ্দেশ্য করে বললো,
— হ্যা তাইতো, প্রত্যয় সাহেব, ক্রীতিক ভাইয়াকে কেন ডেকেছেন?
প্রত্যয় কাট কাট গলায় বললো,
— আমিতো ভেবেছিলাম অরু একা আসবে, আমরা কোথাও সময় কাটাতে গেলে অরুর কি হতো? তাই ভাবলাম ভাইতো ফ্রি আছে…
প্রত্যয়ের কথা শেষ হবার আগেই ক্রীতিক সেখানে হাজির হয়, ক্রীতিক আসা মাত্রই অরু কাচুমাচু হয়ে অনুর পেছনে দাঁড়িয়ে পরে। সবাইকে পিছু হটিয়ে ক্রীতিক সবার আগে অরুর দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে বললো,
— কি ব্যাপার, তুই ওড়নার পেছনে দাঁড়িয়ে মোচড়ামুচড়ি করছিস কেন?কি সমস্যা?
অরু সটান দাড়িয়ে বললো,— ককই নাতো।
ক্রীতিক প্রত্যয়ের দিকে তাকিয়ে বললো,
— তোমরা কোথাও যাবে বলেছিলে?
প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, ক্রীতিক আবারও বলে,
— ইউ ক্যান গো নাও,সময় হলে কল দিও আমি আসেপাশেই থাকবো।
অনু এবার একটু আগ বাড়িয়ে ক্রীতিকের উদ্দেশ্যে বললো,
— ইয়ে ভাইয়া, অরুর একটু খেয়াল রাখবেন আমরা তাড়াতাড়ি চলে আসবো।

ক্রীতিক অরুর দিকে তাকালো, যে এই মূহুর্তে মাথা নিচু করে ক্রমাগত আঙুলে ওড়না পেচিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছোট্ট করে জবাব দিল,
— রাখবো।
অনু আর প্রত্যয় চলে গেলে রাজ এগিয়ে এসে অরুকে বললো,
— এই যে পিচ্চি, চলো এবার বাজার গুলো করে ফেলি।
রাজের পিচ্চি সম্মোধনে অরু আঁতকে উঠে ক্রীতিকের দিকে চাইলো। ক্রীতিক এগিয়ে এসে বললো,
— এক্সকিউজ মি,কি বললে ওকে তুমি?রাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমে ক্রীতিকের মুখের দিকে চাইলো, সামনাসামনি না দেখলেও জেকে গ্রুপের হেড অফিসের গভর্নিং বডির মেম্বারদের মধ্যে সর্বশীর্ষে এই সুদর্শন লোকের ছবি দেখেছে রাজ, তারমানে মালিক পক্ষের কেউ হবে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তৎক্ষনাৎ ক্রীতিককে সালাম ঠুকলো সে।
— হ্যালো স্যার। নাইচ টু মিট ইউ স্যার।
ক্রীতিক তো প্রথমে চেয়েছিল কয়েকটা পাঞ্চ বসিয়ে দিবে ছেলেটার নাক বরাবর, কিন্তু এখন এভাবে সম্মান জানানো তে, ও নিজেই বিব্রত হয়ে পরেছে। কিছু উপায়ন্তর না পেয়ে অরুর হাত থেকে ছো মে'রে বাজারের লিস্টটা নিয়ে, রাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো,
— বাজার গুলো সেরে আসুন আমরা ওয়েট করছি।
— ওকে স্যার।
তরিৎ গতিতে হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে, সুপারশপের দিকে চলে যায় রাজ।

রাজ চলে যেতেই অরুর হাত চেপে ধরলো ক্রীতিক, খানিকটা নিজের কাছে টেনে এনে দাঁতে দাঁত পিষে বললো,
—- এমন চোরের মতো বিহেভ কেন করছিস?তাকা আমার দিকে।
অরু এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে বললো,
— পারবোনা।
— কেন পারবিনা? তাকা বলছি,নয়তো ধরে একটা আ'ছাড় মা'রবো।
অরু তেতে উঠে বললো,
— পারবোনা বলেছি তো, আমার বুঝি লজ্জা লাগেনা?
অরুর না তাকানোর কারন বুঝতে পেরে ক্রীতিক ঠোঁট টিপে হাসি সংবরণ করে বললো,
— আচ্ছা তাকাতে হবেনা, চল।
— কোথায় যাবো?
ক্রীতিক হেলমেট পরে আরেকটা অরুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো,
— বাইকে ওঠ বলছি।
ক্রীতিকের কথায়, অরু নাকোচ করে বললো,— দেখেছেন চারিদিকে কেমন মেঘ করেছে? একটু পরেই বৃষ্টি নামবে, এর মাঝে আপা চলে এলে আবার ঝামেলা হবে। আমি যাবোনা কোথাও।
— তুই উঠবি নাকি আমি নামবো?
ক্রীতিকের ধা'রালো কথার কাঠিন্যতায় খানিকটা ভ'য় পেয়েই বাইকে উঠে বসলো অরু, অতঃপর আর্জি জানিয়ে বললো,
— তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবেন কিন্তু।
— ধরে বস।
অরু অবাক হয়ে বললো,

— ধরলাম তো।
ক্রীতিক অন্যদিকে ইশারা করে বললো,
— ওইদিকে দেখ?অরু ক্রীতিকের দৃষ্টি অনুসরণ করে চাইলে দেখতে পায়, ওদের থেকে খানিকটা দূরত্বে আরেকটা বাইকার কাপল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছে,পেছনের মেয়েটা ছেলেটার কোমড় দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বসেছে, তাদের দুজনার মধ্যে সেন্টিমিটার দূরত্বটুকুও অবশিষ্ট নেই।
অরু সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে বললো,
— আমি ওভাবে ধরতে পারবো না, আপনি আমার বড় তো।
ক্রীতিক অরুর কথা না শোনার ভান করে, ওয়ার্নিং ছাড়াই বাইক স্টার্ট দেয়, তৎক্ষনাৎ ক্রীতিকের পিঠের উপর হুম'ড়ি খেয়ে পরে অরু, অজান্তেই হাত দিয়ে খামচে ধরে ক্রীতিকের টিশার্ট। ক্রীতিক একটু হেঁসে অরুর খামচে ধরা হাতটা সাভাবিক করে নিজের মেদহীন পেটের উপর রেখে দেয়। তারপর হিসহিসিয়ে বলে,
— নাও পার্ফেক্ট।
বাইক চলছে, তবে অরু আর ক্রীতিকের থেকে নিজেকে সরায়নি, উল্টে সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে নিজের মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে ক্রীতিকের পিঠের উপর। এখন ওদের মাঝেও সেন্টিমিটার দূরত্ব অবশিষ্ট নেই আর। পুরুষালি পৃষ্ঠদেশে ধনুকের মতো বাঁকানো নারীদেহটা নিঃসংকোচে সিঁটিয়ে আছে, যার ফলে দুজনার মাঝেই ঢেউ খেলে যাচ্ছে, একটা ভেজা নরম, সুপ্ত অনুভূতির জোয়ার।অরু যা বলেছিল তাই হলো, কিছুদূর যেতেই মাঝরাস্তায় ঝুম বর্ষনে আটকে পড়লে ওরা। নিজেদের বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে কোনোমতে দৌড়ে গিয়ে একটা ইকোপার্কের মস্তবড় গাছের নিচে

ঠায় নিলো দুজন। অরুর পরনে টকটকে লাল রঙা চুড়িদার, যা এই মূহুর্তে ভিজে গিয়ে শরীরের সাথে চুপসে লেগে আছে, তাও গায়ের ওড়নাটা দিয়ে বৃষ্টি আড়াল করে দাড়িয়ে আছে অরু, ক্রীতিক এগিয়ে এসে নিজেও অরুর ওড়নার মধ্যে ঠায় নিলো। অরু এবার একটু ভালো করে ক্রীতিকের মাথার উপর ওড়নাটা ছড়িয়ে দিয়ে বললো,— আপনাকে আজকাল বড্ড আপন মনে হয়।

ক্রীতিক ঘোর লাগা দৃষ্টিতে অরুর ভেজা মুখমন্ডল পরখ করে বললো,

— আমি বরাবরই তোর আপন ছিলাম তুই বুঝতে পারিস নি।সেটা তোর ব্যর্থতা।

অরু অবাক চোখে ক্রীতিকের দিকে তাকায়, বোঝার চেষ্টা করে ক্রীতিক আদতে কি বুঝিয়েছে। ক্রীতিক অবশ্য বোঝানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই, ওর চোখ আটকে আছে অরুর কোমল, ফিনফিনে, র’ক্তরাঙা ঠোঁট জোড়ায়, মানুষ একবার কোনোকিছু পেয়ে গেলে সেটা বারবার পেতে চায়, ক্রীতিকও তার উর্ধে নয়, ও এই মূহুর্তে অরুর ঠোঁটের দখলদারি পেতে চায়। ঠিক কাল রাতের মতো। পরম আবেশে ডুবে যেতে চায় অরুর ঠোঁটের ভাঁজে। শুধু চায় বললে ভুল হবে, অরুর খুব কাছে গিয়ে, সেটা নেওয়ার জন্য উদ্যত ও হলো বটে, ক্রীতিকের পরবর্তী পদক্ষেপ আঁচ করতে পেরে অরু লজ্জা পেয়ে দ্রুত পেছনে ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু এতেও ক্রীতিক পিছ’পা হলো না, বরং একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে অরুর লম্বা চুলগুলো একপাশে সরিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিলো ওর গলার খাঁজে। চোখ বন্ধ করে, প্রিয় নারীর ভেজা শরীর থেকে শুষে নিতে লাগলো প্রতিটি বারি কনা। ক্রীতিকের এতোটা কাছে আসা,এতোটা

গভীর আলিঙ্গন খুব বেশিক্ষন সহ্য করতে পারলো না অষ্টাদশী অরু, লজ্জায় সংকুচিত হয়ে, তরিৎ গতিতে ঘুরে মুখ লুকালো ক্রীতিকেরই বুকের মাঝখানে। অরু কাঁপছে, ওর শরীরের তীব্র কাঁপুনিতে ক্রীতিকের মাঝে হঠাৎ করে তৈরি হওয়া অদম্য সুপ্ত পুরুষালী চাহিদা গুলো মূহুর্তেই হারিয়ে গেলো, ও আস্তে করে অরুর পিঠে হাত রেখে নরম সুরে বললো,— ইটস ওকে বেইবি।
অরু এবার মাথা তুলে বললো,
— আপনি সত্যিই আমার প্রেমে পরেছেন? কবে পরলেন, বলুন না?
ক্রীতিক অরুর গালে নিজের খরখরে পুরুষালী হাত ছুঁয়িয়ে বললো,
— এতোগুলা বছর পর এই প্রশ্ন করছিস। কি উত্তর দিবো আমি?
ক্রীতিকের প্রতিউত্তরের গভীরতা আঁচ করতে পেরে অরু আবারও দু'হাতে শক্ত করে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো।আজ বোধ হয় অরুও প্রেমে পরেছে, কোনোরূপ মোহ কিংবা ক্ষনিকের ভালো লাগা নয়,বরং সত্যিকারের প্রেমে।দিনের দ্বিপ্রহর চলমান, অথচ বাইরে ঝুম বর্ষন, তীব্র বর্ষনে চারিদিকের প্রকৃতি সন্ধ্যারূপ ধারন করেছে। বৃষ্টির ছাট আর দমকা হাওয়ায় বারবার জানালার ভারী পাল্লা দুলেদুলে উঠছে। খানিক বাদে বাদে বৈদ্যুতিক ঝলকানি আর বাজ পরার প্রকান্ড আওয়াজে শরীরের লোমকূপ দাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম। তবুও হাট করে রাখা খোলা জানালা গলিয়ে বাইরের অঝোর বারিধারার পানে ধ্যানমগ্ন হয়ে চেয়ে আছে অনু। অসময়ে বৃষ্টি নামার সাথে সাথে মনটাও কেমন বিষাদপূর্ন হয়ে উঠেছে ওর।অযাচিত মনে বারংবার একই প্রশ্ন এসে উঁকি দিচ্ছে অরু ঠিক আছে তো?

মনেমনে ভাবছে,— মেয়েটাকে কেন যে একা রেখে আসতে গেলাম, ক্রীতিক ভাইয়া আদৌও ওর সাথে আছে, নাকি ওকে রেখেই চলে গিয়েছে,কে জানে?
অনু যখন অরুকে নিয়ে হাজারো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ তখনই হাতে দু'কাপ গরম গরম দুধ চা নিয়ে ওর সামনে হাজির হয় প্রত্যয়। এটা প্রত্যয়েরই ফ্ল্যাট। তাই নিজ হাতে অনুর জন্য চায়ের বন্দবস্ত করেছে সে। অনুর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে প্রত্যয় শুধালো,
— হঠাৎ মনমরা হয়ে গেলে যে, কি ভাবছো?
অনু হাঁটু মুড়ে বসে তাতে মাথা ঠেকিয়ে বললো,
— অরুর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই বৃষ্টির মাঝে একা রেখে এলাম,কি জানি কি করছে?
প্রত্যয় ভ্রু কুঁচকে বললো,
— একা কোথায় ভাই তো আছে।
অনু ঠোঁট উল্টে বললো,
— ক্রীতিক ভাইয়ার মতো মানুষ কি আর অরুর জন্য বসে থাকবে?অনুর কথায় প্রত্যয় মনেমনে একটু হাসলো, অনু তো আর জানেনা তার বোনের শরীরটা ব্যক্তিগত হলেও আত্নাটা সয়ং জায়ান ক্রীতিকের। আপাতত এসব জানানোও যাবেনা,অরুর বারণ আছে, তাই প্রত্যয় কথা ঘুরানোর উদ্দেশ্যে অনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,
— তুমি সবার জন্য কতো ভাবো, সবার প্রতি তোমার কত দায়িত্ববোধ, আচ্ছা আমার কথা কখনো ভাবোনা কেন?
— কে বললো আপনার কথা ভাবিনা? ভাবি বলেই তো মাকে এতোগুলো মিথ্যে বলে বের হলাম, শুধু আপনাকে দেখবো বলে।

প্রত্যয় অনুর কথাতে আস্বস্ত হয়ে বললো,
— তুমি শুধু আমার অনু। তোমার উপর শুধু আমার দখলদারি। আমি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ তোমার জীবনে আসবেনা,কোনোদিন না।
অনু লজ্জামাখা হাসিতে রাঙা হয়ে বললো,— আমি শুধু আপনার, আপনিই আমার প্রথম ভালোবাসা, অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেম। আপনার অতীত আপনাকে কতটুকু দুঃখ দিয়েছে তা আমি জানিনা, তবে আমি চেষ্টা করবো তার চেয়ে দ্বিগুণ ভালোবাসায় আপনাকে মুড়িয়ে দিতে।
একজন আরেকজনকে প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে কখন যে ওরা এতোটা কাছাকাছি চলে এসেছে টের পায়নি কেউই। ব্যাবধান মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র, প্রত্যয় হয়তোবা আজকেও বেসামাল হয়ে পরেছে হৃদয়টা নিয়ন্ত্রণে নেই ওর, অগত্যাই ঠোঁট দুটো এগিয়ে দিয়েছে অনুর ঠোঁটের পানে। তৎক্ষনাৎ ওর ওর ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো অনু, না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,—এখন নয়, বিয়ের পরে, এটা অন্যায়।
প্রত্যয় নিজের হুশে নেই ও অনুর হাত সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললো,
— একটু আধটু অন্যায় করলে কিছু হবেনা ডিয়ার।
প্রত্যয়ের এমন বেসামাল রুপ দেখে উপায়ন্তর না পেয়ে একটানে ওর চশমা খুলে নিজের চোখে লাগিয়ে নিলো অনু,এবার প্রত্যয়ের চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে এসেছে। ফলস্বরুপ না চাইতেও মাঝপথে থেমে যেতে হলো ওকে।

চশমা টাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনু শুধালো,— দেখুন তো আমাকে কেমন লাগছে, বাবাহ! কি পাওয়ার।
প্রত্যয় ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
— এটা কিন্তু মোটেই ঠিক হলোনা অনু।
— কি ঠিক হলোনা? চশমা ছাড়া কি আপনি পুরোপুরি কানা?দেখুন তো এখানে কয়টা আঙুল।
আঙুল উঁচিয়ে শুধালো অনু।
প্রত্যয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— আমি এতোটাও কম দেখিনা অনু, দুইটা আঙুল।
অনু চমকে উঠে বললো,
— সর্বনাশ, কি বলছেন?এখানে তো তিনটা আঙুল।
প্রত্যয় এবার নিজের দূর্বলতা এড়াতে একটু গলা খাঁকারী দিয়ে বললো,
— আমিতো মশকরা করে বলেছি, যাতে তুমি এন্টারটেইন হও।
অনু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,— বুঝলাম, পরক্ষণেই বুদ্ধিদীপ্তদের মতো চোখ বড়বড় করে বললো,
— আরে আপনি কানা হলেও তো সমস্যা নেই, আমিতো আছি, আমি আপনাকে ঠিক সামলে নেবো।
নিজের শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে প্রত্যয় শুধালো,
— তুমি সারাজীবন থাকবে আমার সাথে ?
অনু এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে বললো,
— আপাতত বাসায় যাবো, মাকে মিথ্যে বলে বেরিয়েছি, সেটা মা ঘুনাক্ষরেও জানতে পারলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।
প্রত্যয় এবার অনুকে নিজের পাশে বসিয়ে শুধালো,

— আচ্ছা সত্যি করে বলোতো,তোমরা দু'বোন তোমার মাকে এতো ভয় পাও কেন?
অনু এবার ভাবুক হয়ে পরলো, একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দিলো,
— কারণ মা অনেক বিচক্ষণ আর কঠিন প্রকৃতির মানুষ। মায়ের মতে মিথ্যা বলা সত্যি লুকানোর মতো জ'ঘন্য অ'পরাধ আর কিছু নেই। এছাড়া মায়ের খুব বেশি আহ্লাদী আহ্লাদী ভাব ও পছন্দ নয়, বুঝতেই তো পারেন বিজনেস ওয়েম্যান। ওই জন্যইতো আমি আর অরু ছোট বেলা থেকেই ম্যাচিউর। অরু যা একটু ছেলেমানুষী করে কিন্তু আমার দ্বারা সেসব কোনোকালেই হয়নি।জানেন, মাঝে মাঝে আপসোস হয় আমার, ছোট বেলার দিনগুলো ফিরে পেতে ইচ্ছে করে,এটা-ওটা বায়না ধরতে মন চায়, কিন্তু আপসোস এখন আর কে মেটাবে আমার আবদার?
অনুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে টান মে'রে নিজের বুকের উপর ফেলে দিলো প্রত্যয়, অকস্মাৎ ঘটনায় টাল সামলাতে না পেরে অনুর মাথা গিয়ে ঠেকলো প্রত্যয়ের বুকে। প্রত্যয় অনুর মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে বললো,
— আমি মেটাবো সব আবদার, একবার করেই দেখো।
হুট করে এমন কাছাকাছি আসাতে অনু একটু ভরকে গেলো, ও তাড়াহুড়ো করে প্রত্যয়ের বুকের উপর থেকে মাথাটা তুলতে নিলে প্রত্যয় ওকে পুনরায় নিজের সাথে মিশিয়ে বলে,
— মাত্র পাঁচ মিনিট, তারপর ছেড়ে দিচ্ছি, প্রমিস এর বাইরে কিচ্ছু করবো না।
প্রত্যয়ের কথায় আস্বস্ত হয়ে অনুও এবার শরীরের সবটুকু ভার ওর উপর ছেড়ে দিয়ে , চোখদুটো বন্ধ করে নিলো পরম আবেশে।বৃষ্টি

মাথায় নিয়েই অনেকটা তাড়াহুড়ো করে বাসায় ফিরেছে ওর দু'বোন। এবার শুধু চুপিচুপি রুমে ঢুকে যাওয়ার পালা। তাহলেই ঝামেলা শেষ। কিন্তু বসার ঘর পেরিয়ে রুমের দিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে আজমেরী শেখের গমগমে আওয়াজ ভেসে এলো কর্ণকুহরে,

— কোথায় গিয়েছিলে, ফিরতে সন্ধ্যা হলো কেন?

অরু মুখ কাচুমাচু করে অনুর দিকে অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, অনু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,

— ইয়ে মা, বাজার করতে গিয়েছিলাম সুপার শপে। তোমাকে না বলে গেলাম অনেক কিছু কেনার আছে।

— মিথ্যে কেন বলছো,বাজার তো সেই কখন নিয়ে এসেছে রাজ।

অরু একটু আগ বাড়িয়ে বললো,— আআসলে মা আজকে ব্ল্যাক ফ্রাইডে তো সব কিছুতে ডিসকাউন্ট চলছিল, তাই আমরা দু'বোন একটু লেডিস সেকশনে গিয়েছিলাম ওই জন্যই দেরি হয়ে গেলো।

আজমেরী শেখ ভ্রু কুঁচকে বললো,

— এতো দেরি করে ফিরলে তা কিছু কেনোনি কেন?

অনু বললো,

— পপছন্দ হয়নি মা।

— পছন্দ হয়নি, নাকি টাকার জন্য কেনার সাহস করোনি? তোমাদের আমি খুব ভালো করে চিনি, মনে রেখো জেকে গ্রুপের থার্টি পার্সেন্ট শেয়ার আমার নামে, তোমাদের প্রয়াত আঙ্কেল খুশি হয়ে আমাকে লিখে দিয়ে গেছেন, সে হিসেবে তোমরাও তার মালিক। তাহলে কিসের এতো টাকার চিন্তা তোমাদের?

অরু এবার কিছু বুঝে না পেয়ে বললো,— বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে কার মা?
অনু ওকে কনুই দিয়ে গুঁতো মে'রে থামিয়ে বললো,
— চুপ কর।
আজমেরী শেখ সর্বদা সুস্পষ্টবাদী তাই তিনি সহসা উত্তর দিলেন,
— জায়ান ক্রীতিকের।
অতঃপত মনেমনে বললেন,কিন্তু ছেলেটার খুব বেশি আত্ন অ'হংকার, শুধুমাত্র আমি চেয়ার ওয়েম্যান বলে, কোম্পানির ধারেকাছেও ঘেঁষেনা সে। এবার আমিও দেখতে চাই নিজের এতোবড় সাম্রাজ্য ঠিক কতদিন হাতছাড়া করে রাখতে পারে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। মায়ের অ'গ্নিমূর্তি তরলে পরিনত হতেই অরু, অনু দু'বোন একসাথে রুমে ঢুকে গেলো। অরু একবার ভিজেছে, শরীরটাও কেমন কুটকুট করছে, তাই রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অরু চলে গেলো শাওয়ার নিতে।
একটু পরে শাওয়ার নিয়ে চুল মুছতে মুছতে বেরোতেই পিলে চমকে উঠলো ওর, দেখলো অনু একটা চেকের পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, যেটা থাইল্যান্ড বসে ক্রীতিক দিয়েছিল অরুকে,বিয়ের মোহরানা সরুপ। কিন্তু সেটা নিয়ে আপা কি করছে? ধরা পরে যাওয়ার ভয়ে অরু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চেকের পাতা টা ছো মে'রে নিয়ে সেটাকে ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললো,— এটা দিয়ে কি করছিস তুই?
অনু ঠোঁট উল্টে বললো,
— তোর জামাকাপড় গোছাতে গিয়ে আলমারিতে পেলাম, ক্রীতিক ভাইয়ার নাম মনে হলো, উনি তোকে চেক কেন দিয়েছে?

অরু জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললো,
— আরে ভার্সিটির সেমিস্টার ফি দিয়েছিলেন,কিন্তু আমি বোকার মতো সেটা ঘরে তুলে রেখেছি, জমা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।
অরুর কথা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হলোনা অনুর, কারণ চেকের এমাউন্ট বেশ বড় ছিল, তবে ও পুনরায় কিছু জিজ্ঞেস করারও সুযোগ পেলোনা, তার আগেই চোখ গিয়ে ঠেকলো অরুর ঘাড়ের কাছে র'ক্তিম হয়ে যাওয়া কালচে বেগুনি দাগের উপর ।দেখে মনে হচ্ছে কেউ বাইট করেছে। অনু সহসা এগিয়ে গিয়ে, অরুর গলায় হাত দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো,
— গলায় কি হয়েছে তোর? কে কামড় দিয়েছে?
অনুর কথায় অরু দ্রুত গিয়ে আয়নার সামনে দাড়ালো, দেখলো গলার আর ঘাড়ের মাঝ বরাবর ছোপ ছোপ কালচে দাগ, তৎক্ষনাৎ মনে পরে গেলো দাগগুলোর আসল উৎস। বিকেলের সেই বেসামাল অনূভুতি, ক্রীতিকের ঘোর লাগা চাহনী, আর তারপর হুট করেই অনেকটা কাছাকাছি আসা। এখন সেসব মনে পরতেই কানদুটো কেন গরম হয়ে উঠছে অরুর।— কি হলো কিছু বল?কি করে ব্যাথা পেয়েছিস?
অনুর কথায় অরু থতমত খেয়ে বললো,
—কি বলতো আপা, তখন অনেক বৃষ্টি হলো না? সেই বৃষ্টির মাঝেই একটা বড়সড় পোকা কোথা থেকে যেন উড়ে এসে কামড় বসিয়ে দিলো, আমি টের পাইনি, এখন দেখছি এমন লালবর্ণ হয়ে আছে।
অনু অরুর গলায় হাত বুলিয়ে অসহায় সুরে বললো,

— কি পোকা কামড়ালো বলতো? পাছে না আবার ইনফে’কশন হয়ে যায়, আয় তো একটু মলম লাগিয়ে দিই।
অরু হ্যা না কিছুই বলতে পারলো না, চুপচাপ বসে বসে দেখতে লাগলো, তার আপা তার স্বামীর তৈরি করা প্রথম ভালোবাসার চিহ্নতে কি সুন্দর করে মলম লাগিয়ে দিচ্ছে। ব্যস্ততম দিনকে হটিয়ে, সন্ধ্যা নেমেছে সমগ্র ধরনী জুড়ে, সারা বিকেল ঝুম বর্ষনের ফলস্বরূপ এখন ইকোপার্কটা পুরোপুরি খালি পরে আছে। আশেপাশে মানুষজন তো দূরে থাক একটা কাকপক্ষীও নজরে আসছে না। ইকোপার্কের সরু রাস্তায় ম্যাপল পাতার ছড়াছড়ি, তকতকে সুন্দর সারিসারি ব্যঞ্চি গুলো ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে বৃষ্টির পানিতে। সন্ধ্যা বেলা একটু খানি একা একা হাটবে বলেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মাঝেই ট্র্যাকস্যুট পরে বের হয়েছে এলিসা। সাথে আর কেউ নেই। ওর অবশ্য একটা থাকতে ভালোই লাগে,ওই জন্যই তো এই নির্জন ইকোপার্কে হাটতে আসা। কিন্তু হাটতে হাটতে কিছুদূর যেতেই ঘটলো বিপত্তি, চোখের সামনে দৃশ্যমান হলো এক সুপরিচিত মুখ। ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে একটা অল্পবয়স্কা মেয়ের সাথে কি যেন কথায় মশগুল হয়ে আছে অর্নব। কিন্তু এমন নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে ওরা দুজন? আর মেয়েটাই বা কে? ভাবনায় পরে গেলো এলিসা।
ওদিকে অর্নব কথা বলায় এতোটাই ব্যস্ত যে ওর পেছনে সেই কখন থেকে এলিসা দাড়িয়ে আছে, ও সেটা টেরই পায়নি।
এলিসা বরাবরই অর্নবের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে অভস্ত্য, তাই হঠাৎ এমন অগ্রাহ্য ব্যাপারটা সহ্য হলোনা ওর, উল্টে বিরক্ত লাগতে শুরু করলো প্রচন্ড রকম। এলিসা কিছু একটা ভেবে

এগিয়ে এসে পেছন দিক থেকেই অর্নবের বাহুতে জোরে জোরে হাতদিয়ে টোকা দিলো। অর্নব পেছনে ঘুরে আচমকা এলিসাকে দেখে অবাক হয়ে বললো,— এলিসা তুই এখানে?
পরক্ষণেই সামনের মেয়েটার দিকে একনজর পরখ করে এলিসাকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাড়িয়ে অর্নব শুধালো,
— তুই এখানে কি করছিস একা একা?
অর্নবের কথায় বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, এলিসা বিরক্তি নিয়ে বললো,
— মেয়েটা কে অর্নব?
অর্নব পেছনে ঘুরে মেয়েটাকে একনজর পরখ করে, চোখ ঘুরিয়ে এলিসার দিকে তাকিয়ে বললো,
— আছে বলা যাবে না।
সঙ্গে সঙ্গে অর্নবের কলার খা'মচে ধরলো এলিসা, দাঁতে দাঁত চেপে বললো,— তুই আমার সাথে মজা করছিস?
এলিসার এই হঠাৎ রেগে যাওয়াটা অর্নবের ভালোই লাগলো, ও এলিসার রাগে আরেকটু ঘি ঢেলে দিয়ে বললো,
— মজা কেন করবো, সব সিক্রেট কি আর সবাইকে বলা যায়? প্রাইভেসি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে, এতো বড় মেয়ে হয়েছিস বুঝিস না সেটা?
— মেয়েটা কে অর্নব?
অর্নব ভাবলেশহীন হয়ে বললো,
— হবে আমার লাইফের ইম্পর্টেন্ট কেউ। তুই এতো রিয়াক্ট কেন করছিস?
এলিসা এবার অর্নবের কলার ছেড়ে দিয়ে বললো,

— খুব ইম্পর্টেন্ট কেউ তাই না?
— হ্যা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অর্নব কথাটা বলেছে ঠিকই, কিন্তু এর পরবর্তীতে এলিসার এমন পদক্ষেপ মোটেও কল্পনা করেনি ও। অর্নব দেখলো রাস্তার পাশ থেকে একটা বড়সড় ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে রে’গেমেগে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এলিসা। এলিসার এমন রণমূর্তি দেখে অজ্ঞাত মেয়েটা নিজেও ভ’য় পেয়ে গিয়েছে, এই পা’গলীর হাতে নিজের গায়ে আ’ঘাত প্রাপ্ত হওয়ার আগেই আতঁকে উঠে সহসা ছুট লাগালো মেয়েটা। এলিসাও দমে যাওয়ার পাত্রী নয়, ও নিজেও সমান তালে ছুটতে লাগলো মেয়েটার পিছু পিছু। এদিকে সকল ঝামেলার উৎস বেচারা অর্নব কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলিসা মেয়েটাকে তা’ড়া করে করে হাঁপানী রো’গী বানিয়ে ছেড়েছে। এবার অর্নবও আর দাঁড়িয়ে থাকলো না ছুটে গিয়ে দু-হাতে চেপে ধরলো এলিসার বাঁকানো কোমড়। এলিসা ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
— ছাড় আমাকে তুই, ইম্পর্টেন্ট মানুষ হওয়া দেখাচ্ছি ওকে আমি, বজ্জাত মেয়ে অন্যের জিনিসে নজর দেয়।
অর্নব ওকে আঁটকে রাখতে না পেরে চিল্লিয়ে বলে উঠলো,— বিশ্বাস কর এলিসা, জান আমার। ও কোনো ইম্পর্টেন্ট মানুষ না, ও আমার ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট। তুই থাম একটু, আমি খুলে বলছি।
অর্নবের কথায় এলিসা একটু শান্ত হলে,অর্নব ওর হাতের ইটের টুকরোটা ছু’ড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,
— আমাদেরই ভার্সিটিতে পড়ে মেয়েটা, ক্রীতিকের স্টুডেন্ট। গত কয়েকদিন যাবত ওর ছোটবোন হঠাৎ করে মিসিং, তাই ক্রীতিক ওকে আমার এজেন্সির কার্ড দিয়ে আমার সাথে দেখা করতে

বলেছে, একমাত্র বোনকে খুজে না পেয়ে মেয়েটার অবস্থা দূ'র্বিষহ, তখন থেকে সেটা নিয়েই আলাপ করছিলাম আমরা।
এলিসা এবার দিগুণ ঝাঁজ নিয়ে বললো,— তাহলে আমাকে মিথ্যে কেন বললি?কি সুখ পাস তোরা আমাকে মিথ্যে বলে?
অর্নব চোখ ছোট ছোট করে বললো,
— তুই কেন এতো জেলাস? আর একটু আগে আমার জিনিস, আমার জিনিস করে চেঁচিয়ে কি যেন বললি? আমি কিন্তু শুনেছি।
এলিসা ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে যেতে বললো,— তোর সাথে আর কথা নেই। অযথা কষ্ট দিস আমাকে।
এলিসা হনহনিয়ে হাঁটছে, চোখদুটো না চাইতেও বে'ইমানি করছে ওর সাথে, বারবার জলে ভিজে ঝাপসা হয়ে আসছে সামনের সব দৃশ্যপট। গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে আছে একরাশ না পাওয়ার কষ্ট। অথচ আজ অর্নব ও ওকে বোকা বানালো ওর ইমোশন নিয়ে খেললো।
তবে বেশিক্ষণ হেঁটে এগিয়ে যেতে পারলো না এলিসা, তার আগেই ওকে পেছন থেকে জাপ্টে ধরলো অর্নব, পোনিটেল করা চুলের মাঝে হাজারটা চুমু খেতে খেতে বললো,— আ'ম সরি, আর কক্ষনো এমন হবে না, আ'ম সরি, সত্যি সরি। তুই যে আমার জন্য কিছু ফিল করিস সেটা আমার অজানাই ছিল। বুঝতে পারিনি।
এলিসা এবার ঘুরে সপাটে চ'ড় বসিয়ে দিলো অর্নবের গালে, অতঃপর কাঁদতে কাঁদতে মুখ খুলে বললো,
— কেন বুঝিস নি? তোকে আমি গ্রহন করিনি ঠিকই, কিন্তু দুরেও তো ঠেলে দিইনি কখনো, তোর এতোএতো পা'গলামি, বাচ্চামি, সবকিছু সহ্য করে এসেছি , তোর কি মনে হয় সেটা কেবলই তোর

কথা ভেবে সিমপ্যাথি দেখিয়েছি আমি? আমি এতোটাও ভালো মেয়ে নই অর্নব।তোর করা প্রত্যেকটা পা'গলামিতে আমি সুখ পাই, আনন্দে পুলকিত হই, তাইতো কখনো তোকে বারণ করিনা, কেন বুঝতে পারলি না বল? তুই না ডিটেকটিভ? হ্যা'কার? তাহলে এটুকু তোর মাথায় ঢুকলো না কেন?উমম....
এলিসার এক নাগারে করা অভিযোগের বহরে হুট করেই ইতি ঘটালো অর্নব,ওর নরম অধর যুগল কে নিজের দখলে নিয়ে। এর আগে কি অর্নব এলিসাকে চুমু খায়নি? খেয়েছে তো জোরজবর'দস্তি করে বহুবার। কিন্তু আজ একটু বেশিই আবেগ নিয়ে স্পর্শ করছে অর্নব। যেই স্পর্শে শুধুই আন্তরিকতা আর ভালোবাসার ছড়াছড়ি। অর্নবের কাতর স্পর্শে এতোক্ষণে এলিসাও কুপোকাত, শেষমেশ অর্নবের অসহনীয় ভালোবাসার কাছে হেরে গিয়ে ও নিজেও ঠোঁট মেলালো অর্নবের সাথে। তালে তাল মিলিয়ে মত্তো হলো এক নিদারুন ঠোঁটের খেলায়।ক্লাস আর প্রেজেন্টেশন আছে বলে আজ সকাল সকাল ভার্সিটিতে এসেছিল অরু। কিন্তু সকাল সকাল এসেই যে গালের উপর এমন শক্ত চপেটাঘা'ত হা'মলে পরবে সেটা বোধ হয় আশা করেনি ও। এই মূহুর্তে চ'ড় খাওয়া গালে হাত দিয়ে টলটলে চোখে ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে নাক টানছে অরু, মনেমনে ভাবছে, এটা স্বামী না গিরগিটি? ক্ষনে ক্ষনে রুপ বদলায়, কালই তো কত আদর দেখালো আর এখন চ'ড় মারলো।
অরুর কাঁদো কাঁদো বি'ভৎস মুখের দিকে অ'গ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রীতিক। রাগের তোপে তীক্ষ্ণ চোয়ালটা আরও শক্ত লাগছে ওর।জিদের তোপে ইচ্ছে তো করছে ওর আরেকটা গালেও সপাটে চ'ড় মে'রে দিতে,তাহলে আবার বেশি ব্যাথা পাবে, তাই নিজেকে

সংবরণ করে হাতদুটো মুঠিবদ্ধ করে রেখেছে ক্রীতিক। তবে দু'চোখের অ'গ্নিশিখা দ্বারাই আপাতত ভস্ম করে দিচ্ছে অরুর চিত্তকে। দোষটা অবশ্য অরুরই। অযথাই বাঘের কানে সুরসুরি দিলে বাঘ কি বসে থাকবে?
খানিকক্ষণ অরুর দিকে এভাবে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত পিষে ক্রীতিক ধা'রালো কন্ঠে বললো,— ফারদার যদি এসব বোকামি করতে আসিস, তাহলে অন্য গালটাতেও থা'পড়িয়ে র'ক্ত জ'মাট বাধিয়ে দেবো।
কথা শেষ করে হনহনিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকে যায় ক্রীতিক। ওদিকে ক্রীতিকের কথায় কলিজার পানি শুকিয়ে গিয়েছে অরুর, মনেমনে ভাবছে,
—আমি আসলেই ওনার বউতো? কবুল তো বলেছিলেন, রেজিস্ট্রি পেপারে সাইন ও করেছিলেন, তাহলে কিভাবে ভরা ক্যাম্পাসে আমার গায়ে হাত তুললেন উনি?
ওর ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে সায়নী এগিয়ে এসে মুখ কাচুমাচু করে বললো,— তুমি ঠিক আছো অরু?
অরু নাক টেনে বললো,
— সব তোমার জন্য, আমি বলেছিলাম উনি এতো সহজ নয়, ওনাকে এসব লেটার ফেটার দিতে গেলে উনি রেগে যাবে।
সায়নী মাথা নত করে, অসহায় সুরে বললো,
— আ'ম সরি অরু, তুমিতো ওনার বোন হও তাই তোমার হাত দিয়ে পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি সপ্নেও ভাবিনি উনি এতোটা রে'গে যাবেন যে, রেগেমেগে তোমাকে চ'ড় মে'রে বসবেন।

অরু আর সায়নীর সাথে কথা বাড়ালো না, এই মূহুর্তে সায়নীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করছে না ওর অগত্যাই চুপচাপ ক্লাসে ঢুকে গেলো অরু। ক্রীতিক ক্লাসেই ছিল, অরু পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে চুপচাপ বসে পরলো সবচেয়ে পেছনের সিটে। মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছে না একটু আগের ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটাকে। নিজের কাজে নিজেই লজ্জিত হয়ে পরেছে ও এখন। বারংবার মনে হচ্ছে কেন যে করতে গেলাম এমন পাকামি। দোষ অবশ্য সায়নীর ও কম নয়, যেদিন থেকে শুনেছে অরু ক্রীতিকের স্টেপ সিস্টার, সেদিন থেকে ননদীনি ডাকা শুরু করে দিয়েছে ওকে। ভার্সিটিতে ঢুকলেই শুরু হয় ওর প্রশ্নউত্তর পর্ব, জেকে স্যার কোথায় যায়, কি খায়, কি করে সব কিছুর পাই টু পাই খোঁজ নিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয় সায়নী, বলতে না চাইলে অরুর সাথে কেমন পরপর আচরণ করে সে।
উপায়ন্তর না পেয়ে, একমাত্র বাঙালি বান্ধবীর মনরক্ষার জন্য অরুও সবকিছুর ছাপ ছাপ স্পষ্ট জবাব দেয়। কিন্তু আজকে সায়নী একটু বেশিই করে ফেলেছে, অরুর হাতে রঙিন খামের মোড়কে বাঁধা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বলেছে ক্রীতিককে দিয়ে আসতে, বলেছে তো বলেছে একেবারে ঠেলে ক্রীতিকের সামনে পাঠিয়ে দিয়েছে। গতকাল ক্রীতিকের নরম সরম রূপ দেখে অরু ভেবেছিল একটা চিঠিই তো কি আর বলবে ক্রীতিক , দিয়ে দিলেই তো কাহিনি খতম, ওদিকে বান্ধবীর মনরক্ষাও রয়ে যাবে। কিন্তু কে জানতো কালকের ক্রীতিক আর আজকের ক্রীতিকের মাঝে এমন দিন রাত ফারাক। তাহলে কি অরু নিজের মানসম্মান খোয়ানোর মতো এতো বড় ভুলটা করতো? জীবনেও না।— মিসেস জেকে, ফোকাস।

ঠিক এভাবেই ছোট্ট একটা বাক্য দিয়ে অকস্মাৎ ক্লাসের মধ্যে বো'ম ফাটালো ক্রীতিক। নামটা শোনা মাত্রই, হইহই করে উঠে অরুর মুখের দিকে হা হয়ে তাকিয়ে আছে পুরো ক্লাস। সেবার বাস্কেটবল কম্পিটিশনের সময় সবাই যা অনুমান করেছিল সেটাই আজ বাস্তব হলো।
তাই বলে মিসেস জেকে? সবাইতো ভেবেছিল জেকে স্যারের বেবিগার্ল হবে হয়তো। কিন্তু না এতো স্বয়ং স্ত্রী। তারমানে সকলের ক্রাশ জেকে স্যার বিবাহিত?কথাটা ভাবতেই পুরো ক্লাস শোক শোক নিরবতায় ছেয়ে গেলো। ছেলেরা মেয়েদের চুপসে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে, একমাত্র অরুই চোরের মতো মাথা নুয়িয়ে বসে আছে সেই কখন থেকে, সায়নী ওর দিকে সেই তখন থেকেই কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে, মনেমনে ভাবছে,
— তাহলে অরু আমাকে বোকা বানিয়েছে এতোদিন ধরে?ক্লাস শেষে বের হতেই অরুর হাতটা খপ করে টেনে ধরলো সায়নী, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামিদের মতো করে প্রশ্ন করলো,
— সত্যি করে বলো, এতোদিন ধরে বোকা কেন বানালে আমাকে? আজকেও তো বলতে পারতে।
অরু নিজের হাত ছাড়িয়ে বললো,
— আমি তোমাকে বোকা বানাইনি, যা সত্যি তাই বলেছি।
— এতোদিন বলে এসেছো জেকে স্যার তোমার ভাই,আর এখন জেকে স্যার নিজে তোমাকে মিসেস জেকে বলে সম্মোধন করলো।কোনটা সত্যি?
অরু ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,

— দুটোই সত্যি, উনি আগে আমার স্টেপ ব্রাদার ছিলেন আর এখন স্বামী।
সায়নী তেতে উঠে বললো,— আর ইউ কিডিং মি? স্টেপ ব্রাদার কি করে স্বামী হলো?
— নো আ'ম নট, আর কি করে স্বামী হলো সেটা বরং তোমার জেকে স্যারকেই জিজ্ঞেস করো, উনি আমাকে জোর করে বিয়ে করেছেন কিনা, তাই উত্তরটাও উনিই ভালো দিতে পারবেন। আসছি।
একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যায় অরু। এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হওয়ার ভ'য়ই তো এতোদিন ধরে পেয়ে এসেছে ও,
— স্টেপ ব্রাদার কি করে স্বামী হয়?
অথচ ক্রীতিক একটাবার ওর কথা চিন্তা না করেই টেনে হিঁচড়ে জোর'জ'বরদস্তি করে কবুল বলিয়ে নিলো। এখন অরু চাইলেও এই সম্পর্কটাকে মুছে ফেলতে পারবে না, আর না এড়িয়ে যেতে পারবে জীবনের সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে যাওয়া সত্যিটাকে।একরাশ হৃদয়ের ব্যাথায় কাতর অরু ভার্সিটি থেকে ফিরেই,রুমের দুয়ারে খিল দিয়ে তলিয়ে গিয়েছে ঘুমের দেশে। আর ওঠেনি, অথচ এখন সন্ধ্যারাত তবুও পরেপরে ঘুমাচ্ছে সে। কিন্তু বালিশের পাশে অযত্নে পরে থাকা দামি মোবাইলটার ভাইব্রেট আওয়াজে সেই ঘুম আর বেশিক্ষণ টিকলো না। অগত্যাই ঘুমু ঘুমু চোখে ফোন কানে তুললো অরু। ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো চেনা পরিচিত হৃদয়ে শিহরণ জাগানো হাস্কি কন্ঠস্বর,
— আমার ঘুমপরী, বারান্দায় এসো।

ক্রীতিকের মুখে, তুমি শব্দটা শোনা মাত্রই একলাফে উঠে বসলো অরু, মনেমনে ভাবলো —আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো? উনিতো কখনোই আমাকে এতো আদুরে গলায় ডাকেন না। তাহলে আজ হঠাৎ?

অরু চুপ হয়ে আছে দেখে ক্রীতিক পুনরায় বললো,— কিরে বারান্দায় আয়, ডাকছি কথা কানে যাচ্ছে না?

ক্রীতিকের কথায় অরু তেতে উঠে বললো,

— পারবোনা, সকালে আমাকে মে'রেছেন মনে নেই?গালটা এখনো জ্বলছে।

— মা'র খাওয়ার মতো কাজ করলে আবার মা'রবো,তারপর আবার আদর করবো, এখন জলদি বারান্দায় আয়, তোকে দেখবো।

অরু মুখ ফুলিয়ে বললো,— যাবোনা বলেছি তো।

ক্রীতিক গলার আওয়াজ খানিকটা নরম করে বললো,

— একবার এসে দেখ, তোর জন্য সারপ্রাইজ এনেছি।

সারপ্রাইজের কথা শুনে অরু আর অপেক্ষা করতে পারলো না, ছুটে চলে গেলো বারান্দায়, দেখলো আজ বাইক নয়, কালো মার্সিডিজের ডিকিতে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে ক্রীতিক। ওর কোলের মাঝে ঘাপটি মে'রে বসে আছে ছোট্ট ডোরা। ডোরাকে দেখা মাত্রই অরুর মুখ আপনা আপনি হা হয়ে গেলো। দু'হাত চলে গেলো মুখের উপর, শুকনো মুখটা মূহুর্তেই প্রসারিত হয়ে গেলো খুশিতে, তারপর উচ্ছ্বসিত কন্ঠে অরু বললো,

— ডোরা?আসছি আসছি, আপনি দাড়ান আমি এক্ষুনি আসছি।

কয়েক মিনিটের মাথাতেই তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো অরু, ওর পরনে ক্রীতিকের কিনে দেওয়া পাজামা সেট, চুল গুলো মেসি বান করে উপরে তুলে বাঁধা, যেভাবে ঘুমিয়েছিল সেভাবেই নেমে এসেছে আজ। নিচে নেমে কালবিলম্ব না করে অরু দৌড়ে গিয়ে ক্রীতিকের কোল থেকে ডোরাকে তুলে নিলো নিজের কোলে। ক্রীতিক অবাক হয়ে বললো,— আজ এতো তাড়াতাড়ি বের হলি কি করে?
অরু ডোরাকে আদর করতে করতে বললো,
— মা আর আপা বাসায় নেই, হসপিটালে গিয়েছে ফিরতে রাত হবে।
ক্রীতিক ডোরার থেকে নজর সরিয়ে বললো,
— আগামীকাল আমরা পাহাড়ে যাবো, সবাই মিলে এলিসাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার প্ল্যান আছে, কাল সকাল সকাল বাসায় ম্যানেজ করে বের হবি।
অরু ক্রীতিকের পানে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
— মা জানলে মে'রে ফেলবে, তাছাড়া আপনাদের মাঝে আমি গিয়ে কি করবো?
—আমি বলেছি তাই যাবি।
অরু অসহায় মুখে বললো,— একদিন কি বলে ম্যানেজ করবো আমি? পারবো না, আপনি বরং গিয়ে ঘুরে আসুন।
ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরুর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে কর্কষ আওয়াজে বললো,
— ওকে ফাইন চল তাহলে।
অরু ক্রীতিকের হাত টেনে ধরে ব্যতিগ্রস্থ হয়ে শুধালো,

— একি কোথায় যাবো?
ক্রীতিক নিজের চোয়াল শক্ত করে বললো,
— যেহেতু তুই আমার বউ, সো তুই এখন থেকে আমার সাথেই থাকবি, দেখি কে আটকায় ।
অরু বড়সড় একটা শুষ্ক ঢোক গিলে ক্রীতিককে থামিয়ে দিয়ে বললো,
— শুনুন, শুনুননা একটু, মা কেবল একটু সুস্থ হয়েছে, এই মূহুর্তে মা এতোবড় শক নিতে পারবে না,সব কিছু জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।এমন করবেন না প্লিজ, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো, তবুও এমন পাগলামি করবেন না কথা দিন।
ক্রীতিক পুনরায় গাড়ির ডিকিতে বসে বললো,— ওকে ফাইন কাঁদতে হবেনা, জোর করবো না তোকে।তবে কালকের কথা যাতে মাথায় থাকে।
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে সায় জানালে ক্রীতিক কিছু একটা ভেবে অরুকে টেনে এনে নিজের উরুর উপর বসিয়ে দিয়ে ওর কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে বললো,
— এখনো রেগে আছিস আমার উপর?
অরু নাক ফুলিয়ে বললো,
— আমার রাগ দিয়ে কি আসে যায়, আপনিতো আমাকে সারাক্ষণই মা’রেন।
— আদর করিনা বুঝি?
অরু নিশ্চুপ। ক্রীতিক অরুর গালে হাতদিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারলো সেখানে এখনো পাঁচ আঙুলের ছাপ পরে আছে। ও যায়গাটাতে হাত বুলাতে বুলাতে বললো,

— তোর শরীরে আমার করা দাগগুলো মা'রাত্মক লাগে।
অরু শুষ্ক ঢোক গিলে বললো,
— তাই বলে এভাবে ব্যাথা দেবেন?
ক্রীতিক তীর্যক হেসে বললো,
— ভবিষ্যতে আরও বেশি ব্যাথা দেবো অভ্যেস করে নে।
অরু বুঝতে পারলো ক্রীতিকের কথার ধরন কেমন হুট করেই পাল্টে গিয়েছে, স্পর্শে তার তীব্র কাতরতা, গলার আওয়াজে লেগে আছে একরাশ মাদকতা, নিজ মনের অযাচিত চিন্তা গুলোকে পেছনে হটিয়ে দিয়ে অরু ডোরাকে শক্ত করে চেপে ধরে চুপচাপ হয়ে আছে,ক্রীতিক অরুর গালে নিজের গালটা আলতো স্পর্শে ঘষে দিয়ে বললো,
— আমি ব্যাথা দিয়েছি আবার আমিই আদর করে দিলাম।
হার্টবিট।
— হার্টবিট মানে হৃদস্পন্দন,যা না থাকলে মানুষ মা'রা যায়।
ক্রীতিক ওর গালের সাথে গাল মিশিয়ে বললো,
— তুই আমার কাছে তার চেয়েও বেশি।
ক্রীতিকের হঠাৎ করা উষ্ণ স্পর্শে কেঁপে উঠেছে অরুর ছোট্ট শরীর, সেই সাথে মিয়িয়ে গিয়েছে মস্তিষ্কে চড়াও হওয়া রাগের ফুলিঙ্গ। পুরুষালী স্পর্শ পেয়ে অরু নিজেও খানিকটা কুঁকড়ে গেলো, গলায় দীর্ঘশ্বাস আটকে রেখেই কম্পিত কন্ঠে বললো,—- আপনাকে আমি বুঝতে পারিনা কিছুতেই।
নিজের বলিষ্ঠ দুহাতে অরুর লতানো কোমড় টাকে জড়িয়ে ধরে অরুর গলায় মুখ ডোবাতে ডোবাতে ক্রীতিক বললো,

—-- পুরোপুরি আমার হয়ে যা ঠিক বুঝতে পারবি।রোদ্রজ্জল দিন। সূর্যের প্রখর তাপে ভালোই উত্তপ্ত ধরনী। আমেরিকার কনকনে শীতের মাঝে যেই ভালোবাসার কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল,সেই কনকনে শীত এখন অনেকটাই সহনীয় হয়ে উঠেছে, রাত আর ভোর ব্যাতীত শীতের আঁচ খুব একটা অনূভুত হয়না এখন আর। এছাড়া আবহাওয়ার হুটহাট পরিবর্তন আমেরিকার নিত্তনৈমিত্তিক কাহিনী, এসবে খুব একটা গা ভাসালে চলে না। তবে আজ সত্যিই ব্যতিক্রম চারিদিক, ভোরের মেঘভেজা বাতাস আর প্রাকৃতিক সুঘ্রাণে মো মো করছে স্নিগ্ধ সকাল। সেই সুন্দর সকালেই হাইওয়ে রাস্তা ধরে শাঁই শাঁই করে এগোচ্ছে ক্রীতিকের ব্ল্যাক মার্সিডিজ। গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে টিন্ডেট জানালায় চিবুক ঠেকিয়ে বসে নিস্প্রভ চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে অরু। ওর মনটা বিষন্ন, ব্যতিগ্রস্ত, আর ভারী ক্লান্ত।হাইওয়ে রাস্তার দু'ধারে উঁচু নিচু অসংখ্য পাহাড় আর তারমাঝে সারি সারি উইল্ড মিলের বহর। প্রকৃতির নিদারুন বাতাসে সবগুলো উইল্ড মিলই ঘুরছে আপন গতিতে। সেই তখন থেকে সেগুলো একধ্যানে পরখ করছে অরু। ও জানেনা ক্রীতিক ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আর জানতে চায়ও না, ক্রীতিকই তো নিয়ে যাচ্ছে, অন্য কেউতো আর না।
মা'রুক,কা'টুক, বকুক কিন্তু কখনো আসন্ন বি'পদে হাত ছেড়ে দেবেনা, হৃদ মাঝারে সদ্য জন্মানো ভালোবাসার প্রতি এতোটুকু ভরসা আছে অরুর।কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক নতুন হলেও, চেনা জানা তো আর নতুন নয়।
প্রথমবার ক্রীতিকের সাথে আউটিং এ যাচ্ছে, অথচ অরুর মন মস্তিষ্ক জুড়ে অজানা আ'তঙ্করা ভর করে আছে, বারবার মনে হচ্ছে

কিছু একটা ভুল হচ্ছে, কিছু একটা ঠিক নেই। একদিকে হৃদয় টা ক্রীতিকের জন্য আনচান করে, তো অন্যদিকে মস্তিষ্কটা দূর্বিষহ আর একটা তিমিরে ঢাকা ভবিষ্যতের ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকে। এতো অল্পবয়সে এই মন মস্তিষ্কের দোটানা মোটেই সহ্য হয়না অরুর। ক্রীতিকের মতো মানুষ কিনা শেষমেশ হাঁটুর বয়সী সৎ বোনের প্রেমে আকৃষ্ট হলো? কিন্তু কেন? অরু নিজেও ভেবে পায়না সে উত্তর।অবশ্য ভাবতে চায়ও না,কারন আজকাল তো ও নিজেও ক্রীতিককে ছাড়া কিছু ভাবতে পারেনা, এখনতো নিজের পাশে ক্রীতিক ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের মুখ কল্পনা করলেও গায়ে কাটা দেয় অরুর, একটা সময় নিখিলের জন্য করা অযথা পা'গলামি গুলো ভাবতে গেলে এখন শুধুই হাসি পায়, নিখিলকে আজকাল জোকার বৈকি আর কিছুই লাগেনা অরুর চোখে।যার দরুন নিজের মনের উপরই সন্দেহ জন্মেছে অরুর, ও কি আদৌও নিখিল কে ভালোবেসে ছিল?যদি ভালোই ভালোবাসবে তাহলে কি করে এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো? ভালোবাসা কি ভোলা যায়? ক্রীতিককেও কি এভাবেই চাইলেই ভুলে যেতে পারবে অরু? আচ্ছা ক্রীতিক ওকে ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেবে কি? মনেতো হয়না।সেই কখন থেকে অরু একধ্যানে বাইরে তাকিয়ে আছে, ক্রীতিক অরুর দিকে দুএকবার পরখ করে আবারও ড্রাইভিং এ মন দেয়, এভাবে মনমরা হয়ে কি ভাবছে এতো মেয়েটা কে জানে? তবে সবকিছুরই তো একটা সীমা আছে, অরু ভাবতে ভাবতে সেই সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে বহুক্ষণ আগেই, ক্রীতিকের কাছে অরুর ব্যবহারটাকে এখন গা জ্বালানো আর বিরক্তিকর লাগছে। অরুর মলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে স্থির চিত্ত কেমন ব্যাথা করে উঠছে ওর।

কিন্তু ক্রীতিক খুব সহজে তো নরম হতে জানেনা,আর না হৃদয়ের ব্যাথাটা অহরহ প্রকাশ করে দিতে পারে। তাই ভালোলাগা,মন্দলাগা দুটোতেই একই মুখ ভঙ্গিমা পরিলক্ষিত হয় ওর মাঝে। অজান্তেই হুটহাট মেজাজ হারিয়ে কাঠিন্যতা ছড়িয়ে পরে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, এবারও তাই হলো,কখন থেকে মেজাজ চড়াও হয়ে গেলো টের পায়নি ক্রীতিক, অরুকে কোনোরূপ ভালোমন্দ জিজ্ঞেস না করেই চোয়াল শক্ত করে স্পিডোমিটারের কাটায় একশোর উপর গতি তুলে ফেললো মূহুর্তেই।এতোক্ষণ ধরে চিবোতে থাকা চুইংগামটা তীক্ষ্ণ চোয়ালের এপাশ থেকে ওপাশে নিতে নিতে ভাবলেশ নজরে সামনে তাকিয়েই এমন উদভ্রান্তের মতো হুশশ করে গাড়ি চালাচ্ছে সে। যেন আশেপাশে কোনকিছুই হয়নি, সবকিছু সাভাবিক।ওদিকে হঠাৎ করেই গাড়ির স্পীড দিগুণ বেড়ে যাওয়ায় আচমকা আঁতকে উঠল অরু,হুট করেই বাতাসের তীব্র ধা’ক্কা চোখে মুখে কাঁচের মতো এসে বিধলো, অরু সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে মুখ সরিয়ে আ’তঙ্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্রীতিকের পানে। ক্রীতিক আগের মতোই চুইংগাম চিবুচ্ছে, চোখে তার বিশালাকৃতির রোদ চশমা, পরনে ব্ল্যাক ওভার সাইজ হুডি, লম্বা ঘাড় ছুঁই ছুঁই চুল গুলো এলোমেলো হয়ে কপালে পরে আছে, এই ক্রীতিককে দেখতে ঠিক যতটা না সুন্দর লাগছে, ওর মুখে লেগে থাকা কপট হাসিটা তার চেয়েও ভয়ানক লাগছে।
সেই কখন থেকে অরু একধ্যানে তাকিয়ে আছে দেখে,এবার নিরবতা ভাঙে ক্রীতিক, সামনে দৃষ্টিপাত করেই অরুকে প্রশ্ন ছো’ড়ে,— কি দেখছিস এতো মন দিয়ে?
অরু নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দেয়,

— দেখছি আপনি কতটা হার্টলেস।
ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে জবাব দেয়,
— আমি হার্টলেস নই অরু।
ক্রীতিকের কথায় অরুর অভিমানে ভাটি পরলো, মনের মাঝে জমাট বাঁধা কালো মেঘের কোলে উঁকি দিলো সূর্য কীরন , ও বললো,— তাহলে এভাবে গাড়ি চালিয়ে কিসের হু'মকি দিচ্ছেন?
ক্রীতিক গভীর কন্ঠে বললো,
— ফোকাস অন মি।
অরু সিটের উপর দু পা তুলে দিয়ে ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে মলিন মুখে বললো,
— আপনাকে নিয়েই তো ভাবছিলাম, কবে হয়ে গেলেন এতোটা আপন? আপনার জন্য কি সুন্দর বানিয়ে বানিয়ে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে, মা আর আপাকে বোকা বানিয়ে বের হয়ে এলাম।আমি সত্যিই পাল্টে গিয়েছি।
অরুর এরূপ প্রতিউত্তরের সাথেই সাথেই স্পিডোমিটারের গতি সহসাই ধীর হয়ে এলো। সানগ্লাসের আড়ালে আ'গ্নেয়গিরির লা'ভার মতোন জ্ব'লন্ত চোখ দুটো মূহুর্তেই শান্তরূপ ধারন করলো ক্রীতিকের। ক্রীতিক চুপ হয়ে আছে দেখে অরু পুনরায় বললো,— না আপনাকে আমি হৃদয় থেকে মুছে দিতে পারছি, আর না আপনাকে নিয়ে সুন্দর বৈবাহিক স্বপ্ন দেখতে পারছি,শুধু মনে হচ্ছে আপনি ছাড়া আজকাল আমি অচল, আপনাকে আমার প্রয়োজন নয়তো বুকের ভেতরটা হরহামেশাই পু'ড়ে যায়। এ কেমন দহন? আমি কি প্রেমে পরেছি আপনার?

অরুর শেষ কথাতে গাড়িটা এবার পুরোপুরি থামিয়ে দিলো ক্রীতিক, হুট করে গাড়ির
ব্রেক কষানোতে অরুও একটু হুড়মুড়িয়ে উঠলো। কিন্তু ক্রীতিক ওকে পরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে টান মে’রে নিয়ে এসে নিজের কোলের উপর বসালো। অকস্মাৎ ঘটনাপ্রবাহে অরু নিজেও ভ্যাঁবাচ্যাকা খেয়ে চোখের পলক ফেলতে লাগলো বারবার, নিজেকে সামলানোর জন্য ক্রীতিকের হুডি খামচে ধরে অস্ফুটে সুরে বললো,— গাড়ি থামালেন কেন হঠাৎ ? এসে গিয়েছি বুঝি?
ক্রীতিক অরুর পিঠের দিকে হালকা ধা’ক্কা দিয়ে নিজের দিকে টেনে এনে বললো,
— এতোটা দূর্বল করে দেওয়ার কি মানে অরু? তুই কি চাস আমি গাড়ি চালাতে না পেরে এক্সিডেন্ট করে ম’রে যাই?
অরু বিস্মিত কন্ঠে বললো,
— এসব কি বলছেন?
— নয়তো এসব বলে কেন দূর্বলতা বাড়াচ্ছিস? নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারলে আমি কিন্তু গাড়িতেই তোকে…
কিছু একটা ভেবে থেমে গেলো ক্রীতিক, অতঃপর শুষ্ক ঢোক গিলে ওর ছোট ছোট বেবি হেয়ারগুলো কানের পেছনে গুঁজে দিতে দিতে নরম সুরে বললো,— আই ফিল ইউর পেইন অরু, খুব শীঘ্রই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তুই বললে আমি এখনই সব কিছু ঠিক করে ফেলতে পারি, কিন্তু বারবার তোকে জো’রজব’রদস্তি করতে চাইছি না আমি,তাই সময় দিচ্ছি, তাই বলে এই না যে আমি ভবিষ্যতেও চুপ করে থাকবো। সময় হলে আমার অরুকে আমি

ঠিক ছিনিয়ে নেবো। আই রিপিট ছিনিয়ে নেবো।এখন এসব নিয়ে ভাবিস না জান,আমার উপর একটু ভরসা রাখ, আমিতো আছি।
অরু কিছুই বলছে না অবাক দৃষ্টিতে ক্রীতিকের পানে তাকিয়ে আছে, এই লোক এতো সুন্দর করে বোঝাতেও পারে? মাত্র কয়েকটা বাক্যদ্বারা কি সুন্দর হৃদয়ে বইতে থাকা জ'লোচ্ছ্বাসের মতো উত্তাল ঢেউকে নিমিষেই শান্ত করে কানায় কানায় ভরিয়ে দিলো।
অরু তাকিয়ে আছে দেখে ক্রীতিক বললো,— ইউ হ্যাভ টু প্রমিস মি, আর এসব নিয়ে মন খারাপ করবি না।
অরু এবার ঠোঁট উল্টে বাচ্চাদের মতো হ্যা, না দুইদিকেই মাথা নাড়ালো।
অরুর কান্ডে ক্রীতিক সামান্য হেসে বললো,
— তুই আমার থেকে অনেক বেশি ছোট অরু, তাই অনেক কিছু শেয়ার করতে দ্বিধাবোধ করিস,লজ্জিত হোস, এতে অযথা ভাবনার কিছু নেই, আমাদের মধ্যে সেরকম স্বামী স্ত্রীর সাভাবিক সম্পর্ক এখনো তৈরি হয়নি, এই দ্বিধা আর সংকোচটুকু তাই অসাভাবিক কিছু নয়। তাই বলে এই না যে আমরা কখনো নরমাল স্বামী স্ত্রীর মতো হবোনা।তুই আমার থেকে বয়সে খুব ছোট বলে আমি তোকে ছেড়ে দেবো, কখনোই নিজের একান্ত ব্যক্তিগত চাহিদা গুলোকে তোর সামনে উত্থাপন করবোনা, এটা ভেবে থাকলে এখনো ভুলের মধ্যে আছিস জান। একটা সময় আসবে যখন তোর শরীর সম্ভ্রম দিয়ে নয়, আমার শরীর দিয়ে ঢাকা থাকবে। তোর ফর্সা ত্বকের খাঁজে খাঁজে শুধুমাত্র আমার তৈরি করা ক্ষত থাকবে, আর সেটা তুই খুশি মনে ভালোবেসে গ্রহন করবি। তখন দেখবি এই দ্বিধা এই জড়তা কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, তোর আমার

সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন তুইও আমাকে নিয়ে বৈবাহিক স্বপ্ন দেখবি, আই সয়্যার। এতোক্ষণ তো ভালোই বুঝাচ্ছিল, কিন্তু হুট করেই কি থেকে কিসের মাঝে চলে গেলো ক্রীতিক?
একেতো ক্রীতিকের কোলের উপর বসা, তারউপর ক্রীতিকের এমন লাগাম ছাড়া জ্ঞানদান সব মিলিয়ে মাথা নুয়িয়ে চুপচাপ বসেবসে আঙুল দিয়ে ক্রীতিকের হুডির ফিতে ধরে টানাটানি করছে অরু। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে, এই মূহুর্তে একপা নড়াচড়া তো দূরে থাক মাথা তুলে ক্রীতিকের ওই ভাসা ভাসা চোখের দিকে তাকানোর শক্তিটুকুও অরুর মাঝে অবশিষ্ট নেই।
অরু ক্রীতিকের খোলামেলা কথায় বেশ লজ্জা পেয়েছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্রীতিক ইচ্ছে করেই ওকে লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে দিতে বললো,
— ডু ইউ লাইক সিটিং হিয়ার?
ক্রীতিকের কথার আসল মানে বুঝতে পেরে অরু হকচকিয়ে বললো,
— ছাড়ুন আমি নামবো।
ক্রীতিক ওকে টেনে ধরে বললো,— নো!এখানেই বসে থাক, সময় হলে দুজন একসাথেই নামবো।
অরুর লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে, কেউ শুধু শুধু অহেতুক গাড়ির মধ্যে এভাবে কোলে বসিয়ে রাখে? মানুষ কি বলবে? ক্রীতিক যে এতোটা লাগামহীন নির্লজ্জ প্রকৃতির লোক সেটা আজ প্রথমবার উপলব্ধি করলো অরু, মনেমনে ক্রীতিকের উপর চড়াও হয়ে অরু বললো,

— আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল, এই লোক সুবিধার না, যে সারাক্ষণ ডার্ক রোমান্টিক অডিও বুক শুনে সময় পার করে সে কিভাবে ভদ্রলোক হতে পারে?
ক্রীতিক সেই তখন থেকে কোলের উপর বসিয়ে রেখেছে অরুকে,ওদিকে অরুর প্রচুর বিরক্ত লাগছে এভাবে বসে থাকতে, কতক্ষণ এভাবে বসেবসে কালো হুডির কালো বিশ্লেষণ করা যায়? কালো দেখতে দেখতে চোখ ধরে এসেছে ওর। তাই টিকতে না পেরে নিরবতা ভেঙে অরু শুধালো ,— আপনি আমার শরীরে ক্ষত কেন করবেন? আপনিকি ডা'কাত?
ক্রীতিক এতোক্ষন ব্যাক সিটে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল, হঠাৎ অরুর এমন প্রশ্ন শুনে নিজের হাত দিয়ে অরুর ঘাড়টা সামনে টেনে এনে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ও হিসহিসিয়ে বলে,
— আই লাইক ডার্ক রোমাঞ্চ বেইবি। নরম সরম আদরে আমার পোষায় না। আমি যেখানে টাচ করি সেখানে ক্ষত বানিয়ে তবেই ছাড়ি। এই জন্যই বলি, এখন সময় দিচ্ছি নিজেকে প্রস্তুত কর, ছোট বলে মোটেই ছেড়ে দেবোনা। তোর কাছাকাছি এলে নিজের মধ্যে থাকিনা আমি, পরে আমাকে দোষ দিতে পারবি না।
ক্রীতিকের অসহনীয় কথায় অরুর কান বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, মনেমনে ভাবলো
—-কি প্রশ্ন করলাম,উনি কি উত্তর দিলো,এই লোকের মাথায় কি সবসময় এইসবই ঘোরে?ছ্যাহ!
ক্রীতিক আবারও ব্যাকসিটে মাথা এলিয়ে দিয়েছে, অরু এবার রাগ দেখিয়ে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিলো সায়র।

ক্রীতিক একই ভাবে অরুকে কোলে নিয়েই শুধালো,— কি চাই?
সায়র ক্রীতিকের কথায় পাত্তা না দিয়ে অরুর দিকে চাইলো, যে আপাতত সায়রকে দেখে স্ব ওড়না দিয়ে নিজের নাক,মুখ পেচিয়ে মমি হয়ে ক্রীতিকের কোলে বসে আছে।
অরুর অবস্থা দেখে সায়র ঠোঁট চেপে হাসি সংবরণ করে বললো,
— বাবাহ ক্রীতিক,ভালোইতো উন্নতি হয়েছে তোর বাচ্চা বউয়ের, সেবার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে থাইল্যান্ড বসে কাঁদতে কাঁদতে নাকের পানি চোখের পানি একাকার করে আমেরিকা পর্যন্ত বন্যা বানিয়ে ফেলেছিল, আর এখন কি সুন্দর কোলে বসে আছে, কি খাইয়ে বড় করে ফেললি এতো তাড়াতাড়ি?
ক্রীতিক হাই তুলে বললো,— স্পেশাল ডোজ, তোদের মতো সিঙ্গেল মানুষ এসব বুঝবে না।
ক্রীতিকের মুখে লাগাম টানার জন্য অরু এই প্রথমবার সাহস করে একটা কাজ করে বসলো, ও এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ক্রীতিকের মুখ চেপে ধরলো।
ক্রীতিক অরুর চেপে রাখা হাতের মধ্যে থেকেই অস্পষ্ট সুরে সায়রকে বললো,
— আমার বউ লজ্জা পাচ্ছে, যা ভাগ শালা।
সায়র ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
— বাস ওয়েট করছে জলদি আয়, অতঃপর যেতে যেতে অসহায় সুরে বললো,
— আমার যে কবে একটা বউ হবে। হে উপরওয়ালা আর কতদিন সিঙ্গেল রাখবে তুমি আমায়?একটা আমেরিকান গার্লফ্রেন্ড জুটিয়ে দিলেও তো পারো।চারিদিকে পাহাড় বেস্টিত অরন্যে ঘেরা নির্জন

পরিবেশে সরু পিচঢালা রাস্তার একমাথায় দাড়িয়ে আছে মিনি সাইজের একটা অত্যাধুনিক বাস। ক্রীতিক হাতের মুঠোয় অরুর ছোট্ট হাতটা চেপে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই। যেন অরু কোনো বাচ্চা মেয়ে হাত ছাড়লেই দুষ্টামি শুরু করে দেবে। এদিক ওদিকে তাকিকে বাসটাকে পর্যবেক্ষন করে অরু যেতে যেতে বললো,

— এখন আবার বাসে কোথায় যাবো?

—গন্তব্যে।

ছোট্ট করে উত্তর দিল ক্রীতিক। ওর মনটা ভালো তাই হয়তো এতোটুকু উত্তর পেয়েছে অরু। যেহেতু ক্রীতিক খুব একটা কথা বলেনা,তাই আশপাশের সুন্দর পরিবেশ দেখতে দেখতেই হাটতে লাগলো অরু।

অতঃপর হাটতে হাটতে ক্রীতিকের হাত ধরেই বাসে উঠে এলো ও। বাসের ভেতরে এলিসা, অর্নব, ক্যাথলিন আর সায়র বসা। ক্যাথলিন মাথায় বাকেট হ্যাট পরে আছে, ও অরুকে দেখেও না দেখার ভান করে বসে রইলো, তাকাতে যাবে তারপর আবার ক্রীতিক রেগেমেগে এসে কি কেটে নেবে কে জানে? তার চেয়ে না তাকানোই মঙ্গল।

অরুকে দেখে এলিসা আগ বাড়িয়ে বললো,— অরু আমার কাছে এসে বসো।

এলিসার আন্তরিকতায় অরু এগিয়ে গিয়ে এলিসার পাশে বসলো, আর ক্রীতিক চলে গেলো পেছনে সায়র অর্নবের কাছে।

অরু পাশে বসতেই এলিসা সম্মোহনী হাসি দিয়ে শুধালো,

— আপুর উপর রাগ করে আছো বুঝি?

অরু এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,

— আমি তোমার উপর রেগে নেই আপু। তুমিতো আর কিছু করোনি।
— জেকে কে বাঁধাও তো দিইনি।
এলিসার কথায় অরু এবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ক্রীতিকের পানে চাইলো, যে খুব গভীর মনোযোগে আইপ্যাড স্ক্রল করছে আর সায়র, অর্নবের সাথে কিছু একটা নিয়ে আলাপ করছে। তারপর পুনরায় এলিসার দিকে তাকিয়ে বললো,
— এখানে কারোরই কোনো হাত নেই আপু। আমিই বোধ হয় ওনার বুকের বা পাশের পাঁজর দিয়ে তৈরি হয়েছিলাম,তাই ডেসটিনি এড়াতে পারিনি।
অরুর এমন সহজ সীকারোক্তিতে এলিসার ঠোঁট প্রসারিত হয় মৃদু হাসিতে,অরুর হাতটা নিজের হাতের মাঝে নিয়ে অবিশ্বাসের সুরে এলিসা বলে,— তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ও তোমার জন্য ঠিক কতোটা পা'গল। শুধু আমরাই জানি, তাইতো সেদিন ওর অন্যায় আবদারে বাঁধা দিতে পারিনি। কারণ সময়টা প্রতিকূল ছিল ঠিকই কিন্তু তোমার প্রতি ওর অনূভুতি গুলো ছিল হিরের মতো স্বচ্ছ আর দিনের মতোই সত্য। হি ইজ লিটরেলি অবসেসট উইথ ইউ অরু। আর সেদিন কেউ তোমার মায়ের অপারেশন বন্ধ করেনি,জেকে মিথ্যা বলে তোমাকে ভ'য় দেখিয়েছিল। যাতে তুমি দ্রুত বিয়েতে হ্যা বলে দাও।
এলিসার কথার পাছে অরু আর কিছুই বললো না, আজ ওর সামনে নতুন করে ক্রীতিকের আরও খানিকটা রহস্য খোলাসা হলো। তারমানে ক্রীতিক নিজেকে যেমনটা দেখায় ক্রীতিক আসলে তেমনটা নয়, পুরোপুরি ভিন্ন একটা মানুষ।

অরু যখন হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে ছিল,তখনই এলিসা ওকে হটডগ এগিয়ে গিয়ে বললো,— নাও, এটা খাও।
সকাল থেকে না খেয়ে খেয়ে খিদেয় পেট চো-চো করছে অরুর,এখন খাবার দেখে ক্ষিদেটা যেন আরও দিগুন বেড়ে গিয়েছে, তাই দেরি না করে, হাত বাড়িয়ে খাবারটা নিতে যাবে, তৎক্ষনাৎ পেছন থেকে এলিসাকে উদ্দেশ্য করে ক্রীতিক বললো,
— এলিসা অরুকে কিছু খাওয়াস না, ক্যাম্পিং ভ্যানে গিয়ে একেবারে খাবে, ওর এখন মাথা ঘুরছে। এখন খাওয়ালে বমি করে সারাদেশ ভাসিয়ে দেবে তখন আবার আমার যত জ্বালা।
এলিসা তাড়াতাড়ি করে খাবারটা অরুর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো,
— অরু, সত্যিই তোমার মাথা ঘুরছে?
অরু মেকি হেসে নিজের রাগ সংবরন করে বললো,
—- একটু আপু, অতঃপর ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে কটমটিয়ে বললো,
— আমি মোটেই বমি করে সারাদেশ ভাসাই না।
ক্রীতিক গভীর মনোযোগে আই প্যাড দেখছে,সেইসাথে হটডগে কামড় বসাতে বসাতে অরুকে বলছে,
— ডোন্ট টক,হার্টবিট। বমি চলে আসবে।
অরু মুখে ভেংচি কেটে সামনে তাকিয়ে বললো,
— অসহ্য।জোছনা রাতে আকাশে রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠেছে। তার আশেপাশে নির্ভীক সৈন্যের ন্যায় পাহারায় দাড়িয়ে

অগণিত তারকারাজি। চাঁদ আর তারকাদের রুপোলী আলোয় ভেসে যাচ্ছে পুরো পাহাড়ের এমাথা থেকে ওমাথা।
পাহাড়ের চূড়ায় তিন তিনটে ক্যাম্পিং ভ্যান পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো কৃত্তিম আলোয় আলোকিত। ক্যাম্পিং ভ্যানগুলোর মাঝখানে যে আঙিনার মতো ছোট্ট জায়গাটুকু পরে আছে সেখানে ক্যাম্পফায়ার জ্বালানো হয়েছে, সন্ধ্যা নামাতে একটু একটু হিমেল হাওয়া বইছে পাহাড়ের গায়ে। তবে এই মূহুর্তে কারোরই সেই বাসন্তিক হিমেল হাওয়াতে নজর নেই, আপাতত একযোগে সবার দৃষ্টি ধরে রেখেছে অর্ণব আর এলিসা।
সবাই যখন ক্যাম্প ফায়ারের চারদিকে গোলাকার হয়ে বসে গল্পগুজবে মেতে উঠেছিল, তখনই সবার মধ্যে থেকে অর্ণব উঠে এসে এলিসার সামনে হাটু গেড়ে বসে পরে, এলিসা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে অর্ণব হাতে থাকা চকচকে হিরে খচিত রিংএর বক্সটা বাড়িয়ে দেয় এলিসা পানে।
ক্যাম্পিং করার নাম করে পাহাড়ে এসে অর্ণব এভাবে সারপ্রাইজ করে দেবে সেটা কল্পনাও করেনি এলিসা। অবাকের চড়ম সীমানায় গিয়ে মুখের উপর হাত রেখে এলিসা বললো,— কি করছিস তুই মাথা ঠিক আছে? সবাই দেখছে তোকে।
অর্ণব বললো,
— দেখুক।এখানে সবাই আমার ভালোবাসার পাগলামি গুলো দেখেদেখে অভস্ত্য এলিসা।
তোকে প্রথম দেখে ভালোবেসে ছিলাম আমি, বলতে পারিস লাভ এট ফার্স্ট সাইড,তারপর যতগুলো বছর একসাথে বেস্টফ্রেন্ড হিসেবে কাটিয়েছি, তোর প্রতি ভালোবাসাটা আমার বেড়েই গিয়েছে দিগুণ

তালে, কমেনি কখনো।তোর মনটাকে জিতে নেবার আসক্তি, তোকে আপন করে পাবার নেশাটা শরীরের নিউরনে নিউরনে ছড়িয়ে পরেছে আমার। এখন মনে হচ্ছে একপাক্ষিক ভালোবাসতে বাসতে তুই আমার ব্যাধিতে পরিনত হয়েছিস, আরোগ্য ব্যাধি। আমার এই আরোগ্য ব্যাধি সারাতে তোকে বড্ড প্রয়োজন এলি।তুই কি পারবি না নিজেকে আমার নামে লিখে দিতে? এই মূহুর্তে আমাকে ফিরিয়ে দিলেও আমি এ জীবনে তোর পিছু ছাড়বো না,তুই এটা ভালো করেই জানিস। আর আমিও এটা যে জানি তুই আমাকে ভালোবাসিস, তাই বলছি,
এলিসা?
উইল ইউ বি মাইন? ফর আ লাইফটাইম কমিটমেন্ট?
এলিসা চুপচাপ দাড়িয়ে আছে, হ্যা না কিছুই বলছে না দেখে, অর্ণব পুনরায় বললো,—এখন ফিরিয়ে দিলে অসুবিধা নেই, আমি আবার তোকে প্রপোজ করবো, সমস্যা নেই। তোকে ভালোবাসতে ভালোবাসতে এমনিতেই বন্ধুমহলে নির্লজ্জ খেতাব প্রাপ্ত আমি।
অর্ণবের শেষ কথায় ডুকরে কেঁদে উঠলো এলিসা। কাঁদতে কাদঁতে হেঁচকি টেনে বললো,
— কে বলেছে আমি তোকে ফিরিয়ে দেবো? আমিকি এতোটাই খারাপ, যে নিজের ভালোবাসার মানুষের মন বুঝতে পারিনা?
অর্ণব একগাল হেঁসে বললো,
— তাহলে হাতটা দে?রিং পরাই।
এলিসা তৎক্ষনাৎ নাক টেনে হাত বাড়িয়ে দিলো,
অর্ণব এলিসার অনামিকা আঙুলে রিং পরিয়ে উঠে দাড়িয়ে চট করে এলিসার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবালো।

ওদের এই গভীর প্রেম নিবেদন এতোক্ষণ মন দিয়ে দেখছিল অরু, ভালোও লাগছিল এমন ভালোবাসার পূর্ণতা দেখতে। কিন্তু হঠাৎ করে এভাবে সবার সামনে এতোটা অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন দেখে সংকোচে চোখ সরিয়ে ফেললো অরু। অরুর কাছে ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর হলেও, আমেরিকান কালচারে বড় হওয়া এলিসা অর্ণবের কাছে এটা দুধ ভাত মাত্র ।অরু চোখ নামিয়ে মাথা নত করে চুপচাপ ঘাস ছিড়ছে, তখনই কোথা থেকে এগিয়ে এসে সবার আড়ালে ওকে হ্যাঁচকা টান মে'রে ক্যাম্পিং ভ্যানের পেছনে নিয়ে গেলো ক্রীতিক। চাঁদের নিয়ন আলোতে ক্রীতিকের মাদকতা মিশ্রিত চোখ দুটো দেখে অ'ন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো অরুর, ক্রীতিকের উজ্জল ফর্সা চোখ মুখ সব লালবর্ণ ধারন করেছে, সাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুতই শ্বাস নিচ্ছে সে, ক্রীতিকের এমন উদভ্রান্তরুপ দেখে অরু সচকিত হয়ে শুধালো —কি হয়েছে আপনার, জ্বর এসেছে?দেখি।

অরু ক্রীতিকের কপাল ছোয়ার জন্য হাত বাড়ালে ক্রীতিক সেটাকে খপ করে ধরে, বিনাবাক্যে দ্বিতীয়বারের মতো,নিজের ডার্কব্রাউন ওষ্ঠযুগল অরুর নরম তুলতুলে অধরের মাঝে ডুবিয়ে দেয়।অরুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক অবাধ্য উন্মাদনায় ছেয়ে গিয়েছে ক্রীতিকের শরীর মন সবকিছু। যার ফলস্বরুপ অরুর ঠোঁটের গভীর থেকে গভীরতর রহস্য উন্মুক্ত করায় মত্ত হয়ে আছে ক্রীতিক, হঠাৎ করে আবারও সেদিনের বেসামাল অনূভুতির জোয়ার এসেছিল অরুর মাঝেও, কিন্তু কতক্ষণ? এখন ক্রীতিকের অতিরিক্ত চাহিদা পূরন করতে গিয়ে দম নেওয়াই দায় হয়ে উঠেছে ওর , তারউপর অবাধ্য হাতের স্পর্শ, এমন আকস্মিক আ'ক্রমণে

অরুর যখন প্রান যায় যায় অবস্থা তখন ক্রীতিক নিজেই ছেড়ে দিলো ওর অধর।
একটু খানি দম নিয়ে, নিঃসংকোচে হাত নিয়ে রাখলো অরুর গলায়, অতঃপর একটানে ওড়নাটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো পাহাড়ের ঢালে। এতোক্ষণ যেভাবেই হোক ক্রীতিকের করা পা'গলামি গুলো মুখ বুজে সহ্য করে নিয়েছে অরু, কিন্তু এবার ক্রীতিকের অস্থিরতা আর নেশা ধরা চাহনী দেখে বেশ ভরকে গিয়েছে ও।সেই সাথে ক্রীতিকের পরবর্তী পদক্ষেপ আঁচ করতে পেরেছে খুব ভালোভাবেই, ক্রীতিক এগিয়ে আসছে দেখে ভীত অরু ওর শরীর স্পর্শ করার আগেই অন্যদিকে ঘুরে সশব্দে , নাহহ! বলে কেঁদে উঠলো অরু।হুট করে, একদম হুট করেই ঘটে গিয়েছে ব্যাপারটা, ক্রীতিক নিজের মাঝেই ছিলনা, তখন কি জানি কি হয়ে গেলো, আরেক জনের ভালোবাসা দেখতে দেখতে ওর মাঝেও অরুকে একান্তে কাছে পাওয়ার তীব্র বাসনাটা কেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু আচমকা এভাবে অরুর কা'ন্নার আওয়াজ কানে ভেসে আসতেই সম্বিত ফিরে পেলো ক্রীতিক, দু'হাত দিয়ে নিজের স্টাইলিশ চুলগুলো নিজেই খামচে ধরে অস্পষ্ট সুরে বললো,— শীট।
তারপর দু'কদম এগিয়ে গিয়ে অরুকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললো,
— কি হয়েছে কাঁদছিস কেন? লেগেছে?
অরু বিনাবাক্যে চুপচাপ চোখের জল ফেলছে, দেখে ক্রীতিক আবারও বললো,
— অরু, হার্টবিট, প্লিজ কাঁদিস না, সবাই ওপাশে আছে, এভাবে তোকে কাঁদতে দেখলে ওরা ভাববে আমি তোর সাথে

জো'রজ'বরদস্তি করেছি। কি হয়েছে বল আমায় কেন কাঁদছিস, ঠোঁটে বেশি লেগেছে?
অরু ফুঁপিয়ে উঠে বললো,
— মা, আপাকে,মিথ্যে বলে এতোদূরে এসে এই রাতের বেলা আমি কি ঠিক করেছি? মা যদি একটাবার বুঝে ফেলে আমি মিথ্যে কথা বলেছি, তাহলে আমাকে এমন ভাবে কৌশলে আটকে ফেলবে, যে আমি আর বাইরের জগতের মুখটাও দেখতে পারবো না, আর আপনাকে তো না-ই।
অরুর কথায় ক্রীতিক খানিকক্ষন চুপ হয়ে রইলো, তারপর গভীর কন্ঠে শুধালো,— তুই আমাকে চাস কি না?
অরুর পুরো মস্তিষ্ক এলোমেলো ভাবনায় ছেয়ে আছে, এই সময় এমন একটা প্রশ্নের কি মানে হয়? বুঝে উঠতে পারলো না অরু।
অরু চুপ হয়ে আছে দেখে ক্রীতিক পুনরায় একই প্রশ্ন করলো,
— তুই আমাকে চাস, কি না?
— কি বলছেন, এ....
অরুকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে ক্রীতিক আবারও বললো,
— হ্যা অথবা না। এর বাইরে আর একটা টু শব্দও শুনতে চাইনা।
অরু দেখলো ক্রীতিকের একটু আগের সেই আবেগপূর্ণ প্রেম প্রেম চেহারা হুট করেই কোথাও গায়েব হয়ে গিয়েছে, চোখের মাঝে অনুভূতির ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। এখন যা আছে তা কেবলই বংশানুক্রমে পাওয়া আভিজাত্য আর কতৃত্বে সয়ংসম্পূর্ন ধা'রালো রুপ।

অরু ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে ক্রীতিক ওকে ঘুরিয়ে দাড় করিয়ে দিয়ে বললো,— তোর হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে, টেইক ইউর টাইম, আমি এখানেই আছি কোথাও যাচ্ছিনা।
এবার ক্রীতিকের কথাটাকে একটু সিরিয়াসলি নিয়ে সত্যি সত্যিই ভাবতে বসলো অরু,
সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রথম দিন এসে ভুল করে ক্রীতিকের বিছানায় ঘুমানো, ভরা গ্যালারীতে সবার সামনে ওর ওড়না দিয়ে নিজের ঘাম মোছা,এলিসার জন্মদিনে ক্রীতিকের অনেকটা কাছাকাছি আসা, ওর উপর ক্রীতিকের বারবার অধিকার ফলানো, প্রতিবার বিপ'দে ঢাল হয়ে রক্ষা করা, জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার পর হেলিকপ্টারে করে ওকে সেফ করা,নিজের হাত কে'টে হলেও ওকে বাঁচানো। নুপুর, চুলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসকে যত্ন করে আগলে রেখে দেওয়া,নিখিলের সত্যিটা জানার পর ওকে সামলানো, নিজের জীবনের সাথে ওর জীবনটাকে ইচ্ছে করে জড়িয়ে ফেলা, সেদিন ক্রীতিকের বাড়ি ছেড়ে আসার সময় রাগের মাথায় নিজের গোপনীয় সত্যি কথাটা অজান্তেই সীকার করে ফেলা, রাতের আধারে না ঘুমিয়ে ওকে একনজর দেখতে আসা, আর সবশেষে এলিসার বলা কিছু চড়ম সত্যি,—তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ও তোমার জন্য ঠিক কত টা পাগল। হি লিটরেলি অবসেসট উইথ ইউ।
হটাৎ করেই অরুর মনে হতে লাগলো, প্রথম থেকে সবকিছু যেন একই সুতোয় গাঁথা, কেবল অরুই কিছু টের পায়নি, কিছু বুঝতে পারেনি, কি করেই বা পারতো? ও তো কখনো ক্রীতিকের ভালোবাসা খুজতেই যায়নি। নিজেকে বারবার বসিয়ে এসেছে

ক্রীতিকের অপছন্দের তালিকায়, অথচ এখন মনে হচ্ছে ক্রীতিকের মতোকরে ওকে কেউ কখনো ভালোবাসতে পারবেনা, কোনোদিন না। যাই হয়ে যাক ক্রীতিকের ভালোবাসাকে পায়ে ঠেলে দেওয়ার সাধ্য অরুর নেই, তাছাড়া ও নিজেও তো ক্রীতিকের প্রেমে পরেছে এটা কি করে অস্বীকার করবে?
— ইউর টাইম ইজ ওভার।
পেছন থেকে ক্রীতিকের আওয়াজ ভেসে আসতেই অরু ঘাড় ঘুরিয়ে তরিৎ বেগে বললো,
— আমি চাই।
— কি চাস?
অরু এবার ছুটে ক্রীতিকের গলা জড়িয়ে ধরে দুটো শরীরের মাঝে সমস্ত দূরত্ব ঘুচিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে বললো,
— আমি আপনাকে চাই, জেকে।
ক্রীতিক একটা রহস্যময়ী হাসি দিয়ে বললো,— তুই চাইলেই বা কি আর না চাইলেই বা কি, আমার হাত থেকে তোর এ জীবনে নিস্তার নেই।
আমিতো কেবল তোর হৃদয়ের সুপ্ত অনুভূতি গুলোকে তরতাজা করলাম মাত্র ।
ক্রীতিকের কথায় কান না দিয়ে অরু আবারও বললো,
— আমি আপনাকেই চাই, নিজের স্বামীরূপে আপনাকে ছাড়া অন্যকোনো পুরুষকে আমি কল্পনাও করতে পারিনা বিশ্বাস করুন।
অরুর নিঃসংকোচ সীকারোক্তিতে, ক্রীতিকের মাঝে বছরের পর বছর ধরে জ্বলতে থাকা আ'গুনের হলকার মাঝ দিয়ে, হুট করেই যেন ঠান্ডা জলের শীতল স্রোত বয়ে গেলো। অবশেষে ক্রীতিকের

মতো করে অরুও আসক্তিতে পরেছে, এই আসক্তি যে বড্ড বেসামাল আর য'ন্ত্রণাদায়ক ক্রীতিক তা হাড়েহাড়ে জানে, এবার শুধু অরুর পালা।
অরু এখনো জাপ্টে ধরে আছে ওকে, অরুর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন ক্রীতিককে ভেতর থেকে উন্মাদ করে দিচ্ছে, ও তৎক্ষনাৎ অরুকে কোলে তুলে নেয়, অরুর দুপা আটকে আছে ক্রীতিকের কোমড়ের দুপাশে, ওকে কোলে তুলে নিয়ে ক্রীতিক হাস্কিস্বরে বললো,— একবার তুমি করে ডাক।
অরু ডাকলো না। ক্রীতিক আর অপেক্ষাও করলো না,কোলে নিয়েই ভালোবাসার পরশ এঁকে দিতে লাগলে ওর নরম ঠোঁটের মধ্যিখানে। অতঃপর সেভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো ক্যাম্পিং ভ্যানের দিকে।কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত ভেতরে প্রবেশের আগেই ক্রীতিকের ফোনটা আপন সুরে বেজে উঠলো, ফোন বেজে ওঠায়, এতোক্ষণ ধরে একটু একটু করে তৈরি হওয়া অনুভূতির জোয়ারে হুট করেই কেমন ভাটি পরে গেলো। ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরুকে ক্যাম্পিং ভ্যানে বসিয়ে দিয়ে বললো,— এখানেই ওয়েট কর আমি ফোনটা পিক করে আসছি, আজ রাতে এমনিতেও ঘুম নেই তোর।
অরুকে রেখে ক্রীতিক চলে গেলে, নিজ মনের অযাচিত ভাবনায় লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় অরু,শুষ্ক একটা ঢোক গিলে, মুখ লুকায় নিজের দু-হাতে।বন্ধুর আকাশ ছুঁই ছুঁই পর্বতমালার নিম্নভাগে জোছনা রাতের রুপোলী ঝকঝকে আলো এসে পৌঁছাতে পারেনা কোনোকালেই। সেথায় এখনো ঘোর আমাবস্যা বিরাজমান। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর তমসাচ্ছন্ন,শুধুমাত্র পাহাড়ের

এককোণে গুহার মধ্যে যে গুপ্তঘরটা রয়েছে, সেখান থেকেই জেনারেটর চালিত বৈদ্যুতিক বাল্বের নিয়ন আলোর ছটা এসে ঠেকছে নরম সবুজ কচি ঘাসের উপর। অতীব সুন্দর সেই ম্যাজিকাল আলোছায়া আর ঘাসের আস্তরকে পায়ে মাড়িয়ে তরিৎ বেগে এদিক ওদিক পায়চারি করছে নিখিল। কপালে তার দুশ্চিন্তার গভীর ভাজ, শরীর ঘামে ভিজে চুপচুপা, শার্টের উপর পরা সফেদ রঙা এ্যাপ্রোনটার এথায় সেথায় শুকিয়ে যাওয়া র'ক্তের ছোপ ছোপ দাগ। কুঁচকে রাখা ছোট ছোট চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে, একটু আগেই কোনো অপকর্ম করে ধরা খেয়েছে সে। এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতেই দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে একমনে কি যেন বিরবির করছে একনাগাড়ে ।দেখলে মনে হবে কোনো কিছুর হিসেবে কষছে।

নিখিলের এমন উদভ্রান্তের মতো কর্মকান্ড দেখতে পেয়ে গুপ্তঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে লিও। এক ছুটে বেরিয়ে আসাতে তার স্থুলকায় দেহটা হাঁপিয়ে ওঠে, সে নিখিলের সামনে দাড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শুধায়,

—- কি হয়েছে, এখনো কাজ শুরু করছো না যে? রাত শেষ হয়ে যাবে তো।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ফট করে দু'হাতে লিওর কলার খা'মচে ধরলো নিখিল, অতঃপর চোয়াল শক্ত করে দাঁত খিচিয়ে বললো,— তোমাকে আগেই বলেছিলাম এই কয়জনে হবেনা, সবকিছুর একটা পরিমাণ রয়েছে, পরিমাণের বাইরে ওদের শরীর থেকে অতিরিক্ত হরমোন বের করলে সবগুলো মা'রা পরবে। তখন ধনকুব হওয়ার বদলে জেলে পঁচে ম'রতে হবে আমাদের।

নিখিলের কথায় লিও শুষ্ক ঢোক গিলে ভয়ার্ত কন্ঠে শুধালো,
— এএখন কি করবো?
নিখিল পুনরায় পায়চারি করতে করতে বিড়বিড়িয়ে বলে,
— জানিনা, রাশিয়ান মাফিয়াদের থেকে এডভান্স ডলার নিয়ে ফেলেছি, যে করেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
লিও মুখ কাচুমাচু করে বললো,
— কিন্তু এই সময় নতুন করে টিনএজ হরমোন কোথায় পাবো?
লিওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের হাটার গতি সহসা থেমে যায়, ও আঙুল উঁচিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলতে থাকা ফেইরী লাইট আর মাঝ আকাশে উড়তে থাকা নিভু নিভু জ্বলন্ত ফানুস গুলো দেখিয়ে লিওকে শুধালো,— ওখানে কি হচ্ছে?
লিও ঠোঁট উল্টে বললো,
— মেইবি কোনো গ্রুপ ক্যাম্পিং এ এসেছে।
নিখিল তৎক্ষনাৎ গটগটিয়ে যায়গা ত্যাগ করে, বড়বড় পা ফেলে উঠতে থাকে পাহাড়ের চূড়ায় ।ওর কান্ডে পেছন থেকে লিও হাঁক ছেড়ে ডেকে উঠে বললো,
— আরে কোথায় যাচ্ছো?
নিখিল যেতে যেতে পেছনে না তাকিয়েই ক্রুর হেসে বললো,
— সব কিছু রেডি করো, আসছি আমি। আজকাল স্টুডেন্টরাও হয়েছে ফাজিল একেকটা, কথা নেই বার্তা নেই যখন তখন কল দিয়ে কনভার্সেশন শুরু করে দেয়, আর থামার নামই নেই। প্রথমে পড়াশোনা দিয়ে শুরু করবে, তারপর সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে ঢুকে যাবে ব্যক্তিগত আলাপে। আমেরিকান মেয়েরা এতো নির্লজ্জ আর বেহায়া কেন কে জানে?

স্টুডেন্টের বাড়তি প্যাচাল প্রথমে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলেও এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে ফোনটাই বন্ধ করে দিয়েছে রগচটা, বদ মেজাজী ক্রীতিক। একেতো চড়ম মূহুর্তে কল দিয়ে মুডের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, তারউপর রাত বিরাতে কল দিয়ে ঢংয়ের আলাপ, অসহ্য। স্টুডেন্টদের কাছে ক্রীতিক বরাবরই চুপচাপ, হুম,হা ছাড়া উত্তর দেওয়া ওর ধাঁচে নেই, তাইতো কথা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর ফোন বন্ধ করে দিয়েছে একদম। এবার হাজারটা কল দিলেও আর ক্রীতিকের নাগাল পাওয়া যাবেনা, সে যতই প্রয়োজনীয় আলাপ হোকনা কেন। কিছুক্ষন নিরিবিলি দাড়িয়ে থেকে, নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝ থেকে একবুক বাতাস ভরে নিয়ে, ক্রীতিক পুনরায় এগিয়ে গেলো ক্যাম্পিং ভ্যানের দিকে। ওদিকে সবাই মহা আনন্দে ফানুস উড়াচ্ছে। ক্রীতিক ভাবলো অরুকেও দেখাতে হবে এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটা, নয়তো এতো দূরে ক্যাম্পিং এ আসার মজাটাই মিস করে যাবে মেয়েটা, তাই ভেতরে না গিয়ে বাইরে থেকেই অরুকে ডেকে উঠল ক্রীতিক,

— অরু বাইরে আয়,যাস্ট লুক সামথিং স্পেশাল ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার। কাম ফাস্ট,অরুউউ?

ভেতর থেকে অরুর কোনোরূপ সারা শব্দ না পেয়ে এবার ক্রীতিক নিজেই ধীর গতিতে ক্যাম্পিং ভ্যানের ভেতরে প্রবেশ করলো। চারিদিকে ফানুসের ছড়াছড়ি। একের পর এক উড়ন্ত ফানুসের টিমটিমে আলোয় পুরো পাহাড়টাকে অপার্থিব সুন্দর লাগছে। ক্যাম্প ফায়ারের পাশেই চাঁদের পাহাড় গান বেজে চলেছে সেই তখন থেকে, পুরোই এডভেঞ্চারাস পরিবেশ। পাহাড়ের এককোনে দাড়িয়ে এলিসা উরন্ত ফানুস গুলোকে সুক্ষ্ম নজর দিয়ে

পরখ করছে। তা দেখে, অর্ণব একটা ফানুস নিয়ে এগিয়ে এসে এলিসাকে উদ্দেশ্য করে বললো,
—-- এলি, ফানুস উড়াবি আয়। এলিসা তৎক্ষনাৎ এগিয়ে এসে হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে অর্ণবের হাতে হাত রাখে। তারপর দুজন মিলে এগিয়ে যায় ফানুসটাকে উন্মুক্ত করে দিতে। ফানুসের মধ্যে জ্বলতে থাকা সোনালী আলোয় এলিসার হাতের হিরে খচিত আংটিটা চকচক করছে করছে খুব। অর্ণব সেটার দিকে একবার পরখ করে ওর চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। এলিসার ধূসর চোখ দুটোতেও জ্বলন্ত ফানুসের নিদারুণ প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। স্থির চোখে মুখে ধামাচাঁপা পরে আছে একরাশ খুশির ঝিলিক। অর্ণব সেই খুশিকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিতে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,
— আই লাভ ইউ এলি। শুধু আজ বা কাল নয় জনম জনমের ভালোবাসা তুই আমার।
অর্ণবের কথার প্রতিউত্তরে এলিসাও লাজুক হেসে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই কোথা থেকে যেন ছুটে এসে এক থা’বায় সায়রের কলার টেনে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে ক্রীতিক বললো,— আমার অরু কই?
সায়র বেচারা বসে পপকর্ন চিবুতে চিবুতে অর্ণব এলিসার সিনেমাটিক প্রেম নিবেদন দেখছিল, হঠাৎ এমন অতর্কিত আ’ক্রমণে তৎক্ষনাৎ পপকর্ন ওর গলাতেই আটকে গেলো। কাশি দিতে দিতে ক্রীতিককে ছাড়ানোর চেষ্টা করে কোনো মতে ফ্যাসফ্যাসিয়ে বললো,

— ছাড় ভাই, আমি সত্যিই জানিনা অরু কই। তোরা দুজন তো হুট করেই একসাথে উধাও হয়ে গেলি। তোরা স্বামী স্ত্রী তোদের প্রাইভেসির ব্যাপার আছে, ওই জন্য আর ডাকিও নি আমরা।
সায়রের কথায় ক্রীতিক নিজেকে সংবরণ করে ওর কলার ছেড়ে দেয়। তখনই ওপাশ থেকে এলিসা আর অর্ণব এগিয়ে এসে শুধালো,
— কি হয়েছে জেকে।
ক্রীতিক থমথমে মুখে এদিক ওদিক হালকা মাথা নাড়িয়ে বললো,
— ডোন্ট নো, অরু কোথাও নেই।
এলিসা উদ্বিগ্ন সুরে বললো,
— কোথাও নেই মানে? ও তো তোর সাথেই ছিল।
ক্রীতিক জিভ দিয়ে শুষ্ক অধর ভিজিয়ে চিন্তিত গলায় বললো,
— হ্যা তখন তো ছিল, আমি নিজেই ওকে ক্যাম্পিং ভ্যানে রেখে একটা ফোন কল রিসিভ করতে একটু দূরে গিয়েছিলাম আর তারপর.....ক্রীতিক নিজের তেঁতো গলার অযথা সীকারোক্তি শেষ না করেই চট করে সায়রকে বললো,
— সায়র, তুইনা এলিসা অর্ণবের সারপ্রাইজ মোমেন্ট ধারণ করার জন্য হিডেন ক্যামেরা সেট করেছিলি?
সায়র হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে,ক্রীতিক পুনরায় বলে,
—- কোথায় কোথায় সেট করেছিলি, সব গুলো বের কর, কুইক।
এবার শুধু সায়র নয়, ওর সাথে সাথে অর্ণবও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো ক্যামেরা গুলো খুঁজে বের করতে। এই মূহুর্তে ক্রীতিকের মাথা ফে'টে যাচ্ছে দু'শ্চিন্তায়। অতিরিক্ত দু'শ্চিন্তার ফলে সুকৌশলী মস্তিষ্কটাও হ্যাং করছে বারংবার। রাতের আধারে এমন অচেনা

অজানা পার্বত্য এলাকায় হঠাৎ করেই কোথায় চলে যেতে পারে মেয়েটা। তাও ক্রীতিককে না জানিয়ে?
কিছুক্ষণ আগেই তো সবকিছু কতোটা মসৃণ হয়ে উঠেছিল ওদের মাঝে। অরু বারবার বলেছিল,— আমি শুধু আপনাকেই চাই। নিজ স্বামীরূপে আপনি ছাড়া অন্য কারও মুখ আমি কল্পনাও করতে পারিনা।
সেসব কথা ভাবলে এখনো ক্রীতিকের হৃদয়টা এক অজানা উষ্ণতায় ছেয়ে যায়। মস্তিষ্ক ঘীরে ধরে কাল্পনিক সুখের ভাবনারা। অথচ এখন এভাবে হুট করে হারিয়ে গিয়ে কেমন দুশ্চিন্তায় পাগ'ল বানিয়ে দিচ্ছে ওকে। এটা কি ঠিক হলো?খানিকক্ষণ আগে কাটানো ভালো সময় গুলোর কথা মনে পরতেই মূহুর্তের মধ্যে আ'গ্নেয়গিরির অ'গ্নি'স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পরলো ক্রীতিকের পুরো মস্তিষ্ক জুড়ে ।ও আর চুপচাপ দাড়িয়ে থাকলো না, ধাপ ধাপ পা ফেলে এগিয়ে গেলো ক্যামেরা গুলোর দিকে। মনিটরের স্ক্রিনে একে একে সবগুলো ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ চেক করা হলে শেষ ক্যামেরাতে এসে চোখ আটকে গেলো ওদের সবার,শুধু চোখ আটকে গেলো বললে ভুল হবে রীতিমতো কাশাকাশি শুরু হয়ে গিয়েছে সবার। ভিডিওতে অরুর সাথে করা ক্রীতিকের একান্ত মূহুর্তের পাগলামি গুলো দেখে এলিসা, অর্ণব, সায়র তিনজনই ক্রীতিকের পানে অবিশ্বাস্য চাহনি নিক্ষেপ করে, একই সুরে বলে ওঠে,
— তোরা একটু আগে এসব করছিলি?
সায়র বড়বড় চোখ করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললো,

— সি, হি ইজ সো ডেস্পারেট, মেয়েটাকে শ্বাস পর্যন্ত নিতে দিচ্ছে না।
সায়রের কথায় এলিসা অর্নব মুখ টিপে হেঁসে দিলো।
ওদের খিল্লি আর মজা মাস্তিকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে ক্রীতিক বললো,
— জাস্ট শাট আপ, টেনশনে আমার মাথা ফে'টে যাচ্ছে, আর তোরা এখানে মজা নিচ্ছিস। তাছাড়া অরু আমার বিয়ে করা বউ, যা খুশি, যেভাবে খুশি,যেখানে খুশি করবো তোদের বাপের কি?
ওদের তর্কবিতর্কের মাঝেই ভিডিওর একটা যায়গাতে অর্নব পজ করে বললো,— গাইস লুক।
তৎক্ষনাৎ ক্রীতিক সচকিত হয়ে এগিয়ে এসে স্ক্রিনে চোখ রাখলো। অর্নবকে সরিয়ে দিয়ে , রিপিট করে ওই একই সিন টুকু বারবার টেনে টেনে দেখছে ক্রীতিক। চার সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এ্যাপ্রোন পরা কেউ একজন এসে অরুর সাথে হেঁসে কুশলাদি বিনিময়ের মতো করে কথা বলছে, অতঃপর অরু তার পেছন পেছন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে।
অর্নব পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁট উল্টে বললো,
— কে হতে পারে এই এ্যাপ্রোন পরা লোকটা?
সায়র সহসা এগিয়ে এসে ভালো করে নজর বুলিয়ে বললো,
— আরে এটাতো নিখিল অরুর ক্রাশ।
— অরুর বাচ্চাআআআ!
অকস্মাৎ ক্রীতিকের গর্জনে কেঁপে উঠলো ওরা সবাই। ক্রীতিক উঠে দাড়িয়ে ভ্যানের সামনে রাখা স্টুলটাকে সজোরে লা'থি মে'রে রাগে থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো,

— ওকে একবার খুঁজে পাই, মে'রে ওর গাল ফা'টিয়ে দেবো আমি, তখন সারাজীবনের মতো ক্রাশ খাওয়া ভুলে যাবে।
অর্ণব এগিয়ে এসে ক্রীতিকের কাঁধে হাত রেখে বললো,— ঠান্ডা মস্তিষ্কে ভাব জেকে, এটাকি আদৌও পসিবল? অরুতো তোর সাথে এসেছিল, একটু আগে তোরা কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছিলি, তাহলে হঠাৎ করে অরু কেন নিখিলের সাথে চলে যাবে? তাও কাউকে কিছু না জানিয়ে?
তাছাড়া অরু এডাল্ট, বিয়ের মর্ম কতটুকু সেটা ও ভালো করেই বোঝে,তাও তোকে না জানিয়ে কেন যাবে? আর সবচেয়ে বড় কথা।
অর্ণব কথা শেষ করার আগেই পাশ থেকে এলিসা গুরুগম্ভীর গলায় বললো,
— নিখিল এখানে কি করছে?
অর্ণব এলিসার দিকে তাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বললো,
— রাইট, এই না হলে আমার সোনা।
অর্ণবের আহ্লাদী কথায় এলিসা দাঁত কিরমিরিয়ে উঠে বললো,
— চুপ করবি তুই? সিরিয়াস কনভার্সেশন চলছে এখানে।
ক্রীতিক ওদের কথায় কান না দিয়ে দ্রুত নিজের মোবাইল বের করে লোকেশন ট্র্যাকারে ঢুকে পরলো।
সায়র শুধালো
—কি খুঁজছিস?
ক্রীতিক কিছু একটা সার্চ করতে করতে বললো,

— কিছুদিন আগে আমি অরুকে মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিলাম, সেটার লোকেশনই আমার ফোনে কানেক্ট করে রেখেছিলাম। যদি কখনো প্রয়োজন হয় সেটা ভেবে।
সায়র দাঁত কটমটিয়ে বললো,— সেটা আগে বলবিনা?
ক্রীতিকের এই মূহুর্তে কোনোকিছু ঠিক নেই, চোখ দুটো ঝাপসা লাগছে অগত্যাই, আঙুলের ভাঁজে ধরে রাখা ফোনটা তিরতিরিয়ে কাঁপছে। ও বারবার নিজের ফোকাস ধরে রাখতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। অনবরত হাতের পিঠ দিয়ে নাকের ডগা মুছছে, কিছুই নেই তবুও মুছছে। এলিসা, অর্ণব, সায়র সবাই ক্রীতিকের অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্থতার কথা জানে, তার উপর অরু মিসিং ক্রীতিক নিশ্চয়ই এখন নিজের মধ্যে নেই। মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগে ক্রীতিকের বারবার ঘাড় ফুটানো আর নাকের ডগা মোছা দেখে এলিসা এগিয়ে শান্ত গলায় শুধালো,
—- কিছু পেলি? কোনো লোকেশন?
ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,
— লাস্ট লোকেশন দেখে তো এই পাহাড়েরই আশেপাশে কোনো একটা যায়গা মনে হচ্ছে।
তৎক্ষনাৎ অর্নব আর সায়র ছুটে এসে ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বললো,— কই দেখি?
মোবাইলের লোকেশনটা ভালো মতো পরখ করে চোখ কপালে উঠে গেলো অর্ণবের,অবিশ্বাসের সুরে ক্রীতিককে শুধালো,
— এটা কি আসলেই অরুর লোকেশন?
ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,
— কেন কি হয়েছে?

অর্ণব শুষ্ক ঢোক গিলে বললো,
— আমার জানা মতে এই গুহাটা পরিত্যক্ত, বহুবছর আগে আমেরিকান একটা রিসার্চ টীম এখানে কিছু অ’বৈধ রিসার্চ চালাতো, ওরা টিনএজ ছেলেমেয়েদের হরমোন সংগ্রহ করে সেটাকে প্রসেস করে মৃ’তদেহের স্নায়ু সচল রাখতে ব্যবহার করতো। ইটস আ হিউজ ডে’ঞ্জার। পরবর্তীতে আমেরিকান গভমেন্টের নজরে এলে, তারা পুরোপুরি নিষেধা’জ্ঞা জারি করে দেয় এই রিসার্চের উপর। এছাড়া ওই টীমের সবাইকে শা’স্তির আওতায় আনা হয়েছিল তখন।
অর্ণবের কথা শেষ হতেই এলিসা চট করে বললো,— অরুও তো টিনএজ? সি ইজ অনলি এইটিন প্লাস।
এলিসার কথাটা পুরোই বি’স্ফোরণের মতো গিয়ে হাম’লে পরলো ক্রীতিকের উদ্বিগ্ন মস্তিষ্কে। ওর সচিকত চোখ দেখে মনে হচ্ছে ও যেন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলেছে। দু-হাতে নিজের লম্বা চুল গুলো সজোরে টেনে ধরে, কিছু একটা ভেবে ক্রীতিক অস্ফুটে বললো,
— নিখিল ইজ আ বায়োলজিকাল সাইন্টিস্ট, ওহ নো! দিস মা*** ফা***বা***। ওকে আমি জ্যা’ন্ত ক’বর দেবো আজ।
ক্রীতিকের চড়ম ক্ষীপ্রতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওরা তিনজন একই সুরে শুধালো,
— কি হয়েছে?
ক্রীতিক আর জবাব দিলোনা মোবাইলের লোকেশনে চোখ বুলাতে বুলাতে অন্ধকারের মাঝেই পাহাড়ি আঁকাবাকা সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো পরিত্যক্ত গুহার দিকে।

পেছনে আলো জালিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে ওর পথ অনুসরণ করে স্ব গতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো আরও তিন জোড়া পা। তারা আর কেউ না,ওর জীবন মর'নের বেস্টফ্রেন্ডস, ওর দুঃসময়ের সাথী অর্ণব, এলিসা আর সায়র। পাহাড়ের ঢালে এসে গুহার মুখোমুখি হতেই থমকে গেলো ওরা। গুহার মুখে পাহারাদারের দাঁড়িয়ে আছে এক বিশালাকৃতির লৌহগেইট। তাতে আবার পাসওয়ার্ড লাগানো। অর্নব এলিসার হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে বললো,

— জান ফ্ল্যাশ ধর আমি এটার ব্যবস্থা করছি।

সায়র পেছন থেকে ভীত স্বরে বলে ওঠে,

— আমার কেমন যেন ভ'য় করছে ভাই, যদি ওরা আমাকেও ধরে নিয়ে রিসার্চ করতে বসিয়ে দেয়।

অর্ণব পাসওয়ার্ডের গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে বললো,

— তুই কি টিনএজ শালা? বয়স ত্রিশ পার হয়ে গেলো এখনো ভীতুর ডিমই রয়ে গেলি।

ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,— তোরা প্লিজ তাড়াতাড়ি কর, দম আটকে আসছে আমার।

— হয়ে গিয়েছে।

পাসওয়ার্ড আনলকড এর পিক পিক আওয়াজ হতেই সবাইকে ঠেলে ভেতরে চলে গেলো ক্রীতিক। ক্রীতিকের পেছন পেছন ওরা তিনজনও ঢুকে পরলো গুপ্তঘরে। ঘরটাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধে চোখমুখ কুঁচকে এলো ওদের সবার। শুধু মাত্র ক্রীতিকেরই কিছুতে কিছু হচ্ছে না। ও হন্তদন্ত হয়ে উদভ্রান্তের মতো চারিদিক হাতরে বেরাচ্ছে। বাইরে থেকে যায়গাটাকে যতটা

অন্ধকার আর ভুতুড়ে লাগছিল, ভেতরে তেমন কিছুই নয়, বাল্বের আলোয় চারিদিক ফকফকে পরিস্কার। রুমের মধ্যে যত্রতত্র বিভিন্ন মেশিন আর ক্যা'মিক্যালের শিশি দিয়ে পরিপূর্ণ। ক্রীতিকের অবশ্য এতোকিছুতে নজর নেই, ও একটা একটা করে পর্দা,সেলফ, মেশিন সবকিছু তচনচ করে অরুকে খুঁজছে। খুঁজতে খুজঁতে ভেতরের রুমে ঢুকতেই সেই উৎকট গন্ধটা যেন দিগুণ বেড়ে গেলো এবার।মনে হচ্ছে এখনই গলা দিয়ে খাবার উগড়ে আসবে। ক্রীতিক কোনো কিছুকে তোয়াক্কা না করেই সামনে এগিয়ে যায়। ভেতরের দিকে এগিয়ে গিয়ে চারিদিকে চোখ বুলাতেই দেখতে পায় কিছু কাচের তৈরি কফিন, যেগুলো স্বচ্ছ পানি দিয়ে ভর্তি, তারমধ্যেই ভাসছে অল্পবয়স্কা মেয়েদের দেহগুলো। একেকটা কফিনে একেকটা মেয়ে। পানির মধ্যে ভাসমান মেয়েগুলোকে দেখতে কি ভ'য়ানকই লাগছে।—আচ্ছা এদের মধ্যে অরু নেইতো?
প্রশ্নটা মাথায় আসতেই ক্রীতিক হকচকিয়ে ছুটে এসে প্রত্যেকটা কফিন চেক করতে শুরু করলো। কিন্তু না একটাতেও অরু নেই। স্বচ্ছ কাচের কফিন গুলো চেক করতে করতেই ওর কানে ভেসে এলো অস্পষ্ট এক গোঙানির আওয়াজ, হঠাৎ রিনরিনে আওয়াজে ক্রীতিক সচকিত হলো, ভাবতে থাকলো কোন দিক থেকে আসছে শব্দটা।রুমের মাঝ বরাবর টানানো পর্দার ওপাশ থেকেই আসছে বোধহয় আওয়াজটা। ক্রীতিক দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই অজানা আত'ঙ্ক আর মা'ত্রাতিরিক্ত উ'দ্বেগে কয়েক মূহুর্তের জন্য মস্তিষ্কটা হ্যাং করলো ওর, আবারও মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো পুরোদস্তুর । চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা লাগছে, বারকয়েক চোখের পাতা ফেলে, দৃশ্যপট স্পষ্ট করে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পুনরায়

এগিয়ে গিয়ে একটানে পর্দাটা সরিয়ে ফেললো ক্রীতিক,সঙ্গে সঙ্গে পুরো দুনিয়া দুলে উঠলো ওর।
ক্রীতিকের থেকে কয়েক মিটার দূরত্বে পানি ভর্তি কাঁচের কফিনের উপর হাত পা, মুখ বে’ধে শুয়িয়ে রাখা হয়েছে অরুকে। কপালের দুপাশে লাগিয়ে রাখা হয়েছে কি সব যন্ত্রপাতি। কানের পাশে একটু খানি কা’টা দাগ। হাঁটু সমান লম্বাচুল গুলো কফিন ছাড়িয়ে মেঝেতে পরে আছে। চোখের সামনে নিজের হৃৎস্পন্দনের এমন বি’দ্ধস্ত রূপ দেখে বারবার যেন দুনিয়া দুলে উঠছে ক্রীতিকের। মুখের মাঝে কোনো তরল অবশিষ্ট নেই গলা ভেজানোর জন্য,
এ্যাংসাইটি,ডিপ্রেশন, ওভার থিংকিং আর তীব্র ক্রো’ধ তিনে মিলে ক্রীতিকের গলা চেপে ধরেছে, সেই সাথে বাকশক্তি ও রোধ করে রেখেছে অজানা এক শক্তিবল। তবুও বহু চেষ্টার ফলস্বরূপ অস্পষ্ট সুরে ঠোঁট কাঁপিয়ে ক্রীতিক ডাকলো,— হার্টবিট।
ক্রীতিকের কন্ঠস্বর শোনা মাত্রই, সেদিকে তাকিয়ে মুখ বাঁ’ধা অবস্থাতেই খু’নখুনিয়ে কেঁদে উঠলো অরু। তীব্র কান্নার জোয়ারে কেঁপে উঠলো ওর পুরো শরীর। সবচেয়ে কাছের মানুষের আগমনে নির্বাক কাতরতা, আর অভিমানী কান্নায় চোখের কার্নিশ ভিজে উঠেছে মেয়েটার। ক্রীতিক স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর চোখের ভাষা, যেখানে অরু বারবার ফুঁপিয়ে উঠে আকুতির সুরে বলছে,
— তুমি আসবে আমি জানতাম। কিন্তু এতো দেরি করে কেনো এলে? আমার বুঝি কষ্ট হয়নি?
অরুর চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে নির্বাক ধ্বনিতে ক্রীতিকও একই সুরে জবাব দিল।
— আ’ম সরি হার্টবিট। আ’ম রিয়েলি সরি, খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।

ওদিকে অরুর হঠাৎ বেড়ে যাওয়া কান্নার রোল শুনতে পেয়ে রিসার্চ রুম থেকে বেরিয়ে এসে অকস্মাৎ ওদের সবাইকে দেখে পিলে চমকে গেলো নিখিলের। একসাথে এভাবে এতো জনকে দেখে নিখিলের হা'র্টএ্যা'টার্ক হওয়ার উপক্রম। ও এখন সবার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত ঢোক গিলছে শুধু। মনেমনে খুজছে পালানোর পন্থা। নতুন করে কারোও পদচারনা টের পেয়ে, ক্রীতিক পেছনে ঘুরতেই নিখিলকে দেখতে পায়, ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দমে যাওয়া ক্রো'ধটা দিগুন হারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো ক্রীতিকের। কপালের রগ গুলো ফুলে উঠে, চোখের সাদা অংশ র'ক্তিম হয়ে উঠলো আপনাআপনি। তীক্ষ্ণ ব্লে'ডের মতো ধারা'লো চোয়ালটায় গাম্ভীর্য টেনে ক্রীতিক তে'ড়ে এসে ওর কলার চেপে ধরে চোখমুখ খিঁচে উইথ আউট ওয়া'র্নিং একেরপর আ'ঘাত করতে থাকে নিখিলের নাক বরাবর। সেই সাথে অ'স্রাব্য গা'লি তো আছেই। ক্রীতিকের এই ভয়'ঙ্কর দানবীয় রূপটা সবাই দেখতে পায়না, হুটহাট বেরিয়েও আসে না, তবে যদি একবার বেরোয় তো সেটা জ্বলন্ত অ'ঙ্গারের মতোই বিভৎ'স আর নি'কৃষ্ট।
—- শু**** বাচ্চা তোকে আজ এই পরিত্যক্ত গুহার মধ্যেই জ্যন্ত কবর দেবো আমি, আর নয়তো আমার নাম জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী নয়।
ক্রীতিক কি উত্তেজিত? মোটেই না, সবসময়ের মতোই বাচনভঙ্গিমা এখনো মসৃণ ওর, তবে গলার স্বরে ভয়ানক ক্ষী'প্রতা স্পষ্ট। ক্রীতিকের করা প্রত্যেকটা আ'ঘাত একেবারে চোখে মুখে এসে হা'মলে পরছে নিখিলের। ও দম নেওয়ার ফুরসত টুকুও পাচ্ছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ মা'র খেলে নিজের জীবন এখানেই খোয়াতে

হবে,ব্যাপারটা বুঝতে পেরে,তৎক্ষনাৎ নিজের সর্বশেষ চালটা চাললো নিখিল, কোনো মতে হাতরে বেরিয়ে, হাতের কাছে থাকা সুইচবোর্ডটায় প্রেস করে অন্যদের মতো অরুকেও ফেলে দিলো ক্যা'মিক্যাল মিশ্রিত পানি ভর্তি কফিনের মধ্যে।
সঙ্গে সঙ্গে পানির মধ্যে পরে গিয়ে তীব্র ছটফটানি শুরু করে দিলো অরু। অকস্মাৎ এহেন কান্ডে পেছনে ঘুরে অরুকে ছটফট করতে দেখে নিখিলকে ছু'ড়ে মে'রে, অরুর নিকট ছুটে গেলো ক্রীতিক। তখনও বদ্ধ কফিনে গলা কাঁ'টা মু'রগীর মতোই ছটফট করছে অরু। পুরো কফিন জুড়ে মোটা স্বচ্ছ কাচের আস্তর কোথাও কোনো খোলার যায়গা নেই, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কফিনের সামনে হাটু গেড়ে বসে, কাচের আস্তরটাকে ভা'ঙার উদ্দেশ্যে কফিনের উপরই নিজের সর্ব শক্তি দিয়ে এলোপাথাড়ি পাঞ্চ বসাতে লাগলো ক্রীতিক। ওদিকে সময়ের ব্যবধানে অরু ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।
ক্রীতিক সেদিকে নজর দিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বললো,— হোল্ড অন,ওয়ান মিনিট, যাস্ট ওয়ান মিনিট বেইবি। প্লিজ হোল্ড অন, আমি এটাকে এক্ষুনি ভে'ঙে গুড়িয়ে ফেলবো।
এভাবে ক্রমাগত পাঞ্চ করতে করতে ওর হাত থেঁ'তলে গিয়ে কখন যে পুরো কফিন র'ক্তাক্ত হয়ে উঠেছে তার হদিস নেই ক্রীতিকের, ওর দৃষ্টিতো কেবল স্থির হয়ে আছে অরুর নিভু নিভু চোখ দুটোর পানে। একনাগারে পাঞ্চ করতে করতে হাতের অবস্থা বেগতিক,তবুও এক সেকেন্ডের জন্যও থামেনি ক্রীতিক। যতক্ষণ না র'ক্তাক্ত কাচের আস্তরে ফা'টল ধরে চৌচির হয়েছে, ঠিক ততক্ষণ একই উদ্যমে অনবরত কাচের কফিনে আ'ঘাত করেছে সে।

অন্যদিকে অরুর জন্য ক্রীতিকের এমন উন্মাদনায় আবিষ্ট বেপরোয়া ভয়ং'কর রূপ দেখে, ভ'য়ে জর্জরিত হয়ে নিজের আহত শরীরটাকে টেনেটুনে নিয়েই সুযোগ বুঝে কেটে পরলো নিখিল, ওর আফ্রিকান বন্ধু লিও পালিয়েছে বহুক্ষণ আগেই। তবে মনে হয়না এই শরীর নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে নিখিল। কারন ওর পিছু নিয়েছে এ্যাথলেটিক টম বয় খ্যাত গার্ল এলিসা ক্রিস্টিয়ান। অবশেষে জায়ান ক্রীতিকের মতো বেপরোয়া,জিদি,রগচটা মানুষের কাছে হার মেনে নিয়েছে কাঁচের তৈরি কফিনটা। কফিনটাকে ভে'ঙে চৌচির করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে ক্রীতিক। কফিন ভে'ঙে যেতেই অরুকে টেনে বের করে ওর হাত পা মুখের বাঁ'ধন খুলে বারবার সিপিআর দিতে থাকে ক্রীতিক।
একনাগাড়ে সিপিআর দিতে দিতে একপর্যায়ে এসে অরু লম্বা করে দম নেয়। অরুর শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেয়েই, নিশ্বাসের শব্দ ক্ষীন হয়ে এলো ক্রীতিকের নিজেরও, তৎক্ষনাৎ অরুর মাথাটা কাছে টেনে এনে ওর ঠান্ডা ফ্যাকাশে ঠোঁটে অনবরত চুমু খেতে থাকে ক্রীতিক। নিঃশব্দে নির্লিপ্তে.....তবে অরুর শরীরটা এখনো নেতিয়ে রয়েছে, চোখ মুখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে আছে ,দেখে মনে হচ্ছে শরীরে একরত্তিও শক্তি অবশিষ্ট নেই। শুধু আলতো করে চোখের পলক ফেলছে মাত্র। অরুর হালকাপাতলা নড়নচড়ন দেখে ক্রীতিক বুক ভরে সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে ওকে কোলে তুলে দাঁড়িয়ে পরলো, সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো ওর। অরুকে কোলে নিয়েই বারবার হাতের পেছন দিয়ে ডাকের ডগা ঘষছে ক্রীতিক। চোখের সামনে স্থীর দাঁড়িয়ে থাকা অর্ণব আর সায়র কে কেমন ঝাপসা লাগছে দেখতে, বারবার চোখের পলক ফেলেও সেই

দৃষ্টি স্পষ্ট হচ্ছেনা মোটেই। তবুও অরুকে কোলে নিয়েই সামনে পা বাড়ালো ক্রীতিক। সামনে এগোতে এগোতে ক্রীতিক দেখলো, সায়র আর অর্ণব উদ্বিগ্ন নজরে ওর দিকে হা করে তাকিয়ে আছে, ওদেরকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ক্রীতিক নাক টেনে বললো,— কি হয়েছে? এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?

— তোর নোজ ব্লে'ডিং হচ্ছে জেকে!

সায়রের কথায় ক্রীতিক এবার হাতের পিঠ দিয়ে নাকে ঘষা দিয়ে চোখের সামনে এনে দেখলো, ওর নাক থেকে ফি'নকি দিয়ে র'ক্ত গড়িয়ে পরছে।

ক্রীতিক হাতের পিঠ দিয়ে র'ক্তটুকু পরিষ্কার করতে করতে বললো,

— ইটস ফর এ্যাংসাইটি। কিচ্ছু হবে না চল।

কথাটা বলে দুকদম এগোতেই হাঁটু গেড়ে ধপ করে মেঝেতে বসে পরলো ক্রীতিক। ওর কোলে এখনো অরুর নেতিয়ে পরা ছোট্ট শরীরটা। নিজে বসে পরলেও অরুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে বুকের মধ্যে।এবার সত্যিই সামনের সবকিছু পুরোপুরি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। অসার হয়ে আসছে শরীরের মাংসপেশি গুলোও,

ক্রীতিকের নোজ ব্লে'ডিংএর ঘটনা নতুন কিছু নয়, প্রথম প্রথম আমেরিকায় আসার পরে অতিরিক্ত অব'সাদগ্রস্থতা, আর দু'শ্চিন্তার ফলে প্রায়ই এমনটা হতো। ডাক্তার বলেছিল মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু গত কয়েকবছর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ফলস্বরূপ এটা পুরোপুরি বন্ধ ছিল, অথচ আজ অরুর একটুখানি বিপ'দে, এতো বছর ধরে একটু একটু করে উন্নতি করা ক্রীতিকের মানসিক স্বাস্থ্যে ধস নেমে এলো মূহুর্তেই। তাহলে ক্রীতিক আদতে কতোটা ডেস্পারেট ওর এইটুকুনি হাটুর বয়সী সৎ বোনের জন্য? এ

কেমন প্রেম আর কেমন আসক্তি? সেটাই আপাতত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে অর্ণব আর সায়র। ক্রীতিক হাঁটু গেড়ে বসে নাক থেকে গড়িয়ে পরা র'ক্তগুলো হুডির হাতায় মুছতে মুছতে অস্পষ্ট সুরে বললো,

— অর্ণব, আমি বোধহয় সে'ন্স লেস হয়ে পরবো। তুই অরুকে কোলে নে। প্রাইমারী ট্রিটমেন্ট দিয়ে ওকে সেইফলি বাসায় পৌঁছে দিবি, আর সায়র তুই ভুলেও অরুকে টাচ করবি না। জ্ঞান ফিরে আমি যদি শুনেছি তুই অরুকে টাচ করেছিস, তাহলে তুই আর এ জীবনে বাচ্চার বাপ হতে পারবি না, সেই ব্যবস্থা আমি নিজ হাতে করবো।

সায়র একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

— টাচ করবো না তোর অরুকে, কিন্তু এটলিস্ট তোকে তো ধরতে দে। পরে যাচ্ছিস তুই।

ক্রীতিক সে কথা আদৌও শুনেছে কি শোনেনি কে জানে?

পাহাড়ের নিরিবিলি পরিবেশ আর নিরিবিলি নেই। সকাল সকালই শান্ত,প্রানজুড়ানো,নিরিবিলি পরিবেশ ধারণ করেছে বিধ্বং'সীরুপ। প্রচন্ত বাতাসের তান্ডব আর বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে চারিপাশ, সেই সাথে গাছপালা ভে'ঙে পরার মরমর আওয়াজ তো আছেই। তবে নির্জন পাহাড়ি এলাকা ছাড়িয়ে গাড়ি করে শহরের দিকে এগিয়ে আসতেই বাতাস, বর্ষন দুটোই উধাও, যদিও পাহাড়ী ঝড়ের তান্ডবে চারিদিকের পরিবেশ গুমোট হয়ে আছে, সেই সাথে ভ্যাপসা গরমটাও বেড়েছে আজ। অতিরিক্ত ভ্যাপসা গরমে অরু হাসফাস করছে দেখে অর্ণব সহসা বাটন প্রেস করে গাড়ির টিন্ডেট জানালার কাঁচটা নামিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে

নিদারুন মেঘ ভেজা বাতাস এসে আঁচড়ে পরলো অরুর চোখেমুখে। এবার সত্যিই একটু শান্তি লাগছে। ঠান্ডা বাতাসে একটা বড়সড় নিঃশ্বাস ছেড়ে অর্ণবকে উদ্দেশ্য করে অরু বলে,—-
ধন্যবাদ।
অর্ণব অরুর কথায় নিঃশব্দে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে,অরু পুনরায় শুধালো,
— উনি এখন কেমন আছেন?
অর্ণব স্টিয়ারিংএ দক্ষ হাত চালাতে চালাতে বললো,
— জ্ঞান ফেরেনি এখনো, জ্ঞান ফিরলে সুস্থ হয়ে যাবে, ইটস নট আ বিগ ডিল, দুশ্চিন্তা করোনা।
অর্ণবের কথায় অরু আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড়িয়ে বললো,
— নিজের প্রতি এতো কেয়ারলেস কেন উনি?
অরুর আনমনে বলা কথাটা বোধহয় অর্ণব শুনেছে, তাই ও সামনে তাকিয়েই বললো,
— নিজের প্রতি কেয়ারলেস হতে পারে, তোমার প্রতি নয়।
অর্ণবের কথায় অরু সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ওর পানে, পরবর্তীতে কথার পাছে কিছু বলতে যাবে তার আগেই অর্ণব বললো,
— এসে গিয়েছি। চলে আসার দরুন,অরুর আর কথা বাড়ানো হলোনা,তাই চুপচাপ নেমে গেলো গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে নেমে অর্ণব কে বিদায় জানিয়ে অপটু পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো ভবনের লিফটের দুয়ারে।
শরীরে প্রচন্ড জ্বর আর মাথাব্যাথা। হাত পা গুলো শক্তিহীন অসার হয়ে আছে। সুন্দর লম্বা চুলগুলো জটলা পাকিয়ে কোনোমতে পিঠে

পরে আছে, সুন্দর মাখনের মতো মসৃন মুখটা ফ্যাকাশে বর্ণ ধারন করেছে , চোখদুটো ঢুকে আছে কোটরে। শরীরের এহেন অবস্থা নিয়েই লিফট থেকে বেরিয়ে, এগিয়ে এসে এ্যাপার্টমেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে কলিংবেল চাপলো অরু।
তবে কলিংবেল চাপার সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা আর তার পেছন পেছন আজমেরী শেখের নতুন এসিস্ট্যান্ট রাজ। হুট করেই নিজের বাসা থেকে অপরিচিত কাউকে বেরোতে দেখে অরু খানিকটা অপ্রস্তত হয়ে পরলো, কারন ওর মাথা থেকে পা অবধি সবকিছু এলোমেলো আর অগোছালো । হুট করে কেউ প্রথম দেখে পাগল বলে সম্মোধন করলেও ভুল কিছু হবেনা বৈকি। কিন্তু অরুকে একটা বিশাল ঝটকা দিয়ে, ওর অযাচিত চিন্তায় একবালতি জল ঢেলে মহিলাটি অরুর চিবুকে আদুরে হাত ছুয়িয়ে বললো,— মাস আল্লাহ।
বয়স্ক মহিলার এহেন কথায় চোয়ালঝুলে পরলো অরুর। মনেমনে ভাবলো,
— আমি কি ঠিক শুনলাম? নাকি জ্বরের ঘোরে আসতাগফিরুল্লাহ কে মাসআল্লাহ শুনলাম?
অরু যখন বাইরে দাড়িয়ে একমনে হিজিবিজি ভাবছিল, তখনই মহিলা দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন, নিজে নিজেই আগ বাড়িয়ে বললেন,
— আসি তাহলে মা? আগামী রোববার দেখা হবে।
মহিলার কথার আগামাথা বুঝতে না পেরে অগত্যাই জোরপূর্বক হেসে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো অরু। অরুর সম্মতি পেয়ে মহিলাটি চলে গেলে পেছন থেকে রাজ এসে হিসিয়ে উঠে বললো,
— একি অবস্থা তোমার? একটু পরিপাটি হয়ে চলা যায়না?

এমনিতেই অরুর মানসিক অবস্থা বিদ্ধ’স্ত, তারউপর রাজের এমন অধিকার দেখিয়ে কথা বলা, ব্যাপারটা মোটেই সহ্য হলোনা অরুর, মাথার মধ্যে অযাচিত রাগটা হুট করেই কুন্ডলী পাকিয়ে উঠলো কেন যেন। মূহুর্তেই মেজাজ হারালো অরু, রাজের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচে বললো,— আমি কিভাবে চলবো না চলবো সেটাও আপনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন? কে হই আপনার? দেখুন রাজ, অযথা গায়ে পরা স্বভাব আমার একদম পছন্দ নয়। ছেলেমানুষের এতো গদোগদো ভাব মানায় না, এটলিস্ট আমার চোখে তো বি’চ্ছিরি লাগে।
অরুর কাঠকাঠ কথাগুলো বোধ হয় রাজের গা থেকে পিছলে চলে গেলো, ও অরুর দিকে তাকিয়ে মারাত্মক হেঁসে বললো,
— কেমন ছেলে পছন্দ তোমার? আমিকি হতে পারিনা তেমনটা?
— না পারেন না, তার নখের যোগ্যতাও আপনার নেই,এটলিস্ট পুরুষ মানুষ হিসেবে তো নেই।
অরুর ছু’রির ফলার মতো ধা’রালো কথা শেষ হলে রাজ পুনরায় কিছু বলতে যাবে তার আগেই ভেতর থেকে ছুটে আসে অনু। এগিয়ে আসতে আসতে উদ্বিগ্ন সুরে বলে,
— কি ব্যাপার কার সাথে তর্ক করছিস বাইরে দাড়িয়ে? মা শুনতে পাচ্ছে তো।
অনু চলে আসাতে অরু ভেতরে যেতে যেতে রাজকে উদ্দেশ্য করে বললো,— রিডিকিউলাস।
রাগে ফোঁসফাস করতে করতে সদর দরজা ঠেলে অরু ভেতরের রুমে দু’কদম দিয়েছে কি দেয়নি তার আগেই গম্ভীর গলায় ডেকে উঠলেন আজমেরী শেখ।

— অরু দাঁড়াও।
অরু ভ’য়ে তটস্থ হয়ে আছে বহুক্ষণ আগে থেকেই। তবে এই মূহুর্তে মেজাজটাও বিগড়ে আছে ওর, তাই কোনোরূপ হাপিত্যেশ না করেই পেছনে ঘুরে মায়ের দিকে চাইলো ও। আজমেরী শেখ মোটা থানের ছাই রঙা শাড়ী আর কালো রঙের চুড়িহাতা ব্লাউজ পড়ে আছেন। চোখে তার মোটা ফ্রেমের চশমা। শাড়ীর প্রত্যেকটা ভাঁজ অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে সেট করা, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো টিভিসেটের সংবাদ পাঠিকা।
অরুর চোখে অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, আজকাল মা প্রায়ই এভাবে পরিপাটি হয়ে অফিসে যান। নিজের মরচে পরা আধিপত্যতে একটু খানি ঝালাই করে দিতে।
সাইড ব্যাগটাকে শক্ত হাতে চেপে ধরে মাথা নিচু করে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে অরু,আজমেরী শেখ ওর আগাগোড়া পরখ করে স্পষ্ট আওয়াজে শুধালেন,— কোন ছেলের সাথে গিয়েছিলে?
মায়ের কথায় অরুর পিলে চমকে উঠলো,নিজের সুপ্ত ভ’য়টাকে দূরে সরিয়ে মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে গলায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অরু বললো,
— কি বলছো মা? ককোন ছেলের সাথে আবার যাবো? আমি কাউকে চিনি নাকি এখানে?
আজমেরী শেখ অরুর দিকে নিখুঁত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন,
— এক বছর অসুস্থ ছিলাম আমি,মা’রা যায়নি, তাতেই মিথ্যে কথা শিখে গেলে?
অরুর না সূচক মাথা নাড়িয়ে বলে ওঠে,— মা বিশ্বাস করো…
আজমেরী শেখ ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন,

—-- রাজ খোঁজ নিয়েছে, তোমাদের ক্লাস থেকে কোনো গ্রুপ ক্যাম্পিং এ যায়নি, তাহলে গত চব্বিশ কোথায় ছিলে তুমি?
এখানেও রাজ, বিরক্ত লাগছে অরুর তবুও মাথা নিচু করে গলা খাদে নামিয়ে অরু বললো,
— আসলে মা, আমি অন্য গ্রুপ...
— থাক।
আজমেরী শেখ এবারও সহসা থামিয়ে দিলেন অরুকে। অতঃপর বললেন,— আমি আর মিথ্যে অজুহাত শুনতে চাইছি না অরু, আর না আমার এসব চেঁচামেচি কৈফিয়ত দেওয়া নেওয়া পছন্দ। আমি শুধু সময়ের কাজ সময়ে করতে পছন্দ করি।
মায়ের রহস্যেঘেরা কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছে না অরু। তবে ওর মা যে একশো তে একশো পাক্কা খিলাড়ী সেটা অরু ভালো করেই জানে। কখন কোন চালে আটকে ফেলবে সেটা অরুর কল্পনাতীতই থেকে যাবে। এবারও তাই হলো।আজমেরী শেখ হঠাৎ করে অরুর সামনেই অনুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন,
— এখন এই মূহুর্তে অরুর পুরো ঘর তল্লাশি করে ওর কাছ থেকে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস গুলো নিয়ে নাও। আর হ্যা আজ থেকে অরুর সাথে সর্বক্ষন থাকবে তুমি। আমি যদি ঘুনাক্ষরেও শুনেছি বোনের প্রতি দরদ দেখিয়ে আমাকে বোকা বানাচ্ছো তাহলে তোমার ব্যাবস্থাও আমি করবো। নাও সার্চ হার।
মায়ের কথায় অরু ফুপিয়ে কেঁদে উঠে অ◌াহত সুরে বললো,— মা, কি বলছো?
অনু একটু সাহস করে মাকে বললো,
— মা, মাত্রই তো এলো একটু ফ্রেস হয়ে নিক, তারপর না হয়...

আজমেরী শেখ থমথমে গলায় বললেন,
— ফ্রেস হওয়ার অনেক সময় রয়েছে, আগে ওকে সার্চ করো।
মায়ের কঠোর আদেশ, অনুর আর কিছু করার ছিলোনা অগত্যাই অরুর ব্যাগ হাতরে আইফোন ফিফটিন প্রো-ম্যাক্স মোবাইলটা নিয়ে নিলো অনু। যদিও মোবাইলটা বন্ধ ছিল। তবুও অনুরও এবার ভেতরে ভেতরে সন্দেহের দানা প্রখর হয়, মনেমনে ভাবে,— হুট করে এতো দামি ফোন কোথায় পেলো অরু? তাহলে কি মা'ই ঠিক? অরু খারাপ কোনো পথে পা বাড়িয়েছে?
ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে অরু ব্যাগটাকে ফ্লোরেই ছু'ড়ে মে'রে হনহনিয়ে রুমে চলে যায়।অরু চড়ম কষ্ট পেয়েছে ভেবে, অনু মায়ের দিকে তাকিয়ে অসহায় মুখ করে বললো,
— মা অরুতো ছোট ভুল করতেই পারে, তাই বলে এতোটা কঠোর হওয়া কি ঠিক হবে?
অনুর কথায় আজমেরী শেখ বললেন,
—আপাতত যেটা বলেছি সেটা করো। সময় হলে সব কিছু আমি নিজেই আবার আগের মতো করে দেবো। কিন্তু এখন নয়।সারাদিন রুম আটকে ম'রার মতো পরে থাকলেও সন্ধ্যা হতে না হতেই অরুর একা থাকার শখ ঘুচিয়ে দিয়ে রুমে প্রবেশ করে অনু। অনুর অবশ্য কিছু করার নেই মায়ের আদেশ আসতেই হতো। অনু আসতেই অরু মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে পরলো। অনুর হাতে খাবারের থালা। ও সেটাকে বেডসাইড টেবিলে রেখে দিয়ে নরম গলায় বললো ,
— অরু খাবার এনেছি, খাবি আয়।
অরু নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দিল,

— খিদে নেই, নিয়ে যা।
— সারাদিন না খেয়ে, রুম আটকে পরে আছিস, তাও খিদে নেই? কি হয়েছে বলতো তোর?
অনুর কথায় অরু শক্ত গলায় বললো,
— না নেই, আর কি হয়েছে, কি হয়েছে, এই প্রশ্নটা করা বন্ধ কর আপা। কি হবে আমার?
অনুও এবার ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
— কিছু না হলে, মিথ্যে বলে কোথায় গিয়েছিলি? আর অতো দামি ফোনই বা কোথায় পেলি?
অরু এবার শোয়া থেকে উঠে , অনুর মুখোমুখি হয়ে বসে কন্ঠে দৃঢ়তা নিয়ে বললো,
— তোর কি মনে হয় আমি খারাপ মেয়ে?
অরুর কথার পাছে অনু বললো,— এখন আর মনে হওয়া না হওয়া দিয়ে কি যায় আসে? যা করার তাতো মা করে ফেলেছে।
অনুর একটু কথার আঁচে অরুর হৃদয় কামড়ে উঠলো, ওর পরনে এখনো ক্রীতিকের কিনে দেওয়া সিল্কের পাজামা সেট। মাথার চুলগুলো এলোমেলো ভাবে পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে আটকানো, বুকের মধ্যে অজানা আত'ঙ্কের দল হাতুড়ি পেটা করছে খুব, তবুও একটা শুষ্ক ঢোক গিলে বুকের মাঝে সাহস সঞ্চয় করে অরু শুধালো,
— কি করেছে মা?
অনু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানায়,
— আগামী রোববার রাজ তার পরিবার সমেত তোকে দেখতে আসছে। আজকেই তো ওর মা এসে আমাদের মায়ের সাথে কথা বলে গেলো।

অনুর কথায় অরুর মাথায় যেন আকাশ ভে'ঙে পরলো। দুনিয়া দুলে ওঠার মতোই আচমকা ঘুরে উঠলো মাথাটা। অরু ভেবেছিল মা ওর জন্য কোনো কঠিন শা'স্তির ব্যাবস্থা করেছে, হয়তোবা ভার্সিটিতে যেতে দেবে না, কিংবা নজরবন্দি করে রাখবে সারাক্ষণ , তাই বলে এমন কিছু? অরুর কল্পনার ও বাইরে ছিল এটা। অরু তৎক্ষনাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পরলো। অবিশ্বাসের সুরে অনুকে শুধালো,— কি বলছিস আপা এটা? তুই থাকতে আমি কেন?
অরুর কথায় অনুর মেজাজ চড়ে এলো, ও রুষ্ট কন্ঠে বললো,
— আমি থাকতে মানে? তুই প্রত্যয় সাহেবের কথা জানিস না? তাছাড়া রাজ তোকে পছন্দ করেছে আমাকে নয়।
অনুর কথায় একটা অসহ্য য'ন্ত্রনা ছড়িয়ে পরলো অরুর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অকস্মাৎ ফ্লোরে ধপ করে বসে হুহু করে কান্নায় ভেঙে পরলো অরু, শরীরে ব্যাথা, হৃদয়ে ব্যাথা, মস্তিষ্কে ও একরাশ য'ন্ত্রনা, সবকিছু মিলমিশে অরুর এক করুন অবস্থা এই মূহুর্তে । মেঝেতে বসে কাঁদতে কাঁদতে মনে মনে হাজারবার আহাজারি করতে করতে অরু বললো,— তোকে আমি কি করে বোঝাই আপা, তোর যেমন প্রত্যয় সাহেব আছে, আমারও তো একজন আছে, সে আমার স্বামী, জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। আমি বিবাহিত, আমার শরীর মন সবকিছুর দখলদারী শুধু মাত্র তার। আমি তাকে মেনে নিয়েছি। তার ভালোবাসাকে গ্রহন করেছি। তাহলে কিভাবে আমি অন্য একজন পুরুষের সামনে গিয়ে আইবুড়ো সেজে বসবো? কি করে?
এই কথার একটু খানি আঁচ ও জায়ান ক্রীতিকের কানে গেলে সবকিছু তচনচ করে ফেলবে সে। সেই সাথে আমাকেও কে'টে

টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আমি এখন কি করবো? কিভাবে সবাইকে বলবো যে আমি আমার সৎ ভাই জায়ান ক্রীতিকের বিয়ে করা বউ?

অরু সেই কখন থেকে মেঝেতে বসে শব্দ করে কাঁদছে দেখে অনু আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

— এতো কাঁদছিস কেন অরু? দেখতেই তো আসছে, বিয়ে তো আর হয়ে যাচ্ছে না? ভালোয় ভালোয় সবটা মিটে গেলে তুইও তো বেঁচে যাবি। মা আর তোকে সারাক্ষণ নজরদারিতে রাখবে না।

কথাটা শেষ করে কম্ফোর্টার গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পরলো অনু। অনুর মাত্র বলা কথাগুলো বারবার মস্তিষ্কে বারি খাচ্ছে অরুর।—দেখতেই তো আসছে, বিয়েতো আর হচ্ছে না।

“বিয়ে”শব্দটা অসংখ্যবার প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে এসে লাগছে অরুর,ওর তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে সেবার থাইল্যান্ড বসেই। ধর্মীয়, সামাজিক দুইভাবেই বিয়ে হয়েছে জায়ান ক্রীতিকের সঙ্গে। তাহলে এখন আর নতুন করে কিভাবে বিয়ে হবে? আর তাছাড়া চোখ দুটো বন্ধ করলে স্বামী রুপে ওই সুদর্শন মানবের মুখটা ছাড়া আর কিছুই তো কল্পনায় আসছে না।

মনেমনে হাজার কথা ভাবতে ভাবতেই অরু চলে গেলো টানা বারান্দায়। বাইরে ভারী বর্ষন হচ্ছে। আকাশ বাতাস ছাপিয়ে মেঘ গলিয়ে বৃষ্টি নেমেছে ধরনীতে। বাতাসের তোপে বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে অরুর চোখে মুখে, তবুও সেখানেই হাঁটু মুড়ে বসে পরলো ও।উদাসীন বারীধারার পানে চেয়ে ভাবতে লাগলো নিজের থেকে বয়সে গুনগুনে বারো বছরের বড় সুদর্শন পুরুষটির কথা, যে ওর ব্যক্তিগত পুরুষ। কোনোদিন কি অরু কল্পনা করেছিল ওর সাথে

এমনটা হবে? আমেরিকাতে কেউ ওর জন্য এভাবে দিনের পর দিন অপেক্ষার প্রহর গুনবে? এরকম হুট করেই নিজের নামের পাশে মানুষটার টাইটেল এঁটে যাবে? ভাবেনিতো, কল্পনাতেও ভাবেনি। কিন্তু ভবিতব্য এটাই ছিল।
অরু মেনে নিয়েছে নিজের ডেসটিনি। অবশ্য না মেনে কোথায় যাবে? কি নেই জায়ান ক্রীতিকের? সবচাইতে যেটা বেশি আছে, সেটা অরুর প্রতি এক আকাশসম আসক্তি। মানুষটার পাগলামি, আসক্তি, রাগ, বিরক্তি, একান্ত গোপনীয় চাহিদা সবকিছু অরুকে ঘীরেই। তাহলে অরু কীভাবে ক্রীতিকের মায়ায় না পরে থাকতো? অরুর কাছে ক্রীতিকের মায়ায় জড়ানোর প্রথম ধাপ ছিল ওদের বিয়ে। হয়তোবা বিয়ের পরে উপরওয়ালা প্রদত্ত একধরনের টান তৈরি হয়ে যায় হৃদয়ে, অরুর বারবার মনে হতে থাকে,একটা মাত্রাতিরিক্ত সুদর্শন পুরুষ, আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে হ্যান্ডসাম। লম্বা, চওড়া, গৌড় বর্ণের কথায় কথায় ভ্রু কুঁচকানো লোকটা ওর স্বামী। এই কথাটা দিনের আলোর মতোই সত্যি। অরুর স্পষ্ট মনে আছে বিয়ের পরে সবার জোরাজোরি তে স্বামী রুপি ক্রীতিকের দু-হাতে চুমু খাওয়ার কথা। তখন তো অরুও হৃদ মাঝারে ভীষণ টান অনুভব করেছিল। বিয়ের কথা মাথায় আসতেই অরু চলে গেলো সেদিনের ভাবনায়,যেদিন নিজের সবটুকু ক্রীতিকের নামে লিখে দিয়ে এসেছিল ও। জায়ান ক্রীতিক ওয়েডস অরু। ভাবতে ভাবতেই এক চিলতে হাসি ফোটে অরুর ঠোঁটে। আজকের মতো সেদিন বৃষ্টি ছিলোনা, এশিয়ান দেশ হওয়াতে আমেরিকার মতো কনকনে শীতও ছিল না ব্যাংকক শহরে । তবে আবহাওয়াটা বেশ গুমোট ছিল। অনুর সাথে রাগ করে অরুর করা

চড়ম বোকামির ফলসরুপ ওর উপর বেজায় চটেছিল ক্রীতিক। চোখেমুখে সে কি রাগ তার।যে রাগের কাছে প্রত্যেকবারই হার মেনে যায় অরু। সেবারও মেনেছিল।
সকাল বেলা ওকে আটকে রাখলেও বিকালে এসে কোনোরুপ কথাবার্তা না বলেই টা'নতে টান'তে অরুকে নিয়ে বাইকে বসায় ক্রীতিক। ওদের পেছনে মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে ছিল এলিসা, অর্ণব আর সায়রও। অরু কিছু বুঝে উঠতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে এলিসাকে বললো,— কি ব্যাপার আপু, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন উনি আমায়?
এলিসা অরুকে আস্বস্ত করে ওর কানের পেছনে চুল গুঁজে দিতে দিতে বলে,
— ইটস ওকে, আমরাও আসছি, ভয় পেওনা, ও তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।
এলিসার কথার পাছে অরু আর কিছু বলার সুযোগ পেলোনা, তার আগেই বাইকে টান দেয় ক্রীতিক। অগত্যাই নিজেকে সামলানোর জন্য ক্রীতিকের জ্যাকেট টেনে ধরলো অরু।
ক্রীতিক সামনে ফোকাস করেই অরুকে ডেকে বললো,
— অরু, তুই কি জানিস আজ তোর মায়ের অপা'রেশন?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক পুনরায় বললো,
— তুই কি এটা জানিস আমি ডক্টরকে বলে তোর মায়ের সব ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে রেখেছি।
আমি না বলার আগ পর্যন্ত ওরা তোর মায়ের অ'পারেশনে হাত ও ছোঁয়াবে না।

ক্রীতিকের কথায় অরুর মুখ থেকে যেন র'ক্ত সরে গেলো। ও বাইকে বসেই স্তম্ভিত গলায় বললো,— আপনি কি মজা করছেন?
— তোর কি মনে হয় আমি মজা করার মুডে আছি?
অরু নাক ফুলিয়ে বললো,
— তাহলে এসব কথা কেন বলছেন?
ক্রীতিক একটা পুরাতন গলির মাথায় বাইক থামিয়ে অরুর হাত ধরে বললো,
— বলছি চল।
অরু চারিদিকে তাকালো, দুপাশে পুরাতন ইটের চালার ঘর,তার মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা, ঘর গুলোর মধ্যে বেশির ভাগই থাইল্যান্ডের স্থানীয় মানুষজনের পুরাতন দোকানপাট, ছোটখাটো স্ট্রীট মার্কেট,হকারী আর ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের দোকান দিয়ে ভর্তি গলিটা। সরু রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে অরু খেয়াল করলো আশেপাশের সবাই ওদের দিকে অদ্ভুত নজরে তাকিয়ে আছে। যেমনটা আমরা ভিনদেশীদের দেখলে করি। অরু বড়বড় চোখ করে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করলেও ক্রীতিক সোজা হাটছে। হাটছে তো হাটছেই। ক্রীতিকের পুরুষালী কদমের সাথে পা মিলিয়ে হাটতে হাটতে অরুর পা ব্যথা করছে এখন। গোড়ালি ভে'ঙে মাটিতেই বসে পরতে ইচ্ছে করছে, উপায়ন্তর না পেয়ে অরু শুধালো,— আর কতদূর?
ক্রীতিক ক্রুর হেসে বললো,
— বাবাহ এতো তাড়া?
— কিসের তাড়া? আর আপনি একটু আগে কি বললেন? আমার মায়ের অপা'রেশন বন্ধ কেন করেছেন? কি সমস্যা বলুন?

ক্রীতিক যেতে যেতে বললো,
— সমস্যা তো তুই।
— মানে?
গলির শেষ প্রান্তে একটা পুরাতন মসজিদের সামনে দাড়িয়ে ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— ভেতরে গিয়ে যা করতে বলবো,যেভাবে করতে বলবো, তাই করবি,নয়তো তোর মায়ের অ'পারেশন আর হচ্ছে না।
অরু তৎক্ষনাৎ ক্রীতিকের থেকে নিজের হাতটা ঝটকা মে'রে ছাড়িয়ে বললো,
— মশকরা পেয়েছেন? অপা'রেশন হবেনা মানে? আপনি বলবেন আর অপা'রেশন হবে না এতো সোজা?
ক্রীতিক কপট হেসে অরুর দিকে ঝুঁকে এসে বললো,
— ছোট্ট মানুষ মেমোরি লস হতেই পারে।কোনো সমস্যা নেই, আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, মনে আছে আমার এপ্রোভালের জন্য তোর মা দীর্ঘ একবছর বাংলাদেশে পরেছিলো?
অরু এবার গলার স্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে বললো,
— কি বলতে চাইছেন?
ক্রীতিক সামনে তাকিয়ে বললো,
— আজ, এই মূহুর্তে এখানে আমাদের বিয়ে হবে।
ক্রীতিকের কথায় অরুর মাথা ঘুরে উঠলো। কি বলে এই লোক? জীবনটা কি ছেলে খেলা?যাকে ইচ্ছে হলো তাকে ধরে আনলাম আর জিদ দেখিয়ে বিয়ে করে নিলাম। ক্রীতিকের উপর মেজাজ চড়াও হয়ে গিয়েছে অরুর, ও হিং'স্র বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বললো,— আপনি একটা পা'গল, উন্মা'দ, সাইকো।

নয়তো নিজের সৎ বোনের জীবন নিয়ে এভাবে ছেলে খেলা করতে পারতেন না।
অরু কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক থা’বায় ওর বুকের কাছের জামাটা খা’মচে ধরলো ক্রীতিক। ফিনফিনে জামাটায় একটান দিয়ে নিজের কাছে টেনে এনে অরুর দিকে চোখ রাঙিয়ে ক্রীতিক দাঁত খিঁচে হিসহিসিয়ে বললো,
— তুই আমার কেমন বোন? কোন হিসেবে বোন, উত্তর দে? তোর বাপ আর বাপ এক নয়, তোর মা আমার মা এক নয়, তাহলে নিজেকে আমার বোন দাবি করিস কোন সাহসে ?
শেষ কথাটা বলে অরুকে ধা’ক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ক্রীতিক।
ক্রীতিকের যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে অরুও এবার চুপ হয়ে যায়। চোখ মুখে অসহায় ছাপ টেনে, গলার মাঝে কান্না আটকে রেখে টলমলে চোখে ক্রীতিককে বলে,
— তাই বলে আপনি আমাকে জো’র করে বিয়ে করবেন? সমাজ কি বলবে? দুনিয়া কি বলবে?
আপনার সাথে আমি সেটাও কি সম্ভব? কোন ভুলের রা’গ ঝাড়ছেন আমার উপর, বলুন তো?
ক্রীতিকের দৃষ্টিতে কোনো করুনার ছিটে ফোঁটাও নেই, ও এগিয়ে এসে পুনরায় অরুর হাত চেপে ধরে বললো,— উপর ওয়ালা যার প্রাধান্য দিয়েছে সমাজ তাতে বাঁধা দেওয়ার অধিকার রাখেনা, আর না আমি এসবে পরোয়া করি।
অরু পুনরায় নিজের হাত ছাড়িয়ে বললো,
— আমার জীবনটা এভাবে কেন নষ্ট করছেন? কি করেছি আমি?
ক্রীতিক অরুর দিকে তাকিয়ে হাস্কিস্বরে বললো,

— বিলিভ মি অরু, একটা সময় আসবে, যখন তুই এই সম্পর্কটার জন্য জীবন দিয়ে দিতেও রাজি থাকবি। তখন তুই নিজ মুখে বলবি সেদিন যা হয়েছিল খুব ভালো হয়েছিল। আমি এখন পরিপূর্ণ। আর সেই দিন বেশিদূরে নয়। এখন চুপচাপ ভেতরে চল।
অরু তেতে উঠে বললো,
— আমি যাবোনা, মা আপাকে না জানিয়ে এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে বিয়ে আমি জীবনেও করবো না।
— জায়ান ক্রীতিক লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করেনা, আমার মন চেয়েছে আমি এখন এই মূহুর্তে তোকে বিয়ে করবো, মানে করবোই। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করিস,তাহলে তোর মাকে আজই প্লেনে করে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেবো। ইভেন উইথ আউট এনি ট্রিটমেন্ট।–নাহ! ক্রীতিকের শেষ কথাতে অরু শব্দ করে না বলে ওঠে।
অরুকে কাঁদতে দেখে ক্রীতিক ওর হাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করতে করতে বললো,
— মায়ের ভালো চাইলে ভেতরে চল। তুই শুধু তোর নামটা আমার নামে লিখে দিবি ব্যাস। বাকিটা জীবন তোকে সামলে নেওয়ার দায়িত্ব শুধু আমার।
অরু কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি টেনে বললো,
— আগে ডক্টর কে কল করে বলুন মায়ের ট্রিটমেন্ট শুরু করতে।
ক্রীতিক যেতে যেতে বললো,
— ফোন রিসোর্টে ফেলে এসেছি, বিয়েটা হয়ে যাক অর্ণবের ফোন থেকে কন্ট্রাক্ট করে বলে দেবো।
— ততক্ষণে যদি মায়ের কোনোক্ষতি হয়ে যায়?

ক্রীতিক এবার হাটার গতি থামিয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বললো,
— আমি বলেছি যখন পরে, তারমানে পরেই, আগে বিয়ে হবে, তারপর সব। পুরাতন ছোট্ট মসজিদটার ইটের চালা ক্ষয়ে যায়যায় অবস্থা। ধর্মভিত্তিক দেশ না হওয়াতে এদেশে হুজুর কিংবা মুসলিম খুজে পাওয়া বেশ কষ্ট সাধ্য। তবুও কোথা থেকে যেন অর্ণব আর সায়র মিলে একজন ইন্দোনেশিয়ান হুজুর খুজে এনেছে।
অরু আর ক্রীতিক ভেতরে ঢুকতেই অর্ণব ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
— এতোক্ষণ লাগে তোদের? সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি।
ক্রীতিক ভাবলেশহীন কন্ঠে বললো,
— বউকে রাজি করাতে দেরি হয়ে গেলো। তা তোর লইয়ার আর হুজুর কই?
ক্রীতিকের কথায় অর্ণব পাশে সরে গিয়ে বললো,
— এই যে আমেরিকান লইয়ার।যেহেতু তুই অরু দুজনই আমেরিকা থেকে বিলোং করিস তাই উনিই তোদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজটা আমেরিকান কোর্টে তুলবে।
অর্ণবের বুদ্ধি দেখে সায়র এগিয়ে এসে বললো,
— ওরে শালা,এই ব্যাংকক বসে আমেরিকান লইয়ার কই পেলি তুই?
অর্ণব নিজের কাঁধ ঝাড়া দিয়ে একটু ভাব নিয়ে বললো,
— পেয়েছি, পেয়েছি, টাকা থাকলে বাঘের চোখও মেলে বন্ধু।
সায়র নাক সিকোয় তুলে বললো,— তা এতোই যখন টাকা তাহলে একটা বাঙালি হুজুর ধরে আনতে পারলি না? এ কোন দেশী হুজুর নিয়ে এলি, কথা বুঝিনা কিছুনা। কবুল কোন ভাষায় বলবে ওরা?

অর্ণব দাঁত কিরমিরিয়ে বললো,
— আহাম্মক, বিয়ের সময় সব দেশেই কবুল বলে, তোর এতো চিন্তা করতে হবেনা হুজুর হলেই হলো, তাছাড়া এলিসা মোটামুটি ইন্দোনেশিয়ান ভাষা জানে।
সায়র হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে পাশে সরে গেলে ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে বললো,
— তোদের গবেষণা শেষ হয়েছে? তাহলে এবার বিয়েটা করি?
সায়র ভ্রু কুঁচকে বললো,— তোর দেখি তড় সইছে না জেকে। দাড়া এলিসা ফুলের মালাটা নিয়ে আসুক।
অর্ণব লইয়ারের সাথে কথা বলে কাগজ পত্র রেডি করে ক্রীতিককে ডেকে বলে,
— জেকে অরুকে নিয়ে আয় সাইন করবি।
ক্রীতিক এবার অরুর পাঁচ আঙুলের ভাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে বললো,
— আয় আমার সাথে।
লইয়ারের সামনের চেয়ার দুটোতে পাশাপাশি বসে আছে অরু আর ক্রীতিক।
অরুর নিস্তব্ধ চোখের জলে রেজিষ্ট্রি পেপার ভিজে আঠা আঠা হয়ে গিয়েছে, তবুও কলম হাতে নিয়ে বসে আছে সে।
অরুর এহেন কান্ডে বিরক্ত হয়ে ক্রীতিক আস্তে করে অর্ণবকে বললো,— অর্ণব প্রাইভেট জেট বুক কর। অরুর মা দেশে ফিরবে।
ক্রীতিকের কথার আগামাথা অর্ণবের বুঝে না এলেও অরু তৎক্ষনাৎ বললো,
— করছি করছি, সাইন করছি।

চোখের কার্নিশ বেয়ে গড়িয়ে পরা নোনাজল টুকু হাতের পিঠ দিয়ে মুছে, কাঁপা কাঁপা হাতে অস্পষ্ট অক্ষরে অরোরা শেখ নামটা লিখে দিলো অরু।
অরুর সিগনেচারের পর্ব শেষ হলে ক্রীতিক নিজেও গুটিগুটি অক্ষরে জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী নামটা লিখে দেয়। সিগনেচার করার সময় ক্রীতিকের মুখটা ছিল থমথমে আর গম্ভীর। দেখে মনে হচ্ছিল অরুকে নয়, বরং ওকেই অরু জোর করে ধরে বিয়ে করাচ্ছে। তবে ওর মনে চলছিল অন্য সুর,
—-কথা দিয়েছিলাম খুব বেশি না একটু খানি বড় হ, তোকে আমি আমার করে নেবো। আজ কথা রেখেছি, তুই আজ থেকে আমার অরু। পুরোটাই আমার।রেজিষ্ট্রি পেপারে সাইন করা শেষ হলে এলিসা একটা তাজা ফুলের মালা অরুর হাত ধরিয়ে দিলো, অন্যটা ক্রীতিকের হাতে, তারপর মোবাইলের ভিডিও অন করতে করতে বললো,
— জেকে বউকে মালা পরা।
ক্রীতিক বিরক্ত ভঙ্গিতে বললো,
— এসবের দরকার নেই তো এলিসা।
— দরকার আছে তুই পরা।
এলিসার কথায় ক্রীতিক অরুর নত করে রাখা মাথার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো,
— মাথা তোল মালা পরাবো।
সায়র চোখমুখ কুঁচকে বললো,— সিরিয়াসলি জেকে? তোর বউ হয়ে গিয়েছে মেয়েটা, এখনতো একটু সম্মান দে।
ক্রীতিক এবার সত্যি সত্যিই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

— অরু মাথা তোলো মালা পরাবো।
“তোলো” শব্দটা বলতে গিয়ে ক্রীতিকের বোধহয় জিভ খসে পরার উপক্রম, ওকে দিয়ে এসব হয়না মোটেই। এবার এলিসাও পাশ থেকে তাড়া দিয়ে অরুকে বললো,
—অরু মাথা তোলো।
সবার জোরাজোরিতে অরু এবার মাথাটা তুলে ক্রীতিকের চোখের দিকে চাইলো। সেই ঝড় তোলা কামুক চাহনি, চোখ দেখে মনেই হচ্ছেনা এই লোকটা একটু আগে এতোবড় ভয়া’বহ কান্ড ঘটিয়েছে। অথচ সবার মধ্যে থেকে ফে’সে গিয়েছে অরু।
অরুর ভাবনার মাঝেই ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলো ক্রীতিক। এবার অরুর পালা। কিন্তু অরুর মতো একরত্তি চুনোপুঁটির মতো মেয়ে থাম্বার মতো দাঁড়িয়ে থাকা গ্রীকগড খ্যাত ক্রীতিকের লাগাম কি করেই বা পাবে? তাই সহসাই পা উচিয়ে আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে মুখ কাচুমাচু অরু বললো,— পারছিনাতো।
অরুর কথায় এলিসা মুখ টিপে হাসি সংবরণ করে বললো,
— জেকে কি সমস্যা? তোর বউ তো তোর নাগাল পাচ্ছে না।
ক্রীতিক কিছু না বলেই এবার মাথা নুইয়ে দিলো অরুর সামনে,তৎক্ষনাৎ ওকে মালা পরিয়ে দেয় অরু।
ঠিক সেই মূহুর্তটাই মুঠোফোনের ক্যামেরায় ব’ন্ধী করে নেয় এলিসা। এরপর ধর্মীয় মতে ওদের আরও একবার বিয়ে হয়।অরু আর ক্রীতিক দুজনই কবুল বলে বিয়েটা সম্পন্ন করে।
অরু কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। নাক, চোখ লালবর্ণ ধারণ করেছে। ওর পরনে ছিল লংস্কার্ট আর সুতির টপস। চেহারায় কৃত্তিম প্রসাধনীর লেশমাত্র নেই,তবুও বিয়ের মালা পরিহিত

সদ্যবিবাহিতা অরুকে দেখতে অপরূপা লাগছে। চেহারাতে অন্যরকম লাবন্যতা এসেছে মেয়েটার। এটা বোধ নতুন নতুন বিয়ের পর সব মেয়েদেরই আসে, তাই অরুরও এসেছে।বিয়ের পালা শেষ হলে ছোট্ট একটা নিয়মের মাঝে আটকে পরে ওরা। এটা ইন্দোনেশিয়ান সংস্কৃতি। বিয়ের পর স্বামী তার স্ত্রীর ঘোমটা খুলে মুখ দেখবে অতঃপর স্ত্রী তার স্বামীর দু-হাতে চুমু খেয়ে হাতদুটো চোখে ছুয়িয়ে সম্মান জানাবে। আর স্বামী স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে সেই আন্তরিকতা টুকু সাদরে গ্রহন করবে। দারুন ট্রেন্ড। হুজুরের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে এলিসা, অর্ণব, সায়র একপ্রকার ঝুলে পরেছে ওদের দিয়ে এই ট্রেন্ড পালন করাবেই করাবে। সব নিয়ম পালন করা হয়েছে এটুকু কেন বাকি থাকবে?
ওদের জোরাজোরিতে ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে বললো,
— অনেককিছু করেছি, আর পারবো না। এখন যা করার তোরা কর।
এলিসা ওর দিকে তাকিয়ে কটমটিয়ে বললো,
— পারবিনা মানে? মেয়েটাকে জোরজব’রদস্তি করে বিয়ে করেছিস, আর এখন বলছিস নিয়ম পালন করতে পারবি না? মগের মুল্লুক নাকি?— ভাই কেন বুজছিস না,এটা বাঙালি নিয়ম না,কোথাগার ইন্দোনেশিয়ান নিয়ম। আমরা কেন পালন করতে যাবো?
এলিসা ক্রীতিকের কথায় ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললো,
—শোন জেকে, নিয়ম ইজ নিয়ম, অতো দেশটেশ বুঝিনা আমরা। সো চুপচাপ পালন করে ফেলো।
পাশ থেকে অর্ণব বললো,

— শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস জেকে, অরুতো এখন তোর বউই যা নিয়ম আছে সব করে ফেল। এলিসা হলেতো আমি নাচতে নাচতে ট্রেন্ড পালন করতাম। শুধুমাত্র নিজের দেশ কেন পুরো এশিয়ান সবগুলো কান্ট্রি থেকে নিয়ম ধার করে এনে এনে পালন করতাম।

এলিসা অর্ণবকে চোখ রাঙিয়ে বললো,

— থামবি তুই?

ক্রীতিক এবার ওদের সবাইকে একসাথে থামিয়ে দিয়ে বললো,

— আচ্ছা চুপ কর তোরা। করছি, যা যা নিয়ম আছে সব পালন করছি, তবুও চেঁচামেচি থামা। ক্রীতিকের সম্মতি পেয়ে এলিসা এগিয়ে এসে অরুর পাতলা ফিনফিনে দোপাট্টা দিয়ে ওর মাথায় বড়সড় একটা ঘোমটা টেনে দিলো। এখন আর অরুর মুখ দেখা যাচ্ছেনা। ক্রীতিক কয়েক সেকেন্ড ঘোমটা টানা অরুর দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে দিলো ধীরে ধীরে অরুর ঘোমটা সরানোর উদ্দেশ্যে। ভেতরের উত্তেজনা, উৎফুল্লতায় এবার সত্যি সত্যি ওর হাত কাঁপছে। নিজেকে বারবার দাড় করাচ্ছে সপ্ন দুয়ারে, অরু এখন আক্ষরিক অর্থে ক্রীতিকের বউ। মিসেস অরোরা জায়ান। আর এই মূহুর্তে ক্রীতিক তার বউয়ের ঘোমটা সরাচ্ছে মুখ দেখার উদ্দেশ্যে এটা কি আদৌও সত্যি? নাকি সপ্ন?ক্রীতিক ধীরে ধীরে ঘোমটা তুলে অরুর, নানা তার নতুন বউয়ের মুখের দিকে নিস্প্রভ চোখে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। ওর পুরো পৃথিবীটা এখানেই থমকে গিয়েছে, অরুকে আজ মাত্রাতিরিক্ত সুন্দর লাগছে। তাইতো ক্রীতিকের মতো শক্ত পোক্ত কঠিন হৃদয়ের মানুষটাও কেমন গলে গলে যাচ্ছে ওর মায়াবী মুখখানা দেখে। ঘোমটা তোলা হয়ে গেলে

এলিসা আর হুজুরের নির্দেশে কাঁপা কাঁপা হাতে ক্রীতিকের জিম করা পেশিবহুল সাদা ফর্সা হাতদুটো হাতের মধ্যে নিয়ে নেয় অরু। অতঃপর হেঁচকি দিতে দিতে ওর দু'হাতের পিঠে নিজের ভেজা নরম তুলতুলে অধর খানি ছুয়িয়ে দেয় নির্লিপ্তে,অতঃপর তা মাথা নুয়িয়ে স্পর্শ করায় নিজের দুচোখে।
অরুর এই নিয়ম পালনে কি মোটেও আন্তরিকতা ছিলোনা?
ছিলোতো, যত যাই হোক বিয়ের পরে মেয়েদের হৃদয়টা স্বামীর প্রতি আপনাআপনি দূর্বল হয়ে যায়। ওই মূহুর্তে অরুরও বোধ হয় তাই হয়েছিল। অরু যখন ক্রীতিকের হাতদুটো দুচোখে স্পর্শ করায় তখন ক্রীতিক তার একহাত নিয়ে অরুর মাথার উপর রেখে অন্যহাতের বাহুতে টেনে নেয় অরুর ছোট্ট শরীরটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিকের সাদা শার্টটা খামচে ধরে ওর বুকে মুখ লুকিয়ে কা'ন্নায় ভেঙে পরে অরু। কি জানি কেন এতো কেঁদেছিল সেদিন? আর কাঁদবেই যখন তখন ক্রীতিকের বুকেই কেন? তখন তো ক্রীতিকই আসল কার্লপিট ছিল। তবুও ক্রীতিকের বুকেই কেঁদে ভাসিয়েছিল অরু। এসব অযথা নিয়মকানুন পালনের পর ক্রীতিক আর দাঁড়ালো না, অরুকে কোলে তুলে নিয়ে বেড়িয়ে গেলো মসজিদ থেকে। তারপর বাইকে বসে বরাবরের মতোই নিজের ওয়ালেট, সিগারেটের বক্স, এমনকি একটু আগের মালাটাও অরুর হাতে ধরিয়ে দিলো সে। অরুও চুপচাপ সেগুলো হাতে নিয়েই বসে পরলো বাইকের পেছনে।
অরুর ভেতর তখন ভোঁতা ভোঁতা অনুভূতি থাকলেও আজ ওর অনুভূতি গুলো তুঙ্গে। এখন মনে হচ্ছে বিয়ের পরে স্বামীর সাথে ওর প্রথম বাইক রাইড বোধ হয় সেটাই ছিল।

সেদিনের ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে করে আরও একবার লাজুকতায় মুড়িয়ে গেলো অরু। সেই লাজে রাঙা হলো নরম তুলতুলে কপোল দুখানা।ইদানীং প্রায়শই শেষ রাতে ঝড় হয়। প্রকট ঝড়ে গাছপালা ভেঙেচুরে শহরতলীর হাইওয়ে রাস্তাঘাট পর্যন্ত ব্লক হয়ে থাকে নিমিষেই ।অতঃপর ভোর হতেই সেই ঝড়বৃষ্টি দমে গিয়ে নতুন করে উদীয়মান হয় সোনালী রঙা সূর্য কীরন। এখন সন্ধ্যারাত চলমান, তবুও শেষ রাতে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছে হুহু করে এলোপাথাড়ি বইতে থাকা মেঘ ভেজা ঘূর্ণি বায়ু। সেই তীব্র ঝড়হওয়ার উল্টো পথে বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রীতিকের ব্ল্যাক মার্সিডিজটা। চারিদিকে শুনশান নীরবতা বিরাজমান, পুরো রাস্তাটা খালি পরে আছে, এই যায়গাটা বরাবরই এমন, সন্ধ্যে হতে না হতেই মানুষ জনের আনাগোনা নেমে আসে শূন্যের কোঠায়।ড্রাইভিং সিটে বসে দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ঘুরাচ্ছে ক্রীতিক নিজেই। ভার্সিটির কিছু জরুরি কাজ সম্পন্ন করে আজকেই নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো ফিরেছে সে। চোখে তার ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। সব সময় সেট হয়ে থাকা আন্ডারকাটিং স্টাইলিশ চুলগুলোও এখন এলোমেলো ভাবে কপালে পরে আছে। ড্রাইভ করতে করতে প্রায়শই কপালে পরে থাকা অবিন্যস্ত চুলগুলোকে একহাত দিয়ে ব্যাক ব্রাশ করে পেছনে ঠেলছে ক্রীতিক। তবে এই মূহুর্তে ওর ক্লান্ত মুখ ভঙ্গিমা খুব একটা ঠাওর করা যাচ্ছে না। চোখের ভাষা পড়ার উপায় নেই। দেখলে মনে হবে অনুভূতিহীন নির্জীব এক কাঠের পুতুল। অথচ হাতদুটো চলছে নির্বিঘ্নে, ক্রীতিক যখন স্পিডোমিটারের সর্বোচ্চ গতিতে নিজের গাড়িটাকে বাতাসের বিপরীতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই খানিকটা ফুরসত

দিয়ে ভাইব্রেট ফোনটা সশব্দে বেজে ওঠে ওর। ক্রীতিক কানে ব্লুটুথ লাগিয়ে স্পিডোমিটারের গতি সামান্য ধীর করে ফোনটা রিসিভ করলো। ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে অর্ণব হন্তদন্ত হয়ে বলে ওঠে,— ভাই খবর শুনেছিস?
ক্রীতিক শুধালো,
— কি খবর।
গলার আওয়াজে একরাশ উৎকন্ঠা নিয়ে অর্ণব বললো,
— নিখিল কে সার্চ করার জন্য পুলিশ সহকারে ওর এ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু নিখিল কোথাও নেই। কোথাও নেই মানে কোথাও না। ভার্সিটি, ক্যাম্পাস, সাইনটিস্ট টীম কেউ ওর খবর জানেনা, কেউ না, এমন কি ওর গার্ল ফ্রেন্ডরাও না। কোথায় পালালো বলতো এই হতচ্ছাড়া?
ক্রীতিক স্পষ্ট আওয়াজে বললো,— কোথাও না।
–কিহ!
অর্ণবের কথার প্রতিউত্তরে ক্রীতিক বললো,
— ওকে রাশিয়ান মাফিয়ারা গু'ম করে নিয়ে গেছে, তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়েছিল কিনা,দেখ গিয়ে এতোক্ষণে হয়তো পিস পিস করে ওর লি'ভার কি'ডনি গুলো অন্যদেশে পা'চার করে দিয়েছে তারা।
ক্রীতিক এমন ভাবে নিরুদ্বেগে কথাগুলো বলছিল যেন সামান্য একটা মুরগী কা'টার কথা বলা হচ্ছে এখানে, কি আশ্চর্য!
ক্রীতিকের কথায় অর্ণব আঁতকে উঠে বললো,— কি বলছিস? তুই কি করে জানলি এতোসব?

ক্রীতিক ড্রাইভ করতে করতে ঠোঁটের কোনে একটা বিন্যাস্ত কপট হাসি ধরে রেখে বললো,
— আমিইতো ওকে মাফিয়াদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছি,কৌশলে।
অর্ণব তেতে উঠে বললো,
— এটা মোটেও হেলাফেলার কথা নয় জেকে। ছেলেটা ইয়ং, বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে ভুল করে বসেছে, আমরা ওকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারতাম, হয়তো শুধরে যেতো, নিজের ভুলটা বুঝতে পারতো, তা-না তুই ওকে ডিরেক্ট মৃ’ত্যুর দিকে ঠেলে দিলি? এভাবে কৌশলে আর কত মানুষকে মা’র’বি তুই? সেদিন এ্যা’ক্সিডেন্টের পর জ্যাকসন হসপিটালে ধুঁকে ধুঁকে মা’রা গিয়েছে, আর আজ নিখিল।
অর্ণবের কথায় ক্রীতিকের মোটেও হেলদোল হলোনা, বরঞ্চ নিজের চোয়াল খানা শক্ত করে ও বললো,— যে যার কর্মফল ভোগ করলে আমার তো কিচ্ছু করার নেই।
অর্ণব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— ওদের একমাত্র দোষ কি? ওরা অরুর দিকে হাত বাড়িয়েছিল তাইতো?
ক্রীতিক তীর্যক হেসে বললো,
—এক্স্যাকলি।
— এতো অবসেশন ভালো নয় জেকে। বাই এনি চান্স তোর এই অতিরিক্ত আসক্তি অরুর উপর চড়াও হলে তখন? মেয়েটাকে তো রেগেমেগে মে’রে ফেলবি তুই।

অর্ণবের কথার পাছে ক্রীতিক বললো,— কখনো এমন পরিস্থিতি এলে নিজেকেই নিজে আ'ঘাত করবো আমি। তবুও ওকে নয়। আফটার অল,সি ইজ মাই প্রোপার্টি,হার্টবিট, এন্ড মাই এভরিথিং।
অর্ণব ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
—বুঝেছি তোকে আবার সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো তুই শুধরাবি না।
ক্রীতিক ওর কথায় বিরক্ত হয়ে বললো,
— জ্ঞানদান পর্ব শেষ হলে বল, কলটা রেখে দেই, আমি ড্রাইভ করছি।
এরপর ওপাশ থেকে কল কাটার পিক পিক আওয়াজ ভেসে এলো কানে। অর্ণব কল রেখে দিলে ক্রীতিক আবারও মন দেয় ড্রাইভিং এ।সেদিনের পাহাড়ের ঘটনার আজ প্রায় একসপ্তাহ হতে চললো, অথচ গত একসপ্তাহে একবারও অরুর সাথে দেখা কিংবা কথা কোনোটাই হয়ে ওঠেনি ওর।কারন গত একসপ্তাহ ধরেই শহরের বাইরে ছিল ক্রীতিক। আর আজ যখন সানফ্রান্সিসকো ফিরে অরুকে কল দিলো তখন বারবারই ফোনটা বন্ধ বলছে। এতোক্ষণ তো ক্রীতিক ভেবেছে ব্যাপারটা খুবই সাভাবিক ফোন বন্ধ থাকতেই পারে, কিন্তু অর্ণবের সাথে কথা বলার পর থেকেই অরুকে দেখার জন্য হৃদয়টা কেমন আনচান করছে ওর। বারবার মনে হচ্ছে দেখা না হোক এটলিস্ট অরুর তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দটুকু যদি শোনা যেত তাহলে রাতে অন্তত নিশ্চিন্তে ঘুমানো যেত।
খানিকক্ষন ধরে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মাঝ পথেই ব্রেক কষলো ক্রীতিক। অতঃপর ফোন হাতে নিয়ে দ্রুততার সাথে ডায়াল করলো অরুর নাম্বারে। কিন্তু না অরু কল তুললো না। গত

কয়েকবারের মতো এবারও ফোনটা বন্ধ বলছে। এহেন কান্ডে ক্রীতিক বেশ বিরক্ত হলো, উগ্র মেজাজটা হুট করেই চড়াও হলো অরুর উপর। রাগের তোপে মনেমনে দাঁত খিঁচে বললো,— তোকে একবার চোখের সামনে পেয়ে নেই অরু। তারপর বুঝাবো ফোন বন্ধ করে রাখার শা'স্তি কাকে বলে।

বারবার কল দিয়েও কোনোভাবেই অরুকে কলে না পেয়ে, বিরক্তিতে ফোঁসফাস করতে করতে শেষ মেশ ক্রীতিক কল লাগালো প্রত্যয়ের নাম্বারে।

দুএকবার রিং হওয়ার পরেই কল তুললো প্রত্যয়, তবে ওপাশ থেকে কিছু বলার আগেই ক্রীতিক তড়িঘড়ি করে প্রশ্ন ছু'ড়লো ওকে,

— অরুর কোনো খবর জানো প্রত্যয়?

ওপাশ থেকে বোধ হয় প্রত্যয়ের শুষ্ক ঢোক গেলার আওয়াজ ভেসে এলো, অগত্যাই আমতাআমতা করতে লাগলো ও।

প্রত্যয় আমতাআমতা করছে দেখে ক্রীতিক হুংকার দিয়ে বললো,

— কি হয়েছে? এরকম মেয়েদের মতো মিনমিন করছো কেন? যা বলার স্পষ্ট ভাবে বলো, হোএয়ার ইজ অরু?

প্রত্যয় উল্টো প্রশ্ন করে শুধালো,

— ভাই আপনি কি ফিরেছেন?

ক্রীতিক বললো,— হ্যা একটু আগেই ফিরেছি, এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি, কেন বলোতো?

প্রত্যয় ভয়ার্ত গলায় গাইগুই করে বললো,

— তাহলে বোধ হয় আমাদের একবার অরুদের বাসায় উচিৎ। আমি শুনেছি, না মানে সিওর না, শুনেছি কেবল, অরুর মা,মমানে

আজমেরী ম্যাম বোধ হয় অরুকে ববিবিয়ে দিতে চাইছেন, আজ পাত্র পক্ষ দেখতে আসার কথা।
প্রত্যয়ের কথা শুনে ক্রীতিকের মাথায় ভলভলিয়ে র’ক্ত উঠে গেলো, নিজের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে ক্রীতিক গর্জে উঠে বললো,
— হোয়াট? এমন একটা কথা তুমি আমাকে এখন বলছো? ব্রেইন কোথায় তোমার?
প্রত্যয় থতমত খেয়ে বললো,
— ইয়ে মানে, আমি নিজেই একটু আগে শুনলাম ভাই।
ক্রীতিক আর অযথা কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলো না, তৎক্ষনাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে স্পিডোমিটারের কাঁটায় একশোর উপর গতি তুলে হাওয়ার বেগে হুঁশশ করে চলে গেলো উল্টো পথে। বাইরের ঝড়হাওয়া ক্ষনে ক্ষনে বেড়েই চলেছে। প্রচন্ড বাতাসের তান্ডবে বারবার জানালার ভারী পাল্লা গুলো বারি খাচ্ছে আর বিকট আওয়াজ তৈরি করছে, এই দানবীয় শব্দ সইতে না পেরে অরু এগিয়ে গিয়ে রুমের সবগুলো জানালার গ্লাস টেনে দিলো। গ্লাস টেনে দেওয়াতে গ্লাসের সাথে বাতাস বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে এখন আরও ভ’য়ানক আওয়াজ তৈরি হচ্ছে রুমের মাঝে। সেদিকে অবশ্য খেয়াল নেই অরুর। ওতো সেই কখন থেকে রুমের দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে, চোখের সামনে যে ছোট্ট বেডসাইড টেবিলটা,তারউপর পিচ কালারের জামদানী শাড়ি আর কিছু গহনা রাখা আছে। এগুলো সেই বিকেলে এসে দিয়ে গিয়েছিল অনু। বলেছে সবকিছু পরে রেডি হয়ে থাকতে। সন্ধ্যা নাগাদ রাজের পরিবার আসবে ওকে দেখতে। রাজরা দুইতলায় থাকে, তাই মনে হয়না

সন্ধ্যা হওয়ার পর আর দেরি করেছে তারা, বাইরে একাধিক মানুষের কথাবার্তা আর শোরগোল শুনে মনে হচ্ছে সবাই চলে এসেছে এতোক্ষনে অথচ অরু এখনো ক্রীতিকের দেওয়া পাজামা সেট পরেই বসে বসে ঠোঁট উল্টে কাঁদছে। কিভাবে কি ভেস্তে দেওয়া যায় সেটাই ভাবছে তখন থেকে। এতো অল্প বয়সে এরকম সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে সেটা বোধ হয় কল্পনাতেও ভাবেনি অরু। অথচ যার জন্য এতো হৃদয়ের হাহাকার, গত একসপ্তাহ ধরে তার কোনো খবরই নেই। ফোন নেই তো কি হয়েছে? একটা বার কি বাসার নিচে আসা যেতো না?অভিমান হলো অরুর, বেজায় অভিমান। অভিমানের জোয়ারে গলায় আটকে আছে বুক ফাটা কান্নার দল। ক্রীতিকের উপর অভিমানের ঘট যখন পরিপূর্ন ওর হৃদয়ে, তখনই অরুর মনে হলো,
—-না এসেছে ভালোই হয়েছে, ভুলেও যদি এসব কাহিনি জানতে পারতো তাহলে রাজের সাথে সাথে আমাকেও থা’পরিয়ে চান্দে পাঠিয়ে দিতো নিশ্চিত। যা হয়, তা বোধ হয় ভালোর জন্যই হয়, এবার আজকের দিনটা কোনোমতে বিগড়ে দিতে পারলেই হলো, পরে নাহয় রাজকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে বলবো। আর তারপর মাকেও।
অরুর ভাবনার সুতো ছিড়লো বাইরে থেকে অনুর ডাকে, দরজার বাইরে বারবার ক’রাঘাত করতে করতে অনু বললো,
— কিরে অরু, রেডি হয়েছিস? দরজাটা খোল, তোকে যেতে হবেতো।
অনুর উপস্থিতি টের পেয়ে অরু মনেমনে চিন্তা করলো,

— আপাকে একবার বুঝিয়ে বললে কেমন হয়? আপাও তো একজনকে ভালোবাসে, ও নিশ্চয়ই বুঝবে।
— অরু দরজা খোল, সবাই অপেক্ষা করছে তো। পুনরায় অনুর খাদে নামানো কন্ঠ কানে এলে, অরু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ভেতরে প্রবেশ করে অরুর এমন অগোছালো বিমূর্ষ রূপ দেখে অনুর চোখ কপালে উঠে যায়, ও তৎক্ষনাৎ দরজাটা লাগিয়ে অরুর কাছে এগিয়ে এসে ঝাঁজিয়ে বললো,
— রেডি হসনি কেন এখনো?কি চাইছিস? মা আবারও তোর উপর রেগে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পরুক? আবারও এতিম হতে মন চাইছে?
অরু এবার কান্না ভেজা গলায় অনুকে অনুরোধ করে বললো,
— আমি এসব দেখাদেখি করতে চাইনা আপা, তুই প্লিজ মাকে একটু বোঝা, তোকে আমি সব বলবো, তার আগে তুই কিছু কর।
অনু অরুর চিকন বাহুটা শক্ত করে চেপে ধরে বললো,— আমাকে কিচ্ছু বলতে হবেনা, এখানে মায়ের সম্মান জড়িয়ে আছে, মা নিজে ওদেরকে ইনভাইট করেছে তোকে দেখার জন্য, আর এখন তুই বলছিস যেতে পারবি না?
অরু কাঁদতে কাঁদতে বললো,
— যদি বলি আমি কাউকে ভালোবাসি?
অরু ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
— কে সে, শুনি?
অষ্টাদশী অপারগ অরু নিজের মায়ের সৎ ছেলের নামটা উচ্চারণ করার সাহস আর পেলোনা, সব তচনচ হয়ে যাবে সেকথা ভেবে।

অরু চুপ হয়ে আছে দেখে অনু খিটমিটিয়ে উঠে বললো,— মিথ্যে কথা বলার আর যায়গা পাস না?আমাকে বোকা না বানিয়ে চুপচাপ রেডি হ।
— আপা বিশ্বাস কর আমি মিথ্যা বলছিনা, তুই কিছু একটা কর আপা। আমাকে এভাবে ভরা নদীতে ঠেলে দিস না।
বোনের এরূপ কাকুতি মিনতি দেখে মন গললো অনুর, কিন্তু মায়ের সম্মানেরও তো একটা ব্যাপার আছে,তারউপর মা অসুস্থ এসপারওসপার হয়ে গেলে মায়ের যদি শারীরিক কিছু ক্ষতি হয়ে যায়? সেই ভয়ে তটস্থ অনু। তাই ও নিজের কঠিন সুরটা একটু নরম করে অরুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,— দেখ বোন, আগেও বলেছি এখনো বলছি, দেখতে এলেই বিয়ে হয়ে যায়না। ওরা শুধু দেখে যাবে এই যা। তাছাড়া আজকের দিনটা কোনোমতে চলে গেলেই দেখবি সব সমস্যার সমাধান, পরে না হয় রাজ কে একান্তে বুঝিয়ে বলিস তোর সমস্যা গুলো। এখন দেরি না করে চল।মা সেই কখন থেকে অতিথিদের সামনে বসে আছে।
আপার কথায় বেশ আস্বস্ত হলো অরু। বুকের ভেতরটা অনেক হালকাও লাগছে এখন। ঠিকই তো আজকের রাতটা মানে-মানে চলে গেলে রাজকে ভালোমতো বুঝিয়ে বলতে হবে। তাহলে রাজই সব কিছু মিটিয়ে ফেলতে পারবে। এসব ভাবতে ভাবতে অরুর কান্নাকাটিতে একটু ভাটি পরলে অনু শাড়ি হাতে নিয়ে বললো,
— আয় পরিয়ে দিই।অনু অরুকে আনতে রুমে গিয়েছে, এদিকে অনবরত কলিং বেলের আওয়াজ ভেসে আসছে তখন থেকে। কি জানি কে এমন ভাবে কলিং বেলে চাপছে। অনু ধারেকাছে নেই বলে আজমেরী শেখ এবার নিজেই উঠে গেলেন দরজা খুলতে। অতিথিরা

সবাই গোল হয়ে কাউচে বসে আছে, রাজ ও আছে, অফ হোয়াইট কালারের প্রিন্স কোর্টে তাকে বেশ সুদর্শনই লাগছে। রাজ ছোট বেলা থেকেই আমেরিকাতে বড় হয়েছে। ওর পুরো চোদ্দগোষ্ঠী আমেরিকান নাগরিক , সবাইই এখানকার বড়বড় ব্যাবসায়ী কিংবা চাকুরীজীবি। সেই হিসেবে পাত্রী দেখতে আসায় কোনোরূপ ত্রুটি রাখেননি তারা ভরপুর এনেছেন, তারউপর এসেছেও অনেকজন। পুরো বসার ঘর মানুষে গিজগিজ করছে এই মূহুর্তে।ঠিক সেই সময়ই আগমন ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত একজনার, সে আর কেউ না, মিসেস অরোরা জায়ানের লিগ্যাল গার্ডিয়ান,মি. জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী।
আজমেরী শেখ দরজা খুলতেই চোখের সামনে প্রত্যয়কে দেখতে পায়, প্রত্যয়কে দেখে তিনি ভেবেছেন হয়তো কোনোরূপ অফিসিয়াল কাজেই তার আগমন, কিন্তু তারপর পরই প্রত্যয়ের পেছন থেকে বেড়িয়ে আসে আরেকজন। যদিও এটাই প্রথম সাক্ষাৎ, তবুও এই লম্বা সুদর্শন ছেলেটাকে চিনতে খুব একটা সমস্যা হলোনা আজমেরী শেখের, তিনি ক্রীতিককে দেখা মাত্রই তাচ্ছিল্য হেসে বললেন,
— জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী, এইখানে? অহংকার ভাঙলো তবে? তা আগমনের কারনটা জানতে পারি?
ক্রীতিক আজমেরী শেখের একটা কথারও জবাব না দিয়ে হনহনিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো, ওর পেছন পেছন প্রত্যয়ও। ভেতরের সবাই ক্রীতিককে দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলো বটে, সবার মনে একটাই প্রশ্ন,

— এ আবার কে? আদৌও বাঙালি, নাকি বিদেশি? চেহারা দেখেতো মনে হচ্ছে দুটোর মিক্সড।
ক্রীতিক জিভ দিয়ে গাল ঠেলে এগিয়ে গিয়ে আজমেরী শেখের ব্যক্তিগত ডিভানের উপর পায়ে পা তুলে বসে পরলো। ক্রীতিকের বে'য়াদবি দেখে আজমেরী শেখ এগিয়ে এসে অস্পষ্ট সুরে বিড়বিড়িয়ে ক্রীতিকের উদ্দেশ্যে বললেন,— এটা আমার বসার যায়গা, গেট আপ।
ক্রীতিক পা দুলাতে দুলাতে বললো,
—আমার কোম্পানির টাকায় কেনা। ইনভেস্ট ফ্রম জেকে গ্রুপ? এম আই রাইট?
— কোম্পানির ধারে কাছেও তো আসোনা, আমার নিজের কোম্পানি দাবি করছো?
ক্রীতিক রহস্যের হাসি হেসে বললো,
— আমি যদি সারাজীবনও কোম্পানির ধারে কাছে না যাই, তাও জেকে গ্রুপ আমারই থাকবে।
আজমেরী শেখ নিজের রাগ টুকু সংবরণ করে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন,
— কি চাইছো কি তুমি ক্রীতিক, কেন আমার বাসায় অহেতুক এসে ঝামেলা পাকাচ্ছো?
জবাবে ক্রীতিক বললো,
— ঝামেলা পাকাবো কেন আশ্চর্য ? কি প্রোগ্রাম হচ্ছিল এখানে? প্রোগ্রাম করুন না, আমার কোনো অসুবিধা নেই আমিও দেখছি।
ক্রীতিকের কথায় আজমেরী শেখ ওর দিকে বিরক্তির দৃষ্টি তে তাকিয়ে আছে দেখে ক্রীতিক পুনরায় বললো,

—কেন, আমি ইনভাইটেড না? তাছাড়া ইনভাইট দিয়ে করবো টা কি?আফটার অল উই আর ফ্যামিলি। রাইট মামুনি?আজমেরী ঠিকই বুঝলেন, যেই ছেলে সারাজীবন উনি উনি করে কথা বলেছে। জীবনে এইটুকু সম্মান পর্যন্ত দেয়নি, তার হটাৎ করে মামুনি ডাকে নিশ্চয়ই কোনো ঘাবলা আছে। তবুও চোখের সামনে এতোগুলা মেহমান দেখে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলেন তিনি। ঠিক তখনই সবার কৌতুহল, অযাচিত প্রশ্ন সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে অরুকে নিয়ে অনু প্রবেশ করে বসার ঘরে। অরুর পরনে পিচ কালারের জামদানী শাড়ি, হাতে স্বর্ণের বালা। মাথায় ছোট্ট করে ঘোমটা টানা, দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে।কিন্তু অরুর এই সৌন্দর্য দেখে ক্রীতিকের র’ক্ত গরম হয়ে উঠেছে মূহুর্তেই। শরীরের শিরা উপশিরায় সেই টগবগে র’ক্তের উত্তাল ক্রোধ কোনোমতে ধামাচাপা দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে অনবরত পা দোলাচ্ছে সে।
অনু এগিয়ে এসে অরুকে রাজের মুখোমুখি কাউচে বসিয়ে দেয়। এতোক্ষণ মাথা নুয়িয়ে রাখার জন্য ক্রীতিককে খেয়াল না করলেও কাউচে বসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিককে দেখে অরুর মুখ যেনো থেকে র’ক্ত সরে গেলো। প্রকট আতঙ্কে অজান্তেই নিজেই খামচে ধরলো নিজের শাড়ি। ক্রীতিক এই মূহুর্তে দু আঙুলে কপাল ঘষতে ঘষতে অরুর দিকেই গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পরনে তার সিলভার কালারের ব্র্যান্ডেট শার্ট। শার্ট গলিয়ে শক্ত হয়ে থাকা হাতের জিম করা পুরুষালী পেশিগুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান। ক্রীতিককে এভাবে হুট করে এই সময় দেখতে পেয়ে, ক্রীতিকের আ’গুন চোখে চোখ রেখেই তিরতিরিয়ে কাপছে অরু।

ওকে এভাবে কাঁপতে দেখে রাজের মা অরুর পাশে এসে বসে ওকে আসস্থ করে বললেন,
— কাঁপছো কেন মা? আমরা আমরাইতো। এক সময় এরাই তোমার আসল পরিবার হবে এতো ভয়’ পাওয়ার তো কিছু নেই।কে শোনে কার কথা? এই মূহুর্তে কারোর কথায় কোনোরূপ খেয়াল নেই অরুর, ওতো এখনো ক্রীতিকের দিকেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ক্রীতিক কি থেকে কি করবে সেই ভয়েই তটস্থ অরু।
ক্রীতিক প্রথমে অরুর থেকে চোখ সরিয়ে চারিদিকে একবার চোখ বোলালো, অতঃপর চট করে উঠে দাড়িয়ে অরুর হাতটা শ’ক্ত করে চেপে ধরে, ওকে টা’নতে টান’তে রুমের দিকে নিয়ে গেলো।
ক্রীতিকের হঠাৎ এমন বি’স্ফোরিত কান্ডে সবাই হতভম্ব। কারও মুখে কোনো বাক্য নেই, কি করছে এই ছেলে। ক্রীতিক যখন অরুকে নিয়ে রুমে যাচ্ছিল ঠিক তখনই অরুর অন্য হাত টেনে ধরে রাজ। ক্রীতিক রাজের দিক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তীর্যক স্বরে বললো,
— হাউ ডেয়ার ইউ।
রাজ একটু সাহস দেখিয়ে বললো,
— সি ইজ নট ইওর প্রোপার্টি।
ক্রীতিক শক্ত গলায় জবাব দিল,
— ইয়েস সি ইজ।কথাটা বলে ক্রীতিক রাজকে মা’রতে উদ্যত হবে, তার আগেই প্রত্যয় অরুর থেকে রাজের হাত ছাড়িয়ে বললো,
— জানে বাঁচতে চাইলে ছাড়ো রাজ। অরু বিবাহিত। ক্রীতিক ভাই অরুর হাসবেন্ড।

প্রত্যয়ের শেষ কথাতে রুমের প্রত্যেকটা মানুষের মাথায় যেন আকাশ ভে'ঙে পরলো। কি বললো প্রত্যয় মাত্র এটা? আদৌও ঠিক শুনেছে তো সবাই? আজমেরী শেখ আর অনুতো বাকরুদ্ধ পুরোপুরি। ক্রীতিক সেসবের দু পয়সা তোয়াক্কা না করে প্রত্যয়কে বললো,
— আবর্জনা গুলো পরিষ্কার করো, এস সুন এস পসিবল। আর যেন এদের চোখের সামনে না দেখি আমি।
প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক অরুকে নিয়ে রুমে গিয়ে ঠাস করে রুমের দরজা লাগিয়ে দেয়। অরু জানে ওর কপালে শনি নৃত্য করছে, তাই ভয়ের চোটে কুকরে আছে মেয়েটা।ভেতরে এসে অরুকে সোজা দাঁড় করিয়ে শার্টের হাতাটা গুটিয়ে ওর গালে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চপেটাঘা'ত করলো ক্রীতিক। সঙ্গে সঙ্গে ছি'টকে মেঝেতে গিয়ে পরলো অরু। ঢিলে খোপা করা লম্বা চুলগুলো বাধন হারা হয়ে পরলো মূহুর্তেই। মেঝেতে বসে নিজের মুখটা দু-হাতে চেপে ধরে তীব্র কা'ন্না সংবরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে অরু। ক্রীতিককে দেখতে কি ভ'য়ান'কই না লাগছে। আগুনের শিখার মতো চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে আজ ওর খবর করে ছাড়বে ক্রীতিক। ক্রীতিক নিজের অন্য হাতাটা গুটাতে গুটাতে এগিয়ে এসে অরুকে বললো,
— এটা কেন দিলাম জানিস? আমার বউ হয়েও অন্যকারও সামনে বউ সেজে বসার স্পর্ধা দেখানোর জন্য।
অরুকে শক্ত হাতে টেনে তুলে ক্রীতিক ওর অন্যগালে থা'প্পড় দিতে উদ্যত হলে, অরু চোখ দুটো বন্ধ করে কাঁপতে কাঁপতে বললো,— ব্যাথা পাচ্ছি, কষ্ট হচ্ছে আমার, আর মা'রবেন না, আআমি ইচ্ছে

করে কিছু করিনি, আপা বলেছিল দেখতে এলেই বিয়ে হয়ে যায়না। তাছাড়া আপনিও তো আসেননি এই কদিন কি করতাম আমি? ক্রীতিক আর মা'রলো না ওকে, হাত নামিয়ে রেগেমেগে ওর গলাটা চেঁ'পে ধরে হিসহিসিয়ে বললো,
— একবার ফোন করতে পারতি না? আমি আদৌও বেঁচে আছি কি ম'রে গিয়েছি সেটা অন্তত খোঁজ নিতে পারতি। বিধবা হওয়ার এতো শখ?
অরু কাঁদতে কাঁদতে বললো,— কি বলছেন এসব, ফোন তো আমার কাছে ছিলোই না মা নিয়ে গেছে সেই কবে।
ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরুর গলা ছেড়ে দেয়। ফর্সা গলাটা আঙুলের চাপে র'ক্তিম হয়ে উঠেছে। ক্রীতিক তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে একবার নজর দিলো, তারপর অরুর বাহু ধরে ওকে কাছে নিয়ে এসে ওর সুন্দর কারুকাজ করা ব্লাউজের দুটো হাতাই একটানে ছি'ড়ে ফেললো ক্রীতিক। ওকে রেখে হঠাৎ ওর জামাকাপড় টেনে ছিঁ'ড়ছে দেখে অরু আঁতকে উঠে বললো,
— কি করছেন এটা?
ক্রীতিক অরুর চুলের গার্ডার, ঠোঁটের লিপস্টিক, চোখের কাজল সব কিছু নিজ হাত দিয়ে একেএকে লেপ্টে দিতে দিতে চোয়াল শক্ত করে বললো,— অন্যকারোর সামনে নিজের সৌন্দর্য বিলাতে কেন গেলি অরু? আমার রা'গ কমছে না কিছুতেই, তোকে মার'তেও পারছি না, কলিজায় লাগছে। উল্টে আমিই ব্যাথা পাচ্ছি, ইচ্ছেতো করছে নিজেকে নিজেই...

ক্রীতিক কথা শেষ করার আগেই নিজের নরম তুলতুলে হাত দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরলো অরু, অতঃপর ক্রীতিকের চোখে চেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়ালো।
অরুর এমন প্রতিক্রিয়ায় ক্রীতিকের কি না কি হলো কে জানে? ও হুট করেই অরুকে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে ওর লালচে হয়ে যাওয়া র'ক্তাক্ত গলায় স্ব-গতিতে মুখ ডুবিয়ে দিলো। ক্রীতিক জিদের বশবর্তী হয়ে ক্রো'ধটা একটু বেশিই ঢালছিল অরুর উপর, তবুও চোখ মুখ খিঁচে পুরোটাই সহ্য করে নিলো অরু। এই মিষ্টি যন্ত্রনাটুকু বোধ হয় ওর পাওনা ছিল।
ওদিকে বাইরে থেকে দরজা ধা'ক্কাতে ধা'ক্কাতে হয়রান হয়ে উঠেছেন আজমেরী শেখ। প্রচন্ড মানসিক চাপ আর হঠাৎ রেগে যাওয়ার ফলপ্রসূ শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে গিয়েছে তার। মাকে এভাবে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখে অনু তরিঘরি হয়ে মাকে বসার ঘরে নিয়ে এসে বললো,— তুমি একটু বসো মা, আমি ডাকছি ওদের।
প্রত্যয়ও বাইরেই দাড়িয়ে ছিল এতোক্ষণ, মাত্র অনুকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ও নিজেও এগিয়ে গেলো অনুর পিছু পিছু । যেতে যেতে পেছন থেকে প্রত্যয় বললো,
— এখন না ডাকলেই ভালো হবে ভাই খুব রেগে আছে।
প্রত্যয়ের কথায় অনু ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
— খবরদার আর একটাও কথা যদি বলেছেন, আপনি সব জানতেন, অথচ আমাকে বোকা ভেবে দিনের পর দিন ভালোবাসা দেখিয়ে আমার পিঠেই ছু'রি মে'রেছেন।
প্রত্যয় আশ্চর্য হয়ে বললো,
— আমি কি করলাম আজিব?

— আপনি আমাকে বলেননি কেন যে অরু এতোবড় একটা অন্যায় কাজ করেছে।
প্রত্যয় ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
— কি অন্যায় করেছে অরু?
অনু এবার হাটার গতি থামিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে বললো,— সৎ ভাইকে বিয়ে করা অন্যায় নয়? অরু নাহয় ছোট মানুষ, কিন্তু ক্রীতিক ভাইয়া? সে তো ছোট নয়, তাহলে তিনি এটা কিভাবে করলেন? কিসের প্র'তিশোধ নিতে উনি আমাদের মুখে এভাবে চুনকালি মাখালেন? আমার বোনের জীবনটা ন'ষ্ট করলেন?
প্রত্যয় এবার একটু রেগে গিয়ে বললো,
— ধর্মে, কিংবা আইনে ওদের বিয়ের সম্পূর্ণ বৈধতা আছে, তাহলে চুনকালির কথা কোথা থেকে আসছে অনু?
অনু তেতে উঠে বললো,
— আপনি সমাজ বোঝেন? সারাজীবন তো থেকেছেন অসামাজিক জায়ান ক্রীতিকের সাথে সাথে , তাহলে কি করে বুঝবেন সমাজের মর্ম? আজ বাদে কাল যখন পুরো সমাজ আমাদের পেছনে কথা বলবে,ছি ছি বুলি আওড়াবে, সবাই কানাঘুষা করবে, যে আজমেরী শেখ টাকার জন্য নিজের সৎ ছেলের গলায় নিজেরই মেয়েকে গছিয়ে দিয়েছেন। তখন আপনাদের মতো মানুষের গায়ে না লাগলেও সমাজের অ'পমান আর বিদ্রুপে আমাদের তিন মা মেয়ের ম'রে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কারণ সমাজে এক ঘরেদের কোনো স্থান নেই।
অনুর একনাগাড়ে বলা হাজারটা যুক্তির পাছে প্রত্যয় আর কোনো যুক্তিই খুঁজে পেলোনা অনুকে ঘায়েল করার জন্য, তাই ও সহসা

ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো নিঃশব্দে। আর অনু গটগটিয়ে এগিয়ে গেলো অরুর রুমের দিকে। দুইপাশে দুটো ডিভানের উপর পায়ে পা তুলে মুখোমুখি হয়ে বসে আছে আজমেরী শেখ আর জায়ান ক্রীতিক। অনেকক্ষণ ধরেই তাদের মাঝে পুরোদস্তুর নিরবতা বিরাজমান। ওদের থেকে একটু খানি দূরে দাড়িয়ে আছে অনু, প্রত্যয়, আর অরু। জামা কাপড় পাল্টে, ওড়না দিয়ে গলার কলার বোনগুলো খুব সাবধানে ঢেকে তবেই বেরিয়েছে অরু , নয়তো খানিকক্ষণ আগে পুরো গলায় ক্রীতিকের জিদের তোপে করা দাগগুলো সবার সামনে উন্মুক্ত বই হয়ে যাবে অনায়াসে। এই মূহুর্তে অরু সবার আড়ালে মাথা নুয়িয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওই মস্ত বড় অ'পরাধী, আর এখানে ওর বিচার সভা বসেছে। চারিদিকের থমথমে পরিবেশটাকে আরও খানিকটা গুমোট করে দিয়ে আজমেরী শেখ বললেন,— আমার মেয়েটাকে বলির পাঁঠা কেন বানালে ক্রীতিক?
ক্রীতিক ভাবলেশহীন কন্ঠে বললো,
— ফার্স্ট অফ অল আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি, বলির পাঁঠা বানায়নি, আর সেকেন্ডলি আই থিংক সি ইজ মাই হার্টবিট।
ক্রীতিকের কথায় চটে গেলেন আজমেরী শেখ, দাঁতে দাঁত চেপে বললো,
— মজা করছো আমার সাথে? নিজের সৎ বোনকে বিয়ে করতে লজ্জা করলো না তোমার?
ক্রীতিক বাঁকা হেসে নিজের ঠোঁট কামড়ে বললো,
— শুধু বিয়ে নয়, আরও অনেক কিছু করেছি , এই যে একটু আগেও করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন একটুও লজ্জা লাগেনি, কেনইবা

লজ্জা লাগবে বলুন? বউ হয় তো। যেই পুরুষ বউয়ের সামনে লজ্জা পায় সে আবার কেমন পুরুষ?
ক্রীতিকের কথায়, অনু আর আজমেরী শেখ দুজনই অ'গ্নি দৃষ্টিতে তাকালো অরুর পানে, যে এই মূহুর্তে মাথা নিচু করে ফোপাঁচ্ছে।— ওর দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, আমার বউকে আমি যেটা বলবো ও সেটাই করবে।
ক্রীতিকের কথায় আজমেরী শেখ চোখ ঘুরিয়ে বললেন,
— তুমি একা একা থেকে, আমেরিকান কালচারে বড় হয়ে একটা বেহায়া তৈরি হয়েছো। আর তুমি যেটাকে বিয়ে, ভালোবাসা বলছো না? এটা আসলে ভালোবাসাই নয়, ইটস ইওর অবসেশন, আনহেলদি অবসেশন, যার স্বীকার হয়েছে আমার মেয়েটা। নয়তো নিজের হাটুর বয়সী একটা মেয়েকে কে ভালোবাসে?
আজমেরী শেখের কথায় ক্রীতিক ঠোঁট উল্টে বাহবা দিয়ে বললো,
— আপনি সত্যিই জিনিয়াস, না হলে এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে বুঝে গেলেন জিনিসটা? আর আমি কখন বললাম যে আমি অরুকে ভালোবাসি? আমি ওর প্রতি অবসেশট আনহেলদি রকম অবসেশন। আর এটাই সত্যি।
এখন আপনি সেটা ভালোয় ভালোয় নেবেন, নাকি নেবেন না, সেটা একান্ত আপনার ব্যাপার, বাট আমার বউকে আমি চাই, ব্যাস।
কথাটা শেষ করে তরাগ করে দাঁড়িয়ে পরে ক্রীতিক।
অতঃপর অরুর দিকে একপলক তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্রীতিক বলে,— কিছুদিন সময় নিন, মন দিয়ে ভাবুন, বিয়েটা যেহেতু হয়েই গিয়েছে তারমানে, সি বিলোংস টু মি। তাই আপনাকে জোরজবর'দস্তি করে অরুকে কষ্ট দিতে চাইছি না।

তবে হ্যা আমার বউকে অন্যকারও সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন নয়তো আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। এন্ড আই মিন ইট। কথাটুকু শেষ করে গটগটিয়ে যায়গা ত্যাগ করে ক্রীতিক।
অরুর বিয়ে হয়ে গেছে, আজমেরী শেখ চাইলেও আর মেয়েকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকাতে পারবেননা,কোথাও বিয়ে দিতে পারবেন না, ক্রীতিক যা চাইবে তাই করতে হবে, ব্যাপারটা বুঝে আসতেই অকস্মাৎ ক্ষে'পে গেলেন তিনি, তৎক্ষনাৎ উঠে দাড়িয়ে টেনে এনে এলোপাথারি চ'ড় বসাতে লাগলেন মেয়ের দুইগালে। হঠাৎ এভাবে এলোপাথাড়ি থা'প্পড়ে অরুর মাথায় চ'ক্কর দিচ্ছে বারবার, ও কাঁদতে কাঁদতে মাকে আকুতি করে থামতে বলছে, তবুও আজমেরী শেখের হাত থামছে না, ওকে মা'রতে মা'রতে তিনি কাঠিন্য সুরে বললেন,— একটা নোংরা কীট জন্ম দিয়েছি আমি, বেহায়া, নির্লজ্জ,নষ্টা, নিজের থেকে বারো বছরের বড় সৎ ভাইয়ের সাথে শুতে একটুও লজ্জা করলো না তোর?
মায়ের কথায় অরু যেন আকাশ থেকে পরলো, কি বলছে মা এসব? তার আর জায়ান ক্রীতিকের সম্পর্ক তো এতোটাও গভীরে যায়নি, আর মা কিনা এতো নোংরা চিন্তা করে ফেলেছে?ছিহ!
কথাটা ভাবতেই ডুকরে কেঁদে উঠলো অরু। ওদিকে অরুর কান্নার আওয়াজ কানে পৌঁছতেই দরজার কাছে থেকে পুনরায় তরিৎ বেগে ফিরে এলো ক্রীতিক, হাতদুটো মুঠিবদ্ধ করে রেগেমেগে এদিকেই এগিয়ে আসছে ক্রীতিক, তা দেখে মায়ের হাত চালানোকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে দৌড়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে ক্রীতিকের পায়ের সামনে বসে পরলো অরু, ওর সামনে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,

— হাত জোর করছি, আর অশান্তি করবেন না, মা এমনিতেই অসুস্থ। এতো চাপ নিতে পারবেন না তিনি। আমি কথা দিচ্ছি আপনি ছাড়া এই জীবনে অন্য কোনো পুরুষের সামনে আর নিজেকে উপস্থাপন করবো না আমি। কোনোদিনও না। তাও আপনি ফিরে যান দয়া করে।
ক্রীতিক অরুর মুখোমুখি হয়ে বসে সকলের সামনে অরুর ঠোঁটে আর কপালে আলতো চুমু খেলো, তারপর ওর গালে হাত বুলিয়ে বললো,— তুই কেন পায়ে পরছিস জান? তোর জায়গাতো আমার বুকে।
ক্রীতিকের আদুরে আওয়াজে আবারও ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো অরু, ক্রীতিক নিজের অন্য হাতটা অরুর আরেকগালে ছুয়িয়ে ওর চোখের পানি মুছে দিতে দিতে বললো,
— বিশ্বাস কর অরু, তোর কষ্ট দেখে আমার হৃদয় ছি'ড়ে যাচ্ছে, একবার শুধু বল, তুই আমার সাথে যাবি, বাকিটা আমি বুঝে নেবো। প্লিজ বল।
অরু নিজের হাত দিয়ে ক্রীতিকের হাত ধরে বললো,
— একটু সময় দিন আমাকে, আমি আপা আর মাকে ঠিক বোঝাতে পারবো।
অরুর কথায় ক্রীতিকের সাভাবিক মুখশ্রীটা মূহুর্তেই কঠিন হয়ে উঠলো, ও অরুর দিকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ছু'ড়ে বললো,— মা আর আপা যদি তোর কাছে এতোটাই প্রয়োজনীয় হয়, আমার কথা যদি তোর কাছে এতোটাই অগ্রাহ্য মনে হয়, তাহলে আমিও তোকে আর জোর করবো না। আমার কাছে যেতে হবেনা তোকে, থাকতে

হবে না আমার সাথে। তবে হ্যা, আমাকে খুজে না পেলে আবার কান্না করিস না যেন। বিকজ আই হেইটস ইউর টিয়ারস বেইবি। নিজের কথা শেষ করে এক মূহুর্তও ফুরসত না দিয়ে বাসা থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলো ক্রীতিক।অরু এখনো অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে, ক্রীতিকের শরীরের মাতাল করা স্যান্ডাল উডের গন্ধটা এখনো চারিপাশে ম ম করছে। এইতো একটু আগেও দু’হাত দিয়ে অরুকে ছুঁয়েছিল সে, আর এখন কোথাও নেই সবকিছু কেমন শূন্য। গলার ভেতর দলা পাকিয়ে আছে অজস্র কান্নারা,যার দরুন নাকের ডগাটা বারবার ফুলে উঠছে অরুর। ওর ছোট্ট মস্তিষ্কটা এখনো ঠিক ধরতে পারছে না, একটু আগে কি বলে গেলো ক্রীতিক? কিইবা বোঝালো ওই কঠিন কথাগুলো দ্বারা?রাতের শেষ ভাগ চলমান, চারিদিক ছেয়ে আছে শুনশান নিস্তব্ধতায়। বিশাল আকাশ ছুঁই ছুঁই কংক্রিটের ভবনটার বেশির ভাগ এ্যাপার্টমেন্টেরই আলো নিভানো। ভবনের পেছনে অবস্থিত মানুষ যাতায়াতের সরু রাস্তায় গাড়ি তো দূরে থাক একটা সাইকেল চলারও টুংটাং আওয়াজ নেই পর্যন্ত,কি করেইবা থাকবে? এখনতো সবার ঘুমের সময়। রাতের এই শেষ প্রহরে মানুষ তো দূরে থাক রাত জাগা পাখিরাও বোধ হয় ঘুমিয়ে পরে ক্লান্তিতে।
আমেরিকার এই স্টেটে ভালোই বাঙালি চোখে পরে, তাই হয়তো এখানে নাইট ক্লাব, কিংবা বার এসব বিদেশি আমোদ ফূর্তির জোয়ার অতো বেশি নেই,তারউপর পাশেই হাসপাতাল। তাইতো চারিদিকে এমন শান্তি শান্তি পরিবেশ বিরাজমান।এই শুনশান নিস্তব্ধতা, মৃদু হিমেল হাওয়া,কিংবা শান্তিদায়ক পরিবেশ কোনোটাই উপভোগ করার লেশমাত্র আগ্রহ নেই অরুর মাঝে, আর না আছে

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নিভু নিভু চোখ দুটোর পাতায় একরত্তি ঘুম। সেই সন্ধ্যা বেলাতে টানা বারান্দায় এসে বসেছিল, আর এখন রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটতে চললো, তাও একই ভাবে হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে বারান্দায় বসে আছে অরু। আজকাল এটা ওর প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া গত কয়েকদিন যাবত নামমাত্র খাবার আর পানি খেয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে মেয়েটা। কি করেই বা খাবার মুখে তুলবে ও? মা, আপা কেউ ওর সাথে কথা বলাতো দূরে থাক ওর দিকে ভালো করে ফিরেও তাকায় না, চোখের সামনে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কেমন যেন সবার মাঝে উপস্থিত থেকেও নেই অরু। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে, হঠাৎ করেই ওর সুন্দর সাজানো গোছানো জীবনটা হয়ে উঠেছে দূর্বিষহ আর অসাভাবিক।এতোকিছুর পরেও যার জন্য এতোটা কষ্টসাধ্য করা, যার জন্য এতো ধৈর্য ধারণ করা, যার কথা ভেবে ভেবে এই নির্ঘুম রাত কাটানো, সে যদি অন্তত মনের খবরটা বুঝতো। কিন্তু না ক্রীতিক সেই যে রেগেমেগে চলে গেলো আজ প্রায় একসপ্তাহ হতে চললো, আর আসেনি সে।
ওদিকে মা আর আপার খুশির জন্য ঘরের বাইরে পা মারায়না অরু, কারণ ও জানে ঘরের চৌকাঠ মারালেই সবাই ভাববে অরু ক্রীতিকের কাছে গিয়েছে, তারপর শুরু হবে আরেক অশান্তি। অরু আর অশান্তি চায়না। ওর এইটুকু জীবন দিয়ে কম তো আর ধকল গেলোনা। গত একসপ্তাহের অনাহার আর অবহেলায় সুন্দর লাবন্যময় মুখটা হুট করেই কেমন ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে , না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখের কোটরে কালি জমেছে, লম্বা চুলগুলোতে চিরুনি চলেনি বেশ কয়েকদিন, শরীরের সাথে ফিটিং হয়ে থাকা

জামাটাও গলা থেকে নেমে যাচ্ছে নিঃসংকোচে। আর কিছুদিন এভাবে থাকলে অরুকে অ'সুস্থ হয়ে হসপিটালে ভর্তি হতে হবে নিশ্চিত। জীবনে প্রথমবার প্রেমে পরলে বুঝি এমনটাই হয়? তার দহনে হৃদয় ছি'ড়ে যায়। কিন্তু ওর এই বিভীষিকা ময় অবস্থা করে দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলো ক্রীতিক?
ভেবে পায়না অরু। দিনে অন্তত একশোবার এসে টানা বারান্দায় উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে কেউ আসলো কিনা দেখার উদ্দেশ্যে, কিন্ত না অরুর জন্য এখন আর কেউ আসেনা, বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েও থাকেনা কেউ। অরু কষ্ট পায়, ওর হৃদয়টা ব্যাথায় টনটন করে ওঠে, অভিমানি কা'ন্নায় ভিজে ওঠে চোখের পাতা। ক্রীতিকের উপর একরাশ অভিমান করে, অরু নিজেকেই নিজে কঠিন শর্ত এঁটে দিয়ে বলে,—- আর কখনো আপনার জন্য অপেক্ষা করবোনা আমি, আপনি একটা নিষ্ঠুর মানব, হৃদয়ে মায়া দয়া বলে কিছুই নেই আপনার। নয়তো কিভাবে পারছেন আমাকে না দেখে থাকতে? আপনার কি একটুও খারাপ লাগে না? আমাকে একটুও দেখতে ইচ্ছা করেনা? যদি দেখতে না-ই ইচ্ছে করে তাহলে আপনি কেন আমার মস্তিষ্কে ঘুরপাক করেন সারাক্ষণ? আমি খেতে পারছি না, ঘুমাতে পারছি, সাভাবিক হতে পারছি না, আপা- মাকে বুঝাতেও পারছি না, অথচ ভেতরটা আপনার দহনে পু'রে যাচ্ছে সারাক্ষণ। কেন এই দহন? উত্তরটা অন্তত দিয়ে যান।
অরুর অযাচিত অভিমানী মনের উত্তর দিয়ে যায়না কেউই, তাই পরক্ষণেই আবার রেগেমেগে অরু নিজেই বলে,
—যেহেতু আপনি আমার কথা ভাবেননা, তাই এবার থেকে আমিও আর আপনার কথা ভাববো না, একটুও ভাববো না। ঠিকই তো সে

যদি অরুকে না দেখে ভালো থাকতে পারে,এতোগুলা দিন চলে গেলো তাও যদি অরুকে একটাবার মনে না পরে, তবে অরুও থাকতে পারবে। কোনো সমস্যা নেই।
কিন্তু হায় প্রেমে পড়লে কি আর এতো শর্ত মনে থাকে? অষ্টাদশী যে ভীষণ ভাবে প্রেমে পড়েছে ওই উগ্র, বেপরোয়া লোকটার। তাইতো ফেটে পরা অভিমানের কয়েকমূহু পরেই নিজেকে নিজে দেওয়া শর্তফর্ত জলাঞ্জলি দিয়ে পুনরায় ছুটে যায় টানা বারান্দায়, অতঃপর সেই চেনা মুখ, চেনা কামুক চোখ, চেনা বাইক কিছুই দেখতে না পেয়ে তীব্র কা'ন্নার জোয়ারে সেখানেই বসে পরে অরু। প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, অরুর অপেক্ষা শেষ হয়না, তাকে একটাবার দেখার জন্য আনচান করতে থাকা হৃদয়টা অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে ঝিমিয়ে পরে তবুও আশা হারায়না অরু। ওর মনে হচ্ছে ক্রীতিক সেদিনের ঘটনায় একটু রেগে আছে, তাই হয়তো আসছে না, রাগ পরে গেলে ঠিক চলে আসবে। কিন্তু আর কত? ক্রীতিকের বি'ষের মতো জ্বালাময় প্রেম যে অরুর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যাচ্ছে। জীবনে প্রথমবার কারও সত্যিকারে প্রেমে পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, সবার অজান্তে একটু একটু করে নিজেই খু'ন করছে নিজেকে, শুধু মাত্র জায়ান ক্রীতিকের জন্য।সময় চলমান, দিনের আলো আর রাতের মাঝেই তার প্রবাহ বিদ্যমান l এই আসে তো এই যায়, দেখতে দেখতে চোখের পলকেই কেমন দশদিন পার হয়ে গেলো, তবুও দেখা মেলেনি ক্রীতিকের। এখন আর অভিমান হয়না অরুর বরং কষ্ট হয়, ভীষন কষ্ট।যেই কষ্টে ওর হৃদয়টা ক্রমাগত দুমরে মুচড়ে শেষ হয়ে যায়। অনু আর আজমেরী শেখ ভেবেই নিয়েছে যেহেতু দেখা সাক্ষাৎ, যোগাযোগ কিছুই নেই সেহেতু ধীরে

ধীরে সবকিছু থেকে বেরিয়ে আসবে অরু, একবার শুধু মনটা ঘুরে গেলেই কেল্লাফতে, তারপর সোজা ডি'ভোর্স। কিন্তু তারা তো আর জানেনা,ক্রীতিকের এই অনুপস্থিতি ছিল অরুর হৃদয়ে এক নিদারুণ প্রেমের জোয়ার। অষ্টাদশীর মনে দা'গ কেটে গিয়েছে এই দূরত্ব। জায়ান ক্রীতিক আর নিখিল দু'জনকে ভালোবাসার পার্থক্যটা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে সে। নিখিলের মাসের পর মাস অনুপস্থিতি কিংবা দূরত্ব কোনো কিছুই এভাবে পো'ড়ায় নি অরুকে। অথচ ক্রীতিকের এই দশদিনের দূরত্ব অরুকে বুঝিয়েছে সত্যিকারের ভালোবাসা কি?ক্রীতিকের হাস্কি কন্ঠস্বর, ক্রীতিকের রাগ,ক্রীতিকের হাসি, ক্রীতিকের ছোঁয়া, ক্রীতিকের শরীরের মাতাল করা সুবাস কিইনা মিস করে অরু? এখন আর ভাবতে ইচ্ছে হয়না ক্রীতিক কেন আসেনা, এখন তো অরুর নিজেরই সবকিছু ভে'ঙেচুরে ক্রীতিকের বুকে গিয়ে ঝাপিয়ে পরতে মন চায় অনায়েসে । হৃদয়টা যে এই দহন আর সহ্য করতে পারছে না। ক্রীতিকের ও কি ঠিক এই রকমই য'ন্ত্রনা হতো অরুর অনুপস্থিতিতে? ভাবছে অরু। মনেমনে বলছে,
—— আপনি তো এই দহন, এই য'ন্ত্রণা বোঝেন, তাহলে জেনেশুনে কেন আমাকে এই দহনে পো'ড়াচ্ছেন? কি দোষ করেছি আমি? আমার কষ্টে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হচ্ছে আপনার? হাসি পাচ্ছে খুব নিশ্চয়ই?হাহ, অষ্টাদশীর অবুঝ অভিমান.....
অলস দুপুরে খাওয়া নাওয়া ছেড়ে অরু যখন শুয়ে শুয়ে ক্রীতিকের কথায়ই ভাবছিল তখনই রুমে প্রবেশ করে অনু। আজকাল অনু আর অরুর মাঝে খুব একটা ভাব নেই, যতটুকু প্রয়োজন পরে

কেবল ততটুকুই কথা বলে ওরা। এর বাইরে চোখাচোখি হলেও কোনো এক অজানা অপরাধ বোধ ঘীরে ধরে দুজনকে।
অনু রুমে এসে দেখতে পায় অরু বিছানায় উপুর হয়ে ম’রার মতো পরে আছে, লম্বা সিল্কি বাঁধন হারা চুলো গুলো পুরো খাটে ছড়িয়ে, শরীরটা শুকিয়ে এইটুকুনি হয়ে গেছে মেয়েটার। কিসের এতো কষ্ট এই একরত্তি মেয়ের বুঝে পায়না অনু। হয়তো বুঝতে চায়ও না, তাই ও আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেকে উঠলো অরুকে,— অরু খেতে আয়।
অনুর ডাকে শুয়ে শুয়েই জবাব দিল অরু,
— রেখে দে, পরে খাবো।
অনু বলে,
— রেখে দিলে ঠান্ডা হয়ে যাবে, এখনই খেয়ে যা, তাছাড়া মা বাসায় নেই, কেউ কিছু বলবে না তোকে।
মা বাসায় নেই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো অরু। অতঃপর অনুর কাছে এগিয়ে এসে জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে একটু সাহস করে বললো,
— আপা আমার ফোনটা একটু দিবি? খুব বেশি না মাত্র পাঁচ মিনিট, তারপর আবার নিয়ে নিস, দে না আপা।
অনু গম্ভীর গলায় বললো,
— তোর ফোন মা লকারে ঢুকিয়ে তালা মে’রে রেখেছে, আমি কিভাবে দেবো?অরু একটু ভেবে বললো,
— তাহলে তোর টা দে।
অনু স্ব ভ্রু কুঞ্চিত করে শুধালো,
— কি করবি ফোন দিয়ে তুই?

অরু স্পষ্ট গলায় জবাব দিল,
— জায়ান ক্রীতিক কে কল করবো।
অরুর কথায় ঝাঁজিয়ে উঠলো অনু, ও তৎক্ষনাৎ অরুর দিকে ক্ষী'প্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তেঁতো গলায় বললো,
—- জায়ান ক্রীতিক, জায়ান ক্রীতিক বলা বন্ধ কর অরু, কানে লাগছে আমার। উনি আমাদের ভাই হয়।
অরু শক্ত গলায় বললো,
— উনি আমার স্বামী, ওনাকে আমি শুধু ক্রীতিক ও বলতে পারি, স্বামীকে ভাইয়া কেন বলতে যাবো?
— এরকম একটা সম্পর্কের কথা মুখে আনতে লজ্জা করেনা তোর? যেখানে মানুষটার বাবা আমাদের মায়ের প্রয়াত স্বামী।অনুর ধা'রালো কথায় অরু ঘাবড়ালো না, বরঞ্চ সোজাসাপটা ভাবে বললো,
— আমাদের বিয়ের সম্পূর্ণ বৈধতা আছে আপা, সমাজ যা বলে বলুক আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি, আমি আর পেছাতে পারবো না, তাহলে ম'রে যাবো।
অনু দাঁত কটমটিয়ে বললো,
— তাই বলে জায়ান ক্রীতিককে? মানুষটা একটা উগ্র মেজাজী লোক, ছেলে বুড়ো কাউকে এইটুকুনি রেসপেক্ট দেয়না, আমাদের মাকে তো দেয়ই না। তাকেই ভালোবাসতে হলো তোকে? আমি যতটুকু দেখেছি তোর সাথে তো ভালো ভাবে কথাও বলেনা সে, তাহলে ভালোবাসাটা এলো কোথা থেকে?
অনুর কথায় অরু মনেমনে হাসে, অতঃপর মনেমনেই বলে,

— জায়ান ক্রীতিক রহস্যময় মানব আপা, উনি সামনে যা দেখায় ভেতরে পুরোপুরি তার বিপরীত। একদিন সেটা তোরাও বুঝবি। অরু চুপ হয়ে আছে দেখে, অনু বিরক্তি জড়ানো গলায় বললো,
— শোন অরু ভালোবাসিস আর যাই করিস, তবে তোর এসব অ'স্বাস্থ্যকর ভালোবাসা আর পা'গলামিতে মায়ের শরীরের যদি এইটুকুনি ত্রুটি হয়েছে, কিংবা মা আবার অসুস্থ হয়েছে তাহলে তোর খবর আছে।
অরু সঙ্গে সঙ্গে বললো,
— তাহলে সম্পর্কটা মেনে নিলেই তো পারিস।
অরুর কথায় অনু তেতে উঠে বললো,
— জায়ান ক্রীতিককে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে বে'য়াদবের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছিস দেখছি। আর কি মেনে নেব? মেনে নেওয়ার মতো সম্পর্কে জড়িয়েছিস তুই?
—- তাহলে সেধে সেধে দরদ দেখাতে আসিস না, আমাকে একা ছেড়ে দে।
অনু দাঁত কিরমিরিয়ে বললো,— আমাকে আর মাকে না জানিয়ে বিয়ে করতে তোর একটুও বাঁধলো না অরু? আরও কি কি করেছিস কে জানে? নয়তো দামি ফোন, এতো বড় এ্যামাউন্টের চেক, এতোসব কোত্থেকে আসছে?
অনুর শেষ কথায় র'ক্ত চড়ে গেলো অরুর মস্তিষ্কে, সেদিন মা-ও একই কথা বলেছে, আর আজ আপাও আকারে ইঙ্গিতে বোঝালো, কি ভাবে ওকে এরা? আজ আর চুপ থাকলো না অরু, তেঁতো গলায় বললো,

— যদি করেও থাকি স্বামীর সাথে করেছি,পাপ তো আর করিনি। তাহলে কেন শুধু শুধু কথার আ'ঘাত করছিস আপা?
অরু মিথ্যে কিছু বলেনি, কথাটা ভেবেই দমে গেলো অনু। নিজেকে বারবার বসালো অরুর যায়গাতে, আজ প্রত্যয় যদি বৈধ ভাবে কিছুর দাবি করতো, তাহলে কি অনু ফিরিয়ে দিতো? কখনোই না। অরুর বেলায় কেন সবাই বিমাতাসূলভ আচরণ করছে তাহলে?ওর দো'ষটা কোথায়? ভালোইতো বেসেছে অপ'রাধ তো আর করেনি, তাহলে ওকে বারবার অপরা'ধীর মতো কেন জাজ করা হচ্ছে?
অনু চুপচাপ মলিন মুখে কিছু ভাবছে দেখে, অরু কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে শুতে শুতে বললো,
— তোর কিছু বলার না থাকলে যেতে পারিস, আমি ঘুমাবো।
অনু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নিরব পদধ্বনিতে বেরিয়ে যেতে যেতে ছোট্ট করে বললো,
— খেয়ে নিস।আজ বহুদিন বাদে আবারও ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়িয়ে রেডি হচ্ছে অরু। লম্বা চুলে চিরুনি টেনে টেনে চুলগুলো পরিপাটি করে নিচ্ছে সযত্নে। গায়ে পরেছে ডার্ক কফি কালারের ফতুয়া আর লংস্কার্ট। নিজেকে এতোটা গোছানোর পরেও চোখেমুখে কি বি'ষন্নতা মেয়েটার। ফর্সা উজ্জল চেহারাটা গত পনেরোটা দিনে কয়েক শেড ফর্সা হয়ে গিয়েছে, ফ্যাকাসে মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে র'ক্তশূণ্যতায় ভুগছে বহুদিন। নিজের মলিন চেহারাটার দিকে খানিকক্ষণ একই ভাবে তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিলো অরু, তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার হাতরে একটা লিপ বাম বের করে আলতো করে লাগিয়ে নিলো দু ঠোঁটে। এখন একটু ভালো লাগছে

দেখতে। নিজেকে আরও একবার আয়নায় দেখে নিয়ে পার্স ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে রুমে থেকে বেরিয়ে গেলো অরু।
আজ পনেরোটা দিন হলো ক্রীতিকের দেখা নেই, কোনো খোঁজ নেই।এখনতো অরুর অভিমানের চেয়ে চিন্তা বেশি হচ্ছে, কোথায় গেলো লোকটা? কেনইবা অরুর থেকে নিজেকে এতোটা আড়াল করে রেখেছে? তাহলে কি সে আর অরুকে চায়না? কিন্তু ক্রীতিক যে বলেছিল,— তুই শুধু বিয়েটা কর,বাকিটা জীবন আমি সামলে নেবো।
এই তার সামলানো? এসব কথা ভেবেই গত রাতে অরু ঠিক করেছে ও ভার্সিটিতে যাবে। তাতে মা যা বলার বলুক, আর যা করার করে নিক। এভাবে চার দেওয়ালের মাঝে বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকলে নির্ঘাত দম আটকে ম'রে যাবে ও। তার চেয়ে একটা রি'স্ক নিয়ে ক্রীতিকের সামনা সামনি হওয়াটা বেশি জরুরি। এভাবে ভালোবাসার লোভ দেখিয়ে কষ্ট দেওয়ার মানে কি? জানতে চায় অরু। সেই উদ্দেশ্যেই সকাল সকাল আজ বেরিয়েছে ও। মা অফিসে, আপা বোধ হয় নিজের রুমে সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে পা টিপেটিপে এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে অরু।ভার্সিটি ক্যাম্পাসে পা রাখতেই, সবার আগে আজও দেখা হয়ে গেল সায়নীর সাথে। অরু সায়নীকে দেখে ঠোঁটের কোনে কিঞ্চিৎ হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে আসতেই, সায়নী অরুকে দেখা মাত্রই মুখ ঘুরিয়ে সোজা হাটা দিলো বিপরীত দিকে। সায়নীর এমন বিরুপ আচরণে ঘাবড়ালো না অরু, কারন সেদিন অরুও সায়নীর সাথে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেনি, তারউপর সায়নী জেনে গিয়েছে ওর পছন্দের জেকে স্যার আর কেউ নয় সয়ং অরুর হাসবেন্ড।

এতোকিছু একসাথে জানার পর একটু আধটু রাগ হওয়ারই কথা, তাই সায়নীর পেছন পেছন এগিয়ে আসতে আসতে অরু বললো,
— সায়নী দাঁড়াও, একটাবার আমার কথা শোনো প্লিইইজ। খুব বিপ'দে পরেছি আমি।
অরুর শেষ কথায় পা থেমে গেলো সায়নীর, ও চোখ মুখ শক্ত করে বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাড়াতেই আশ্চর্য হয়ে গেলো। আপনাআপনি হাত চলে গেলো মুখের উপর, মনেমনে বললো,
—এ কি হাল হয়েছে গুলুমুলু মেয়েটার? এতোটা শুকিয়ে গিয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে বাতাসের ধা'ক্কায় উড়ে যাবে এক্ষুনি।
সায়নী দাড়িয়ে পরতেই অরু ছুটে এসে বললো,— রাগ করে আছো এখনো?
সায়নী বেশ ম্যাচিউরড, অরুর থেকে বয়সেও কয়েক বছরের সিনিয়রই হবে, স্কলারশীপ নিয়ে এসেছে কিইনা। তাই রাগ হলেও প্রকাশ করার প্রশ্নই ওঠে না, অগত্যাই সায়নী বললো,
— রাগ করিনি, কিন্তু এ কি হাল হয়েছে তোমার, এতোটা শুকিয়ে গেলে কি করে?
অরু সায়নীর কথাটা পুরোপুরি এরিয়ে গিয়ে বললো,
— বলবো, সব বলবো, তার আগে তুমি প্লিজ আমাকে বলো তোমার জেকে স্যার কোথায়?
অরুর কথায় সায়নী তাচ্ছিল্যের হাসি হেঁসে বললো,— নাইস জোক অরু, তোমার হাসবেন্ড অথচ খোজ জিজ্ঞেস করছো আমার কাছে? ইজন্ট ইট ফানি?
অরু না সূচক মাথা নাড়িয়ে অনুনয় করে বললো,

— আমি মজা করার অবস্থায় নেই সায়নী, প্লিজ বলো, আচ্ছা থাক তোমার বলতে হবেনা, আরেকটু পরেই তো ওনার ক্লাস আমই বরং খুজে নেবো।
অরুকে হয়রান আর ব্যতিগ্রস্থ দেখাচ্ছে, চোখে মুখে দারুণ কষ্টের ছাপ, ওর এমন অবস্থা দেখে মন টললো সায়নীর, ও আস্তে করে বললো,
— কি হয়েছে বলোতো তোমাদের? জেকে স্যার তো প্রায় পনেরো দিন ধরে ভার্সিটিতে আসেন না, আর তুমিতো তারও আগে থেকে।
সায়নীর কথায় অরুর ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে গেলো, ও মনেমনে বললো,
— কি বলছে সায়নী এটা? ক্রীতিক পনেরো দিন ধরে ভার্সিটিতে আসেন না? কিন্তু উনিতো কাজে ফাঁকি দেওয়ার লোক নন, আমিতো অন্তত দেখিনি। তাহলে হুট করে কোথায় হারিয়ে গেলেন উনি?
অরু ভাবছে দেখে সায়নী বললো,— তোমার সাথে কথা হয় নি স্যারের? এখন আবার বলোনা যে নিজের হাসবেন্ডের কোনো খোঁজই জানোনা তুমি।
অরু একটা শুষ্ক ঢোক গিলে অপ’রাধীর সুরে বললো,
— ঠিকই বলেছো তুমি সায়নী, আমি ওনার কোনো খোঁজই জানিনা।
পরক্ষণেই কিছু একটা মাথায় আসতেই চট করে অরু বলে ওঠে,
—তোমার ফোনটা একটু দাওনা সায়নী। সায়নী হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে ফোন বাড়িয়ে দেয় অরুর হাতে, ফোন পেয়ে অরু কাঁপা হাতে মুখস্ত নাম্বারটা ফোনে তুলে ডায়াল করলো তাতে। কিন্তু এবারও অরুকে নিরাশ করে দিয়ে কলটা কেটে গেলো। কেটে গেলো

বললে ভুল হবে, ফোনটা পুরো পুরি বন্ধ। নিভু নিভু শেষ আশা টুকুও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াতে অরুর বুক কাঁপছে, কা'ন্নারা দলা পাকিয়ে আটঁকে আছে গলায়। বাকশক্তি ক্ষীণ, জিহ্বাটা অযথাই তেঁতো হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পরেছে, অরু একবার দুবার করে উদভ্রান্তের মতো অসংখ্য বার ডায়াল করলো ক্রীতিকের নাম্বারে, কিন্তু প্রতেয়কবার সেই একই বিরক্তিকর কথা,

— দা নাম্বার ইজ ক্লোজড।

অরুকে এমন দিশেহারা হতে দেখে সায়নী শুধালো,

— আর ইউ ওকে?

অরু এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে বিড়বিড়িয়ে বললো,

—ঠিক নেই, কিচ্ছু ঠিক নেই, আমি আমার মন, মস্তিষ্ক, হৃদয় কিচ্ছু ঠিক নেই ।ভার্সিটি ক্লাস সব কিছু সিকোয় তুলে শেষমেশ অরু গিয়েছিল ক্রীতিকের বাড়িতে, কিন্তু না বাড়িটাও ফাঁকা পরে আছে, কোথাও নেই ক্রীতিক। অগত্যাই একবুক ব্যাথা আর অভিমান নিয়ে ঘরে ফিরেছে অরু। ক্রীতিকের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এসেছে পুরোদস্তুর।

প্রায় দু'ঘন্টার রাস্তা জার্নি করে এসে বড্ড ক্লান্ত লাগছে অরুর, তারউপর সারাদিন না খেয়ে আছে। কিন্তু এখন খাওয়া যাবেনা, চুপচাপ রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হবে, নয়তো মা দেখলে হাজারটা প্রশ্ন তুলবে, কড়া কথা শোনাবে।সেই ভেবে সদর দরজা খুলে চুপচাপ মাথা নুয়িয়ে নিজের রুমে পা বাড়ালো অরু।কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলোনা, রুমে প্রবেশের আগেই বাধ সাধলেন আজমেরী শেখ, গলা উঁচিয়ে বললেন,— ন'ষ্টামো করতে গিয়েছিলে বুঝি?

অরু হকচকিয়ে উঠে পেছনে তাকিয়ে বললো,

— কি বলছো মা?
আজমেরী শেখ দুহাত বুকের উপর ভাজ করে সাবলীল ভঙ্গিতে বললেন,
— আমার কাছে খবর আছে তুমি জায়ান ক্রীতিকের বাড়িতে গিয়েছিলে।
মায়ের কথায় অরু চো’রের মতো মাথাটা নিচু করে ফেললো, অতঃপর বললো,
—- আসলে মা, তুমি যা ভাবছো তা নয়।
— একদম চুপ করো। তোমার নোংরা মুখে মা ডাকবে না আমাকে।
অরু কান্না জড়িত কন্ঠে চেচিয়ে উঠে বললো,
— বারবার নোংরা নোংরা কেন বলছো? কি নোংরামো করেছি আমি?
আজমেরী শেখ কাঠকাঠ গলায় বললেন,— সেটা মুখে বলতে হবে?
ওদিকে মা মেয়ের তর্ক শুনে রুম থেকে বেড়িয়ে এলো অনু। অরুকে এভাবে মায়ের সাথে ঝাঁজিয়ে কথা বলতে দেখে চটে গেলো সে, অগত্যাই অরুর দিকে এগিয়ে এসে বললো,
— আবার শুরু করেছিস অশান্তি? তুই চাইছিস টা কি অরু? আমাদের মা ম’রে যাক?
অনুর কথায় অরু আহত সুরে বললো,
— কি বলছিস আপা?
— তাহলে সকালে উঠে কোথায় গিয়েছিলি, আর সন্ধ্যা বেলাতেই বা কেন ফিরলি?
অরু কাঁদতে কাঁদতে বললো,

— তোরা আমার সাথে কেন এমন করছিস? কেন এতো মানসিক য’ন্ত্রনা দিচ্ছিস? আমি ঠিক নেই আপা ভেতর থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছি, প্লিজ আমাকে একটু সস্থি দে। আমাকে একটু বাঁচতে দে।
অনু চোয়াল শক্ত করে বললো,
— তুই আগে আমাদের বাঁচতে দে, মাকে সুস্থ থাকতে দে।
অরু বললো,— কি করতে বলছিস আমাকে?
অনু স্পষ্ট আওয়াজে বললো,
— ক্রীতিক ভাইয়াকে নিজের স্বামী দাবি করা বন্ধ কর। ভুলে যা তাকে।
অরু কিছুক্ষন নিরব চোখে মা আর আপার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কাঠকাঠ আওয়াজে বললো,
— পারবোনা।
সঙ্গে সঙ্গে ওর নরম তুলতুলে গালে এসে হা’মলে পরলো আরও একখানা চ’ড়ের আ’ঘাত। অরু এটার জন্যই অপেক্ষা করছিল, এটা খাওয়া হয়ে গেলে রুমে চলে যাবে সে। তাইই করলো, গালে হাত দিয়ে টলমলে চোখের পানিটুকু আড়ালে মুছে রুমে গিয়ে সশব্দে দরজা লাগিয়ে দিলো।
অরু চলে গেলে অনুও নিজের রুমে গিয়ে দরজায় কপাট আটে,ওর মনটা যে খুব ভালো তাতো নয়, বরং অতিরিক্ত খারাপ, গত পনেরোটা দিন ধরে প্রত্যয়ের সাথে কথা নেই। অনু না হয় রাগ করেছে, তাই বলে প্রত্যয় কি একটাবার কল দিয়ে ওর খোজ নেবেনা? এ কেমন ভালোবাসা তার?প্রত্যয়ের উপর গভীর রাগটা যখন গভীরতর হয়েছিল, তখনই ঘটে গিয়েছে এই ঘটনা, অনু নিজের একরাশ রাগ আর বিরক্তি অজান্তেই ঝেড়ে ফেলেছে ছোট্ট

বোনটার উপর। এটা অবশ্য নতুন নয়, অনু বরাবরই রগচটা স্বভাবের, হুটহাট রাগ উঠে যায় ওর, আর তার বহিঃপ্রকাশটাও হয় ভুল ভাবে। সেই ভুল বহিঃপ্রকাশের বেশির ভাগ স্বীকারই হয় অরু। কিন্তু আজ একটু বেশি বেশি হয়ে গিয়েছে। অনু নিজেই সেটা এখন বুঝতে পারছে, অনুশোচনা, অপরাধ বোধে গলা ধরে আসছে ওর। ও পরেছে মহা দোটানায় একদিকে বোনের অসহায়ত্ব আর অন্যদিকে মায়ের স্বাস্থ্য। কোন দিকে যাবে অনু?তাও মা কিংবা জায়ান ক্রীতিক কেউ যদি একটু নরম মনের হতো, দুইজনই হচ্ছে টিট ফর ট্যাট। কেউ কাউকে এক বিন্দু ছাড় দিতে রাজি নয়, ওদিকে এসবের মাঝে পিষে যাচ্ছে, ছোট্ট অরুটা। অরুর জন্য এবার সত্যি সত্যি ভেতরটা পু'ড়তে লাগলো অনুর। অনু যখন অরুকে নিয়ে একরাশ অনুশোচনায় ডুবে আছে, ঠিক তখনই অযত্নে পরে থাকা ফোনটা বেজে ওঠে তারস্বরে।
অনু স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখতে পায় প্রত্যয়ের নাম্বার। এতোগুলা দিন বাদে আজ হঠাৎ প্রত্যয়ের কল পেয়ে ভেতরে ভেতরে খুশির হিড়িক পরে গেলো অনুর, ও তৎক্ষনাৎ ফোনটা রিসিভ করে, কানে ধরে চুপ হয়ে রইল। এপাশ থেকে সারাশব্দ না পেয়ে ওপাশ থেকে প্রত্যয় ডাকলো,
— হ্যালো, অনু শুনতে পাচ্ছো?
— হুম বলুন।
অনুর নরমসরম আওয়াজ পেয়ে প্রত্যয়ের ও বোধ হয় ভালো লাগলো, ও খানিকটা আদুরে গলায় বললো,— কেমন আছো সোনা?
অনু অভিমানী সুরে বললো,

— কে খোঁজ নেয়?
প্রত্যয় নিজের অপরাধ টুকু স্বীকার করে বললো,
— খুব বেশি ঝামেলায় ছিলাম, সব বলবো তোমায়, তার আগে ফোনটা অরুকে দাও।
অনু ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
— অরুর সাথে কি কাজ আপনার?
প্রত্যয় শাসন করার সুরে বললো,
— দিতে বলেছি দাও। ওর সাথে জরুরি কথা আছে।
অনু নাক ফুলিয়ে বললো,
— আপনি এতোদিন পরে বকা দেওয়ার জন্য কল দিয়েছেন তাইনা?প্রত্যয় বুঝলো অনুর অভিমানের ঘট পূর্ণ। প্রেমিক হিসেবে প্রত্যয়ের ও তো একটা দায়িত্ব আছে প্রেমিকার রাগ ভাঙানোর, কিন্তু এখন তো হাতে সময় নেই। তাই ও খুব বেশি আদর দেখিয়ে বললো,
— আমার জান, আমার প্রান, আমার অনু, প্লিজ কথা শোনো,ফোনটা অরুকে দাও, তারপর আমি তোমার সাথেই সারারাত কথা বলবো প্রমিস, আজ আর ঘুমাতে দেবোনা তোমায়।
প্রত্যয়ের এমন আহ্লাদী কথায় গদোগদো হয়ে উঠলো অনু, এতোক্ষণের রাগ ঢাগ সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো মূহুর্তেই, ও লাজুক সুরে বললো,
— ঠিক আছে এটাই কিন্তু শেষ বার, তারপর আর এরকম রিকোয়েস্ট করবেন না, মা জানলে খুব চটে যাবে আমার উপর।
প্রত্যয় সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
— আচ্ছা করবো না এবার দাও।

— একটু ধরুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।সেই সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাত অবধি একনাগাড়ে শাওয়ার ছেড়ে ভিজেছে অরু। নিজের সাথে নিজে না পেরে চিৎকার করে কেঁদেছে, শরীরের ব্যাথা, মনের ব্যাথা, সব কিছুতে জর্জরিত হয়ে আছে ও। হাত পা গুলো পানিতে ভিজে আরও ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত ভেজার ফলসরুপ, ঠান্ডায় তিরতিরিয়ে কাপছে ছোট্ট শরীরটা। একপর্যায়ে নিজের ভ্রম ছুটে গেলে জামাকাপড় পাল্টে মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে নিজেই ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসে অরু।
ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় টানা বারান্দায়, আকাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন, দূর আকাশে গুড়গুড়িয়ে মেঘ ডাকছে, হয়তো আজ রাতেও ঝড় আসবে। প্রচন্ড ঝড়ে ভে'ঙে যাবে গাছপালা। সেই তীব্র ঝ'ড়ের তান্ডব ও হয়তোবা অরুর মনের ঝ'ড়ের কাছে সামান্য মাত্র। তখনও কংক্রিটের ভবনের কোনো একতলা থেকে ভেসে আসছে বেসুরো গানের লাইন,” রাত চান্দের আলো ঝড়ে বন্ধু তোমারও ঘরে
হায়, আলো যে জ্বলে না আমি একলা আন্ধারে
বন্ধু বিব্রতি যে না আমি খুঁজি তোমারে....
তুমি কোথায় আছো, কোথায়
দেইখা যাও আমারে......”
গানের লাইন গুলো খুব মন দিয়ে শুনতে শুনতেই, অস্ফুটে অরু বললো,
আমার থেকে লুকিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি জায়ান ক্রীতিক? তুমিহীন আমিটা যে বিদ্ধস্ত, বিমূর্ষ, আর পা'গলপারা সেটা তোমার অদেখাই রয়ে গেলো। সেদিন তোমার বলে যাওয়া প্রতিটি কথার

মর্ম আজ হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি আমি। নিজের অজান্তেই তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে পরেছি আজ, এখন তোমাকে যে আমার চাইই চাই, কিন্তু তুমিতো নেই, কোথাও নেই। আর কত পো'ড়াবে আমায় বলো? কত বোঝাবে তোমার মর্ম? পারছিনা তো আর, এবার তো ফিরে এসো??

অরুর নিদারুণ ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে রুমে প্রবেশ করে অনু। রুমের মাঝে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে অরু এগিয়ে গিয়ে তোয়ালে দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বললো,

— খাবোনা আমি, যেতে পারিস।

অনু বললো,

— খেতে ডাকার জন্য আসিনি, প্রত্যয় সাহেব কথা বলতে চাইছে।

অরু একদিকের চুল অন্যদিকে এনে পুনরায় তোয়ালে চালাতে চালাতে বললো,

— এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

— বলেছে ইম্পর্টেন্ট কিছু, হয়তোবা ক্রীতিক ভাইয়া....

অনু কথাটুকু শেষ করার আগেই ওর হাত থেকে ছো মে'রে ফোনটা নিয়ে কানে ধরলো অরু, এই মূহুর্তে খুব ভয় করছে ওর, শরীরটা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে, কোনোমতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে, কাঁপা গলায় অরু বললো,— হ্যালো!

অরুর প্রতিউত্তরে ওপাশ থেকে প্রত্যয় আস্তে করে বললো,

— ভাই নিচে অপেক্ষা করছে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে, ধপ করে মেঝেতে বসে পরলো অরু। দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরলো নিজের ক্রন্ধনরত মুখ। কাঁদতে কাঁদতে ক্রমাগত পা দুটোকে বাচ্চাদের

মতো মেঝেতে ছুড়তে লাগলো ও। হুট করেই হৃদয়ের ব্যথাটা তরতর করে বেড়ে গিয়েছে । অভিমানের ঝড়ে মস্তিষ্কটা ব্লক হয়ে আছে। আজ আবারও কতগুলো দিনপর পেটের মধ্যে প্রজাপতি উড়ছে ।ইচ্ছেতো করছে চিৎকার করে কাঁদতে। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। তাই মেঝেতে বসেই দু'হাতে মুখ চেপে ধরে চোখের পানি ফেলছে অরু। অরুকে এভাবে কাঁদতে দেখে অনু আর কথা বাড়ায়না ফোন হাতে নিয়ে চুপচাপ রুম ত্যাগ করে।অরু যখন নিচে আসে তখন রাত বারোটা কি একটা। চারিদিকের তীব্র ঝড়োহাওয়া আর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ভবন থেকে বেড়িয়ে আসে অরু। ওর পরনে ফ্রক আর লেগিংস, ভেজা চুলগুলো পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে কোনোমতে আটকানো। মাথার উপর বড় করে ঘোমটা টানা। নিচে এসে ক্রীতিক কিংবা তার বাইক কোনোটাই দেখতে পেলোনা অরু, শুনশান নিরব রাস্তায় শুধু মাত্র চোখে পরলো একটা ব্ল্যাক মার্সিডিজ। অরু জানে এটা কার গাড়ি তাই ও আর দেরি করলো না, ছুটে চলে গেলো গাড়ির সামনে।এতোগুলা দিন পর ক্রীতিককে দেখার উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছে ওর, সেই সাথে হৃদয় ভার হওয়া অভিমান তো আছেই। অরু গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই একটানে দরজা খুলে দিলো ক্রীতিক।
ক্রীতিককে দেখে হা করে তাকিয়ে আছে অরু, পরনের অফ হোয়াইট ব্র্যান্ডেট শার্ট আর ওভার সাইজ ব্ল্যাক ডেনিম দুটোই অগোছালো। কপাল জুড়ে আঁটোসাটো ব্যান্ডেজ, লম্বা ঘাড় ছুঁই ছুঁই চুল গুলো আরও খানিকটা লম্বা হয়ে কপালে পরে আছে। বাম হাতের পিঠে এখনো ক্যানোলা লাগানো।

অরু জানেনা ক্রীতিকের কেন এই হাল, তবে কিছুটা আঁচ করতে পেরে ডুকরে কেঁদে উঠে অরু বললো,— এখনো বলবেন মাইনর বাইক এ’ক্সি’ডেন্ট তাইতো?
ক্রীতিক মৃদু হেসে বললো,
— বেশি না মাত্র তিনদিন সে’ন্সলেস ছিলাম। পায়ের ফ্যাকচারের কারনে হাটতে পারিনি, আজই ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে, আর আমি হসপিটাল থেকে সোজা তোর কাছে চলে এসেছি।
ক্রীতিকের কথা শুনে অরুর অপ’রাধবোধ তুঙ্গে উঠে যায়, ও কত কিই না ভেবেছিল এই কদিন। অথচ ক্রীতিক কিনা হসপিটালে শুয়ে শুয়ে মৃ’ত্যুর সাথে পাঞ্জা লরছিল?নিজের উপর বড্ড রাগ হলো অরুর। অরুকে কাঁদতে দেখে ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে বললো,
— ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদবি নাতো একদম, তোর কান্না বিশ্রী লাগে। আমি কি ম’রে গেছি?আশ্চর্য!
অরু নাক টেনে বললো,
— লাগলে লাগুক।
ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নরম সুরে বললো,— বুকে আয়।
ক্রীতিক কি বললো সেটা শোনার জন্য অরু এবার চোখ তুলে তাকালো,
অরু এখনো প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,
— বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাঁধানোর শখ হয়েছে? তাহলে ভিজতে থাক আমি গেলাম।
অরুর তৎক্ষনাৎ বলে ওঠে,
— আমায় রেখে কোথায় যাবেন আপনি?

অরুর কথায় ক্রীতিক গভীর চোখে তাকালে, অরু পুনরায় মিনমিনিয়ে বললো,
— না মানে বৃষ্টি নেমেছে তাই।
ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বললো,
— কতক্ষণ ধরে বলছি বুকে আয় কথা শুনিস আমার?
— হ্যা??ক্রীতিক আর কথা বাড়ালো না অরুর হাতে হ্যাচঁকা টান দিয়ে ওকে গাড়ি মধ্যে নিয়ে শব্দ করে গাড়ির ডোর লক করে দিলো। সেই সাথে নিভিয়ে দিলো অবশিষ্ট আলোটুকুও। তবুও সোডিয়ামের টিমটিমে আলোয় ক্রীতিকের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাঁচ্ছে অরু। যে এই মূহুর্তে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ওর দিকেই মাতাল চাহনীতে চেয়ে আছে। ক্রীতিক কে হুট করে এতোদিন পর এতোটা কাছে দেখতে পেয়ে কেন যেন এই মূহুর্তে প্রচন্ড কা'ন্না পাচ্ছে অরুর। খুশির কান্না। ও কাঁপা হাতে ক্রীতিকের গালে হাত ছুয়িয়ে মনে মনে বললো,
—- আপনাকে দেখার তৃষ্ণায় বুক ফেটে ম'রেই যাচ্ছিলাম, তারপর হুট করেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে আবারও ফিরে এলেন আপনি,ধরা দিলেন হৃদয়ে, পুনর্জীবিত করে দিলেন আমার আত্মাটাকে। এ কোন মায়ায় বাঁধা পরেছি আমি?
অরু চুপচাপ ক্রীতিকের গালে হাত রেখে চোখের জল ফেলছে দেখে ক্রীতিক হিসহিসিয়ে বললো,— আই মিসড ইউ বেইবি। তোর কি একবারও মনে পরেনি আমাকে?
অরু কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না, তাই উল্টো প্রশ্ন করে বললো,
— আপনি ঠিক আছেন? হাতে এখনে ক্যানোলা লাগানো কেন?

ক্রীতিক নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বললো,
— ডিসচার্জ করার আগেই বেরিয়ে এসেছি তো তাই খোলা হয়নি।
অরু পটু গিন্নির মতো করে ওকে শা'সিয়ে বললো,
— এটা কি ঠিক হলো? আপনি এখনো ইনজুরড।
ক্রীতিক অরুর গলায় নাক ঘষতে ঘষতে বললো,
— তোর কাছে ফিরে এসেছি, এবার ঠিক হয়ে যাবো।
অরু চোখ দুটো বুজে কাঁপা গলায় বললো,
— আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আসবেননা।
ক্রীতিক অরুর ওড়নাটা সরিয়ে ওর লম্বা চুলগুলো একটানে খুলে দিয়ে, চুলের সুঘ্রাণে মুখ ডোবাতে ডোবাতে বললো,— তোকে ছাড়া বাঁচতে পারলে তো।
ক্রীতিকের কথায় অরু মৃদু হাসে, তীব্র ঝরের শেষে প্রকৃতি যেমন পুরোপুরি শান্ত হয়ে যায় ওর হৃদয়টাও এই মূহুর্তে পুরোপুরি শান্ত। বাইরে বৃষ্টি ছাপিয়ে ঝড় শুরু হয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠছে আকাশ। এমন ঝড়োহাওয়ার মধ্যে গাড়িতে বসে থাকতে ভ'য় করছে অরুর। অথচ ক্রীতিক সেই যে গলায় মুখ ডুবিয়েছে এখনো ছাড়েনি। অরু এখন ব্যাথায় জর্জরিত হয়ে চোখ বুজে সহ্য করছে সবকিছু। এক পর্যায়ে গগন কাঁপানো আওয়াজে হুট করেই বাজ পড়লো ধরনীতে, সঙ্গে সঙ্গে অরু ঘুরে এসে ক্রীতিককে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।
অরু জড়িয়ে ধরাতে এতোক্ষণে ক্রীতিক পার্থক্যটা বুঝতে পারলো, অরু শুকিয়ে গিয়েছে অনেকটা। শরীরটা এইটুকুনি হয়ে গিয়েছে। ক্রীতিক এবার ভ্রু কুঞ্চিত করে অরুকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে চোয়াল শক্ত করে বললো,

— এভাবে শুকিয়ে গিয়েছিস কেন? কি হয়েছে এই কদিনে তোর সাথে?
ক্রীতিকের কথায় অরু মাথা নিচু করে ঠোঁট উল্টে ফুপিয়ে উঠলো, অভিমানী কা’ন্নায় ভে’ঙে পড়ে অস্পষ্ট সুরে বললো,— কি হয়েছে সেটাতো আপনি ভালো বলতে পারবেন। সেদিন কি কি সব কঠিন কথা বলে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন, আর এলেন না, দিন যায়, রাত যায় আপনি আর আসেন না। আমিতো ভেবেছি আপনি আমাকে শা’স্তি দেওয়ার জন্য লুকিয়ে আছেন কোথাও।আমার বুঝি কষ্ট হয়নি?
অরুর কথায় ক্রীতিক যেন আকাশ থেকে পরলো, ও অরুর গাল দুটো হাতে চেপে ধরে চোয়াল শক্ত করে বললো,
— মাত্র কয়েকটা দিন আমি আসি নি বলে তুই খাওয়া বন্ধ করে দিবি?এটা কেমন কথা? আমাকে কি তোর এতোটাই লেইম মনে হয়? যাকে না দেখে একমূহুর্ত থাকতে পারিনা, তাকে শা’স্তি দেওয়ার জন্য নিজেই লুকিয়ে থাকবো?এই তোর বুদ্ধি? নিজেকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার সাহস কোথায় পেলি তুই? মাত্র পনেরো দিনে ভুলে গেলি, শরীরটা তোর হলেও আত্মাটা যে আমার?
অরু কাঁদতে কাঁদতে অভিমানের পসরা সাজিয়ে বসেছে, একেএকে উগরে দিচ্ছে সব, ক্রীতিকের শার্টের বোতাম খুঁটতে খুঁটতে হেঁচকি তুলে অরু বললো,—- শুধু আসেন নি তাতো নয়, একটা খোজ নেই, খবর নেই, আপনার ফোনটাও বন্ধ। আপনি জানেন আমি আপনার বাড়িতে পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে এসেছি কিন্তু আপনাকে পাইনি।
অরুর কথায় ক্রীতিক বিরক্ত ভঙ্গিতে বললো,

— খুজেছিস ভালো কথা, তাই বলে নাওয়া,খাওয়া বন্ধ করে এভাবে শুকিয়ে যেতে হবে?এখন আমি আদর করবো কোথায়? পিচ্চি মেয়েদের বিয়ে করলে এই হয়, পরিস্থিতি বোঝে না, কিচ্ছুনা, সারাক্ষণ ইমোশনাল হয়ে থাকে।
অরু কাঁদতে কাঁদতে ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
— ইমোশন যদি বুঝবেনই না, তাহলে করেছেন কেন পিচ্চি মেয়েদের বিয়ে? আমিকি বিয়ে করার জন্য নাচছিলাম?
অরুর এতোএতো কান্নাকাটি সহ্য হলোনা ক্রীতিকের, ও অরুকে এক ঝটকায় টেনে এনে নিজের বাহুতে আগলে ধরে এবার নরম সুরে বললো,— আমি কল্পনাও করিনি যে তুই আমার জন্য এতোটা ডেস্পারেট হয়ে যাবি, তাহলে জ্ঞান ফেরার পরে অন্তত অর্ণব কে দিয়ে খবর পাঠাতাম। কিন্তু তাই বলে তুই এভাবে নিজেকে কষ্ট দিবি?
অরুর উত্তর নেই, ওতো ফোপাঁতে ফোপাঁতে নাকের পানি চোখের পানি দিয়ে ক্রীতিকের শার্ট ভিজিয়ে ফেলেছে। ক্রীতিক সেসবে গুরুত্ব না দিয়ে পুনরায় বললো,
— এখানে আর থাকতে হবেনা, চল আমার সাথে।
অরু এবার মাথা তুলে শুধালো,
—কোথায় যাবো?
— তোর হাসবেন্ডের বাড়ি আছে, সেখানেই।
অরু আঁতকে উঠে বললো,
—কি বলছেন, এই ঝড়ের মাঝে এতো রাতে?
— যাবি কি না?

অরু কিছু বলছে না দেখে ক্রীতিক গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বললো,— আমিওবা তোকে কেন জিজ্ঞেস করছি অযথা? তোকে ছাড়া আমি আর থাকতে পারবো না, সো না এর কোনো অপশন নেই।
ক্রীতিকের কান্ডে অরু হতভম্ব। কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না ওর, তাই একবার সবটা বোঝার জন্য নিজের দিকে তাকালো অরু,
পায়ে স্যান্ডেল, গায়ের ওড়নাটা ব্যাকসিটে পরে আছে, পরনে ফ্রক। বাইরে তুমুল বর্ষন। পেছনে ফেলে এসেছে মা আর আপাকে। পাশে বসে দক্ষ হাতে ড্রাইভ করছে সব চেয়ে কাছের মানুষটা আর অরু এভাবেই তার সাথে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে। অবশ্য জায়ান ক্রীতিকের দ্বারা সবই সম্ভব।
সানফ্রান্সিসকো ছাড়িয়ে শহরতলীর সেই নির্জন শুনশান রাস্তায় আসতেই ঘটলো বিপত্তি, গাছপালা ভে'ঙে পরে পুরো রাস্তা ব্লক হয়ে আছে। সামনে যাওয়ার কোনোরূপ উপায়ান্তর নেই। অগত্যাই ক্রীতিক ব্রেক কষলো সেখানেই। পুরো রাস্তা জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার,বিদ্যুতের লাইনচ্যুত হওয়ায় রোড লাইট গুলোও নিভে আছে। চারিদিকে মানুষতো দূরে থাক একটা মশা-মাছিরও আনাগোনা নেই। অথচ বাইরে ঝুম বৃষ্টি। এমন একটা পরিবেশে আটকে পরে অরুর গা ছমছম করছে। তাই ও মুখ কাঁচুমাচু করে বললো,— এবার কি হবে?
ক্রীতিক একবার অরুর ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবলো, অতঃপর গমগমে আওয়াজে বললো,
— অরু ব্যাকসিটে চল।

অরু অবাক সুরে শুধালো,
— কেন?
— আমি বলেছি তাই।
অরু উদ্বিগ্ন হয়ে বললো,
— এভাবে জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস কেন ফেলছেন?আপনার কি শরীর খারাপ করছে?
ক্রীতিক বললো,
— হ্যা, চল এবার।
অরু আর কিইবা করবে, ক্রীতিকের শরীর খারাপ লাগছে দেখে তারাহুরো করে বেরিয়ে গেইট খুলে ব্যাক সিটে গিয়ে বসলো।
ক্রীতিক ও অন্য সাইড থেকে এসে গেইট লাগিয়ে দিলো।
ক্রীতিক এসেছে দেখে অরু নিজের জামা কাপড় থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়া বাদ দিয়ে ওর ব্যান্ডেজ করা কপালে হাত ছুয়িয়ে বললো,— কোথায় খারাপ লাগছে দেখি?
ক্রীতিক তৎক্ষনাৎ কোনোকিছুর পূর্বাভাস না দিয়েই, অরুর হাতটা পিছনে চেপে ধরে নিজের ঠোঁট দিয়ে ওর ওষ্ঠাধর দখল করে।
ক্রীতিকের এহেন কান্ডে অরু বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ও নড়তে পারছে না, ক্রীতিককে ছাড়াতেও পারছে না, ওদিকে দম আটকে আসছে।
একটা দীর্ঘ আর গভীর চুম্বন শেষে ক্রীতিক অরুর ঘাড়টা চেপে ধরে নিজের কাছে টেনে এনে হিসহিসিয়ে বললো,
— হার্টবিট, একবার তুমি বলে আপন সুরে ডাক, তোর মুখে তুমি শোনার ইচ্ছে আমার বহু বছরের।

অরুর চোখ বন্ধ, কোনোমতে জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো,
— আপনিতো আমার অনেক বড়।
ক্রীতিক হাস্কিস্বরে বললো,— সো হোয়াট? আমি তোর সব থেকে আপন, আরেকটু পরে আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকবে না, তাহলে আমাকে ডাকবি নাতো কাকে ডাকবি?
অরু এই মূহুর্তে পুরোপুরি ক্রীতিকের বশবর্তী, কোন এক অদৃশ্য জা'দুবলে ক্রীতিক ওকে পুরোপুরি নিজের আয়ত্তে নিয়ে ফেলেছে, তাই অরুও কাঁপা কাঁপা কন্ঠে বললো,
— আপনাকেই বলবো।
— তাহলে বল।
অরু পরাজিত সৈনিকের মতো ছোট্ট করে উচ্চারণ করলো,
—ততুমি!
ক্রীতিক পুনরায় বললো,— চোখ খুলে, আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট আওয়াজে বল।
অরু এবার তাই করলো,শুষ্ক ঢোক গিলে ক্রীতিকের চোখে চোখ রেখে রিনরিনিয়ে বললো,
— তুমি।
অরুর লজ্জারাঙা মুখ দেখে ক্রীতিক নিঃশব্দে হাসলো, অতঃপর একটানে অরুকে নিজের কোলে বসিয়ে দিয়ে হাস্কিস্বরে বললো,
— আই নিড ইউ অরু, আই ডেস্পারেটলি নিড ইউ রাইট নাও। হবি না আমার?
ক্রীতিকের কথা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরে ভ্রম ছুটে গেলো অরুর,মূহুর্তেই ভ'য়ের চোটে আ'ত্মাটা শুকিয়ে গেলো ওর।

ক্রমাগত ছটফট করতে লাগলো ক্রীতিকের কোল থেকে নামার জন্য। ক্রীতিক একহাতে অরুকে চেপে ধরে অন্যহাত দিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বিরক্ত হয়ে বললো,
— কি হয়েছে? ছটফট করছিস কেন?মা'রছি তোকে? আদরই তো করবো।
অরু আতঙ্কিত সুরে বললো,— আমার ভ'য় করছে।
অরু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক নিজের হাতে লাগানো ক্যানোলাটা একটানে বের করে ফেললো, তৎক্ষনাৎ ফিনকি দিয়ে র'ক্ত বেরোলো ওর হাত থেকে। অরু সেখানটায় চেপে ধরে বললো,
— কি করছেন?
— এটা ডিস্টার্ব করছে।
অরু এবার কম্পিত কন্ঠে বললো,
— আপনি কি চাইছেন?
ক্রীতিক পুনরায় নিজের শার্টের বোতামে হাত চালাতে চালাতে অরুর দিকে ঘোর লাগা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
— তোকে।
ক্রীতিকের নেশালো আওয়াজে কেঁপে উঠলো অরু, তবুও অনেকটা সাহস সঞ্চার করে মিনমিনিয়ে বললো,
— আমার ভ'য় করে আপনাকে।
ক্রীতিক একটানে অরুকে নিজের বুকের উপর ফেলে দিয়ে বললো,— ভয় কেন?
অরু কাঁদো কাঁদো সুরে বললো,
— আপনি ডার্ক রোম্যান্স শোনেন সবসময়।

ক্রীতিক অরুর লম্বা চুলগুলো একপাশে সরিয়ে ধীরে ধীরে ওর জামার চেইনটা খুলতে খুলতে বললো,
— দিস ইজ ইউর ফার্স্ট টাইম, সো আ'ল বি জেন্টাল বেইবি.....
অরুর মাঝে ডুবে যেতে যেতে ক্রীতিকের মন বলছে,
"ঝলসানো রাতে,এ পো'ড়া বরাতে
তুমি আমার অন্ধকার..
আর রোশনাই....... "মধ্যরাতে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে বর্ষনে মুখরিত ধরনী,সেই সাথে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তাল ঝড়ো হাওয়ায় চারিদিক কনকনে ঠান্ডা। ঝড়ের তান্ডব কমে এসেছে একটু একটু, অথচ অন্ধকারের মাঝে আটকে পড়া ব্ল্যাক মার্সিডিজটা এখনো সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে। ধরনীতে বহমান ঝড়ের গতিবেগ কমে এলেও দুটো হৃদয়ে এলোপাথারি বইতে থাকে উত্তাল জলো'চ্ছ্বাসের তান্ডব আজ রাতে বোধ হয় কমবে না আর। ক্রীতিকের অবাধ্য আচরণে ইতিমধ্যে অরু বুঝতে পেরেছে,আজ রাতটা ওর জন্য দীর্ঘতম হতে চলেছে, সেই সাথে নিদ্রাহীন।একটি অপার্থিব সকাল, সেই শুরুর দিন গুলোর মতোই নিরিবিলি, নিস্তব্ধ,শুনশান পরিবেশ, দীর্ঘ ঝড়ের তান্ডব আর ঝুম বর্ষাকে সর্বেসর্বা বিদায় জানিয়ে, খুব ভোরেই সূর্য কীরন উঁকি দিয়েছে পূব আকাশে। দক্ষিণ জানালার কাঁচ গলিয়ে সেই একফালি মিঠে রোদ এসে আঁচড়ে পরছে অত্যাধুনিক ধাঁচের রুমটিতে। অরুর কাছে এই পরিবেশ, এই আবহাওয়া নতুন কিছু নয়, বরঞ্চ অনেকদিনের অভ্যেস।তবে আজ এই নিস্তব্ধতার সাথে প্রথমবার নতুন করে যা যোগ হয়েছে,তা হলো চন্দন কাঠের মন মাতানো সুঘ্রাণ। রুমের আনাচে-কানাচেতে ম ম করছে এই চেনা পরিচিত পুরুষালী সুঘ্রাণ। বিছানা, বালিশ,

কুশন,কম্ফোর্টার সব কিছুই বেশ স্নিগ্ধ লাগছে চনমনে এই স্যান্ডল উড পারফিউম আর মাস্কি সৌরভে। অরুর মনে হচ্ছে গত পনেরোটা দিনের নির্ঘুম রাতের কাছে আজকের এই আড়ামদায়ক ঘুমটুকু অমৃত সম। আর ও এই অমৃত সম ঘুমটুকু পুরোপুরি আহরন করতে চায় নির্বিঘ্নে, তাইতো ঘুমের মাঝেই অরুর হৃদয়ে গিয়ে ঠেকছে নিদারুন এই সুগন্ধ,বারংবার মনে হচ্ছে এতোটা আরামের ঘুম কোনোদিন ঘুমায়নি ও।
ব্যথাতুর শরীরটাকে একটুখানি নাড়িয়ে চারিয়ে আরও খানিকটা সময়ধরে নতুন এই অনুভূতির সাথে পরিচিত হবে বলে ভেলভেটের মতো মসৃন কুশনের মাঝে মুখ দাবিয়ে, মিঠে রোদটুকু পিঠে পিছলে দিয়ে অন্য দিকে ঘুরে শুলো অরু। এলোমেলো হয়ে ঘুমানোর দরুন ওর রেসমের মতো সিল্কি চুল গুলো ছড়িয়ে পরে আছে পুরো বিছানা জুড়ে। সেগুলোকে গোছানোর কোনোরুপ প্রয়াস না চালিয়েই আবারও ঘুমের দেশে পারি জমালো অরু। তবে অরুর এই অমৃতসম আরামদায়ক ঘুম গাঢ় হতে পারলো না খুব একটা, তার আগেই কানে ভেসে এলো ইলেকট্রনিক্স মেশিনের ভসস ভসস আওয়াজ।এহেন আওয়াজে ঘুমের মাঝেই বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে গেলো অরুর।কোথা থেকে এই আওয়াজের উৎস তা ঠাওর করার জন্য খানিকটা চোখ ও খুললো বটে। ঘুমের রেশ কাটিয়ে আড়মোড়া ভে’ঙে চোখের পাতা খুলতেই সফেদ রঙা সিলিং এর দিকে চোখ গিয়ে ঠেকলো ওর, যা দেখে হুট করেই বড্ড অপরিচিত লাগছে অরুর। কিন্তু চারপাশের স্নিগ্ধ সুঘ্রাণটা বড়োই পরিচিত। অগত্যাই ঘুমের ঘোর কাটিয়ে চারিদিকে চোখ ঘোরালো ও, সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পরে যায় ঝড় আর বৃষ্টিস্নাত নির্ঘুম বিগত রাতের

কথা। কিছু ঘোর লাগানো মূহুর্ত আর তারপর জায়ান ক্রীতিকের অনেকটা কাছে চলে আসা। সব কিছুই সুস্পষ্ট অরুর মস্তিষ্কে এখন। সেসব কথা মাথায় আসতেই তীব্র লজ্জায় চোখদুটো খিঁচে বন্ধ করে নিলো অরু।

অরু যখন ঘনিষ্ঠ মূহুর্তের কথাই ভাবছিল, ততক্ষনে ছক্কা লাগার মতো আরও একটা প্রশ্ন এসে মাথায় লাগলো ওর, মনেমনে ভাবলো,— তখন তো গাড়িতে ছিলাম, তাহলে এখন কোথায়?

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কানে ভেসে এলো সেই বিরক্তিকর ভসস ভসস আওয়াজ। আওয়াজের উৎস খোজার জন্য অরু এবার চোখ ঘুরিয়ে চাইলো ওয়াল মিরর এর দিকে, দেখলো ওর থেকে খানিকটা দূরত্বে আয়নার সামনে দাড়িয়ে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ব্যাকব্রাশ করে করে চুল শোকাচ্ছে ক্রীতিক, পরনে তার ট্রাউজার সেট। ক্রীতিককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অরু তরিৎ গতিতে কম্ফোর্টারের মধ্যে মুখ লুকালো,মুখ ঢাকা দিতে দিতেই নিচু স্বরে বিড়বিড়ালো,

— নির্লজ্জ,নির্দয় লোক।

ওদিকে অরুর নড়নচড়ন টের পেয়ে ক্রীতিক হাতের কাজ চালাতে চালাতেই ডাকলো,— মিসেস অরোরা জায়ান!

ক্রীতিকের এহেন সম্মোধনে, কম্ফোর্টারের মাঝে বসেই উষ্ণতায় ছেয়ে গেলো অরুর সর্বাঙ্গ। লজ্জারা র’ক্তিম হয়ে ঘীরে ধরেছে মুখ মন্ডলের আনাচে কানাচে, সেই সাথে যোগ হয়েছে তলপেটের উড়ন্ত প্রজাপতি। লজ্জায় রাঙা হয়ে অরু যখন ঠোঁট কামড়ে মটকা মে’রে পরেছিল, তখনই পুনরায় ডেকে ওঠে ক্রীতিক,আয়নার দিকে তাকিয়েই বলে,

— এটা আপনার বাপের বাড়ি নয় মিসেস জায়ান, এটা আপনার স্বামীর বাড়ি, তাই বারোটা পর্যন্ত ঘুমানোর বদ অভ্যেস দূর করতে হবে, কজ আপনার হাসবেন্ডকে সকাল সকাল ভার্সিটি যেতে হয়। ক্রীতিকের এহেন খোঁচামা'রা কথায় অরু আর শুয়ে থাকতে পারলো না, অগত্যাই মুখ কাচুমাচু করে উঠে বসে পিঠ ঠেকিয়ে দিলো খাটের ব্যাক স্ট্যান্ডে। ওর পরনে এখনো ক্রীতিকের সফেদ রঙা শার্ট। সামনের দিকে শার্টের দুটো বোতাম খোলা, অরু নিজের অপটু হাতে বোতাম দুটো লাগিয়ে, একটু একটু চোখ উঁচিয়ে ক্রীতিককে দেখলো অতঃপর মিনমিনিয়ে শুধালো,
— বাসায় কি করে এলাম?
ক্রীতিক এদিকে না ঘুরেই জবাব দিল,
— ভুতে নিয়ে এসেছে তোকে।অরু জানে ক্রীতিক মজা করছে, কিন্তু ওর কেন যেন কথা বলতে বেশ অস্বস্তি হচ্ছে, কথা তো দূরে থাক ক্রীতিকের চোখের দিকে তাকাতেও লজ্জা লাগছে এই মূহুর্তে। শান্ত,সাবলীল চোখ দুটোর দিকে তাকালেই বারংবার মনে পরে যাচ্ছে কাল রাতের অশান্ত, আর ঘোর লাগানো দৃষ্টিপাতের কথা, যা অরু উপেক্ষা করতে পারেনি,নিজের অজান্তেই আপন করে নিয়েছিল সেই মিষ্টি যন্ত্রনাটুকু। অথচ এখন সেসব কথা মনে পরলেই লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে অরুর। অরু চুপ হয়ে আছে দেখে ক্রীতিক বললো,
— ঘুম না হলে,ঘুমাতে পারিস, ডিস্টার্ব করবো না।
অরু না সূচক মাথা নাড়িয়ে মিনমিনিয়ে বললো,
— আপনার মাথার ব্যান্ডেজ কোথায়?
ক্রীতিক বললো,— ফ্রেশ হওয়ার ছিল তাই খুলে ফেলেছি।

অরু ভ্রু কুঁচকে বললো,
— তাই বলে পুরো ব্যন্ডেজ খুলে ফেলতে হবে? আপনি এতো ছন্নছাড়া কেন বলুন তো?
অরুর কথায় ক্রীতিক এবার ঘুরে তাকিয়ে চোখ ছোট ছোট করে বললো,
— কাল পুরোপুরি স্বামীর অধিকার দিয়েছিস, আর আজই শাসন করার স্টার্ট?
ক্রীতিকের কথা গায়ে না মেখে অরু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, ক্রীতিকের শার্টটা ওর হাঁটুতে গিয়ে ঠেকেছে, অরু সেটাকে টেনে হিঁচড়ে আরও খানিকটা নিচে নামাতে নামাতে বললো,
— এখানে তো আমার কোনো জামা কাপড় নেই কি পরবো?
ক্রীতিক বললো,— ক্লজেট ভর্তি জামাকাপড় আছে যা খুশি পর গিয়ে।
— ওগুলো তো আপনার, আমি কিভাবে পরবো?
ক্রীতিক এবার ম্যাকবুক নিয়ে ডিভানের উপর বসতে বসতে বললো,
— আমার যা, তাই তোর। এখন থেকে আমার ড্রেসই পরবি তুই,সব তোর।
ক্রীতিকের কথায় অরু দাঁত দিয়ে নখ কামড়াতে কামড়াতে বিড়বিড়িয়ে বললো,
— আশ্চর্য লোক, এমনভাবে বলছে যেন সে ইনার ও পরে।
— পরার দরকার নেই।

ক্রীতিকের রাশভারি আওয়াজ কানে ভেসে আসতেই, অরু হকচকিয়ে বললো,
— কিহহ!
ক্রীতিক এবার ম্যাকবুক থেকে চোখ সরিয়ে অরুর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট আওয়াজে বললো,— আমার সামনে ইনার পরার দরকার নেই। তোকে এসব ছাড়াই সুন্দর লাগে।
ওর এহেন কথায় অরু দ্রুত মাথা নিচু করে ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে বললো,
— নির্লজ্জ, বেহায়া লোক মুখে লাগাম নেই কোনো। ওনার লজ্জা নাই থাকতে পারে, তাই বলে কি আমারও নেই?
তবে ওয়াশরুমে আর ঢোকা হলো না অরুর, তার আগেই ওর চোখ আটকালো পায়ের নুপুরে, পা দুটো এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নুপুরজোড়া ভালোমতো পরখ করে অস্ফুটেই অরু বললো,
— অদ্ভুত তো আমার নুপুর গুলো এমন সোনালী রঙের হয়ে গেলো কেন?
অরুর কথায় ক্রীতিক ডিভান ছেড়ে উঠে এসে ওর সামনে দাড়িয়ে দু'পকেটে হাত গুঁজে বললো,
— আর কবে বড় হবি অরু? তুই বড় হতে-হতে তো আমি বুড়ো হয়ে যাবো।
অরু মাথা তুলে করুন সুরে বললো,— কেন কি হয়েছে?
ক্রীতিক ঠোঁট কামড়ে বললো,
— না কিছু না,আমার পিচ্চি বউ সোনা আর রুপার পার্থক্য বোঝেনা তাই বললাম আর কি। অবশ্য দোষটা আমারই।
মনেমনে বললো,

— যখন পরিয়েছিলাম তখন তুই ঘুমের ঘোরে ছিলি, জানার কথাও নয়।
ক্রীতিকের কথায় মন খারাপ হয়ে গেলো অরুর,ও মুখ কালো করে শুধালো,
— এভাবে কেন বলছেন কি করেছি আমি?
অরুর কথায় ক্রীতিক বললো,
— কিছু করিস নি, হেটে যেতে পারবি নাকি হেল্প করবো?
আবার সেই লাগাম ছাড়া কথাবার্তা, ক্রীতিকের কথায় অরু দ্রুত ওই যায়গা থেকে প্রস্থান করতে করতে দাঁত কিরমিরিয়ে বলে,
— পারবো আমি, সরুন তো।দিনের দ্বিপ্রহর চলমান। সকালের মিঠে রোদ টুকু মিয়িয়ে গিয়ে কালো মেঘের আড়ালে ঠায় নিয়েছে সূয্যি মামা। যার দরুন অত্যাধুনিক হলরুমটা অন্ধকারে ছেয়ে আছে। একটা লম্বা হট শাওয়ার শেষে অন্ধকারের মাঝেই পা টিপে টিপে হলরুমে এসেছে অরু। নিচে নেমে কোনোকিছু না ভেবেই সবার আগে স্ফটিকের সবগুলো আলো জ্বালিয়েছে ও। এবার সবকিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। ফিকে হয়ে যাওয়া নিরিবিলি রুমে উপস্থিতি মাত্র দুজনার, অরু পাশ ঘুরে কাউচের দিকে তাকিয়ে দেখলো ক্রীতিক কাউচে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে বসে বাইক রেচিং গেইম খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অরু ক্রীতিককে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো,অযাচিত মনটা লাফিয়ে উঠে শুধালো ,
— আপনি কি করে থাকেন এতোটা একা একা? কষ্ট হয়না বুঝি?
অরু সেই তখন থেকে করুন চাহনিতে তাকিয়ে আছে দেখে গেইমটা পজ করে কানের হেডফোন নামিয়ে, ক্রীতিক বললো,— এভাবে

ডিস্ট্রাক্ট করতে মন চাইলে রুমে চল,আমিও একটু মন ভরে দেখি তোকে। কাল রাতে মন ভরেনি।
ক্রীতিকের কথা গায়ে না মেখে অরু কিচেনের দিকে যেতে যেতে বললো,
— খিদে পেয়েছে, কি রান্না করা যায় বলুন তো?
অরু কিচেনের দিকে দু'কদম এগিয়ে যেতেই কঠিন সুরে বাধ সাধে ক্রীতিক, ওকে আর এক পাও বাড়াতে না দিয়ে ক্রীতিক বলে,
— খবরদার কিচেনে যাবি না তুই।
ক্রীতিকের কথায় অরু ভ্রু কুঞ্চিত করে পেছনে তাকিয়ে শুধালো,
— কিচেনে না গেলে রান্না কিভাবে করবো?
ক্রীতিক মনিটরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,
— ফ্রীজে স্যালাড, আর পাস্তা রাখা আছে গরম করে খেয়ে নে।
অরু নাক সিকোয় তুলে বললো,— আমি এসব খেতে পারিনা, তাছাড়া রান্না করলে সমস্যাটা কোথায়?আগেও তো রান্না করতাম, আর আপনি খেতেনও। তাহলে এখন কিসের অসুবিধা আপনার?
ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে বললো,
— আগের কথা ভুলে যা,এখানে তোকে রান্না করার জন্য আনিনি আমি।
অরু কিচেন কাউন্টারে হেলান দিয়ে, দুহাত বুকে ভাজ করে বললো,
— তাহলে কেন এনেছেন শুনি?
অরুর শেষ কথাতে ক্রীতিক মনিটরের গেইমটা পজ করে রিমোট কন্ট্রোলটা কাউচের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাড়ালো, অতঃপর ট্রাউজারের পকেটে হাত গুঁজে অন্যহাত দিয়ে লম্বা ঘাড় ছুঁই ছুঁই চুল

গুলো ব্যাকব্রাশ করতে করতে অরুর দিকে এগিয়ে এসে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে হাস্কি আওয়াজে বললো,
— দুটো রিজন, এক ইচ্ছে মতো আদর করার জন্য, আর দুই আমাকে অভ্যেসে পরিনত করার জন্য।
ক্রীতিকের কথায়, অরু খানিকটা ভরকে যায়, অযাচিত লজ্জায় মিয়িয়ে যাওয়া মুখখানা হুট করেই আড়াল করে দাড়িয়ে পরে উল্টো দিকে। ক্রীতিক সেভাবেই দাড়িয়ে অরুর আগাগোড়া পরখ করতে থাকে। ক্রীতিকের ক্লজেটে কালোর সমাহার, সেখান থেকেই বেছে নিয়ে একটা একটা ব্ল্যাক ওভারসাইজ টিশার্ট, আর একটা থ্রী কোয়ার্টার পরেছে অরু। ক্রীতিকের থ্রী কোয়ার্টার অরুর ফুল প্যান্টে পরিনত হয়েছে। দেখতেও বেশ কিউট লাগছে ওকে। অরুকে ভালোমতো পরখ করে ওর কনের কাছে মুখ নিয়ে ক্রীতিক হিসহিসিয়ে বলে ওঠে,— আমার ড্রেসে তোকে মারাত্মক লাগছে হার্টবিট। এখন থেকে আমার সামনে অন্যকিছু পরার দরকার নেই।
অন্য কিছু পরার দরকার নেই মানে? এ আবার কেমন কথা?অরু কি এখন সারাজীবন এসব দানবীয় সাইজের পোশাক আশাক পরে ঘুরে বেড়াবে নাকি আশ্চর্য? মানুষ কি বলবে? কথাটা ভেবেই বিরক্ত হলো অরু, বিরক্তিতে চিড়বিড়িয়ে পেছনে ঘুরে ক্রীতিককে হালকা ধাক্কা মে’রে সরিয়ে কাউচে গিয়ে বসতে বসতে বললো,
— খিদে পেয়েছেতো আমার,সালাদ খেতে পারবোনা, অন্যকিছুর ব্যবস্থা করুন।
ক্রীতিক পকেট থেকে ফোন বের করে, সেটা স্ক্রল করতে করতে বললো,

— আমি রান্না টান্না করতে পারিনা, কি খাবি বল অর্ডার করে দিচ্ছি।
অরু একঝলক ক্রীতিককে পরখ করে কিছু একটা ভেবে বললো,
— বলছি তার আগে এদিকে আসুন। ওর অকস্মাৎ সম্মোধনে ক্রীতিক ফোন থেকে নজর সরিয়ে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
— সিরিয়াসলি তুই আমাকে কাছে ডাকছিস? তাহলে কাল এতো কান্নাকা'টি করার কি মানে ছিল অরু?
আবার সেই ভুলভাল কথা টানছে ক্রীতিক, এই লোকের মাথায় আর কিছু নেই নাকি? ভেবে পায়না অরু, এমনকি ভাবার জন্য খুচরো সময় নষ্ট ও করেনা, বরং উঠে এসে কোনোরূপ কসরত না দেখিয়েই অনেকটা অধিকার নিয়ে নিজের হাত দিয়ে ক্রীতিকের খরখরে পুরুষালি হাতটা ধরে ওকে টেনে এনে কাউচে বসালো। অরুর কান্ডে ক্রীতিক আর বাঁধ সাধলো না, উল্টে কাউচে গা এলিয়ে দিয়ে অরুকে নিজের কোলে বসিয়ে নরম সুরে শুধালো,
— এখানে কেন?অরু পেছনে ঘুরে ক্রীতিকের ক্ষতস্থানে আলতো হাত বুলিয়ে বললো,
— আপনার এখন হসপিটালের বেডে শুয়ে শুয়ে ফ্রুটস খাওয়া উচিৎ, তা না করে আমাকে কথা দিয়ে পিষ্ট করছেন। কতটা গভীর ক্ষত হয়েছে একবারও খেয়াল করেছেন?
ক্রীতিক অরুর কথার দু'পয়সা তোয়াক্কা না করে নিজ হাত দিয়ে ওর গালদুটো চেপে ধরে বললো,
— কতবার বলেছি আমাকে তুমি করে বলবি, কথা শুনিস না কেন?

অরু ক্রীতিকের চোখ থেকে অন্য দিকে চোখ সরিয়ে অস্পষ্ট সুরে বললো,
— পারবোনা,আমার লজ্জা লাগে ভীষন।
ক্রীতিক ঠোঁট বাকিয়ে হেসে বললো,— এখনো লজ্জা?
অরু ক্রীতিককে কিভাবে বোঝাবে কাল রাতের কথা উঠলেই কান দিয়ে ধোয়া বের হয় ওর, ভীষণ লজ্জায় শিহরণ জেগে ওঠে ক্ষুদ্র নারীদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সেই শিহরণে কেঁপে ওঠে অষ্টাদশীর হৃদয়,মন সবকিছু। হৃদয়ের সাথে কম্পিত হয় ধনুকের মতো বাঁকানো নারী শরীরটাও।
পরমূহুর্তেই নিজেকে সামলে নেয় অরু, শখের পুরুষের সেই শিহরণ জাগানো প্রথম ছোঁয়াকে পুরোপুরি মাথা থেকে সরিয়ে, মনের মাঝে জেঁকে বসে তার প্রতি একটুকরো ব্যাথাতুর ভালোবাসা, বারবার মনে হতে থাকে,
—- কেন আপনি এতো একা জায়ান ক্রীতিক? আপনার জীবনটা অন্যসবার মতো সাভাবিক নয় কেন? এতোগুলা বছর কি করেই বা একা একা বেঁচে আছেন আপনি? আমি কি আপনার জীবনের এই একাকিত্ব আদৌও দূর করতে পারবো কোনোদিন?
অরু চুপচাপ বসে আছে দেখে ক্রীতিক আগ বারিয়ে শুধালো,— কি ভাবছিস?
অরু এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে টি টেবিল থেকে ফাস্ট এইড বক্স হাতরিয়ে, ক্রীতিকের কোল থেকে নেমে গিয়ে পাশে বসে বললো,
— এ্যা’ক্সিডেন্ট কিভাবে করলেন?
ক্রীতিক কাউচের ব্যাকসিটে গা এলিয়ে দিয়ে বললো,

—- সেদিন তোর মায়ের বাসা থেকে বেরিয়ে বাইকে রাইডিং এ গিয়েছিলাম, ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ছিল তাই না করতে পারিনি,হয়তো মেন্টালি ডিস্ট্রাক্ট ছিলাম, তাই নিজের উপর কন্ট্রোল ছিলনা।
ক্রীতিকের কথায় ভয়ের চোটে অরুর শরীরের লোমকূপ দাড়িয়ে গেলো। কোনোমতে ওর মাথায় সফেদ ব্যান্ডেজের আস্তর লাগাতে লাগাতে অরু বললো,— আপনার রা'গটাকে ভীষন ভয় করে আমার। কোনোদিন যদি..
অরু কথা শেষ করতে পারলো আর,তার আগেই ওকে টান মে'রে নিজ বুকের উপর ফেলে দিয়ে ক্রীতিক আগের মতো করেই হিসহিসিয়ে বললো,
— নিজের হার্টবিটকে কেউ আ'ঘাত করে?
অরু ঠোঁট ফুলিয়ে বললো,
— তাহলে নিজেকে কেন করছেন? আপনি একটুখানি ব্যাথা পেলে আমারও তো কষ্ট হয়।
অরুর কথায় ক্রীতিক চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো, শেষ কবে, কোথায়,কখন ওকে কেউ এভাবে বলেছে। ওর ক্ষত,ওর ব্যাথা এসব নিয়ে চিন্তা করেছে, ওকে একটু আপন করে আগলে ধরেছে, ক্রীতিকের মনে নেই, তাই বোধ হয় অরুই জীবনে প্রথম যে ক্রীতিককে অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে বেধেছে। আজ ক্রীতিকের অশান্ত হৃদয়টা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বলছে,— এতো বছরের অপেক্ষা খুব একটা কষ্টের ছিলনা অরু, এখন তো সেসব শুধুই স্মৃতি মাত্র, আমার অরু এখন আমার বুকেই আছে, আর কক্ষনো কেউ এই দূরত্ব বাড়াতে পারবে না, তোর আমার মাঝে যদি কেউ দুঃসপ্নেও চলে আসে, তবে তারাও বাকিদের মতোই আমার আসল পৈচাশিক

রুপটা স্ব চোখে দেখতে পাবে। অর মেইবি লাইফটাও দিয়ে দিতে হতে পারে হু নোজ?ইজি চেয়ারের নরম গদিতে বসে বারবার গা দোলাচ্ছেন গভীর চিন্তাগ্রস্থ আজমেরী শেখ।মনেমনে কষছেন একের পর এক ছক। তার ছোট মেয়েকে যে জায়ান ক্রীতিক নিয়ে গিয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই সুকৌশলি মস্তিষ্কের আজমেরী শেখের। তার এতো কড়া শাসন, এতোটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এতোটা দাম্ভিকতা সবকিছুকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গেলো তারই সৎ ছেলে। যে সবসময় আজমেরী শেখের সাথে টেক্কা দিয়ে চলতে পছন্দ করে, কিন্তু আজমেরী নিজেও তো চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়, কৌশলে কিভাবে চেক মেট দিতে হয় সেটা তারও জানা।
তাছাড়া সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো মান সম্মান, জায়ান ক্রীতিকের মতো বে'য়াদব, বেহায়া ছেলে যে সমাজের ধার ধারে না কোনোকালেই তার দ্বারা সবই সম্ভব, নিজের সৎ বোনকে বিয়ে করাও সম্ভব।
কিন্তু আজমেরী শেখের চরিত্র পুরোপুরি ক্রীতিকের বিপরীত,সে সব কিছুতে সবার আগে সমাজকে প্রাধান্য দেয়, সে মতোই প্রতিটা কাজ করে ,ওই জন্যই হয়তো তাদের মাঝে এই দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধ।—আমেরিকায় তোমাদের রেজিষ্ট্রি হয়েছে, বাংলাদেশে তো নয়। এখন আমিও যদি তোমার মতো কৌশলে চালি তাহলে কি করবে তুমি জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী?
বেশ অনেকক্ষন ধরে ভাবতে ভাবতে কিঞ্চিৎ ক্রুর হেসে বিড়বিড়ালেন আজমেরী শেখ।আকাশে শুক্লপক্ষের মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে, তার চারিপাশে তারকারাজির নির্ভীক অবস্থান। মিটিমিটি

জ্বলন্ত তারকারাজি আর চাঁদের রুপোলী আলোয় ভেসে যাচ্ছে নির্জন পাহাড়ি শহরতলীর রাস্তাঘাট।
ভোরের দিকে সেই যে একপশলা ঝুম বৃষ্টি হলো, তারপর থেকেই আকাশ পরিস্কার। রাতের আকাশে পেজা তুলোর মতো উড়ো মেঘের আড়ালে ক্ষনে ক্ষনে গা ঢাকা দিচ্ছে শুক্লপক্ষের সুন্দরী চাঁদ। তাই জোস্ন্যা রাতের নিয়ন আলো ছাপিয়ে একটু একটু আলোছায়া এসে খেলা করছে পর্দা সরিয়ে রাখা অত্যাধুনিক মাস্টার বেড রুমের আনাচে কানাচে।অরু আজ সন্ধ্যা হতে না হতেই রুমের সবকটা আলো নিভিয়ে পারি দিয়েছে ঘুমের দেশে , যদিও বা ক্রীতিক মুখে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে কার্যত অনলাইনে অরুর সবরকম প্রয়োজনীয় জিনিস অর্ডার করে দিয়েছে সে। কারণ আর যাই হোক অরুকে কোনোরুপ অসস্থিতে দেখতে চায়না ক্রীতিক,তাও ওর নিজের বাড়িতে বসে।
এই যেমন আজ সারাদিন অরুর ভীষণ মন খারাপ ছিল। ক্রীতিকের ভ'য়ে বেচারি বলতেও পারছিল না যে, ও আপা আর মাকে মিস করছে। দুদিন ধরে অরু নেই,তারা কি করছে, কেমন আছে, আদৌও অরুকে খুজছে কিনা সব কিছু নিয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অরু। সেদিন হৃদ মাঝারে সদ্য গজিয়ে ওঠা প্রনয়ের টানে ক্রীতিকের সঙ্গে চলে এলেও, এখন মা আর আপার কথা মনে পরতেই হৃদয় থামচে ওঠে অরুর। বুকের মাঝে দানাবাঁধে কষ্টরা,সেই কষ্ট প্রতিফলিত হয় ওর চোখে মুখে। অরুর চুপসে থাকা মলিন মুখ দেখে কিছুটা হলেও ঘটনা আঁচ করতে পারে ক্রীতিক, কিন্তু ওর ও তো কিছু করার নেই, অরুকে যেতে দেওয়া, কিংবা ভুলে যাওয়া, দুটোই পুরোপুরি অসম্ভব ক্রীতিকের পক্ষে। কারন

ক্রীতিক ভালো করেই জানে অরুকে যেতে দিলে ও নিজেই বাঁচবে না। তবে ক্রীতিক তো ভারী কঠিন হৃদয়ের মানুষ, তাই নিজের দূর্বলতাটুকু পুরোপুরি আড়াল করে, একটা টিভি আনিয়ে সেটাকে সেট করে দিয়েছে হলরুমের মাঝ বরাবর, নিজের গেমিং মনিটরের পাশেই। এতো বড় টিভি দেখে অরু যখন শুধালো,
— এটা কেন এনেছেন?
তখন জবাবে ক্রীতিক বলে,— বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকার মতো টাইম আমার নেই,তাই সময় কাটানোর জন্য এনে দিয়েছি, আমি যখন না থাকবো তখন বসে বসে নেটফ্লিক্স দেখবি।
ক্রীতিকের গমগমে রুষ্ট কথায় মেজাজ খিটখিটিয়ে উঠলো অরুর, তবে এখন পর্যন্ত ঝাজিয়ে তেঁতো গলায় কথা বলার সাহস ওর হয়ে ওঠেনি, তাই অরু সহসাই স্বাভাবিক কন্ঠে বললো,
—- সময়ই যখন নেই,তাহলে অমন মাঝরাতে রাস্তা থেকে নিয়ে এলেন কেন?
ক্রীতিক রিমোট কন্ট্রোলটা ভালোমতো চেক করতে করতে জবাব দেয়,
—- থাকতে পারছিলাম না তাই,তোকে দেখতে ইচ্ছে করলে হাজারটা ব্যস্ততাকেও পায়ে ঠেলে দিতে পারি আমি। তাই আমার ফিলিংস নিয়ে এতো ভাবতে হবে না তোর। নিজে কেন বাংলার পাঁচের মতো মুখ বানিয়ে রেখেছিস সেটা নিয়ে ভাব।
অরু আর জবাব দিলোনা, ক্রীতিকের সাথে বেহুদা তর্ক করার এনার্জি নেই ওর,মনটা বিষিয়ে আছে সেই সকাল থেকেই, তাই কথা না বাড়িয়ে গটগট করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় চলে গেলো অরু। দোতলায় গিয়ে ক্রীতিকের রুমের দিকে আর পা বাড়ালো না ও,

বরং উল্টো ঘুরে বিপরীত পার্শে ওর আর অনুর জন্য বরাদ্দ কৃত সেই আগের রুমটায় প্রবেশ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই নিঃশব্দে তলিয়ে গেলো ঘুমের দেশে।অরু অন্যরুমে গিয়ে শুয়েছে ব্যাপারটা নজরে আসতেই, ক্রীতিকের তীক্ষ্ণ চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠলো। অকস্মাৎ র'ক্ত টগবগিয়ে উঠলো ধমনীর শিরায় শিরায়, এমনিতেই অরুর বিষন্ন মুখ আর উদাসীনতায় ক্রীতিকের মেজাজটা বিগড়ে ছিল সারাদিন , তারউপর এখন আবার অরুর এমন কান্ড। ক্রীতিকের শক্তপোক্ত চওড়া বক্ষ ছাড়া অরু অন্যকোথাও মুখ দাবিয়ে ঘুমাবে সেটা বোধ হয় ক্রীতিক কল্পনাতেও ভাবতে চায়না,আর অরু কিনা একদিনের মাথায়ই অন্য রুমে গিয়ে শুয়ে পরলো? কথাটা ভাবতেই ক্রোধটা তুঙ্গে উঠে এসেছে ওর। হঠাৎ বেড়ে ওঠা তীব্র ক্রোধটাকে কোনোমতে ঠোঁট কামড়ে সংবরণ করে,দু'আঙুলে নিজের গলাটা ঘষতে ঘষতে কিছু একটা ভাবলো ক্রীতিক। অতঃপর চট করেই উঠে চলে গেলো দোতলায় অরুর ঘরের দিকে ।প্রকট আক্রোশ আর চরম বিরক্তি নিয়ে রুমের মাঝে পা বাড়াতেই, ঘুমন্ত অরুকে দেখা মাত্র পা দুটো সহসা ধীর হয়ে যায় ক্রীতিকের, সেই সাথে মস্তিষ্কের জ্বলন্ত ক্রোধে ভাটি পরে তৎক্ষনাৎ, রুমের পর্দাগুলো আলগোছে ঠেলে ধীর পায়ে, ঘুমন্ত নিষ্পল অরুর দিকে এগিয়ে আসে ক্রীতিক।
খানিকক্ষন সেই ঘুমন্ত মুখটা মনদিয়ে পরখ করে ওকে দু-হাতে তুলে নিয়ে নিজের রুমের দিকে ফিরে যেতে যেতে হিসহিসিয়ে ক্রীতিক বলে,
— তোর ঘুম তোকে বাঁচিয়ে দিলো অরু, নয়তো আজ আমি তোর ঠিক কিই হাল করতাম সেটা নিজেও জানিনা। আজ তুই টের

পেতিস জায়ান ক্রীতিকের রোমাঞ্চ আদতে কতটা মারাত্মক। যেটা সহ্য করতে পারবি না তার জন্য উইশ করিসনা হার্টবিট।কষ্টটা তোরই হবে।অরু সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়েছে, আর এখন রাতের শেষ প্রহর চলমান, ঘড়ির কাটায় ঠিক কয়টা বাজে জানা নেই অরুর, জানার অবশ্য কথাও নয়, ও তো ঘুমের ঘোরে বুদ হয়ে আছে এখনো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, অরুর মনে হচ্ছে কয়েকক্রোশ দূর থেকে ওকে কেউ গলা উঁচিয়ে ডাকছে, গলার আওয়াজ স্পষ্ট নয়, তাই অরু এবার ঘুমের ভ্রম কাটিয়ে একটু সচকিত হলো, অতঃপর খেয়াল করে শোনার চেষ্টা করলো সেই দূরের আওয়াজ। এবার চোখ বুজেই সুস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো অরুর কানে, কয়েকক্রোশ দূর থেকে নয় বরং খুব কাছে, একেবারে কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে হাস্কিস্বরে ডাকছে ক্রীতিক,

— আমার ঘুম পরী উঠে পরো।

ক্রীতিকের তপ্ত নিঃশ্বাস, আর আলতো ঠোঁটের পরশ ক্রমশই কানে গলায় এসে স্পর্শ করছে ওর,ক্রীতিকের এহেন নেশা ধরানো স্পর্শে অগত্যাই ঘুম ছুটে গেলো অরুর। ও চট করেই চোখ দুটো খুলে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়লো,—- কি বললেন? আবার বলুন।

ক্রীতিক উঠে দাড়িয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,

—- বলেছি অনেক ঘুম হয়েছে, এবার উঠে পর,বের হবো আমরা।

অরুর স্পষ্ট মনে আছে, ক্রীতিক বেশ নরম গলায়, আদুরে ভাষায় সম্মোধন করেছিল ওকে,অথচ এখন তার পুরোপুরি বিপরীত, তবে এসবের বাইরেও যেই প্রশ্নটা সবার আগে অরুর মস্তিষ্কে গিয়ে ঠেকলো সেটা হলো,

—-- এই ভোর রাতে কোথায় যাবেন উনি?
অরুকে ভাবতে দেখে ক্রীতিক বললো,
— এখন আবার দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করলি নাকি?
অরু শোয়া ছেড়ে উঠে বসে শুধালো,
— এতো রাতে কোথায় যাবো?
ক্রীতিক অরুকে বাচ্চাদের মতো কোলে তুলে নিয়ে বাইরের দিকে এগোতে এগোতে বললো,
—-- আমি যেখানে নিয়ে যাবো, যেদিকে নিয়ে যাবো, যে দেশে নিয়ে যাবো, ইভেন ম'রতে নিয়ে গেলেও, সেখানেই চুপচাপ যাবি তুই ,উইথ আউট এনি কোশ্চেন অর এনি ডাউট ।
অরু নিজের ঝীম ধরা ঘুমুঘুমু মাথাটা ক্রীতিকের কাঁধের উপর এলিয়ে দিয়ে মনেমনে বলে,
—-- করবোনা, কখনো কোনো প্রশ্ন করবো না, যেখানে খুশি নিয়ে যাও শুধু এভাবেই নিজের বুকের মাঝে আগলে রেখো,আমি চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করবো তোমায়,ইভেন উইথ আউট এনি কোশ্চেন অর এনি ডাউট। হাইওয়ে রাস্তা ধরে হাওয়ার গতিতে ছুটে যাচ্ছে ইয়ামাহা খচিত গাঢ় নীল রঙের বাইকটা, স্পিডোমিটারের গতি তখনও একশোর কাটা ছুঁই ছুঁই। অরু শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ক্রীতিককে, ও জানেনা ক্রীতিক ওকে ঠিক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তারউপর ঘুমের রেস এখনো কাটেনি ভালোকরে, কি করেই বা কাটবে? ভোরের আলো ফুটতে এখনো ঢের বাকি। অগত্যাই নিজের টাল সামলানোর জন্য ক্রীতিকের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে অরু। ওর পরনে এখনো ক্রীতিকের কালোরঙা টিশার্ট আর থ্রী কোয়ার্টার। ক্রীতিকের পরনেও একই

রঙের কেলভিন ক্লাইন খচিত টিশার্ট। দেখে মনে হচ্ছে ওরা দুজন পরিকল্পনা করেই একই রকম কাপড় পরিধান করে বেরিয়েছে। যাকে বলে ম্যাচিং ম্যাচিং....
ঘন্টা খানেকের দূর্বার রাইডিং এর পর বাইক এসে থামলো একটা পাহাড়ি রিসোর্টের সামনে, সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় তার অবস্থান।অন্যদিক দিয়ে এলে সোজা রিসোর্টের গেইটে গাড়ি দাড় করানো যেত, অযথা এতোখানি ঘুরে এই পাহাড়ি রাস্তার ঢালে বাইক থামানোর কি মানে আছে জানেনা অরু। রিসোর্টে টাঙানো ল্যানটার্ন আর ফেইরী লাইটের কৃত্তিম আলোয় পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে আঁকাবাকা রাস্তা অবধি যতদূর চোখ যায় সবকিছু ঝকঝকে পরিষ্কার। অরু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ক্রীতিককে শুধালো,—- এখানে কেন নিয়ে এলেন? এখান থেকে হেটে হেঁটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে অতো উপরে উঠতে গেলে জান বেরিয়ে যাবে। আমি পারবো না।
ক্রীতিক নিজের হেলমেট খুলে বাকেট হ্যাট টা পরে নিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজে বললো,
—- তোকে উঠতে বলেছি আমি?
অরু মুখ কাচুমাচু করে বললো,
—- তাহলে?
ক্রীতিক আর জবাব দিলো না অরুর প্রশ্নের, বরং এগিয়ে এসে অরুকে কোলে নিয়েই, একে একে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলো পাহাড়ের চূড়ায়,
ক্রীতিকের এহেন কান্ডে অরুর চোখ কপালে উঠে গিয়েছে,সেই সাথে শুকিয়ে গিয়েছে গলার তরল টুকুও, নিজের শক্ত হাতে ক্রীতিকের

গলা জড়িয়ে ধরে, জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে কম্পিত কন্ঠে অরু বলে,—- এভাবে কোলে নিয়ে অতো উপরে ওঠা টা রিস্ক হয়ে যাচ্ছেনা? না মানে এধারওধার হলে যদি কিছু হয়ে….
ক্রীতিক অরুর দিকে না চেয়েই পা চালাতে চালাতে জবাব দিলো,
—- ম'রলে দুজন একসাথে ম'রবো, আর কোনো আপসোস থাকবে না,সেটাই ভালো নয় কি?
—- কিন্তু আপনার তো আমাকে নিয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে।
ক্রীতিক অরুকে একঝলক দেখে নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বললো,
—- আমি একবারও বলেছি তোকে কোলে নিয়ে উপরে উঠতে আমার কষ্ট হচ্ছে?
ক্রীতিকের কথায় অরু না সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক পুনরায় বলে,
—- তাহলে বেশি বোঝা বন্ধ কর নয়তো মা'র খাবি।
ক্রীতিকের এহেন কথায় অভিমান হলো অরুর, আগে সম্পর্ক যা-ই ছিলো মানা যায়,কিন্তু এখন তো স্বামী হয়ে গিয়েছে,এখনও কিনা ক্রীতিক মা'রতে চায় ওকে?ব্যপারটা বেশ অ'পমান জনক আর লজ্জার ।স্বাভাবিক ভাবে অরুরও খারাপ লেগেছে,তাই দরদ দেখানোর সকল ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দিয়ে আর একটাও কথা না বাড়িয়ে, চুপচাপ হয়ে ক্রীতিকের কোলেই বসে রইলো অরু। ক্রীতিক যখন পাহাড়ের চূড়ায় এসে অরুকে কোল থেকে নামিয়ে দেয় তখনো ভোরের আলো ফোটেনি, রিসোর্টের আবছা আলোয় অরু চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যায়গাটা সংরক্ষিত, কিন্তু আপাতত কোনো মানুষের আনাগোনা নেই এখানে, পেছনে অবস্থিত সফেদরঙা কটেজ গুলোর ব্যাক ইয়ার্ডটা বেশ সুন্দর এবং সুসজ্জিত।

আর সামনে রয়েছে বিস্তৃত খোলা আকাশ, অরু যেখানে দাড়িয়ে আছে সেখান থেকে কয়েক কদম এগোলেই গভীর খাদ। সেদিকে ভুলক্রমে উঁকি দিলেও পিলে চমকে ওঠে অরুর, শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যায় শীতল ঠান্ডা স্রোত। অথচ সেখানে গিয়েই পা দুলিয়ে বসেছে ক্রীতিক,বসে থেকেই আঙুলের ইশারায় ডাকলো অরুকে।
ক্রীতিকের ইশারা বুঝতে পেরে অরু,না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—- আমি ওখানে যাবোনা, আমার ভ’য় করছে,তাছাড়া নিচের দিকে তাকালেই আমার কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।
ক্রীতিক খানিকটা দূরে দাড়িয়ে থাকা অরুকে আশ্চর্য কন্ঠে শুধালো,—— আমি থাকতে ভ’য় কিসের তোর?
ক্রীতিকের এই একটা বাক্যই যথেষ্ট ছিল অরুর আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার জন্য। অরু জানে, জায়ান ক্রীতিক বেঁচে থাকতে ওর শরীরে বিপ’দের সুক্ষ্ম আঁচ ও লাগতে দেবেনা সে, অবশেষে সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকেই সহসা এগিয়ে গিয়ে সাবধানে ক্রীতিকের গা ঘেঁষে পাহাড়ের চূড়ায় বসে পরলো অরু। অরু বসার সঙ্গে সঙ্গে ওর কোলে মাথা এলিয়ে দিয়ে কচি ঘাসে আবৃত মাটির উপর শুয়ে পরে ক্রীতিক। ক্রীতিকের এহেন কান্ডে অরু ধরফরিয়ে উঠে বললো,
—- কি করছেন, খাদে পরে যাবেন তো?অরু কথায় ক্রীতিক বাঁকা হাসিতে ঠোঁট প্রসস্থ করে, অতঃপর কোনো টু শব্দ না করেই, হাত উঁচিয়ে একটানে অরুর লম্বা চুলের গার্ডারটা খুলে নেয় নিজ হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝরিয়ে ক্রীতিকের শরীরে আঁচড়ে পরলো রেশমের মতো সিল্কি চুল গুলো। অরুর চুলগুলোকে নিজের বুকে যায়গা করে দিয়ে ক্রীতিক বললো,

—-- খোলা চুলে তোকে বরাবরই এট্রাক্টিভ লাগে। আমি পাগল হয়ে যাই দেখলে।
ক্রীতিকের কথায় অরু ভ্রু কুঁচকালো, কি প্রশ্নে কি উত্তর দিলো এই লোক? নিজের বিরক্তিটুকু ঠোঁট কামড়ে সংবরণ করে অরু আবারও শুধালো,
—-- কি বলছেন এসব?
ক্রীতিক অরুর হাতটা নিজের চুলের ভাঁজে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো,
— হাত বুলিয়ে দে,ঘুমাবো আমি। কাল সারারাত ঘুমায়নি।
অরু কর্কষ আওয়াজে শুধালো ,— কেন ঘুমাননি, নিষেধ করেছিলাম আমি?
ক্রীতিক চোখ দুটো বন্ধ করেই জবাব দিলো,
—-- তোর জন্যই তো ঘুমাতে পারিনি, নিজের রুপ দেখিয়ে আমাকে সিডিউস করেছিস,তোর শা'স্তি হওয়া উচিৎ।
—-- বা-রে আপনি বুঝি আমাকে খুব ঘুমাতে দিয়েছেন? গাড়ির মধ্যেই তো….
কথাটা শেষ করার আগেই নিজের জিভে লাগাম টানলো অরু, কথায় কথায় কিসব বলা শুরু করেছে টের পায়নি তখন, আর এখন নিজের লাগামহীন কথায় নিজেরই লজ্জা লাগছে খুব, মনেমনে ভাবছে,
—-- সব দোষ এই জায়ান ক্রীতিকের, ওনার সাথে দুদিন থেকেই ঠোঁট কা'টা হয়ে গিয়েছি আমি। ভবিষ্যতে যে আরও কত অভ্যেস জুটিয়ে ফেলবো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এখন কি করি?অগত্যাই কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে অরু নরম স্বরে ক্রীতিককে বললো,

—- ঘুমাবেন যখন বাড়িতে ঘুমালেই তো পারতেন? কষ্ট করে এতো দূর রাইড করে আসার কি দরকার ছিল শুনি?
ক্রীতিক ঘুমু ঘুমু আওয়াজে জবাব দিলো,
—- কেন নিয়ে এসেছি সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবি। ক্রীতিক ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ, অরু আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ক্রীতিকের চুলের ভাঁজে, আর মনেমনে ভাবছে,
—- আগে আপনার চোখের দিকে তাকাতেও ভ'য় করতো আমার, মনে হতো এই বুঝি ভাসা ভাসা চোখ দুটো দিয়ে গিলে খাবেন আমাকে, অথচ এখন দেখুন, পুরো দুনিয়ার আড়ালে কতোটা আয়েশ করেই না ঘুমিয়ে আছেন আপনি আমার কোলে। আর আমাকে দেখুন কতোটা নিঃসংকোচে, কতোটা যত্ন করে আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। কেনইবা দেবোনা বলুন, আপনাকে তো আমি ভালোবেসে ফেলেছি, আপনি কি তা জানেন?অরুর মন গহীনের হাজারও সহজ সীকারোক্তি তখনই থেমে যায়, যখন ও দেখতে পায় চোখের সামনে বিস্তৃত আকাশে কুসুম রঙা সূর্য উদয় হচ্ছে। ভোর হয়েছে,প্রশান্ত মহাসাগরীয় হিমেল হাওয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে শরীর,কর্ণকূহরে ভেসে আসছে পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ, আর চোখের সামনে পুরো আকাশ জুড়ে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে একফালি র'ক্তিম সূর্য কীরন। কি অপরূপ দৃশ্য, এতোটা কাছ থেকে আগে কখনো সূর্যদয় দেখার সুযোগ হয়নি অরুর এটাই প্রথমবার, তাই নিজের ভেতরের চরম উৎকন্ঠাকে দমাতে না পেরে দু'হাতে ঘুমন্ত ক্রীতিকের চুল খামচে ধরে খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠলো ও।

হঠাৎ করেই চুলে বেশ জোরেশোরে টান পরায় অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে বসলো ক্রীতিক,চিৎকার রত অরুর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে শুধালো,—- কি হয়েছে?
অরু খুশিতে টলোমলো চোখে আঙুল উঁচিয়ে সূর্যদয় দেখালো,ক্রীতিক এবার মৃদু হাই তুলে সেদিকে এক নজর তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে অরুর দিকে চাইলো, যে এই মূহুর্তে মুগ্ধনয়নে ধরনী জুড়ে সোনালী সূর্যের আগমন দেখছে।
আর ক্রীতিক দেখছে তার অরুকে, নিস্প্রভ চোখে অরুকে দেখতে দেখতেই ক্রীতিকের মন বলে,
—— আমার চাঁদ সূর্য দুটোই তোর মাঝে নিবদ্ধ অরু, তোর মাঝেই তারা উদীয়মান, আবার তোর মাঝেই তারা অস্তমান, আমি কেবল মুগ্ধ নয়নে দেখি আর ভাবি কি অপরূপ তারা। গলে যাওয়া মোমের নিয়ন অগ্নিশিখায় তোকে প্রথমবার দেখেছিলাম আমি,সেটাই ছিল আমার দেখা সবচেয়ে অপরূপ দৃশ্য। প্রথম দেখাতেই তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠেছিলো হৃদয়টা,যে তৃষ্ণা আজও মেটেনি আমার, বরাবরই আমি সার্থপর,আর সার্থপরের মতোই তোকে অতিরিক্ত চাই। সেদিনের পর থেকে এক অষ্টাদশী ছাড়া আর কাউকে মনভরে দেখার ইচ্ছে জাগেনি কোনোকালেই, এ জীবনে আর কোনোদিন জাগবে বলে মনেও হয়না।
ক্রীতিক সেই তখন থেকে তাকিয়ে আছে দেখে অরু একটু ইতস্তত বনে গেলো,নিজের জামা কাপড় কোনোমতে ঠিকঠাক করে মিনমিনিয়ে শুধালো,
—- কি দেখছেন অমন করে?
অরুর প্রশ্নের জবাবে ক্রীতিক ক্ষীণ আওয়াজে বললো,

—- আমার সূর্যদয়। টিন্ডেট কটেজের জানালা দিয়ে সূর্যদয়ের দৃশ্য স্পষ্ট, অরু কাচের জানালা দিয়ে এখনো সেদিকেই তাকিয়ে আছে। পুরো দৃশ্য উপভোগ করার আগেই ক্রীতিক টেনেটুনে কটেজে নিয়ে এসেছে ওকে, ভারী নির্দয় আচরণ, কিন্তু এই মূহুর্তে ঝগড়া করার মতো সময় নেই অরুর হাতে, ও পুরোটা দৃশ্য ঠিকঠাক ভাবে দেখতে চায়, তাই কটেজের জানালা দিয়েই আপাতত উপভোগ করছে সাদামাটা সূর্যদয়।
কিন্তু এই মূহুর্তে বোধ হয় সেটাও সহ্য হলোনা নির্দয় ক্রীতিকের, ও কোনোরূপ আওয়াজ না করেই এগিয়ে এসে হাট করে লাগিয়ে দিলো জানালাটা। এবার বিরক্তিতে চিড়বিড়িয়ে ওঠে অরু। নিজের রাগটাকে কোনোভাবেই দমাতে না পেরে তেঁতো গলায় ক্রীতিককে বলে,— কি সমস্যা?
অরুর কাঁধের উপর নিজের চিবুক ঠেকিয়ে, ক্রীতিক হিসহিসিয়ে জবাব দেয় ,
—— আমার এই টি শার্টটা তোর পরনে বি'শ্রী লাগছে অরু, খুলে ফেলি?
ক্রীতিকের কথায় অরুর গলা শুকিয়ে এলো, ঠান্ডার মাঝেও হাতের তালু ভিজে উঠলো তপ্ত ঘামে। লজ্জায় কথা আটকে আসছে,তবুও নিজের মধ্যে একটু মেকি গাম্ভীর্য ধরে রেখে কথা ছো'ড়ে অরু ,
——ককেন?আপনিই তো কাল বললেন যে, আপনার জামা কাপড়ে আমাকে মারাত্মক লাগে।
ক্রীতিক নিজের বলিষ্ঠ হাতে অরুর পরনের টি শার্টটা টেনে খুলতে খুলতেই হাস্কিস্বরে বললো,

—- কাল পরার পরে মারাত্মক লেগেছে, আর আজ খোলার পরে, ডিপেন্ডস অন মাই মুড বেইবি। একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ চারদিনের মাথায় আবারও সানফ্রান্সিসকো ফিরে যাচ্ছে অরু। ক্রীতিক নিজেই ড্রাইভ করে এগিয়ে দিয়ে আসছে ওকে। ওদিকে মনের মাঝে একরাশ ভয় আর দ্বিধা আকরে ধরে আছে অরুকে,মা আর আপার মুখোমুখি হলে ঠিক কি রকম লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে তারা, তা একমাত্র উপরওয়ালাই ভালো জানে। কিন্তু পাশে বসা ক্রীতিকের গম্ভীর মুখটা দেখে আপাতত সেসব ভাবতে ইচ্ছে হলোনা অরুর, গত দু'ঘন্টার পিনপতন নীরবতা ভে'ঙে কোনোমতে হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করে অরু ক্রীতিককে শুধালো,

—- কবে ফিরবেন?

ক্রীতিক স্টিয়ারিং এ হাত চালাতে চালাতে জবাব দিলো,—- খুব শীঘ্রই।

অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে আবারও শুধালো,

——আপনি একাই যাচ্ছেন?

—— না প্রত্যয় ও সাথে যাচ্ছে।

অরু মুখ কাচুমাচু করে বললো,

—- আমাকে নিয়ে গেলে হতোনা?

ক্রীতিক অরুদের ভবনের সামনে এসে অকস্মাৎ ব্রেক কষে বললো,

— তোকে নিয়ে যেতে পারলে আমার চেয়ে খুশি আর বোধহয় কেউ হতো না অরু, কিন্তু সেটা সম্ভব নয় মিডিয়ার ধারে কাছেও তোকে আমি এলাউ করবো না।

অরু অগত্যাই হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে শুকনো মুখে গাড়ি থেকে নেমে গেলো। ক্রীতিকও নামলো ওর সাথে সাথে, ক্রীতিককে নেমে আসতে দেখে অরু শুধালো,—- আবার নামতে গেলেন কেন? আপনার ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে তো।
ক্রীতিক স্ব পকেটে হাত গুঁজে,অন্যহাতে অরুর ঘাড় টেনে নিজের দিকে নিয়ে এসে কাতর কন্ঠে বললো,
—- একবার তুমি করে ডাক, তারপরেই চলে যাচ্ছি।
ক্রীতিকের কথায় অরু শুষ্ক ঢোক গিলে ওর গলাটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বললো,
—- ফিরে আসুন তারপর সব আবদার মেটাবো প্রমিস।
ক্রীতিক ব্যাথাতুর হাসলো, অতঃপর ক্রোধিত সুরে বললো,
—- তোর মাকে ম্যানেজ করা না করা একান্তই তোর ব্যাপার,বাট আমি ফিরে এলে আমার সাথে আমার বাড়িতে ফিরবি দ্যাটস মাই অর্ডার।
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ায়,ওকে আসস্থ করে বলে,— বুঝেছি এখন যান।
কথা শেষ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায় অরু, ক্রীতিক এখনো সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে, এতোক্ষণ ধরে নাকের আসেপাশে মো মো করতে থাকা বুনোফুলের মেয়েলী সুঘ্রাণটা অরু যাওয়ার সাথে সাথে কেমন মিলিয়ে যাচ্ছে।
অরুর হঠাৎ দূরত্বে ক্রীতিকের কেমন দম আটকে আসছে, ব্যাথায় ভরে উঠেছে হৃদয়টা। নিজের অজান্তেই হাত চলে গিয়েছে বুকের বা পাশে, আজ এই মূহুর্তে জীবনে প্রথমবার ক্রীতিক অনুভব করলো ওর হার্টবিট ফে'ইল করছে, ক্রমশ হৃদস্পন্দন গতি হারাচ্ছে, অরুর

প্রতি এট্রাকশন তো নতুন কিছু নয়, তাহলে নতুন করে এই সুপ্ত অনুভূতি কোথা থেকে উদয় হলো? ক্রীতিক চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভাবলো,তার পরক্ষনেই গলা উঁচিয়ে স্পষ্ট আওয়াজে বলে উঠলো,—- অরু আই লাভ ইউ।
ক্রীতিকের বলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা শব্দে পা দুটো অকস্মাৎ থমকে গেলো অরুর, সামনে পা বাড়ানোর শক্তি নেই আর,পুরো শরীর মন ছেয়ে গিয়েছে অজানা বৈ'দ্যুতিক শিহরনে, হৃদয়ের কানায় কানায় টইটম্বুর হয়ে উপচে পরা অনুভূতির জোয়ার, গলায় আটকে আছে তীব্র কা'ন্নার রেশ। ও আর এভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারলো না একমুহূর্তও ,তৎক্ষনাৎ দৌড়ে গিয়ে ঝাপিয়ে পরলো ক্রীতিকের বুকে,একবার, দুইবার, তিনবার ক্রীতিকের আঙুলে চাপ দিয়ে কিছু একটা সংকেত বোঝালো,অতঃপর গলা খাদে নামিয়ে রিনরিনে আওয়াজে বললো,
—- আমিও তোমাকে ভালোবাসি জায়ান ক্রীতিক, খুব ভালোবাসি।ঝিমিয়ে পরা ম'রা বিকেলে সূর্যরশ্মির আলোর ছটা মিয়িয়ে এসেছে কিছুটা। চোখের সামনে পরিষ্কার তকতকে পিচ ঢালা রাস্তাতেও শেষ বিকেলের ছায়া পরেছে। মাঝ আকাশে পাখিদের ঘরে ফেরার ঢল।
সারিসারি উইল্ড মিল গুলো এখনো স্বীয় গতিতে ঘুরছে, ঈষান কোনে মেঘ জমেছে, খানিকবাদে বাদেই মেঘের গুড়গুড়ানি ভেসে আসছে সেথা থেকে। ব্ল্যাক মার্সিডিজের টিন্ডেট জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একনজর পরখ করে আবারও ড্রাইভিং এ মন দিলো প্রত্যয়,গন্তব্য এয়ারপোর্ট।

গাড়ির স্টিয়ারিংএ হাত চালাতে চালাতেই লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে একনজর ক্রীতিককে পরখ করে নিলো সে। পেছনে বসে ব্যাকসিটে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছে ক্রীতিক। সেই তখন থেকে একই ভাবে বসে আছে দেখে এবার
প্রত্যয় একটু গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালো,—- ভাই, আর ইউ ওকে?
ক্রীতিক চোখ খুললো না আর, শুধু ছোট্ট করে উত্তর দিলো,
— ঠিক আছি।
যদিও বা প্রত্যয় ক্রীতিকের উত্তরে সন্তুষ্ট নয়, কারণ ও জানে ক্রীতিক ঠিক নেই, এমন একটা মূহুর্তে ঠিক থাকার কথাও নয়, তবুও জায়ান ক্রীতিক যখন বলেছে সবকিছু ঠিক আছে, তখন সেটাই সঠিক ধরে নিতে হবে। এর বাইরে কথা বাড়ানোটা মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই প্রত্যয়ও সেটাই করলো, ক্রীতিকের কথায় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে পুনরায় ড্রাইভিং এ মন দিলো। বেশ কিছুটা সময় ধরে চোখদুটো বন্ধ রেখেও অরুর মুখটা সরানো যাচ্ছেনা মানস্পট থেকে। গাড়িটা এয়ারপোর্টের দিকে যত এগোচ্ছে ততই হৃদয়টা অদৃশ্য বেদনায় তপ্ত খরার মতো খাঁ খাঁ করছে। ক্রীতিক বরাবরই উগ্র মেজাজী হুটহাট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যখন তখন, কিন্তু অরুর বেলায় সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আজও অরুকে ওমন করে একা ছেড়ে আসছে মন সায় দেয়নি ক্রীতিকের, তাইতো অর্ণবকে বলে এসেছে অরুর বাসায় সর্বক্ষন নজর রাখতে।
অরুর কথা ভাবতে গিয়ে পাশে পরে থাকা মোবাইল ফোনটা হাতরে নিলো ক্রীতিক, অতঃপর গ্যালারীতে ঢুকে,স্ক্রল করতে লাগলো কাল ভোরে ধারণকৃত কিছু একান্ত মূহুর্ত। ক্রীতিকের মোবাইলে অরুর

তেমন কোনো ফটো নেই বললেই চলে, কিন্তু গতকাল সূর্যদয়ের সময় কটেজে নিজেদের অন্তরঙ্গ মূহুর্তের পরে অরুর বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছিল ক্রীতিক। যেখানে দেখা যাচ্ছে শরীরে ছফেদ রঙা কম্ফোর্টার জড়িয়ে গাল ফুলিয়ে বসে আছে অরু, চোখ দুটো অশ্রুশিক্ত, কেঁদে কে'টে লালবর্ণ ধারণ করেছে সুন্দর ফর্সা কোমল মুখটা।
অরুর ছবিতে চোখ বুলিয়ে ওর রাগের কারণ ভাবতে ভাবতে আজও নরম করে হেসে ফেললো ক্রীতিক। একেএকে ভাবতে লাগলো কাল ভোর থেকে এই মূহুর্ত অবধি ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা ঘটনা।.... কাল মিষ্টি ভোরে, নরম রোদের আড়ালে মিষ্টি অরুকে নিজের মতো করেই কাছে টেনে নিয়েছিলো ক্রীতিক,এরপর অরুর ছোট্ট শরীরে চলেছিল ক্রীতিকের দীর্ঘক্ষনের রাজত্ব আর কতৃত্ব।ভালোবাসার পর্ব শেষ করে ক্রীতিক যখন সবে সবে একটু আবেশিত ঘুমের তোপে চোখ দুটো বুজেছিল, তখনই কর্ণকুহরে ঝঙ্কার তোলে ক্রন্দনরত অরুর ফোপাঁনোর আওয়াজ।
অরু কাঁদছে ব্যাপারটা মস্তিষ্কে গিয়ে বিট করতেই শোয়া থেকে চট করে উঠে বসলো ক্রীতিক,ঘুম জড়ানো কন্ঠে অবুঝের মতোই চোখ বড়বড় করে প্রশ্ন করলো অরুকে,—- কি হয়েছে কাঁদছিস কেন?
বয়সে বারো বছরের বড় ক্রীতিকের কাছে অষ্টাদশী অরু বরাবরই বাচ্চাসম, একমাত্র ক্রীতিক আর আপার সামনেই ওর বাচ্চামী করার সভাব রয়েছে, ক্রীতিকের আওয়াজ পেয়ে অরু এইমূহুর্তে বাচ্চাদের মতোই ফ্যাচফ্যাচিয়ে কেঁদে উঠলো, শরীরে একটা সুতা ও নেই,কোনোমতে নরম চাদরটাকে শরীরে পেচিয়ে অরু অস্পষ্ট আওয়াজে ফোপাঁতে ফোপাঁতে বললো,—- আপনি সেদিন গাড়িতে

বলেছিলেন আমাকে একটুও ক’ষ্ট দেবেন না, সবসময় জেন্টাল থাকবেন, অথচ আজকে দেখুন, আপনার ভালোবাসার চোটে আমি আ’হত হয়ে গিয়েছি।

অরুর কথায় ক্রীতিক উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালো,

—- বেশি লেগেছে? ডক্টরের কাছে যেতে হবে?

অরু দাঁত কটমটিয়ে বললো,

—- চুপ করুন বেহায়া লোক, এসব অসুস্থতা নিয়ে কেউ ডক্টরের কাছে যায়?

—- কেউ না গেলেও তুই যাবি, কারণ তোকে নিয়ে আমি একটুও রি’স্ক নিতে চাইনা, এমনিতেও এসবের জন্য তোর বয়সটা অনেক কম। ক্রীতিক কথা শেষ করে অরুকে কোলে নেওয়ার জন্য উদ্যত হলে অরু হুরমুড়িয়ে খাট থেকে নেমে যায়,তবে বিছানা ছেড়ে নেমে গিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না বেচারি, পা দুটো অবশ হয়ে থাকার দরুন, কম্ফোর্টার সহ’ই ধপ করে বসে পরলো মেঝেতে। অরুর এহেন নাজেহাল অবস্থা দেখে ঠোঁট টিপে হাসি সংবরণ করলো ক্রীতিক। অতঃপর এগিয়ে গিয়ে অরুকে পুনরায় বাহুবদ্ধ করে কোলে তুলে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে হাস্কিটোনে হিসহিসিয়ে বলে,

—– আগেই বলেছিলাম তোকে, ডার্ক রোমান্স আমার বেশ পছন্দ। ক্রীতিকের কন্ঠে ঘোর মাদকতা,চোখ দুটোতে কামনার জোয়ার, ওর এমন দ্রত নিঃশ্বাসে ভরকে যায় অরু। শুষ্ক ঢোক গিলে শুধায়,—ককি হয়েছে আপনার?

অরুকে বিছানায় ছু’ড়ে ফেলে দিয়ে তপ্ত আওয়াজে ক্রীতিক বলে,

— বেইবি,ফ্রর্ম নাও অন, আই ওন্ট বি জেন্টাল এনি মোর। বি আ গুড গার্ল ওকে?
অরু হকচকিয়ে উঠে বললো,
— কিহহ!
অরুর আশ্চর্যের সীমানা তুঙ্গে নিয়ে, ঠোঁটের কোনে একটা ক্রুর হাসি ঝুলিয়ে, বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা হ্যা'ন্ডকাফ্ বের করতে করতে ক্রীতিক বললো,
—- ভ'য় নেই,আমার সাথে থাকলে অভ্যেস হয়ে যাবে। *রিসোর্ট থেকে বাড়িতে ফিরে, বেলা বারোটার দিকে পুরোপরি ফর্মাল গেটআপে রেডি হয়ে রুম থেকে বেরিয়েছে ক্রীতিক। এ'ক্সি'ডেন্টের কারনে বেশ অনেকদিন ভার্সিটিতে যেতে পারেনি ও, গতকাল উইকএন্ড ছিলো বলে বাড়িতেই সময় কাটিয়েছে। আর আজ হুট করেই ডিপার্টমেন্ট প্রফেসরদের মিটিং এ জরুরি তলব পরেছে ওর, না গেলেই নয়। তাইতো অরুকে নিয়ে দ্রুত বাড়িতে ফিরেছে ক্রীতিক।
তবে বিপত্তি ঘটেছে অরুকে নিয়েই, সেই যে রিসোর্টে বসে রা'গ করে গাল ফুলিয়েছে, এখনো সেভাবেই বসে আছে। অরুর কাছে অবশ্য রা'গ করার যথাযথ যুক্তি রয়েছে, তবে ক্রীতিকের মতামত অনুযায়ী,
—- নিজেকে সামলাতে না পারলে আমার কি করনীয়?
হলরুমের কাউচে বসে টিভি দেখতে দেখতেই অরুর চোখ গেলো ক্রীতিকের দিকে। শরতের আকাশের মতো লাইট ব্লু শার্টের ফুল স্লিভস হাতার বোতাম গুলো বেশ মনোযোগী দৃষ্টিতে লাগাতে লাগাতে নিচে নামছে ক্রীতিক। কাঁধের একপাশে ঝুলে আছে

ল্যাপটপ ব্যাগ। আজ অনেকদিন পরে ক্লিন সেভ করায় ওকে দেখতে অন্য রকম সুদর্শন লাগছে। ক্রীতিককে আড় চোখে একঝলক পরখ করে ভেতরে ভেতরে জমিয়ে রাখা রাগটা আবারও মাথায় চড়ে বসলো অরুর,তৎক্ষনাৎ মুখ ঝামটি দিয়ে ক্রীতিকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে, টিভির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়ালো অরু,—- দয়ামায়াহীন নির্দয়,পাষাণ, সা'ইকো,বদমাশ লোক।
অরুর এতো অভিযোগ আর গা'লাগাল বোধ হয় ক্রীতিক শুনেও শুনলো না, বরং এগিয়ে এসে অরুর কপালে টকাস করে একটা গভীর চুমু খেয়ে নির্লিপ্ত কন্ঠে শুধালো,
—- ব্যাথা কমেছে জান?
অরু জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।
অরুর কান্ডে ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে বললো,
—- ইগনোর করা আমার পছন্দ নয় অরু। তুই আমাকে যা খুশি বল সমস্যা নেই, আমার উপর জিদ ফলাতে নিজের হাত ব্যবহার কর তাতেও সমস্যা নেই,কিন্তু আমাকে ইগনোর কিংবা রিজেক্ট করার দুঃসাহস দেখাবি না আর। কখনোই না।
অরু এবার মাথা নিচু মিনমিনিয়ে বললো,— আআপনি আমাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পান তাই না?
ক্রীতিক অরুর চিবুক ধরে ওর মাথাটা তুলে,চোখের মধ্যে চোখ রেখে বললো,
—- তুই আমার সম্পত্তি বেইবি,তোর সবকিছু আমার জন্য বিলোং করে, যেভাবে খুশি তোকে সেভাবে আদর করার অধিকার রাখি আমি। এটাকে যত দ্রুত পজিটিভলি নিবি, তত তাড়াতাড়ি তোর কাছেও সবকিছু স্বাভাবিক মনে হবে।

কথা শেষ করে নতুন উদ্যমে অরুর দু'গালে চুমু খেয়ে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলো ক্রীতিক।
অরুর শরীরটা সত্যি সত্যিই ভালো নেই, সকাল থেকেই জ্বর জ্বর ভাব, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে। আগের রাতে না ঘুমানোর দরুন মাথাটাও ধরে আছে খুব, এই মূহুর্তে বিশ্রাম নেওয়াটা বড্ড জরুরি। তাই ক্রীতিকের অর্ডার করে রেখে যাওয়া খাবার আর অষুধ খেয়ে হলরুমেই চাদর টেনে ঘুমিয়ে পরে অরু।একটা দুঃস্বপ্নের মাঝপথে আটকে গিয়ে অরুর যখন হুট করেই ঘুম ছুটে যায় তখন সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।দুঃস্বপ্নের পরিনতি জানার সাহস কিংবা ইচ্ছে কোনোটাই নেই ওর,অগত্যাই ধরফরিয়ে শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো অরু। ঠান্ডার মধ্যেও শরীরটা ঘামে ভিজে জপজপ করছে, হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে শ্বাসপ্রশ্বাস।
ভ'য়ে জর্জরিত চুপসে যাওয়া মুখমন্ডলটাকে বেশ অনেকক্ষন লাগলো স্বাভাবিক করতে। কিছুক্ষণ একই ভাবে বসে থেকে হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম টুকু মুছে চারিদিকে চোখ বোলালো অরু, রুমটা অন্ধকারে ছেয়ে আছে হয়তো ক্রীতিক এখনো ভার্সিটি থেকে ফেরেনি, অন্ধকার রুমের আনাচে কানাচে লেজ নাড়িয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে বিড়াল ছানা ডোরা। ক্রীতিকের বাড়ির ফ্রি সার্ভিসে আগের থেকে বেশ নাদুসনুদুস হয়েছে সে। এ বাড়িতে আসার পর অনেকদিনের মাথায় সুস্থ সবল টগবগে ডোরাকে দেখে বেশ আস্বস্ত হয়েছিল অরু, মনেমনে ভেবেছিল,—- সবাই মিথ্যে বলে,আমার জায়ান ক্রীতিক এতোটাও খারাপ না।
কিছুক্ষন ধরে বসেবসে ডোরার নড়নচড়ন লক্ষ করার পরে, কয়েকবার নাক টেনে ভেতরে অনেকটা ঠান্ডা বাতাস পুরে নিয়ে

ধীর পায়ে রুমে চলে গেলো অরু।অতঃপর ফ্রেশ হয়ে জামা কাপড় পাল্টে পুনরায় ফিরে এলো হলরুমে। এখন সত্যিই শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছে,মেজাজটাও ফুরফুরে। অগত্যাই ডোরাকে কোলে নিয়ে অরু গিয়ে বসলো টিভি দেখতে, আজকাল এ বাড়িতে থাকা সত্বেও ডোরাকে সময় দিতে পারেনা অরু। কি করেই বা দেবে?আরেকজনার হাজার রকমের মুড সুইং মেটাতে মেটাতেই ওর ছোট্ট জীবনটা ফালাফালা। কখনো বিরক্ত হবে, তো কখনো আদর করবে। কখনো চ'ড়িয়ে গাল লাল করে দেবে, তো কখনো নিজেই সেখানে মলম ঘষবে, কি মুশকিল।

রিমোট দিয়ে একেক করে টিভির চ্যানেল পাল্টাচ্ছে অরু, কোনো কিছুই ভাল্লাগছেনা। বিদেশি চ্যানেলের ছাতার মাথা কিছুই বোঝার জো নেই,ওদিকে নেটফ্লিক্স দেখার মতো ধৈর্য নেই।অরু যখন টিভির চ্যানেল পাল্টাতে গভীর মনোযোগী তখনই বাড়িতে ফেরে ক্রীতিক। হলরুমে একমূহুর্তও অপেক্ষা না করে সোজা সিঁড়ি ডিঙিয়ে রুমে গিয়ে,গলা উঁচিয়ে ডাকতে শুরু করে অরুকে।

—- অরু,অরুউউ, ডাকছি আমি রুমে আয়!

সকালের রাগে এখনো ভাটি পরেনি অরুর,তারউপর এখন আবার উদভ্রান্তের মতো রাগী রাগী গলায় ডাকছে ক্রীতিক, ক্রীতিকের চোখের সামনে পরলেই সকালের কথা মনে পরে যায় ওর। লজ্জা আর অভিমান দুটোই তরতরিয়ে বেড়ে যায় তৎক্ষনাৎ, ওই জন্যই হয়তো অরু আর বেড রুমের দিকে পা বাড়ানোর সাহস পেলোনা। চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে রইলো কাউচের উপর।

ওদিকে অরু রুমে আসছে না দেখে ক্রীতিক রাগে ফোসফোস করে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় বললো,

—-- অরুর বাচ্চা রুমে আয়, নয়তো আমি একবার নিচে এলে তোকে কাঁ'চা চি'বিয়ে খাবো, সকালের কথা ভুলে গিয়েছিস?নাহ, অরু এবারও এলোনা। ক্রীতিকের মেজাজ এতোক্ষণে সপ্তম আসমানে উঠে এসেছে, এতো তেজ কেন এই মেয়েটার?ক্রীতিক একটুতো কোলে নিয়ে আদরই করতো ওকে,খেয়ে তো আর ফেলতো না। তাও উপরে এলোনা ওই ছলনাময়ী পিচ্চি অরু।
ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে পায়ের জুতো জোড়া দুটোকে দুইদিকে ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে, খালি পায়েই তরতর করে নিচে নেমে এলো। ক্রীতিক যখন শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়ে রেগেমেগে অরুকে কিছু বলবে,তার আগেই ওর চোখ গেলো চলন্ত টিভির স্ক্রিনে। বেশ বড়সড় ইংরেজি হেডলাইন। অরু ছলছলে চোখে সেদিকেই তাকিয়ে আছে, ক্রীতিকের উপস্থিতি টের পেয়ে, ওর দিকে না তাকিয়েই অরু বলে ওঠে,—-- কিয়ারা রোজারিও তো খুব নামকরা অভিনেত্রী ছিলেন। শুনেছি উনিশ শতকে ওনার করা প্রতিটা শর্ট ফিল্ম, সিরিজ,মুভি সবকিছুর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে,এখনো চেহারায় বার্ধক্যের চিহ্নটুকু অবধি নেই, অথচ উনি কিনা এতো তাড়াতাড়িই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন? আর এই নিউজে কি বলছে এসব? ওনার নাকি দুই সন্তান, সারাজীবন তো টিভির পর্দায় একজনকেই দেখে এলাম,তাহলে আরেকজন কোথায়?
অরুর কথা ক্রীতিকের কানে আদৌও পৌঁছেছে কি-না তার হদিস নেই, নিউজটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেভাবে খালি পায়ে নিচে নেমে এসেছিল, সেভাবেই উপরে উঠে গেলো।
ক্রীতিক চলে যেতেই অরুর ভ্রম কাটে, কোনোরূপ বাক্য আদান-প্রদান না করেই ক্রীতিক এভাবে চলে গেলো কেন? প্রশ্নটা

মাথায় আসতেই অরু নিজেও ডোরাকে রেখে ক্রীতিককে অনুসরণ করে উপরে রুমের দিকে এগিয়ে যায়।
রুমে প্রবেশ করে অরু দেখতে পায়, দক্ষিণ দিকের যে কাচের দেওয়ালটা আছে সেদিকেই মুখ করে দু'পকেটে হাত গুঁজে জীবন্ত মূর্তির ন্যায় দাড়িয়ে আছে ক্রীতিক।
অরুর মনে এক অজানা আ'তঙ্ক খচখচ করছে, নিজের উদ্বিগ্নতা দমাতে না পেরে বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে প্রশ্নটা ছু'ড়েই ফেললো ও,—— কি হয়েছে আপনার? আপনি কি কিয়ারা রোজারিও কে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন?
আহত গলায় উল্টো শুধালো ক্রীতিক,
—- আমার নাম কি অরু?
অরু ঠোঁট উল্টে অস্ফুটেই জবাব দিলো,
—- আপনার নাম তো জায়ান ক্রীতিক.....
কথা শেষ করার আগেই কিছু একটা আঁচ করতে পেরে, থেমে গেলো অরু,ক্রীতিক ঘুরে তাকিয়ে বললো,
—- এখন বুঝেছিস আমার এই অদ্ভুত নামের রহস্য?
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ছানাবড়া হলো অরুর,চমকে গিয়ে ক্রীতিকের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে অরু বললো,
— তারমানে আআপনিই কিয়ারা রোজারিওর বড় সন্তান!!
কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই মুখের উপর দু'হাত দিয়ে অরু বলে ওঠে,
—- আআপনি ঠিক আছেন?ক্রীতিক জবাব দিলো না, এগিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসে অরুকে নিজের কাছে টেনে এনে দু'হাতে শক্ত করে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে, মাথা ঠেকালো অরুর ছোট্ট পেটে।

ওর এমন কাতর,ব্যথাতুর স্পর্শে জমে গেলো অরু, যে মানুষটা সবসময় অরুকে নিজের বুকে ঠায় দিয়ে এসেছে, সে কিনা আজ হুট করেই অরুর বুকে মুখ লুকালো? ক্রীতিকের মা মা’রা গিয়েছে, যেভাবেই থাকুক না কেন মা নামক নাড়ির টানটুকু পৃথিবীর বুকেতো অন্তত জীবিত ছিল। আর আজ সেই বিনে সুতোর বাঁধনটাও ছিন্ন হলো।
ক্রীতিকের কষ্ট পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাহলে ক্রীতিক কেন চুপচাপ বসে আছে? কেনইবা মায়ের কথা বলে বিলাপ করে কা’ন্না করছে না এখনো? জানা নেই অরুর। ও তো কেবল নিজের ছোট্ট দু’হাতে ক্রীতিকের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে ব্যস্ত।
এভাবে নিঃশব্দে শুধু ভারী দীর্ঘশ্বাসের আদান-প্রদানে কতোটা সময় যে অতিবাহিত হয়েছিল জানা নেই অরুর, ভীষণ হৃদয়বিদারক নিস্তব্ধতা কাটিয়ে ক্রীতিকের ফোনটা যখন ভাইব্রেট হয়,তখনই ভ্রম ছুটে যায় অরুর, ও ক্রীতিককে বুকের মধ্যে আগলে রেখেই একহাত বাড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করলো।ফোন রিসিভ করে কানে ধরতেই ওপাশ থেকে প্রত্যয় বলে,—— ভাইকে লস অ্যাঞ্জেলস যেতে হবে, ওনার মায়ের শেষ কার্য ওখানেই সম্পন্ন হবে।
অরু মিনমিনিয়ে বললো,
—- ওনার মা কি ওনাকে একবারও দেখতে চায়নি?
জবাবে প্রত্যয় বলে,
—- শুনেছি মৃ’ত্যুর আগ পর্যন্ত নিজের ভুলের জন্য আহাজারি করছেন তিনি, চাতক পাখির মতো মুখিয়ে ছিলেন ছেলেকে একনজর দেখার জন্য, কিন্তু ভাই ইচ্ছে করেই নানা বাড়ির সাথে

সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল বহুবছর আগেই। তাই শেষ ইচ্ছে আর পূরণ হয়নি ওনার।
অরু কিছুটা হলেও ঘটনার সারাংশ বুঝতে পেরে কল কেটে দিলো তৎক্ষনাৎ ।
তারপর ক্রীতিকের মুখোমুখি হয়ে হাটু গেড়ে বসে, ওর গাল দুটো দু'হাতে আঁজলা ভরে ধরে শুধালো ,—- আমার শাশুড়ি মাকে যে সবসময় টিভিতে দেখাতো আগে বলেন নি কেন?
ক্রীতিক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অরুর পানে,অরু এবার পুনরায় বললো,
—— শেষ কৃত্তের জন্য আপনি কাল এল. এ. যাচ্ছেন তাইতো?
ক্রীতিক হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, অরু বলে,
—- তাহলে এই সুযোগে আমিও একটু আমার মায়ের কাছে যাই? মা' তো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক সবকিছু মেনে নেবে, দেখবেন।
আমি কথা দিচ্ছি আপনি ফিরে এসে দেখবেন সবকিছু স্বাভাবিক আর কতোটা সুন্দর হয়ে গিয়েছে। মা আপা আমাদের সম্পর্কটা মেনে নিয়েছে। তারপর আমরা প্রতিদিন একসাথে ভার্সিটি যাবো, যে যার কাজ করবো, ফেরার পথে মায়ের বাসা থেকে রাতে খেয়ে প্রতিদিন বাড়ি ফিরবো। উইকএন্ডে রাত জেগে মুভি দেখবো, অর্ণব ভাইয়া,সায়র ভাইয়া,আর এলিসা আপুর সাথে সুযোগ পেলেই ট্যুরে যাবো, আমাদের সপ্নের মতো সংসার হবে, আমি কথা দিচ্ছি, এ জীবনে আর কখনো একা হবেন না আপনি। আর না কখনো আমরা দুজন আলাদা হবো। এটাই শেষবার।

অরুর প্রতিশ্রুতির পালা শেষ হলে ক্রীতিক পুনরায় অরুকে দাঁড় করিয়ে ওর বুকে মাথা রাখে,চোখ দুটো আবেশে বন্ধ করে নির্লিপ্ত গলায় বলে,—- একটা সত্যি বলি? পুরো দুনিয়াতে তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই অরু। তুই না থাকলে এই বাড়িটার মতোই আমার হৃদয়টাও ফাঁকা হয়ে যায়, কি ভীষণ য'ন্ত্রনায় কাতরাই আমি,সেটা কেবল আমার হৃদয় জানে।তুই আমার অবসেশন অরু,আমার মাদকতা,আমার স্লিপিং পিল, আমার দিন, আমার রাত, আমার আশা, আমার গড়ন, আমার ভাঙন,আমার জীবন আমার মরন সবকিছু তুই। তাই কখনো যদি আমার থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টাও করিস,সেদিন তোর য'ন্ত্রনাদ্বায়ক ভাগ্য আমি নিজের হাতে লিখবো জান।গাড়িতে বসে বসেই কালকে অরুকে বলা ব্লে'ডের মতো ধারা'লো কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আজ আবারও একবার আওড়ালো ক্রীতিক,

—— আই রিপিট,আমার থেকে দূরে গেলে তোর জীবনে কালবৈশাখী ঝড় তুলে ছাড়বো আমি।পরন্ত বিকেলে সাইক্লিং করে মাত্রই ইকো পার্কের শেষ প্রান্তে এসে থামলো অর্ণব আর এলিসা।

অর্ণব বরাবরই ম্যাকবুক,কম্পিউটার, কিবোর্ড এসব নিয়ে পরে থাকতে বেশি পছন্দ করে,কিন্তু আজকাল এলিসার পাল্লায় পরে প্রায়শই বিকেলের দিকে সাইকেল নিয়ে কিংবা হেটে হেটে বের হতে হয় ওকে।এলিসা আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী মেয়ে,সে এথলেটিক গার্ল, দৌড়, ঝাপ, লাফালাফি, মা'রামা'রি এসবে শীর্ষঅবস্থান ওর।

দুই মেরুর এই দুই প্রেমিক জুগলের মিলে মিশে থাকাটাও বেশ কষ্টসাধ্য, তবুও এলিসাকে বসে রাখার জন্য নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে অর্ণব,মনেমনে ভাবে —-ভালোবাসি,ফেলেতো আর দিতে

পারবো না? কিন্তু এই বদ মেজাজী উড়নচন্ডী মেয়েটার একটা দফারফা করতেই হবে এবার।
এলিসা সাইকেলের চেইনে চোখ বোলাতে বোলাতে শুধালো,—- কি ভাবছিস?
অর্ণব মাথা চুলকাতে চুলকাতে আশপাশটা পরখ করতে করতেই চট করে বলে ওঠে,
—- দেখ এলি ওখানে একটা চার্চ।
এলিসা একনজর সেদিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে বললো,
— তো?
—- তো মানে? চল গিয়ে ফাদারের কাছ থেকে আর্শিবাদ নিয়ে আসি।
উপরে উপরে এলিসাকে পটালেও মনেমনে অর্ণব ভাবে,
—— ব'জ্জাত মহিলা, একবার চার্চে চল, ফাদারের কাছ থেকে বশীকরন পানি পরা এনে যদি না খায়িয়েছি তোকে, তবে আমার নামও অর্ণব সায়ন্ত নয়।
অর্ণবের কথায় এলিসা কিছু একটা ভাবলো, তারপর না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,—- নাহ যাবো না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে চল ফিরে যাই।
অর্ণব তৎক্ষনাৎ নিজের সাইকেলটাকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসে এলিসার বাহু আঁকড়ে ধরে বললো,
—— এমন করেনা জান, সামনে বিয়ে করতে হবেনা? একটুখানিরই তো ব্যাপার, চলনা প্লিজ।
অর্নবের এহেন আহাজারিতে অপারগ এলিসা ফোস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

—— ঠিকাছে চল।
অর্ণব খুশি মনে এলিসাকে ধরে নিয়ে চার্চের দিকে এগিয়েই যাচ্ছিল, তখনই কোথা থেকে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে উদয় হলো সায়র।
সায়রকে দেখা মাত্রই বিরক্তিতে চিড়িবিড়িয়ে উঠে অর্ণব বলে,—- শালা বিরিয়ানির এলাচি, আসার আর টাইম পেলিনা?
সায়র কথা বলার ফুরসত পাচ্ছে না, এখনো হাঁপাচ্ছে, তা দেখে এলিসা অর্ণবকে থামিয়ে দিয়ে বললো,
—- চুপ কর অর্ণব, আগে ওকে শ্বাস করার সুযোগ দে।
অর্ণব থমথমে গলায় বললো,
—- দিলাম।
বেশ অনেকক্ষন পরে পানি পান করে খানিকটা শান্ত হয়ে অর্ণবের উদ্দেশ্যে সায়র বলে,
—- জেকে তোর প্রেমের বারোটা বাজালো বলে, দোস্ত।
অর্ণব ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
—- কেন কি হয়েছে? তোকে না ঘুরে আসতে বললাম অরুর বাসার সামনে থেকে? এতোটুকু দ্বায়িত্ব পালন করতে পারিস না? ম্যানারলেস কোথাগার।
—- আরে সেখানেই তো গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি অরুদের এ্যাপার্টমেন্টে অন্য ভাড়াটিয়া উঠেছে, অরুরা নেই।
অর্ণব বড়বড় চোখ করে বললো,—- নেই মানে? হুট করে কোথায় গেলো অরুরা?
সায়রের কথায় অর্ণবের গলা শুকিয়ে এসেছে, এলিসা অর্ণবের ভয়ার্ত চাহনি দেখে আগ বাড়িয়ে সায়রকে শুধালো,

—- আজ প্রায় দশদিন হতে চললো, জেকে এখনো এল.এ থেকে ফেরেনি?
সায়র না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—— ওর মায়ের কিছু উইশ ছিল, সেগুলো ও আর ওর ভাই মিলে পূরন করতে করতেই শুনেছি টাইম লেগেছে, তবে আজ কিংবা কালের মধ্যে তো ফিরে আসার কথা। সায়রের কথায় এবার এলিসার কপালেও চিন্তার ভাঁজ পরলো, ও একটা ভয়ার্ত শুষ্ক ঢোক গিলে, পেছনে খ্রীষ্ট ধর্মের পবিত্র ধর্মশালা চার্চের দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রুশ এঁকে বিড়িবিড়িয়ে বললো,
—- আই উইশ, এভ্রিথিং উইল বি ভেরি ফাইন, আমেন। “দিন পাল্টায় রঙ বদলায় অস্থির মন
হাতের মুঠোয় ফেরারি সময়,শুধু শিহরণ,
ছায়াপথ ধরে হাতছানি কার, সেই পিছুটান….
তার কথা মনে পরে… তার কথা মনে পরে…”
গাড়ির প্লে লিস্টে বাজতে থাকা চমকপ্রদ লাইন গুলো শেষ হতে না হতেই সহসা থেমে গেলো ব্ল্যাক মার্সিডিজ গাড়িটা। জানালার কাঁচ নামিয়ে সেই তখন থেকে নিকোটিনের ধোঁয়া উড়াচ্ছে ক্রীতিক,যার দরুন গাড়িটা থেমে যাওয়া সত্ত্বেও প্রত্যয়কে আগ বাড়িয়ে আর কিছু প্রশ্ন করলো না ও,বরং মসৃণ চামড়া দিয়ে তৈরি প্রসস্থ গদিতে পায়ে পা তুলে বসেই দু’ঠোটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার কুন্ডলী ছেড়ে,অন্যহাতে ফোন তুলে কল লাগালো ব্ল্যাক হার্ট ইমোজি দিয়ে সেভ করা একটা নাম্বারে। ক্রীতিক কলে ব্যস্ত এই সুযোগে গাড়ি থেকে সহসা নেমে গেলো প্রত্যয়, আজ তেরো দিনের মাথায় লস অ্যাঞ্জেলস থেকে সানফ্রান্সিসকো ফিরেছে ওরা। ক্রীতিকের মা বড়

পর্দার সাবেক তারকা, সে হিসেবে অনেক বেশি দায় দায়িত্ব আর ফর্মালিটিস ছিল সেখানে , এছাড়া বেশকিছু ইন্টারভিউ তো ছিলোই। কিয়ারা রোজারিওর দ্বিতীয় ঘরের সন্তান রয়েছে ঠিকই তবে সে একা হাতে সকল দ্বায়িত্ব সামলানোর মতো ততোটাও বড় নয়, একসাথে অনেক গুলো ধকলের ফলসরুপ পরিস্থিতিটাই বদলে গিয়েছিল তখন,অগত্যাই ইচ্ছে না থাকা সত্বেও থেকে যেতে হয়েছিল ক্রীতিক কে।আর আজ কাঁধে জমে থাকা মাতৃত্বের শেষ দ্বায়িত্বটুকুর অবসান ঘটিয়ে সানফ্রান্সিসকো ফিরে সবার আগে অরুকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ওদের ভবনের সামনে এসে গাড়ি থামাতে নির্দেশ করে ক্রীতিক।প্রত্যয় নিজেও অবশ্য মনে মনে এটাই চেয়েছিল, কারন ও নিজেও তো অনুকে দেখেনা বহুদিন। ক্রীতিক আর অরুকে নিয়ে সেই যে রাগারাগি হলো, তারপর প্রতিদিন ফোনে কথা হলেও মায়ের ভয়ে তটস্থ অনু সামনাসামনি দেখা করার সাহস করে উঠতে পারেনি আর,তাছাড়া গত তেরো দিন ধরে তো ফোনের যোগাযোগটুকুও পুরোদমে বন্ধ। ওই জন্যই তো বহুদিনের দূরত্বে প্রত্যয়ের হৃদয়টাও যে পু'ড়ছে খুব।দিনের আলোকে পায়ে মাড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে এইতো কিছুক্ষন হলো। পশ্চিম আকাশে এখনো সূর্যের সোনালী আবিরের ছটা,গোধূলি সন্ধ্যায় তীব্র হাওয়া দিচ্ছে প্রকৃতি, যার দরুন ভবনের পাশে টাঙানো যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সাইজের একফালি পতাকাটা পতপত করে উড়ছে। সেই সাথে উড়ছে প্রত্যয়ের কপাল ছুঁই ছুঁই লম্বা চুল গুলোও। নতুন করে টাঙানো পতাকাটাকে এক নজর পরখ করে তরাগ গতিতে ভবনের দিকে চোখ সরিয়ে নিলো প্রত্যয়, একতলা দুইতলা ছাড়িয়ে নজরবন্দি হলো তিন তলায় অবস্থিত কর্ণারের এপার্টমেন্টটা। ভর সন্ধ্যা

বেলাতেও সেথায় নিকোশ কালো অন্ধকার বিরাজমান, কোনোরুমেই একফোঁটা আলো জ্বলছে না। পুরো ভবনে এই একটা এ্যাপার্টমেন্টেরই এই হাল দেখে বিস্ময়ে বিমূর্ত হলো প্রত্যয়ের হাসিহাসি মুখখানা।
অনুর রুমের টানা বারান্দায় চোখ বুলিয়ে অস্ফুটেই বিড়বিড়ালো প্রত্যয়,—- ব্যাপারটা কি?অনুতো সবসময় ঘরে সন্ধ্যা বাতি জ্বালিয়ে দেয়, তাহলে আজ কোথায় গেলো সব?
প্রত্যয়ের অযাচিত ভাবনার ছেদ ঘটে ক্রীতিকের দ্রুত পায়চারির আওয়াজে, ও চোখ ঘুরিয়ে দেখতে পায় এই ঠান্ডা হাওয়ার মাঝেও নিজের ওভারকোর্টটা ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে কানে ফোন আর হাতে সিগারেট নিয়ে ক্রমাগত পায়চারি করছে ক্রীতিক। চেহারায় তার ভীষণ তীক্ষ্ণতা আর বিরক্তির ছাপ, দেখে মনে হচ্ছে কোনোকিছুর অপারগতায়, জিদের তোপে নিজের চুল নিজেই টেনে ছিড়ে ফেলতে চাইছে ও। ক্রমশ একই নাম্বারে ডায়াল করতে করতে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ক্রীতিকের, এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করতে করতেই বলে ওঠে ,—- অরু, জানবাচ্চা আমার প্লিজ ফোনটা তোল।এই বয়সে তোর জন্য এতো পাগলামি করতে আর ভালো লাগেনা আমার। অথচ প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মূহুর্তে চিন্তা দিয়ে পাগল করে ছাড়িস আমাকে। এতো কেন নির্দয় তুই ?
ক্রীতিকের বেপরোয়া আর উদভ্রান্ত ভঙ্গিমা নজরে এলে প্রত্যয় এগিয়ে এসে শুধালো,
—- এনি প্রবলেম ভাই?

ক্রীতিক সিগারেটের শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে তিন তলার দিকে একঝলক তাকিয়ে ভরাট গলায় বললো,—- অনুকে কল দাও প্রত্যয়, আমার ব'দমাশ বউটা কল তুলছে না।
ক্রীতিকের কথা শুনে প্রত্যয়ের ভেতরটা ধক করে উঠলো আচমকা, ও তৎক্ষনাৎ গলা খাদে নামিয়ে বললো,
—- অনু তো সকাল থেকেই কল তুলছে না ভাই, আমি ল্যান্ড করার পর থেকেই কল দিয়ে যাচ্ছি,ফোন অফ।
প্রত্যয়ের কথায় ক্রীতিকের শক্ত চোয়াল ধা'রালো হয়ে উঠলো কিছুটা, বাঁজপাখির মতো তীক্ষ্ণ নজরটা পুনরায় চলে গেলো তিনতলার টানা বারান্দায়, তিমিরে ঢাকা বারান্দার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকাতেই চট করে ক্রীতিকের সুকৌশলি মস্তিষ্কটা খারাপ কোনোকিছুর পূর্বাভাস অনুভব করলো। তৎক্ষনাৎ পেশিবহুল হাতদুটো মুঠি বদ্ধ হয়ে উঠলো ওর, ছু'রির ফলার মতো ধারালো নজরটা প্রত্যয়ের দিকে ঘুরিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে ক্রীতিক হুকুমের স্বরে বললো,— প্রত্যয় উপরে যাও, ভেতরে কে আছে, না আছে,কে কি করছে,কে কি বলছে, কিচ্ছু দেখার দরকার নেই সোজা গিয়ে অরুকে টা'নতে টা'নতে নিচে নিয়ে এসো।
ক্রীতিকের কথায় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে প্রত্যয় ভবনের দিকে চলে গেলেও ক্রীতিকের মন বলছে অরু উপরে নেই,অরু যদি উপরেই থাকতো তবে তা ঠিকই টের পেতো ক্রীতিকের হৃদয়। আর ওই জন্যই শেষ সন্দেহটুকু হটাতে প্রত্যয়কে পাঠানো। প্রত্যয় চলে গেলে ক্রীতিক গাড়ির ডিকিতে হেলান দিয়ে চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ করে নিলো,প্রচন্ত য'ন্ত্রনায় মাথা ফে'টে যাচ্ছে ওর,তার সাথে যোগ হয়েছে হৃদয়ের লেলিহান। একটা মেয়ের জন্য আর কতো? আগে তাও

শারীরিক মানসিক দুটোরই দূরত্ব ছিল, ভালোবাসাটা একতরফা ছিল। ক্রীতিক নিজেকে ব্যাপক ভাবে সামলে নিয়েছে বহুবছর। কিন্তু এখন? সবটা পাওয়া হয়ে গিয়েছে, অরুর শরীরের প্রতিটা খাঁজে খাঁজে ক্রীতিকের তীব্র ভালোবাসার স্পর্শ জড়ানো, সেই সাথে হৃদয় উপচানো মায়া তো আছেই, এখন কি করবে ক্রীতিক? পেয়ে হারানোর ব্যথাটা যে বড্ড যন্ত্রনাদ্বয়ক। অরু কি তা বোঝেনা? খানিকক্ষণ চোখ দুটো বন্ধ রেখে অরুকে খুব কাছ থেকে অনুভব করতে করতেই অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো ক্রীতিকের গলা থেকে,
—-আই সয়ার অরু,তোকে খুঁজে পেলে আমি যে তোর কি হাল করবো সেটা আমি নিজেও জানিনা। লাইট, ক্যামেরা একশান, ডিরেক্টর রিচার্ডের মুখ থেকে শব্দ ক'খানি বের হতেই লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর সুদর্শন পোজ দিতে শুরু করলো সায়র। শেষ রাতে শ্যুট চলছে,সামনেই সামার ফেস্টিভ্যাল,বছরের শুরুর দিকে এই সময়ে এসে ফটোশ্যুটের কাজে বেশ ব্যস্ত সময় পার করে সায়র। রোগা পাতলা লম্বাটে গড়ন আর ব্রাউন স্কিন টোনের সায়রের নিখুঁত চেহারা আর আত্মবিশ্বাসী রেম্প ওয়াকের দরুন গুচ্চি,লুইস ভুইটোন,নাইক,কেলভিন ক্লাইনের মতো পৃথিবী সেরা নামি দামি প্রায় অনেক গুলো ব্র্যান্ডেরই সুপার মডেলের খেতাব রয়েছে সায়রের ঝুলিতে।
এতো সাকসেস আর প্রতিপত্তির বাইরে গিয়ে না পাওয়ার তালিকাটাও বৃহত ওর। আর এখন এই সময়ে এসে সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন ওর জীবনে, সেটা হলো জীবন সঙ্গী, যাকে এখনো খুজে পাওয়া হয়নি সায়রের। কি জানি কবে পাবে, কার নামই বা লেখা আছে ওর ভাগ্য জুড়ে। ডিরেক্টর সাহেব প্যাকআপ বলতেই,

সায়র দ্রুত হেটে মেকআপ রুমে চলে গেলো, ওর পেছন পেছন গেলো আরও দুজন স্টাফ, যারা এই মূহুর্তে ওর মেকআপ ঠিকঠাক করবে। সায়র এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের উপর গা ছেড়ে বসেছে কি বসেনি তার আগেই ঝীম ঝীম আওয়াজে ভাইব্রেট হলো ওর মোবাইলটা। কে কল দিয়েছে দেখার জন্য ফোনটা চোখের সামনে ধরতেই তরাগ করে লাফিয়ে উঠলো সায়র। ফোনের স্ক্রীনে ক্রীতিকের রাগারাগি চেহারাটা ভাসছে,তারউপরে গুটিগুটি ইংরেজি অক্ষরে লেখা “ব্রিটিশ হিটলার”।
ক্রীতিক কল দিয়েছে তাও এই সময় ব্যাপারটা সন্দেহ জনক, ফোনের দিকে তাকিয়ে মনেমনে সায়র বলে,
—-এবার কি করবো? কি উত্তর দেবো? কল টা কি কেটে দেবো?কিন্তু কল না ধরলে তো আরেক বি’পদ, হিটলারের বাচ্চা সোজা শ্যুটিং সেটে এসে কেলিয়ে যাবে, তখন আবার মান ইজ্জতের ব্যাপার।
কিছুক্ষন একই ভাবে ফোনের দিকে চেয়ে থেকে, চোরের মতো এপাশ ওপাশ তাকিয়ে কয়েকদফা শুষ্ক ঢোক গিলে ফোন রিসিভ করে ভয়ে ভয়ে কানে ধরলো সায়র।
ফোন তোলার সঙ্গে সঙ্গে, এপাশ থেকে হ্যালো ট্যালো বলার কোনোরূপ ফুরসত না দিয়েই ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রীতিক,—- সায়রের বাচ্চা আমার অরু কই?
ক্রীতিকের কথায় ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সায়র,মনেমনে বললো,
— জানতাম, যত দোষ সায়র ঘোষ।

—-- সায়র উত্তর দে, অর্ণব কে আমি বলে যাইনি অরুর দিকে খেয়াল রাখতে? কোথায় ওই হতচ্ছাড়া? অরুকে খুজে না পেলে কিন্তু এলিসাকে আমি নিজে দাড়িয়ে থেকে অন্যত্র বিয়ে দেবো,কথাটা বলে দিস ওকে।
ক্রীতিক রাগে কাঁপছে, কথার টোনে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাই সায়র আর কোনোরূপ মশকরা কিংবা ভনিতা না করেই বললো,
—-- অরু যে নেই সেটা আরও দুদিন আগেই জেনেছি আমরা, তোর কথা মতো খোঁজ নিতে গিয়েই জেনেছি। পরে উপায়ন্তর না পেয়ে অর্ণব অরুর বোনের ফোন নাম্বার জোগাড় করে লোকেশন ট্র্যাক করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কাজ হয়নি,ফোনটা বন্ধ , লাস্ট লোকেশন ওদের এপার্টমেন্টেই।
ক্রীতিক ক্রোধে ফেটে পরে বললো,—- হাদারাম, তাহলে আগে কেন জানাসনি আমাকে? এতোদিন পরে এখন আমি কোথায় খুজবো ওকে?
সায়র ভয়ার্ত কন্ঠে বললো,
—-- তুই রেগে যাবি, দুশ্চিন্তা করবি তাই সাহসে কুলায় নি।
ওর কথায় ক্রীতিক দাঁত খিঁচে বলে ওঠে,
—-- তো এখন কি আমি ঠিক আছি? তোর কি মনে হয়?
সায়র জবাব দিলোনা, অপর পাশের নিরবতা আঁচ করে ক্রীতিক নিজের অতিরিক্ত ক্রোধ দমিয়ে, গলা কিছুটা খাদে নামিয়ে শুধালো,
—-- অর্ণব কোথায়?ফোন কেন তুলছে না ও?
সায়র বললো,—-- তোর ভ’য়ে ফোন টোন বন্ধ করে কোথায় যেন ঘাপটি মে’রে আছে, মেইবি এলিসার বাসায়।
—-- ফা’ক অফ।

ক্রীতিক শেষ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিক পিক করে কল কাটার আওয়াজ ভেসে এলো।
সায়র একটা সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
—— যাক এই যাত্রায় বেঁচে গেলাম।
অতঃপর পরক্ষনেই কপাল জুড়ে সুক্ষ চিন্তার ভাজ পরলো ওর,আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে আওড়ালো সায়র,
—— কোথায় যেতে পারে অরু?একটা ক্রোধিত গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, মোবাইল ফোনটা শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে পাহাড়ের ঢালে ছুটে মারলো ক্রীতিক। সন্ধ্যা রাতে যা ভেবেছিল তাই হয়েছে, শুধু অরু কেন অরুর একটা চিহ্ন পর্যন্ত পরে নেই ক্রীতিকের জন্য। আর এই ব্যপারটাই জ্বা'লিয়ে পু'ড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে ক্রীতিক কে। হৃদয়ের অসহ্য য'ন্ত্রণা আর মস্তিষ্কে জ্বলতে থাকা আ'গ্নেয়গিরির দাবানল যেন একসাথে গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে। প্রচুর মানসিক চাপে নিজের অজান্তেই বারবার হাতের পিঠ দিয়ে নাক ঘষে যাচ্ছে সেই সন্ধ্যা থেকে।
মাথাটাকে সামান্য একটু ক্ষনিকের নিস্তার দিতে দিয়াশলাই দিয়ে আবারও সিগারেট ধরিয়ে নতুন উদ্যমে নিকোটিনের ধোয়া বাষ্পিত করতে ব্যতিগ্রস্থ হলো ক্রীতিক। সন্ধ্যা থেকে কতবার যে স্মোক করেছে সে খেয়াল নেই ওর। সিগারেটে পুড়ে সুন্দর ডার্কব্রাউন পুরুষালী ঠোঁট জোড়া একরাতেই কেমন তামাটে রঙ ধারণ করেছে।
শেষ রাতের আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে শুক তারা। তমশাচ্ছন্ন রাতে পুরো শহর ঘুমিয়ে আছে,ঘুম নেই শুধু ক্রীতিকের দু'চোখে।

ওর ঘোর লাগা নিদ্রাহীন চোখদুটো জুড়ে তো শুধু অরুর বসবাস,মেয়েটা হারিয়ে গিয়েও ঘুমাতে দিচ্ছে না। কি আশ্চর্য!ক্রীতিক যখন বাইকে হেলান দিয়ে স্মোক করতে করতে হিজিবিজি ভাবছিল তখনই হুরমুরিয়ে ছুটে আসে প্রত্যয়, পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে ক্রীতিকের দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় করে দম নিলো ও। সেইসাথে হাতদুটো দিয়ে হাঁটুতে ভর করে হাঁপাতে লাগলো কিছুক্ষন। নিস্তব্ধ রাতে শুনশান পরিবেশে হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে প্রত্যয়ের বক্ষদেশ, কোনোমতে নিজের ব্রেথক্যাচ করে অস্পষ্ট আওয়াজে প্রত্যয় শুধালো,

—- আপনার ফোন কোথায় ভাই?

ক্রীতিক নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দিলো,

— ফেলে দিয়েছি।

—- কোথায় ফেলেছেন?

ক্রীতিক চোখ দিয়ে ইশারা করলো পাহাড়ের ঢালে। প্রত্যয় সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

—- খোঁজ নিয়েছি ভাই,অরুরা সানফ্রান্সিসকোর কোথাও নেই।

ক্রীতিক বললো,—- শুধু সানফ্রান্সিসকো না,পুরো ইউ এস এ তে যে নেই সেটা আমিও জানি, থাকলে লোকেশন ট্রাক করা যেত, অন্য কোনো ইনফরমেশন থাকলে বলো।

প্রত্যয় ঠোঁট কামড়ে বললো,

—- ডক্টর এডওয়ার্ডের চেম্বারে গিয়েছিলাম।

ক্রীতিক এবার সচকিত হয়ে শুধালো,

—- কি বলেছেন উনি?

— উনি বলেছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি আজমেরী ম্যাম নিজের চিকিৎসা পত্রের সবকিছু গোছাচ্ছিলেন, এমনকি ওনার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে জানিয়েছিলেন, কোনোভাবে এখন দেশে ফিরতে পারবে কিনা।
প্রত্যয় বাকি কথা শেষ করার আগেই ক্রীতিক বললো,
—- এবার সবকিছু ক্লিয়ার প্রত্যয়, আজমেরী শেখ তার মেয়েদেরকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। কিন্তু ওনাকে এতো তাড়াতাড়ি এ কাজে হেল্প করলো কে? কোম্পানির হেল্প নিলে তো আমার কানে ঠিকই পৌছাতো, তাহলে কার এতো সাহস?
প্রত্যয় এতো বেশি ঘাটালো না,বরং উল্টো প্রশ্ন ছু'ড়ে বললো,
—- কিন্তু ভাই বিডি তে ফিরে কোথায় যেতে পারে?
প্রত্যয়ের কথায় ক্রীতিক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললো,
—- আজমেরী শেখের দৌড় জেকে গ্রুপ, আর ক্রীতিক কুঞ্জ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।
পরক্ষণেই ভ্রু কুঞ্চিত করে কিছু একটা ভেবে ক্রীতিক বললো,
— আচ্ছা আজমেরী শেখের এ্যাসিসট্যান্ট কি কোনোভাবে এতে ইনভলভ?
প্রত্যয় না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,—- না ভাই, রাজ বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে, তাছাড়া ওর পরিবার শান্তি প্রিয়।সেদিন আপনার সাথে ঝামেলা হবার পর,রাজ ওর বাবা মায়ের নির্দেশে চাকরিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে।কারণ ওর পরিবার চায়নি দ্বিতীয়বার তাদের ছেলে আপনার সামনে পরুক।
— ভেরি গুড, তুমি যাও রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, গিয়ে রেস্ট করো।

প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে চলে যাওয়ার আগে আরেকবার ঘাড় ঘুরিয়ে শুধালো,
—- ভাই আপনি।
ক্রীতিক আরও একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললো,
—— সময় হলে চলে যাবো, ইউ স্যাড গো।
প্রত্যয় আর কথা বাড়ায় না চুপচাপ বড়বড় পা ফেলে যায়গা ত্যাগ করে।
—- আহ!দিস ফা’কিং অবসেশন।প্রত্যয় চলে যেতেই গম্ভীর আওয়াজে কথাটা বলে বাইকের লুকিং গ্লাসের মাঝ বরাবর সজোরে পাঞ্চ বসিয়ে দিলো ক্রীতিক,সঙ্গে সঙ্গে ভে’ঙে চৌচির হয়ে ঝরঝর করে মাটিতে আঁচড়ে পরলো কয়েক টুকরো ভগ্ন কাঁচ,সেই সাথে ধারালো কাচে আ’ঘা’তপ্রাপ্ত হয়ে র’ক্ত বেরিয়ে এলো ক্রীতিকের হাতের বেশ কয়েকটা আঙুল থেকে।
নিজের র’ক্তা’ক্ত হাতের দিকে এক পলক ও না তাকিয়ে উল্টে একের পর এক ধোঁয়ার কুন্ডলী ছাড়তে ছাড়তে পুনরায় গর্জে উঠে হিং’স্র গলায় ক্রীতিক বললো,
—- প্র’তারক, মি’থ্যাবাদী,ছ’লনাময়ী নিজের সবকিছু আমার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে, হাজারটা মি’থ্যা প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে, আমাকে নিজের জন্য উন্মাদ বানিয়ে ছেড়ে এভাবে মায়ের হাত ধরে পালিয়ে যেতে একবারও কলিজা কাঁপলো না তোর? আমি তোর আদতে কি হাল করবো সেটা একবারও মাথায় আসেনি তাইনা? ঠিকাছে, জায়ান ক্রীতিকের আসল চেহারাটা এবার তুইও দেখবি। কি ভেবেছিলি? পিচ্চি বলে ছেড়ে দেবো? মোটেই না, জায়ান ক্রীতিক এতোটাও স্বাধু পুরুষ নয়, ভালোবাসার দ’হনে একটু একটু করে পু’ড়ি’য়ে মা’র’বো

তোকে আমি। ঠিক যেভাবে তুই আমাকে মে'রেছিস। তোকে যেদিন পুরোপুরি ভাঙতে পারবো, সেদিন আবারও এই বুকে ঠায় পাবি তুই, তার আগে আর নয় ।পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছুটা নিচে গিয়ে ক্রীতিকের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে সেখানেই ধপ করে বসে পরে প্রত্যয়। দূর্বল হাতে চিকন ফ্রেমের চশমাটা খুলে,অদূরে সানফ্রান্সিসকো মূল শহরের দিকে নিস্প্রভ চোখে তাকিয়ে মনেমনে প্রত্যয় বলে,

—— ভাইকে কি করে বোঝাই আমার চোখেও যে আজ আর ঘুম নামবে না, এভাবে সারাজীবন পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি অনু? এই হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব ছাপিয়ে আমি কি আদৌও তোমাকে খুঁজে পাবো? আর কি দেখা হবে আমাদের?

অযাচিত প্রশ্নের উত্তর মেলেনা আর, উল্টে প্রেয়শীকে হারানোর নিদারুণ বিজ্ঞাপ্তিতে ছেয়ে যায় হৃদয়ের শহর, সহসাই হাত দিয়ে নিজের বুকের বাম পাশটা চেপে ধরে প্রতয়,চোখের কার্নিশ বেয়ে গড়িয়ে পরে অশ্রুশিক্ত দুফোঁটা নোনাজল, তৎক্ষনাৎ শার্টের হাতার উল্টো পিঠ দিয়ে সেই জল টুকু আড়াল করে পকেট থেকে ফোন হাতরে কাউকে কল লাগালো ও, ওপাশ থেকে কে কি বললো সেটা না বোঝা গেলেও এপাশ থেকে প্রত্যয় বললো,

—— অনন্যা শেখের বিডি নাম্বারটা চাই আমার, এস সুন এস পসিবল। অবশেষে ক্রীতিক যখন বাড়িতে ফিরলো তখন সবে সবে ভোর হয়েছে মাত্র। চারিদিকে সূর্যের সোনালি ছটা নিদারুণ আলো ছড়াচ্ছে, ডুপ্লেক্স বাড়িটা কাঠের শোপিচের মতোন মাথা উঁচু করে স্ব

স্থানে দাড়িয়ে আছে, এই একটা মায়া যা ক্রীতিককে আজ অবধি ছেড়ে যায় নি।

ফ্রেঞ্চ গেইট ছাড়িয়ে টলতে টলতে ভারী পদযুগলে বাড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ক্রীতিক। ওর চোখ দুটো আগের চেয়েও অনুভূতি শূন্য। প্রতিটি কদমে অজানা আ'ক্রমন হানা দিচ্ছে হৃদয়ে। সেখান থেকে কেউ একজন অসহায় গলায় চিৎকার করে বলছে,——

ভেতরে যাস না কষ্ট হবে, ওখানে অরু নেই,সব ফাঁকা।

তৎক্ষনাৎ জিদি উগ্র মনটা গম্ভীর ধা'রালো গলায় বলে উঠছে,

— না থাকলে নেই, ওই মি'থ্যে বাদীটা কবেই বা ছিল আমার, কয়েক দিনের জন্য ফিরে এসে কেবল হৃদয়টাতে এক সমুদ্র জ'লোচ্ছ্বাস তুলে দিয়ে আবার জায়গা মতো ফিরে গিয়েছে, ছ'লনাময়ী একটা। নিজের সবকিছু দিয়ে আমাকে পাগল বানাতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি।

শেষ কথাতে দম আটকে এলো ক্রীতিকের,চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এলো তৎক্ষনাৎ, আবারও সেই এলোমেলো অনুভূতি, অরুর গায়ের মিষ্টি গন্ধ, অরুর নরম তুলতুলে ঠোঁট, ওর স্পর্শ সবকিছু এখনো জীবন্ত দু'চোখের পাতায়। সেসব কথা মাথায় এলে উন্মাদ হয়ে যায় ক্রীতিক। তবে জিদি মস্তিষ্কটা খুব বেশিক্ষণ ভাবতে দিলোনা অরুকে,সবকিছু মাথা থেকে ঠেলে সরিয়ে অকস্মাৎ চোখদুটো খুলে ফেললো ও। পরবর্তীতে আবারও ভারী পা ফেলে এগিয়ে গেলো মেইন ডোরের কাছে। দরজা খুলতে খুলতে হাতের পিঠ দিয়ে সেই কখন থেকে এক নাগাড়ে নাকের ডগা ঘষছে ক্রীতিক। ব্যাপারটা বিরক্তিকর আর আ'শঙ্কা জনক। কিন্তু ক্রীতিকের কাছে প্যানিক এ্যা'টার্ক নতুন কিছু নয়, তাই ও এসবে কোনোরূপ পাত্তা না দিয়েই

চুপচাপ ভেতরে ঢুকে গেলো। ভেতরে প্রবেশ করে হলরুমে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃশ্যগত হলো বিড়াল ছানা ডোরা, আবারও সেই অরুর স্মৃতি, বিরক্তিতে এবার চিড়বিড়িয়ে উঠলো ক্রীতিক, গর্জে উঠে তেঁতো গলায় ডোরাকে ধমকের সুরে বললো,
—— তুই এখনো এখানে কি করছিস? যা ভাগ।
অবুঝ প্রানী ডোরা কি বুঝলো কে জানে? হুট করেই মিয়াঁও মিয়াঁও আওয়াজ করা থামিয়ে দিয়ে চুপচাপ লেজ গুটিয়ে অন্যদিকে হাঁটা দিলো সে। ডোরাও চলে যাচ্ছে, ব্যপারটা বোধগম্য হতেই হাঁটু ভেঙে ধপ করে মেঝেতে বসে পরলো ক্রীতিক,অতঃপর কাতর কন্ঠে বলে উঠলো,—- যাস না ডোরা।
ডোরা গেলোনা সেখানেই লেজ গুটিয়ে বসে পরলো তখনই।
ক্রীতিক সেদিকে একনজর পরখ করে মৃদু হেসে, আবারও নাকের ডগায় আঙুল ছোঁয়াতেই বুঝতে পারলো ওর নোজ ব্লে’ডিং হচ্ছে।
ক্রীতিক ঝাপসা চোখে আঙুলের দিকে তাকিয়ে বিড়িবিড়িয়ে বললো,
—- এগেইন, দিস ফা’কিং প্যানিক এ্যা’টার্ক। বির’ক্তিকর।
কোনোমতে হাতার উল্টো পিঠ দিয়ে ভালোমতো র’ক্তটুকু মুছে,ক্রীতিক কাঁপা হাতে পাহাড়ের ঢাল থেকে কুড়িয়ে আনা আধভাঙ্গা ফোনটা দিয়ে “আর্জেন্ট”লিখে ম্যাসেজ করলো ফ্রেন্ডস গ্রুপে। তারপর একটু নিচের দিকে স্ক্রল করে আবারও সেই ব্ল্যাক হার্ট ইমোজি দিয়ে সেভ করা নাম্বারের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে কাঁপা হাতে টাইপ করলো ক্রীতিক,—- আবারও আমাকে একা করে দিয়ে কোথায় চলে গেলি হার্টবিট? তোকে ছাড়া আমি ঠিক নেই, মোটেই ঠিক নেই। তুই ঠিক আছিস তো জান?

পুরোপুরি চোখ বুজে যাওয়ার আগে এতোটুকুই টাইপ করেছিল ক্রীতিক। ও জানতো এই ম্যাসেজ কিংবা এই নাম্বার কোনোটাই অরুর কাছে পৌঁছাবে না আর, তবুও ছ’ন্নছাড়া, বেপরোয়া মনটাকে কে বোঝাবে এই কথা? কেই বা দেবে অরুর খবর? আচ্ছা অরু আদৌও ঠিক আছে তো?মাঝরাতে বিশাল কক্ষের লাগোয়া কাঠের দরজায় তীব্র করাঘা’তের ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে যেন পুরো অন্দরমহল কেঁপে উঠছে ক্রীতিক কুঞ্জের।
সেই সাথে কাচের চুড়ি ভা’ঙার টুংটাং আওয়াজ। অমন শক্ত পোক্ত দরজা ভেদ করে ভেতরের আওয়াজ তো বাইরে আসার কথা নয়, তবুও ভেতর থেকে অরুর গগন কাঁপানো হৃ’দয় বিদা’রক একেকটা চি’ৎকারে কম্পিত হয়ে উঠছে অনুর শরীর। ওড়না দিয়ে দু’হাতে মুখ চেপে ধরে অরুর কক্ষের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে অনু।
ওদিকে দরজার বাইরে কারও উপস্থিতি টের পেতেই বারাবারি রকমের উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অরু। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে দরজা ধা’ক্কাতে ধা’ক্কাতে ভে’ঙে ফেলছে হাতের সবগুলো চুড়ি। অরুকে এভাবে বুক ফাটি’য়ে কাঁদতে দেখে অনু কাঁপা গলায় বলে ওঠে,—-
অরু বোন আমার একটু শান্ত, আমি মামির কাছ থেকে চাবি ছি’নিয়ে এনে তোর রুমের দরজা খুলে দিচ্ছি, তবুও এভাবে কাঁদিস না দয়া করে।
অনুর কথায় তীব্র কা’ন্নায় ভে’ঙে পরে অরু বললো,
—— জায়ান ক্রীতিককে ছাড়া আমি ম’রে যাবো আপা,তুই দয়া করে আমাকে তার কাছে যেতে দে, আর কোনোদিন তোদের এই অপয়া মুখ দেখাবো না, তবুও তাকে ছাড়া বাঁচবো না।

অনু ভেবে পায়না,জায়ান ক্রীতিকের মতো একটা উগ্র মেজাজী, দয়ামায়াহীন,পা’ষণ্ড পুরুষের জন্য কিনা তার এইটুকু বোন এভাবে পা’গল হয়ে গেলো? কিন্তু কেন? কি এমন আছে জায়ান ক্রীতিকের মাঝে? কোন জাদুবলেই বা বশ করেছে সে অরুকে?
কই অনুর চোখে তো কোনোদিন তেমন কিছু পরেনি, ক্রীতিক অরুকে জো’র করে বিয়ে করেছে ব্যাপারটা ভাবতে গেলেও মাঝেমাঝে সন্দেহ হয় অনুর, মনে মনে বলে,—- কি করে সম্ভব এটা? ক্রীতিক ভাইয়াকে তো কখনো অরুর দিকে ভালো করে তাকাতেও দেখলাম না,অথচ অরু কি-না তার জন্য এভাবে পা’গলামি করছে? আচ্ছা ক্রীতিক ভাইয়া কি আসলেই এতোটা ভালোবাসা ডিজার্ভ করে? উনি তো সুযোগ পেলেই অরুকে মা’রধর করে, তাহলে অরু কেন এমন করছে? একটুআধটু ভালোবাসলে কি কোনোদিন এতোটা পাগলামি করা যায়?মোটেই না। তারমানে কি ক্রীতিক ভাইয়ার ভালোবাসাটা ইনডিভিজুয়াল? আমরাই শুধু দেখতে পাইনা,যার জন্য রয়েছে সে ঠিকই গভীরতা টের পেয়েছে এই ভালোবাসার।
অনুর ভাবনার ছেদ ঘটে অরুর ফোপাঁনোর আওয়াজে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কন্ঠে অরু পুনরায় বলে,
—— আপা দে’না যেতে, ম’রে যাবো তো। তুইওতো ভালোবাসিস, তাহলে আমি কি দোষ করেছি?
অরুর কাকুতি মিনতি শুনে কান্না দমিয়ে রাখতে পারলো না অনু, অজান্তেই চোখের পাতা ভারী হয়ে গড়িয়ে পরলো অশ্রুজল।
অতঃপর কোনোমতে নিজেকে সংবরণ করে, অনু বললো,

—— কি করে যাবি ক্রীতিক ভাইয়ার কাছে? ভুল গিয়েছিস আমরা যে বাংলাদেশ চলে এসেছে,আর তোর জায়ান ক্রীতিক এখনো সেই ক্যালিফোর্নিয়াতে।
অনুর কথায় একপ্রকার ঝাঁজিয়ে উঠলো অরু, অসম্ভব তেঁতো গলায় বললো,—- তাহলে কেন নিয়ে এলি আমাকে? তোদের কি মনে হয় ওনাকে ছাড়া আমি ভালো থাকবো? মোটেই না। জায়ান ক্রীতিক কে ছাড়া পাগ’ল হয়ে যাবো আমি, শুনেছিস তুই? তোর মামি আর মাকেও কথাটা বলে দে, আমার স্বামী একবার ফিরে এলে, প্রত্যেককে ক্রীতিক কুঞ্জ থেকে হটিয়ে ছাড়বে, তবুও আমাকে ছাড়বে না।
অনুর কষ্ট হচ্ছে খুব, ছোট্ট বোনটার এমন দূরহ অবস্থা আর সহ্য করা যাচ্ছে না, তাছাড়া মা তো এখন আগের চেয়ে ভালোই সুস্থ, দু’একটা কথা বললে খুব বেশি বারাবারি হবে না, সেই ভেবেই অনু চোখ মুছতে মুছতে পা বাড়ালো মায়ের কক্ষের দিকে। মনেমনে ঠিক করলো,——আজ মায়ের পায়ে পরে অনুরোধ করে হলেও সবকিছু ঠিক করতে হবে। মামি আর রেজা ভাইয়ের বুদ্ধিতে মা এবার সত্যি সত্যিই অতিরিক্ত করছে। অরুকে আটকে রাখার মতো তো এমন কিছু হয়নি? ও তো আর উড়ে উড়ে আমেরিকা চলে যেতে পারবে না,তাহলে কেন এই নি’র্দয় আচরন?
ভেবে পায়না অনু। তাছাড়া অরুতো ঠিকই বলেছে জায়ান ক্রীতিক অরুর খোঁজে বাংলাদেশে এলো বলে। তখন মামি আর মামির নেতা ছেলে রেজার যে তুলোধুনোর মতোই নাজেহাল অবস্থা হবে সেটা অনু ভালোই আঁচ করতে পারছে এখন থেকেই। অনুজা ছোট্ট বোনটার উদভ্রান্ত ভগ্নহৃদয়ের কা’ন্না আর কষ্ট দেখে অবশেষে

কিছুটা হলেও হৃদয় টললো অনুর। মনের মনিকোঠায় কোথায় যেন চিনচিনিয়ে নাড়া দিয়ে উঠলো ওর।
যেখানে মানুষ দুইটা একজন আরেকজনকে ছাড়া ম’রে যাচ্ছে, সেখানে এতো সমাজ বিবেচনা করে কি লাভ? বুঝে আসেনা অনুর। তাছাড়া ধর্মে যেই সম্পর্কের পুরোপুরি বৈধতা আছে, সেখানে সামান্য সমাজ আর সমাজের কটুক্তির দোহাই দেওয়াটা নিছকই ছেলে মানুষি নয় কি?জায়ান ক্রীতিক কবেই বা মেনেছে এই সমাজের নিয়ম কানুন? তার মতো মানুষকে সমাজের শেকলে ব’দ্ধ করা কেবলই কল্পনা মাত্র। অথচ এসবের মাঝে পরে শুধু শুধু পাহাড় সমান ক’ষ্টে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওইটুকুনি মেয়েটা।
এতোদিন যেমন তেমন ছিল, দেশে ফেরার পরে এখন আবার শুরু হয়েছে মামি আর রেজা ভাইয়ের উপদ্রপ। সবমিলিয়ে নিজের ছোট্ট বোনের এমন হৃদয় নিংড়ানো কা’ন্নার জোয়ার চোখের সামনে আর দেখতে পারলো না অনু। করিডোরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কিছু ক্ষী’প্র সিদ্ধান্ত সমেত, নিজের সকল সংশয় ভুলে ছুটে যেতে লাগলো মায়ের কক্ষের দিকে। চৈত্র মাসের ভ্যাপসা গরম, মাথার উপর অনবরত ঘুরতে থাকা বৈদ্যুতিক পাখাটার জীবন ফুরিয়ে এসেছে বোধহয়,তবুও কর্মক্ষেত্রে অটল সে। পুরাতন আমলের পাখা মজবুত তো হবেই।
রাতের বেলাতেও এইটুকুনি ঠান্ডা হাওয়া নেই, তাই রুমের মাঝে এয়ারকুলার মেশিন চালিয়ে ইজি চেয়ারে বসে বেশ মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছেন আজমেরী শেখ। সেই প্রথম জীবন থেকেই সাহিত্যে তার ভীষণ আগ্রহ, জামশেদ জায়ানের সাথে বিয়ে হওয়ার পরে তিনিই মহলের এককোনে একটা ছোটখাটো লাইব্রেরী উপহার

দিয়েছিলেন আজমেরী শেখকে। ভালোবাসা প্রকাশের ফলস্বরূপ লাইব্রেরীর নাম দিয়েছিলেন "মেরীর রংমহল"।

কিছু বছর আগেও ব্যবসায়ী কাজে স্বামীকে সাহায্য করার পরে যেই ফুরসত টুকু মিলতো সেই সময়টা লাইব্রেরিতেই কাটাতেন আজমেরী শেখ। খুব মনদিয়ে নাড়াচাড়া করতেন পছন্দের বইগুলো, একে একে পাতা উল্টে বুক ফুলিয়ে নিতেন নতুন বইয়ের সুঘ্রাণ ।মাঝখানে অবশ্য অসুস্থতায় কেটে গিয়েছে বেশ কিছু বছর,এখন আর আগের মতো চোখের তীক্ষ্ণ পাওয়ারটা অবশিষ্ট নেই, তাই চোখের উপর মোটা ফ্রেমের চশমা লাগিয়েই বহুবছরের অভ্যেসে কিছুটা শান দিতে বসেছেন তিনি আজ।

আজমেরী শেখ যখন বইয়ের পাথায় বুদ হয়ে আছেন, তখনই হুড়মুড়িয়ে কক্ষে প্রবেশ করে অনু। অনুর এমন অকস্মাৎ আগমনে ভ্রুকুটি করে আজমেরী শেখ বলেন,

—-এটা কি ধরনের আচরণ অনু? কারও রুমে ঢুকতে হলে আগে নক করতে হয়, এখনো শিখাতে পারিনি কেন?

মায়ের কথায় কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে, অনু হাতের মাঝে হাত দিয়ে কচলাতে কচলাতে বললো,

—- মামি কেন অরুর রুমের দরজায় তালা লাগিয়েছে মা? তুমি কিছু বলোনি?

আজমেরী শেখ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললেন,

—- তালা লাগিয়েছে মানে?মায়ের কথার পাছে অনু কিছু বলবে তার আগেই রুমের মাঝে আগমন ঘটে অনুর মামি জাহানারার। অনু রা আমেরিকা থেকে ফেরার পরেই পুরো পরিবার শুদ্ধ এসে ক্রীতিক কুঞ্জে হাজির হয়েছে তারা। উদ্দেশ্য আজমেরী শেখের

দেখভাল করা। অনুর মামা ভূমি অফিসের ছোটখাটো কর্মকর্তা, তিনি মেয়েলী ঝুট-ঝামেলায় খুব কমই থাকেন।
তবে ক্রীতিক কুঞ্জের মতো আলিশান বাড়িতে একমাস কেন একবছর বেড়াতেও তার কোনো অসুবিধা নেই। তারউপর এখন তার বোনও সুস্থ সবল হয়ে ফিরেছে,আগেতো ধিঙ্গি মেয়ে দু'টোর সাথে জাহানারার সারাদিন কথা কাটাকাটি লেগেই থাকতো, এখন আর সেই সুযোগ নেই। কারন মামির সাথে বে'য়াদবি করলে কিভাবে মেয়েদের সু-শিক্ষা দিতে হয় সেটা তার বোন ভালো করেই জানে।
ওই জন্যই তো, বউয়ের এক কথাতেই এখানে বেড়াতে চলে আসা। জাহানারার অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা ফলিয়ে তবেই এ বাড়ি থেকে বিদেয় হবে সে, তার আগে নয়।
অনুর কথায় আশ্চর্য হয়ে আজমেরী শেখ কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবেন তার আগেই জাহানারা এগিয়ে এসে বলেন,—- কি করবো বলো আজমেরী, তোমার ছোট মেয়েটা অসহ্য রকম চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলছিল, তারউপর অন্দরমহলের সব দামিদামি জিনিস গুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছে। বিশ্বাস না হলে নিচে গিয়ে দেখো একবার।
মামির কথায় তেতে উঠে অনু বললো,
—— ভাঙলে ওর স্বামীর টাকায় কেনা জিনিস ভেঙেছে, তাতে তোমার কি মামি?
অনুর মুখে ক্রীতিকের গুনগান শুনেই গর্জে উঠলেন আজমেরী শেখ,মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন,

—— চুপ করো, কে কার স্বামী? কোথাকার কোন থাইল্যান্ড বসে বিয়ে পরিয়েছে, রেজিষ্ট্রি করেছে ওসব আমি মানিনা।
—- কেন মানোনা মা? অস্বীকার করতে পারবে অরু যে ক্রীতিক ভাইয়ার বিবাহিতা স্ত্রী? তাছাড়া অরু চারদিন যাবৎ ক্রীতিক ভাইয়ার সাথে ছিল, একসাথে একই ছাদের নিচে, আর সবচেয়ে বড় কথা ওরা একজন আরেকজন কে ভালোবাসে। তাহলে মেনে নিতে সমস্যা কোথায়?
অনুর কথার পাছে, আজমেরী শেখ কিছু বলার আগেই জাহানারা মুখ দিয়ে বিরক্তিকর ছ্যাহ ছ্যাহ উচ্চারণ করে বলে ওঠে ,—— কতটা লজ্জা শরমের মাথা খেলে মানুষ এই কাজ করতে পারে বাপু? শেষ পর্যন্ত কিনা নিজের মায়ের সৎ ছেলের গলায় ঝুলে পরলো ছ্যাহ। আমার তো মনে হয় ওই ছেলে ফূর্তি করার জন্যই এতো নাটক করেছে, ফূর্তি করা শেষ এখন আর এদিকে ফিরেও তাকাবে না।
মামির কথায় শক্ত হয়ে এলো অনুর চোয়াল, এরা ভাবেটা কি নিজেকে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে। ওদিকে আজমেরী শেখের ও কানে লেগেছে কথাগুলো, নিজের সন্তানকে নিয়ে কেউ এসব বললে কানে লাগারই কথা। আজ নিজের ভাইয়ের বউ বলছে, দুদিন পর মহল্লার লোকেরাও বলবে,তারপর ধীরে ধীরে পার্টি অফিসের সবাই পিঠ পিছে থিল্লি ওড়াবে। তার মেয়েকে নিয়ে বাজে কু'রুচিকর মন্তব্য করবে,খুব গভীর আর অন্তরঙ্গ ব্যাপার গুলো নিয়ে হাসাহাসি করবে। এখনই সেসব কথা ভাবতে গেলে মেজাজ সপ্তম আসমানে চড়ে যায় আজমেরী শেখের।

তিনি ক্ষ্যা'পাটে অনুকে তৎক্ষনাৎ ধমকের সুরে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—- অরু যদি একটা রাস্তার ছেলেকেও ভালোবাসতো তবুও তার অন্যান্য যোগ্যতা বিচার করে মেনে নিতাম আমি,কিন্তু জায়ান ক্রীতিক কে মানা যায়না। তাই এসব বিষয় নিয়ে আর একটাও কথা বাড়াবে না অনু, চুপচাপ থাকবে,সবার সব কিছু জানাজানি হয়ে যাওয়ার আগেই অরুর জন্য উপযুক্ত একটা ব্যাবস্থা করবো আমি।
অনু বিচলিত হয়ে তেঁতো গলায় বললো,
—- জায়ান ক্রীতিকের দোষটা কোথায় মা?
তখন থেকে অনু ক্রমাগত মুখেমুখে তর্ক করছে তাও এরকম একটা জটিল বিষয় নিয়ে, ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না আজমেরী শেখের। তাই তিনি এবার মেয়েকে চোখ রাঙিয়ে বললেন,
—— আমি বলেছি মেনে নেওয়া যায়না,তারমানে যায়না। আর কোনো প্রশ্ন করবে না এক্ষুনি নিজের রুমে যাও।
অনু থমথমে গলায় বললো,— যা ইচ্ছে করো মা, তবে নিজের জিদ আর অহমিকাকে এতোটাও বড় করে দেখতে যেও না যার ফলসরুপ তোমার মেয়ের না আবার বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যায়।
কথাটুকু বলে মামির কোমরের গোছা থেকে টান মে'রে অরুর রুমের চাবিটা নিয়ে হনহনিয়ে বেড়িয়ে যায় অনু।
অনু চলে যেতেই শুরু হয়ে যায় জাহানারার ব্রে'নওয়াশ। তিনি এগিয়ে গিয়ে আজমেরী শেখের উদ্দেশ্যে বলেন,
—- সেই কবে থেকে বলছি তোমায় আজমেরী, অনু বড় হয়েছে,আমার রেজাও মাসআল্লাহ নামদাম কামিয়েছে অনেক, পুরো ঢাকা দক্ষিণের ছাত্রলীগের সহসভাপতি হয়েছে এবছর। রেজার

কথায় বড়বড় মাথা ওয়ালা লোকেরাও এখন ওঠে বসে। তাছাড়া আমার ছেলের ক্ষমতা তো তোমরা নিজের চোখেই দেখলে, তোমাদের সকল বন্দোবস্ত সেরে হুট করেই কেমন আমেরিকা থেকে নিয়ে এলো। ক্ষমতা না থাকলে কি এসব হয়? তাই এখনো সময় আছে অরুর মতো উচ্ছনে গিয়ে ভুলভাল কাহিনী ঘটানোর আগেই অনু আর রেজার গাঁটছড়াটা বেধে দাও। তাহলে ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকলো,মাঝখান থেকে তোমার একটা ছেলেও জুটলো।
একসাথে অনেকগুলো কথা শেষ করে,রুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে জাহানারা পুনরায় বললেন,
—-আমি যা বলি তোমার ভালোর জন্যই বলি বোন। অন্যের কথায় প্রভাবিত হওয়ার মতো মানুষ আজমেরী শেখ নয়। কিন্তু অরু এবার ইউ এস এ তে গিয়ে যা যা ঘটালো তাতে অনুর প্রতি সন্দেহ আর শঙ্কা দুটোই তার মনেও দানা বেঁধেছে কিছুটা।
এক মেয়ের জন্য মান সম্মান খোয়া যাচ্ছে, এই সময়ে অন্য মেয়েকে সম্মানের সাথে উপযুক্ত গুনাগুন সম্পন্ন পাত্রস্থ করা অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতোই। তাই আপাতত আজমেরী শেখের মাথায় জাহানারার কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে।
ঠিকই তো এভাবে শর্ট নোটিশে কত সহজে দ্বায়িত্ব নিয়ে সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছে রেজা। তাছারা আরেকটা কথাও তো ঠিক, এখন আর সেই এলাকার নেতাদের লেজ ধরে ঘুরে বেড়ানো পাতি নেতা নেই রেজা। নিজের যোগ্যতায় বেশ ভালোই নামদাম কামিয়েছে সে। দেখতে শুনতেও খারাপ না। এককথায় পাত্র হিসেবে ভালো, শুধু ভালো নয় বরং বেশ ভালো। মামির কাছ থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে অনু যখন দ্রুত পা ফেলে অরুর রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল,

তখনই হুট করে সামনে চলে আসে রেজা আর ওর ছোট বোন রুপা।
না, রেজা অনুর পথ আটকে দাঁড়ায়নি, বরং দু'জন দুদিক থেকে আসছিল বলেই পথিমধ্যে দেখা। আমেরিকা থেকে আসার পর এটাই বোধ হয় প্রথম সাক্ষাৎ ওদের। যার ফলস্বরুপ অনুকে দেখা মাত্রই পা দুটো থমকে যায় রেজার। রেজার পেছনে ওর ছোট বোন রুপাও ছিল, মাত্রই সন্ধ্যার টিউশন থেকে ফিরেছে সে, এখন রুমেই যেতো। কিন্তু পথিমধ্যে ভাইকে এভাবে আচমকা দাঁড়িয়ে পরতে দেখে,তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের আগন্তুক কে দেখার জন্য একটু খানি উঁকি দেয় রুপা।
উঁকি দিতেই চোখের সামনে অনুকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে রুপা বললো,—- আরে ভাবি যে, কতদিন পর দেখা হলো তোমার সাথে।
এমনিতেই মেজাজ চড়াও হয়ে আছে,মাথাটা য'ন্ত্রণায় ধিরিম ধিরিম আওয়াজ করছে,তারউপর রুপার এমন অহেতুক ভাবি সম্মোধনে বেশ বিরক্ত হলো অনু, তৎক্ষনাৎ রুপাকে চোখ রাঙিয়ে বললো,
—- কে তোর ভাবি? আপু বল।
অনুর ধমকে রুপা মুখ কালো করে চলে যেতেই রেজা খানিকটা এগিয়ে এসে শুধালো,
—— কেমন আছো অনু?
অনু বিরক্তিতে চিড়বিড়িয়ে উঠে বললো,
—- ভালো নেই।
—কেন?
অনু এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া পরখ করলো রেজাকে,আগের চেয়ে বেশভূষায় বেশ পরিবর্তন হয়েছে তার । চেহারায় এখন

আগের মতো মদন মদন ভাবটা আর নেই, সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি আর মুখভর্তি খড় দাড়িতে ভালোই লাগছে দেখতে,কোথাও যেন একটা গু’ন্ডা মা’স্তান ভাইব আছে।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনুর চোখে রেজাকে সেই আগের মতোই মদন মদন লাগছে। রেজা এখনো প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছে দেখে অনু নিজের ভ্রম ছেড়ে বেরিয়ে এসে বললো,—-আপনার মা ভালো থাকতে দিলেতো?
অনুর কথার পাছে রেজা স্নেহের স্বর বুলিয়ে বললো,
———এভাবে কেন বলছো অনু? এখন একটু সহ্য করো বিয়ের পর মাকে সামলানোর দ্বায়িত্ব আমার।
অনু অবাকের চরম শিখরে পৌঁছে বলে,
—- কিসের বিয়ে, কার বিয়ে? কি বলছেন যা-তা?
রেজা ঠোঁট কামড়ে হেঁসে বললো,
—- এবার আমাদের বিয়েটা সত্যিই হচ্ছে “প্রিয়া আমার”। একটু আগে শুনে এলাম মা আর ফুপি বিয়ে নিয়ে আলাপ করছে।
আরেকটু সবুর করো তোমাকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে বউ করে নিয়ে যাবো আমি।
রেজার পকর পকর অনু এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে অরুর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বজ্র কন্ঠে বললো,—-রিডিকিউলাস।
রেজা লাজুক হেঁসে হালকা মাথা চুলকে বলে ওঠে,
—— হ্যা ওইটাই।
রেজার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভঙ্গিমা পাল্টে গেলো অনুর, রাগি রাগি চেহারাটা মূহুর্তেই ধারণ

করলো অসহায় রূপ। মুখশ্রী জুড়ে জমা হলো একরাশ ঘন কালো আত'ঙ্কের মেঘ, দেখে মনে হচ্ছে টলটলে চোখ দুটো থেকে এখনই নেমে আসবে অসহায় অপারগ বারিধারা। তপ্ত রাশভারি ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে করিডোর দিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড়ালো অনু,
—— শুনেছি বাড়ির বড় মেয়েরা সবসময় স্যাক্রিফাইস করে, আমি যদি নিজের ভালোবাসার বেলায় একটু খানি স্বার্থপর হই তাহলে কি খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে? আমিও কি অরুর মতো খারাপ আর অবাধ্য মেয়ে হয়ে যাবো?ক্রীতিক কুঞ্জের হলরুমে টাঙানো দেয়াল জোড়া বিশাল ঘড়িটায় ঢংঢং আওয়াজ করে সকাল আটটার জানান দিচ্ছে।
তবে এখনো পর্যন্ত বিছানা ছাড়েনি কেউ। নিচে ডাইনিং এর যায়গাটাও পুরোপুরি ফাঁকা, সেই সুযোগে সবার আড়ালে অরুকে একটু খানি মাংস ভাত মাখিয়ে খায়িয়ে দিচ্ছে অনু।
খাবারের লোকমা মুখে নিয়েই বসে বসে ফোপাঁচ্ছে অরু, কিছুতেই মুখ থেকে গলায় নামাচ্ছে না। সেই তখন থেকে একই ভাবে বসে আছে দেখে অনু এবার ধমকে উঠে বললো,
—- কি ব্যাপার খাচ্ছিস না কেন?
অরু হেঁচকি তুলে বলে,—- খাবার গলা দিয়ে নামছে না আপা,আমি ওনার কাছে যাবো।বিশ্বাস কর ওনার থেকে এতোটা দূরে চলে এসেছি, সেটা ভাবলেও আমার কলিজা ছিঁ'ড়ে যাচ্ছে, গ'লা কাঁ'টা মুরগীর মতো ছটফট করে উঠছে হৃদয়টা।
আমাদের কি আর কখনো দেখা হবেনা আপা? উনিতো আমাকে না দেখে থাকতে পারেনা,প্রচুর রেগে যায়। আচ্ছা, অতিরিক্ত টেনশনে ওনার যদি আবারও প্যানিক এ্যা'টাক হয়, আবারও যদি নাক দিয়ে

র'ক্ত পরে, তাহলে? উনিতো তখন পুরোপুরি সেন্সলেস হয়ে যায়, ওনার অনেক কষ্ট হয় আপা।
খাবার মুখে নিয়ে একত্রিশ বছরের ক্রীতিকের জন্য মাত্র উনিশে পা দেওয়া অরুর এমন দুশ্চিন্তা দেখে অনু হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর ছোট বোনের দিকে, ঠিক কতোটা ভালোবাসলে সামান্য ভৌগোলিক দূরত্বে মানুষ এতোটা ছটফট আর আহাজারি করে জানা নেই অনুর,তাই বলার আর কিছু ভেবে না পেয়ে অরুকে স্বান্তনা দিয়ে অনু বলে,
—- সব ঠিক হয়ে যাবে বোন আমার, ক্রীতিক ভাইয়া ঠিক কোনো একদিন চলে আসবে,এখন খেয়ে নে।
অনু কথাটা বলেছে কি বলেনি,তখনই ওর মুখের কথা ছো মে'রে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ডাইনিং এর দিকে এগিয়ে এসে জাহানারা বললেন,—— খাওয়া খাওয়া, বেশি করে খাওয়া, শরীর ভে'ঙে চুড়ে যা হাল হয়েছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ বাড়ির ছোট সাহেব সর্বনাশের আর কিচ্ছুটি আর বাদ রাখেনি।
মামির আকারে ইঙ্গিতে করা নোং'রা তি'রস্কারে থমথমে হয়ে ওঠে অনুর মুখ। এসবের কারনেই তো অরুকে মামির সামনে খুব একটা পরতে দেয়না ও।
অনুর এসব রাগ ঢাকের দু'পয়সা তোয়াক্কা না করে জাহানারা এগিয়ে এসে,আঙুল উঁচিয়ে অরুর ঢিলে হয়ে যাওয়া জামাটা দেখিয়ে বললো,
—- দেখ দেখ জামাটা পর্যন্ত কাঁধ থেকে খুলে পরছে, কি ধকলটাই না গিয়েছে মেয়ের উপর দিয়ে, আগে তো এমন ছিলিস না। অথচ এবাড়ির ছেলের সাথে কদিন থেকেই এই হাল?

হ্যারে অরু হাঁটুর বয়সী মেয়ে হয়ে বয়সে ওমন বড় সৎ ভাইয়ের সাথে থাকতে তোর একটুও ভয় করলো না?
মামি এখন ইচ্ছে করে লাগাম ছাড়া কথা বলে ঝামেলা পাকাতে চাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলো অনু,
—-মামি চুপ করবে তুমি?মামির বলা নোংরা কথার মাথায় এতোক্ষণে নিজের শরীরের দিকে চাইলো অরু, আসলেই ও আগের চেয়ে অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে, তবে এটা আজ বা কাল নয়, প্রায় মাস খানিক আগে ক্রীতিক যখন হুট করেই ওর সাথে দেখা করতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল তখনকার ঘটনা।
ঘুরিয়ে পেচিয়ে হলেও কথাটা সত্যি, ক্রীতিকের জন্যই শারীরিক এই অধপতন অরুর। তাই অরু নিজের জামাটা ঠিকঠাক করে খাবার চিবুতে চিবুতে মামির উদ্দেশ্যে বললো,
—- স্বামীর সাথে থাকতে ভ’য় কিসের মামি?বিয়ের পরে মামার সাথে থাকতে তোমার বুঝি খুব ভ’য় হতো? শুনেছি তোমার আর মামার বয়সের পার্থক্য প্রায় পনেরো বছর, সেখানে আমিতো আমার স্বামীর চেয়ে বারো বছরের ছোট মাত্র।
এইটুকুনি মেয়ের মুখে এতো বড় অপ’মান জনক কথা শুনে ঝাঁজিয়ে উঠলেন জাহানারা, আশেপাশের কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই খিটমিটিয়ে বললেন,—— বিদেশে গিয়ে ন’ষ্টা হয়ে ফিরেছিস আবার বড়বড় কথা বলা হচ্ছে? মহল্লার মানুষকে বলে দিলে তখন বুঝবি অপ’মান কাকে বলে।
— মামি, কি সমস্যা তোমার? কেন গায়ে পরে শুধু শুধু ঝ’গড়া করছো, আর কাকে কি বলছো তুমি? যে গদিতে বসে পায়ে পা দোলাচ্ছো সেটা ওর স্বামীর টাকায় কেনা, তাই ভালোয় ভালোয়

বলছি মুখ সামলাও। পরিনাম খারাপ হতে পারে। জায়ান ক্রীতিক কে চেনোনা তুমি।
অনুর কথা শেষ হতেই,জাহানারার তীরের ফলার মতো দৃষ্টি ভস্ম করলো অনুকে, তিনি সেভাবেই তাকিয়ে বললেন,
—- ক'দিন পর ছেলের বউ হবি বলে তোক কিছু বলছি না অনু, তাই বলে এইনা যে মুখেমুখে তর্ক করলে তোকে ছে'ড়ে দেবো আমি।
অনু আশ্চর্য হয়ে শুধালো,—- কি বলছো, কার ছেলের বউ?
—- তোমার আর রেজার বিয়ে ঠিক করা হয়েছে।
মায়ের মুখ থেকে ভেসে আসা অকস্মাৎ কথাটা ধূমকেতুর হলকার মতো ছুটে এসে কর্ণকূহরে ঝঙ্কার তুললো অনুর, ও তৎক্ষনাৎ পাশ ঘুরে মায়ের দিকে তাকিয়ে আহত সুরে ডাকলো,
—- মা!
আজমেরী সিঁড়ির রেলিং ধরে নামতে নামতে বললেন,
—- আশা করি তোমার কোনো আপত্তি নেই।
অনু কাতরে উঠে বললো,
—- এতো তাড়াহুড়ো কেন মা? মাত্র কদিনই তো হলো আমরা দেশে ফিরলাম, তুমি এখনো সুস্থ হওনি পুরোপুরি, তোমাকে এখনো মাসে মাসে চেকআপের জন্য ইউ এস এ যেতে হবে। আর এখনই কিনা....
—- ওই জন্যই তো তাড়াহুড়ো, তোমাদের জন্য করনীয় দ্বায়িত্বটুকু ভালোয় ভালোয় পালন করতে পারলে তবেই আমার শান্তি। তাছাড়া তোমার বিয়ে না হলে অরুকে বিয়ে দেওয়া যাবেনা,এই মূহুর্তে অরুর বিয়ে হওয়াটা জরুরি, কিন্তু বড় বোনের আগে ছোট

বোনকে বিয়ে দিতে গেলেই মানুষ পেছনের কাহিনি খোঁচাতে শুরু করবে,এটাতো আর আমেরিকা নয়। তাই আপাতত অরুর নয়, তোমার বিয়েটাই মোক্ষম আমার কাছে, আশা করি এবার আর কোনো আপত্তি নেই?

মায়ের কথা শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠলো অনু, জড়ানো কন্ঠে বললো,—- হ্যা,হ্যা অনেক আপত্তি আছে, আমি এই বিয়েটা কিছুতেই করতে পারবো না মা।

অনুর প্রতিক্রিয়া শুনে আজমেরী শেখ মুখে কিছুই বললেন না, চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে অতঃপর আহত সুরে বলে উঠলেন,

—— ইদানীং আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে অনু, যখন তখন আবারও পরে যেতে পারি, তবে মনে হয়না এইবার পরে গেলে আর কোনোদিন উঠতে পারবো। সুস্থ থাকতে কথা শোনো মায়ের, নয়তো পরে আপসোস করবে।

মায়ের কথায় অনু, অরু দু'বোনেরই মুখ থেকেই র'ক্ত সরে গেলো, ওরা কি মায়ের সাথে বেশি বেশি করে ফেললো? সেটাই ভাবছে আপাতত।অনুর হাত পা কাঁপছে, মনে হয়না আর শেষ রক্ষা হবে।অরুতো তাও কয়েকটা দিনের জন্য হলেও ক্রীতিকের হতে পেরেছিল, ওদের ভালোবাসা পূর্নতা পেয়েছিল, কিন্তু অনুদের অপূর্ণ ভালোবাসার কি হবে?

এই “কি হবে”,ভাবতেই গিয়েই বুকের ভেতরে এলোপাথারি ঝড় উঠেছে অনুর,সেই ঝড়ে একে একে ভে'ঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে আশা, ভরসা,প্রতিশ্রুতি সব। প্রত্যয়ের সাথে প্রথম দেখা হওয়া থেকে শুরু

করে শেষ দিন পর্যন্ত মানস্পটে খচিত প্রতিটা সুন্দর মূহুর্তে যেন হুট করেই দা'উদাউ করে অ'গ্নি শিখা জ্বা'লিয়ে দিয়েছে কেউ।
অনু আর এভাবে ভেজা চোখ নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারলো না সবার সামনে, এঁটো হাত সহ'ই ছুটে চলে গেলো নিজের রুমে। অতঃপর দরজা লাগানোর কর্কষ আওয়াজ ভেসে এলো দোতলার কোনো একটা ঘর থেকে। সন্ধ্যে হতেই ল্যানটার্ন আর স্ফটিকের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে হিরিকো খচিত বারের চারিপাশ। ভেতরে সফ্ট গানের তালে তালে শরীর দোলাচ্ছে তরুণ তরুণীর দল। হাতে থাকা হুইস্কি আর রেড ও'য়াইনের প্রভাবে কেউ মাতাল আবার কেউ বা অর্ধ মাতাল। তবুও মিউজিকের তালে তালে পায়ে পা মিলিয়ে কোমর দোলাতে মোটেও অপারগ নয় তারা।
বিশাল বারের এককোনে যে বার কাউন্টার রয়েছে, সেখানেই বারস্টুল পেতে ডোরাকে কোলে নিয়ে বসে বসে রেড ও'য়াইনে চুমুক দিচ্ছে ক্রীতিক, পরনে এখনো পুরোপুরি ফর্মাল ড্রেস। দেখে মনে হচ্ছে ভার্সিটি থেকেই এখানে এসেছে সে। ক্রীতিকের মোটেই ডিস্কোবার কিংবা হইহট্টগোল পছন্দ নয়। তাই নিজের মতো করে একটু খানি সময় কাটাতে হলে এখানেই চলে আসে ও।
ছোট্ট ডোরা নিজের নরম তুলতুলে গা টা পুরোপুরি ক্রীতিকের হাতে ছেড়ে দিয়ে আধো আধো চোখ খুলে ঝিমাচ্ছে, মনে হয় অ্যা'লকোহলের গন্ধে ওরও নেশা ধরে এসেছে। ক্রীতিক ডোরার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললো,—— তোর মালিকের মতো ঢং করা বন্ধ কর, নয়তো মাথায় তুলে একটা আ'ছাড় দেবো। ডোরা বেচারী হয়তো জানেই না আসলে ওর দোষটা কোথায়,তাই সহসা চুপচাপ বসে রইলো ও।

ডোরাকে ধমক দিয়ে ক্রীতিক যখন আবারও ওয়াইনে মন দেয়, তখনই বারের মধ্যে একে একে আগমন ঘটে অর্ণব, এলিসা, আর সায়রের।
ওরা আজকাল ক্রীতিককে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় থাকে, ওই জন্যই নিজেদের অবসর হলেই, হুটহাট লোকেশন ট্র্যাক করে চলে আসে ক্রীতিকের কাছে,ওকে একটু সময় দেওয়ার জন্য, ঠিক আগের মতো।
ওদেরকে দেখে ক্রীতিক ভালোমন্দ কিছুই বললো না,বরং ভাবলেশহীন হয়ে বসে রইলো আগের ন্যায়।
অর্ণব এগিয়ে এসে বারস্টুল টেনে বসতে বসতে অবাক হয়ে শুধালো,
—- দেখে তো মনে হচ্ছে ভার্সিটি থেকে ফিরেছিস, তাহলে বিড়ালের বাচ্চা কোলে নিয়ে বারে কি করিস তুই?
ক্রীতিক ঠোঁট উল্টে না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,— জানিনা।
সায়র একটু ভালো করে নজর বুলিয়ে বললো,
—— আরে এটাতো অরুর বিড়াল।
ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে বললো,
—- তোকে জিজ্ঞেস করেছি? কতবার বলেছি ওর নাম মুখে নিবিনা তুই।
এলিসা ওদের থামিয়ে দিয়ে বললো,
—— থামনা তোরা, জেকে তুই তো বিড়াল দেখলেই এ’লার্জি এ’লার্জি বলে নাক সিটকাস, এখন তাহলে বিড়াল নিয়ে বারে কি করিস তুই? আর কতক্ষণ ধরেই বা এখানে বসে আছিস? আদৌও ভার্সিটিতে গিয়েছিলি?

ক্রীতিক কোনোরূপ জবাব না দিয়ে নির্লিপ্ত মুখে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলের উপর রেখে পুনরায় চুমুক দিলো ওয়াইনের গ্লাসে।
কাগজে কি আছে দেখার জন্য অর্ণব তাড়াহুড়ো করে কাগজটা লুফে নিয়ে সেটাতে চোখ বুলিয়ে আশ্চর্য কন্ঠে বলে ওঠে,—— তুই রিজাইন দিয়েছিস মানে? এটা তোর শখের জব ছিল।
ক্রীতিক সামান্য হাসিতে ঠোঁট প্রসারিত করে বলে,
—— আই নো।
এলিসা রেগেমেগে বললো,
—- তাহলে হুট করে রিজাইন দিয়েছিস কেন? অরুর জন্য? সবকিছুর একটা লিমিট থাকতে হয় জেকে, এভাবে লিমিটক্রস করে কেউ লাইফ লিড করতে পারেনা, তুই আজকাল যা শুরু করেছিস, তাতে খুব শীঘ্রই ম'রে যাবি তুই।
সায়র নাক চোখ সিকোয় তুলে বললো,
—- গাইস ওর সাথে থাকতে থাকতে বিড়ালটাও অসভ্য আর উগ্র হয়ে যাচ্ছে, আমাদের উচিৎ বিড়ালটাকে হেফাজতে নিয়ে নেওয়া। নয়তো কোন দিন দেখবো বিড়ালটারও অতিরিক্ত ডি'প্রেশনে নোজ ব্লে'ডিং হচ্ছে।
ওদের একেক জনার যুক্তি শুনে ক্রীতিক বিরক্ত হয়ে কর্কষ আওয়াজে বলে উঠলো ,—— আহ,চুপ করবি তোরা, আমি ডিপ্রেশড হয়ে ঘরে বসে থাকার জন্য মোটেই জব ছাড়িনি, বিডি তে যাওয়ার জন্য ছেড়েছি।
এবার অর্ণব,এলিসা, সায়র একযোগে বললো,
—- কিহ, তুই অবশেষে বিডি তে ফিরছিস?

ক্রীতিক ওয়াইনের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিতে দিতে বললো,
—- একেবারের জন্য যাচ্ছি না, বেশকিছু হিসেব নিকেশ বাকি পরে আছে,সেগুলো শুধে আসলে মিলাতে যাচ্ছি। তাছাড়া আরও একজনকে খুব কাছ থেকে শা’স্তি দেওয়াটাও বাকি পরে আছে। আমি আবার বাকির খাতা খুব বেশিদিন ফেলে রাখিনা।
তীর্যক ছু’ড়ির ফলার মতো কথাগুলো উগরে দিয়ে ডোরাকে নিয়ে উঠে যায় ক্রীতিক, যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে তাকিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বলে,—- বাই দা ওয়ে, সি ইজ নট বিড়ালের বাচ্চা, হার নেইম ইজ” ডোরা”।
ক্রীতিক চলে গেলে সায়র, অর্ণব আর এলিসার কাঁধ হাত দিয়ে অস্ফুটেই বলে ওঠে,
—- দোস্ত এবারের ভ্যাকেসনটা বাংলাদেশে কাটালে কেমন হয়?
অর্ণব দাঁত কটমটিয়ে সায়রের একহাত ঝাড়া মে’রে এলিসার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললো,
—- কেমন হয় সেটা পরে বলছি, তার আগে তুই আমার বউয়ের কাঁধ থেকে হাত সরা গর্ধব।
সায়র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গালে হাতদিয়ে মিনমিনিয়ে বললো,
—- আজ একটা বউ নেই বলে বন্ধুরাও মীরজাফরের মতো আচরন করে, হাহ!!দেখতে পাচ্ছি না, ছুঁতে পাচ্ছি না, ভুলতে পারছি না,তবুও তুমি আছো, এ তোমার কেমন থাকা জায়ান ক্রীতিক??
ল্যাপটপের কিবোর্ডে এতটুকু টাইপ করে থামলো অরু, অতঃপর “জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী” খচিত যে ইমেইল একাউন্ট টা এখনো সেভ করা রয়েছে, সেটার সেন্ড অপশনে ক্লিক করে চোখ বোলালো মেইল একাউন্টের পাশে এটে থাকা ছোট্ট ডিপিতে। ডিপিতে দেখা

যাচ্ছে রোদচশমা আর ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেট পরিহিত ক্রীতিক কে, যে বাইকে হেলান দিয়ে উরুর উপর হেলমেট নিয়ে নির্বিঘ্নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। গম্ভীর মুখ খানাও কি স্নিগ্ধ লাগছে দেখতে।
এই ছবিটা বেশ কিছু বছর আগের হবে হয়তো, অন্তত হেয়ার স্টাইল তো তাই বলছে। দেশে ফেরার পর আজ প্রায় সাত দিন যাবত এই একই কাজ ক্রমাগত করে যাচ্ছে অরু। ও জানেনা এই মেইল একাউন্ট আদৌও ক্রীতিক ব্যবহার করে কিনা।কিন্তু ওই যে আশায় বাঁচে চাষা। সেরকমই বুকের মাঝে জমে থাকা তীব্র দহন আর একটা অনাকাঙ্ক্ষিত আশাকে সামনে রেখে প্রতিদিন ক্রীতিকের একাউন্টে মেইল পাঠায় অরু।
কি জানি হুট করে ক্রীতিকের চোখে পরলেও তো পরতে পারে। কারণ একটাই ক্রীতিক নিজে থেকে যোগাযোগ না করলে এ ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো উপায় জানা নেই অরুর ।
মেইল পাঠানো শেষ হলেও সেই কখন থেকে এক ধ্যানে ক্রীতিকের ছবির দিকে তৃষ্ণার্থ চাতকের ন্যায় তাকিয়ে আছে অরু, মনেমনে ভাবছে,—— কতদিন আপনাকে দেখিনা, আপনি কত দূরেএএ।আপনার ছবির দিকে তাকালে হৃদয় কেঁপে ওঠে আমার,বারবার মনে হয় হাজার মাইল দূরত্বে নিজের অতি মূল্যবান কি যেন ফেলে এসেছি আমি, যখন মস্তিষ্কটা গভীর ভাবে ভাবতে থাকে কি সেই জিনিস? তখনই মনে পরে যায়, আমার আত্মাটাকেই তো আপনার মাঝে ফেলে রেখে এসেছি আমি। এখন আপনি হীন আমার আমিটার অস্তিত্ব যে পৃথিবীর বুকে থেকেও নেই। ছয়মাস আগে যখন আমেরিকাতে প্রথম পা রেখেছিলাম তখনও কি

জানতাম? কেউ একজন আমার জন্য বুকের ভেতর ভালোবাসার পাহাড় জমিয়ে দিন রাত নিদারুণ কষ্টে অতিবাহিত করছে। আর এখন সেই কষ্টটা শুধে আসলে ফেরত দিচ্ছেন আপনি আমাকে। আপনি সত্যিই পা'ষাণ, আর নি'র্দয়। আপনি আমাকে না দেখে বেশ ভালোই থাকতে পারেন। শুধু শুধু সামনে এলে আমাকে ব্যথা দেওয়ার জন্যই পা'গলামি আর রা'গ দেখানোর নাটক করেন। এখন সব বুঝতে পারছি আমি। প্রথমে ভালোবাসা, তারপর অভিমান অতঃপর সবশেষে বুকভা'ঙা কাতর কা'ন্না, এভাবেই যাচ্ছে অরুণ দিন। অরু ভালো নেই, ভালো থাকার কথাও নয়। এক অষ্টাদশীকে নিজের প্রেমে পা'গল করে দিয়ে ক্রীতিকের আর খোঁজ নেই।
যে ক্রীতিক জিদের তোপে গত আট বছর ধরে বাংলাদেশে আসেনি সে কখনোই হুট করে শুধুমাত্র অরুর টানে বাংলাদেশ চলে আসবে না নিশ্চয়ই?অরু হলফ করে বলতে পারে, ক্রীতিক আসবে না, আর এখানেই হয়তো অরুর অপারগতা,অসহায়ত্ব আর দুঃখের দিনের সূচনা।
অরু তখনও টেবিলের উপর মাথা এলিয়ে রেখে ল্যাপটপে ক্রীতিকের ছবির দিকে তাকিয়ে অযাচিত চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল। চোখের কার্নিশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল অশ্রুসিক্ত নোনাজল। ঠিক সে সময় হুট করেই রুমে প্রবেশ করে অনু। রুমের মাঝে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে তরিঘরি করে ল্যাপটপ বন্ধ করে চোখ মুছে পেছনে চাইলো অরু। দেখলো দরজার কাছে অনু দাড়িয়ে। আজকাল অনুর মুখের দিকে তাকানো যায়না আর, সবসময় এইটুকুনি হয়ে থাকে শুকিয়ে । অনুর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে গলা খাদে নামিয়ে প্রশ্ন ছুড়লো অরু,—- কিছু বলবি আপা?

অনু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—- তোর সাথে একজন দেখা করতে এসেছে, ছাদে গিয়ে দেখ অপেক্ষা করছে বোধ হয়।
প্রেমিক পুরুষের হাজার কিলোমিটারের দূরত্বে নেতিয়ে যাওয়া মনটা হুট করেই লাফিয়ে উঠলো অরুর, হৃদ গহীনের কোথাও যেন প্রদীপ শিখার ন্যায় দপ করেই জ্বলে উঠলো একফালি আশার আলো। অনুর সাথে কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করায় সায় দিলোনা অরুর মন, ও তৎক্ষনাৎ গায়ে কোনোরকম ওড়নাটা জড়িয়ে ছুট লাগালো মহলের ছাদের দিকে।
ক্রীতিক কুঞ্জের তিনতলা বিশিষ্ট বিশাল মহলের লম্বা করিডোর পেরিয়ে চিলেকোঠার কাছে আসতেই হাঁপিয়ে উঠলো অরু। দিনের দ্বিপ্রহর চলমান। তবুও চারিদিকে চৈত্র মাসের খাঁ খাঁ রোদ্দুরে চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এই সময়ে ছাদের দিকে তাকালেও কেমন গলা শুকিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পু'ড়ে ফো'সকা পরে চামড়া উঠে আসবে। বুড়িগঙ্গা ছাপিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে যা ও একটু শীতল হাওয়া দিচ্ছে তাও রোদ পেরিয়ে এদিকে আসতে আসতেই হিটারের উত্তাপে পরিনত হচ্ছে।
অনেক গুলো দিন আমেরিকার বরফশীতল ঠান্ডা আবহাওয়ায় থেকে এসে এই রোদকে অরুর চোখে ঝ'লসানো অ'গ্নিদাহের মতোই ভ'য়ানক লাগছে। তাই কিছুক্ষণ চিলেকোঠার ঘরের সামনে দাড়িয়ে থেকে সেখান থেকেই গলা ছেড়ে ডাকলো অরু,—— শুনছেন এদিকে আমি।
ওর প্রিয় আগন্তুক কোন দিকে দিয়ে আসবে তা ঠাহর করা যাচ্ছে না, তাই সহসা এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে অরু। কিছু সময়

যেতেই ওর চোখের সামনে দৃশ্যগত হলো সেই আগন্তুক। কিন্তু এতো জায়ান ক্রীতিক নয়, জায়ান ক্রীতিকের ধারে কাছের কেউ ও নয়। অকস্মাৎ ঝটকা টাকে সামাল দিতে না পেরে হতবিহ্বল হয়ে সামনের মানুষটার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে অরু।
—— কেমন আছিস অরু?
চঞ্চলা হাসিতে ঠোঁট প্রসারিত করে প্রশ্ন ছুড়লো নীলিমা।
অনেকদিন বাদে দেখা, তাও অবাক না হয়েই মেকি হেসে অরু বলে,
—- হ্যা ভালো আছি।
চিরাচরিত মিথ্যে কথা, যা ওর চোখে মুখে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে, তাও বলতে হয় তাই বলা।—-কিন্তু তুই হঠাৎ ক্রীতিক কুঞ্জে?
অরুর করা দ্বিতীয় প্রশ্নে নীলিমা সহসা হেসে উত্তর দিলো,
—- তোর সাথেই দেখা করতে এলাম, অনু আপা ডেকে পাঠিয়েছে তোর নাকি মন মেজাজ ভালো নেই।
অরু মৃদু হেসে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বললো,
—- তেমন কিছুনা আমি ঠিক আছি।
অরুর কথার পাছে নীলিমা কিছুই বললো না, শুধু নির্লিপ্ত চাহনীতে আগাগোড়া পরখ করলো ওর, মনেমনে ভাবলো,
—— এক নিখিল ভাইয়ের জন্য কি হাল হয়েছে মেয়েটার। নাদুস নুদুস মাখনের মতো শরীরটা শুকিয়ে চোদ্দ বছরের না বালিকাদের মতো লাগছে। গলার হাড় হাড্ডি সব বোঝা যাচ্ছে। তাও বলছে ও নাকি ঠিক আছে। নিখিল ভাই যে কেন অরুর একতরফা ভালোবাসা বুঝলো না, কে জানে?

নীলিমা সেই তখন থেকে চুপ হয়ে আছে দেখে অরু বললো,—-
দাঁড়িয়ে থাকবি চল নিচে যাই, এ বাড়িতে প্রথম এলি, তোকে ক্রীতিক কুঞ্জ ঘুরিয়ে দেখাই।
নীলিমা না সূচক মাথা নাড়িয়ে, অরুর হাতে হাত রেখে বললো,
—- তোকে আমার সামনে খুশি থাকার ভান করতে হবে না অরু, আমি জানি তুই পু'ড়ছিস। তবে আমি জিজ্ঞেস করবো না কেন এই দহন, সেটা না হয় তোর ভেতরেই থাকুক। আমি শুধু বলতে এসেছি, এভাবে মনমরা হয়ে ঘরে বসে আর কতদিন থাকবি বল? যে যাওয়ার সে তো গিয়েছে, তাই বলে তো আর জীবন থেমে থাকবে না,তাই না? আমি বলি কি তুই আবার পড়াশোনায় মন দে।
অরু না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—— এই মূহুর্তে একাডেমিক পড়াশোনায় মন বসানোর মতো মন কিংবা মস্তিষ্কের অবস্থা নেই আমার নীলিমা। আমার একটু সময় লাগবে। তাছাড়া ইউ এস এ তে আমি ইকোনমিকস এ পড়তাম। এখন আবার হুট করে এখানে কি নিয়ে শুরু করবো তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।
অরুর কথাগুলো শুনে নীলিমা মাথা নাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করলো, পরক্ষণেই চট করে বলে উঠলো,—— অরু, তোর তো সাহিত্যে বেশ আগ্রহ, তুই নোবেল পড়তে ভালোবাসিস। তুই একটা কাজ করতে পারিস, তুই বাংলা একাডেমির সাহিত্যকলায় ভর্তি হয়ে যা না। ওখানে প্রতিদিন সাহিত্যের আসর বসে, বিভিন্ন বয়সের কবি,সাহিত্যিক, গল্পকার রা ওখানে এসে নিজের লেখা কবিতা, গদ্য,উপন্যাস এসব পাঠ করে অন্যদের উৎসাহিত করেন।

ভেতরে পাবলিক লাইব্রেরীও আছে,একেবারে মনোরম শান্তি শান্তি পরিবেশ। যারা একটু নিরিবিলিতে সাহিত্য চর্চা কিংবা উপন্যাস লেখায় মনদিতে চায়,তারাই সকল ডিপ্রেশন ভুলে একাডেমিতে গিয়ে বইয়ের মাঝে কিংবা সাহিত্য আড্ডায় ডুব দেয় ।তাছাড়া পাশের চারুকলা একাডেমিতে আমি প্রতিদিন আঁকাআঁকি আর স্কাল্পচারের কাজ শিখতে যাই, তুই যদি সাহিত্যকলায় ভর্তি হোস তাহলে দুজন মিলে প্রতিদিন একসাথে যাওয়া যাবে।
নীলিমার কথাটা একেবারেই ফেলনা নয়, বরং অরুর ভা'ঙাচোরা মনটা ভালোই আগ্রহ পেলো ওর প্রস্তাবে। সেইসাথে অরুর মস্তিষ্কে খেলে গেলো আরও একটা কৌশলী পরিকল্পনা, মনেমনে ভাবলো,
—— এটাই সুযোগ মাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পড়াশোনার নাম করে বিয়ে দেখা থেকে আটকানো যাবে। তাছাড়া সাহিত্যে মায়ের বেশ আগ্রহ আমি একাডেমিতে ভর্তি হতে চাই শুনলে না করবে না নিশ্চয়ই?
অরু কিছু একটা ভাবছে থেকে নীলিমা ব্যথাতুর কন্ঠে বললো,
—- একটু সময় নে, তারপর না হয় সিন্ধান্ত নিস। আর হ্যা ওসব পেছনের কথা ভুলে যা, দেখবি তোর জীবনে এমন কেউ আসবে যে তোর চোখের দিকে তাকালেও ভালোবাসার গভীরতা মাপতে পারবে, হাত বাড়িয়ে নয় বরং হৃদয় বাড়িয়ে স্পর্শ করবে তোর সুপ্ত অনুভূতি গুলোকে।
নীলিমার কথায় অরু আশ্চর্য হয়ে বললো,—— কি বলছিস এসব নীলিমা? আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু উনিই।সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাড়িয়েছে,এখন আর ওনাকে ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষকে আমি আমার জীবনে কল্পনাও করতে

পারিনা। উনি ছাড়া অন্যকেউ ভালোবেসে স্পর্শ করার আগে ম’রণ হোক আমার।
নীলিমা বুঝতে পারে মেয়েটা নিখিল ভাইয়ের প্রতি খুবই সিরিয়াস।তাই এসব ভুলে যাওয়া টাওয়ার কথা বাড়িয়ে আর মন খারাপ করলো না অরুর, সহসা কথা ঘুরিয়ে শুধালো,
—- রাখ এসব মন খারাপের কথা, আমেরিকাতে কি কি করলি তাই বল?
গোধূলী বেলায় বিকেলের অসহিষ্ণু তীব্র রোদ, এখন অনেকটা সহনীয় হয়ে এসেছে, অদূরে কান ফাটানো হুইসেল বাজিয়ে একে একে সদরঘাট ছাড়ছে লঞ্চ গুলো। বুড়িগঙ্গা পারের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়ার বেগ বেড়েছে, সেই সাথে বড় আমগাছটার ছায়ায় ঢাকা পরেছে শেষ বিকেলের ম’রা রোদ। অরু এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা কাঁচা আম ছিড়ে, ছাঁদের পাঁচিলে পা দুলিয়ে বসতে বসতে বললো,
—— আয় বলছি।নিকোশ আধারে ছেয়ে গেছে সন্ধ্যার আকাশ। সূর্যের শেষ লালিমা টুকুও অবশিষ্ট নেই আর। চারদিকে ভ্যাপসা গরম, শেষ রাতে কালবৈশাখী ঝড় হলেও হতে পারে,পশ্চিম আকাশের বিদ্যুৎ চমকানোর গতিবেগ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। অরু মাত্রই নীলিমাকে গেইট থেকে রিকশায় তুলে দিয়ে ফিরে এলো। ভ্যাপসা গরমে জীবন অতিষ্ট, তারউপর হাঁটু সমান লম্বা চুল। অনেকটা শুকিয়ে যাওয়াতে এতো লম্বা চুলের ভার বইতেও আজকাল কষ্ট হয়ে যায় অরুর। ও কোনো রকম চুলগুলো মাথার উপর চুড়ো করে বাধতে বাঁধতে অন্দরমহলের দিকেই যাচ্ছিল। তখনই ওপাশের বাগান বিলাশের ঝোপের আড়াল থেকে ওর কানে

ভেসে আসে ক্রন্দনরত অনুর অস্পষ্ট কিছু কথা। অনুর কথাগুলো ভালো মতো ঠাওর করার জন্য এগিয়ে গিয়ে বাগানবিলাশের অন্যপাশে দাঁড়াতেই অরু শুনতে পেলো কা'ন্নারত অনুর শেষ কথা,—— আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে প্রত্যয় সাহেব। আমি আপনাকে দেওয়া কথা রাখতে পারিনি, আমার জন্য দ্বিতীয়বার আপনাকে কষ্ট পেতে হলো, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি মোটেই ভালো মেয়ে নই,খুব খারাপ, সব ছেলের সাথেই এমন ভালোবাসার নাটক করি, আমি আপনার এক্স তিন্নির থেকেও খারাপ। আমাকে বিয়ে করে আপনি একটুও ভালো থাকতেন না, তাই যা হয় ভালোর জন্যই হয়। ভবিতব্য মেনে নিন।আর আমাকে ভুলে যান।

ওপাশ থেকে প্রত্যয় কি বললো না বললো কিছুই শোনা গেলো না, উল্টো অনু তাড়া দিয়ে বললো,

—- আমার স্বামী ডাকছে প্রত্যয় সাহেব, আমাকে যেতে হবে। কাল বাসর রাত ছিলো কিনা, ডাকবেই তো। এখন রাখছি, আর কখনো কথা হবেনা আমাদের।দোয়া করি, আপনি আমেরিকাতে সত্যিকারের সোলমেট কাউকে না কাউকে ঠিক পেয়ে যাবেন।তখন আমাকে কিংবা আমার দেওয়া পাথরের মতো আ'ঘাত গুলোকে মনে পরবে না আর।আপনি খুব সুখি হবেন।এরপর কল কাটার পিক পিক আওয়াজ হলো, বোধ প্রত্যয়ই লাইনটা কেঁটে দিলো।

—-আর আমি এও জানি আপনার মতো পিওর হার্ট কে কষ্ট দিয়ে আমি কোনোদিনও সুখের মুখ দেখতে পাবো না, আর না আপনাকে কখনো ভুলতে পারবো।

অস্ফুটে কথাটা বলেই শুকনো মর্মরে পাতার উপর ধপ করে বসে পরে বোবা কা'ন্নায় ভেঙে পরলো অনু।

অনুর এহেন হাল না হলে অরু হয়তো ছুটে গিয়ে প্রত্যয়ের সাথে কথা বলতে চাইতো,প্রত্যয়ের মাধ্যমে ক্রীতিকের খোজ নিতো। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়। আপাতত সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে রাগে ফুঁসছে অরু। বোনের উপর রাগটা যেন পাহাড় সমান উঠে এসেছে, আ'গ্নেয়গিরির সুপ্ত লাভার মতোই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মস্তিষ্কটা।
অরু নিজের রাগ দমাতে না পেরে বড়বড় পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে অনুর সামনে দাড়িয়ে শক্ত গলায় বললো,
——এভাবে শুধু শুধু মিথ্যে বলে একজনকে কষ্টের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়ার কি মানে ছিল আপা?
অনু দু'হাতে মুখ চেপে কা'ন্নার আওয়াজ সংবরণ করছে ঠিকই কিন্তু ওদিকে হৃদয়টা ছি'ন্নভি'ন্ন হয়ে যাচ্ছে অপারগ কা'ন্নার তালে।বোনকে এভাবে কাঁদতে দেখে মন টললো না অরুর, ও দিগুন আওয়াজে বললো,
—- কি হলো বল আপা? কেন করলি এটা? যে মানুষটা হাজার মাইল দূরে থেকেও নাম্বার সংগ্রহ করে তোকে কল দিয়ে তোর খোঁজ নিতে ভুললো না, তাকে তুই এভাবে ফিরিয়ে দিলি?
অথচ আমাকে দেখ চাতক পাখির মতো ছটফট করছি জায়ান ক্রীতিকের একটুখানি খবর পাবো বলে, কিন্তু জায়ান ক্রীতিক তো প্রত্যয় ভাইয়ার মতো এতোটা সদয় নয়। তাহলে কেন করলি এটা?
অরুর কথার পাছে অনু এবার হেঁচকি তুলে বললো,—- যা করেছি চিন্তা ভাবনা করে, বুঝে শুনে করেছি,তোর টেনশনে এমনিতেই মায়ের শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। বাড়িতে প্রতিনিয়ত একের পর এক ঝামেলা লেগেই আছে। এখন যদি আমিও এসব বলে মা'কে নিরাশ

করি তাহলে মা'কে আর বাঁচাতে পারবো না অরু। পরিবারের বড় সন্তানের জন্মই হয় স্যাক্রিফাইস করার জন্য, আমিও নাহয় মায়ের কথা ভেবে নিজের ভালোবাসাকে স্যাক্রিফাইস করলাম। এ আর এমন কি?
কথা শেষ করে পুনরায় কা'ন্নায় ভে'ঙে পরলো অনু।
অনুর কথার যুক্তি আছে,কিন্তু অনুর ভালোবাসা না মানার মতো তো কোনো কারন নেই? অনু তো আর নিজের সৎ ভাইয়ের প্রেমে পরেনি। আর না ক্রীতিকের মতো প্রত্যয়ের সাথে মায়ের কোনো ব্যক্তিগত ঝামেলা আছে, তাহলে মাকে একবার খুলে বলতে সমস্যা কি?অনুর কান্নাকা'টি দেখে অরু তৎক্ষনাৎ সিদ্ধান্ত নিলো ও গিয়ে মাকে সত্যিটা বলবে, নরম সুরেই বলবে বোঝানোর চেষ্টা করবে তারপর যা হওয়ার হোক। নিজের সিদ্ধান্তকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে অনুকে রেখেই দ্রুত যায়গা ত্যাগ করলো অরু। দ্রুত পদধ্বনিতে মায়ের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনেমনে ভাবলো,
—— আমি না হয় জায়ান ক্রীতিকের প্রেমে পরে খুব বড় অন্যায় করে ফেলেছি,কিন্তু আপা তো আর তেমন কিছু করেনি, তাহলে আপা কেন নিজের ভালোবাসার মানুষকে আপন করে পাবেনা?ভর সন্ধ্যা বেলা এসির পাওয়ার বাড়িয়ে দিয়ে একটু ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আজমেরী শেখ।
বাংলাদেশে ফিরে আজকেই প্রথম অফিসে গিয়েছিলেন তিনি, অফিস থেকে ফিরে সব ফাইল পত্র গুছিয়ে কেবলই শুতে যাবেন তখনই হুরমুরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো অরু।
অরুর সাথে আজকাল খুব একটা কথা বলেন না আজমেরী শেখ, অরুর চোখের দিকে চাইলেই ক্রীতিকের জন্য এক অদম্য ব্যথাতুর

ভালোবাসার জোয়ার দেখতে পান তিনি। যা আজমেরী শেখের মোটেই পছন্দ নয়। নিজের সৎ ছেলের সঙ্গে কিভাবে তার মেয়ে ছি ছি। ভাবলেও বিরক্ত লাগে তার, অগত্যাই সেসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে, হেড বোর্ডে গা এলিয়ে দিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ দুটো নিবদ্ধ রেখে মেয়েকে শুধালেন,—- কি প্রয়োজন?
অরু প্রথমে কিছুক্ষন তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তখনই পুনরায় আওয়াজ ভেসে এলো ওদিক থেকে,
—-কিছু বলার না থাকলে যেতে পারো, আমি একটু রেস্ট করবো।
মনের মাঝের সকল শঙ্কাকে হটিয়ে অরু এবার চট করে বলেই ফেললো,
—— মা আপা একজন ভালোবাসে, তুমি রেজা ভাইয়ের সাথে আপার বিয়েটা দিওনা,আপা মুখ ফুটে কিছু বলবে না তোমাকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক’ষ্টের বোঝা বইতে বইতে আপা হয়তো ম’রেই যাবে।
অরুর কথায় তৎক্ষনাৎ হাতের বইটা ডিভানে ছু’ড়ে মে’রে গভীর গলায় প্রশ্ন করলেন আজমেরী শেখ,
—- সে আবার কার সাথে ন’ষ্টামো করে বেরিয়েছে?
নোংরা কথাটা যে আকারে ইঙ্গিতে অরুকে বলা হয়েছে, সেটা অরু ভালোমতোই বুঝতে পেরেছে,তবুও মায়ের কথা গায়ে না মেখে নরম গলায় বললো,—— পপপ্রত্যয় ভাইয়া।
—- সি এফ ও অফ জেকে গ্রুপ?
মায়ের কথায় অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়াতেই কোথা থেকে যেন শ’ক্ত চ’পেটাঘা’ত এসে আঁচড়ে পরলো অরুর গালে। শরীরটা বেশ দূর্বল, তারউপর এতো শক্ত চ’ড় খেয়ে দু কদম পিছিয়ে গেলো

অরু। তীব্র ব্যথায় চ'ড় খাওয়া গালে হাতদিয়ে চোখদুটো খানিকক্ষণ খিঁচে রাখলো ও। অরুর দিকে তাকিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অনু বললো,
—- তোকে আমি এসব বলতে বলেছি? সত্যি করে বল অরু? আমিকি একবারও বলেছি মাকে গিয়ে এসব বল, তাহলে কেন বললি?
অরু ফুপিয়ে উঠে বললো,
——- আমিতো মিথ্যে কিছু বলিনি আপা, তাছাড়া যা বলেছি তোর ভালোর জন্যই…
অরু কথা শেষ করার আগেই অনু তেতে উঠে বললো,
——কে বলেছিল তোকে আমার ভালো করতে? আমি বলেছি?আমার ভালো করতে গিয়ে এখন যদি মায়ের কিছু হয়ে যায় তখন কি করবি তুই? এমনিতেই সারা ঘরে একাই অশান্তি বাধিয়ে রেখেছিস, আর কত অশান্তি হলে থামবি তুই? বল আমায়?অনুর প্রতিটি ঝাঁঝালো কথায় ডুকরে কেঁদে ওঠে অরু। ওর শরীরটাও যে আর নিতে পারছে এই অশান্তি। অথচ যার কারণে এই ন'রক জীবন যাপন, তারই তো হদিস নেই। সে আদৌও বাংলাদেশে ফিরবে কিনা তাও জানা নেই অরুর। অথচ সব অপবাদ, সব তিরস্কার এসে জুটলো অরুর কপালে। বিয়ের পরে তো এইসব অশান্তিরই ভ'য় পেয়েছিল অরু।
নিজের আকাশচুম্বি রা'গকে দমাতে না পেরে অনু আরও কিছু বলবে, তার আগেই আজমেরী শেখ বলে ওঠেন,
—— তোমরা দুজনই এক্ষুনি বাইরে যাও, শরীরটা ভালো লাগছে না আমার। একটু একা থাকতে চাই।

অনু এগিয়ে এসে বললো,
—-- মা কোথায় খারাপ লাগছে তোমার? বলো আমায়, মাথা টিপে দেবো একটু।
—— চুপচাপ বাইরে যাও।
আজমেরী শেখের রাশভারি আওয়াজে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল অনুর, ও তৎক্ষনাৎ অরুর হাত ধরে গম্ভীর গলায় বললো,
—— চল।চোখের পলকে খসখস করে উল্টে গিয়েছে ক্যালন্ডারের পাতা। বাংলা ক্যালেন্ডারের শেষ পাতাকে বিদায় জানিয়ে বৈশাখ এসেছে ধরনীতে।
অরুরা বাংলাদেশ ফিরেছে প্রায় একমাস হতে চললো। বৈশাখে পা দিতে না দিতেই প্রায় প্রতিটি বিকেলেই আকাশ কালো করে তীব্র ঝড়ে ফেটে পরে প্রকৃতি। আজকেও তেমন এক বিকেল, মেঘ তো নয় যেন আকাশ জুড়ে বুনো মহিষের পাল। সেথা থেকে গুড়গুড়িয়ে ভেসে আসছে কাল বৈশাখী সংকেত। চারিদিকে ঘূর্নি হাওয়া বইছে। একাডেমী গেইট দিয়ে বেরিয়ে অরু দ্রুত পা চালাচ্ছে বাড়ির দিকে। আজ পুরো রাস্তায় একটাও রিকশার দেখা নেই।যার ফলসরুপ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে অরুকে। তবে মেইন রাস্তা ছেড়ে গলির মোড়ে ঢুকতেই দেখা মিললো চেনা পরিচিত একটা সাদা গাড়ির। অরু ফুটপাত ধরে এগিয়ে আসতেই সহসা গাড়ির কাঁচ নামিয়ে কিছুটা ঘাড় বাকিয়ে উঁকি দিলো ধূসররঙের সিকোয়েন্স পাঞ্জাবি পরিহিত এক সুদর্শন। চোখে তার রোদ চশমা। অরু কাছাকাছি আসতেই লোকটা আগ বাড়িয়ে বললো,—-- আরে অরোরা যে,
অরু সম্মোহনী হেসে জবাব দিলো,
—-- জ্বি অমিত ভাই।

অমিত আরিয়ান, বাংলা একাডেমিতে যার যাতায়াত অহরহ। থাকবে নাইবা কেন, এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা নামকরা উপন্যাস আর ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে তার। বছরের বেস্ট সেলের তালিকায় তার বইয়ের নামই সর্বাগ্রে। সাহিত্য কলার সদস্যদের কাছে অমিত আরিয়ান অনেকটা সেলিব্রিটিদের মতোই, যে একাডেমিতে আসলে হইচই লেগে যায় পুরো একাডেমি জুড়ে, কেউ নিজের পছন্দের বইয়ের পাতায় অটোগ্রাফ নেয়, তো কেউ পাশে দাড়িয়ে সেলফি। মূলত গত বছর অমিতের যে রোমান্টিক জনরার উপন্যাসটি বের হয়েছে সেটার পর থেকেই অমিতের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। অরুও সভাব সুলভ সেই উপন্যাসটা পরেছিল। পড়ার পরেই বুঝেছিল অমিত আদতে কতটা জ্ঞানের অধিকারী।একাডেমিতে নবীনদের বেশ ভালো উৎসাহ দেয় অমিত,সেইসাথে ছোটখাটো টিপস।
সেখান থেকেই মূলত অরুর সাথে মুখ চেনা চিনির পরিচয়। দেখা হলে নিজের ছোট বোনের মতোই লিখালিখি তে দু এক লাইন উৎসাহ দিয়ে যান অরুকে।অরুও বড় ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধার নজরে দেখে অমিতকে, মাঝে মধ্যে নিজে থেকে দুএকটা প্রশ্নও করে বটে। যদি তার বিশাল জ্ঞান ভান্ডার থেকে এক আধটু আহরণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে। তাছাড়া অমিতকে শ্রদ্ধা না করার তো কোনো কারণ নেই, আজ অবধি কখনো কোনো মেয়ে ঘটিত কিংবা অন্য কোনো খারাপ স্ক্যান্ডালে নাম জড়ায়নি অমিতের। অরু অন্তত শোনেনি কখনো।—-এই গলিতে কি করো হুম?
অমিতের প্রশ্নে ভাবনার সুতো ছিঁড়লো অরুর, মৃদু হেসে জবাব দিলো,
—- এই গলিতেই থাকি আমি।

—- ও এম জি, কোথায় থাকো?
অরু ইতস্তত কন্ঠে বললো,
—- জ্বি, ক্রীতিক কুঞ্জে।
আজকাল বাড়ির নামটা মুখে নিতেও কেমন যেন দম আটকে আসে অরুর। বাড়ির নামেও যে তার স্মৃতি জড়িয়ে।
অমিত আশ্চর্য হয়ে গেলো অরুর কথায়, চোখ দুটো বড়বড় করে বললো,
—— তুমি চৌধুরী বাড়ির মেয়ে?
জামশেদ জায়ান কি হয় তোমার?
এতো ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করলো না অরুর, তাই গতানুগতিক কথা এড়িয়ে অরু বললো,—- আকাশ কালো করেছে, মনে হয় ঝড় আসবে আমি আসি অমিত ভাই।
—— আরে কোথায় যাচ্ছো, গাড়িতে এসো আমি এগিয়ে দিচ্ছি ঝড়ে পরবে তো।
অরু দ্রুত পা চালাতে চালাতে বললো,
—— দরকার নেই চলে যেতে পারবো।
অরু চলে গিয়েছে অনেকক্ষন, অমিত এখনো সেদিকে তাকিয়ে, থাকতে থাকতে ঠোঁট উল্টে বলে উঠলো,
—— এতো সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটা সবসময় মুখ কালো করে থাকে কিসের এতো দুঃখ ওর?
অরু ঘরে ঢুকে ব্যাগটা ছোফার উপর ছু’ড়ে ফেলে ডাইনিং এ গিয়ে ঢকঢক করে একগ্লাস পানি পান করলো।

পানিটা শেষ হতেই কানে ভেসে এলো মামির গা জ্বালানো কথা,—-বিদেশ থেকে এক কাহিনী করে এসেছে, এখন আবার সন্ধ্যে পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ করে বেড়ায়।
আমিও দেখবো আজমেরী কিভাবে বিয়ে দেয় এই ধিঙ্গি মেয়ে গুলোর। একজনকে তো এ বাড়ির ছেলেই ফূর্তি করে ছেড়ে দিলো,কই আর তো এলোনা, জানি জানি আর আসবেও না। যা নেওয়ার ছিল সে তা নিয়ে নিয়েছে। এখন আর কি করবে এই হাড় হাড্ডি ওয়ালা মেয়েকে দিয়ে?
অরু জানে মামি চটে আছে,চটে থাকারই কথা সেদিন অনুর ব্যাপারে সত্যি কথা গুলো বলে দেওয়ার পর আজমেরী শেখ আর বিয়েটা নিয়ে কথা বাড়ায়নি। সেই তেজে মামিও আর ক্রীতিক কুঞ্জ ছাড়েনি। সেও দেখতে চায় ঠিক কতদিন আর মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে থাকতে পারে আজমেরী। তার সোনার টুকরো ছেলেকে অনুর সাথে বিয়ে দিয়ে তবেই এ বাড়ি থেকে যাবে সে।অন্যান্য দিন চুপচাপ থাকলেও আজ একটু বেশিই বেড়েছে মামি,তার কারন আজ বাড়িতে অনু আর মা নেই। ব্যবসায়ী কাজে শহরের বাইরে গিয়েছে আজমেরী শেখ। শরীরটা ভালো না থাকার কারনে সাথে করে অনুকেও নিয়ে গিয়েছে। সেই সুযোগে অরুকে আজ ইচ্ছে মতো কথা শোনাচ্ছেন জাহানারা।
জাহানারা যখন এ বাড়ির ছোট সাহেব কে জড়িয়ে অরুকে হাজারটা নোংরা কটাক্ষ করায় ব্যস্ত, তখনই হন্তদন্ত হয়ে বাইরে থেকে ছুটে আসে রুপা, কোনমনে হাঁপাতে হাঁপাতে গলা ছেড়ে ডেকে বলে,

—- মা, লম্বা মতো একটা ভাইয়া, রেজা ভাইয়াকে ইচ্ছে মতো পে'টাচ্ছে।
অরুর দুই পয়সার ইন্টারেস্ট নেই ওদের মা'রামা'রিতে, রেজা গোল্লায় যাক তাতে ওর কি? সেই হিসেব মতে ব্যাগটা নিয়ে উপরের দিকে হাঁটা দিলো অরু।
জাহানারা হকচকিয়ে উঠে বললো,—- কে মা'রে আমার ছেলেকে, এতো বড় সাহস কার?
রুপা ভয়ার্ত কন্ঠে বললো,
—- জানিনা, কখনো দেখিও নি এই মহল্লায়। দেখতে বিদেশিদের মতো কিন্তু বিদেশি না, ভাইয়াকে বাংলায় গা'লি দিচ্ছিলো।
রুপার শেষ কয়েকটা কথা ছক্কা লাগার মতোই অরুর মস্তিষ্কে গিয়ে লাগলো, অজানা শিহরণে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল ওর পুরো শরীর। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। টলমলে চোখদুটো দেখে মনে হচ্ছে এখনই চেতনা হারাবে ও। কিন্তু হারালো না। হাতদুটো শক্ত করে নিজেকে স্থির রেখে কাঁপা কন্ঠে বললো,
—— রুপা,যে এসেছে তার চুল গুলো কি ঘাড় অবধি লম্বা? আর চোখ গুলো কি ভাসা ভাসা?
রুপা ঠোঁট উল্টে হ্যা সূচক মাথা নাড়াতেই কাঁধ থেকে ব্যাগটা ফেলে দিয়ে বাইরের দিকে ছুট লাগালো অরু।
ওর পরনে সুতির স্কার্ট আর টপস, লম্বা চুলগুলো পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে কোনমতে আটকানো। দুই পায়ে ক্রীতিকের পরিয়ে দেওয়া দুটো সোনার নুপুর। সেভাবেই ছুটছে অরু।

তবে অন্দরমহল থেকে বেরোনোর আগেই খপ করে ওর হাত টেনে ধরলো জাহানারা, চোখ রাঙিয়ে শুধালো,—- কে এসেছে সত্যি করে বল?
অরু জবাব দিলো না, এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে গেলো সদর দরজার বাইরে, তবে ক্রীতিকের দিকে আর এক পা ও এগোতে না দিয়ে ওকে আবারও শক্ত করে চেপে ধরলো জাহানারা। হুট করে এভাবে টেনে ধরায় সদর দরজায় হুমড়ি খেয়ে পরে গেলো অরু। ঠিক তখনই একজোড়া মোহাবিষ্ট ভাসা ভাসা চোখ স্থির হলো অরুর চোখে।
চোখের সামনে অরুকে দেখা মাত্রই হাতের হ'কিস্টিকটা দূরে ছু'ড়ে মা'রলো ক্রীতিক।
তারপর দাড়িয়ে রইলো রেজার পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায়। ক্রীতিককে এভাবে দাড়িয়ে পরতে দেখে হকচকিয়ে উঠলো অরু, এক্ষুনি তো রেজার চ্যালাপ্যালারা ক্রীতিকের উপর নিজেদের রা'গ ঝা'ড়তে উদ্যত হবে, তাহলে এভাবে দাঁড়িয়ে পরার কি মানে?
অরু সেদিকে তাকিয়ে দু'হাতে ভর করে উঠতে যাবে তখনই ক্রীতিককে একেরপর এক তীব্র ক'ষাঘা'ত করতে লাগলো রেজার লোকেরা। সঙ্গে সঙ্গে আবারও মুখ থুবড়ে পরলো অরু, চোখের সামনে নিজের স্বামীকে এভাবে মা'র খেতে দেখে হৃদয়টা দুমড়ে মুচড়ে ছি'ড়ে যাচ্ছে ওর। অথচ ক্রীতিক এক ধ্যানে অরুর দিকে তাকিয়ে মা'র খেয়ে যাচ্ছে।
মা'র খেতে খেতে এক পর্যায়ে ঠোঁট কে'টে ফিনকি দিয়ে র'ক্ত বেরিয়ে এলো ক্রীতিকের। ও হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের র'ক্তটুকু মুছতে মুছতে ক্রুর হাসি হাসলো অরুর পানে চেয়ে।

ক্রীতিক কুঞ্জে দাড়িয়ে, ক্রীতিক কুঞ্জের মালিকই কিনা মা’র খাচ্ছে, তাও বাইরের লোকের হাতে। শুধু মাত্র অরুকে কাঁদানোর জন্য। এবং সেই উদ্দেশ্য সফল ও হয়েছে, অরু বেশ ক’ষ্ট পাচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে পৈচাশিক হাসিতে প্রসারিত হলো ক্রীতিকের দু’ঠোঁট। তবে এই অসহনীয় দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলো না অরু,গলা ছে’ড়ে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—- ওনাকে মা’রছো কেন?ছাড়ো, উনি এই বাড়ির ছোট সাহেব।
অরুর শেষ কথাতে চমকে উঠে ভ’য়ে তটস্থ হয়ে দু’কদম পিছিয়ে গেলো সকলে।তবে শেষ রক্ষা হলো না আর।
ক্রীতিক কিছু না বললেও, এলিসা, অর্ণব আর সায়র গাড়ি থেকে নেমে এই দৃশ্য দেখেই দৌড়ে এসে একেক টাকে ইচ্ছে মতো রা’ম ধো’লাই দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে দিলো।আর ক্রীতিক ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো অরুর দিকে। অরুও কোনো মতে হাতের তালুতে ভর করে উঠে দাড়ালো, এই আশায় হয়তো এখনই ঝড়ের বেগে ছুটে এসে ওকে বুকের মাঝে জাপ্টে ধরবে ক্রীতিক। কিন্তু আদতে তেমন কিছুই হলোনা ক্রীতিক এগিয়ে এসে অরুকে ধরা তো দুরে থাক ওর ধারে কাছেও এলোনা, উল্টো অরু এগিয়ে এসে ওর ক্ষ’তস্থানে হাত ছোঁয়াতে গেলে বিদ্যুৎ বেগে দূরে সরে যায় ক্রীতিক।ঈষান কোনে মেঘ ডাকছে। আকাশ জুড়ে বুনো মহিষের পাল। পরন্ত বিকেলে কাল বৈশাখীর স্পষ্ট পূর্বাভাস। চারিদিকের ঘূর্ণি বাতাসে ধুলোবালির ঝড় উঠেছে যেন।
তবে তকতকে পিচ ঢালা ফ্রন্ট ইয়ার্ড আর সুসজ্জিত বাগান বিলাশের পাঁচিল পেরিয়ে সেই ধূলোবালির ঝড় খুব একটা প্রবেশ করতে পারেনা ক্রীতিক কুঞ্জের আলিশান বাড়িতে। ফ্রন্ট ইয়ার্ডে ছোট্ট

লেকের পাশ ঘেষে যে গোলাকার বৈঠকখানা বাঁধানো সেখানেই চ্যালাপ্যালা নিয়ে দলের মিটিং এ ব্যস্ত সময় পার করছে রেজা। ঢাকা দক্ষিণের সহসভাপতির পদ লাভ করার পর থেকেই ভারী ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটে রেজার সময়কাল।
সত্যি বলতে এই বাড়ির পূর্ব পুরুষদের রাজনৈতিক কতৃত্ব আর নাম ভাঙিয়েই রেজার এতদূর আসা, সে হিসেবে প্রমান সরূপ এ বাড়ির সুবিশাল বৈঠকখানায় প্রায়শই বসে রেজার রাজনৈতিক আসর, ও যে এই বাড়িরই কুটুম সেটা বোঝাতে হবে তো সবাইকে।আলোচনা তখন মাঝপথে,একের পর এক নিজেদের বক্তব্য পেশ করছে দলের সদস্যরা, ঠিক সে সময় বাগানে বিলাশে ঘেরা বিশাল গেইটটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজে খুলে যেতেই সবার দৃষ্টি গিয়ে ঠেকলো সেদিকে। কার্ড দিয়ে উবারের ভাড়া মিটিয়ে মাত্রই বাড়িতে প্রবেশ করেছে সানগ্লাস পরিহিত, লম্বা মতো এক অচেনা সুদর্শন যুবক। তার প্রতিটি পদধ্বনিতে উপচে পরা কতৃত্ব্য আর আভিজাত্য। হাটার তালে তালে চওড়া কাঁধটা ক্রমশ দুলে উঠছে,দেখে মনে হচ্ছে কোন গ্লোবাল সুপারস্টার মাত্রই গুরুত্বপূর্ণ শর্ট শেষ করে শুটিং সেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। এহেন ম্যানলি হাটা চলা পেছন থেকে যে কেউ দেখলে নিস্প্রভ হয়ে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য।
অচেনা কাউকে এভাবে হুট করে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে রেজার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য এগিয়ে এসে বিরক্ত কন্ঠে শুধালো,—-
কে আপনি? কি চাই?
ক্রীতিক হাঁটার গতি ধীর করে গম্ভীর গলায় বললো,
—- গেট আউট।

লোকটা এবার চড়াও হয়ে এগিয়ে এসে ক্রীতিকের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলে,
——বলেছি তো, পরিচয় না দিয়ে ওদিকে যাওয়া যাবে না।
লোকটার কথা বলতে বাকি, চোখের সানগ্লাসটা খুলে ওর গালে সপাটে চ'ড় বসিয়ে দিতে দেরি হলোনা ক্রীতিকের। অকস্মাৎ শক্ত জিম করা হাতের চ'পেটা'ঘাতে তিনশো ষাট ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘুরে গিয়ে শুকনো মাটিতে মুখ থুবড়ে পরলো লোকটা।
ক্রীতিক পুনরায় সানগ্লাসটা চোখে চড়িয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,—— এটাই আমার পরিচয়।
বাড়ি বয়ে এসে, নিজের লোকের উপর হঠাৎ আ'ক্রমণ দেখে, রেগেমগে বেশ ক্ষী'প্র গতিতে এগিয়ে এলো রেজা, ক্রীতিকের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে গাঢ় গলায় বললো,
—- আমার লোকের গায়ে হাত তুলিস কে তুই? আমাকে চিনিস, আমি হলাম সহসভা…
রেজার কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই ওর বাম গালে আঁচড়ে পরলো তীব্র ক'ষাঘা'ত। হঠাৎ থা'প্পড়ের তাল সামলাতে না পেরে রেজা নিজেও ঘুরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পরলো শুকনো চৌচির মাটিতে।
নিজেদের নেতাকে এমন বলিষ্ঠ থা'প্পড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখে, হকিস্টিক নিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়েও ভয়ার্ত ঢোক গিলে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলো দলের অন্য ছেলে গুলো।এদের কান্ডে তরাগ করে ক্রীতিকের মাথায় র'ক্ত উঠে গিয়েছে, পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িটাকে চিড়িয়াখানার মতোই অদ্ভুত লেগেছে ওর নিকট। মস্তিষ্কে দমে থাকা সুপ্ত রা'গটা হুট করেই চড়াও হয়েছে

চোখের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা রেজার উপর। আজ এই সহসভাপতির তো একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে ও, যেই ভাবা সেই কাজ ছেলে পেলেদের হাত থেকে হকিস্টিক ছি'নিয়ে এনে ইচ্ছে মতো রাগ ঝেড়েছে রেজার উপর। ক্রীতিক যখন হকিস্টিকের শ'ক্ত প্রহা'রে ফা'টিয়ে ফেলছিল রেজার শরীর। ঠিক তখনই চোখের সামনে হাজির হয় আনচান করতে থাকা চূর্ণ বিচূর্ণ একজোড়া অসহায় চোখ।
যা দেখে পুরোপুরি থেমে যায় ক্রীতিক, হাতের হকিস্টিকটা ছু'ড়ে ফেলে দেয় অনেক দূরে, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পরে নিজে আ'ঘাতপাপ্ত হয়ে অন্য একজনের আত্মাকে য'ন্ত্রনায় পু'ড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।
বালাইষাট ক্রীতিক তাতে সফল হয়েছে, অরু ক'ষ্ট পেয়ে সদর দরজার সামনে হু'মড়ি খেয়ে পরে চিৎকার করে কাঁদছে। মনে হচ্ছে ওরা ক্রীতিককে নয়, প্রতিটা আ'ঘাত অরুর হৃদয়ে করছে।
শেষমেশ দ্বিতীয় গাড়িটা গেইট দিয়ে ঢুকতেই ঝামেলার অবসান হলো। গাড়ি থেকে একে একে নেমে এলো, সায়র,অর্ণব, এলিসা, ক্যাথলিন আর প্রত্যয়। ক্রীতিক ভারী পা ফেলে সদর দরজার কাছাকাছি আসতেই, অরু এগিয়ে এসে ওর ক্ষ'তস্থানের দিকে হাত বাড়িয়ে ঠোঁট উল্টে ফুঁপিয়ে উঠে বললো,
—— কেন করলেন এমনটা?আমাকে কাঁদাতে খুব ভালো লাগে তাইনা?
ক্রীতিক জবাব দেয়া তো দূরে থাক বরং অরু ছোঁয়ার আগেই, ওর থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে দাড়ায়।
ওর এহেন কান্ডে অরু বিস্মিত হয়ে বললো,

—- কি হয়েছে আপনার? আমাকে চিনতে পারছেন না?
অরুর প্রশ্নের বিপরীতে ক্রীতিক কোনোরূপ জবাব দেওয়ার আগেই ওদিক থেকে সায়র এগিয়ে আসতে আসতে সম্মোহনী হেসে বললো,—— আরে মিস এলোকেশী, আবার দেখা হলো আমাদের।দেখলে তো কেমন তোমার টানে চলে এলাম।
কথায় কথায় সায়র খেয়ালই করেনি ক্রীতিক যে ওর দিকে তখন থেকে অ'গ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যখন খেয়াল করলো,তখন সঙ্গে সঙ্গে গলা খাদে নামিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে মেকি হেসে বললো,
—— না মানে তোমাদের দেশের মানুষের টানে,কি ভালো মানুষ তোমরা বাবাগো, আসার সঙ্গে সঙ্গে কেমন মা'রামা'রি দিয়ে আপ্যায়ন করে নিলে। ততত‌াইনা জেকে?ক্রীতিক একইভাবে ভাবে দাড়িয়ে আছে, ওদিকে এলিসা এগিয়ে এসে অরুকে দেখা মাত্রই চমকে উঠে বললো,
—- শরীরের এ'কি হাল হয়েছে তোমার অরু? খাওয়া দাওয়া করোনা নাকি? এভাবে শুকিয়ে গেলে কেন?
এলিসার কথার মাথায় ক্রীতিক সাবধানে আড় চোখে একবার অরুর আগাগোড়া পরখ করলো।
ওদিকে অরু কারও কথার কোনোরূপ উত্তর না দিয়েই চোখ মুছতে মুছতে দৌড়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলো।
অরু চলে গেলে সায়র হতবিহ্বল মুখে সেদিকে তাকিয়ে বললো,
—- আরে এতোদূর থেকে এলাম, একটুখানি ওয়েলকাম না করে এভাবে দাড় করিয়ে রেখে দৌড়ে চলে গেলো?
এলিসা একপলক ক্রীতিককে পরখ করলো, যে সেই কখন থেকে একইভাবে অরুর যাওয়ার পানে চেয়ে আছে, আর কোনো দিকে

নজর নেই বললেই চলে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্রীতিকের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সায়রের হাত ধরে ভেতরে যেতে এলিসা বলে,—-স্বামী স্ত্রীর মান অভিমানের পালা চলছে এখানে, চল ভেতরে যাই, এমনিতেও আমাদের ওয়েলকাম করার মতো কেউ নেই।
সায়র ভ্রু কুঁচকে ভেতরে যেতে যেতে গম্ভীর মুখে বললো,
—- হ্যা তাতো থাকবেই না, বাড়ির মালিক কে দেখতে হবে না? এক নম্বরের হিটলার। আলিশান মহলের বসার ঘরে কয়েক ইঞ্চি গা দাবিয়ে দেওয়া নরম গদিতে বসে আছে সবাই। ক্রীতিক সেই তখন থেকে পায়ের উপর পা তুলে স্মো'ক করছে। প্রত্যয় চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে পুরো বসার ঘর পর্যবেক্ষন করে মনেমনে বললো,
—- ক্রীতিক ভাই শুধু শুধু টেনে হিঁচড়ে দেশে নিয়ে এলো। যার জন্য দেশে আসলাম সেই তো নেই।
ওর ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে ক্রীতিক ডেকে বলে,—— আমার কয়েকটা আর্জেন্ট বাইক লাগবে প্রত্যয়,কোন ব্র্যান্ডের গুলো ইউজ করি তাতো জানোই। বাইরের গ্যারেজটা পরিস্কার করার ব্যাবস্থা করো। আর হ্যা, আমার রুমে একটা গেমিং মনিটর পাঠিয়ে দিও মনে করে।
সায়র তিনশো ষাট ডিগ্রি এঙ্গেলে চারিদিকে একঝলক চোখ ঘুরিয়ে বললো,
—- ভাই এটা বাড়ি নাকি রাজ প্রাসাদ?সবকিছুতেই কেমন আভিজাত্যের ছোঁয়া।
সায়রের তালেতাল মিলিয়ে এলিসাও বলে ওঠে,
—- রিয়েলি জেকে ইটস অ্যামেইজিং। ইউর ফ্যামিলি হ্যাজ ভেরি গুড টেস্ট।

ওদের থেকে কিছুটা দূরত্বে ডাইনিং এর কাছে দাঁড়িয়ে জাহানারা আর রুপা হা করে ওদের কথা গিলছে। একপর্যায়ে রুপা তব্দা খেয়ে বললো,

—-- মা দেখো কি সুন্দর সুন্দর ছেলে সব বিদেশি। জাহানারার চোখ চিকচিক করে উঠলো মেয়ের কথায়, তিনি আবেগ সামলাতে না পেরে এলিসাকে দেখিয়ে বললেন,

—-- ছেলে বাদ দে ওই মেয়েটাকে দেখ, কি সুন্দর। এরকম একটা মেয়ে যদি আমার ব্যাটার বউ হতো?

জাহানারার মুখ থেকে কথাটা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি কথায় কথায় যেন অর্ণব এগিয়ে গিয়ে এলিসার ঠোঁটে একসাথে কয়েকটা চুমু খেলো, সবার সামনেই সেই চুমুতে আবার পুরোদস্তুর সায় দিলো এলিসা। যা দেখে এই মূহুর্তে জাহানারার ভীমড়ি খাওয়ার উপক্রম, তিনি মেয়ের হাত দুটো ধরে হাসফাস করে উঠে বললেন,

—-- রুপারে আমাকে একটু ধর।

এতোক্ষণ যাবত সেভাবে খেয়াল না করলেও এখন নিজের শার্টের কলার নাড়াতে নাড়াতে জাহানারার উদ্দেশ্যে অর্ণব বললো,

—-- এই যে খালা একগ্লাস ঠান্ডা পানি দিন তো। বিডিতে অনেক গরম।

ক্যাথলিন একটু ইতস্তত কন্ঠে ভা'ঙা ভা'ঙা বাংলায় বললো,—-- আমিও।

জাহানারা একটু জোরপূর্বক হেসে বললো,

—-- ইয়ে মানে বাবা'রা আমি আসলে এ বাড়ির খালা নই।

বাকি কথা শেষ করার আগেই ক্রীতিক প্রত্যয়কে উদ্দেশ্য করে বললো,

—-- বাড়ির কেয়ারটেকার মোখলেস চাচাকে খবর দাও, আমার ফ্রেন্ডসরা যতদিন আছে উনি যাতে একজন ভালো বাঙালি রাধুনি রেখে দেয়। ওরা যাতে বাঙালী এক্সোটিক খাবার দাবার গুলো টেষ্ট করতে পারে, আর হ্যা এস সুন এস পসিবল এদেরকে বিদেয় করো,আমার মহিলা সার্ভেন্ট পছন্দ নয়।
ক্রীতিকের কথায় অপমানে থমথমে হয়ে গেলো জাহানারার মুখ।
রুপা চুপসানো মুখে ঠোঁট উল্টে মিনমিনিয়ে বলে,
—-- মা কি বলছে উনি? আমরা নাকি সার্ভেন্ট?
জাহানারা মেয়েকে আস্বস্ত করে বললেন,—-- চুপ কর তোর ফুপি ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
ক্রীতিক এতোক্ষণে সোফা ছেড়ে উঠে সামনের কেভিনেটের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বললো,
——এখানে আমার ফেবারিট কিছু শোপিচ ছিল, কোথায় গেলো সেগুলো?
জাহানারা তৎক্ষনাৎ নালিশ করার মতো গলা উঁচিয়ে অরুর ঘরের দিকে ইশারা করে বলে ওঠে,
—— ওই যে, ওই মেয়েটা ভে’ঙেছে, শুধু এগুলো না আরও অনেক কিছু ভে’ঙেছে। এইটুকু মেয়ের সে’কি তেজ।
ক্রীতিক সবাইকে শুনিয়ে বিড়বিড়ালো,
—— আমার বউ, তেজ থাকা মাস্ট। প্রত্যয় শোনো।
এগিয়ে এসে প্রত্যয় শুধালো,
—-- হ্যা ভাই?আগের শোপিচ গুলোর মতোই সেম কিছু শোপিচ অর্ডার করে দিও, ওগুলো আমার অনেক ফেবারিট। আর হ্যা

একজোড়া করে অর্ডার করে দিও। বলা তো যায়না মহারানীর আবার কখন মুড সুইং হয়।
প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে সবকিছু নোট করে বললো,
—— ভাই এখন আসছি, অনেক দিন পর ফিরেছি বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছে।
ক্রীতিক ওর কাঁধের উপর হাত রেখে আস্বস্ত করে বললো,
—- বিলিভ মি,এখন ফিরে যাচ্ছো, তবে খুব শীঘ্রই স্ব-সম্মানে এই বাড়িতে পা রাখবে তুমি।
ক্রীতিকের কথায় স্মিত হেসে দ্রুত পদধ্বনিতে যায়গা ত্যাগ করলো প্রত্যয়। বিকেলের কালো মেঘ রাত হতেই পরিনত হয়েছে প্রকান্ড ঝড়ে, ঝড়ের বেগে চারিদিকে প্রবল হাওয়া দিচ্ছে। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই,জেনারেটর জ্বালিয়ে সকলে মিলে রাতের খাবার খেতে বসেছে ওরা। অনেক বছর পরে এমন বৈশাখী ঝড়ের মাঝে টিমটিমে আলোয় টেবিলে হরেক রকমের বাঙালি খাবার দেখে উৎকন্ঠার সীমা নেই ওদের সবার।
ঘি মাখানো ভাত, আমের ডাল, কুচো চিংড়ি ভুনা,কাতলা মাছের ঝোল, মাংস কষা, শিল পাটায় তৈরি ভর্তা,লাউ পাতার বড়া আর শেষ পাতে দই মিষ্টি। কতোটা আমোদ করেই না খাবার গুলো হাতে মেখে উপভোগ করছে ওরা।
একটু পর ফ্রেশ হয়ে এসে ওদের মাঝে চেয়ার টেনে বসলো ক্রীতিক, ওর চোখ দুটো আইপ্যাডে নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে খেয়ালই করলো না যে ও অরুর পাশে বসেছে।

বিকেলের ঘটনার পরে এলিসাই অরুকে বুঝিয়ে শুনিয়ে খাবার খেতে নিয়ে এসেছে, এলিসা বড় আপার মতো, তাই ওর কথা ফেলতে পারেনি অরুও সহসাই চলে এসছে ডাইনিং এ।
চিকন কোমল হাতে প্লেটের মধ্যে কেউ ভাত তুলে দিচ্ছে, ব্যাপারটা দৃষ্টিগোচর হতেই আইপ্যাড থেকে চোখ সরালো ক্রীতিক। দেখলো অরু, ওর পাশে বসে নিজের ছোট ছোট হাত দিয়ে পটু গিন্নিদের মতো করে ওর প্লেটে খাবার বেরে দিচ্ছে। লম্বা চুলের আড়াল থেকে অরুর ঢিলে হয়ে যাওয়া জামাটা স্পষ্ট জানান দিচ্ছে যে অরু কতোটা শুকিয়ে গিয়েছে। ক্রীতিক সেদিকে একঝলক তাকিয়ে, হুট করেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালো। ক্রীতিকের কান্ডে অরু আচমকা লাফিয়ে উঠলো,সায়র খেতে খেতে শুধালো,—— কি হয়েছে?
ক্রীতিক বেসিন থেকে হাত ধুয়ে উপরে যেতে যেতে বললো,
—— নাথিং।
অর্ণব হাঁক ছেড়ে বললো,
—— খাবিনা?
সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে যেতে যেতে জবাব দিলো ক্রীতিক,
——খিদে নেই।
ক্রীতিক এভাবে উঠে যাওয়াতে অরু অ'পমানিত বোধ করলো খুব ,লোকটা শুধু শুধু ওর সাথে কেন এমন রাগ দেখাচ্ছে কিচ্ছুইতো মাথায় ঢুকছে না ওর। ক্রীতিক কি এমন ভুলের শা'স্তি দিচ্ছে ওকে? সবাই এই মূহুর্তে ওর থমথমে মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে

সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে যায় অরু। ওরা দুজন চলে যাওয়ার পরপরই সায়র বিরক্তিতে চিড়বিড়িয়ে উঠে বললো,

—- তোর বন্ধু চাইছেটা কি অর্ণব? যার জন্য ইউ এস এ বসে ড্রা'গ,ফ্রা'গ নিয়ে যা-তা অবস্থা করে ফেলেছিল, আর এখন চোখের সামনে পেয়েও তাকে না দেখার ভান করে এরিয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য।

এলিসা ক্যাথলিনের প্লেটে তরকারি তুলে দিতে দিতে বললো,

—- জেকে নিজের অভিমানটা প্রকাশ করতে পারছে না, কারন এসব ওর ধাঁচে নেই,যার ফলস্বরূপ অরুর সাথে এমন রু'ড বিহে'ভ করছে। আই থিংক সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। অরুই ঠিক করে ফেলবে। কারণ ওই পিচ্চি মেয়ে ছাড়া আর কারোর ধার ধারেনা ঘাড় ত্যাড়া ছেলেটা।

এলিসার কথা শুনে অর্ণব খেতে খেতে আমোদিত সুরে বললো,

—— জান, তুইতো দেখি জাতে মাতাল তালে ঠিক আছিস।

এলিসা এদিক ওদিক তাকিয়ে কটমটিয়ে বললো,

—— একবার রুমে চল, তারপর তোর হচ্ছে। বাইরে ঝড়ের তান্ডব ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মেঘভেজা শীতল বাতাসে দুলদুল করছে চারিপাশ, অন্ধকারে দৌড়াতে দৌড়াতে চিলেকোঠা অবধি চলে এসেছে অরু। বিদ্যুৎ নেই, তারুউপর দমকা, তাই অন্ধকারটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে। অরু যখন চিলেকোঠার ঘরের সামনে এসে হাঁটু ভে'ঙে বসে তাতে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো, তখনই নাকে এসে সুড়সুড়ি দিলো চেনা পরিচিত ম্যানলি স্যান্ডালউড পারফিউমের সুঘ্রাণ। এই সুঘ্রাণটা অরুর বেশ পরিচিত। শুধু পরিচিত বললে ভুল হবে, একটা সময় এই সুঘ্রাণে মিলে মিশে একাকার হয়ে উঠেছিল ওর শরীর। প্রথম নারী সত্তার বিসর্জন

হয়েছিল সেই সুঘ্রাণ যুক্ত পুরুষের হাতেই। আর এখন এই অন্ধকার চিলেকোঠায় আবারও স্যান্ডাল উড পারফিউমের সুঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে ফোপাঁতে ফোপাঁতে এদিক ওদিক চোখ বোলাতেই অরু দেখলো মানুষটাকে।
অন্ধকারের মাঝে ট্রাউজারের পকেটে হাত গুঁজে নির্বিগ্নে নিকোটিনের ধোঁয়া উড়াচ্ছে ক্রীতিক। ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে অরু চট করে উঠে দাড়িয়ে শক্ত গলায় বললো,—— আমাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যই বুঝি হাজার মাইল দূর থেকে বাড়ি বয়ে এসেছেন?
ক্রীতিক কোনো প্রকার জবাব দিলো না। ক্রীতিকের নিরবতায় অরুর মস্তিষ্কটা টগবগিয়ে উঠলো, ও দু কদম এগিয়ে এসে ঝাঁজালো কন্ঠে বললো,
—- কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, তাইতো?
ক্রীতিক এবারও নিশ্চুপ।
অরু এবার পেছন থেকে ক্রীতিকের টিশার্টটা খা'মচে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠে বললো,
—-এতোই যদি অপছন্দ আমাকে, তাহলে ডিভোর্স দিয়ে দিলেই তো পারেন। শুধু শুধু কেন এভাবে ন'রক য'ন্ত্রতা দিচ্ছেন?
ক্রীতিক এবার সিগারেটটা পায়ে পিশে অরুর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললো,—- কলিজায় সাহস টা খুব বেড়ে গিয়েছে দেখছি? এখনই ডিভোর্স চাওয়া শিখে গেছিস? "ডিভোর্স" শব্দটা উচ্চারণ করতে একবারও বুক কাঁপলো না তোর? এই কথার জন্য তোর কি হাল করবো আমি সেটা একবারও কল্পনা করেছিস?

ক্রীতিকের শান্ত মসৃণ অথচ প্রান না'শকারী হু'মকির ন্যায় ধা'রালো কথায় শুকনো ঢোক গিলে দু কদম পিছিয়ে গেলো অরু।
পেছাতে পেছাতে নীড়হারা ব্যার্থ পাখির ন্যায় আহত কন্ঠে বললো,
—— আপনাকে ভালোবাসাটা যে এতো য'ন্ত্রনার তা আগে জানা ছিলোনা আমার।
ক্রীতিক অরুর দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বললো,
—- এতোটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছিস? সারাজীবন আমার সাথে থাকবি কি করে তুই?
অরু ঠোঁট উল্টে অভিমানি কন্ঠে শুধায়,
—— এতোদিন দূরে থেকে পো'ড়াতেন আর এখন কাছে এসে পো'ড়াচ্ছেন কেন করছেন এমন? একটু ভালো বাসুন না? আমি আপনার একটুখানি ভালোবাসা পাওয়ার জন্য চাতক পাখির মতো ছটফট করছি, আপনিকি বুঝতে পারেন না?ক্রীতিক এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এগিয়ে অরুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। দমকা হাওয়ায় অরুর লম্বা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছে। খানিক বাদে বাদে উড়ে গিয়ে ঠায় নিচ্ছে ক্রীতিকের চওড়া বুকে। অরুকে অবাক করে দিয়ে ক্রীতিক ওর চুল গুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে চোখ বন্ধ করে তাতে নিঃশব্দে নাক ছোঁয়ালো,অতঃপর মুঠো ভর্তি অরুর চুলের সুবাসে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিলো ক্রীতিক। দুজনার নিরবতায় কিছুক্ষণ সেভাবেই অতিবাহিত হলো।
পরমূহুর্তেই শুকিয়ে যাওয়ার দরুন অরুর বেড়িয়ে আসা কলার বোন গুলোর দিকে নজর পরতেই শক্ত হয়ে এলো ক্রীতিকের চোয়াল। ও তৎক্ষনাৎ অরুকে ধা'ক্কা মে'রে দূরে সরিয়ে দিয়ে গটগটিয়ে নিচে যেতে যেতে বললো,

—- ইউ ডিজার্ভ ইট। কাক ডাকা ভোরে ঘুম ভেঙেছে সায়রের।
সকাল সকাল ঘুম ভাঙার অভ্যেস না থাকলেও ইউ এস এ, বাংলাদেশ সময়ের তারতম্যের কারণে রাতে সেভাবে ঘুম হয়নি ওর। রাতে ঘুম না হলেও দুপুরের দিকে হয়তো দেখা যাবে ঘুমের জন্য চোখের পাতা খুলে রাখাই দায় হয়ে পরেছে। তাই ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে সকাল সকালই একটু খানি লেকের আশেপাশে হাটতে বেরিয়েছে সায়র।
পেছনে অবশ্য ট্র্যাক স্যুট পরে ক্রীতিক আর অর্ণব ও বেরিয়েছে, তবে ওদেরকে পেছনে ফেলেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে সায়র। রাতে ঝড়ের তান্ডবে পুরো ব্যাক ইয়ার্ড ভরে গিয়েছে কাঁচা আমে। মহলের চারপাশ থেকে সুক্ষ হাতে সেই আম কুড়াচ্ছে বাড়ির কেয়ারটেকার মোখলেস চাচা। সেখানটায় মোড়া পেতে বসে আছে এলিসা আর ক্যাথলিন। ক্যাথলিন ডিএসএলআর এর ক্লিকে কর্মরত মোখলেস চাচার ছবি ধারণ করায় ব্যস্ত। আর এলিসা এটা ওটা প্রশ্ন করায়। মোখলেস চাচাও হাত চালাতে চালাতে বেশ উৎসুক হয়ে উত্তর দিচ্ছেন এলিসার প্রশ্নের।
সায়র হাঁটতে হাঁটতে গেইটের কাছে এগিয়ে এসে গেইট খুলতে যাবে, তার আগেই কেউ একজন গেইট খুলে হুরমুরিয়ে প্রবেশ করে বাড়ির ভেতরে, হুট করে প্রবেশ করায় দুজনার একজনও ঠিক মতো ঠাওর করতে পারেনি, অগত্যাই টাইম টেবিল মিলে যাওয়ায় আগন্তুক তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পরলো সায়রের কোলে। সায়রও সিনেমার হিরোদের মতোই দক্ষ হাতে ধরে ফেললো তাকে। ঠিক যেন বল নাচের সেই বিখ্যাত পোজ। আগন্তুকের বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে যাওয়া মার্বেলের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে যেন

কবি বনে গেলো সায়র, হুট করেই সুর ধরে বলে উঠলো,—— এই কাক ডাকা ভোরে, পথ ভুলে আমার মনের অভ্যায়রন্যে এসে উষ্ঠা খেয়ে পরে গেলে,কে তুমি অবলা নারী?
সায়রের কথায় বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে ফেললো নীলিমা , তরিঘরি করে পা'গল লোকটার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে, জামা কাপড় ঠিক করতে করতে নীলিমা বললো,
—— কান খুলে শুনুন ব'দমা'শ পুরুষ, আমি মোটেও অবলা নারী নই। আর না আমি পথ ভুলে কোথাও উষ্ঠা খেয়েছি। বরঞ্চ আপনিই এখানে খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহল্লায় নতুন মনে হচ্ছে, তাই নীলিমাকে চেনেন না। ইভ'টিজিং করতে আসলে না?আব্বাজানকে বলে এমন ক্যালানী খাওয়াবো,যে সারা জীবনের জন্য এই মহল্লার ঠিকানাই ভুলে যাবেন,হুহ।গড়গড়িয়ে কথাগুলো শেষ করে,একটা মুখ ঝামটি দিয়ে চলে গেলো নীলিমা।
সায়র ঠোঁট উল্টে ক্যাবলা কান্তের মতো বিড়বিড়িয়ে বললো,
—- আশ্চর্য বাঙালি মেয়েরা এতো সেনসিটিভ কেন? কি এমন বললাম? মেয়ে তো নয় যেনো ধানিলঙ্কা, আব্বাজানের ভ'য় দেখায়। আজিব!
এতোক্ষনে ক্রীতিক আর অর্নব ও এগিয়ে এসেছে গেইটের কাছে। সায়রকে এভাবে একা-একা কথা বলতে দেখে অর্নব ওর কাঁধে হাল্কা ধাক্কা দিয়ে বললো,
—— কিরে ঠিক আছিস?
সায়র ঠোঁট কামড়ে বললো,
——দোস্ত মেয়েটাকে দেখেছিস, পুরাই রাগিণী।
অর্নব ফুস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,

—-- জেকে অরুতে আসক্ত, আর আমার এলি আছে, তাই আমাদের মেয়ে দেখিয়ে লাভ নেই দোস্ত।
সায়র মাথা চুলকে শুকনো মুখে বলে,—— হ্যা ঠিকই তো তোমাদের বিয়ে বাসর সব শেষ, আর আমি এখনো সিঙ্গেল।
সায়রের কথার পাছে অর্ণব আবারও ভুল ধরে বললো,
—-- এবারও মিস্টেক আমার বিয়ে হয়নি, আর জেকের বাসর।
সায়র চোখ ছোট ছোট করে ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে বললো,
—-- আমি ওকে বিশ্বাস করিনা দোস্ত । ও যা অধৈর্য, সুযোগ পেলে গাড়ির মধ্যে বাসর সেরে ফেলতেও দু'মিনিট ভাববে না।
সায়রের কথায় ক্রীতিক আচমকা বিষম খেলো। কাশতে কাশতে বললো,—— আমাকে নিয়ে গবেষণাটা এবার বন্ধ করবি তোরা?
ক্রীতিকের নাজেহাল অবস্থা দেখে সায়র অর্ণব ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে একই সুরে বলে উঠলো,
—— তুই কি আসলেই গাড়িতে…….
ওদের কথা বলার আর কোনো কোনোরূপ ফুরসত না দিয়ে হনহনিয়ে গেইটের বাইরে চলে গেলো ক্রীতিক।
ক্রীতিক চলে যেতেই, সায়র আর অর্ণব একজন আরেকজনার দিকে তাকিয়ে আপসোসের সুরে বললো,
—— হাহ,জেকে শালা সব কিছুতেই ফার্স্ট। ক্রীতিক গেইট ছাড়িয়ে বাইরে বেরোতেই দেখতে পেলো একটা সাদা টয়োটাতে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে ক্রীতিক কুঞ্জের দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে অমিত।
একসাথে একই ভার্সিটিতে পড়ার সুবাদে প্রথম দেখাতেই অমিতকে চিনতে পারলো ও। তাই সহসা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন ছুড়লো ক্রীতিক,
—— অমিত আরিয়ান রাইট?

অমিত তরিঘরি করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্রীতিকের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো,——চিনতে পেরেছো তাহলে?
ক্রীতিক একটু ইতস্তত করে হাত মিলিয়ে বললো,
—— তা আমার বাড়ির সামনে কি করছো?
অমিত মৃদু হেসে বললো,
—— তোমার বোনের জন্য ওয়েট করছিলাম, ও তো বাংলা একাডেমিতে যায় প্রতিদিন, তাই ভাবলাম আমি যেহেতু এই গলি দিয়ে যাচ্ছি ওকেও নিয়ে যাই ।
ক্রীতিক ভ্রু কুঞ্চিত করে অবাক হয়ে বললো,
—- আমার বোন মানে?
—- কেন অরোরা তোমার বোন না?
ওর কথায় পেছন থেকে সায়র ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে,
—- গেলো!
অমিত একটু ঝুঁকে মাথা কাত করে শুধালো,
—- কি গেলো?অমিতের কথায় চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে ক্রীতিকের। কোনো মতে হাতদুটো মুঠি বদ্ধ রেখে নিজেকে সংবরণ করে, দাঁতে দাঁত চেপে ও বললো,
—— অরোরা আজকে যাবেনা, শরীর ভালো নেই ওর, তুমি যেতে পারো।
অমিত আর কিইবা করবে হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে গাড়ি নিয়ে তৎক্ষনাৎ প্রস্থান করে।
অমিতের গাড়িটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক কাউকে কল দিয়ে বললো,

—— ক্রীতিক কুঞ্জের সীমানা ছাড়ানোর আগেই সাদা টয়োটার টায়ার বরাবর গু'লি করে দাও। যাতে করে সারা জীবনে আর এই বাড়ির সামনে দাড়ানোর সাহস না পায় ওই গাড়ি।
এতোক্ষণ যাবত সবকিছুই পেছনে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষন করছিল সায়র আর অর্ণব। ক্রীতিকের শেষ কথাগুলো শুনে সায়র অর্ণবের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো,
—- দোস্ত তোকে বলেছিলাম না সকাল থেকেই বাম চোখটা কেমন লাফাচ্ছে, দেখলি তো?
অর্ণব চিবিয়ে চিবিয়ে বললো,—- তোর জীবনে নারী নামক প্যারার এন্ট্রি ঘটেছে ওই জন্য লাফিয়েছে। এখানকার ঘটনার জন্য নয়, তাই ভুলভাল যুক্তি প্রদান করা বন্ধ কর।নয়তো জেকে কে বলে তোর অন্য চোখ লাফানোর ব্যাবস্থা করছি আমি।
সায়র বিস্ময়ে ভ্রু কুঞ্চিত করে শুধালো
———কি বলবি?
—— বলবো তুই আবারও অরুর নাম মুখে নিয়েছিস।।
কথাটা শেষ করেই কপট হাসিতে প্রসারিত হলো অর্ণবের ঠোঁট। ওদিকে সায়র অর্ণবের দিকে তাকিয়ে রাগে কটমটিয়ে উঠে বিড়বিড়ালো,
—— শা'লা মীরজাফর।
গোধূলি বিকেলে সূর্যের ঝাঁ ঝাঁ উত্তাপ কমে এসেছে কিছুটা। এখন পর্যন্ত পায়ের তলার মাটি লোহার তাওয়ার মতোই তেতে আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, দুপুরের ভাতঘুমে বিভোর পুরো মহল্লা। শুনশান নিরবতার মাঝেই গলির মোড় থেকে ক্ষনে ক্ষনে ভেসে আসছে নেড়ি কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ।

ভেজা টিস্যু দিয়ে কপালের অহর্নিশ ঘাম টুকু মুছে মাত্রই ক্রীতিক কুঞ্জের কলিং বেলে হাত চালালো প্রত্যয়।
আজ আর কোনো ফর্মাল পোশাকে নয়, মেরুন টিশার্ট আর ব্ল্যাক ডেনিমে হাজির হয়েছে সে। কাঁধে ল্যাপটপ ব্যাগ। বাংলাদেশে আসার দরুন। আমেরিকার আবহাওয়ার সাথে মিলিয়ে ডাই করা হালকা বাদামি চুলগুলোতে রুক্ষতা স্পষ্ট দৃশ্যমান।চোখের চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠেলে, দরজার বাইরে দাড়িয়েই নিজের পছন্দের স্টাইলিশ চুলগুলোতে হাত বোলালো প্রত্যয়, অতঃপর অপেক্ষারত হলো সদর দরজা খোলার।এই উত্তপ্ত বিকেলে কিছুতেই ক্রীতিক কুঞ্জে আসার ইচ্ছে ছিলো না প্রত্যয়ের। কিন্তু ক্রীতিকের জরুরি তলবে না এসে আর উপায় কি?
ক্রীতিকের সিদ্ধান্ত এখন থেকে জেকে গ্রুপের বাংলাদেশি ব্র্যাঞ্চে নিয়মিত বসবে সে। তাই কোম্পানির প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস গুলো নিয়েই এই ভর দুপুরে ছুটে আসা। ক্রীতিক মালিক মানুষ, সে চাইলেই হাজার দিন দায়িত্ব ফেলে রাখতে পারে। কিন্তু প্রত্যয়ের তো আর সেই সুযোগ নেই। পুরো কোম্পানির দ্বায়িত্ব তার কাঁধে, বাংলাদেশ হোক কিংবা বিদেশ অফিস তো তাকে নিয়মিতই করতে হয়। তারউপর ক্রীতিকের ব্যক্তিগত একটা সাইড ও পুরোপুরি প্রত্যয়ের দেখভাল করতে হয়, সে হিসেবে প্রত্যয় ভিষণ ব্যস্ত একজন মানুষ।
নিজের হাজার রকম দ্বায়িত্বের কথা চিন্তা করতে করতে আবারও ভেজা টিস্যু দিয়ে কপাল মুছলো প্রত্যয়। ঠিক তখনই ঝনাৎ করে খুলে গেলো সদর দরজা। নিজের ভাবনা থেকে বেরিয়ে প্রত্যয় সামনে তাকাতেই দেখলো কালো চুড়িদার পরিহিত অনুকে। যে এই

মূহুর্তে প্রত্যয়কে দেখে চোখদুটো রসগোল্লা বানিয়ে দাড়িয়ে আছে। অনুর চোখে চোখ পরার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ছোট ছোট করে ফেললো প্রত্যয়। ধীর পায়ে সামনে এগোতে এগোতে ধা'রালো গলায় কথা ছু'ড়লো তৎক্ষনাৎ,—- তোমার না বিয়ে হয়ে গিয়েছে কোন ভুড়ি ওয়ালা আড়ৎদারের সাথে? খুব বড়লোক,পুরান ঢাকার নামকরা ব্যবসায়ী,তোমাকে অনেক ভালোবাসে, বাসর করাও শেষ। তাহলে এখানে কি করছো?
প্রত্যয়ের রক্তিম চোখের দিকে তাকিয়ে ঢকাত করে শুষ্ক গিলে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলো অনু। অনুর পদচারণ অনুসরণ করে প্রত্যয় এগোতে এগোতে পুনরায় বললো,
—-কোথায় সেই গোঁফধারী সুদর্শন পুরুষ? আমিও একটু দেখি আমার অনুকে কে দিলো এতো সুখ? বিছানায় পারফর্মেন্স কেমন ছিল সেটাও তো জানতে হয়। আমার জিনিসকে আমার আগেই উপভোগ করেছে, ভুড়িওয়ালার লাক আছে বলতে হয়। আমার অপরিচিতা যে ভুঁড়িতে এতো শান্তি খুঁজে পায়, তা জানলে এতো কষ্টে জিম করে আর বডি বানাতাম না, ট্রাস্ট মি।
প্রত্যয়ের উল্টাপাল্টা কথা শুনে অনু মনেমনে বললো,—- রাগের চোটে ওনার মাথার তাড় ছি'ড়ে গিয়েছে, এক্ষুনি আইসব্যাগ দিতে হবে।
যেই ভাবা সেই কাজ, অনু ছুটে গিয়ে ফ্রীজ থেকে আইস ব্যাগটা এনে প্রত্যয়ের মাথার উপর রেখে দিলো ভোঁ দৌড়। অনু ভয়ের চোটে গা ঢাকা দিতে চাইছে ব্যাপারটা বুঝে আসতেই অনুর পেছন পেছন ছুট লাগালো প্রত্যয়, ওকে তাড়া করতে করতে চেঁচিয়ে প্রত্যয় বললো,

—- অনুর বাচ্চা, তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমাকে মিথ্যে বলার শা'স্তি সরুপ মুখ সেলাই করে দেবো তোমার। তারপর তোমায় দেখিয়ে দেখিয়ে আন্টিমার্কা মহিলাদের সাথে ফ্লার্ট করবো, তখন বুঝবে কেমন লাগে।
ধা'ন্দাবাজ মহিলা দাঁড়াও বলছি।কে শোনে কার কথা অনু ছুটছে তো ছুটছেই। একতলা পেরিয়ে দোতলা, দোতলার করিডোর পেরিয়ে তিনতলা তারপর সোজা ছাঁদ। প্রত্যয়ও দমবার পাত্র নয়, এতোগুলো মিথ্যে বলার শাস্তি আজ অনুকে দিয়েই ছাড়বে ও। তাইতো অনুর পিছনে ছুটতে ছুটতে ছাঁদে চলে আসা।
দৌড়ে ছাঁদের শেষ মাথায় এসে অকস্মাৎ থেমে গেলো অনুর পা। কোনো মতে পাঁচিলে হাত দিয়ে নিজেকে সামলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে চাইলো অনু। দেখলো ওর থেকে কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাঁটুতে হাত ভর করে হাঁপাচ্ছে প্রত্যয়। কয়েক সেকেন্ড হাঁপিয়ে, নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে, অনুর দিকে তাকিয়ে রা'গে গজগজিয়ে উঠে প্রত্যয় বললো,—- স্কুলে কি দৌড়ের কম্পিটিশন করতে নাকি? বাপরে বাপ।
অনু মুখ কাঁচুমাচু করে বললো,
— আপনি কেন তাড়া করছেন আমাকে? ওই জন্যই তো দৌড়ালাম।
প্রত্যয় দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে অনুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললো,
— শা'স্তি দেবো বলে। তোমার সাহস কি করে হয়, আমাকে এতোগুলা মিথ্যে কথা বলার? তোমার কি মনে হয়? তুমি বলেছো আর আমি তোমার কথা বিশ্বাস করে বসে আছি? স্টুপিড মেয়ে।

সবসময় প্রশ্রয় দিয়েছি, কথার প্রাধান্য দিয়েছি, তাই বলে যা খুশি তাই বলবে? আমার ইমোশন নিয়ে খেলবে? স্পিক আপ?
অনুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো প্রত্যয়। প্রত্যয় প্রচন্ড রেগে আছে, চোখ দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি অনুকে চোখ দিয়েই ভস্ম করে দেবে এই ভদ্র,সভ্য,ঠান্ডা মেজাজের ছেলেটা।
তারউপর মিথ্যে বলার দরুন অনুকেই দোষারোপ করছে বারবার , তাই এইমূহুর্তে ভয়ে কুকরে গিয়ে নিরবে চোখের জল ফেলছে অনু।
প্রত্যয় কা'ন্নারত অনুর দিকে তাকিয়ে রাগে ফোসফাস করতে করতে বললো,—- তোমাকে আমি ম্যাচিউর ভাবতাম অনু। সবসময় বিশ্বাস ছিল তুমি সবকিছু ম্যাচিউরিটি দিয়ে হ্যান্ডেল করবে, আমাদের সম্পর্কটাকেও। কিন্তু না, একটুখানি সাময়িক টানাপোড়েনে তুমি আমাকে জাস্ট ওয়ান টু তে দূরে সরিয়ে দিলে। ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের মিথ্যে বিয়ের কাহিনী শোনালে। তারপর বললে আমাকে ভুলে যান, হাউ সিল্যি। এটাকি বাংলা সিনেমা পেয়েছো?
অনু ফোঁপাতে ফোপাঁতে সামান্য গলা উঁচিয়ে বলে,
— আআসলে পরিস্থিতি।—ফা'ক ইউর পরিস্থিতি। ভালো কিভাবে বাসতে হয় নিজের বোনকে দেখে শেখো। ক্রীতিক ভাই এসেছে শব্দে কথা বলাতো দূরে থাক অভিমানে ফিরেও তাকাচ্ছে না অরুর দিকে। তবুও চুপচাপ সহ্য করছে মেয়েটা। কেন জানো? কারণ ও সত্যিকারের ভালোবেসেছে। সত্যিকারের ভালোবাসায় পরিস্থিতির দোহাই দেওয়াটা একটা অজুহাত মাত্র। ভালোবাসায় যতটা সুখ ঠিক ততটাই য'ন্ত্রনা, এই মাত্রাতিরিক্ত সুখ আর মাত্রাতিরিক্ত য'ন্ত্রটা

দুটোকে সয়ে নিতে পারলে তবেই না তুমি সত্যিকারের ভালোবেসেছো।
কিন্তু আপসোস, তুমি এসবের কিছুই জানোনা,কিছুই বোঝোনা, শুধু একটু আবেগের বশে বলে দিয়েছো সারাজীবন আমার সাথে থাকবে। আরে একসাথে থাকাটা কি এতোই সোজা? ফা'ক ইওর ম্যাচিউরিটি।
রেগেমেগে কথা শেষ করে হনহনিয়ে পিছু হাটে প্রত্যয়। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ছুটে এসে ওকে শক্ত করে জাপ্টে ধরলো অনু। অনুর কান্নারত তীব্র শরীরের ঝাঁকুনি পুরোপুরি অনুভব করতে পারছে প্রত্যয়। বৈশাখী বিকেলের উত্তাপের মাঝেও তৎক্ষনাৎ একটা নরম ভেজা অনুভূতিতে ছেয়ে গেলো প্রত্যয়ের হৃদয় মন।
এভাবে কিছুটা সময় অতিবাহিত হলে, চোখ দুটো খিঁচে বন্ধ রেখে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে নরম স্বরে প্রত্যয় বলে,—- সরি অনু, মাথা ঠিক ছিলোনা তাই তোমাকে একটু বেশিই বকে ফেলেছি।কেঁদোনা।
অনু প্রত্যয়ের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—- আমিই সরি, খুব সরি, কোনোকিছু ভাবনা চিন্তা না করে, আপনার সাথে নিজের সমস্যা শেয়ার না করে, এভাবে এতোগুলা মিথ্যে কথা বলে আপনাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অজুহাত তৈরি করা আমার মোটেই ঠিক হয়নি। আমাকে কি ক্ষমা করা যায়না?শুধু একবার,প্লিইইজ।
—- যেখানে তুমি আমার কাছে অ'পরাধীই নও,সেখানে ক্ষমা করার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে অপরিচিতা?

অনু এবার চোখ তুলে তাকায় প্রত্যয়ের পানে, বোঝার চেষ্টা করে ওর কথার সারমর্ম। প্রত্যয় ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুর চোখ মুছিয়ে দেয়, অতঃপর হিসহিসিয়ে শুধায়,—- ক্যান ইউ ফিল ইট ডিয়ার?
অনু হেঁচকি টেনে বলে কি?
—- কি ফিল করবো?
প্রত্যয় একই সুরে বলে,
—- মাই লাভ। ইউ ফল ইন লাভ উইথ মি, হার্ডলি, শেইম লেসলি,ডেস্পারেটলি এন্ড আনকন্সিয়াসলি।
প্রত্যয়ের কথায় অনু লজ্জায় মিয়িয়ে যায়। লতানো তরুর ন্যায় মাথাটা নুয়িয়ে ফেলে তৎক্ষনাৎ। প্রত্যয় অনুর চিবুকে হাত দিয়ে মাথাটা একটু তুলে বলে,
—- আর যদি কখনো কিচ্ছু লুকিয়েছো, তাহলে সত্যি সত্যি তোমাকে আর ক্ষমা করবো না আমি।
অনু হেঁচকি তুলতে তুলতে না সূচক মাথা নাড়ালে, প্রত্যয় ওকে দু'হাতে বাহুডোরে আগলে ধরে, তপ্ত গমগমে চমৎকার আওয়াজে বলে,——আমি তোমার হৃদয়ের গোপন থেকে গোপনীয় কথাটাও জানতে চাই অনু।
হতে চাই তোমার সুখের সন্ধি আর দুঃখের পিছুটান। আমার নীরে তুমি সর্বক্ষন ভালোবাসায় অম্লান।
বুড়িগঙ্গা পারের নাতিশীতোষ্ণ বাতাসের সাথে সাথে তখনও ভেসে আসছিল বেসুরো দুটো গানের লাইন,
“আমার বেঁচে থাকার প্রার্থনাতে
বৃদ্ধ হতে চাই তোমার সাথে,
অনেক খুঁজে তোমায়, নিলাম চিনে,

ভালোবাসার এই দিনে…. ”আলিশান মহলের সবচেয়ে সুন্দর আকর্ষনীয় আর বড় ঘরটায় থাকেন আজমেরী শেখ। এটা মূলত ক্রীতিকের বাবা জামশেদ জায়ানের ঘর ছিল। স্বামীর সূত্রেই এই ঘরের উত্তরাধিকারী এখন তিনি।
আপাতত এই ঘরের কর্ণারে যে দামি মখমলের ডিভানগুলো রয়েছে, তাতেই মুখোমুখি হয়ে বসে আছে আজমেরী শেখ আর জায়ান ক্রীতিক।
ক্রীতিক সেই তখন থেকে বসে বসে পায়ের উপর পা রেখে দোলাচ্ছে। দু আঙুল দিয়ে বারবার ঘসে যাচ্ছে নিজের কপাল। মূর্তিমান ক্রীতিকের দিকেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন আজমেরী। ক্রীতিক দেশে আসার পরে এটাই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।
ক্রীতিক কি বলতে এসেছে, কিংবা কি বলবে সেসবের জন্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে নিজেই গভীর গলায় প্রশ্ন ছুড়লেন আজমেরী শেখ ,—— এই ঘরে কেন এসেছো, কি চাই?
ক্রীতিক নিজের বন্ধ চোখ জোড়া অকস্মাৎ খুলে ফেললো, অতঃপর শান্ত মসৃণ গলায় বললো,
—- কি চাই সেটা আপনি ভালো করেই জানেন, তাহলে কেন করলেন এটা? কোন সাহসে অরুকে আমার কাছ থেকে কে’ড়ে নিয়ে এলেন? অরু ছাড়া পুরো দুনিয়াতে এখন আর আমার কেউ নেই।আপনি সেটা ভালোভাবে জানতেন, তবুও আমায় দ্বিতীয়বার একাকিত্বের য’ন্ত্রনায় ভোগালেন কেন? আন্সার মি?
আজমেরী থমথমে গলায় বললেন,
—- ভদ্রভাবে কথা বলো, আমি তোমার গুরুজন হই।

ক্রীতিক এক পা অন্য পায়ের উপর তুলে ডিভানে গা ছড়িয়ে বসে বললো,
— হ্যা তা হোন বটে, শাশুড়ী মা বলে কথা।
—- আমি কারও শাশুড়ী নই।
ক্রীতিক একটু তাচ্ছিল্য করে হেসে বললো,—- আপনি মানেন বা না মানেন, অরু আমার। আপনি ভালো করেই জানতেন, ইউ এস এ টু বিডি কেন, পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো গর্তে গিয়ে লুকালেও অরুকে আমি ঠিক খুজে বের করতাম। শুধু শুধু টাইম ওয়েস্ট করলেন।
আজমেরী শেখ দমে যাওয়ার পাত্রী নন, যথেষ্ট সুকৌশলী মহিলা তিনি। তাই এবার চোয়াল শক্ত করে ক্রীতিকের চোখে চোখ রেখে আজমেরী বললেন,
—- আমি যা করেছি, তোমার আর অরুর মান সম্মান বাঁচানোর জন্যই করেছি।একবার ভেবে দেখেছো, এ বাড়ির একমাত্র ছোট সাহেব তার সৎ বোনকে বিয়ে করেছে একথা জানাজানি হলে, তোমার পরিবারের এতো বছরের ঐতিহ্য, নামদাম, আভিজাত্য কোথায় গিয়ে দাড়াবে?
সমাজের মানুষ তোমার চরিত্রে আঙুল তুলবে, সেই সাথে আমার ওইটুকুনি মেয়ের দিকেও।
আজমেরী শেখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের টি টেবিলে পা'ঞ্চ মে'রে গ'র্জে উঠলো ক্রীতিক,—- আই ডোন্ট কেয়ার এবাউট দিস ফা"কিং সমাজ। আমার আত্মা যাকে চেয়েছে আমি তাকিয়েই বিয়ে করেছি,তাকেই ভালোবেসেছি আর তার সাথেই বেড শেয়ার করেছি।

দেখি কোন সমাজের সাহস আছে আমার অরুকে কটাক্ষ করার। যেই সমাজ অরুর কিংবা আমার ফিলিংসের দিকে আঙুল তুলবে সেই সমাজের নিয়মই ভে'ঙে দেবো আমি। তাতে যদি আমি জায়ান ক্রীতিক শেষ হয়ে যাই তবে তাই হবো, তবুও অরুকে আমি এই জনমে ছাড়ছি না।
আজমেরী শেখের মুখের উপরে একনাগাড়ে অনেক গুলো কথা ছু'ড়ে মে'রে,গটগটিয়ে বেরিয়ে যায় ক্রীতিক। যাওয়ার আগে পিছু ডেকে নির্লিপ্ত কন্ঠে আজমেরী বলেন,—— যেদিন সন্তানের বাবা হবে,সেদিন ঠিক বুঝবে, আমি কেন এতোসব করেছি।
ক্রীতিক না ঘুরেই দাঁড়িয়ে বললো,
—- আমার আর আপনার মেয়ের ডিএনএ আর যাই হোক দু"শ্চরিত্রের অধিকারী হবেনা। এজ এ প্যারেন্ট, দ্যাটস এনাফ ফর মি।
পরক্ষণেই কি ভেবে যেন ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রীতিক বলে,
—- আর হ্যা, অনু প্রত্যয়ের বিয়ের আগ পর্যন্ত, আপনার ভাইয়ের পরিবার কিছুতেই যাতে ক্রীতিক কুঞ্জ ত্যাগ না করে। পুরো বিয়ের অকেশনে তারা আমার স্পেশাল গেস্ট।
ক্রীতিক যখন কথাগুলো বলছিল তখন ওর ঠোঁট ভে'ঙে বেড়িয়ে আসছিল সামান্য রহস্যময়ী ক্রুর হাসি।
ক্রীতিক স্থান ত্যাগ করে চলে যেতেই তীরের ছিলার মতো এক ভ্রু উঁচিয়ে,আজমেরী শেখ কটমটিয়ে বললেন,
—- কিয়ারা রোজারিও যে কি খেয়ে এমন ত্যাঁদর ছেলে জন্ম দিয়েছিল কে জানে? এ নিশ্চয়ই ব্রিটিশদের বংশ ভূত।

ক্রীতিকের উপর রাগ ঝাড়তে গিয়ে একটা কথা মিস করে গিয়েছে আজমেরী শেখ, মাত্র সেটা মস্তিষ্কে বিট করতেই, তিনি অস্ফুটে বললেন,—- অনু আর প্রত্যয়ের বিয়ে মানে? কি বললো এই ত্যাঁদর ছেলে? আমার মেয়ে গুলো কি ওর খেলার পুতুল নাকি? না না এক্ষুনি ওর এসব কৌশলী পরিকল্পনা বন্ধ করতে হবে।
আজমেরী শেখ রে”গেমেগে ডিভান ছাড়লেন, তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরলেন ক্রীতিককে অনুসরণ করে।
করিডোরের এমাথা থেকে ওমাথা কোথাও ক্রীতিক নেই। অগত্যাই হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে গিয়ে দাড়িয়ে পরলেন তিনি, আজমেরী শেখ যেখানে দাড়িয়ে ছিলেন, তারপাশে সিঁড়ি ঘরের ওঠার রাস্তা। ঠিক সেখান থেকেই কিছু অযাচিত আওয়াজ কর্ণকূহরে পৌঁছালে, তরিৎ গতিতে চোখ ঘোরালেন তিনি, মরচে যাওয়া আবছা আলোতে দেখেলেন, অন্ধকার সিঁড়িতে বসেবসে ফোপাঁচ্ছে অনু,পাশেই বসে আছে প্রত্যয়। অনু কাঁদছে দেখে বারংবার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রত্যয়। অনুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আদুরে আওয়াজ ভেসে এলো প্রত্যয়ের দিক থেকে,——
এতো কাঁদে কেউ? মাথা ব্যাথা করবে তো জান। আর বকবো না সরি তো। এই যে দেখো কানে ধরছি, ঘাট হয়েছে আমার। আমার অনু, আমার ময়না পাখি আর কাঁদেনা।
পরক্ষনেই আবারও নিজের বলিষ্ঠ হাতের পিঠ দিয়ে অনুর দু কপোল মুছে দিলো প্রত্যয়।
আজমেরী শেখ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে অনু আর প্রত্যয়ের দৃষ্টিগোচর হবার আগেই দ্রুত চলে এলেন সেখান থেকে। তখন মাঝরাত, বাইরে পূর্নিমা,রাতের আকাশে

মস্তবড় চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোতে ভেসে যাচ্ছে ক্রীতিক কুঞ্জের সুবিশাল মহল। রুপার বার্তায় মাত্রই রুম থেকে বেরিয়েছে অরু। মা নাকি ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। গত দুদিনে মামির উপদ্রপ কমেছে খানিকটা, সে আপাতত রেজাকে নিয়ে হসপিটালে রাত্রিযাপন করছে। আর রুপা মামির মতো এতো ভেজাল করেনা, তাই রুপাকে খুব বেশি বিরক্তও লাগেনা অরুর। ওই জন্যই তো রুপার কথামতো সহসা রওনা হয়েছে মায়ের ঘরের দিকে।
কিছুদুর গিয়ে করিডোরের মাঝ পথেই আটকে গেলো অরুর পা। দেখলো অন্যপাশ দিয়ে অনুও বের হয়ে এসেছে। অনুকে শুকনো মুখে এগিয়ে আসতে দেখে অরু তারাহুরো করে ওর কাছে গিয়ে শুধালো,
—- কিছু কি হয়েছে আপা? মা আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালো যে?
অনু ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়,
—— জানিনা রে, আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছে। সত্যি করে বল অরু, ক্রীতিক ভাইয়ার সাথে কিছু করিস নি তো?
অরু বিরক্ত কন্ঠে বললো,
—— আপা! উনি এসেছে থেকে আমার মুখের দিকে অবধি ভালো করে তাকাচ্ছে না,কথা বলা দূরের থাক।
অনু বললো,—— ভাগ্যিস মামি নেই, থাকলে এটাকে তিল থেকে তাল বানিয়ে হাজারটা অপবাদ জুড়ে দিতো।
অরু অন্যমনস্ক হয়ে গেলো, মনেমনে ভাবলো,
—— হতেও তো পারে মামির কথায়ই ঠিক, জায়ান ক্রীতিক এখন আর আমাকে ভালোবাসেনা। এখন আর আমি আগের মতো

গোলগাল নেই,শুকিয়ে গিয়েছি অনেক, তাই হয়তো আমার সৌন্দর্যে উনি আকর্ষিত হচ্ছেন না, ভালো লাগছে না আমাকে আর।
ভাবনার মাঝপথে অনু আচমকা ধাক্কা দিলো অরুকে, অরুর ভ্রম কেটে গেলে, গলা খাদে নামিয়ে অনু বলে,
—— এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে চল, আর হ্যা কিছু কড়া কথা শোনার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখ। মা তো একটু বলবেই, ওসব মনে রাখার দরকার নেই। কেমন?
অরু অনুর কথায় মাথা নাড়িয়ে সায় জানিয়ে অনুর আঁচল ধরে পেছন পেছন এগিয়ে গেলো।
—- মা আসবো?আজমেরী শেখ হাতের বইটা রেখে ঘুরে তাকালেন, পাওয়ারি চশমায় স্পষ্ট দেখতে পেলেন ফুটন্ত কলির মতো তার দুই মেয়েকে। একজনের পরনে লাল টকটকে চুড়িদার, আরেকজনের পড়নে কালো। আমেরিকা থেকে আসার পরের দিনগুলোতে যেমন বিষন্ন, মলিন মুখশ্রীতে ঢাকা পরে থাকতো স্নিগ্ধ চেহারাটা, এখন এই মূহুর্তে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। যদিও অরুকে কাহিল দেখাচ্ছে, তবুও কোথাও একটা লাবন্যের আভা ফুটে উঠেছে ছোট্ট মুখটায়।
মেয়েদেরকে একনজর পরখ করে আজমেরী শেখ বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে গম্ভীর গলায় বললেন,
—— হ্যা এসো।
অনু ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো,—- কি হয়েছে মা? শরীর খারাপ করছে তোমার?
—- আমি ঠিক আছি, তুমি ঠিক আছোতো?

মায়ের কথার রহস্য ছেদ করার ক্ষমতা নেই অনুর, অগত্যাই শুষ্ক ঢোক গিললো ও। জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে বললো,
—— ঠিকই তো আছি মা।
আজমেরী শেখ আর কথা ঘোরালেন না, স্পষ্ট আওয়াজে বললেন,
—— প্রত্যয়ের পরিবারের সাথে কথা বলা হয়েছে, ওরা কাল সন্ধ্যায় আসছে। দু'বোন সেজেগুজে রেডি থাকবে। আমিতো আর জায়ান ক্রীতিক না, যে পরিবার সমাজ এসবের বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছে করবো। যা হবে দু পরিবারের সম্মতি এবং সকল রিচুয়াল মেনেই হবে।
আজমেরী শেখের কথায় অরুর মুখটা চুপসে গেলেও, আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে অনুর হৃদয়। সকল আশা ভরসা বিসর্জন দেওয়ার পরে এ যেন মেঘ না চাইতে জল। ও পারছেনা খুশিতে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠতে, কারণ সেটা ওর ধাঁচে নেই। তাই চুপচাপ মায়ের কথায় মাথা কাত করে সম্মতি জানালো অনু।—— এবার যেতে পারো।
আজমেরী শেখ যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু বোন বাইরের দিকে অগ্রসর হয়।ঠিক তখনই পুনরায় অরুকে ডেকে ওঠেন তিনি,মায়ের ডাকে অরু পিছু তাকালে, একটা ভারী দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে আজমেরী বলেন,
—- তোমার স্বামীকে বলবে, সে যাতে যথা সময়ে মেহমানদের সামনে উপস্থিত থাকে। আমরা সামাজিক জীব তো তাই এসব আতিথেয়তা আমাদের পালন করতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় অতিথিদের সর্বোচ্চ আপ্যয়নে। তাই কালকের দিনটা অন্তত যাতে একটু ভদ্রভাবে নিচে নামে।

কেন যেন মায়ের তিক্ত কথাগুলোও আজকে বেশ মনে ধরলো অরুর। ইচ্ছেতো করছে উড়ন্ত পাখির ন্যায় উড়ে উড়ে ডানা ঝাপটাতে। এই প্রথম ক্রীতিক আর ওর সম্পর্কটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে মা, তার মানে কি একটু একটু করে সম্পর্কটা স্বাভাবিক হচ্ছে মায়ের কাছে?
এর চেয়ে খুশির আর কিই হতে পারে। আজ অনেক গুলো দিন পরে হয়তো অরু একটু ঘুমোতে পারবে। যাকে বলে সত্যিকারের ঘুম l
ওদিকে ঘুম নেই অনুর চোখে। কি বললো মা এটা? এতো তাড়াতাড়ি কি মনে করে সবকিছু মেনে নিলো মা? এটা কি আসলেই সত্যি নাকি সপ্ন? ঘুম ভেঙে গেলে যদি সব মিথ্যে হয়ে যায়,তখন? অযাচিত ভয়ের সত্যতা যাচাই করার জন্য নিজের শরীরেই নিজে চিমটি কাটলো অনু।—- আউচ!
ব্যথা পেয়ে তরাগ করে উঠে বসলো ও। মনেমনে বললো,
—- সবই ঠিক আছে, কোনো কিছুই স্বপ্ন কিংবা ভ্রম নয়। কিন্তু রেজা ভাই আর মামি জানলে কি অশান্তিটাই না করবে,কে জানে? মাকে না আবার কথা দিয়ে পিষ্ট করে ফেলে।তখন তো আমারই কষ্ট হবে। হে উপর ওয়ালা যা হওয়ার তা যাতে ভালোয় ভালোয় হয়, নয়তো মায়ের কষ্ট আমি দেখতে পারবো না, কিছুতেই না।
নিশুতি, নিস্তব্ধ, শুনশান তমসাচ্ছন্ন রাত। অরু গভীর তলিয়ে আছে। দক্ষিণের জানালাটা হাট করে খোলা, সেথা থেকে বুড়িগঙ্গা পারের শা শা বাতাস ধেয়ে আসছে। অদুরে লঞ্চের হুইসেল বাজছে, হয়তো শেষ রাতে ঘাটে ভিড়েছে, তাই ঘুমন্ত যাত্রীদের জানান দিতেই এই তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

লঞ্চের তীক্ষ্ণ আওয়াজে ঘুমের খুব একটা অসুবিধা না হলেও, সিগারেট পো'ড়া উৎকট গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসছে ঘুমন্ত অরুর। মনে হচ্ছে কেউ নাকের কাছে এসে সিগারেট ধরিয়েছে, যে সেই সিগারেট না, বিদেশি ব্র্যান্ডেট কোনো সিগারেট, যার দরুন গন্ধটাও তীক্ষ্ণ, ঘুমের মাঝেও কেমন মস্তিষ্কে গিয়ে লাগছে। বাইরের হিমেল হাওয়াও সেই গন্ধ দূর করতে পারছে না। বেশকিছুক্ষন ঘুমের তালে হাসফাস করে শ্বাস নিতে না পেরে অবশেষে লাফিয়ে উঠে বসলো অরু। বাইরের চাঁদের আলোতে আলোকিত ঘর। সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পুরো রুমে কেউ নেই, অথচ সিগারেটের গন্ধটা এখনো বর্তমান। নিজের মনের ভ'য় আর সন্দেহ কাটাতে উঠে গিয়ে বৈদ্যুতিক লাইট জ্বালালো অরু। রুমজুড়ে ফকফকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পরতেই অরুর দৃষ্টিগোচর হলো মিয়িয়ে যাওয়া ধোঁয়ার কুন্ডলী। দেখে মনে হচ্ছে এখানে একটু আগেও কেউ ছিল, কিন্তু কে?এতো রাতে নিজের ঘুম বিসর্জন দিয়ে কে আসতে পারে এই রুমে, ভাবনায় পরে গেলো অরু।
তবে ভাবনারা ঘনীভূত হওয়ার আগেই চোখের পাতা ভার হয়ে এলো ঘুমে, অরু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না,তৎক্ষনাৎ গিয়ে গা এলিয়ে দিলো বিছানায়, ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে ভাবলো,
—— যে থাকার থাকুক, জায়ান ক্রীতিক বাড়িতেই আছে, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না, আফটার অল হি ইজ মাই সুপার হিরো। আজ আর একাডেমিতে যাওয়া হলোনা অরুর। সন্ধ্যায় মেহমান আসবে, তারউপর এখনো ক্রীতিকের বন্ধুরা আছে,তাই বাড়িতে অনেক কাজ। সকাল সকালই টেলিফোন করে নীলিমাকে জানিয়ে দিয়েছে অরু। বলেছে সন্ধ্যা বেলায় যাতে শাড়ি টাড়ি পরে

নীলিমাও চলে আসে, তাহলে একসাথে সেলফি তোলা যাবে।
নীলিমাও বেশ উৎসুক হয়ে সায় জানিয়েছে অরুর কথায়।
অবশেষে অনু আপার বিয়ে হতে যাচ্ছে। ওদের খুশির যেন সীমা নেই।
নীলিমার সাথে কথা শেষ করে অরু খাবার টেবিলে আসলে, আজমেরী শেখ বলেন,
—— তাকে বলা হয়েছিল?
“তাকে” বলতে মা ক্রীতিককে বুঝিয়েছে, ব্যাপারটা মাথায় আসতেই অরু দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে যেতে যেতে বললো,———- এক্ষুনি বলে আসছি মা, তাড়াহুড়োয় ভুলে গিয়েছিলাম।
অরু যখন উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ক্রীতিকের রুমে প্রবেশ করলো,তখন সেই আট বছর আগের মতোই অনুভূতি হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে এই বুঝি উঠে এসে ঠাস করে থা’প্পর লাগিয়ে দেবে ক্রীতিক, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলবে,
—- আমার রুমে কি চাই?
অথবা হিতে বিপরীত ও হতে পারে, না উঠেই হাতের ইশারায় ডেকে বলতে পারে,
—- এখানে বস তোকে দেখবো।
মনের মাঝে বাসা বাঁধা তখনকার য’মরাজ যে এখন হৃদয়ের পৃথ্বীরাজ হয়ে যাবে কে জানতো?
অতীতের কথা মনে করে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রুমের মাঝে এগিয়ে যায় অরু। বেলা প্রায় এগারোটার কাছাকাছি, অথচ এখনো উদম শরীরে উপর হয়ে ঘুমাচ্ছে ক্রীতিক। কোমড় অবধি টানা কম্ফোর্টার ছাড়িয়ে তার ভি শেইপ পৃষ্ঠদেশ, পুরুষালি

বাহু,ফর্সা পিঠের ইতি উতি রাজত্ব গেঁড়ে বসা কুচকুচে কালো তিল সবকিছুই দৃশ্যমান অরুর চোখে। সেদিকে তাকালেই যেন ঘোর লেগে আসে, জাগ্রত হয় অবাধ্য নারী সত্তা। তাই বেশিক্ষণ না তাকিয়ে, তাড়াহুড়ো করে চোখ নামিয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে রিনরিনে আওয়াজে ডাকলো অরু,—— শুনছেন, কথা ছিল, কাজের কথা।
ক্রীতিকের কোনো হেলদোল নেই। অথচ অরু একই ভাবে ডাকলো বেশ কয়েকবার।
পরক্ষণেই মনে মনে বললো,
—- আমি জানি সজাগ থাকলেও সারা দিবেন না আপনি। আমারই ভুল আগ বাড়িয়ে ডাকতে এসেছি।
অরু যখন বিরক্ত হয়ে গাল ফুলিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখনই আওয়াজ ভেসে আসে ক্রীতিকের। সকালের হাস্কিটোনে ক্রীতিক বলে,
—— চোখ ভর্তি ঘুম, আর মাথা ভর্তি শুধু তুই।
অরু তরতরিয়ে এগিয়ে এসে শুধালো,
—- কি বললেন?
ক্রীতিক এবার ঘুরে শুলো, বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা কুড়িয়ে চেইক করতে করতে বললো,
——— নাথিং, কি বলতে এসেছিস সেটা বল।
অরু চোখমুখ শক্ত করে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে,
—- আজ প্রত্যয় ভাইয়াদের বাড়ি থেকে মেহমান আসবে, মা বলেছে আপনাকে উপস্থিত থাকতে।
ক্রীতিক ফোন স্ক্রল করতে করতে বললো,

—— রাতে ঘুমাতে পারিনি, পার্টি অফিসের পূর্নমিলনীও ঘুমের জন্য ক্যান্সেল করেছি। সারাদিন ঘুমাবো। সন্ধ্যায় ডেকে দিস, ঘুম হলে চলে আসবো।
অরু কঠিন গলায় বললো,
——— বাড়ির জামাইদের এসবে থাকতে হয়, আর আপনি বাড়ির ছোট জামাই।
——— ওহ তাই আমি বুঝি ক্রীতিক কুঞ্জের জামাই? আগেতো জানা ছিলোনা?
—- হ্যা তাইতো।
কথায় কথায় ক্রীতিক খেয়াল করলো অরু সেই তখন থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলছে, কাহিনি ধরতে না পেরে ক্রীতিক ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞেস করলো,
—— আমি তোর শশুর না ভাসুর? এভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিস কেন?
অরু চোখমুখ খিঁচিয়ে বললো,—— দয়া করে কিছু পড়ুন।
ক্রীতিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,
—— এমন ভাব করছিস যেন এর আগে তুই আমাকে আনড্রেস দেখিসনি।আমিতো প্যান্ট.....
—- থাআআআক!
কানে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো অরু। তৎক্ষনাৎ রুম ত্যাগ করতে করতে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো,
—— নির্লজ্জ, বেহায়া লোক। এই রুমে এসে আমার ঘাট হয়েছে।সন্ধ্যে হতেই হ্যাজাক আর ল্যানটার্নের আলোতে সেজে উঠেছে ক্রীতিক কুঞ্জ। চারিদিকে উৎসব মুখর পরিবেশ। মূলত

ক্রীতিকের বন্ধুরাই মাতিয়ে রেখেছে সবকিছু। সায়র আজকে ফটোগ্রাফার। এদিকে সেদিক যেখানে যা পাচ্ছে তারই ছবি তুলে নিচ্ছে ও।
এলিসা ব্যস্ত সময় পার করছে অনুকে সাজাতে। পাশেই দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথায় ফুল পড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ক্যাথলিন। আজ বাঙালিদের মতো থ্রী পিচ পরেছে সে। রুমের কোথাও অরুর দেখা নেই। মেয়েটা সাজেওনি। ক্রীতিক এখনো ওর সাথে ঠিক ভাবে কথা বলেনা, চোখে চোখ রেখে তাকায় না।
ওই জন্যই সাজগোজ করার ইচ্ছেটাও ম’রে গিয়েছে। কিন্তু এলিসা তো মোটেও কথা শোনার পাত্রী নয়, ঠিকই কোথা থেকে যেন ধরে এনে অরুকেও সাজাতে বসেছে।মেহমান এসেছে এইতো কিছুক্ষন। ঘরোয়া আয়োজন, ছোটখাটো আংটি বদল যাকে বলে, তাই মেহমানের সংখ্যাও কম। প্রত্যয়ের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া তেমন কেউ আসেনি।
অতিথিদের কিছু সময় পরে, প্রত্যয় নিজেও এসেছে, পুরোপুরি ফর্মাল স্টাইলে। অফ হোয়াইট শার্ট, ব্ল্যাক কোটি আর ব্ল্যাক রিস্ট ওয়াচে তাকে মারাত্মক সুদর্শন লাগছে। প্রত্যয়ের কোলে তার বড় বোনের পিচ্চি মেয়ে অন্তু। অন্তুকে কোলে নিয়েই ভেতরে প্রবেশ করে আজমেরী শেখকে সালাম জানালো প্রত্যয়। আজমেরী শেখ হাসিমুখে সালাম গ্রহন করে প্রত্যয়কে বসতে বললো।
মোখলেস চাচা সহ বাড়ির অন্য ভৃত্যরা অতিথি সমাদরে ব্যস্ত।অর্ণব আর এলিসা অতিথিদের সাথে টুকটাক কথা জমিয়েছে। সায়র সকলের ভিডিও ধারণ করছে। ঠিক সেসময় অনুকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামে অরু আর ক্যাথলিন।কটকটে গাঢ় মেরুন

রঙের হাফসিল্ক শাড়ি আর হাত ভর্তি রেশমি চুড়ি পরিহিত অনুকে চেনাই যাচ্ছে না এখন। দেখতে অপরূপ লাগছে। হুট করেই মনে হচ্ছে সিনেমার মেইন ক্যারেক্টারের এন্ট্রি হয়েছে। সবার চোখ অনুর দিকে। অন্তুকে চকলেট দিতে দিতে প্রত্যয়ও দু একবার আড় চোখে দেখে নিলো অনুকে।

অরুও আজ শাড়ি পরেনি, সিকোয়েন্স থ্রী পিচ পরেই অনুকে নিয়ে নেমেছে সে। নিচে এসে অনুকে বসানো হলো প্রত্যয়ের পাশেই। ভালোবাসার বিয়ে দেখা দেখির কিছু নেই। ডিরেক্ট আংটি বদল হলেই চলে, তবুও আশ মেটাতে সবাই একটু একটু করে দেখে নিলো হবু বউকে।

একজন মাত্র মানুষ যিনি অনুর পাশাপাশি, উঠে এসে অরুকেও চিবুক তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তিনি হলেন প্রত্যয়ের বড় ফুপি। অরু বুঝলো না ওকে এভাবে দেখার কি আছে, তবে সেরকম কিছু মনেও করলো না।

সবাই যখন অনু আর প্রত্যয়কে নিয়ে মেতে আছে, তখন অরুর দিকে এগিয়ে আসেন আজমেরী শেখ। কিছুটা রাগান্বিত হয়ে গলা খাদে নামিয়ে শুধান,—— তোমার স্বামী কোথায়?

অরু থতমত খেয়ে উপরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলবে, তার আগেই দেখা গেলো সিঁড়ি দিয়ে নামছে ক্রীতিক। চোখে মুখে এখনো ঘুমের রেশ। এলোমেলো চুল, পড়নে কালো টিশার্ট আর ট্রাউজার। পায়ে স্লিপার, হাতে আইপ্যাড। সেভাবেই অতিথিদের সামনে চলে এলো ক্রীতিক। আজমেরী শেখ ক্রীতিককে দেখে অরুকে চোখ রা'ঙিয়ে চলে গেলেন। আর অরু সেখানে দাড়িয়েই কপাল চাপড়াতে থাকলো। এ কি স্বামী কপালে জুটলো তার? রাইট বললে লেফ্টে

যাবে, তো লেফ্ট বললে রাইটে। ঘাড় ত্যাড়ামির ও তো একটা সীমা থাকা দরকার।
ক্রীতিক সবার মাঝে আসতেই প্রত্যয় দাড়িয়ে ওকে বসতে বললো, ক্রীতিক ও গিয়ে একটা সিঙ্গেল সোফার উপর বসে পরলো। ওকে দেখে প্রত্যয়ের পনেরো বছরের কাজিন ফট করে বলে উঠলো,—-
ভাইয়া আপনি দেখতে পুরাই রানবীর কাপুরের মতো। এলোমেলো চেহারাতেও হট লাগছে।
প্রত্যয়ের ফুপি তৎক্ষনাৎ মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে বললো,
—- চুপ করবে তুমি? ইউ হ্যাভ নো ম্যানারস।
ক্রীতিক ইতস্তত কন্ঠে বললো,
—— ইটস ওকে ছোট মানুষ বুঝতে পারেনি।
সায়র মিনমিনিয়ে বললো,,
——— নিজে একটা ছোট মেয়ের জন্য দিওয়ানা হয়ে ঘুরছে, আর এখানে আদিখ্যেতা দেখানো হচ্ছে ঢং যত্তসব।
সবার সব টকশোতে ইতি টেনে অবশেষে ছোটমোটো করে আজমেরী শেখ অনু আর প্রত্যয়ের আংটি বদলের ঘোষণা করেন। এবং সবার হইহুলোরে ওদের আংটি বদলটা হয়েও যায়।
দুই পরিবারের সম্মতি সাপেক্ষে একসপ্তাহ পরে ঠিক করা হয় বিয়ের দিন তারিখ।
এইংগেজমেন্ট মানে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা। দুজন দুজনকে নতুন করে চিনতে শুরু করা। অনেকটা কাছ থেকে, আর অনেকটা আন্তরিকতা দিয়ে। তাই মেয়ে আর জামাইকে একটু প্রাইভেসি দিয়েছে সবাই।
আলাদা কথা বলার জন্য ওদের ছাঁদে পাঠানো হয়েছে।

আর নিচে আপাতত সবাই মিষ্টি মুখ করায় ব্যস্ত। প্রত্যয়ের ফুপি আজমেরী শেখের মুখে একটুখানি মিষ্টি পুরে দিয়ে, হাসিমুখে বললেন,—- আপা, আমাদের তো আরও একটা আবদার বাকি রয়ে গেলো।
আজমেরী শেখ খানিকটা উৎসুক হয়ে শুধালেন,
—— কি আবদার বলুননা।
—- আমাদের আরও একজন ছেলে আছে, প্রত্যয়েরই চাচাতো ভাই, ওর নাম অমিত। নামকরা নোবেলিস্ট,কিছুদিন আগে ছোট খাটো একটা কার এ'ক্সি'ডেন্ট হয়েছে দেখে আজ আসতে পারেনি, ও আসলে আপনার ছোট মেয়েকে খুব পছন্দ করে। অনু আর প্রত্যয়ের কথা বলা, কওয়ার আগে থেকেই অরুর কথা বলাবলি করেছি আমরা।
ছেলেটা অবশেষে কাউকে পছন্দ করেছে, তাই আবদার না করে থাকতে পারিনি, এখন আপনাদের মতামত।
প্রত্যয়ের ফুপির কথা শেষ হতেই ঘর শুদ্ধ সবাই বিব্রত চাহনি নিক্ষেপ করলো ক্রীতিকের পানে। যে এতোক্ষণ যাবত আইপ্যাড স্ক্রল করছিল, কিন্তু এই মূহুর্তে বাঁজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চাহনিতে চেয়ে আছে, এককোনে কাঁচুমাচু হয়ে দাড়িয়ে থাকা অরুর দিকে।অরুর নিজেও এহেন প্রস্তাবে হতবাক। কিন্তু আপাতত ওর ভ'য় করছে, ভীষণ ভ'য়। ক্রীতিক না আবার বড়সড় ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে। চারিদিক এমন থমথমে হয়ে আছে দেখে প্রত্যয়ের ফুপি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন, তার আগেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শান্ত স্বরে ক্রীতিক বলে ,
—— অরু যে ভা'র্জিন না সেটা আপনার ভাতিজা জানেতো?

—-কিহ!
হতবিহ্বল হয়ে গেলেন প্রত্যয়ের ফুপি,এই টুকু মেয়ে ভা’র্জিন না, তাও আবার এসব গোপনীয় কথা সবার মাঝে বসে বলছে তারই সৎ ভাই?
ক্রীতিক চারিদিকে একবার চোখ বোলালো, তারপর উঠে গিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললো,
—- এনজয় ইওর কোয়ালিটি টাইম।
সবাইকে বিদায় জানিয়ে উপরে যেতে যেতে সবার সামনে অরুকে ডেকে ক্রীতিক বললো,
—- অরু এক্ষুনি উপরে আয়। এক্ষুনি মানে এক্ষুনি।অরু রুমে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওকে হ্যাচকা টান দিয়ে বিছানায় ছু’ড়ে মা’রলো ক্রীতিক।
শরীরের শক্তি ক্ষীণ, তার উপর এভাবে ছু’ড়ে মা’রাতে মারাত্মক ব্যথা পেলো অরু। ক্রীতিকের সেদিকে খেয়াল নেই। গত কয়েকদিনের রা’গ, হিং”স্রতা সব একসাথ হয়ে মস্তিষ্কে জমা হয়েছে ওর। চোখদুটোতে ভর করেছে র’ক্তিম তে’জক্রিয়তা কপালের সবকটা রগ ফুলে আছে।
অরু নিজেকে সামলে উঠে দাড়ালো। ও বুঝতে পারলো না ওর দোষটা কোথায়, তাই ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,
—- সমস্যা কি আপনার, যখন ইচ্ছে মা’রছেন, যখন ইচ্ছে অবহেলা করছেন, যখন ইচ্ছে কাছে টেনে নিচ্ছেন,কেন? কি করেছি আমি?
ক্রীতিক জো’র করে শ’ক্ত হাতে অরুর ঠোঁটের লিপস্টিক ঘষে মুছতে মুছতে বললো,—- কতবার বলেছি অন্যকারও সামনে সাজবি না কথা শুনিস নি, আমি মাত্র একটা মাস দূরে ছিলাম এর

মধ্যে অন্য নাগর জুটিয়ে ফেলেছিস। তারা এখন আমার বউয়ের জন্য, আমার বাড়িতেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে। তোকে আজ আমি কি করবো নিজেও জানিনা।
অরু ক্রীতিককে দু-হাতে ধা'ক্কা দিয়ে সরিয়ে বললো,
—— কি করবেন আপনি আমাকে, মে"রে ফেলবেন? মা'রুন,কা'টুন যা ইচ্ছে করুন। আপনার জন্য এমনিতেই আধম'রা হয়ে আছি আমি। অথচ আপনাকে দেখুন কষ্ট দিয়েই যাচ্ছেন, তো দিয়েই যাচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন তার কোনো উত্তর নেই। কি দোষ আমার বলুন, কেন এমন করছেন? কেন!!
আবারও ক্রীতিকের শক্ত বুকে ধা'ক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো অরু। এবার আর নিজের ক্রো'ধটাকে সংবরণ করতে পারলো না ক্রীতিক। ওর হাতদুটো নিজের মুঠোয় পুরে,গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললো,—— বিকজ আই লাভ ইউ ড্যামএট।
ক্রীতিক এতো জোরেই কথাটা বলেছে যে ওর গ'র্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মহলের প্রতিটি দেওয়ালে। সেইসাথে হলরুমে বসা সকলেই লাফিয়ে উঠেছে এহেন গর্জনে।
অরুর নিজেও এই মূহুর্তে থরথরিয়ে কাঁপছে, ক্রীতিক নিজের দাঁতে দাঁত পিষে অরুর মুখের কাছে মুখ এনে বললো,
—— ইচ্ছেতো করছে মে'রে মে'রে নরম তুলতুলে গালগুলোকে র'ক্তা"ক্ত করে দিতে। কিন্তু না খেয়ে খেয়ে নিজের এমন হাল করেছিস সেটা করতেও কলিজায় লাগছে। এদিকে রা"গটাকেও কমাতে পারছি না। ওহ গড!
অরু ক্রীতিকের চোখে চোখ রেখে কাঁদছে।

ক্রীতিক ও অরুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেভাবেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে,খানিকটা শান্ত স্বরে বলে,
—— অরু, আমার অ্যারোগেন্সি, আমার রা’গ, আমার জিদ, আমার ডেস্পারেটনেস। তুই না সহ্য করলে আর কে সহ্য করবে বলতো? কার কাছে খোলা বই হবো আমি? তুই কি চাস আমি সারাজীবন ডি’প্রেশন আর এ্যাং’সাইটিতে ধুঁকে ধুঁকে ম”রি?অরু জবাব দেয় না, শুধু ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠে পরে থাকা লম্বা চুল গুলোকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ স্থির হয়ে থাকে।
ক্রীতিকের রা’গ সংযত করার জন্য অরু নিজেকে তার কাছে সমর্পন করছে, ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই একটানে ওর জামার ফিতেটা খুলে শক্ত হাতে ওর বাহু চেপে ধরে অরুর তুলতুলে কোমল উন্মুক্ত পৃষ্ঠদেশে ঝড়ের গতিতে মুখ ডুবিয়ে দিলো ক্রীতিক।সন্ধ্যা রাতের মিটিমিটি শুক তারা ঢাকা পরেছে মেঘের আড়ালে। চাঁদের ও একই অবস্থা, পেঁজা তুলোর মতোন নরম শুভ্র মেঘের আড়ালে বারবার লুকিয়ে পরছে সে। মেঘের এই লুকোচুরি খেলায় পুরো রাস্তা জুড়ে কোমল আলো ছাঁয়া বিরাজ করছে।
একনজরে দেখলে মনে হবে কেউ অবিন্যস্ত হাতে শিউলি ফুল ছড়িয়ে রেখেছে পুরো রাস্তার আনাচে-কানাচে। গলির মোড় থেকে সেই শিউলি ফুলের রাস্তা দ্রুত পায়ে মাড়িয়ে মাত্রই ক্রীতিক কুঞ্জে প্রবেশ করলো নীলিমা।
ওর পরনে কালো পাড়ের খয়েরী তাঁতের শাড়ি। শাড়ি পড়ার খুব একটা অভ্যেস নেই নীলিমার। ওই জন্যই বারবার মনে হচ্ছে খুলে খুলে যাচ্ছে। একদিক থেকে চুল সামলাচ্ছে তো একদিকে

শাড়ি।আলগোছে কুঁচি সামলাতে সামলাতেই মহলে প্রবেশ করে নীলিমা।
ঠিক সেই মূহুর্তেই আচমকা ক্যামেরার ফ্ল্যাশে ঝিল ধরে উঠলো ওর দু’চোখ। হঠাৎ আলোক রশ্মির তীক্ষ্ণতা সামলাতে না পেরে নীলিমা চোখ মুখ কুঁচকে দাড়িয়ে পরলো তৎক্ষনাৎ।
ওদিকে নীলিমা দাঁড়িয়ে পরতেই চোখের সামনে এসে কেউ একজন আপসোসের সুরে বললো,—- গেলো, গেলো, রাগিণীর রাগে ক্যামেরাটা ঝ’লসে গেলো।
এতোক্ষণে নীলিমা বেশ সামলেছে নিজেকে, সামলাতে গিয়ে সামনের ব্যক্তির কথা কর্ণকূহরে পৌঁছাতেই তরাগ করে চোখ খুলে নিলো ও, চোখ খোলা মাত্রই সেদিনের সেই বাঁ’দরটাকে আবারও দেখতে পেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ও বললো,
—— আজকেও আপনি? সত্যি করে বলুন তো এই বাড়িতে ঘুরঘুর করেন কেন? ধা’ন্দাটা কি?
সায়র নীলিমার কথায় পাত্তা না দিয়ে বললো,
—— এইংগেজমেন্ট খাওয়া দাওয়া সব শেষ, এখন কি সবার ফেলে রাখা ঝুটাঝাটা খেতে এসেছো নাকি?
লোকটার কথায় মেজাজ চড়াও হয়ে গেলো নীলিমার, ও কটমটিয়ে বললো,—- দরকার পরলে তাই খাবো, তবুও আপনার মতো অমন চিকন আলী হবোনা। ফটোগ্রাফার ওয়ালা, ফটোগ্রাফার ওয়ালার মতোন থাকুন, যান গিয়ে ওদিকে ডেকোরেশনের ছবি তুলুন।
নীলিমা কথার পাছে, সায়র ভাব নিয়ে নিজের উপর থেকে নিচ অবধি আঙুলের ইশারা করে গম্ভীর গলায় বললো,

—— ইটস কলড মডেলিং ফিগার। এটা মেইনটেইন করতে আমাকে কতো ডায়েট করতে হয় তা তুমি জানো?
নীলিমা মুখ ঝা'মটি দিয়ে সায়র কে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললো,
—- জানতেও চাইছি না, রাস্তা ছাড়ুন তো।
সায়র তৎক্ষনাৎ বাঁধ সেধে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে ওঠে ,—— আরে আরে ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?
— সেটাও আপনাকে বলতে হবে?
—- ওদিকে যেও না, অরু তার হাসবেন্ডের রা'গ কমাচ্ছে,তুমি গেলে ডিস্টার্ব হবে।
সায়রের কথায় সিঁড়ির মাঝে আটকে গেলো নীলিমার পা দু'টো । ও সেখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে বিরক্তির নজরে সায়রের দিকে চেয়ে মনেমনে বলে,
—- লোকটা শুধু বাঁ'দর নয়, পা'গল ও বটে,নইলে নিখিল ভাইয়ের শোকে যে অরু সেই কবে থেকে ডিপ্রেশনে ডুবে আছে, বলে কিনা সে নাকি স্বামীর রা'গ ভাঙাচ্ছে? যেখানে নিখিল ভাইই নেই, সেখানে স্বামীটা কি আকাশ চিড়ে বের হবে?আশ্চর্য।
নীলিমা সেই তখন থেকে একধ্যানে তাকিয়ে আছে, তা টের পেয়ে সায়র চিবুকে আঙুল বোলাতে বোলাতে মিটিমিটি হেসে বলে,—- ক্রাশ খেলে নাকি?
তারপর নিজেই নিজেকে বাহবা দেওয়ার মতো করে বললো,
—-অবশ্য সবাই খায় তুমি নতুন কিছু নও, যাও তোমার ক্রাশ রিকোয়েস্ট এক্সেপ্টেড।

নীলিমা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, আবারও সিঁড়ি ভেঙে উপরে যেতে পেছন ঘুরে বললো,
—- আপনি একটা পা'গলু, সেই সাথে হা'দারাম ও।
সায়র পেছন দিক থেকে সামান্য মাথা চুলকে বিড়বিড়িয়ে বললো,
—- নো ম্যাটার, সবাই বলে।
দোতলায় গিয়ে করিডোরে দাঁড়িয়েই অরুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করলো নীলিমা,
— অরুউউ, এ্যাই অরুউ?
নীলিমার আওয়াজ কানে পৌঁছাতেই ক্রীতিককে জো'র জব'রদস্তি করে নিজের থেকে ছাড়িয়ে কোনো মতে গায়ের ওড়নাটা ঠিকঠাক করে তরিঘরি পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো অরু।
অরুকে দেখা মাত্রই নীলিমা ওর কাছে এগিয়ে এসে অবাক হয়ে শুধালো,—- এ্যাই! তোর ঘর না ওইটা?
তাহলে এই ঘরে কি করিস?
অরু শুষ্ক ঢোক গিলে নীলিমার দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করলো, খানিকটা ভেবে চিন্তে দোনোমোনো করে বললো,
—- না মানে ধুধলো, ময়লা পরেছিল, আজ আবার অতিথি এলোনা ওই জন্যই তো পরিস্কার করতে এলাম মাত্র ।
—- তাই বল আমি আরও ভাবলাম আজকের দিনেও রুম আটকে কেঁ'দে ভাসাচ্ছিস বুঝি।
নীলিমার কথায় অরু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে কিছুটা মেকি হাসলো।
ঠিক তখনই নীলিমা মুখ কালো করে পুনরায় বললো,

—-- আংটি বদল,সকল রিচুয়াল শেষ হয়ে গেলো, অথচ তোরা কেউ একটু আমার জন্য অপেক্ষা করলি না, আমিকি কেউ না?অরু নিজেও এবার একটু লজ্জিত হলো, ওই বা কি করতো? ক্রীতিক আর মা দুজন মিলে ওকে নিয়ে যা শুরু করেছে, দুজনার চোখ রাঙানি খেতে খেতেই জীবন অতিষ্ট অরুর।
তবুও নীলিমাকে ধাতস্ত করে অসহায় কন্ঠে অরু বলে,
—-- আসলে প্রত্যয় ভাইয়ার কাজিন অমিত ভাই পা ভে'ঙে হসপিটালে ভর্তি। ওই জন্য প্রত্যয় ভাইয়ার বাবা অনুরোধ করেছেন সকল নিয়ম কানুন যাতে তাড়াতাড়ি আর ঘরোয়া আয়োজনে শেষ হয়, যাতে তারা একবার হসপিটালে গিয়ে অমিত ভাইকেও দেখে যেতে পারেন।
নীলিমা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো,
— কোন অমিত ভাই? তোদের বাংলা একাডেমির অমিত ভাই নয়তো?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—-- হ্যা উনিই।
অরুর কথায় আপনা-আপনি হাত চলে গেলো নীলিমার হতবাক মুখের উপর, ও আরোষ্ঠ গলায় বললো,—— হায় আল্লাহ! অমিত ভাইয়ের সাথেই এটা হওয়ার ছিল?
আজকে অমিতকে নিয়ে বাড়িতে ঝামেলা হয়েছে, ক্রীতিক হিং'স্র হা'য়নার মতোই ক্ষে'পে উঠেছিল অরুর উপর। সময় মতো আপসে না এলে, আজকে না জানি রে'গেমেগে আরও কি কি করে ফেলতো এই উন্মাদ লোকটা।

পুরো ব্যাপারটা আরও একবার স্বরণ করে একটা ভ'য়ার্ত ঢোক গিলে,অমিতের টপিক টা তৎক্ষনাৎ পাল্টে ফেললো অরু। নীলিমার দিকে তাকিয়ে সহসা হেসে বললো,

——— চল নিচে গিয়ে ডিনার করবি, আমিও খাইনি, একসাথে খাবো।

নীলিমা অরুর কথায় গু'রুতর নাকোচ করে বললো,

—- যাবোনা, নিচে একটা বাঁ'দর দাঁড়িয়ে আছে।

অরু ভ্রু কুঁচকে বললো,—- সারা ঘরে লাইট জ্বলছে, এর মাঝে বাঁদর কোথায় পেলি তুই?

নীলিমা আঙুলের ইশারা করে ডিভানে বসে বসে রসগোল্লা চিবুতে থাকা সায়রকে দেখিয়ে বললো,

—— ওই যে দেখ বসে বসে রসগোল্লা খাচ্ছে, ওটাই বাঁদর। শুধু বাঁদর নয় পাশাপাশি হনুমানও। দুই জাতির মিশ্রন।

নীলিমা সায়রের নাম মুখে নিতে না নিতেই সায়র রসগোল্লা সমেত অকস্মাৎ বিষম খেলো। এলিসা ওর দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিয়ে ওর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললো,

—— একটু আস্তে খাবিতো।

সায়র এক ঢোক পানি পান করে এলিসার দিকে ছলছলে নয়নে তাকিয়ে বললো,

—- হঠাৎ করে কে এতো মনে করছে আমায়, বলতো?

এলিসা স্ন্যাক্স চিবুতে চিবুতে ফোনের দিকে নজর দিয়ে রুষ্ট গলায় বললো,—— তোর ক্লায়েন্ট রা ছাড়া আর কে?

নীলিমার মুখ থেকে সায়রকে নিয়ে এরূপ সম্মোধন শুনে তৎক্ষনাৎ দাঁত দিয়ে জিভ কাটলো অরু।

অতঃপর নীলিমা কে একটু সাইডে নিয়ে গিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,
—-- কাকে কি বলছিস ভাই? আমেরিকাতে উনি সেলিব্রিটি। ওনার বড় বড় ছবি, পোস্টার পুরো শহরের বিলবোর্ড জুড়ে থাকে তুই জানিস?
নীলিমা ঠোঁট বাকিয়ে ভেংচি কেটে,অরুর কথায় পুরো দস্তুর অনাগ্রহ প্রকাশ করে বললো,
—-- সে যাই হোক, কিন্তু এই সেলিব্রিটি বাঁদর তোদের বাড়িতে কি করে?
—-- আরেহ উনি, ওনার না মানে ক্রীতিক ভাইয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। ক্রীতিক ভাইয়ার সাথেই বাংলাদেশ বেড়াতে এসেছেন, উনি আসলে ইন্ডিয়ান।
অরুর কথা শুনে নীলিমা চোখ মুখ কুঁচকে জোরালো কন্ঠে বললো,—-- কিহ! তোর সেই পা'ষণ্ড ভাইটা দেশে এসেছে? তুই ঠিকই বলেছিলি অরু, ওই শালা এক নম্বরের ব'জ্জাত, নয়তো তার বন্ধু এমন বাঁদরামো করে কেন? বিদেশে বসে এসব হনুমানদের সাথে মিশে মিশেই তোর ভাইটা গোল্লায় গিয়েছে। উমমমম…
নীলিমা ভাষনের মতো করে গলা উঁচিয়ে ক্রীতিকের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করার আগেই নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরলো অরু।
তারপর ওকে টে'নে হিঁ'চড়ে নিচে নিয়ে যেতে যেতে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো,
—— নীলিমার বাচ্চারে থাম এবার, এমনিতেই সন্ধ্যা থেকে আমার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে, এখন আবার তুই তুফান বয়ে আনিস

না।প্রত্যয় আর অনুর বিয়েটা পারিবারিক ভাবেই বেশ ঘটা করে আয়োজন করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
তবে পরিবারের থেকেও একধাপ এগিয়ে ক্রীতিকের বন্ধু মহল।এই বিয়ে নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাসের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। যেহেতু অরু ক্রীতিকের বিয়েটা অনাকাঙ্ক্ষিত আর বিরল ভাবে হয়েছে,সেহেতু অনু প্রত্যয়ের বিয়েতে প্রি ওয়েডিং পার্টি থেকে শুরু করে,মেহেন্দী,রং খেলা, হলুদ সব রকম আনুষ্ঠানিকতা করে তবেই বিয়ের স্বাদ পুরোপুরি আস্বাদন করবে ওরা।
বিয়ের মাত্র এক সপ্তাহ বাকি আর সামনে এতো এতো আয়োজন। সেই কথা মাথায় রেখেই ওরা সকলে রেডি সেডি হয়ে বেরিয়েছে শপিং করার উদ্দেশ্যে। ওদের একেক জনার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে পুরো শপিংমলটাই আজ ওরা তুলে নিয়ে ফিরবে ক্রীতিক কুঞ্জে।
পরন্ত বিকেল রৌদ্রতাপ কমে এসেছে কিছুটা।চারিদিকে নাতিশীতোষ্ণ গুমোট হাওয়া বইছে। এর মাঝেই বাড়ির পুরাতন সদস্য ব্ল্যাক কেডিলাকের সামনে হাজির হয়েছে এলিসা, অর্ণব,সায়র,ক্যাথলিন,অনু,আর মোখলেস চাচা।
প্রত্যয় ওদের বাড়ি থেকে সরাসরি শপিং মলে আসবে। একটু পর অরুও হাজির হয় ওদের মাঝে।
অরুকে গাড়ির নিকট এগিয়ে আসতে দেখে সায়র চোখ ছোট ছোট বানিয়ে ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,—— আরেহ, হি'টলারের বউ তুমি এখানে কেন? আমাদের কি যাত্রা পথে মাঝ রাস্তায় উড়িয়ে দেওয়ার শখ হয়েছে তোমার? তুমি চাচ্ছো শপিং মলে না গিয়ে, আমরা সরাসরি উপরে চলে যাই তাইতো?

সায়রের ধ’মক খেয়ে ঠোঁট উল্টে অনুর দিকে অসহায় দৃষ্টিপাত করে অরু বলে,
—- আপা দেখনা,
অনু উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালো,
—- হ্যারে অরু,ক্রীতিক ভাইয়া কি যাবে না আমাদের সাথে?
অরু বিরক্ত হয়ে রুষ্ট আওয়াজে বললো,—- আশ্চর্য, তোরা সবাই এমন ভাব করছিস যেন আমিই স্বয়ং জায়ান ক্রীতিক। উনি কি করবেন, না করবেন আমি কিভাবে বলবো? তাছাড়া উনিকি আমার সাথে সব কথা শেয়ার করে? তোদের কি মনে হয়?
অনু বলতে চাইলো,
—-তাহলে জায়ান ক্রীতিকের মতো এমন অ’স্বাদু পুরুষের জন্য এতো পা’গল হওয়ারই বা কি ছিল?
কিন্তু ও সে-সব বললো না, বরং অরুর কথায় ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। ওদিকে এলিসা সকলকে ডেকে বললো,
—— হয়েছে আর গবেষণা করতে হবেনা ওই যে জেকে আসছে।
এলিসার কথা শুনে ঘুরে গেইটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করলো সকলে,দেখলো আঙুলের ডগায় বাইকের চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে এদিকেই এগিয়ে আসছে ক্রীতিক।
পরনের অফ হোয়াইট ফুল স্লিভ টিশার্ট, আর সাথে ম্যাচিং ওভার সাইজ অফ হোয়াইট প্যান্টে তাকে আজ আদতে কাল্পনিক গ্রীক গডের মতোই সুদর্শন লাগছে। ঘাড় ছুঁই ছুঁই চুল গুলোকে সেট করার জন্য মাথায় লাগিয়ে রেখেছে বাকেট হ্যাট। পরনের সবকিছু ধবধবে সাদা হলেও মুখটা কালো আর গম্ভীর হয়ে আছে ক্রীতিকের। গভর্নিং

বডির সদস্য হিসেবে জেকে গ্রুপে জয়েন করার ইচ্ছে ছিল আজকেই। সে হিসেবে গভর্নিং বডির অন্য সদস্যদের ও আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল তাদের নতুন বসের জয়েনিং মিটিং এ। কত কত ইম্পর্টেন্ট ক্লায়েন্টদের ইনভাইট করা হয়েছিল।
অথচ এই বদের হাড্ডি বন্ধু গুলোর জন্য অফিশিয়াল সব প্ল্যান ক্যান্সেল। কাজকর্ম ঠিকেয় তুলে এখন এদের সাথে না চাইতেও শপিং এ বেরোতে হচ্ছে ক্রীতিককে।
ক্রীতিক যতক্ষনে গাড়ির কাছে এসেছে, ততক্ষণে সিট ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে ওরা।
অরু আর অনু দু বোন শুকনো মুখে দাড়িয়ে বড়দের ঝগড়া দেখছে।
এলিসা অর্নব পুরো দস্তুর যু'দ্ধ লাগিয়েছে সিট নিয়ে। দেখলে কে বলবে এরা কাপল? একজন যে আরেক জনের প্রান ভোমড়া?
ওদের ঝগড়া ঝাটির মাঝখানে সায়র একটুখানি মাথা চুলকে বললো,
—- মোখলেস চাচাকে না নিলেই তো হয়।
এলিসা তৎক্ষনাৎ ক্ষ্যা'পাটে কন্ঠে বললো,—- খবরদার!মোখলেস চাচাকে আমার ভালো লেগেছে, ওনাকে আমি শপিং করিয়ে দেবো।
অর্নব দাঁত খিঁচে বললো,
—- এতোই যদি চাচাকে ভালো লাগে তাহলে আমি কে?হ্যা?
অতঃপর মোখলেস চাচার দিকে তাকিয়ে অর্নব কটমটিয়ে বলে,
—- এই চাচা আপনি যান তো আপনাকে নেওয়া হবেনা। ভাগুন।
মোখলেস চাচা অপ্রস্তুত হেসে বললো,

—- ইয়ে মানে, আমাকে ডিকিতে তুলে দিলেও হবে।কোনো সমস্যা নেই বাবা।
—— তবুও আপনার শপিং এ যেতে হবে তাইতো?
সায়রের কথার পাছে ক্রীতিক এগিয়ে এসে রাশভারি আওয়াজে শুধালো,
—— কি হয়েছে?
সায়র পিছনে ঘুরে ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললো,—— যায়গা সংকট, তোর বউ কে নিতে পারছি না, সরি।
সায়রের কথায় ক্রীতিক আড় চোখে অরুর দিকে তাকালো , যে এই মূহুর্তে ভীত হরিণীর মতো ডাগর চোখে ক্রীতিকের দিকেই তাকিয়ে,ক্রমাগত আঙুলে ওড়না পেচাচ্ছে।
কাল অমন কাছাকাছি আসা,আবেশিত আলিঙ্গনের মাঝেও দুজনার একবারও কথা হয়ে ওঠেনি । তখন আবার নীলিমার ডাকে ক্রীতিককে ধা’ক্কা মে’রে চলে গিয়েছিল অরু। সেই মূহুর্ত থেকেই ক্রীতিক দিগুণ ক্ষেপে আছে অরুর উপর।
রিজেকশন ওর একদম পছন্দ নয়। কুক্ষণেও এই মেয়েকে একা পেলে যে কি করবে সেটা ও নিজেও জানেনা।
ক্রীতিক সেই তখন থেকে ক্ষ্যা’পাটে বা’ঘের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেখেছে, বিষয়টা নজরে আসতেই আড়ালে শুষ্ক ঢোক গিললো অরু।
সায়র ক্রীতিকের সামনে হাত নাড়িয়ে বললো,—— এক্সকিউজ মি, কথা এদিকে হচ্ছে ওদিকে না।
ক্রীতিক গমগমে আওয়াজে বললো,

—- অরুকে রেখে তোরা চলে যা। আর অনু একটু পরে আসুক, আমি প্রত্যয়কে বলে দিচ্ছি ও অনুকে পিক করে নেবে।
ক্রীতিকের কথায় অরু আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো, কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত গলায় বললো,
—— নাহ!আপা আমি ওনার সাথে যাবোনা, আমার ভ’য় করছে।
সায়র ক্যাথলিনের দিকে তাকিয়ে বললো,
—- ক্যাথ তাহলে তুমি যাও জেকের সাথে। সায়রের কথা শুনে তৎক্ষনাৎ এলিসার পেছনে লুকিয়ে পরলো ক্যাথলিন। সেবার চুল কা’টার ঘটনার পর থেকেই ক্রীতিককে ভু’তের মতো ভ’য় পায় ক্যাথলিন। সেই ভয়’ঙ্কর রূপ দেখার পর, ক্রীতিকের সাথে কথা বলা তো দূরে থাক, ওর চোখের দিকে পর্যন্ত চোখ তুলে তাকানোর সাহস পায়না মেয়েটা।
আর ওকে কিনা বলা হচ্ছে সেই যমরাজের সাথে বাইকে বসতে, অসম্ভব।
ক্রীতিকের চেঁচামেচি, অতিরিক্ত কথা মোটেই পছন্দ নয়। এখন এই মূহুর্তে ওদের সবার বাক বিতন্ডায় মেজাজ চড়ে উঠলো ওর। নিজের বিগড়ানো মেজাজটাকে সংবরণ করতে না পেরে সহসা ধমকে উঠলো ক্রীতিক,
—— কি বলেছি কানে যায়নি? অরু বাইকে বস, রাইট নাও।
এবার আর ওরা অপেক্ষা করেনা, বরং ক্রীতিকের কথা মতো, অরু আর অনুকে রেখেই তৎক্ষনাৎ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় ক্রীতিক কুঞ্জের গেইট দিয়ে।
অনুও প্রত্যয়ের জন্য অপেক্ষা করবে বলে, অরুকে রেখে বাড়ির ভেতর চলে গেলো।

পাছে শুধু অসহায়ের মতো পরে রইলো একলা অরু। ওর ভীত সন্ত্রস্ত চাহনি দেখে মনে হচ্ছে, কেউ বা'ঘের খাঁচায় হরিণ শাবক আমানত রেখে গিয়েছে। আর সেই জীবন পন অসহায় হরিণী শাবকখানা ও নিজেই।—— কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ক্রীতিকের ভরাট আওয়াজে কম্পিত হয়ে ওঠে অরুর এইটুকুনি তনু শরীর। ও মাথা উঁচিয়ে মিনমিনিয়ে বলে,

—— আপনাকে ভ'য় করছে।

—- আমিকি কি বা'ঘ না ভা'ল্লুক? নাকি কাছে এলে কি তোকে খেয়ে ফেলবো,কোনটা?

ক্রীতিকের কথায় অরু নিশ্চুপ, নির্বিকার ওর ভঙ্গিমা, ওর এহেন নিরবতা দেখে ক্রীতিক শান্ত স্বরে বললো,

—— আমি কিছু বলেছি অরু।তুই আসবি নাকি আমি আসবো, কোনটা?

অরু তৎক্ষনাৎ বাঁধ সেধে দ্রুত পায়ে ক্রীতিকের নিকট এগিয়ে যেতে যেতে বললো,

— না থাক।অরু কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর নরম তুলতুলে মোলায়েম হাতটা খপ করে নিজের শক্ত হাতে চেপে ধরলো ক্রীতিক। ওর হাতের বাঁধন এতোটাই শক্ত ছিল যে চোখ মুখ খিঁচিয়ে মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো অরু,

— আহ! লাগছে ছাড়ুন।

ক্রীতিক ছাড়েনা, উল্টে অরুকে বাইকের সাথে চেঁপে ধরে নিজের মুখটা অরুর দিকে বাড়িয়ে দাঁত দিয়ে দাঁত পিষে ক্রীতিক বলে,

—- হাউ ফা'কিং ডেয়ার ইউ অরু?কাল আমাকে ধা'ক্কা মা'রার সাহস কোথায় পেলি তুই? কতবার বলেছি তোকে? আমার

রিজেকশন একদম পছন্দ নয়, আদর করতে চাইলে চুপচাপ সেটা করতে দিবি, চুমু খেতে চাইলে চুপচাপ সেটা খেতে দিবি। তখন আমাকে ডির্স্টাব করার দুঃসাহস দেখাবি না। প্রথমবার গাড়িতে বসে যা যা শিখিয়েছিলাম এরমধ্যে ভুলে গিয়েছিস?
অরু অস্রুশিক্ত চোখের পাতায় পলক ফেলে, দু'ফোঁটা নোনাজল ছেড়ে দিয়ে আরোষ্ঠ গলায় বললো,—- ছাড়ুন না ব্য'থা লাগছে। কষ্ট হচ্ছে তো আমার।
অরুর ভেজা চোখ আর কম্পিত ঠোঁটের শিহরণ দেখে মূহুর্তেই স্বাভাবিক হয়ে উঠলো ক্রীতিকের শক্ত চোয়াল। দুচোখের অ'গ্নিস্ফুলিঙ্গ দপ করে নিভে গিয়ে ঘনীভূত হলো তীব্র কামনা। অরুর কেঁপে ওঠা নরম তুলতুলে ঠোঁট জোড়া চৌম্বকীয় আকর্ষনে টানছে ওকে।
এই ভীত সন্ত্রস্ত ডাগর চোখ, , এই কম্পিত ঠোঁট,এই অভিমানী পান পাতার মতো স্নিগ্ধ মুখ, এই লতানো ছোট্ট শরীর, এসবের মাঝেই বারবার আটকে যায় ক্রীতিক। ক্রো'ধান্বিত মস্তিষ্কটা শান্ত নীড় হয়ে যায় মূহুর্তেই। তীব্র মা'দকতা মিশিয়ে হৃদয়ে ঢেউ তোলে কামনার প্লাবন।
মাঝে মাঝে ক্রীতিকের মনে হয় এ কোনো সাধারণ অষ্টাদশী নয়,বরং এ মেয়ে মায়াবিনী, জা'দুকরিনী,হৃদয়হরনী,যার ছোঁয়া তো দূরে থাক উষ্ণ চাহনিতেও জলোচ্ছ্বাসের সূত্রপাত হয় বচ্ছর ত্রিশেক ম্যাচিউরিটি খ্যাত হৃদ গহীনে।ক্রীতিক সেই তখন থেকে একই ভাবে তাকিয়ে আছে, নিস্প্রভ ওর চাহনী, একবার পলকও ফেলছে না। সামান্য চোখের চাহনি দিয়েই যেন অরুর সুপ্ত নারী সত্তাকে ক্রমশ জাগ্রত করছে নির্লজ্জ লোকটা। ওর কামুক চোখের

চাওনিতে বারে বারে আরোষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে অরু। ব্যাপারটা লজ্জাজনক। অরু ও লজ্জা পেলো ভীষণ। সহসা অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে জড়তা মিশ্রিত কন্ঠে বললো,
—- চলুন যাওয়া যাক।
অরুর কথায় ভ্রম কেটে গেলো ক্রীতিকের, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ ওরা এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই, চিরাচরিত ফর্মে ফিরে এসে, নিজের হ্যাট,মোবাইল, সিগারেট, ওয়ালেট সবকিছু অরুকে বুঝিয়ে দিয়ে হেলমেট পরে বাইকে বসে পরলো ক্রীতিক।
অরুও নিঃসংকোচে ক্রীতিকের কাঁধে হাত রেখে বসে পরলো বাইকে। অরু বসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক বলে ওঠে,
—-ধরে বস। ক্রীতিকের কথায় অরু এবার নিজের হাতের বাঁধন শক্ত করলো কিছুটা।
পরমূহুর্তেই শাঁই শাঁই আওয়াজ তুলে ক্রীতিক কুঞ্জের বিশাল গেইট ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলো ইয়ামাহা খচিত ব্র্যান্ডেট বাইকটা।
এই পুরো কাহিনী দোতলার বারান্দা থেকেই সুক্ষ্ম নজরে পরখ করলো অরুর মামাতো ভাই রেজা। পরক্ষনেই ব্যতিগ্রস্থ হাতে আঙুল চালালো মোবাইলে। কাউকে ম্যাসেজ করলো বোধ হয় ।সন্ধ্যা সারে সাতটা, সোডিয়াম আর চলন্ত গাড়ির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঢাকা শহর। শপিং কমপ্লেক্সের তিনতলা জুড়ে বিশাল ক্যাফেটেরিয়া, তার একপাশে থাই লাগানো বিস্তার দেওয়াল। সেখান থেকে সামান্য উঁকি দিলে পাখির চোখে পুরো শহরটা দেখা যায়।

রাতের শহরের লাল, নীল, সোনালী চকচকে আলো বাদ দিলে ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি যা দেখা যায় তা হলো ট্রাফিক জ্যাম। সেই তখন থেকে পুরো রাস্তাটা জ্যামে আটকে আছে, একনাগাড়ে হর্ণ বাজিয়ে যাচ্ছে শয়ে শয়ে গাড়ির বহর।
হর্ণের আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম। কি বিদঘুটে অনুভূতি, যদিওবা এতোদূর থেকে সেই আওয়াজ কানে ভেসে আসছে না, তবুও কোল্ড কফির স্ট্র টাকে আঙুলের সাহায্যে ঘুরাতে ঘুরাতে দূর্বিষহ জ্যামের দিকে একধ্যানে তাকিয়ে আছে নীলিমা। নিজের মাঝে অনুভব করতে চাইছে রাস্তার মানুষ গুলোর বি’ষাদময় তিক্ত অনুভূতিকে।
সেই তখন থেকে একইভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে দেখে তিথি এবার ডেকে উঠলো ওকে,——এ্যাই নীলিমা, তখন থেকে বাইরে তাকিয়ে আছিস কি দেখছিস বলতো?
তিথির ডাকে চোখ ঘুরালো নীলিমা, পুনরায় কোল্ড কফিতে সিপ নিয়ে বললো,
—— কেমন আছিস বল, তোর তো খবরই নেই,বিয়ে-শাদি করে ফেললি নাকি?
নীলিমার কথায় তিথি মুঁচকি হেসে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, নীলিমা আবার শুধায়,
—- তা জিজু কোথায়?
এবার তিথি আঙুলের ইশারায় কাউকে দেখাবে,তার আগেই নীলিমার চোখ গেলো তিথির পেছনে এক আগন্তুকের দিকে।যে এই মূহুর্তে চিকেন ফ্রাই আর কোকের ট্রে হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাঁকা সিট খোঁজায় ভীষণ ব্যস্ত।

—— এখানেও পাগলু?
বিড়বিড়িয়ে কথাটা বলে মেনু কার্ডের আড়ালে তাড়াহুড়ো করে মুখ লুকালো নীলিমা। যা দেখে তিথি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—- কি হয়েছে,হুট করে এমন চো'রের মতো বিহেভ করছিস কেন?
নীলিমা হিসহিসিয়ে বলে,
——— চুপ কর বিদেশি বাঁদরটা এদিকেই আসছে, একবার দেখে ফেললে বকবক করে মাথা খেয়ে ফেলবে।
—— এক্সকিউজ মি, কে বাঁদর?
আচমকা পুরুষালী রাশভারী আওয়াজে লাফিয়ে উঠলো নীলিমা, থতমত খেয়ে মুখের সামনের মেনু কার্ডটা সরাতেই দৃষ্টিস্থাপন হলো সায়রের কুঁচকানো ভ্রুর ভাজে।
সায়র নীলিমার পাশেই বসেছে, যার দরুন মেনু কার্ডটা সরাতেই চকিতে পেছনে সরে গেলো নীলিমা। কোনো মতে নিজের ভ'য় টাকে আড়াল করে চোখে মুখে মিথ্যে আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে তেঁতো গলায় নীলিমা বললো,
—- আপনি এখানে কি করছেন, এটা আমার সিট চোখে দেখতে পাচ্ছেন না?
সায়র এগিয়ে গিয়ে নীলিমার কফিতে একটা সিপ দিয়ে বললো,
—- দেখাও দেখি কোথায় লেখা আছে এটা তোমার সিট? আমি যতদূর জানি সিটটা ক্যাফের কতৃপক্ষের , এবং এটা সকল কাস্টমারের জন্য বরাদ্দ। মানুষের জিনিস কে নিজের বলা বন্ধ করো লো'ভী মেয়ে। কোনদিন না অন্যের জামাইকে দেখিয়ে বলো, এই জামাই আমার।

তিল কে তাল, আর ক কে কলিকাতা বানিয়ে ফেলবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে সায়রের মাঝে, সেটা বেশ ভালো মতোই টের পেলো নীলিমা। তাই আপাতত কিছু না বলে অগত্যাই চুমুক দিলো কফিতে।
সায়র কিঞ্চিৎ বাঁকা হেসে বললো,—- হাউ ইজ ইট?
—— মানে?
সায়র কফির স্ট্র টাকে ইশারা করে বললো,
—— আমার লিপস টেস্ট।
নীলিমার এতোক্ষণে মাথায় ঘুরলো একটু আগে এই একই স্ট্র দিয়ে সায়র ওর কফি পান করছে,আর এখন ও নিজেও খেলো। ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই টিস্যু দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছতে মুছতে নীলিমা নাক মুখ কুঁচকে বললো,
—— অ'সভ্য লোক, কি চান আপনি?—- আপাতত এক চুমুক কফি নিয়ে,সেটাকে কুলকুচি করে সরাসরি তোমার মুখে পুরে দিতে চাই।
সায়রের এমন বিদঘুটে কথায় গা গুলিয়ে এলো নীলিমার, ও অনেকটা বিরক্ত হয়ে বললো,
—— আপনি আসলেই একটা পা'গলু। পঁ'চা,বা'সি, ন'ষ্ট, উৎকৃষ্ট। সব আপনি।
প্রতিউত্তরে সায়র আরও গা গুলানো কিছু কথা ছুঁড়বে, তার আগেই নীলিমার নাম ধরে ডেকে ওঠে অরু।
নীলিমা পেছনে চেয়ে অরুকে দেখে আশ্চর্য কন্ঠে বলে,
—— অরু তুই?—— অরু তুই?
অরু এগিয়ে এসে সহসা হেসে বলে,
—— আপা দের বিয়ের শপিং এ এসেছি, তুই কি….

বাকি কথা বাড়ানোর আগেই ওর সাথে চোখাচোখি হলো তিথির ।
তিথি অরুকে দেখে সংকোচ কিংবা অ’পরাধ বোধ করা তো দূরে থাক, উল্টে একটা গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বললো,
—— তাহলে শেষ মেশ ফিরেই এলি আমেরিকা থেকে? তোকে আগেই বলেছিলাম নিখিল ভাইয়ের পেছনে পরে থাকা বন্ধ কর, তোকে দু’পয়সার ও পাত্তা দেবে না নিখিল ভাইয়ের মতো মানুষ ।শুধু শুধু এতো গুলা দিন ধরে মিথ্যে আশা নিয়ে বেঁচে আছিস। হাউ শেইম।
নীলিমা তৎক্ষনাৎ তিথিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললো,—— থামবি তুই তিথি? অরুর মনটা এমনিতেই ভালো যাচ্ছে না।
অরু এবার মুখ খুললো, তিথির দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বললো,
—— তোকে কে বলেছে আমি মিথ্যে আশায় বেঁচে আছি? আমাকে দেখে কোন দিক দিয়ে তোর অসুখী মনে হচ্ছে?
তিথি তাচ্ছিল্য করে হেসে বললো,
—- দেখতেই তো পাচ্ছি, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিস, আমি কিছু বুঝিনা ভেবেছিস?
ওদের ত’র্কের ফাঁকে বাম হাত ঢুকিয়ে, অরুর দিকে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে সায়র শুধালো,
—- জেকের মতো আস্ত একটা প্যারা জীবনে উপস্থিত থাকতে, তুমি আবার কার জন্যে শুকিয়ে গেলে এলোকেশী?সবার উদ্ভট কথা শুনে আ’হাম্মকের মতো ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে আছে অরু, প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন উদ্যমে তিথিকে কিছু বলার।
ঠিক সেই সময়ে, সবার আকর্ষন কেড়ে নিয়ে বয়জেষ্ঠ একজন ওদের মাঝে চলে এসে তিথির কাঁধে নিঃসংকোচে হাত রেখে বললো,

—— হ্যালো এভরি ওয়ান। কি অবস্থা সবার?
লোকটা স্মার্ট, বেশভূষা দেখেই বোঝা বেশ যাচ্ছে বেশ ধনাঢ্যশালী ব্যক্তি হবে হয়তো। তবে বয়সে ওদের চেয়ে চোখবুঁজে কয়েকগুণ বড় তো হবেই।
সায়র লোকটাকে দেখে জোর পূর্বক হেসে বললো,—-কে আপনি দাদু?
তিথি তৎক্ষনাৎ লোকটার বেড়ে ওঠা ভূড়িতে আবেশিত হাত ছুয়িয়ে একগাল হেসে বললো,
—— মিট মাই বিলোভট হাসবেন্ড, খন্দকার মোশতাক আহমেদ।
তিথির কথায় ওরা সবাই মুখ টিপে হাসি সংবরণ করলো। সায়র তো কুলিয়ে উঠতে না পেরে মিনিমিনিয়ে বলেই ফেললো,
—— এই দাদু আবার হাসবেন্ড হয় কি ভাবে? দেখে তো মনে হচ্ছে সারাদিন হাঁচি কাশিতেই দিন শেষ হয়ে যায় ওনার, তাহলে বউ সামলায় কখন?
সায়র নীলিমার পাশেই বসা ছিলো বিধায়, নীলিমা ওর উরুতে চিমটি কেটে সহসা থামিয়ে দিয়ে বললো,
—— চুপ করুন, অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করতে শিখুন।
নীলিমার শেষ কথাটা সায়রের হৃদয়ে গিয়ে লাগলো, আসলে মেয়েটাকে যতটা রা’গী আর বেয়ারা মনে হয়, ততটাও নয়। মনটা ভালো আছে।
অরু এখনো তিথি আর তার দাদু ওরফে হাসবেন্ডের গদোগদো প্রেম দেখে সার্কাস দেখার মতোই হা করে তাকিয়ে আছে, মনে মনে ভাবছে,—- ইশ এই দাদুটাও কি রোমান্টিক, অথচ আমার বর কে

দেখো,সারাদিন মেজাজ আর মেজাজ। এমন করে একটু লোকের সামনে গদোগদো ভালোবাসা দেখালে কি হয়?
তিথি তার বিলোভট হাসবেন্ডের থেকে চোখ সরিয়ে, অরুকে উদ্দেশ্য করে বললো,
—- এখনো সময় আছে, এরকম একজন দেখে বিয়ে করে নে, পুরো লাইফ আরামছে পায়ের উপর পা তুলে কেটে যাবে।আ…
তিথির কথা মাঝপথেই আটকে গেলো যখন চমৎকার এক পুরুষালী কন্ঠে পেছন থেকে খুব অধিকার নিয়ে অরুকে ডেকে উঠলো কেউ,
——- মিসেস অরোরা জায়ান!
ক্রীতিক হঠাৎ করে পুরো নাম ধরে ডেকে ওঠায়,অরু হকচকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো,—— এইতো আমি।
চলতি ক্লাইমেক্সে আরও খানিকটা আকর্ষন ঢেলে দিতে, সবার মাঝে এসে দাড়ালো ক্রীতিক।সুদর্শন ক্রীতিককে দেখে অকস্মাৎ চিকচিক করে উঠলো তিথির দু’চোখ, ও তব্দা খেয়ে কিছুটা লাজুক হেসে শুধালো,
—- আপনি কে ভাইয়া?
ক্রীতিক বাহুর মাঝে অরুকে নিয়ে বললো,
—— হার বিলোভট হাসবেন্ড, জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী।
অরুর স্বামী কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চুপসে এইটুকুনি হয়ে গেলো তিথির মুখ, ও পুনরায় অবিশ্বাসের সুরে বললো,
—- ক্রীতিক কুঞ্জের মালিক জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী?
তিথির সম্মোধনে ক্রীতিক অরুর দিকে তাকিয়ে সহসা হাসলো, যার অর্থ হ্যা।

এই মূহুর্তে তিথির থমথমে মুখ খানা দেখে মনে হচ্ছে, কেউ কয়েকশ অ’পমানের চ’পেটা’ঘাতে লাল করে দিয়েছে ওর মুখ।
নীলিমা হতবাক হয়ে অরুকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললো,—-
জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী না তোর সৎ ভাই?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো।
—- তাহলে হাসবেন্ড কি করে হলো?
অরু নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,
—- বিয়ে করেছে তাই হাসবেন্ড হয়েছে।
নীলিমা হাসফাস করতে করতে বললো,
—- আমি না কিছু মিলাতে পারছি না অরু,তুইতো সেদিনও নিখিল ভাইয়ের জন্য কা’ন্নাকাটি করলি, তাকে ছাড়া নাকি তুই আর কাউকে তোর জীবনে ভাবতে পারিস না, তাহলে হঠাৎ?
অরু ঠোঁট উল্টে ভ্রু কুঁচকে বললো,
—– তোকে কে বললো, আমি নিখিল ভাইয়ের জন্য কেঁদেছি? আমি তো ওনার জন্য কাঁদছিলাম। অরু চোখ দিয়ে ইশারা করে দেখালো ক্রীতিক কে।
নীলিমা হতবিহ্বল কন্ঠে বললো,—- কিহ! তুই ওনার জন্য কাঁদছিলি?
অরু ঠোঁট ফুলিয়ে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে নীলিমা পুনরায় বলে,
—- উনি কেন তোকে হঠাৎ বিয়ে করতে গেলো ?আর তুইই বা কি করে, না মানে আসলে কি বলতো সবকিছু আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা অরু, উনি কি আসলেই তোকে নিজ ইচ্ছেতে বিয়ে করেছে? মানে উনিকি তোর, সত্যিকারের, আপন স্বামী?

অরু না সূচক মাথা নাড়িয়ে ক্রীতিকের দিকে অভিমানী চোখে তাকিয়ে বললো,
—- নিজ ইচ্ছেতে নয় বরং জো’র করে বিয়ে করেছে! নি’র্দয় পা’ষান লোক একটা।
অরুর কথা শুনে নীলিমা হা হয়ে গেলো, হতবিহ্বল কন্ঠে শুধালো ,
—– কি বলিস! ওনার মতো মানুষ তোর মতো পুচকে মেয়েকে জো’র করে বিয়ে করে নিলো? আমি সত্যিই এখন কনফিউজড অরু, কি এমন আছে তোর মাঝে?
অরু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,—- জানিনা, ওনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।
—– আচ্ছা তুই ওনাকে ভালোবাসিস?
নীলিমার কথায় অরু তাকায় ক্রীতিকের দিকে, যে এই মূহুর্তে সায়র আর অর্ণবের সাথে কফিতে মন দিয়েছে, অরু এভাবে তাকিয়ে আছে দেখে হুট করেই চোখাচোখি হয়ে গেলো দুজনার, অরু তৎক্ষনাৎ চোখ নামিয়ে মুচঁকি হেসে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো।
নীলিমা কৌতুহল বশত শুধালো,
—- আর উনি?
অরু জবাব দেয়,—– উনি কখনো মুখে ভালোবাসি বলেন না, তবে ওনার মহাসমুদ্রের মতো গভীর ভালোবাসা স্পষ্ট উপলব্ধি করি আমি, যে ভালোবাসার অতলে যাওয়ার সাধ্যি আমার নেই। আছে শুধু এক সমুদ্র ভালোবাসায় নিরন্তর সাঁতার কেটে বেড়ানোর অদম্য ইচ্ছে।
আমি বুঝতে পারি উনি আমার জন্য ঠিক কতটা উ’ন্মাদ। ওনার পা’গলের মতো ভালোবাসা, এতগুলো বছরের অপেক্ষা, সবার

আড়ালে দিনের পর দিন আমাকে ছায়ার মতো আগলে রাখা, আমার কষ্টে নিজেকে ভে'ঙেচুরে ফেলার মতো য'ন্ত্রনাদ্বায়ক কাজগুলো, আমাকে ওনার প্রেমে পরতে বাধ্য করেছে নীলিমা। আর যখন সত্যি সত্যি প্রেমে পড়ে গেলাম, তখন আমিও বুঝলাম সত্যিকারের প্রেমে পড়লে ঠিক কতোটা পু'ড়'তে হয়, কতটা য'ন্ত্রনা সহ্য করতে হয়।আমি সবটা সহ্য করেছি, ওই জন্যই হয়তো এখন এই মূহুর্তে উনি আমার কাছেই রয়েছেন। এখনের এই জায়ান ক্রীতিক আর একান্ত গোপনীয় আমার জায়ান ক্রীতিকের মাঝে রাতদিন ফারাক। ওনার না বলা গোপন ভালোবাসায় এতোটাই আবিষ্ট আমি,যে আর কারোর হাজার বার উচ্চারিত ভালোবাসায়ও এখন আর পোষাবে না আমার নীলিমা। সত্যিই পোষাবে না।
এক নাগাড়ে কথা গুলো শেষ করে, আবারও ক্রীতিকের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপন করে অরু। যে এই মূহুর্তে গভীর মনোযোগে ফোন স্ক্রল করছে, আবার মাঝে মাঝেই অরুর দিকে তাকিয়ে দক্ষ অভিভাবকের ন্যায় পর্যবেক্ষন, করছে অরুর গতিবিধি।— আরে! কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? সবাইতো অন্যদিকে যাচ্ছে।
শপিং শেষ করে,বাড়ি যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় হঠাৎ বাইকের টার্ন অন্যদিকে ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠলো অরু। ওর কথার পাছে ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বললো,
—- সো হোয়াট?
—- সো হোয়াট মানে? এতো রাত হয়ে গিয়েছে বাড়ি যাবোনা?
—- আমিতো এখানেই, তাহলে বাড়ি যাওয়ার এতো তাড়া কিসের তোর?
কে আছে বাড়িতে?

অরু মুখ কালো করে বললো,
—- সবাই আমাদের রেখে চলে যাচ্ছে তাই আর কি…
ক্রীতিক অরুকে থামিয়ে দিয়ে স্পিডোমিটারের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে বললো,
—- সবার কথা বাদ, ফোকাস অন মি, আমি যদি না ফেরার দেশে নিয়ে যাই, তবে তুই সেখানেই যাবি, ইভেন উইথ আউট এনি ফা'কিং কোশ্চেন। এখন ধরে বস।
অরু বললো,—- ধরলাম তো।
ক্রীতিক তীর্যক কন্ঠে বললো,
—- আরও শক্ত করে ধর আমার হচ্ছে না, তোকে ফিল করতে পারছি না।
ক্রীতিকের কথায় অরু লজ্জায় ঠোঁট কামড়ে ধরে, পরক্ষণেই মাথাটা এলিয়ে দেয় ক্রীতিকের কাঁধের উপর।
ক্রীতিক রাইড করতে করতেই মৃদু হেসে বললো,
—- নাও পার্ফেক্ট বেইবি।
ওদিকে রাস্তা ছেড়ে বে-রাস্তায় মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে বসেই চেঁচিয়ে উঠলো সায়র,
—— আরে ওদিকে কই যাচ্ছিস তোরা? রাস্তা তো এদিকে।
ক্রীতিক জবাব দেয়না, সায়রের দিকে তাকিয়ে একটু ভাব নিয়ে হেলমেটের গ্লাসটা টান মে'রে নামিয়ে দিয়ে ওদের থেকে দিগুণ গতিতে বাইক নিয়ে হারিয়ে যায় রাস্তার অদূরে।
অরু যখন বাইক থেকে নামলো তখন দেখতে পেলো এটা এয়ারপোর্ট গেইট। ক্রীতিক অরুর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ওকে একটা

সেফ যায়গায় দাড় করিয়ে দিয়ে বললো,—— বেইবি, ওয়েট কর আমি আসছি।
অরু তৎক্ষনাৎ দু-হাতে ক্রীতিকের বলিষ্ঠ হাতটা টেনে ধরে কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বললো,
—- এয়ারপোর্টের মধ্যে কোথায় যাচ্ছেন আপনি? আমায় রেখে কোথায় চলে যাবেন সত্যি করে বলুন?
ক্রীতিক মৃদু হেসে অরুর দিকে সামান্য ঝুঁকে হাস্কিটোনে বললো,
—- তোকে ছেড়ে কোথায় যাবো আমি?
—- এই যে যাচ্ছেন।
ক্রীতিক অরুকে আস্বস্ত করে বললো,
—- দু মিনিটে ফিরে আসছি। ওকে?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, ওর হাতে হেলমেটটা ধরিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে যায় ক্রীতিক।
তারপর যখন ফিরে আসে তখন ক্রীতিককে দেখে উৎকন্ঠায় বড়বড় হয়ে যায় অরুর দু'চোখ, আপনা আপনি ফাঁকা হয়ে যায় ওষ্ঠাধর।
চোখ দুটোতে বারবার পলক ছেড়েও নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছে না অরু। তাই ক্রীতিকের হাতের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটেই অরু বলে ওঠে ,—- ডোরা?
ক্রীতিক ডোরার বাস্কেটটা অরুর হাতে তুলে দিলো। অরু সহসাই বাস্কেট খুলে ডোরাকে কোলে নিয়ে বললো,
——— আপনি সত্যিই ডোরাকে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন?
ক্রীতিক পুনরায় হেলমেট পরতে পরতে বলে,

—— ডোরা এডপ্টেড ছিল না, তাই ফর্মালিটিস পালন করতে করতে দেরি হয়ে গেলো, নয়তো আমার সাথেই নিয়ে আসতাম।
অরু ডোরার গলায় আদুরে আঙুল বোলাতে বোলাতে বললো,
—- কার নামে এডপ্ট করলেন?
ক্রীতিক অরুকে হেলমেট পরিয়ে দিয়ে বললো,
—— দুজনার, মহামান্য পিতা মি. জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী, আর মহোদয়া মাতা মিসেস অরোরা জায়ান।
ক্রীতিকের কথায় ফিক করে হেসে দিয়ে ডোরাকে নিয়েই বাইকে উঠে বসলো অরু। কিছুদূর গিয়ে একটা ফাঁকা রাস্তায় ব্রেক কষলো ক্রীতিক। ঘড়ির কাটা তখন বারোটার ঘর ছুঁই ছুঁই, চারিদিক নিস্তব্ধ আর শুনশান, পুরো পুরি নিরবতার মাঝে কর্ণকূহরে এসে বাড়ি খাচ্ছে ঝিঁঝি পোকার অক্লান্ত আওয়াজ।
এমন একটা যায়গায়, এতো রাতে বাইক থামানোর দরুন, উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন ছুড়লো অরু, বললো,
—— কিছু হয়েছে?
ক্রীতিক বাইক স্ট্যান্ড করিয়ে বললো,
—- কিছু হয়নি নাম এক্ষুনি।
অরু নেমে দাঁড়ালো, পুনরায় তৎপর হয়ে শুধালো,
—-কি হয়েছে, রাগ করেছেন?
ক্রীতিক জবাব না দিয়ে নিজে বাইকে হেলান দিয়ে অরুকে টান মে’রে নিজের কাছে নিয়ে এলো।
ক্রীতিকের কর্মকান্ডে অরু বিস্ময়ে হতবাক, ও আশ্চর্য বনে গিয়ে বললো,—— কি করছেন?

ক্রীতিক একটানে অরুর চুলের গার্টারটা খুলে, ওর চুল গুলো বাঁধন হারা করে দেয়, অতঃপর হিসহিসিয়ে বলে,
—- দেনা পাওনা শোধ করছি, যেটা এয়ারপোর্ট বসেই করতাম। তোর ডোরাকে এনে দিয়েছি, এবার আমি যা চাইবো, সেটা তুই আমাকে দিবি।
অরু ক্রীতিকের বাঁধনের মধ্যে থেকেই কাইকুই করে বলে ওঠে ,
—- ছাড়ুন এটা মাঝরাস্তা।
——- চুপচাপ আমার কাজ করতে দে, নয়তো সারারাতেও ছাড়া পাবিনা।
অরু গলা খাদে নামিয়ে বললো,
—- কি করবেন আপনি?
ক্রীতিক অরুকে আরও কিছুটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে এসে বললো,
—- আগে আমাকে তুমি করে বল তারপর করছি।
অরু চোখ মুখ কুঁচকে বললো,
—-পারবো না।
—— জাস্ট সে, তুমি।
ক্রীতিকের কড়া আদেশ, তারউপর মাঝরাস্তায় এভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে দাড়িয়ে আছে, অগত্যাই উপয়ান্তর না পেয়ে অরু বলে ওঠে ,—- তুমি।
ক্রীতিক পুনরায় বলে,
— আবার বল।
অরু কাঁপা স্বরে বললো,
—- তুমি।

ক্রীতিক অরুর গলায় নাক ঘষতে ঘষতে বললো,
—- বারবার বল হার্টবিট, তোর মুখে তুমি ডাক শুনলে পা'গল হয়ে যাই আমি। যখন আমি খুব রে'গে যাবো, তখন তুই এই ট্রিকস টা প্রয়োগ করতে পারিস। আমি শান্ত হয়ে যাবো, প্রমিস।
ক্রীতিকের ভালোবাসায় কাতর অরু, পা দুটো ভে'ঙে আসছে, কোনোমতে ক্রীতিকের উপর নিজের শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। কিন্তু ক্রীতিকের বোধ হয় সেটাও সহ্য হলোনা, ও তৎক্ষনাৎ ঘুরে গিয়ে অরুকে তুলে বাইকের সিটে বসিয়ে দিয়ে,তরিৎ বেগে নিজের অধর ডুবিয়ে দিলো অরুর নরম তুলতুলে ওষ্ঠাধরের ফাঁকে।
ক্রীতিকের হঠাৎ পদক্ষেপে কেঁপে উঠল অরু, চুপসানো শরীরটাকে একটু সস্থি দিতে শক্ত হাতে খা'মচে ধরলো পুরুষালী চওড়া বুকে লেপ্টে থাকা টি -শার্ট খানা।
রাত বাড়ছে, সেই সাথে চু'ম্বনের গভীরতা ও। তীব্র আ'লিঙ্গনের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমশ দলিত মথিত হচ্ছে অষ্টাদশীর ফিনফিনে কোমল ওষ্ঠাধর। আবেশিত নয়নে নয়ন এঁটে রাখা, মাতাল করা এই নির্ভীক, বেপ'রোয়া পুরুষই কেবল জানে এই গভীরতার শেষ কোথায়। নিশুতি রাতে গাড়ি ঘোড়ার চাপ কমে এসেছে কিছুটা। পুরান ঢাকার অলিগলিতে এখন কেবলই দোকানীর শাটার টানার ঝনঝন আওয়াজ। ফুটপাত গুলোও মানব শূন্য, পথচারী যারা আছেন তারা ও দ্রুত পদচারণায় বাড়ি ফেরার পায়তারা করছেন। ক্রীতিকের বন্ধুমহল কেনাকাটা শেষ করে বাড়িতে ফিরলেও, অনু আর প্রত্যয়ের বাড়ির বড়দের জন্য উপহার সামগ্রী কিনতে কিনতে সন্ধ্যা গড়িয়ে মাঝরাতে গিয়ে ঠেকেছে। আজ বহুদিন বাদে আবারও

ওরা হাতে হাত ধরে বাবল টি এর সিপ নিয়েছে। আমেরিকাতে বসে দু'জন দু'টো জারে টি পান করলেও, এখন সময় ভিন্ন, অতএব প্রত্যয়ের ঘোর আপত্তি আলাদা করে বাবল টি নেওয়ার।
ও যদি খায় তবে অনুর টা থেকেই খাবে। অনুও আর বাধসাঁধে নি,কোনোরূপ বাকবি'তন্ডা ছাড়াই প্রত্যয়ের সাথে ভাগাভাগি করেছে নিজের পছন্দের বাবল টি।
এরপর দু'জনে হাতে হাত ধরে হাতিরঝিলে বসে একটা প্রানোচ্ছল সুন্দর সন্ধ্যা পার করে মাত্রই বাড়ির গলিতে প্রবেশ করলো ওরা।প্রত্যয় মনোযোগী ভঙ্গিতে ড্রাইভ করছে, আর অনু কেনাকাটার লিস্ট গুলো আরও একবার মিলিয়ে নিচ্ছে।
আজমেরী শেখ অসুস্থ মানুষ, তারউপর কোম্পানির চেয়ার ওয়েম্যান। এতোকিছু সামলানোর পর কেনাকাটা কিংবা বাড়তি ঝামেলার চাপ মায়ের উপর পরুক সেটা মোটেই চায়না অনু। ওই জন্যই আজ নিজের বিয়ের শপিং এ নিজেরই আসতে হলো ওকে।
এছাড়া ক্রীতিকের বন্ধুরাও সবাই যথেষ্ট দ্বায়িত্ব পালন করেছে, দ্বায়িত্ব নিয়ে অনু আর প্রত্যয়ের বিয়ের জন্য সকল কেনাকাটা তারাই করেছে।এমনকি বাড়ির পুরাতন কেয়ারটেকার মোখলেস চাচাকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছে যাতে টুকিটাকি কোনোকিছু বাদ না পরে। এসবের পেছনে অবশ্য এলিসার অবদান সর্বাগ্রে। মেয়েটা আসলেই সর্বদিকে পটু। কি না জানে সে?
ক্যারাটে, বক্সিন, মেকআপ, পকার প্লে,রান্নাবান্না, ঘর গোছানো,অর্ণবের প্রফেশনাল কাজে সাহায্য করা, এখন আবার কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির জন্য এপ্লাই করছে, হয়তো কনফার্ম হয়েও যাবে খুব শীঘ্রই।

এতো গুণ সম্পন্ন মেয়ে এলিসাকে বিশ্লেষণ করলে এককথায় কি বলা যায়? অনু একটু ভাবে, পরক্ষনেই মনেমনে আওরায়,—- মেইবি, মিস্টার পার্ফেক্টের ফিমেল ভার্ষনই হলো এলিসা।
—- এসে পরেছি।
প্রত্যয়ের কথায় ভাবনার সুতো ছিঁড়লো অনুর। ও চোখ উঁচিয়ে দেখলো গাড়িটা ক্রীতিক কুঞ্জের সামনে দাড়িয়ে।
প্রত্যয় অনুর দিকে তাকিয়ে বললো,
—- পেছনের ব্যাগ গুলো মোখলেস চাচা নিয়ে যাবে, তুমি একাই চলে যাও।
প্রত্যয়ের কথায় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে সহসা নেমে গিয়ে বাড়ির দিকে হাটা দিলো অনু, ঠিক তখনই পিছু ডেকে প্রত্যয় বলে,—- এই যে বউ!
নতুন সম্মোধন, সেই সাথে চমকপ্রদ শিহরণ, অনু থমকালো, অতঃপর ঘাড় ঘুরিয়ে প্রত্যয়কে শুধালো,
—- কিছু বলবেন?
প্রত্যয় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে একটা দুই বাই দুই ইঞ্চি সাইজের চৌকো বক্স অনুর দিকে এগিয়ে দিলো। জিনিস টা কি বুঝতে না পেরে অনু ইতস্তত বোধ করে বললো,
—- কি আছে এতে?
প্রত্যয় অনুর হাতে বক্সটা ধরিয়ে দিয়ে বললো,
—- তোমার স্বপ্ন, তবে এটা এখন খোলা যাবেনা, আমাদের বিয়ের পরে খুলবে। এখন এটাকে নিয়ে সুন্দর করে আলমারিতে তুলে রাখবে, সাবধান ভুলেও যাতে হারিয়ে না যায়।

প্রত্যয় এমন ভাবে স'তর্কবানী প্রয়োগ করেছে যে নিজের কৌতুহল দমাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে অনুর। দুষ্ট মনটা বারবার লাফিয়ে উঠে বলছে,—এক্ষুনি খুলে ফেল, দেখে নে এইটুকুনি বক্সের ভেতর কি এমন স্বপ্ন জমা রেখেছে প্রত্যয়?
পরক্ষনেই ভদ্র সভ্য,সংযমি মনটা হাত গুটিয়ে বলে ওঠে,
—- মোটেই না, উনি যেহেতু বলেছেন বিয়ের পরে খুলতে, তাহলে সেটাই হবে, এই ক'দিনের জন্য সানন্দে ধৈর্য ধরবো আমি।
অনু বক্সের উপরিভাগ হাতদিয়ে স্পর্শ করতে করতেই অন্দর মহলে প্রবেশ করে, পুরোপুরি মনোযোগ ওই ছোট্ট বক্সের দিকে নিবদ্ধ থাকায়, সামনে এগোতে গিয়ে হুট করেই কারও শক্ত বাহুতে ধা'ক্কা খেয়ে দু'কদম পিছিয়ে গেলো অনু।
ধা'ক্কার জোরটা বেশ ভালোই ছিল,এমতাবস্থায় প্রচন্ত ব্যথায় চোখ খিঁচিয়ে সামনে দৃষ্টিপাত করলো অনু, দেখলো ওর থেকে কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে রা'গে ফুঁসছে রেজা। রেজা কি তাহলে হসপিটাল থেকে বাড়িতে না গিয়ে, সোজা ক্রীতিক কুঞ্জে ফিরলো? কিন্তু কেন?
এ বাড়ির ছোট সাহেবের হাতে মা'র খেয়ে আবার এই বাড়িতেই ফিরেছে বিষয়টা বোধগম্য হতেই বিস্ময় জড়িত কন্ঠে অনু বলে ওঠে,—- রেজা ভাই আপনি?
রেজা কাঠকাঠ গলায় জবাব দিলো তৎক্ষনাৎ,
—- তোমার সৎ ভাই আমাদের তোমার বিয়ে খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অনু। যে অনুকে সেই ছোট্ট বেলা থেকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে এসেছি সেই অনুর বিয়ে খেতে। ভাবতে পারছো?
অনুর মুখ চুপসে গেলো, কিছুটা শান্ত গলায় বললো,

—-- দেখুন রেজা ভাই, আপনাকে ভাই ব্যতিত অন্য কোনো নজরে কখনোই দেখিনি, না আপনার সাথে আমার কোনোকালে সহজ কথোপকথন হয়েছে। তাহলে স্বপ্নটা দেখলেন কোথা থেকে? আর বাকি রইলো বিয়ের কথা? ওটা আপনার মা'ই সারাজীবন আপনার মস্তিষ্কে ব্যা'ক্টেরিয়ার মতো প্রয়োগ করেছে। যার ফলরূপ আপনি আমাকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে এসেছেন।অনুর শান্ত গলায় করা তি'রস্কারে রেজার কপালে ক্রুর ভাঁজ প্রতিস্থাপিত হলো, ও রুষ্ট কন্ঠে বললো,
— জায়ান ক্রীতিকের আশকারায় এতো কিছু বলছো তো? আজকে দেখো জায়ান ক্রীতিকের কি হাল হয়, সাথে অবশ্য তোমার বোনটাও ফাঁ'সবে, কাল সকালের মধ্যে জায়ান ক্রীতিকের মান সম্মান যদি আমি ধুলোয় মিশিয়ে না দিয়েছি তবে আমার নাম ও রেজা নয়।
রেজার কথায় অনু আ'তঙ্কিত হলোনা, উল্টে গলার জো'র বাড়িয়ে বললো,—-- প্রথমত আমার মা এই বিয়েতে মত না দিলে, অন্য কারও আশকারায় আমার কিছু যায় আসতো না রেজা ভাই। আপনার ফুপিই সরাসরি বিয়েটা দিচ্ছেন,তাই আশকারা তো একটু পাবোই বলুন? আর জায়ান ক্রীতিকের সম্মানের কথা বলছেন? সেতো সমাজেরই পরোয়া করেনা, সম্মান তো দূরছাই। উল্টে তার পেছনে কলকাঠি নেড়ে আপনি কতোটা সেফ থাকবেন সেটা নিয়েই আমি আপাতত দুশ্চিন্তা গ্রস্থ।
রেজা অনুর দিকে দু কদম এগিয়ে এসে একটা তাচ্ছ্যিল্যের হাসি দিয়ে বললো,

— আমার হাত ঠিক কতোটা লম্বা, তা তো তুমি কল্পনাও করতে পারবে না অনু, তোমাকে আমি দেখে নেবো… কাল প্রেসের লোকেরা এসে যখন বাড়ি ভর্তি করে ফেলবে একই প্রশ্নে মাথা খারাপ করে দেবে যে,

—- আজমেরী শেখ আদতে কোন সার্থ হাসিলের জন্য নিজেরই সৎ ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন, নিজের স্বামীর পদবী নিজের মেয়ের গায়েও এঁটে দিলেন, তখন দেখবো তোমার ওপেন হা’র্ট সা’র্জারী ফেরত মা, আর তোমার বিয়ে, দুটোরই কি হাল হয়?দেখা যাবে মান সম্মানের ভয়ে তোমার বিলেত ফেরত স্বামী আর তার পরিবার বিয়েটাই ভে’ঙে দিলো। তখন তোমার মা মান সম্মান বাঁচাতে আবারও আমার মায়ের হাত পা ধরে তোমাকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিতে উদ্যত হবেন। মার্ক মাই ওয়ার্ড অনন্যা শেখ।

রেজার এতোগুলা কথায় থমথমে হয়ে গেলো অনুর চোয়াল, রাগে র’ক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে ওর সমগ্র মুখশ্রী, এক্ষুনি রেজার গালে চ’ড় না বসালে খুব বড় অ’ন্যায় হয়ে যাবে, সেই অ’ন্যায়ের ভাগিদার হতে চায়না অনু, যার ফলস্বরুপ কয়েক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্ষ্যা’পাটে বাঘিনীর মতো রেজার গালে শ’ক্ত চ’পেটাঘা’ত বসাতে উদ্যত হলো অনু। তবে চ’ড় টা আর বসাতে পারলো না, তার আগেই শি’কার ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঝড়ের বেগে অনুর সামনে থেকে রেজার কলার ধরে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ক্রীতিক।

অনু ভড়কালো, মাথার মধ্যে টগবগিয়ে বেড়ে ওঠা ক্রো’ধটা মূহুর্তেই বিস্ময়ে পরিনত হলো, ও ঘাড় ঘুরিয়ে সাইডে তাকাতেই দেখতে পেলো, রেজাকে মেঝেতে ফে’লে ওর বুকের উপর হাটু গেড়ে

বসে এলোপাথারি ঘু’ষি দিয়ে যাচ্ছে ক্রীতিক। ক্রো’ধান্বিত প্রতিটি ঘু”ষি আঁচড়ে পরছে রেজার চোখে মুখে।
এভাবে ক্রমাগত এলোপাথারি মা’রের তোপে একদন্ড শ্বাস ফেলছে পারছে না রেজা, অথচ ক্রীতিক থামার নামই নিচ্ছে না, উল্টে মা’রের সাথে সাথে চোয়াল শক্ত করে অ’স্রাব্য গা’লিতে পিষ্ট করছে রেজাকে। ক্রীতিকের কর্মকান্ডে একটা শুষ্ক ঢোক গিলে ভয়ার্ত চোখে অরুর দিকে চাইলো অনু, দেখলো অরুর একহাতে হাতে গজের ব্যান্ডেজ প্যাঁচানো অন্য হাতে ডোরার বাস্কেট। ও নিজেও ক্রীতিকের এমন রা’গ দেখে থরথরিয়ে কাঁপছে।
কিন্তু এখন তো কাঁপাকাপির সময় নয়, ক্রীতিককে থামাতে হবে নয়তো রেজাকে আজ মে’রেই ফেলবে লোকটা, ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই, অরু ছুটে গিয়ে ক্রীতিকের হাত টেনে ধরলো, তবুও থামছে না ক্রীতিক, অরু পারছে না ক্রীতিকের পুরুষালী শক্তির সাথে কুলিয়ে উঠতে, তাও জো’র জব’রদস্তি করে কোনোমতে রেজার বুকের উপর থেকে সরিয়ে দাড় করালো ওকে। তবুও হিং’স্র সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে রেজাকে পা দিয়ে ক্রমাগত আ’ঘাত করে যাচ্ছে ক্রীতিক। ওর র’ক্তিম চোখ, আর তীব্র ক্রো’ধ দেখে মনে হচ্ছে ও আজ রেজাকে মে’রেই ফেলবে। হলরুমে হঠাৎ এতো চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে রুম থেকে বেরিয়ে দোতলার করিডোর দিয়ে উঁকি দিলো সায়র, অর্ণব আর এলিসাও। ক্রীতিককে হঠাৎ করে এমন রে’গে যেতে দেখে ওরাও হতবাক, কি এমন হলো হুট করে? সন্ধ্যা বেলাতেও তো সব ঠিক ঠাকই ছিল। বেশ শান্ত সাবলীল ছিল ক্রীতিক।

ক্রীতিকের গর্জন শুনে আজমেরী শেখ আর জাহানারা ও অন্য দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন, সবাই নিরব দর্শক, কেউ ক্রীতিকের রা'গের কারণ ধরতে পারছে না, শুধু মাত্র জাহানারা বেগম সিঁড়ি ভেঙে ছুটে নিচে নেমে এলেন, তিনি কা'ন্না জড়িত কন্ঠে একপ্রকার কাকুতি মিনতি করেই অরুকে বলতে লাগলেন,
— ও অরু, দয়াকরে থামা তোর স্বামীকে, আমার ছেলেটাকে মে'রে ফেললো তো।
অনু জানেনা কি হয়েছে, কেনই বা ক্রীতিক এতো ক্ষে'পেছে, তবুও খারাপ কিছু যে ঘটেছে সেটা অরুর ব্যান্ডেজ করা হাত দেখেই আঁচ করতে পারছে ও, কিন্তু এখন ক্রীতিককে থামানোটা জরুরি, নয়তো রেজার খুব খারাপ পরিনতি হবে, তাই অনু নিজেও উদ্বিগ্ন স্বরে অরুকে বললো,—- ক্রীতিক ভাইয়াকে আটকা অরু, রেজা ভাইয়ের না'ক মুখ দিয়ে র'ক্ত বেরোচ্ছে ম'রে যাবে তো।
আপার কথা কর্ণকূহরে পৌঁছালে অরু এক প্রকার হন্যে হয়ে পেছন থেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ক্রীতিক কে। পর মূহুর্তেই ওর মনে পরে গেলো ক্রীতিকের বলা তখনকার কথাগুলো,
—- বারবার বল হার্টবিট, তোর মুখে তুমি ডাক শুনলে পা'গল হয়ে যাই আমি। যখন আমি খুব রে'গে যাবো, তখন তুই এই ট্রিকস টা প্রয়োগ করতে পারিস । আমি শান্ত হয়ে যাবো, প্রমিস।
অরু এবার তাই করলো, সবার সামনেই দু-হাতে পেছন থেকে শক্ত করে ক্রীতিককে জড়িয়ে ধরে বললো,
—- প্লিজ থামো, একটু শান্ত হও, আর না। দয়া করে আর মে'রোনা, ম'রে যাবেতো।

অরুর ট্রিকস বোধ হয় কাজে লাগলো, ক্রীতিক তার কথা রেখেছে, অরুর করা তুমি সম্মোধনে মূহুর্তেই মস্তিষ্কে জ্বলতে থাকা বি'ধ্বংসী ক্রো'ধটাকে সামলে নিয়েছে ও। পরমূহুর্তেই নিজের মেদহীন এ্যাবসে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা অরুর ব্যান্ডেজ করা হাতটাতে নজর দিয়ে, বাঁজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চাহনি নিক্ষেপ করলো, মু'মূর্ষু রেজার দিকে, সেভাবেই তাকিয়ে থেকে ধা'রালো আওয়াজে বললো,

—- বা'স্টা'র্ড, আমার মতো অভদ্রের পেছনে লাগতে এসে মোটেই ঠিক কাজ করিস নি তুই, আজকে ইন্ট্রো দিলাম খুব শীঘ্রই তোর খেল খতম করবো আমি। সময় হলে টের পাবি জায়ান ক্রীতিক আদতে কতটা জ'ঘন্য আর ট'ক্সিক।

অরু আবারও হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ বন্ধ রেখেই রিনরিনে আওয়াজে বললো,

—- প্লিজ শান্ত হও একটু, প্লিইইজ।

ক্রীতিক অরুর ব্যন্ডেজ করা হাতে আলতো স্পর্শ করে ঘাড় ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত কন্ঠে বলে,—- এতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছিস, হাতে ব্যথা করছে না?

অনিমেষ কথাগুলো কানে ভেসে আসতেই অরু পুরোপুরি বাঁধন হারা করে দিলো ক্রীতিককে, ওকে ছেড়ে দিতেই চারিদিকের বিস্মিত হতবাক কয়েক জোড়া চোখ দেখে, লজ্জিত হয়ে দ্রুত মাথা নিচু করে নিলো অরু।

আজমেরী শেখ করিডোরের কার্নিশে হাত রেখে এতোক্ষণ জীবন্ত পুতুলের মতোন দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু করার নেই এই মূহুর্তে। অরুকে নিজের বশে এনে ক্রীতিক অদৃশ্য শেকলে বে'ধে ফেলছে আজমেরী শেখের হাত,

পা। তারউপর বাড়িটা ক্রীতিকের, এখন তিনি চাইলেও চুপচাপ নিরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারছেন না।

—— রিডিকিউলাস।

ক্রীতিক থেমে যাওয়ার এক পর্যায়ে, চোখে চশমা এটে গটগটিয়ে রুমে যেতে যেতে, দাঁতে দাঁত পিষে বিড়বিড়ালেন আজমেরী শেখ। ওয়াশরুম থেকে ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে, একটা সিল্কের পাজামা গায়ে চড়িয়ে,সতর্ক হাতে ডোরাকে কোলে নিয়ে মাত্রই বিছানায় বসেছে অরু।

মাঝরাত তখন শেষ রাতে গিয়ে ঠেকেছে, আরেকটু পরে হয়তো ফজরের আজান হবে। অথচ বাড়ির সবাই মাত্র কিছুক্ষণ হলো যে যার রুমে ঢুকেছে, ক্রীতিকের সাথে সায়র অর্ণব ও ওর রুমে। এতো রাতে কি নিয়ে কথা বলছে তারা, কে জানে?

আগের রাতের সব ঘটনা ভুলে গিয়ে অরু যখন ডোরাকে আদর করায় মন দিয়েছে, ঠিক তখনই ওর রুমে কড়া নারে অনু। দরজা খোলাই ছিল, তবুও অরু কিছুটা গলা উঁচিয়ে বললো,—- দরজা খোলাই আছে।

অনু রুমে ঢুকলো, তবে এগিয়ে গিয়ে বসে কথা বলার অপেক্ষা করলো না,বরং অরুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই উদ্বিগ্ন কন্ঠে শুধালো,

—- হ্যারে অরু, কি হয়েছে বলতো?

ক্রীতিক ভাইয়া হঠাৎ করে রেজা ভাইকে এভাবে মা’রলো কেন? তারউপর তোর হাতে ব্যান্ডেজ, তোকেও মা’রেনি তো?

অনুর কথায় অরু নিজের হাতের দিকে তাকালো, হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে ব্যান্ডেজ করা, নিজের হাতটা ভালো মতো পরখ করে, অরু নরম স্বরে বললো,— রেজা ভাই ঠিক আছে?
অনু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—- ক্লিনিক থেকে প্রাইমারী ট্রিটমেন্ট নিয়ে, মামী সহ তাদের বাড়িতে চলে গিয়েছে।
— ওহ, ভালো।
অরুকে কেমন উদাসীন লাগছে, তাই অনু আবারও আগ বাড়িয়ে বললো,
—- কি হয়েছে বললি নাতো?
অনুর কথায়, অরুও ভাবনায় পরে গেলো, মনেমনে ভাবতে লাগলো তখনকার ঘটনা, একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জের ধরে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কতটা দূ'র্বিষহ আর আ'তঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ওদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ মূহুর্তটা। আর সবচেয়ে বড় কথা সেই পুরো ঘটনার পেছনে ছিল ওরই মামাতো ভাই রেজা। এখনো সেসব কথা ভাবতে গেলে, রেজার উপর মেজাজ চড়ে ওঠে অরুর। মাঝরাতে শুনশান নিস্তব্ধতার মাঝে, নিরিবিলি রাস্তায় ক্রীতিক যখন শুধুই অরুর হৃদস্পন্দন বাড়ানোর পায়তারা করছিল, ক্রমশ নিজের ঠোঁটের খেলায় অরুকে মাতিয়ে তুলছিল,ঠিক সেসময় খুব কাছ থেকে অযাচিত কিছু হিসহিসানির আওয়াজ কানে বিট করতেই অকস্মাৎ গতি হারায় তীব্র গভীরতর চুম্বন।

ক্রীতিক তরিৎ গতিতে চোখ খুলে দেখতে পায়, রাস্তার অপর পাশের বন্ধ টং দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুক্ষ্ম হাতে গো’পন ক্যা’মেরায় ওদের একান্ত মূহুর্তগুলো ভিডিও করছে কেউ।
এহেন অবস্থায় ক্রীতিক কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করলো না, উল্টো অরুকে ছেড়ে দিয়ে শান্ত স্বরে বললো,
— আমি আসছি বেইবি, তুই বস। কথাটা শেষ করে টি-শার্টের হাতা গুটাতে গুটাতে রাস্তার ওপাশে গিয়ে, এক টাকে কলার ধরে টেনে বের করলো ক্রীতিক। তারপর শুরু করলো একের পর শক্ত হাতের থা’প্পড় দেওয়া।
এভাবে হঠাৎ করে মাঝরাস্তায় ক্যামেরা হাতে লোকটাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেলো অরুর। তার উপর এমন একটা খোলামেলা যায়গায় বসে ক্রীতিক লোকটাকে বেধ’ড়ক মা’রছে।
আচ্ছা, লোকটা যদি প্রেসের কেউ হয়? কিংবা কোনো গ্যাং এর সদস্য হয় তখন? তখন তো বেশ ঝামেলায় পরে যাবে ক্রীতিক। তার চেয়েও বড় কথা,এখানে যে একজনই আছে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এক্ষুনি যদি অন্ধকার ছাপিয়ে আরও কয়েকজন চারপাশ থেকে বেরিয়ে আসে?
তখন তো ক্রীতিক একা তাদের সাথে পারবে না। এলোমেলো চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে অরুর, অথচ ক্রীতিক থামছেই না, প্রথমে ওর হাতের ক্যামেরাটাকে আ’ছাড় মে’রে গুড়িয়ে ফেলেছে। অতঃপর ক্রমাগত ওর চো’য়াল বরাবর পা’ঞ্চ বসাতে বসাতে বলছে,

— জা'নো'য়ার, কিসের ভিডিও করছিলি,বল কে পাঠিয়েছে? সাফ সাফ বল নয়তো আজ রাতই তোর জীবনের শেষ, দিনের আলো আর দেখতে পাবিনা। তার গ্যারান্টি সয়ং আমি।
কথা শেষ করে আবারও লোকটাকে মা'রতে উদ্যত হলে,লোকটা কোনো মতে নিঃশ্বাস ধরে রেখে হাপিত্যেশ করে কাঁদতে কাঁদতে দু'হাত জোর করে বললো,
—- বলছি! ঢাকা দক্ষিণ ছাত্রলীগের সহ সভাপতি রেজা ভাই আমাদের কল করেছিল, বলেছিল তরতাজা নিউজ আছে, জেকে গ্রুপের নতুন এম ডি নাকি তার আপন সৎ বোনের সাথে অ'ন্তরঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
তার কথা বিশ্বাস করে টি আর পি বাড়ানোর আশায় সেই সন্ধ্যা থেকে আপনাকে স্ট'ক করছিলাম আমরা। আআসলে আমরা মিডিয়া থেকে এসেছি ।
ক্রীতিক নতুন উদ্যমে লোকটাকে মা'রতে মা'রতে বললো,—-হা'রামজাদা, ব'দমাশ, আমি আমার বউকে চুমু খাই কি তোদের টিআরপি বাড়ানোর জন্য?
জিদের বসে লোকটাকে মা'রতে গিয়ে ক্রীতিকের একটা কথা মাথা থেকেই বেরিয়ে যায়,লোকটা বলেছিল আমরা আপনাকে স্টক করছি, তারমানে ওরা একজন নয়।
কিন্তু হঠাৎ করেই যখন পেছন থেকে অরুর আচমকা চিৎকার ভেসে এলো কানে,তৎক্ষনাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে চাইলো ক্রীতিক।দেখলো অরু থরথরিয়ে কাঁপছে, সেই সাথে ওর কব্জি বেয়ে গড়িয়ে পরছে অনর্গল র'ক্তধারা ।

অরুর পেছনে ক্যামেরার একটা ভাঙা অংশ নিয়ে দাড়িয়ে আছে আরেকটা লোক। লোকটার গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে ও শীঘ্রই অরুকে আবারও আ'ঘাত করবে, তবে তার আর ফুরসত দিলোনা ক্রীতিক, ছুটে গিয়ে ক্যামেরার ধা'রালো টুকরোটা ছিনিয়ে নিয়ে লোকটাকেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো ও।
লোকটার বাহুতে মে'রে, ক্রীতিক যখন ওর গলায় আ'ঘাত করবে, ঠিক সেই মূহুর্তে কাঁপা হাতে ওর হাতটা টেনে ধরে, না সূচক মাথা নাড়ালো অরু।অরু সেই তখন থেকে ভয়ের তোপে থরথরিয়ে কাঁপছে দেখে, ক্রীতিক সব ফেলে দু'হাত দিয়ে আগলে ধরলো অরুকে। ওর মাথাটা শক্ত করে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে ক্রীতিক ভয়ার্ত গলায় বললো,
—- জানবাচ্চা, হার্টবিট, আর ইউ ওকে না?
অরু কাঁপতে কাঁপতে ক্রীতিকের টি-শার্টে ভেজা চোখ নাক মুছতে মুছতে বললো,
— ভ'য় করছে, আপনি এখানেই থাকুন। কোথায় যাবেন না।
ক্রীতিক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
—- কোথাও যাবো না আমি, ব্যাগ থেকে আমার ফোনটা দে, ট্রিপল নাইনে কল করতে হবে।
অরু বললো,
—- আমি আপনার ফোন থেকে করে দিয়েছি কল।
অরুর কথায় সস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে ওর কপালে শব্দ করে চুমু খেলো ক্রীতিক, তারপর ওর হাতের দিকে তাকিয়ে বললো,
— দেখি হাতটা?

কাহিনীর এই পর্যায়ে এসে থামলো অরু। এতোক্ষন যাবত অরুর কথা শুনে অনুও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, আলগোছে কানের পেছনে লম্বা চুল গুলো গুঁজে দিয়ে শুধালো,—— তারপর কি পুলিশ কে'ইস হলো?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে, বললো,
— হ্যা, তখনই আমাদের থানায় যেতে হয়েছে, ওনারা জায়ান ক্রীতিকের হাত পা ধরে নিজেদের কর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেও, প্রেসের লোকদের গায়ে হাত তোলার ফলস্বরুপ ওনাকে অনেকগুলো টাকা জ'রিমানা দিতে হয়েছে।
অনু আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, কেন যেন এতো ঝামেলার জন্য কোথাও একটা নিজেকেই অ'পরাধী মনে হচ্ছে ওর। মনেমনে ভাবলো,
—- সবকিছুর মূলে হয়তোবা আমিই ছিলাম।আজ আমার বিয়েটা অন্য কোথাও হচ্ছে বলেই রেজা ভাই সবার উপর এতোটা ক্ষে'পেছে। বিয়ে হতে হতে আরও যে কি কি ঝামেলা পাঁকাবে তা কেবল উপর ওয়ালাই জানে।—- আস্তে ভাই আস্তে, সামলে, আরে আরে ওদিকে না এদিকে।
অর্ণবের ডিরেকশনে কান ঝালাপালা হয়ে গেলো সায়রের, ও এবার না পেরে বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেই উঠলো,
—- বাইক টা কি তুই চালাচ্ছিস না আমি?
অর্ণব পেছনে বসা অবস্থায় সামনে মুখ বাড়িয়ে কটমটিয়ে বললো,
—- জীবনে প্রথমবার লাইসে'ন্স ছাড়া বাইক চালাতে এসেছিস, তাও আবার এমন রেসিং বাইক। তাই তোকে ডিরেকশন দিচ্ছি, বেশি কথা না বলে চুপচাপ মন দিয়ে শোন, নয়তো বিয়ের আগেই তোর বউ বিধবা হবে, সাথে আমারটাও।

সায়র কাঁপা কাঁপা হাতে বাইকের ব্রেক সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, তবুও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সামনে মনোযোগ নিবেশ করে বললো,
— মানুষ মন দিয়ে নয়, কান দিয়ে শোনে হাঁদারাম। তাছাড়া, এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন তুই রাইডিং এ খুব এক্সপার্ট, আয় তাহলে চালা একটু।—— বিয়ের আগে বিধবা হওয়ার শখ নেই আমার, তোর এতো শখ জাগলো কেন কে জানে? জাগলো তো জাগলো আবার আমাকে সাথে করে নিয়ে ম'রার শখ জাগলো, কি আশ্চর্য শখ!
অর্ণবের কথার পাছে সায়রের কথা বলার ফুরসত নেই, ও আপাতত বাইকের ব্রেক সামলাতে ব্যস্ত। তবুও ক্ষনে ক্ষনে এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছে ব্রেক। যার দরুন বাইকটাও হেলে দুলে উঠছে ক্রমশ।
বাইক যখনই হেলেদুলে উঠছে, অর্ণব তখনই বুকে মাথায় ক্রুশ একে বারবার ঈশ্বরকে ডাকছে। ওর হা-হুতাশে বিরক্ত হয়ে সায়র ধমকে উঠে বললো,
—- চুপ করবি? বাসায় গিয়ে ঈশ্বরকে ডাকিস, আগে আমাকে ডিরেকশন দে।
অর্ণব বলে,
—- যাচ্ছিটা কোথায় সেটা তো আগে বল?
—- আমার না হওয়া শশুর বাড়ি, ভেবেছি বিয়েটা বাংলাদেশেই করবো বুঝলি।
অর্ণব হতবিহ্বল কন্ঠে বললো,

—-- এই পুরান ঢাকার চিপা গলিতে তুই শশুর বাড়ি কোথায় খুজে পেলি?
সায়র দুষ্ট হেসে বললো,
—-- চিরুনি তল্লাশি করে পেয়েছি, চল তোকে দেখাবো। কথা শেষ করে সায়র বাইকে টান দিতেই, আবারও ঈশ্বর নাম জপতে জপতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেললো অর্ণব।
আজ ক্রীতিক অফিস জয়েন করেছে, সেই সুযোগে গোধূলি বিকেলে ক্রীতিকের বাইক নিয়ে সায়রের না হওয়া শশুর বাড়ি খুজতে বেরিয়েছি ওরা দুজন। কিন্তু এই গাদানো সারিসারি ছোট বড় শ্যাওলা পরা বিল্ডিং এর মাঝে আদতে সায়রের না হওয়া শশুর বাড়ি যে কোনটা সেটাই বুঝতে পারছে না ওরা। বাইক থামিয়ে দু’জন মিলে যখন এদিক ওদিক সুক্ষ্ম নজরে পরখ করছিল, ঠিক তখনই সায়রের দৃষ্টিগত হলো এক অপার্থিব দৃশ্যপট, ওদের থেকে কয়েক মিটার দূরত্বে যে পুরাতন কংক্রিটের দোতলা বিল্ডিংটা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার ছাঁদেই ত্রীভঙ্গ আকারে নাচের তালিম নিচ্ছে সদ্য যৌবনে পা রাখা এক অষ্টাদশী রমনী। পরনে তার কুচকুচে কালো চুরিদার,পায়ে ঘুঙুর, ওড়নাটা কাঁধ ছাড়িয়ে কোমড়ের কাছে বাঁধা। কাঁধ অবধি রিভন্ডিং করা সিল্কি চুল গুলো পাঞ্চ ক্লিপে বাঁধা পরেছে। চেহারা স্পষ্ট নয়, তবুও গোধূলির আভায় নৃত্যরত মেয়েটাকে মায়াবী অপ্সরীর মতোই স্নিগ্ধ লাগছে। আর সায়র? সে তো সেই তখন থেকেই হা করে তাকিয়ে দেখছে,তার গোধূলি বেলার অপ্সরীটাকে। অপ্সরীর অস্পষ্ট মুখশ্রী দেখেও সায়র চোখ বন্ধ করে বলতে পারে এটাই তার রাগীনি ।গ্রীষ্মের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পু’ড়তে থাকা জনমানকে একটু খানি সস্থি দিতে সন্ধ্যা

নেমেছে ধরনীতে। বাইরের উষ্ণ বাতাস এতোক্ষণে হিমেল হাওয়ায় পরিনত হয়েছে। চারিদিক এখন বেশ শীতল। শুধু মাত্র শীতল নয় ক্রীতিকের মস্তিষ্ক।
ওর মাথাটা গরম হয়ে আছে, সারাদিন অফিস শেষে যখন বাড়িতে ঢুকে অরুকে না পেলো, তখনই মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে ক্রীতিকের, বিগড়ানোর মেজাজের অ'গ্নিস্ফুলিঙ্গতে আরও খানিকটা জোয়ার দিতে অরুর মামি এসে জানায়, তাকে বাড়িতে রেখে আজমেরী শেখ তার দুই মেয়েকে নিয়ে অমিতকে দেখতে হসপিটালে গিয়েছেন, সদ্য হওয়া আত্নীয়তার সম্পর্কে আরও খানিকটা শখ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।সেই কথা শোনার পরে আর এক দন্ডও অপেক্ষা করেনি ক্রীতিক, গটগটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে বাড়ি থেকে। আর এখন হসপিটালের করিডোর ধরে বড়বড় পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে অমিতের কেভিনের দিকে। ক্লান্ত ঘামে ভেজা শরীর হাতরিয়ে টাইয়ের নট'টা ঢিলে করতে করতে মনেমনে ভাবছে,
অনেক হয়েছে আজ অরুকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই ছাড়বে ও।
ক্রীতিক যখন দু পকেটে হাত গুঁজে কেভিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, ঠিক তখনই অরুর সাথে চোখাচোখি হলো ওর। অরু ভেতরেই ছিল, হঠাৎ করে এভাবে ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে তরিঘরি করে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো ও।
অরু বাইরে বেরোনোর সাথে সাথে, ওর ব্যান্ডেজ করা হাতের কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরলো ক্রীতিক, অতঃপর রুষ্ট গলায় বললো,—- চল।
অরু ক্রীতিকের সাথে তাল না মিলিয়ে উল্টো হাতে টান দিয়ে বললো,

—-- আরেহ! কোথায় যাবো, মা আর আপা ভেতরে তো।
ক্রীতিক অ'গ্নিদৃষ্টিতে পেছনে তাকিয়ে বললো,
—-- সো হোয়াট?
ক্রীতিকের এমন আ'গুন ঝড়া নিস্প্রভ চাহনি দেখে অরু বুঝলো ক্রীতিক রে'গে আছে, তাই খুব একটা কথা না বাড়িয়ে শুষ্ক ঢোক গিলে বললো,
—-- না মানে, ওদেরকে অন্তত বলে তো আসি।
— দরকার নেই। গমগমে আওয়াজে কথাটা বলে আবারও অরুকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা দেয় ক্রীতিক। তবে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পর পরই সামনে এসে দাড়ায় অমিতের বাবা মা।
অমিতের বাবা মা মুরব্বি মানুষ, তার উপর নতুন আত্মীয়, সে হিসেবে তাদের সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু মাথা খারাপ ক্রীতিক সেসবের ধারে কাছেও গেলো, উল্টে চোখমুখে বিরক্তির ভাঁজ টেনে অমিতের বাবাকে বললো,
—-- কি হয়েছে? সামনে দাড়ালেন যে?
অমিতের বাবা সহসা হেঁসে বললেন,
—-- বাবা তুমি অনু অরুর ভাইয়া না?ক্রীতিক একঝলক অরুর মুখের দিকে চাইলো, যে এই মূহুর্তে চোখ দিয়ে হাজারো কাকুতি মিনতি করছে, ক্রীতিক যাতে উল্টো পাল্টা কিছু না বলে।
ক্রীতিক চোখ সরিয়ে নেয়, তারপর অমিতের বাবার দিকে তাকিয়ে অনুভূতি হীন গলায় বলে,
—-- হ্যা ভাইয়া, শুধুমাত্র অনুর ভাইয়া।
অমিতের বাবা এতো কিছু খেয়াল করলেন না, বরং হাসিমুখে বললেন,

—- তা বাবা তুমি কি বাসায় যাচ্ছো? আর অরুও কি তোমার সাথেই যাবে নাকি?
ক্রীতিক এবার গম্ভীর কন্ঠে বললো,
—- আমার বউ যেহেতু, আমার সাথেই তো যাবে, অন্য কারও সাথে নিশ্চয়ই নয়?ভালো থাকবেন আঙ্কেল আসছি। বাক্য শেষ করে ক্রীতিক হাটা ধরলে, অমিতের মা পিছু ডেকে একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে,
—- এখানে কিছু খাবার দাবার আছে বাবা, অরু যেহেতু চলেই যাচ্ছে, তাহলে তোমরা বরং এটা নিয়েই যাও।
মেজাজের মাত্রা তাপমাত্রার মতোই ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রীতিকের, তবুও ভেতরের উ'গ্রতাকে সামলে রেখে, প্যাকেট হাতে নিয়ে, ক্রীতিক ছোট করে বললো,
— ঠিক আছে।
তারপর আর এক মূহুর্ত ও দাঁড়ালো না, অরুকে টা'নতে টা'নতে নিয়ে গেলো সবার দৃষ্টি সীমার আড়ালে। বাড়িতে এসে ক্রীতিক সবার আগে খাবারের প্যাকেটটা ছু'ড়ে মা'রলো মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো হলরুমে ছড়িয়ে পরলো,ফলমূল সহ সুস্বাদু সব খাবার গুলো। ক্রীতিক এভাবে খাবার ছু'ড়ে ফেলেছে দেখে এবার অরুর ও বেশ রা'গ হলো। ও তৎক্ষনাৎ নিজের হাতটা ঝাড়ি মে'রে ক্রীতিকের থেকে ছাড়িয়ে বললো,
—- লাগছে আমার ছাড়ুন।
ক্রীতিক দ্বিগুণ শক্তিতে আবারও চেপে ধরলো অরুর হাত, তারপর কাঠিন্য গলায় বললো,
— লাগলে লাগুক, লাগার জন্যই তো ধরেছি।

কেঁ’টে যাওয়া হাতটা এভাবে বারবার চেপে ধরাতে ব্যথায় টনটন করছে ওর, কিন্তু ব্যথার চেয়েও বেশি এই মূহুর্তে বিরক্ত লাগছে অরুর।
অ’সভ্যতা, বে’য়াদবির একটা সীমা থাকে,ক্রীতিক আজ সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। শুধু শুধু সবার সামনে সিনক্রিয়েট করলো, আর এখন খাবার গুলো সব ফেলে দিলো। এলোমেলো খাবার গুলোর দিকে তাকিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠলো অরুর মস্তিষ্ক, ও সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে ক্রীতিকের হাতটা আবারও ঝটকা মে’রে ছাড়িয়ে দিয়ে তেঁতো গলায় বললো,—- আপনি একটা উ’ন্মাদ, সা’ইকো। সারাজীবন একা থেকে থেকে নিজে তো একরোখা, আর অসামাজিক হয়েছেনই এখন আবার আমাকেও আপনার মতো নি’র্দয় বানানোর পায়তারা করছেন।
ক্রীতিক অরুর পানে র’ক্তিম চাহনি নি’ক্ষেপ করে ওর চোয়াল টা দু আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরে বললো,
— কাকে কি বলছিস, বুঝে বলছিস? মেজাজ বিগড়ে আছে অরু, এক্ষুনি থাম নয়তো তোর শরীরে আজ মা’রের নয় অন্য কিছুর দা’গ বসাবো আমি।
অরু তেজ দেখিয়ে ক্রীতিকের হাত ছাড়িয়ে বললো,
—– যা বলেছি ঠিক বলেছি, কোনো স্বাভাবিক মানুষ এতোটা নি’র্দয় হতে পারে, আপনিই বলুন? আপনি যদি বদ্ধ উ’ন্মাদ নাই হবেন, তাহলে একটা অসুস্থ পা ভা’ঙা মানুষকে নিয়ে কিসের এতো সমস্যা আপনার?
একাতো যাইনি, মা আপার সাথে সম্মান রক্ষার্থে গিয়েছি। তারউপর মুরব্বি বয়জেষ্ঠদের ও যা খুশি তাই বলে এসেছেন,

কেন?—— আমার সামনে অমিতের হয়ে ওকালতি করা বন্ধ কর অরু, ভুলে যাসনা আমি তোর স্বামী, সেদিন আমার সামনে, আমার বাড়িতে অমিত তোর জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ভুলে গিয়েছিস?আর তুই কিনা আজ ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ করে সেই অমিতকে দেখতে চলে গেলি? হাউ ফা'কিং ডেয়ার ইউ অরু!
ক্রীতিকের ক'ঠিন ধমকে এবার একটু গলা খাদে নামিয়ে অরু বললো,
—- আমি আগেও বলেছি মা আর আপার সাথে গিয়েছি। তাছাড়া অমিত ভাই ভালো একজন মানুষ, ওনার পরিবার কেন এসব বলেছে তা জানিনা, আমার জানা মতে উনি আমাকে বোনের নজরে দেখেন।
আসলে সমস্যাটা আপনার মধ্যে , একারোখা জীবন কাটাতে কাটাতে সমাজ, নিয়ম কানুন সবকিছু ভুলতে বসেছেন। হয়েছেন চড়ম অ'সভ্য।অরু কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে থেকে ওর ঘাড়টা চে'পে ধরে নিজের মুখের কাছে নিয়ে এলো ক্রীতিক,অতঃপর থমথমে ব্যথাতুর গলায় বললো,
—— ভুলে যাসনা আমার একরোখা হওয়ার পেছনে দায়ী কিন্তু একমাত্র তুই, তোর জন্যই এই বাড়ি, কাছের মানুষ, দলীয় পদ সব ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। আর আজ তুই আমার দিকেই আঙুল তুললি, ইজন্ট ইট ফেইট?
আর কি যেন বললি,মা আর আপা রাইট? তোর কাছে যদি মা আর আপা এতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়, ওদের তুলনায় আমার অস্তিত্ব যদি এতোটাই ম্লান হয়, তবে চাইনা আমার তোকে।

কথাটা বলে অরুকে সজোরে ধা’ক্কা মে’রে ডিভানের উপর ফেলে দিলো ক্রীতিক।
তারপর আবারও কঠিন কিন্তু মসৃণ গলায় বললো,—- আমি যেদিন পাশে না থাকবো সেদিন তুই বুঝবি পৃথিবীটা আদতে কতটা সা’র্থপর আর কতটা জ’ঘন্য। আমি তোকে ঠিক কিভাবে খারাপ দুনিয়া থেকে বুকে আগলে আড়াল করে রেখেছি, তখন তুই হারে হারে টের পাবি।
যদিও বা তখন তোর ক’ষ্ট দূর করার জন্য আমি আদৌও এক্সিস্ট করবো কিনা সন্দেহ ।
কিছু তিক্ত অথচ চরম সত্য কথা বলে, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে যায় ক্রীতিক।
ক্রীতিকের শেষ কথাগুলো এবার আর অরুর মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে গিয়ে লাগলো। আচমকা মনে হলো হৃদয়টাকে ন’খড় হাতে খামচে ধরেছে কেউ, ক্রীতিককে ছাড়া পৃথিবী এও সম্ভব? অরু ভাবতে পারেনা।
ভাবতে চায়ও না, নিজের করা প্রকট ভুলটাকে শুধরে নিতে তৎক্ষনাৎ ক্রীতিকের পেছন পেছন উঠে যায় সিঁড়ি ভে’ঙে।
অতঃপর করিডোর পেরিয়ে সোজা ক্রীতিকের রুমে, কেবল মাত্র এই আশায় যে, ক্রীতিক হয়তো ওকে ক্ষমা করলেও করতে পারে,কিন্তু তেমন কিছুই হয়না। অরু রুমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে, তীব্র গর্জনে,—- জাস্ট গেট লস্ট।
বলে হাত ধরে অরুকে রুমের বাইরে ছুঁ’ড়ে মা’রে ক্রীতিক।
তারপর ধাপ করে লাগিয়ে দেয় দরজাটা।

অরু কাঁদতে কাঁদতে দরজার বাইরেই হাঁটু ভে'ঙে বসে পরলো।
কিছু তিক্ত সত্যি কথা যে মানুষের হৃদয়কে এই ভাবে নাড়িয়ে দিতে পারে, তা বোধ হয় কা"ন্নারত অরুকে না দেখলে বোঝা যেত না মোটেই। অরু কাঁদছে তখন থেকে, তা দেখে অরুর মামি জাহানারা এগিয়ে এসে কিছুটা পৈচাশিক হাসি দিয়ে বললো,
—— ঠিক হয়েছে একদম, টাকা হা'তানোর লোভে আরও বিয়ে কর বড়লোকের ছেলেকে। একদিন, দুদিন, তার পর ঠিকই মজা নিয়ে পথে ছেড়ে দেবে। মিলিয়ে নিস আমার কথা।
অরুর ক'ষ্টে মামির বোধ হয় বেশ আনন্দই হলো, তবে অরুর আপাতত সে সবে মন নেই। ও নিজের দু হাঁটুতে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়িবিড়ালো,—- জায়ান ক্রীতিক তুমি কি জানো? তুমি সেই গু"প্তঘা'তক যে খু'ন করে একটা পরাসৈন্য তৈরী করার উদ্দেশ্যে, আর আমি হলাম সেই ধ'র্মা'ন্ধ যে ওই গু'প্তঘা'তকের ছু'রির ইশারাতে নাচি।
তুমি আমার জীবনে এমন এক ভালোবাসার গোলকধাঁধা, যার থেকে হাজার বছর ছুটলেও আর পরিত্রান নেই আমার। না নেই..পরন্ত বিকেলে মিয়িয়ে যাওয়া সূর্য কীরণ তীরের ফলার মতোই তীর্যক আকার ধারন করেছে। সেই তীর্যক সূর্য কীরণের সোনালী আলোক রশ্মিটুকু আঁচড়ে পরছে নীলিমাদের দোতলা ভবনের ছাঁদে। যেখানে এই মূহুর্তে নির্দিধায় নৃত্য করতে সয়ং নীলিমা।নাচে ওর বাধ্যবাধকতা নেই, শখ করেই নাচ শেখা। যেমনটা চারুকলায় গিয়ে আঁকাআকির ক্ষেত্রে। আব্বাজানের একমাত্র মেয়ে হওয়ায়,মেয়ের কোনোরূপ শখ আহ্লাদের ত্রুটি রাখেন না নীলিমার বাবা তাইয়েব জামান।

ছোটবেলা থেকেই বাবার আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে নীলিমা ও হয়েছে একরোখা আর বড্ড বেয়ারা। যাকে দেবে তো হৃদয় উজাড় করে দেবে, আর যাকে দেবে না তাকে একরত্তি ও না। পছন্দ অপছন্দের ক্ষেত্রেও একই স্বভাব নীলিমার। তবে বর্তমানে ওর অপছন্দের শীর্ষে রয়েছে সায়র, এক কথায় ক্রীতিক কুঞ্জের সেই বিদেশি বাঁদর টা। অতো নাম মনে রাখার সময় আছে নাকি নীলিমার?
অপছন্দের শীর্ষ তালিকার মানুষটার কথা ভাবতেই গিয়েই বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে গেলো নীলিমার, মনমনে ভাবলো,—-মানুষ এতোটা বি'রক্তিকর আর অ'সহ্য কি করে হতে পারে? কি করে?
সায়রের কথা ভাবতে গিয়ে নীলিমা যখন বারবার নাচের মূদ্রায় ভুল করছিল আর চোখ মুখ খিঁচিয়ে সায়রের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছিল, ঠিক তখনই বাড়ির সামনে স্ট্যান্ড করা বাইক দেখে চোখ আটকে গেলো নীলিমার।
ও নাচ বাদ দিয়ে এগিয়ে এসে ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে দাড়াতেই দেখতে পেলো সায়র দাঁড়িয়ে আছে। সায়রকে দেখে নীলিমা কটমটিয়ে বললো,
— এখন বুঝেছি, শনি তাকিয়ে ছিল বলেই তখন বারবার ভুল করছিলাম।
আপাতত ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাত নাড়ছে সায়র, আর সায়রের থেকে কিছুটা দূরে অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকছে অর্ণব। নীলিমাকে উঁকি দিতে দেখেই সায়র নিচ থেকে কথা ছুড়লো,— উপরে আসবো কি?

নীলিমাদের ছোট্ট বাড়ি, ছাঁদে আসার সিঁড়ি টাও বাইরের দিকে, যে কেউ চাইলেই ফট করে উঠে আসতে পারবে,আপাতত সেসব কথা বাদ, এই বাঁদরটা কি করে ওর ঠিকানা খুঁজে পেলো সেটাই ভাবনার মোক্ষম বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে নীলিমা মস্তিষ্কে।
নীলিমাকে নিস্প্রভ চোখে ধ্যান মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সায়র আর অনুমতির অপেক্ষা করলো না, তরতর করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এলো নীলিমাদের ছাঁদে।
সায়র উপরে এসে নীলিমার চুলে টোকা মা'রতেই ভ্রম ছুটে গেলো নীলিমার, ও তৎক্ষনাৎ সায়রের দিকে অ'গ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,—- ব'দমাশ পুরুষ, আপনি এখানে কি করছেন? আমাদের বাসার ঠিকানাই বা খুঁজে পেলেন কি করে?
সায়র একটা চমৎকার হাসি দিয়ে বললো,
— কি যে বলোনা, আমার না হওয়া শশুর বাড়ি আর আমি খুঁজে পাবোনা?
সায়রের কথায় নীলিমার চোখ কপালে, ও হতবাক হয়ে বললো,
—- আশ্চর্য, কে আপনার শশুর?
— কেন, তোমার আব্বাজান।
নীলিমা এবার মেকি হাসলো, সায়রের সাথে তাল মিলিয়ে বললো,
— ওহ তাই বুঝি? আমার আব্বাজান বুঝি আপনার শশুর? তা একটু ডেকে পাঠাই, বলি তার একমাত্র জামাই কে একটুখানি জামাই আদর করে যেতে?
সায়র নিজের শার্টের কলারটা পেছনে ঠেলে বললো,— হ্যা হ্যা বলো। আই এপ্রেসিয়েট।

সায়রের কথায় হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে নীলিমা তৎক্ষনাৎ গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে,
— আব্বাজান, হুনতাছেন?
তৎক্ষনাৎ নিচ তলা থেকে এক গুরুগম্ভীর কর্কষ আওয়াজ ভেসে এলো,
—- কিতা অইছে আম্মাজান, ডাক পারতাছেন ক্যালা?
নীলিমা আবারও চেচিয়ে বলে ওঠে,
—- ছাঁদে আইয়েন, দেইখা যান বালা, আমগো ছাঁদে বিদেশি বাঁন্দর লাফাইয়াছে।
—- কি কইতাছেন আম্মাজান এসব? লাঠি নিয়া আমুনি?
—- না আব্বাজান, বাঁশ নিয়া আহেন, আছোলা বাঁশ।
নীলিমার কথায় সায়র হতবিহ্বল, হতভম্ব হয়ে মুখ হা করে দাঁড়িয়ে আছে, শেষমেশ হবু শশুরের কাছ থেকে কিনা আছোলা বাঁশ খাওয়ার হু'মকি এলো? এ কেমন দস্যি মেয়ে?
নীলিমা মিটিমিটি হেসে আবারও গলা উঁচিয়ে কিছু বলবে তার আগেই তরিৎ বেগে এগিয়ে এসে আলতো হাতে ওর মুখটা চেঁপে ধরলো সায়র। নীলিমার ডাগর ডাগর কৌতহলী চোখের দিকে তাকিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,—- এ্যাই মেয়ে, তুমিকি সত্যি সত্যি আমাকে মা'র খাওয়ানোর প্ল্যান করছো নাকি?
নীলিমা সায়রের হাতের মধ্যে থেকেই বোকা বোকা চোখে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো।
নীলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষনাৎ ফিক করে হেঁসে দিলো সায়র, হাসতে হাসতে বললো,
—- তুমি বুঝি বাড়িতে এভাবে কথা বলো? ইটস সো ফানি ইয়ার।

সায়রের কথা শুনে নীলিমার ম্লান হয়ে যাওয়া উ'গ্র মেজাজ টা আবারও তরতরিয়ে মাথায় চড়ে উঠলো, ও সায়রকে ধা'ক্কা দিয়ে সরিয়ে বললো,
—-- ভাষা নিয়ে মশকরা করলে সত্যি সত্যি আজ আব্বাজানকে দিয়ে আপনার শশুর বাড়ি আসার শখ মিটিয়ে দেবো, বলে দিলাম।
সায়র চোখ ছোট ছোট করে সন্দিহান গলায় বলে,—-- তারমানে তুমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে হলেও সীকার করছো যে আমি আমার হবু শশুর বাড়িতে এসে পরেছি। তাইতো?
নীলিমা কটমটিয়ে বললো,
—-- আপনি চাইছেন টা কি বলুন তো?
সায়র দুষ্ট হেসে বললো,
— তেমন কিছু নয়, আপাতত একটু জামাই আদর খেতে চাচ্ছি ,খাওয়াবে নাকি?
নীলিমা রাগী নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
—-- একটু দাড়ান খাওয়াচ্ছি আপনাকে জামাই আদর, পরক্ষনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ও,
—— আব্বাজান, হুনতাছেন!
সায়র বোধ হয় কুক্ষণেও আশা করেনি যে, নীলিমা আবারও চেঁচাবে। হঠাৎ এভাবে চেঁচিয়ে ওঠাতে সায়র নিজেও ভড়কে গিয়েছে,
ওদিকে ভেতরের সিঁড়ি থেকে ধাপ ধাপ আওয়াজ ভেসে আসছে, কেউ একজন এগিয়ে আসতে আসতে বলছে,
— আইতাছি আম্মা, বাঁশ খান জোগাড় করতে দেরি অয়া গেলোগা।

এ কথা শুনে সায়র চোখ বড়বড় করে উপরওয়ালার নাম জপে বলে উঠলো ,—- হে খোদা এ কাদের পাল্লায় পরলাম আমি? যেমন মেয়ে তার তেমন বাপ, মেয়ে বাঁশ জোগাড় করতে বললো, অমনি বাপ বাঁশ নিয়ে হাজির?
তাইয়েব জামান সিঁড়ি ঘরের কাছাকাছি চলে আসাতে নীলিমা সায়রের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললো,
— এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান’না। আব্বা দেখে ফেললে খবর আছে।
সায়র নিচে যেতে যেতে অভিমানী সুরে বললো,
—- আব্বাজানকে বাঁশ দিতে ডেকে এনে এখন আর দরদ দেখাতে হবে না। আসছি বায়।সন্ধ্যা থেকেই তীব্র বর্ষন। বৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে মুখরিত চারিপাশ। রৌদ্রের খাঁ খাঁ বিকেলের ইতি টেনে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে ,
এ বুঝি জৈষ্ঠ্যের পূর্বাভাস?
পুরো ঢাকা শহরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছে, যার দরুন, চারিদিক ধোঁয়াসা আর মানব শূন। সেই শেষ বিকেল থেকে বাংলা একাডেমির গেইটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অরু, অথচ এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে জলোচ্ছ্বাসিত রাত।
অনুর বিয়ের কত কত আয়োজন, মন খারাপের পশরা, সবকিছুকে একপাশে ঠেলে সকাল সকাল বাংলা একাডেমিতে এসেছিল অরু। এর কারণ, আজকেই ওর প্রথম লেখা সাবমিট করার শেষ দিন ছিল। পুরো উপন্যাস নয়,একাংশ মাত্র।ক্রীতিকের হাজার মাইল দূরত্ব যখন অরুকে খুব পো’ড়াতো, একাকীত্বের য’ন্ত্রনায় ডু’বিয়ে

দিতো, সে'সময়টাতেই এক সমুদ্র য'ন্ত্রনায় হাবুডুবু খেতে খেতে একাডেমির সবার উৎসাহে লেখা শুরু করেছিল অরু।
পুরোপুরি শেষ না হলেও যেটুকু লেখা হয়েছে সেটাই আজ জমা দিতে আসা। প্রতীক্ষা একটাই প্রথম বার না হলেও কয়েকবার চেষ্টা করলে প্রকাশনীদের নজরে আসলেও তো আসতে পারে।
কিন্তু দিন শেষে কি হলো? বৃষ্টির মাঝে পুরো দস্তুর আটকে পরলো অরু। শেষ বিকেলে যখন ঝুম বৃষ্টি নামলো তখন রিকশা কিংবা গাড়ি নিয়ে একে একে সবাই একাডেমি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অরুর বুদ্ধি বরাবরই কম, কিংবা বেশি বলেই ,বারবার ভুল করে বসে থাকে মেয়েটা, আজও সেটাই হলো, ঝুম বৃষ্টির মাঝে অরু আর রিকশা নিলোনা, মনেমনে ভাবলো,—- বৈশাখের ঝড়, একটু বাদেই থেমে যাবে নিশ্চয়ই। কষ্ট করে খানিকক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলে, বৃষ্টি কমার সাথে সাথে রিকশা সিএনজি সব হাতের কাছে পাওয়া যাবে। এখন গায়ে বৃষ্টি লাগিয়ে কি লাভ? শুধু শুধু।
কিন্তু বলেনা, অভাগা যেদিকে যায়, দূ-কুল শুকিয়ে যায়, অরুর ক্ষেত্রেও সেটাই হলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে নিশুতি রাতে ছেয়ে গেলো ধরনী,
তবুও বৃষ্টি তো কমলোই না উল্টে ঝড়ের তান্ডবে চারিদিক লন্ডভন্ড।
একাডেমির গেইট বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষন আগে। চারিদিকে মানুষ তো দূরে থাক একটা নেড়ি কুকুরের ও আওয়াজ নেই। রাস্তায় অবশিষ্ট সোডিয়ামের নিয়ন আলোটুকু তীর্যক আলো ছড়াচ্ছে চারিপাশে, তবে ঝড়ের তান্ডবে সেটাও ক্ষীণ মনে হচ্ছে।প্রথমে ঝুম বৃষ্টি আর এখন দা'নবীয় ঝড়, বিদ্যুৎ এর

ঝলকানিতে ক্ষনে ক্ষনে গ'র্জে উঠছে আকাশ। তারউপর ঘূ'র্নিবায়ু। অরুর মনে হচ্ছে এই দূ'র্যোগের মাঝে আশেপাশের জড়বস্তুর মতোই ও নিজেও উড়ে গিয়ে অন্য কোথাও ছি'টকে পড়বে। কারণ বাতাসের তান্ডবে অরুর রোগা পাতলা তনু শরীরটা ভে'ঙে চু'ড়ে যাওয়ার উপক্রম।
ঝড়ের সাথে তাল মিলিয়ে বারংবার গগন কাঁপানো বিকট ব'জ্রপাতে কেঁপে উঠছে অরু। ঝড়বৃষ্টি যাও সহনীয় ছিল। কিন্তু এই ব'জ্রপাতের আওয়াজ অরুর কলিজায় গিয়ে লাগছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ওর মাথার উপরেই এসে পরলো বুঝি ভয়'ঙ্কর বিদ্যুৎের হল্কাখানি।
এই ঝড়ের মধ্যে একা একা এমন নিস্তব্ধ পরিবেশে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে তীব্র ভ'য়ে আর আ'তঙ্কে অরুর গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকের কাছটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে, মাথাটা ঝিমুনি দিয়ে উঠছে ক্রমশ।
গেইটের সামান্য সরু ছাউনি ওকে বৃষ্টি কিংবা বজ্রপাত কোনোকিছুর হাত থেকেই রক্ষা করতে পারছে না। প্রকৃতির এমন দান'বীয় বি'ধ্বংসী রুপ দেখে অকস্মাৎ বসে পরে কানে দু'হাত দিয়ে শব্দ করে কেঁ'দে উঠলো অরু। বসার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীব্র জলো'চ্ছ্বাসের ছাঁট এসে আঁচড়ে পরলো ওর চোখেমুখে, এমতাবস্থায় না চাইতেও আ'তঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠলো অরু,—- মা, ভয় করছে!!
চারিদিকে প্র'লয়ঙ্কারী ঝড়ের তান্ডব। না চাইতেও ক্রীতিকের চেহারাটা বারবার ভেসে উঠছে অরুর মানস্পটে। অথচ অরু জানে ক্রীতিক যেই পরিমাণ রে'গে আছে, আজ ভ'য় পাওয়া তো দূরে

থাক, অরু ম'রে গেলেও ক্রীতিক নিজের জিদ খুয়িয়ে ওকে নিতে আসবে না, কখনোই না।
ক্রীতিক যদি অরুর খোজ করতো কিংবা অরুর জন্য কোনোরূপ চিন্তাই হতো ওর মনে, তাহলে তো যখন ঝড় শুরু হলো তখনই নিতে আসতো, এতো দেরী করতো না নিশ্চয়ই?
অরু বারবার ভুল প্রমানিত হয়, মিথ্যে আশায় বুক বাধে,মানুষটা ওর উপর রেগে আছে যেনেও তার পথ চেয়ে বসেছিল, এবার হলোতো? ঝ'ড়বৃষ্টির তা'ন্ডবে ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে গেলো অথচ অরুকে নিতে কেউ এলোনা, কেউ না।
এই পর্যায়ে এসে অরুর মনে হচ্ছে ও আসলেই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। ক্রীতিকের জীবনে তো অন্তত নয়। কিছু অযাচিত ভাবনায় পরতে পরতে আকাশের প্র'কান্ড গ'র্জনে আবারও কম্পিত কন্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলো অরু,—-আ'মা ভয় করছে!
চিৎকার দেওয়ার পরপরই গা ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো অরু, কাঁদতে কাঁদতে বললো,
—- আমি বাড়ি যাবো, আমি মায়ের কাছে যাবো,আপার কাছে যাবো, কোথায় তুমি জায়ান ক্রীতিক? এই বিদ্যুৎের আলোতে আমার খুব ভ'য় করছে।
আবারও মুখের উপর জলো'চ্ছ্বাসের ছাট পরার সঙ্গে সঙ্গে আহাজারী বন্ধ হয়ে গেলো অরুর। মনে হচ্ছে চারিদিকের শ'ত্রুরদল ঘিরে রেখে আছে ওকে, অরু একটা টু শব্দ করলে আবারও ওকে মা'রতে এগিয়ে আসবে ওরা। সেই ভেবেই ভয়ের চোটে শুকনো ঢোক গিলে চুপসে গেলো মেয়েটা, অরুর এখন সন্দেহ হচ্ছে কাল সকাল অবধি আদৌও ও বেঁচে থাকবে তো?

এটাই ছিল মূর্চ্ছা যাওয়ার আগে অরুর শেষ ভাবনা, কারন অরুর এখন মনে হচ্ছে ও চেতনা হারাবে খুব শীঘ্রই।
তবে হারালো না, গল্পের পেছনেও যেমন গল্প থাকে, তেমনই অরুর ছোট্ট মস্তিষ্কের ভাবনা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, ক্রীতিকের ভাবনা সেখান থেকেই শুরু। অরুর আধোও আধোও চোখ জোড়া শেষবারের মতোন যখন চারিদিকে কাউকে খুজে না পেয়ে সর্বশান্ত, ঠিক সেই সময় দিশেহারা কন্ঠে পেছন থেকে চিৎকার দিয়ে ওকে ডেকে উঠলো কেউ,—- অরুউউউ!
চেনা পরিচিত আন্তরিকতা জড়ানো পুরুষালী কন্ঠস্বরটা কর্ণগহ্বরে পৌঁছাতেই অকস্মাৎ পেছনে চাইলো অরু, ক্ষনিকের বিদ্যুৎ হল্কানির আলোয় দেখতে পেলো ঝড়ের মাঝে ফুল ফর্মাল গেটাপে বৃষ্টিতে ভিজে জুবুথুবু হয়ে ওর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওর স্বামী, ওর ব্যক্তিগত পুরুষ, ওর ব'দমেজাজি লোকটা, ওর জায়ান ক্রীতিক।
ক্রীতিক এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু অরু একনজর ক্রীতিকের মুখশ্রী পরখ করেই,মাথাটা নুয়িয়ে তীব্র অভিমানে খুনখুনিয়ে বাচ্চাদের মতো কেঁদে উঠলো, ওর কা'ন্নারা ক্রীতিককে স্পষ্ট জানান দিচ্ছে,
—- আরও আগে কেন এলেনা? তুমি জানো আমি কতোটা ভ'য় পেয়েছি?
ক্রীতিকের ঠান্ডার ধাঁচ আছে, একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়, তার উপর ঝড়বৃষ্টির মাঝে শাপলা চত্বরের জ্যামে পরে গাড়িটা ওখানেই ফেলে রেখে হেটে হেঁটে এতোদূর এসেছে। এখন আবার তার ছোট্ট বউটা অভিমান করে বসে আছে। তাই কয়েকদফা হাঁচি দিয়ে, অরুর কাছে এগিয়ে গেলো ক্রীতিক। প্রথমে অরুর ব্যাগটা নিজের

গলায় ঝোলালো, তারপর একটানে অরুকেও কোলে তুলে নিয়ে হাঁটা দিলো ঝড়ের মাঝেই।
এখনো আগের মতোই ঝড় হচ্ছে, গগন কাঁপানো বজ্রপাতে কম্পিত হচ্ছে ধরনী, অথচ অরু একটুও ভ'য় পাচ্ছে না কি আশ্চর্য!ভয়ের বদলে এখন ওর মাথায় যেটা ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো কেবলই অভিমান, অভিমানের তোপে হৃদয়টা শক্ত হয়ে আছে ওর, অগত্যাই ক্রীতিকের কোলে বসে সেটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটালো অরু, নিজের ছোট ছোট কোমল হাতে ওর চওড়া বুকে ধা'ক্কা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে ওঠে ,
—- ছেড়ে দিন যাবোনা আপনার সাথে। আমি একাই যেতে পারবো।
ক্রীতিক নিজের হাঁচি সংবরন করে বললো,
—- বেইবি, দেখ আমার ঠান্ডা লেগে গিয়েছে, যা বলার বাড়িতে গিয়ে বলিস, আমাকে মা'রিস তখন, আমি কিচ্ছু বলবো না, চুপচাপ সহ্য করবো । কিন্তু এখন নামিয়ে তোর রা'গ ভাঙাতে পারবো না, অলরেডি অনেক ভিজেছি। আমার নি'উমোনিয়া হলে তখন কিন্তু তুইই সবথেকে বেশি কা'ন্নাকাটি করবি। ক্রীতিকের ইমোশনাল ব্লাকমেইলে অরু চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়, অগত্যাই ক্রীতিকের গলা জড়িয়ে ধরে চুপচাপ ফোপাঁতে থাকে অরু।
অতঃপর হেটে মেইন রাস্তায় গিয়ে তবেই একটা সিএনজির দেখা পায় ওরা, সেটাকে বলে কয়ে ডাবল ভাড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই ক্রীতিক কুঞ্জের রাস্তা ধরানো হলো। ক্রীতিক একা থাকলে হয়তো এতো কসরত করতে যেতোনা, মূলত অরুর সেইফটির জন্যই এতো খাটুনি। রুমে এসে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই অরু

এক ছুটে বারান্দায় চলে যায়। পুরো রুম অন্ধকারে ছেয়ে আছে, বাইরে তীব্র বর্ষন। অরু, ক্রীতিক দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। অথচ অরু রাগের চোটে আবারও ছুটে বেলকনিতে চলে গেলো। ক্রীতিক আলো জ্বালানোর প্রয়োজন বোধ করলো না।
বরং দ্রুত হাতে দরজা লক করে, অরুর তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে এগিয়ে গেলো বারান্দার কাছে। অরু বৃষ্টির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পরনে ভেজা টপস আর স্কার্ট। ক্রীতিকের ইন করা সফেদ শার্টটাও ভিজে শরীরের সাথে লেপ্টে রয়েছে। ও সে'সবে পরোয়া করলো না,উল্টে এগিয়ে গিয়ে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পেছন দিক থেকে অরুর ভেজা চুলে ক্রমাগত চুমু খেতে খেতে কাতর গলায় বললো,—- আ'ম সরি হার্টবিট, ইট'স মাই ফল্ট, আর কখনো এমন হবে না, কখনো তোমাকে এতোটা ক'ষ্ট দেবো না, কালকের জন্য আ'ম রিয়েলি সরি। আর আজ আমি বুঝিনি তুমি এতোটা ভ'য় পাবে, তাহলে আর জ্যামে বসে সময় নষ্ট করতাম না তখনই হাটা ধরতাম।
একান্ত ঘনিষ্ঠ মূহুর্তে ক্রীতিক অরুকে তুমি করে ডাকছে, তারউপর এভাবে কাকুতি মিনতি করে সরি বলছে। অরু কল্পনাতেও হয়তো ক্রীতিকের এই রুপ আবিষ্কার করেনি কোনোদিন, অথচ আজকে এসব অরুর চোখের সামনে ঘটছে। ভালোবাসা মানুষকে কতটা দূর্বল আর কতটা অপারগ বানিয়ে দেয় তার জলজ্যান্ত প্রমান জায়ান ক্রীতিক।
কাল নিজেই রাগ করলো আর আজ নিজেই সরি চাচ্ছে। ক্রীতিকের এহেন ভালোবাসায় মাখামাখি আওয়াজে নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না অরু।কোনোরুপ ছলচা'তুরী না করেই ক্রীতিকের দিকে

ঘুরে ওর চওড়া ঢেউ খেলানো বুকে মাথা এলিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো ও। কাঁদতে কাঁদতে ক্রীতিকের ভেজা শার্টটা খা'মচে ধরে বললো,
—- আমি ভেবেছিলাম আপনি আজ আর আসবেন না, এই ঝড়ের মাঝেই ম'রে পরে থাকবো আমি।
ক্রীতিক গ্রীবাটা নিচে নামিয়ে একহাতে অরুর ভেজা চুল গুলো কানে গুঁজে দিতে দিতে হাস্কিটোনে বললো,
— না এসে কি করে থাকতাম?আমার আত্নাটা যে তোর মাঝে। হাজার বার বিচ্ছেদের পরেও উপসংহারে আমি তোকেই চাই অরু, শুধু তোকে। নো ওয়ান এলস।
অরু আবারও ঠোঁট কামড়ে কেঁদে ওঠে, কাঁদতে কাঁদতে শুধায়,
—- কি আছে আমার মাঝে?কেন এতো ভালোবাসা?
ক্রীতিক ঠোঁট উল্টে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,
—- জানিনা তো, তবে হ্যা, একটা জিনিস আছে যা আমার এখনই চাই, রাইট নাও।
মূহুর্তেই ক্রীতিকের কথার ধরন পাল্টে গিয়েছে, কন্ঠে ভর কাছাকাছি আসার প্রখর আকুতি, তা অরু স্পষ্ট টের পেয়েছে। টের পাওয়ার দরুন, ক্রীতিকের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে কয়েক কদম দূরে সরে গেলো অরু।
অরু দূরে সরে যাওয়াতে ক্রীতিক খানিকটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন ছুড়লো,—- কি হয়েছে?
অরু মুখ কাঁচুমাচু করে বললো,
—- আপনাকে ভ'য় করছে, সেবারের মতো যদি আমাকে হ্যা'ন্ডকাফ্…..

অরুর কথা শেষ হওয়ার আগেই ওর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের কাছে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো ক্রীতিক, অতঃপর ওর লম্বা চুলগুলো সরিয়ে আলতো হাতে অরুর ওড়নাটা টেনে খুলতে খুলতে বললো,

—– এখানে হ্যা’ন্ডকাফ্ কোথায় পাবো হুম? শুধু একটু কথা শুনবি তাহলেই হবে।

অরু আবারও ক্রীতিকের থেকে সরে তারাহুরো পায়ে বেতের সোফায় গিয়ে বসে পরে। অরুর কান্ডে এবার বিরক্ত হয়ে গেলো ক্রীতিক, কিছুটা ধমকে উঠে বললো,—– কি হয়েছে, রা’গাচ্ছিস কেন আমাকে?

অরু অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্রীতিকের পানে, ওর ঠোঁট জুগল তিরতিরিয়ে কাঁপছে। চোখের কোটর নতুন উদ্যমে ভিজে উঠেছে অশ্রুজলে। এমন একটা মূহুর্তে অরুকে কাঁদতে দেখে ক্রীতিক এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসে, অরুকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে গভীর গলায় শুধালো,

—– আমার টাচ খারাপ লাগছে? চলে যাবো আমি?

অরু মাথা নুইয়ে না সূচক মাথা নাড়ালো।

ক্রীতিক বললো,—– তাহলে কাঁদছিস কেন? হোয়াই?

অরু এবার মুখ খুললো, ঠোঁট ফুলিয়ে বললো,

—– সবাই বলে আমি শুকিয়ে গিয়েছি, আগের মতো সৌন্দর্য নেই আমার। ভয় হচ্ছে এখন আপনিও যদি আমাকে অসুন্দর আবিষ্কার করেন, আমার উপর আপনার অনীহা চলে আসে তখন?

ক্রীতিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো,এই মেয়ে কেন তার অবসেশনটা বুঝতে পারেনা কে জানে? অরু সুন্দর, অসুন্দর, শুকিয়ে গেলো না মোটা

হলো, তা নিয়ে ক্রীতিকের বিন্দু মাত্র মাথা ব্যথা নেই। তার চেয়েও বড় কথা সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা তো দূরে থাক, অন্য মেয়েদের দিকে ওই চোখে তাকানোর মতোও ধৈর্য নেই ক্রীতিকের, কি করেইবা থাকবে? এক অরুকে দেখতে দেখতেই তো ওর জীবন পার।

ক্রীতিক চুপচাপ বসে আছে দেখে অরু নাক টেনে পেছনে তাকিয়ে শুধালো,—- রাগ করেছেন?

ক্রীতিক হ্যা না কিছুই বলেনা,কোনোরূপ ও'য়ার্নিং ছাড়াই একটানে অরুর সম্ভ্রমটুকু খুলে ছু'ড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে, সাথে নিজের শার্টটাও, তারপর ওকে কোলে নিয়ে বেডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে,

—- আজ আমিও দেখবো কি কমতি আছে তোর মাঝে, যা আমাকে উ'ন্মাদ করে দিতে ব্যর্থ। জায়ান ক্রীতিক যদি তোর সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে তোর মাঝে ডুব দেওয়ার জন্য একবার উ'ন্মাদ হয়ে পরে,তবে পৃথিবীর সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে তুই তুলনাহীন বেইবি। আমাকে যতদিন এভাবে উ'ন্মাদ করতে পারবি, ঠিক ততোদিন তুই অতুলনীয় সৌন্দর্যে আবৃত থাকবি। আর বারবার সেই সৌন্দর্যের সবটুকু পরম আবেশে আহরণ করবো আমি, শুধুই আমি। ইউ ক্যান মার্ক মাই ওয়ার্ড।

ক্রীতিকের এতো ভারী ভারী কথা বোঝার সাধ্যি নেই অরুর। আপাতত ও এসব বোঝার অবস্থাতেও নেই। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া মিষ্টি য'ন্ত্রনায় এলোমেলো অরু, সেই সাথে পরিপূর্ণ ও। বর্ষনের শেষ রাতে অরুর চোখের কার্নিশ বেয়ে আবারও গড়িয়ে পরলো কয়েকফোঁটা তপ্ত নোনাজল, তবে এই জলে দুঃখ ছিলোনা,

ছিল একরাশ ভ'য়াভহ পূর্ণতা। বৈশাখী ঝড়ের তান্ডব শেষে আজ সকাল সকালই সূর্যি মামার দেখা মিললো পূবের আকাশে। দক্ষিণের জানালাটা হাট করে খুলে রাখায় সূর্যের আলোয় ফকফক করছে চারিপাশ। তীক্ষ্ণ আলোতে খুব সকালেই ঘুম ছুটে গেলো অরুর। ঘুম ছুটে যাওয়ায় কিছুটা আড়মোড়া ভেঙে চারিদিকে চোখ ঘুরাতেই ও নিজেকে আবিষ্কার করলো ক্রীতিকের শরীরের নিচে।
ক্রীতিক উপুর হয়ে অরুর বুকে মাথা রেখে,দু-হাতে অরুর কোমড় জড়িয়ে ধরে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। অরু ঘুমু ঘুমু চোখে লাজুক হেসে খানিকক্ষণ ক্রীতিকের সিল্কি চুলের ভাঁজে হাত বোলালো, তারপর আস্তে করে রয়ে সয়ে উঠে গেলো বিছানা থেকে। শরীরটা ব্য'থায় টনটন করছে, মনে হচ্ছে অতি শীঘ্রই জ্বর আসবে, অরু সেসব ব্যথাকে পাত্তা দিলোনা। বিশাল হাই তুলে, খাট থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো ড্রেসিন টেবিলের সামনে। মেঝেতে এখনো ওদের ভেজা জামা কাপড় গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অরু সেদিকে একনজর পরখ করে, চোখ ঘুরিয়ে আয়নায় তাকালো, ওর পড়নে ক্রীতিকের গ্রে রঙের ওভার সাইজ টিশার্ট।
কাল গভীর রাতে এলিসাকে কল দিয়ে নিজের ক্লজেট থেকে কিছু জামা কাপড় আনিয়েছিল ক্রীতিক। অরু আবার তাতেও ভাগ বসিয়েছে, ট্রাউজারটা ক্রীতিককে দিলেও টিশার্ট টা নিজেই পরে নিয়েছে। আর এখন সেটাকে নাকের কাছে নিয়ে বারবার নাক টেনে সুঘ্রাণ নিচ্ছে, ওর পছন্দের স্যান্ডাল উড পারফিউমের মন মাতানো সুঘ্রাণ।
—- কিসের ঘ্রান নিচ্ছিস এভাবে?

ক্রীতিকের ঘুমন্ত হাস্কিস্বরে লাফিয়ে উঠলো অরু। চকিতে পেছনে চেয়ে দেখলো হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে ক্রীতিক। অরু নিজের কান্ড এড়াতে এগিয়ে গিয়ে নিজের কালসিটে কলার বোন গুলো দেখিয়ে অভিযোগের সুরে বললো,—- দেখুন তো কি করেছেন কাল রাতে, সব জ্ব’লে যাচ্ছে।
ক্রীতিক দু’হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো,
—- বুকে আয়।
অরু গেলো। ক্রীতিক অরুর গলায় কয়েকদফা চুমু খেয়ে বললো,
—- কমে যাবে এন্টিসেফটিক লাগিয়ে নিস।
অরু ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে কোনো কথা নেই। ক্রীতিক অরুকে বাহুর মধ্যে নিয়েই পকেট থেকে দুটো আঙটি বের করলো, একটাতে পাথর বসানো, পাথরের চিকচিক দেখে মনে হচ্ছে দামি কোনো হিরে। অন্যটা শুধু হোয়াইট গোল্ডের গোলাকার রিং।
ক্রীতিক একটা রিং নিজের আঙুলে পরে অন্যটা অরুর অনামিকা আঙুলে পরিয়ে দিলো। অরু চিকচিক করতে থাকা হাতের আংটি টা নাড়িয়ে চাড়িয়ে শুধালো,—— এটা কেন?
ক্রীতিক বললো,
—- তুই যে বিবাহিত তার প্রমান, তাছাড়া বিয়ের পর থেকেই এতো এতো ঝামেলা যে তোকে একটা আংটি কিনে দেওয়ার সুযোগ ও হয়নি আমার, তাই কাল শপিং এ গিয়ে কিনে ফেললাম, পছন্দ হয়েছে?
অরু মুচকি হেসে জবাব দিলো,
— খুউউব।
—-তাহলে চুমু খা।

ক্রীতিকের কথায় অরু ভড়কে গিয়ে বললো,
—- কিহ।
—- চুমু খেতে বলেছি তোকে, আমার টাইম নেই অরু, যেতে হবে। সায়র আর অর্ণব কল করতে করতে ফোনের মাথা খেয়ে ফেলছে। এই রুমে এভাবে দেখে ফেললে হুলস্থুল লাগিয়ে দেবে ওরা দুজন। তুই কি চাস আমাদের এভাবে দেখুক ওরা?
অরু শুকনো মুখে না সূচক মাথা নাড়ালো।
ক্রীতিক পুনরায় বললো,—- তাহলে যা বলছি তাই কর, দ্রুত।
অরুর আর কিইবা করবে স্বামী মহোদয়কে খুশি করার এক আকাশ ইচ্ছে সরুপ ছোট্ট করে হামি দিয়ে দিলো গালে। ক্রীতিক অরুর কপালে বেশ কয়েকটা চুমু খেয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো,
——- ডোন্ট ফরগেট টু টেইক ইউর পেইন কিলার বেইবি। ফ্রেশ হয়ে এসে ক্রীতিকের টিশার্ট ছেড়ে মাত্রই নিজের জামা কাপড় গায়ে চড়িয়েছে অরু, ওড়নাটা এখনো নেয়নি যার দরুন গলার দা'গ গুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান। অরু সেগুলোতে আলতো হাতে এন্টিসেফটিক লাগাচ্ছিল,ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে রুমে প্রবেশ করে অনু। ভেতরে আসতে আসতে অনু বলে,
—— শুনেছিস রুপাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাও কাল রাত থেকে।
অরু হাতের কাজ রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো,—- কি বলিস আপা?
অনু আর কথা আগানোর সুযোগ পেলোনা, উল্টো চোখ ছোট ছোট করে অরুর দিকে সন্দিহান হয়ে তাকিয়ে বললো,
—- কাল রাতে ক্রীতিক ভাইয়া তোর রুমে ছিল?

আপার প্রশ্নে অরু হা না কিছুই বললো না, ধরা খেয়ে যাওয়া চোরের মতো শুধু উপর নিচ মাথা ঝাকালো কিছুক্ষণ ।
অনু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সাবলীল ভঙ্গিতে বলে,
—- জানি, কাল আমিই ক্রীতিক ভাইয়াকে কল করেছিলাম, তুই বাড়িতে ফিরছিলি না দেখে। কাল সারা রাত বৈশাখী ঝড় দা'নবীয় তান্ডব চালিয়েছে পুরো শহর জুড়ে। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, গাছপালা উপড়ে পরে বিভিন্ন লেনের যান চলাচল বন্ধ। অতিরিক্ত বৃষ্টি পাতে পুরো ক্রীতিক কুঞ্জ ফ্যাকাশে রুপ ধারণ করেছে, থোঁকায় থোঁকায় বাগান বিলাশ গুলো ঝড়ে পরে আছে পিচে ঢাকা ফ্রন্ট ইয়ার্ড জুড়ে।
অনুর সন্দিহান দৃষ্টিপাত এড়াতে লাজুক অরু খোলা জানালা গলিয়ে বাইরে চেয়ে আছে সেই তখন থেকে, সারারাত ঝড়ের তোপে কেমন নেতিয়ে পরেছে সৌন্দর্য বর্ধক গাছপালা গুলো। আজ সূর্য উঠেছে,গাঢ় তার সোনালী কীরণ। খুব সম্ভবত দুপুর গড়াতেই গাছগুলো আবার আগের রুপ ধারণ করবে। এই মূহুর্তে অনুর নিজেরও বেশ ইতস্তত বোধ হচ্ছে অরুর সাথে কথা বলতে, কি বলতে কি বলে ফেলেছে । ওই জন্যই তখন থেকে ওদের মাঝে পিনপতন নীরবতা বিরাজমান।
এই অসস্থিদায়ক মূহুর্তটাকে কোনো মতে এরিয়ে যাওয়ার দরুন হাতের আঙুলে ওড়না প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে অনুই ডেকে উঠলো প্রথমে,
—- বলছিলাম যে অরু, ইয়ে মানে,বলছিলাম…
—- এ্যাই আপা, আজকে তোদের প্রি ওয়েডিং পার্টি না? রাতে কতো মজা হবে বলতো?

অনুকে কথা বাড়ানোর কোনোরূপ ফুরসত না দিয়েই পেছনে তাকিয়ে ফট করে কথাটা বলে উঠলো অরু। ভাবটা এমন যেন ও নিস্পাপ একটা বাচ্চা, বিয়ে,বাসর, কিংবা জায়ান ক্রীতিক এসবের কোনোদিন নাম ও শোনেনি ও।
অরুর কথায় সস্থি পেলো অনু, তৎক্ষনাৎ হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,—- হ্যা এলিসা আপুরা আয়োজন করছে শুনলাম, আমাদের দেশে আবার এসব হয় নাকি? কিন্তু…
মূহুর্তেই ভার হয়ে এলো অনুর মুখশ্রী, আধার ঘনালো পান পাতার মতো উজ্জ্বল মুখটাতে।
অরু এগিয়ে এসে শুধালো,
—- কিন্তু কি আপা?
অরুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির পাছে অনু জবাবের উৎস খুঁজে পেয়েছে কি পায়নি, তার আগেই, নিচতলা থেকে প্রচন্ড চেঁচামেচির আওয়াজে দু’বোন হকচকিয়ে উঠলো ওরা। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে কেউ কাউকে মা’রছে খুব , সকাল সকাল আবার ক্রীতিক কারোও সাথে ঝা’মেলা শুরু করলো নাতো? কথাটা বোধগম্য হতেই কলিজার পানি শুকিয়ে এলো অরুর। এই মানুষটা ঝামেলা মা’রামা’রি এসব না করে অরুকে একদন্ড শান্তি দিতে পারেনা নাকি?
না পারেনা, কারণ সে তো দ্য গ্রেট অ’সভ্য, উ’গ্র, বে’পরোয়া, ছ’ন্নছাড়া,জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। যার কাজই হলো সকাল সন্ধ্যা ঝামেলা পাকানো।
অরুর নিস্ফল ভাবনার ছেদ ঘটে আবারও নিচ তলার তীব্র শোরগোলের আওয়াজে। ভ্রম ছুটে গেলে অরু আর এক মূহুর্ত ও অপেক্ষা করেনা, ওড়নাটা কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে, দ্রুত পায়ে

রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অনুকে বলে,—-- আপা চলতো, আবার কি হলো দেখে আসি।
অরুর কথায় উপুর নিচ মাথা নাড়িয়ে বড় বড় পা ফেলে দোতলা ছাড়লো অনুও।
ওরা দু'বোন যখন প্রচন্ত চিন্তায় উদ্বিগ্ন মস্তিষ্কে দ্রুত কদমে নিচে নেমে এলো, তখন অন্দরমহল পুরোপুরি নিরব।
অরু, অনু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ঘটনা বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছে, হলরুমের মাঝ বরাবর পায়ের উপর পা তুলে ডিভানে বসে আছে ক্রীতিক। ওর আশেপাশে সায়র, অর্ণব, এলিসা,ক্যাথলিন, মোখলেস চাচা সবাই আছে। আজমেরী শেখ ও অন্য একটা কাউচে বসে আছেন।
সবার সামনে চরম অ'পরাধীর ন্যায় মেঝেতে বসে বসে কাঁদছে রুপা। দেখে মনে হচ্ছে এতোক্ষণের ঝ'ড় টা ওর উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে।কারণ ওর দিকে তাকিয়ে এখনো রা'গে ফো'সফাস করছেন জাহানারা। তার আ'গুনের ফু'লকির মতো চোখজোড়া দেখে মনে হচ্ছে পারলে আরও কয়েক ঘাঁ বসিয়ে দেয় রুপাকে। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বলে তার হাত আটকে আছে, শক্তি বলটা কি তাহলে জায়ান ক্রীতিক? ভাবছে অরু।
চারিদিক অবলোকন করে অরু হিসহিসিয়ে অনুকে শুধালো,
— আপা, কি হয়েছে বলতো?
অনু জবাব দেয়,
—-- কাল সন্ধ্যা বেলায় টিউশনে গিয়ে সারারাতেও আর বাড়িতে ফেরেনি রুপা, রেজা ভাই গিয়েছিল ওকে আনতে, কিন্তু গিয়ে শোনে রুপা নাকি টিউশনিতেই যায়নি। কোনো এক ছেলের সাথে

ভেগেছে, তাই সকাল সকাল মামি এসেছিল ক্রীতিক কুঞ্জে, মাকে বলে কয়ে কিছু একটা উপায় বের করানোর জন্যে। সেটা জানাতেই তো আমি তোর রুমে গেলাম তখন। আর এখন এসব।
ওদের কথোপকথনের মাঝেই অন্দরমহলে প্রবেশ করেন অরুর মামা, তিনি চারিদিকের থমথমে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে উঠতে না পেরে তার স্ত্রী জাহানারার দিকে এগিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে শুধালেন,—- কি হয়েছে, মেয়েটা এভাবে মেঝেতে বসে কাঁদছে কেন?
স্বামীর কথায় গর্জে উঠলেন জাহানারা, রুষ্ট গলায় বললেন,
—- সেটা তোমার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করো, সারারাত একটা ছেলের সাথে ফ'ষ্টিন'ষ্টি করে, মান সম্মান খুয়িয়ে এখন ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়েছে, ওকে মে'রে ফেলো রেজার বাবা, নইলে আমি মহল্লায় মুখ দেখাতে পারবোনা। যেই জাহানারা সবাইকে কথায় দাবিয়ে রাখে, মুখের জোরে সবাইকে ওঠায় বসায়, আজ তার মেয়ে হয়ে ও কিনা এমন একটা নোং'রা কাজ করে ফিরলো? ছিহ! এখন আমি ওকে দিয়ে করবো টা কি বলতে পারো?
অরুর মামা কিছুটা শান্তস্বরে বললেন,
— আহ, এভাবে বলছো কেন?
জাহানারা পুনরায় ঝাঁজিয়ে উঠে বললেন,—- বলবোনা তো কি করবো? তোমার মেয়েকে গাড়ি করে কয়েকটা ছেলে মহল্লার মাঝখানে ফেলে রেখে গেছে। সবাই দেখেছে, কানাঘু'ষায় পুরো মহল্লা গরম, তোমার কি মনে হয়, এই মেয়ের আর বিয়ে হবে কোনোদিন? মুখপু'ড়ি সব খুয়িয়ে এখন আবার ফিরলি কেন?

এই বলে জাহানারা আবারও রুপাকে মা'রতে উদ্যত হবেন, ঠিক তখনই জাহানারা বরাবর কথার তী'র ছো'ড়ে ক্রীতিক,
—- স্টপ ইট,আই হেইট নয়েজ। ক্রীতিকের গর্জনে থেমে গেলেন জাহানারা, জাহানারা থেমে যেতেই ক্রীতিক তীর্যক কন্ঠে পুনরায় বললো,
—- ঠিকই বলেছেন আপনি,আপনার মেয়ের কোথাও বিয়ে হবেনা, লোকজন আপনার সম্মুখে ছি ছি বুলি আওরাবে, এর কারণ অবশ্য আপনি নিজেই, লোকজনের হাঁড়ির খবর ঘেঁটে কাসুন্দি বানিয়েছেন এতোদিন। এখন সয়ং আপনার মেয়ের পালা,তারা তো এবার আপনাকে আখমাড়াই করবেই। এতে কোনো ভুল নেই।
ক্রীতিকের কথায় জাহানারা জবাব খুঁজে পেলোনা, জবাব দেওয়ার মতো কিই'বা আছে? কথা তো সত্য।
আজমেরী শেখ এখনো চুপচাপ, তিনি ক্রীতিকের পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায়, আসলে চাইছেটা কি ক্রীতিক? সেটাই আপাতত ভাবছেন তিনি। অনু, অরু এখনো চুপচাপ শুকনো মুখে ঘরের এককোনে দাঁড়িয়ে আছে।
ক্রীতিক স্পষ্ট চোখে একনজর অরুর দিকে তাকালো, অতঃপর সবার সামনেই ওকে ডেকে বললো,—- বেইবি, একগ্লাস পানি নিয়ে আয়তো, সকালে ব্রেকফাস্ট করে পানিটাও খেতে পারিনি।
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে কিচেনের দিকে এগিয়ে গেলে,ক্রীতিকের কথায় মোখলেস চাচা হকচকিয়ে বলে ওঠেন,
—- আমি নিয়ে আসছি বাবা।
ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বাঁধ সেধে বললো,

—-- আমার বউ আছেতো এখানে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন, আপনার সাথে জরুরি কথা আছে।
মোখলেস চাচাকে হুকুম করে, পরক্ষণেই জাহানারার দিকে তাকিয়ে ক্রীতিক বলে,
—-- রুপাকে মোখলেস চাচার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। মোখলেস এখনো অবিবাহিত বয়স খুব বেশি না মাত্র পয়তাল্লিশ বছর।
ক্রীতিকের কথায় যেন বাজ পড়লো পুরো হলরুম জুড়ে। আজমেরী শেখ তৎক্ষনাৎ তেতে উঠে বললেন,
—— ক্রীতিক!এবার একটু বেশি বারাবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, অফিসেও তুমি আমার অমতে ইচ্ছে মতো রুলস দিয়ে যাচ্ছ আর এখন বাড়িতেও?ক্রীতিক হাতের ইশারায় আজমেরী শেখকে থামিয়ে জিভ দিয়ে গাল ঠেলে বললো,
—-- আমার কথা এখনো শেষ হয়নি মাদার ইন ল্। তাছাড়া ডিল টা আপনার আমার মাঝে হচ্ছে না, ডিল হচ্ছে আমার আর ওনার মাঝে, চোখ দিয়ে জাহানারাকে ইশারা করে ক্রীতিক।
—-- তাই আপাতত আপনার মতামত গ্রহনযোগ্য নয়।
আজমেরী শেখ আর কথা না বাড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ হয়ে গেলে জাহানারা রেগেমেগে বলেন,
—-- তাই বলে বাড়ির কেয়ারটেকারের সাথে আপনি আমার মেয়ে….
জাহানারা কথা শেষ করার আগেই কথা ছুড়লো ক্রীতিক, বললো,—— বিয়ে হয়ে গেলে আমার বনানীর ফ্ল্যাটটা আমি মোখলেস চাচা আর রুপার নামে উইল করে দেবো।এছাড়া মোখলেস চাচাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী জেকে গ্রুপে

কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে। আফটার অল আপনারা আমার বউয়ের পরম আত্মীয় এতোটুকু দায়বদ্ধতা তো আমার আছেই, রাইট?

ক্রীতিকের ছু'ড়ে মা'রা মেঘ না চাইতে জলের মতোন অফার শুনে জাহানারার চোখ বিস্ময়ে চিকচিক করে উঠলো। বনানীতে নিজস্ব ফ্ল্যাট তো তার বাবা দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠীর ও সাধ্যের বাইরে, সেখানে ক্রীতিক কিনা এমনি এমনি দিয়ে দেবে? জাহানারার চোখেমুখে লোভাতুর দৃশ্য ভেসে উঠেছে, ভেতরে ভেতরে টগবগ করছে কামনার লাবডুড। জাহানারা তখন থেকে চুপ হয়ে আছেন দেখে অরুর মামা এবার ক্রীতিকের কথায় নাকোচ করে বললো,—- অসম্ভব, তাই বলে মেয়েকে এমন চল্লিশোর্ধ লোকের সাথে বিয়ে দেবো নাকি?

অরুর মামার রাশভারী কথা তখনই থেমে গেলো, যখন পাশ থেকে জাহানারা তীক্ষ্ণ কন্ঠে বলে উঠলেন,

—- তুমি চুপ করো একদম, কে বিয়ে করবে তোমার এই অ'পয়া, হত'চ্ছা'ড়া, ন'ষ্টা মেয়েকে? যা হয় ভালোর জন্যই, উনি আমাদের ভালোর জন্যই একথা বলেছেন, চুপচাপ বিয়েতে মত দাও। তাছাড়া ওমন বিশাল ফ্ল্যাটের মালিক হলে মোখলেস কে জামাই বানাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

এদিকে এই কাহিনির মূল চরিত্র মোখলেস চাচা এখনো হতবিহ্বল চোখে একে একে সবার কথা শুনে যাচ্ছে, ক্রীতিক কি আসলেই তাঁকে বিয়ে দিয়ে, তার এতো বছরের বি'ষাদময় আইবুড়ো নাম ঘোঁচাবে নাকি? সেটাই আপাতত ভাবছে মোখলেস চাচা। সবার মাঝে নিরবতা বিরাজমান, শুধু মাত্র রুপা মায়ের হাত পা ধরে

কা'ন্নাকাটি করছে, যাতে তাকে মোখলেস চাচার কাছে বিয়ে না দেওয়া হয়। অনু আর অরু মামিকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু জাহানারা তার সিদ্ধান্তে অনর, তিনি উল্টে খানিকটা দোনোমোনো করে ক্রীতিককে প্রশ্ন করেই বলেন,

—-- বলছি যে,বিয়েটা হয়ে গেলে সত্যি ফ্ল্যাট পাবেতো ওরা?

ক্রীতিক গভীর গলায় বললো,

—-- এখন বিয়ে হলে, উইলটাও এখনই হবে, আমার কাগজ পত্র সব রেডি।

ক্রীতিকের কথায় জাহানারা পুলকিত হয়ে নিজের স্বামীর উদ্দেশ্যে বললো,

—-- ওগো তাহলে আর দেরি কেন? কাজী আনার ব্যবস্থা করো, আজকেই বিয়ে হবে ওদের।অরুর মামা খুব যে সৎ মানুষ তা নয়, টাকা,অধিপত্য এসবের লো'ভ তারও আছে, মেয়ের সূত্র ধরে যদি এভাবে রাতারাতি লাখ পতি হয়ে যাওয়া যায় তো ক্ষতি কি? হোক বিয়ে, মেয়ে তো আর পানিতে পরে যাচ্ছে না, উল্টো মোখলেস কে জামাই বানিয়ে নাকের ডগায় দড়ি দিয়ে ঘুরানো যাবে, ব্যাপারটা মন্দ হবেনা।

অবশেষে মনেমনে হাজারো লাভ লসের হিসেব কষিয়ে তবেই তিনি চললেন কাজী খোঁজার উদ্দেশ্যে।

শেষমেশ নানান জল্পনা কল্পনার ইতি টেনে রুপার বিয়ে হতে-হতে সকাল গড়িয়ে বিকেল হলো। একহাতে রুপাদের বিয়ে হয়েছে, আর অন্যহাতে ফ্ল্যাটের চাবি উঠেছে জাহানারার কোমরের গোছায়।আজমেরী শেখের কিছু বলার ছিলোনা, বললেও হয়তো জাহানারা পাত্তা দিতেন না। তাই নিজের গুরুগম্ভীরতা ধরে রাখতে

চুপই রয়েছিলেন তিনি। আজকাল ক্রীতিকের কর্মকান্ডে তিনি শুধুই নিরব দর্শক মাত্র। কোনো কিছু বলার বা ক্রীতিককের বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার হেতু রাখেনা ক্রীতিক। ব্যাপারটা আজমেরী শেখের নিকট চ'রম বি'রক্তির পর্যায়ে উঠে এসেছে, তাও তিনি নিশ্চুপ। কারন একটাই, অনুর বিয়ে। অনুর বিয়েটা সর্বোত্তম পন্থায় দিতে চান তিনি। তারপর না হয় একে একে দান চালা যাবে। তাড়াহুরোর কিছু নেই। তাছাড়া আজমেরী শেখের তাড়াহুড়ো জিনিসটা পছন্দও নয় মোটে।
আজ যেহেতু বিয়ের প্রথম দিন তাই মেয়ে জামাইকে নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরেছেন জাহানারা।
কে জানে? হয়তোবা অনুর বিয়ে উপলক্ষে দুয়েক একদিন বাদে আবারও পুরো পরিবার শুদ্ধ ক্রীতিক কুঞ্জে হাজির হবেন তিনি। *
অরু তরিঘরি পায়ে মাত্রই প্রবেশ করেছে ক্রীতিকের রুমে। রাগের তোপে শরীরটা রি রি করছে ওর। এখানে আসতে আসতেই ঠিক করে নিয়েছে যা হওয়ার হয়ে যাক আজকে ক্রীতিক কে কিছু কড়া শুনিয়ে তবেই এখান থেকে যাবে ও।
ক্রীতিক তখন রুমেই ছিল, আপাতত তার মনোযোগ ল্যাপটপে নিবদ্ধ। অরু ভেতরে গিয়ে আচমকা ক্রীতিকের মুখের সামনেই ল্যাপটপটা ঠাস করে বন্ধ দিলো।
অরুর কান্ডে ক্রীতিক কিছুটা রাগী গলায় বললো,—— হোয়াট'স রং অরু?কাজ করছি তো।
অরুর এক অগাধ বিশ্বাস ক্রীতিক ওকে পা'গ'লের মতো ভালোবাসে, অন্য সবার সাথে যাই করুক না কেন,তবে অরু যদি ক্রীতিকের কলিজাটাও চি'বিয়ে খে'য়ে নে'য় তবুও ক্রীতিক টু

শব্দটাও করবে না, সেই সাহস থেকেই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও বললো,—- কাজ পরে করবেন, আগে বলুন এতো বড় একটা অ'ন্যায় কেন করলেন? মামীকে লো'ভ দেখিয়ে কেন মোখলেস চাচার মতো একটা চল্লিশোর্ধ লোকের সাথে রুপার বিয়ে দিলেন?বিয়ে কি একটা ছেলে খেলা?যে যার সাথে খুশি যেভাবে খুশি বিয়ে দিয়ে দিলেন?

আমি খুব ভালো করে জানি রুপা উধাও হওয়া থেকে শুরু করে এতো কাহিনীর পেছনে নিশ্চয়ই আপনার হাত আছে, বলুন কেন করেছেন এসব?

অরুর একাধারে বলে যাওয়া ননস্টপ কথার বহরে কান না দিয়ে পুনরায় ল্যাপটপে মন দিয়ে ক্রীতিক শান্ত স্বরে বললো,—- বড়দের কথা এতো জানতে হয়না অরু, ভুলে গিয়েছিস আমি যে তোর বারো বছরের বড়?

ক্রীতিকের কথায় অরু বিরক্ত হয়ে বললো,

—— তা এতোই যখন আপনি বড়, আমি যে আপনার বারো বছরের ছোট সেটা কাল রাতে মনে ছিলোনা? এতো করে বলেছিলাম ছাড় দিয়েছিলেন একটুও? তখন তো নো ওয়ে, নো ওয়ে, করছিলেন।

অরু রাগে ফোসফাস করছে। কি বলছে, না বলছে, কিচ্ছু খেয়াল নেই ওর। তাই ক্রীতিক এবার উঠে গিয়ে অরুর মুখোমুখি হয়ে সটান দাঁড়িয়ে পরলো, অতঃপর ঘাড়টা একটু নিচু করে নরম, শান্ত, গলায় শুধালো,

—— কি হয়েছে, এতো রেগে আছিস কেন?

অরু ঠোঁট উল্টিয়ে শক্ত গলায় বললো ,

—-- কেন করলেন এটা?
রাগের তোপে তিড়তিড়িয়ে কাঁপতে থাকা অরুর ফিনফিনে ঠোঁটে বৃদ্ধাঙ্গুলি বুলিয়ে ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,—— তুই আমাকে না বললেও তোর শরীর আমাকে বলে দেয় অরু, আমার অবর্তমানে তোর উপর দিয়ে ঠিক কতটা ঝ'ড়ঝাপটা গিয়েছে। শুধু মাত্র আমাকে ভালোবাসার অ'পরাধে, আমাদের বিয়েটা মেনে নেওয়ার অ'পরাধে, তোর আশেপাশের মানুষ গুলো তোকে ঠিক কি পরিপান মানসিক য'ন্ত্রনায় ভুগিয়েছে সেটা তোর চেহারা, তোর শরীর দেখেই বুঝিয়ে গিয়েছি আমি।
ইউ এস এ থেকে আসার পর তোর অবস্থা দেখে নিজেকেই নিজের শা'স্তি দিতে ইচ্ছে করছিল আমার। তোকে যতবার চোখের সামনে দেখছিলাম ততবারই নিজের রা'গ সামলাতে পারছিলাম না আমি।মস্তিষ্ক আ'গুন হয়ে উঠছিল আমার। ইচ্ছে করছিল আরও আগে দেশে না ফেরার শা'স্তি সরুপ নিজেকেই নিজে শেষ করে দিই। ফলস্বরুপ তোকে বারবার এড়িয়ে গিয়েছি।
অরু এখনো প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ডাগর ডাগর চোখ দুটো কৌতুহলে পরিপূর্ণ। ওর কৌতুহলের জোয়ারে কিছুটা ভাটি দিতে আবারও বলা শুরু করে ক্রীতিক,—— মনে আছে অরু? আমি বলেছিলাম, তুই নিশ্চিন্তে থাক পুরো দুনিয়া আমি দু'হাতে সামলে নেবো। যে সমাজ আমার বউয়ের দিকে আঙুল তুলবে সেই সমাজের নিয়মই আমি পাল্টে দেবো।
হয়তো কিছুটা দেরী হয়েছে,কিন্তু আমি সেটাই করেছি, সমাজের রিপ্রেজেন্টার হিসেবে তোর মামী তোর দিকে বারবার আঙুল তুলেছে, তোর আমার বয়সের পার্থক্য নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে।

তোর শরীরে আমার করা ভালোবাসার স্পর্শ গুলোকে নোং’রা বলে আখ্যায়িত করেছে। ওই জন্যই আমি ওনার কথার বান ওনাকে দিয়েই কাটিয়েছি।আজ প্রথমে ওনার মেয়ের শরীরে নোং’রা স্পর্শের ক’লঙ্ক উঠেছে, পুরো মহল্লার কাছে খা’রাপ আ’খ্যায়িত হয়েছে, তারপর দিন শেষে লো’ভের তাড়নায় উনিই আবার ওনার মেয়েকে এমন একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছেন, যার সাথে ওনার মেয়ের বয়সের পার্থক্য এক, দুই, কিংবা বারো বছর নয়, গুনে গুনে ছাব্বিশ বছর।

আজ থেকে তোর মামী আর তোর সামনে, সমাজ নিয়ে টু শব্দও করবে না অরু। কারন আমি সমাজের নিয়মটাই ভে’ঙে দিয়েছি।

ক্রীতিকের কথায় হতবাক হয়ে ওর দিকে হা করে তাকিয়ে আছে অরু, চোখ দুটো আগের চেয়েও বৃহৎ আকৃতি ধারণ করেছে, মনেমনে ভাবছে,—- মানুষ এতোটা গভীর আর সুকৌশলি চিন্তা কিভাবে করতে পারে?

অরু তখন থেকে হতবুদ্ধি হয়ে দাড়িয়ে আছে দেখে ক্রীতিক ভ্রু উঁচিয়ে শুধালো,

—- কি বউ? সবটা মাথার উপর দিয়ে গেলোতো?

অরু নির্লিপ্ত চোখে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, ক্রীতিক ওকে বুকের মধ্যে টেনে এনে বললো,

—- চিন্তা নেই,মোখলেস চাচা মানুষ হিসেবে অসাধারণ। তাছাড়া ওরা যাতে ভালো থাকে সে সব ব্যবস্থা আমি নিজ হাতে করবো। তারচেয়েও বড় কথা রুপা যার সাথে পালিয়েছিল সেই ছেলেটা মোটেও সুবিধার না এক কথায় ডা’কা’ত বলতে পারিস। আ’ম সিওর ও রুপাকে দূরে কোথাও নিয়ে পাঁ’চা’র করে দিতো।

অরু নিজের নরম দু'হাতে ক্রীতিকের চওড়া পিঠখানা আঁকড়ে ধরে ওর শক্ত বুকের মাঝ বরাবর মুখ দাবিয়ে দিয়ে বললো,—— আপনি কি জানেন? আপনি একটা বেস্ট হাসবেন্ড? সবার থেকে বেস্ট। আজ থেকে আপনি যে নিশানা ধরে পথ এগোবেন, আপনার ফেলে যাওয়া সেই পায়ের ছাপে পা রেখে চোখ বন্ধ করে এগিয়ে যাবো আমি, প্রমিস। এই যে পিংকি প্রমিস।
মিষ্টি হেসে কথাটা বলে ক্রীতিকের খরখরে কনু আঙুলের ভাঁজে নিজের কোমল তুলতুলে কনু আঙুলটা প্রবেশ করালো অরু।যেহেতু নিজেরা নিজেরা, এদেশে ওদের চেনা পরিচিত তেমন কেউ নেই, তাই প্রি ওয়েডিং এর পার্টিটা ক্রীতিক কুঞ্জের ছাদেই আয়োজন করা হয়েছে।
মাত্রই কেক টেক কেটে মাদুর পেতে আড্ডা দিতে বসেছে সবাই। আগামী কাল অনু প্রত্যয়ের গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে, তারপর সারা জীবনের জন্য এই পরিবারের অতিথি হয়ে যাবে অনু।
অরুর তো তাও বাড়িতেই বিয়ে হয়েছে, তারউপর ক্রীতিক ওকে বাচ্চাদের মতো করে আগলে রাখে, কিন্তু অনুকে তো শশুর বাড়ি যেতে হবে, পুরো একটা আলাদা পরিবারের সাথে নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে, দিন রাত সংসার সামলাতে হবে, সেসব ভাবতে গেলেই প্রত্যয়কে নিজের করে পাওয়া, বিয়ের আনন্দ সবকিছু কেমন ফিকে হয়ে যাচ্ছে অনুর হৃদয়ে।এই আড্ডাতে অনু ছাড়াও আরও একজনার মুখটা মলিন হয়ে আছে, সে হলো এলিসা। যার কিনা এই বিয়ে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল,সেই সকাল থেকে মুখ ভার করে বসে আছে। প্রয়োজনের বাইরে কারও সাথে একটা কথাও বলছে না, কি অদ্ভুত?

অনুর মন খারাপের কারন জানে অরু, কিন্তু এলিসার এই মাত্রাতিরিক্ত বি’ষন্নতা কিছুতেই ধরতে পারছে না ও। অরু যখন চোখ মুখ কালো করে এলিসার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে এসব ভাবছিল,তখনই কনুই দিয়ে সামান্য খোঁ’চা মে’রে ওকে ডেকে উঠলো নীলিমা, শুধালো,
—- কি ভাবছিস বলতো তখন থেকে?
নীলিমার ডাকে ধ্যান ভাঙে অরুর, ও না সূচক মাথা নাড়িয়ে ছোট্ট করে জবাব দিলো,
—— কিছুনা।অতঃপর পুনরায় মন দিলো সবার সাথে আলাপ চারিতায়। আপাতত সায়রই বকবক করে যাচ্ছে সবার মাঝে। অর্ণব গিটার নিয়ে বসেছে গান গাইবে বলে। অনু আর প্রত্যয় চোখে চোখে হাজারো কথা আদান-প্রদান করছে।
ক্রীতিক সবার সাথে আড্ডা দিতে বসেছে ঠিকই, তবে তার ধ্যান জ্ঞান সবকিছুই ম্যাকবুকে নিবদ্ধ। নতুন নতুন অফিস জয়েন করার পর থেকেই সারাক্ষণ ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকে ও। কি জানি, কি করে?
ক্যাথলিন এলিসার কাধে মাথা রেখে অর্ণবের করা গিটারের টুংটাং আওয়াজে মন দিয়েছে। নীলিমা অরুর পাশে বসেই সায়রের সাথে একের পর এক যুক্তিবিদ্যায় ব্যস্ত।
একমাত্র অরুই চুপচাপ সবাইকে গভীর চোখে কে পরখ করছে। সায়র কি ভেবে যেন কথার একপর্যায়ে হুট করেই বললো,—- গাইস চলো সবাই ট্রুথ এন্ড ডেয়ার খেলা যাক।

আশেপাসের উৎসুক জনতা সবাই একে একে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালেও ক্রীতিক কিবোর্ডে আঙুল চালাতে চালাতে গভীর গলায় বললো,
—— আমাকে এসব ডেয়ার ফেয়ার দিলে খবর আছে তোর সায়র।
ক্রীতিকের কথায় সায়র বিরক্ত কন্ঠে বললো,
—- এখানে আছিস মানে তোর খেলায় অংশগ্রহন করতে হবে নো ক’ম্প্রোমাইজ।
কথা শেষ করে একটা খালি হুইস্কির বোতল সবার মাঝে ঘোরালো সায়র, বোতল ঘোরাতেই সবার আগে ফেঁ’সে গেলো বেচারি নীলিমা। সায়র নীলিমার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রু উঁচিয়ে বললো,
—- কি সাহসী আব্বাজানের সাহসী কন্যা, ট্রুথ না ডেয়ার?
নীলিমা ঠোঁট বেকিয়ে বললো,—- ডেয়ার ফেয়ার পারবো না, ট্রুথ।
সায়র নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,
—- ঠিকাছে বলো তাহলে, বয়ফ্রেন্ড আছে?
নীলিমা দাঁত কটমটিয়ে মনে মনে বললো,
—- ব’দমা’শ, বিদেশি বা’ন্দর, জানতাম তুই ভুলভাল কোশ্চেনই করবি আমায়।
—- কি ভয় পেয়ে গেলে নাকি রাগীনি?
নীলিমা থমথমে গলায় উত্তর দিলো,
—- না নেই।
নীলিমা জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলো সায়র,সবার সামনেই ঝড়ের গতিতে নীলিমার দিকে ঝুঁকে গিয়ে চোখ মুখ খিঁচিয়ে বললো,—— বিএফ নেই তো আমাকে একটা চান্স দিতে

পারতে, শুধু শুধু আব্বাজানকে দিয়ে তাড়া খাওয়ানোর মানেটা কি ছিল? তোমাদের মেয়েদের এতো ভাব কেন বলোতো?
সায়রের কান্ডে নীলিমা খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে, শুষ্ক ঢোক গিললো। ওদিকে সায়রের ভাবসাব এমন যে আজকে নীলিমার সাথে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে ও। কেন ওকে আছোলা বাঁ'শ নিয়ে তাড়া করা হলো সেই প্র'তিবাদ সরূপ। কিন্তু ওকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে অর্ণব বললো,
—— থাম ভাই, খেলার মাঝখানে কি শুরু করলি? খেলাটা কন্টিনিউ কর নয়তো চললাম, অনেক রাত হয়েছে ঘুমাবো। সায়র নিজেকে সংবরণ করে ফোসফাস করতে করতে পুনরায় বোতল ঘোরালো, এবার গিয়ে বোতল থামলো ক্রীতিকের সামনে। ক্রীতিক সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেই, অর্ণব বললো,
—- কি নিবি ট্রুথ না ডেয়ার?
ক্রীতিক নির্লিপ্ত কন্ঠে বললো,
—- ট্রুথ, তবে কোনোরূপ ফা'জলামো করবি না বলে দিলাম।
অর্ণব ক্রীতিকের স'র্তক বার্তায় দু'পয়সার তোয়াক্কা না করে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছু'ড়লো ওকে,
—- অরুকে তোর দেওয়া ফার্স্ট গিফট কি ছিল? আর এমন কি স্পেশাল গিফট যা তুই ওকে দিতে চাস এখনো দেওয়া হয়নি?
অর্ণবের কথা শেষ হলে ক্রীতিক ম্যাকবুক থেকে চোখ সরিয়ে অরুকে পর্যবেক্ষন করলো, যে লাজুক লতা হয়ে হাত দিয়ে কানের পেছনে চুল গুঁজে ক্রীতিকের দৃষ্টি এড়াতে বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ক্রীতিক অরুর দিকে দৃষ্টি রেখেই একটু ভেবে বললো,—— আই থিংক ফার্স্ট গিফ্ট ছিলো কিছু পাজামা সেট। আর

স্পেশাল গিফট যদি বলিস, দেন আই ওয়ান্না গিভ হার মাই বেস্ট ডি এন এ।
এ কি ঠোঁট কা'টা কথা!!ক্রীতিকের কথা শুনে কাশি উঠে গেলো সবার। অরু লজ্জা টজ্জা ঠিকেয় তুলে, ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে কটমটিয়ে বললো,
—- নি'র্লজ্জ লোক।
ক্রীতিক ঠোঁট উল্টে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,
—— আশ্চর্য ট্রুথ আর ডেয়ার খেলা হচ্ছে, তাইতো সত্যিটা বললাম।
অরু চোখ মুখ খিঁচিয়ে বললো,
—- এই সত্যি কে বলতে বলেছে আপনাকে?
ওদের স্বামী স্ত্রীর বা'কবিত'ন্ডার মাঝে সায়র হো হো করে হেসে বললো,
—— শুনেছিস অর্ণন? জেকে এখনো বাসরটাই করতে পারলো না, এদিকে বাচ্চা উপহার দিয়ে দিচ্ছে? হাউ ফানি।হেহ হেহ।
ক্রীতিক সায়রের মেলে যাওয়া চোয়ালখানা আলতো হাতে বন্ধ করে দিয়ে বললো,—- আপাতত মুখটা বন্ধ কর, যখন হবে তখন ঠিকই টের পাবি, আদৌও বাসর করেছি কি করিনি।
অরু তৎক্ষনাৎ সবার মধ্যে থেকে উঠে গিয়ে, গটগটিয়ে নিচে চলে গেলো।
সায়র হাঁক ছেড়ে বললো,
—- আরে এলোকেশী কোথায় চলে যাচ্ছো? খেলা তো শেষ হয়নি।
সায়র কথাটা উচ্চারন করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক আচমকা সায়রের গলা চে'পে ধরে বললো,

—— শা’লা তোকে কতবার বলেছি আমার বউকে তুই ডাকবি না কখনো। আবার ঢং করে এলোকেশী ডাকা হচ্ছে? আজ তোর খবর আছে। এই বলে ক্রীতিক সায়রের গলাটা গায়ের জো’রে চে’পে ধরে।
সায়র কোনো মতে শ্বাস টেনে অস্পষ্ট আওয়াজে অর্ণব কে ডেকে বলে,—— ভাই থামা এটাকে, বিয়ের আগেই আমার হবু বউটা বি’ধবা হয়ে যাবে তো।
এলিসা ওদের ঝামেলার মাঝখানে অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, বেশ চড়া গলায় বললো,
—- থামবি তোরা? অসহ্য লাগছে আমার।
অর্ণব সায়রকে রেখে এলিসার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় আলতো হাত ছুঁয়িয়ে বললো,
—- এলি, কি হয়েছে জান? মন খারাপ?
এলিসা জবাব দিলোনা এক ঝটকায় অর্ণবের হাতটা ঝা’ড়ি মে’রে সরিয়ে বড় বড় পা ফেলে চলে গেলো ছাঁদ থেকে।গোধূলি শেষে সন্ধ্যা তিমিরে মুড়িয়ে গিয়েছে চারিপাশ। আজ বোধহয় আমাবস্যা তাই সন্ধ্যাক্ষনেই রাতের মতো নিকোশ কালো আধার নেমেছে ধরনী জুড়ে। তবেই সেই আধারের এক চিলতে নিকোশ কালোও অবশিষ্ট নেই ক্রীতিক কুঞ্জে। কি করেই বা থাকবে? পুরো বাড়িটা ফেইরী লাইট আর ল্যান্টটার্নের আলোয় ঝিকমিক করছে। সন্ধ্যা হতেই যেন পুরো মহল্লা জ্বলে উঠেছে ক্রীতিক কুঞ্জের চকচকে আলোয়। অদূর সদরঘাট থেকেও সেই আলোর ছটা পাখির চোখে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ঘুরে ঘুরে দেখছে আর ভাবছে কি হচ্ছে ওখানে, এতো আলোই বা কেন?

আজমেরী শেখ কোনোরূপ ত্রুটি রাখতে চাননা মেয়ের বিয়েতে, ওই জন্যই হয়তো এতো আয়োজন, ধুমধামের কোনোশেষ নেই। সন্ধ্যার পরপরই গেইট ছাড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে নামি-দামি গাড়ির বহর। এরা কেউ কেউ জেকে গ্রুপের ভিআইপি ক্লায়েন্ট, নয়তো জামশেদ জায়ানের রাজনৈতিক সূত্রে পূর্ব পরিচিতরা। যাদের আপাতত আজমেরী শেখ আর ক্রীতিক দুজন মিলেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যদিওবা দুজন কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনা, কিন্তু এই মূহুর্তে ক্লায়েন্টদের সামনে সবকিছু স্বাভাবিক ভাবেই সামলাচ্ছে তারা। ইটস কলড প্রফেশনাল রিলেশন, যেটা ক্রীতিক আর আজমেরী শেখ দুজনই বেশ ভালো মতো রপ্ত করতে পারে।
প্রত্যয় অনু স্টেজে বসে আছে। ওদেরকে মেহমানরা টুকটাক উপহার সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছে। এখনো গায়ে হলুদ পর্ব শুরু হয়নি। গেস্টরা সবাই সফ্ট ড্রিংকস পান করছে। ক্রীতিক অনেক বছর পর দেশে ফেরার দরুন অনেকেই এগিয়ে এসে ওর সাথে কুশল বিনিময় করে যাচ্ছে। এলিসা মাত্রই অন্দর মহল থেকে বেরিয়েছে ওর পরনে ল্যাভেন্ডার কালারের লেহেঙ্গা। গায়ে হলুদের প্রোগ্রাম হলেও আলাদা কোনো ড্রেসকোর্ট ছিলনা বলে, যে যার মতো জামাকাপড় পরে নিয়েছে ওরা। তবে অর্নব এলিসার সাথে মিলিয়ে ল্যাভেন্ডার কালারেরই পাঞ্জাবি চড়িয়েছে গায়ে। সায়রের আপাতত দেখা মিলছে না।
ক্রীতিক মেরুন ভেলভেট প্রিন্স কোর্ট পরেছে,
সেই সাথে ব্ল্যাক স্কিনি ডেনিম। ঘাড় ছুঁই ছুঁই চুল গুলো আজ বেশ অনেকটা ছোট করা হয়েছে।
এলিসাকে বেরোতে দেখে অর্নব ওর হাত টেনে আহত সুরে বললো,

—-- কথা বলছিস না কেন এলি, কি হয়েছে?
এলিসা কঠোর গলায় বললো,—-- হাত ছাড় অর্ণব ভাল্লাগছে না।
—-- না ছাড়বো না।
ওদের এই বা'কবিত'ন্ডার মাঝেই হুট করে, একদম হুট করেই, স্টেজে এন্ট্রি নিলো দুজন ব্রাইডমেট, প্রথমে লাল নীল চোখ ধাঁধানো লাইট, অতঃপর হঠাৎ করেই বেজে ওঠে সবার প্রিয় গান।
এলিসা অর্ণব তৎক্ষনাৎ, নিজেদের তর্কবির্তকের ইতি টেনে অবাক চোখে স্টেজে তাকালো।
সায়র মাত্রই কিছু মিষ্টি আর দধি নিয়ে একসাইডের টেবিলে বসেছিল। ও সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে এই বিয়েতে ও ডায়েট ফায়েট ভুলে সব খাবে।
তারপর আমেরিকা ফিরে যা হবে দেখা যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ এক চামচ দধি মুখেও নিয়েছিল কেবল, কিন্তু সেই দধি গলা দিয়ে নামার আগেই ওর চোখ আটকে গেলো স্টেজে।
দেখলো ফেইরী টেল থেকে নেমে আসা দুটো জলজ্যান্ত পরী স্টেজে হিন্দি গানের সাথে কোমড় দোলাচ্ছে। তাদের হাসির ফোয়ারা যেন চারিদিকে মুক্ত দানার ন্যায় ঝরে পরছে।
সেদিকে তাকিয়ে কয়েকবার পলক ফেলে অস্ফুটেই সায়র বললো,—— এটাকি আসলেই আমার রাগীনিটা নাকি? হায় আল্লাহ, এতো সুন্দর কেন লাগছে, নজর লেগে যাবেতো সবার। পঁ'চা মেয়েটাকে কে বলেছে এভাবে নাচতে? আমার তো হার্টবিট ফে'ইল করছে, ওহ গড।
ক্রীতিক তখনও ক্লায়েন্টদের সাথে কুশল বিনিময়ে ব্যস্ত। একজনের পর একজন আসছেই, চারিদিকে তাকানোর ফুরসত নেই ওর।

নেই স্টেজের দিকেও মন। কিন্তু হঠাৎ করেই ওর কেন যেন মনে হলো, স্টেজে এই মূহুর্তে যে মেয়েটা গানের তালে পা দোলাচ্ছে, সুন্দর সুন্দর ভঙ্গিমাতে হেলেদুলে নাচ করছে, সেই মেয়েটাকে ও চেনে।
কেন যেন উষ্ণ হৃদয়টা বলছে একবার ফিরে তাকা ক্রীতিক, শুধু একবার, এন্ড দেন, ইউ উইল বি ফা'কিং স্পিচ লেস। ক্রীতিক তাকালো, হুট করে নয়, আস্তে আস্তে সময় নিয়ে নজর ঘোরালো, আর তারপর?
ওর হৃদয়টা ওখানেই থমকে গেলো। অরুকে এতোটা হাসিখুশি বোধ হয় এই জীবনে দেখেনি ক্রীতিক। তারউপর এমন মাতাল করা নাচ?
অরু এতো সুন্দর করে নাচতেও পারে? ক্রীতিক হা হয়ে তাকিয়ে আছে স্টেজে নৃত্যরত ওই অষ্টাদশীর দিকে। পরনে অফ হোয়াইট লেহেঙ্গা, হাঁটু সমান লম্বা চুল গুলো পুরোপুরি বাঁধন হারা তার। গলায়, কানে, সিঁথিতে সাদা পাথরের ছোট ছোট জুয়েলারীতে অরুকে দেখে চোখ জ্বলে যাচ্ছে ক্রীতিকের।
এই মেয়েটা ওর হৃদয়হরনী, সেই ছোট্ট বেলা থেকে নিজের মায়াবলে ক্রীতিককে ব'শ করে রেখেছে।
আজকে মনে হচ্ছে অরুকে নতুন করে আবিষ্কার করলো ক্রীতিক। যে অরু নিজেকে মেলে ধরতে জানে, খিলখিলিয়ে হাসতে জানে, বুক ভরে শ্বাস নিতে জানে। কিন্তু ক্রীতিক তো শ্বাস নিতে পারছে না, ওর তো দ'ম ব'ন্ধ হয়ে আসছে। এই অরুকে দেখে ওর মোটেই সস্থি লাগছে না, কেমন হাসফাস লাগছে, বুকের ভেতরটা সুক্ষ্ম ব্য'থায় চিনচিন করছে, বারবার মনে হচ্ছে আমার বউটা এতো কেন

সুন্দর? এতো কেন নিখুঁত? উপর ওয়ালা কি একটু খানি খুঁত রাখতে পারতো না? ক্রীতিককে একটুখানি সস্থি দেওয়ার জন্য? এখন যে ক্রীতিকের মাতাল মাতাল লাগছে খুব, ইচ্ছে করছে নৃত্যরত অরুর পাশে দাড়িয়ে সবাইকে এনাউন্সমেন্ট করে বলতে, দেখো সবাই এই মিষ্টি মেয়েটা আমার বউ, আমার হার্টবিট, আমার সবকিছু, শুধু আমার। ওর নেশায় আমি আসক্ত, সঙ্গিন প্রনয়াসক্ত। কিন্তু ক্রীতিক তো সেসব বলতে পারেনা, কারন হৃদয়ের কথা মুখ ফুটে বলে বেড়ানো ওর ধাঁচে নেই। তাই অরুর নাচ শেষ হতেই ওকে টেনে টুনে মহলের মধ্যে নিয়ে গেলো ক্রীতিক।
করিডোরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অরু একটু ভয়ার্ত গলায় শুধালো,—- কি হয়েছে? এভাবে টানছেন কেন?
ক্রীতিক অরুর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হাস্কিটোনে বললো,
—- কি করেছিস এটা? আমি তো ঠিক নেই অরু, আ’ম নট ওকে?
অরু ক্রীতিকের কপালে হাত ছুয়িয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে ওঠে ,
—- কেন কি হয়েছে? সেদিন বৃষ্টিতে ভিজলেন বলে জ্বর আসেনি তো আবার, দেখি?
ক্রীতিক অরুর হাত সরিয়ে দিয়ে, নিজের একহাত, অরুর আঁচলের ফাঁক গলিয়ে ওর মেদহীন উদরে ছোঁয়ালো। ক্রীতিকের শক্ত হাতের স্পর্শে তৎক্ষনাৎ কেঁপে উঠল অরু। কম্পিত কন্ঠে বললো,
— কি করছেন, আঁচলটা এলোমেলো হয়ে যাবে তো।
—- হলে হোক, তুই যে আমাকে এলোমেলো করে দিয়েছিস তার কি হবে? এভাবে কেন নাচতে গেলি অরু? আমার যে এখন বুকে ব্য’থা করছে খুব, মনে হচ্ছে ম’রে যাবো। তোকে একান্তে কাছে পেতে ইচ্ছে

করছে, কিন্তু সেটাতো এই মূহুর্তে সম্ভব নয়।কারন বাইরে সবাই আমার সাথে মিট করার জন্য ওয়েট করে বসে আছে।
তাহলে এখন কি করবো আমি? তোর প্রতি এতো কেন আ’সক্তি আমার? কেন এতো সুন্দর তুই?বলনা?
তোকে কাছে না পেয়ে আমি যদি বুকের ব্যথায় ম’রে যাই? তখন সব দোষ তোর।
ক্রীতিক উ’দভ্রান্তের একের পর এক বুলি আওড়ে যাচ্ছিল। ওর চোখে মুখে ভীষণ কাতরতা,ভীষণ অসহায়ত্ব।
কিন্তু এই পর্যায়ে এসে ওর মুখটা হাত দিয়ে আলতো করে চেপে ধরলো অরু।
অতঃপর ক্রীতিকের চোখে চোখ রেখে না সূচক মাথা নাড়ালো।ক্রীতিকের একটা হাত তখন ও পেছনে লুকোনো। অরু চুপচাপ দাড়িয়ে আছে দেখে ক্রীতিক এবার বিনা দ্বিধায় হাঁটু ভে’ঙে বসে পরলো ওর সামনে,আলতো হাতে শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে নির্লিপ্তে ঠোঁট ছোঁয়ালো অরুর তুলতুলে কোমল উদরে, এরপর অন্য হাতটা সামনে বাড়িয়ে কাঁচা হলুদের রঙে রাঙিয়ে দিলো অরুর সমগ্র উদর।
ক্রীতিকের একেক’টা কাজে প্রত্যেক বারই বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পরে অরু,এবারও তার বিপরীত নয়। তবে এই মূহুর্তে বিস্ময়ের চেয়েও লজ্জায় চুপসে গিয়েছে ও। ক্রীতিক কি করলো এটা? কারও চোখে পরলে নিশ্চয়ই অরুকে পা’গল ভাববে? তারা’তো আর জানেনা যে অরুর একটা পা’গল স্বামী আছে।অরু আপন মনে হিজিবিজি ভাবছে,ক্রীতিকের ঘোর কাটেনি তখনও। ও উঠে দাড়িয়ে অরুকে এক ঝটকায় পেছনে ঘুরিয়ে, অরুর লম্বা চুলগুলো

একপাশে সরিয়ে দেয়, এবং এর পরপরই পুনরায় নিজ হাতে হলুদ রঙে রাঙিয়ে দিলো ওর কোমল পৃষ্ঠদেশ। অতঃপর সেভাবেই পেছন থেকে দু'হাতে শক্ত করে অরুর কোমড় জড়িয়ে ধরে,ওর হলুদ লাগানো পৃষ্ঠদেশে নিজের গাল ঘষে দিলো পরম আবেশে। ক্রীতিকের খড় দাঁড়ির সূঁচালো অনুভূতি আর ঠোঁটের স্পর্শে আরও একদফা কাঁপুনি দিয়ে ওঠে অরুর সর্বাঙ্গ। ও আর সহ্য করতে পারলো না ক্রীতিকের এমন এলোমেলো স্পর্শ। অগত্যাই ক্রীতিকের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে, একছুটে পালিয়ে চলে গেলো ক্রীতিকের দৃষ্টির অগোচরে। মস্ত বড় আলিশান বাড়িটা আজ ষাটের দশকের নামি-দামি রাজ প্রাসাদের মতোই জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে সেজে উঠেছে। এটাকে একঝলক দেখায় কে বলবে? যে এ বাড়িটাই গত কয়েক বছর যাবত মানব শূন্য হয়ে দিনাতিপাত করেছে। তখন অরু আর অনু ব্যতিত পুরো বাড়িটাই ছিল ভূতুড়ে বাড়ির ন্যায় শুনশান জনমানবহীন।
যদিও বা মামিরা আসতো কম বেশি, তবে সেটাও তাদের প্রয়োজনে। তাছাড়া মামিদের আগমন অরু অনুর নিকট সর্বদাই ছিল মোক্ষম আ'তঙ্কের কারণ। এক কথায় এরা আসার চেয়ে না আসাটাই ছিল বহুল কাম্য।
আজ বাড়িতে কোনো আ'তঙ্ক নেই। চারিদিকে খুশির ফোয়ারা বইছে। প্রত্যয় অনুর গায়ে হলুদের আয়োজন এ বাড়িতেই করা হয়েছে যার ফলসরুপ প্রত্যয়দের বাড়ির সবাইও এখানেই উপস্থিত। অমিতের আজ ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে তাই আসতে পারেনি, কাল হয়তো অমিতও আসবে।স্টেজে মন মাতানো গানের তালে একে

একে নাচ করছে নাচের দলের মেয়েরা। ভিআইপি অতিথি থেকে শুরু করে,সকলের মনোনিবেশ আপাতত স্টেজেই আটকে আছে। হাত ভর্তি মেহেদী নিয়ে স্টেজে প্রত্যয়ের পাশেই বসে আছে অনু, চোখের সামনে মজার মজার খাবার, অথচ কিছুই খেতে পারছে না মেয়েটা, ওদিকে সকাল থেকে না খাওয়ার দরুন পেটটাও কেমন গুড়গুড়াচ্ছে ওর।
পেটে ক্ষুদা থাকলে সবকিছুই যেমন বিষাদে পরিপূর্ণ,ঠিক তেমনি অনুর কাছেও আপাতত এই নাচগান হৈ-হুল্লোড় সবকিছু জঘন্য রকম তেঁতো লাগছে, বড্ড তেঁতো ।
অথচ অরুটা এন্ট্রি সং এ কোমড় দুলিয়ে সেই যে তখন উধাও হলো আর খবর নেই। অনু তখন থেকে কেমন হাসফাস করছে, ওর পাশেই বসেছিল প্রত্যয়।
কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারীরা এসে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছে প্রত্যয়কে, কিন্তু অনুর তাতে কোনো আগ্রহ নেই, ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই প্রত্যয় অনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে সামান্য নিচু স্বরে প্রশ্ন করলো,—- কি হয়েছে তোমার? তখন থেকে খেয়াল করছি অন্য মনস্ক হয়ে আছো।
অনু বরাবরই পরিস্থিতি সামলানো দ্বায়িত্বশীলা বড় মেয়ে, নিজের বিয়েতে অতিথি সকলের খাওয়ার আগেই, নিজের ক্ষিদে পাওয়ার মতো লজ্জা জনক কথাটা কৌশলেই প্রত্যয়ের কাছ থেকে চেপে গেলো ও।সামান্য হাসার চেষ্টা করে মুখ ফুটে অস্পষ্ট আওয়াজে বললো,
—- কই,কিছু হয়নিতো।

কিন্তু প্রত্যয় তো এতোটাও বোকা, কিংবা দ্বায়িত্বজ্ঞান হীন ছেলে নয়। অনুকে সে যথেষ্ট ভালোভাবে চেনে। তাই অনু বলা সত্ত্বেও সবার মাঝে থেকে স্টেজ খালি করে অনুকে নিয়ে সরাসরি অন্দরমহলের ভেতরে চলে যায় প্রত্যয়। যাওয়ার আগে নিজের বড় আপুকে ডেকে বলে অনুর রুমে যাতে এক প্লেট কাচ্চি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
একটু পরেই ওরা আসছে, তখন না হয় হলুদ লাগানো যাবে। রুমের ভেতরে প্রবেশ করে অনু ঠোঁট উল্টে বললো,
—- এতো মেহমানদের বসিয়ে রেখে আমাদের এভাবে চলে আসা কি ঠিক হলো?
প্রত্যয় হাত ধুয়ে এসে, পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে অনুর মুখে পোলাও এর লোকমা তুলে দিতে দিতে বললো,
—- যাবো তো,তার আগে খেয়ে নাও। নয়তো তোমার পেটের গুড়গুড় আওয়াজ আমি একা নই পুরো ক্রীতিক কুঞ্জ শুনে ফেলবে।
অনু খাবার চিবুতে চিবুতে নরম স্বরে বললো,
—— আপনি কিভাবে বুঝলেন আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে?
প্রত্যয় অনুর চোখে অনিমেষ চেয়ে থেকে বললো,
—- আমি কিভাবে বুঝলাম সেটা ম্যাটার করেনা, ম্যাটার হলো সেদিন এতো করে বুঝানোর পরেও তুমি আমাকে কিছুই শেয়ার করছো না, নিজের ভেতরের কথা ভেতরেই আটকে রাখছো। আচ্ছা অনু,একবারও ভেবে দেখেছো? আজ রাত পেরোলে কাল যে আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে যাবো। তুমি, আমি আমরা হয়ে যাবো।তোমার সকল ভয়, লজ্জা আমি নির্দ্বিধায় হরণ করে নেবো? তোমার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি হবো আমি, অথচ

সেই আমার কাছেই তুমি ইজি হতে পারছো না এখনো। সামান্য ক্ষিদে পেয়েছে এই কথাটুকুও বলতে দ্বিধাবোধ করছো, কেন?
অনু প্রত্যয়কে মানানোর চেষ্টা করলো, কিঞ্চিৎ আদুরে গলায় বললো,
—- আমিতো ভেবেছি সবার সামনে ক্ষিদে পেয়েছে বলাটা ভালো দেখাবে না, এতো লোকজন কে কি ভাববে…
অনুর বাকি কথা জিহ্বাতেই আটকে রইলো, তার আগেই প্রত্যয় কিছুটা শক্ত গলায় বললো,
——কতবার বলেছি আমার সামনে এতো ম্যাচিউরিটি, এতো দ্বায়িত্ববোধ দেখাতে হবে না, আমি আছিতো তোমাকে সামলানোর জন্যে, একটা প্রত্যয় আছে তো তোমাকে নিজের কাঁধে ঠায় দেওয়ার জন্য, তবুও কেন যে এতো ওভার থিংক করো কে জানে?
ওর কথা শুনে ফিক করে হেঁসে দিলো অনু, অতঃপর প্রত্যয়ের গলাটা মেহেদী শুকানো দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো,—— এতো আস্কারা দিচ্ছেন? আমি কিন্তু আপনার মাথায় চড়ে বসবো, তখন বুঝবেন বউয়ের কি জ্বালা।
অনুর শরীর থেকে মিষ্টি একটা বউ বউ গন্ধ বেরোচ্ছে, প্রত্যয় ভালোভাবে টের পাচ্ছে সেই সুঘ্রান, ও প্রথমে অনুর কপালে কপাল ঠেকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আস্বাদন করলো অনু অনু মিষ্টি মেয়েলী সুগন্ধটুকু, তারপর ওর নাকে নাক ঘষে হিসহিসিয়ে বললো,
—— আমিতো চাই তুমি আমাকে জ্বা'লাও, পো'ড়াও। জ্বা'লিয়ে পু'ড়িয়ে একদম নিজের সাথে মিশিয়ে নাও। এই দূরত্ব যে আর ভাল্লাগছে না অনু, একটুও ভাল্লাগছে না। বাড়ি ভর্তি মানুষ হলেও,

সেই মানুষের কোনোরূপ আনাগোনা নেই অন্দরমহলের চারিদিকে। সবাই আপাতত স্টেজের ওখানে নাচ গান নিয়ে মেতে আছে। দোতলার করিডোরটা পুরোপুরি নিরব। চারিদিক ল্যাভেন্ডার মোমের আলোয় চিকচিক করছে, সেই সাথে ওয়াইল্ড জেসমিনের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে।ক্ষনে ক্ষনে প্রবল ভেগে ধেয়ে আসছে বৈশাখী দমকা হাওয়া। হাওয়ার তালে দুলে উঠছে সৌন্দর্য বর্ধক লাল, নীল, হলুদ নেটের উপর কারুকার্য করা ফিনফিনে পর্দাগুলো। বাইরে থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট গানের লাইন,

” নেশা নেশা একি নেশা চোখে,

ভুলে থাকতে পারিনা তোকে,

অচেনা স্বপ্নগুলো তোকে ছুঁতে চায়”আর এদিকে একের পর এক নেটের পর্দার আড়ালে আলগোছে গা ঢাকা দিচ্ছে অরু। ক্রীতিক যখনই সেই পর্দাটা দ্রুত হাতে সরিয়ে দিচ্ছে, তৎক্ষনাৎ একই ভাবে ছুটে গিয়ে অন্য একটা পর্দার আড়ালে ঠায় নিচ্ছে অরু। এভাবেই করিডোরের এমাথা ওমাথা করছে ওরা দুজন। একজন চোখের লজ্জা আর মনের সংকোচ আলগোছে লুকোতে নিঃশব্দে আড়াল হচ্ছে, তো আরেকজন মনের কামনায় চোখের যাতনায় বারবার তাকে উন্মুক্ত করছে।

নিরব রাত নিস্তব্ধ পদধ্বনি অথচ দুজনার হৃদ মাঝারে বয়ে যাচ্ছে উত্তাল সমুদ্রাগত তীব্র জ’লোচ্ছ্বাসিত জোয়ার। যার নাম “প্রেম”।অরু পারছে না ক্রীতিকের সাথে, পারছে না নিজের লজ্জাটুকু আড়াল করে লুকিয়ে থাকতে, বারবার ওকে কাছে টানার পায়তারা করে যাচ্ছে ক্রীতিক। বেহায়া পুরুষ ক্রীতিক।

আজ কি এমন হলো লোকটার? বুঝে উঠতে পারছে না অরু। ওদিকে সফেদ লেহেঙ্গাটা হলুদে মাখামাখি, সেই সাথে ক্ষনিক আগের ক্রীতিকের অবাধ্য স্পর্শ গুলো এখনো জীবন্ত, কি শিহরণ, কি উথালপাথাল পা'গলপারা অনুভূতি ভাবতে গেলে এখনো শরীরের লোমকূপ দাড়িয়ে যাচ্ছে অরুর ।
ক্রীতিক যেভাবে ওর পেটে পিঠে হলুদ মেখে দিয়েছে মনে হচ্ছে গায়ে হলুদটা অনুর নয়,বরং অরুরই।আর ক্রীতিক হলো একমাত্র ব্যক্তি যে অরুকে হলুদ মাখিয়ে গায়ে হলুদ সম্পন্ন করেছে আর কারোর হলুদ লাগানোর প্রয়োজন নেই ওর বউয়ের শরীরের ভাজে।ক্রীতিকের সাথে লুকোচুরি প্রেমে এবার সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছে অরু, একপর্যায়ে উপয়ান্তর না পেয়ে তিনতলার সিঁড়ি ধরে দৌড়ে ছাঁদে উঠে গেলো ও। অরুকে এভাবে দিশেহারা হয়ে ছুটতে দেখে ভ্রম ছুটে গেলো ক্রীতিকের। মাতাল ভাবটা মস্তিষ্ক থেকে সরে যেতেই ক্রীতিক হাঁক ছেড়ে অরুকে বললো,
—— আস্তে, সাবধানে বেইবি, তুই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলে আমি ডিএনএ কাকে দেবো বলতো?ছাদেঁর পাঁচিলে দু-হাত রেখে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এলিসা। ওর দু'চোখ দূর আকাশে নিবদ্ধ, যেখানে আলো নেই, চাঁদের দেখা নেই, আছে কেবল একফালি কালচে মেঘের ঘনঘটা।
আজকেও বোধ হয় সেদিনের মতো দা'নবীয় ঝড় আসবে ভূবণ ভুলিয়ে।সেই সাথে আকাশ ফুটো হয়ে ঝমঝম বৃষ্টি। এলিসা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ওর চাঁদের মতো ফ্যাটফ্যাটে ফর্সা মুখের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে অর্ণব।

একটু আগেও ওর সাথে যা নয় তাই ব্যবহার করেছে এলিসা, ওর প্রতিটি কথা ছিল বি'ষাক্ত তীরের ফলার মতোই বে'দনাদায়ক আর অ'পমান জনক। কিন্তু অর্ণব তো বরাবরই নির্লজ্জ, এলিসার কাছে দু'পয়সার দাম না পেলেও ওর ইমেজে এইটুকু ভা'ঙন ধরেনা, এটা আজ বা কাল থেকে নয়, বরং বহু বছর আগে থেকেই। তাইতো এলিসার বলা তি'ক্ত কথা গুলোকে একপাশে সরিয়ে অকস্মাৎ পেছন থেকে দু'হাতে শক্ত করে ওর কোমড় জড়িয়ে ধরলো অর্ণব।
গ্রীবা নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ওর ঘাড়ের উপর। অর্ণব ধরেছে থেকেই এলিসা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছটফট করছে। কিন্তু অর্ণব তাতে এক ফোঁটাও বিরক্ত নয়, উল্টো এলিসাকে আরও কাছাকাছি এনে ওর ঘাড়ে গলায় উ'ন্মাদের মতো সামান্য জো'র খাটিয়ে দাঁত বসাতে বসাতে অর্ণব শুধালো,—- কি হয়েছে জান,কে কি বলেছে? এক্ষুনি বল, নয়তো, নয়তো আমি তোকে ব্যথা দিতে বাধ্য হবো। আমার কা'মড় গুলো জোরালো হবে, তোর ফর্সা শরীরটা র'ক্তিম হয়ে উঠবে। আর….
অর্ণব কথা শেষ করতে পারলো না, তার আগেই নিজেকে ছাড়িয়ে ওর শক্ত হাতে অর্ণবের তীক্ষ্ণ ফর্সা গালে আচমকা চ'ড় বসালো এলিসা। অর্ণব নিজেও বোধহয় আশা করেনি এলিসা হুট করে এমন কিছু করবে।
ওদিকে চ'ড় খেয়ে পাশ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অরুর সাথে চোখাচোখি হলো অর্ণবের। অরুকে দেখা মাত্র ও আর এক মূহুর্ত ও দাঁড়ালোনা। থমথমে মুখ নিয়ে, অরুকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে ত্যাগ করলো সিঁড়ি ঘর।

অর্ণব চলে যেতেই অরু এগিয়ে এলো এলিসার নিকট, কিছুটা ইতস্তত আর ভয়ার্ত কন্ঠে অস্ফুটে শুধালো,
—- কিছু হয়েছে আপু? তুমি কি কোনো কারনে ডি’স্টার্ব?অরুর কথায় এলিসা আড় চোখে তাকালো ওর দিকে। অরু শুষ্ক ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আবারও বললো,
—— না মানে, আমাদের বাড়িতে কেউ যদি কিছু….
অরুর কথা এখানেই আটকে গেলো, বাকি কথাটুকু গ্রাস করে নিলো হতবিহ্বল এক অনাকাঙ্খিত পরিবেশ। হুট করেই অরুর কথার মাঝে ওকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠলো এলিসা। এলিসার মতো শক্ত আর কঠোর মানবী যে কাঁদতেও পারে, তা আগে জানা ছিলোনা অরুর।
এই ক্রীতিকের বন্ধু মহলটাই কেমন রহস্যে ঘেরা এক দূর্লভ প্রাচূর্য, যার উপরটা চকচকে আর আকর্ষনীয় হলেও ভেতরটা রহস্যের জালে মোড়ানো, কখনো সেখানে ধরা দেয় প্রকট অসহায়ত্ব, কখনো বা কিঞ্চিৎ অপারগতা।
কি অদ্ভুত হাতের কাছে টাকার পাহাড় থাকতেও কিছু মানুষ অসুখী, বড্ড অসুখী। কি এতো না পাওয়া তাদের? বুঝতে পারেনা অরু, আপাতত বোঝার মতো সময়ও না, ও তৎক্ষনাৎ নিজের হিজিবিজি ভাবনার ইতি ঘটিয়ে এলিসার পিঠে আলতো হাত বুলিয়ে বললো,—- কি হয়েছে আপু, বলা যাবে?
এলিসা পুনরায় সটান হয়ে দাঁড়ালো, চোখের পানিটুকু আঙুলের ডগা দিয়ে তাড়াহুড়ো মুছতে গিয়ে আবারও ফুঁপিয়ে উঠলো। অরু বুঝলো এলিসা নিজেকে জোরকদমে সামলাতে চাচ্ছে, কিন্তু কোনো কারনে পারছে না।

—- বলোনা আপু কি হয়েছে? অর্ণব ভাইয়া কি?
অরুর কথার মাঝখানে এলিসা বলে ওঠে,
—- ওর কোনো দোষ নেই অরু, সব দোষ আমার, আমিইতো বেবিটাকে.....
কান্নার তোপে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে এলিসার, অরু একটা বড়সড় দম নিয়ে আস্তে করে প্রশ্ন ছু'ড়লো,
—— তুমি কি প্রেগন্যান্ট আপু?
এলিসা কাঁদতে কাঁদতে শুধু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো।
অরু ঝটকা খেলো না, ও তো মনেমনে এটাই সন্দেহ করেছিল,তারপর আবারও বললো,
—-বাচ্চাটা নিশ্চয়ই অর্ণব ভাইয়ার?
এলিসা এবার জবাব দিলো,—— হ্যা, সেদিন যখন জেকে এল এ থেকে ফিরলো, অর্ণব হুট করেই জেকের জবাবদিহীতার ভ'য়ে আমার বাসায় চলে এসে ফোন টোন বন্ধ করে দেয়। তারপর বেশ কয়েকদিন ও আমার বাসাতেই ছিল।
অরু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে গলায় অসহায়ত্ব ধরে রেখে বললো,
—— তাহলে এটা অর্ণব ভাইয়াকে কেন জানাচ্ছো না? ওনার সন্তান ওনার তো জানার অধিকার রয়েছে।
এলিসা নাক টেনে বললো,—- তোমার কি মনে হয়, বিয়ের আগে এই বাচ্চাকে ও কখনো স্বীকৃতি দেবে? শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বলবে অষুধ খেয়ে ন'ষ্ট করে ফেলতে।যেটা আমি পারছি না, আমার দ্বারা হচ্ছে না, গত ওয়ান উইক যাবত এটাই চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি। কিন্তু আমি পারছি না অরু, মাতৃত্ব আমাকে বারবার

অ’পরাধীর কাঠগ’ড়ায় দাঁড় করাচ্ছে, আমার মতো শক্ত হার না মানা মেয়েটাকেও তীব্র ভাবে হারিয়ে দিচ্ছে এই দুই মাসের ভ্রুণটা। কি করবো আমি?
অরুর চোখ দুটো অভিমানে ছলছল করছে, এলিসা এমন একটা কথা ভাবলো কি করে সেই অভিমান? নাকি অর্ণবকে কষ্ট দিলো সেই অভিমান? জানা নেই অরুর, যা হোক ও নিজেকে সামলালো, অতঃপর আস্তে ধীরে ছাঁদের পাঁচিলে অহেতুক আঙুল ঘষতে ঘষতে বড়বড় শ্বাস ফেলে বললো,—- আমি বিবাহিতা আপু, জায়ান ক্রীতিকের মতো ঘা’ড়ত্যা’ড়া লোকটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি, ওনার বড্ড বেশি মুড সুইং হয়। যখন মেজাজ বিগড়ে যায়, তখন কি বলে, না বলে নিজেও খেয়াল করে উঠতে পারেনা। সেসময় ওনার মাঝে যেন উনি থাকেনা,বরং জেগে ওঠে এক হিং’স্র পশু সত্তা।
তবুও আমি ওনার মাঝেই সুখ হাতরে বেড়াই, নিজের মাঝে ওনার রাগ ঢাক সবটা সহ্য করার ক্ষমতা ধারণ করি, দিনশেষে উনিই আমার শান্তি নিকেতন, কারন উনি হলেন আমার প্রেমিক পুরুষ, আমার জনম জনমের ভালোবাসা, আমার জায়ান ক্রীতিক।এতো কিছু কেন বলছি জানো আপু?কারন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মানুষটা আর যাই হোক, নিজের প্রান পণ উজাড় করে হলেও, আমাকে বি’পদ, আপদ, দোটানা, পিছুটান এবং সবরকম অশু’ভ থেকে খ’ঞ্জরের মতো রক্ষা করতে কোনোদিন কার্পন্য করবেনা। আর না কোনোদিন পিছুপা হবে। সেটা যদি মৃ’ত্যুর দুয়ারও হয় তবুও না।

আর সেখানে তুমি অর্ণব ভাইয়ার ভালোবাসায় আঙুল তুলছো আপু? আমিতো বহুদূর থেকেও দেখতে পাই তোমার প্রতি ওনার এক আকাশসম মায়া, এক মহাসমুদ্র ভালোবাসা, এক পৃথিবীসম হৃদয়ের টান। তাহলে তুমি কেন দেখতে পেলেনা আপু?উনিতো কষ্ট পেলেন, যে তোমাকে বছরের পর বছর শর্তহীন ভালোবেসে গিয়েছে সে কষ্ট পেলো।তোমার বাচ্চার বাবা কষ্ট পেলো। যার অংশ তোমার উদরে একটু একটু করে বড় হচ্ছে সেই মানুষটা কষ্ট পেলো। যে তোমাকে জীবনে প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করিয়েছে সেই মানুষটা আ'ঘা'ত পেলো,.....
অরু গড়গড়িয়ে আরও কিছু বলবে,তার আগেই ওর দু'হাত শক্ত করে চেপে ধরে ফুপিয়ে উঠলো এলিসা, কা'ন্না জড়ানো কন্ঠে ঠোঁট ভেঙে বললো,
—— থামো অরু, আর নিতে পারছি না আমি, অর্ণব কোথায়? ও কোথায়?আমার বাচ্চার বাবা কোথায়? ওকে ডেকে আনো, বলো যে আমাকে যতদ্রুত সম্ভব বিয়ে করে নিজের বক্ষস্থলে ঠাঁয় দিতে।আমি আর পারছি না,ওকে ছাড়া আর এক মূহুর্তও থাকতে পারছি না।
কথাগুলো বলে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু ভেঙে ধপ মাটিতে লুটিয়ে পরলো এলিসা। অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে এলিসাকে শান্ত করে বললো,
—- তুমি এখানেই থাকো আপু, আমি এক্ষুনি আসছি।অরু নিচে নেমে অর্ণবের ঘর তালাশ করে দেখলো অর্ণব ঘরে নেই, তাই একটু সন্দেহ বশত এগিয়ে গেলো ক্রীতিকের ঘরের দিকে। কারন এই

সময় অর্ণবের ক্রীতিক আর সায়রের কাছে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
হলোও তাই, অরু কোনোরূপ কড়ানাড়া ছাড়াই ক্রীতিকের রুমে প্রবেশ করলো। ভেতরে ঢুকতেই দেখা মিললো ওদের তিনজনার, ক্রীতিক ভিডিও গেইমটাকে পজ করে থমথমে মুখ নিয়ে গেমিং চেয়ারটাতে বসে আছে, অর্ণব আর সায়র ও তাই, চুপচাপ বসে আছে বেডের উপর। দেখে মনে হচ্ছে অরুকে দেখামাত্র ওরা একটু অসস্থিতেই পরলো বটে। অরুর অবশ্য তাতে যায় আসেনা, কিন্তু ও ভেতরে প্রবেশ করার আগেই বাঁধসেধে ক্রীতিক বলে,
—— কি হয়েছে অরু, কিছু বলবি?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বলে,
—- রাতে শুনবো, এখন রুমে যা।
ক্রীতিকের কথায় ঘোর আপত্তি জানালো অরু, ওর কথায় কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে ভেতরে আসতে আসতে অরু বলে,—— আমার জরুরি কথা আছে।
ক্রীতিক একটু শা'সানোর সুরে বললো,
—- বলেছিতো এখন না পরে শুনবো, দেখছিস না এখানে বড় রা কথা বলছে?
—— আপনাদের কথা পরে শুনবো, আগে আমার কথা শুনুন।
ক্রীতিক বুকের ভেতরের তপ্ত দীর্ঘঃশ্বাসটা নাক দিয়ে বের করে, একটু গম্ভীর গলায় বললো,
—— বেইবি রাগ উঠাস না, রুমে যা, রাতে তোর সব কথা শুনবো, দরকার পরলে সারারাত না ঘুমিয়ে শুনবো, বাট নট নাও।এখানে বড়রা কথা বলছে, যদি

আমার রুম থেকে যেতে ইচ্ছে না করে তো চুপচাপ বসে থাক। নো মোর সাউন্ড ওকে?
অরু বুঝলো ক্রীতিক নাছোড়বান্দা, ওকে কিছুতেই আলাদা কথা বলতে দেবে না এই নি'র্দয় লোকটা, তাই এবার উপয়ান্তর না পেয়ে অর্ণবের দিকে দৃষ্টিপাত করে, অরু সবার সামনে বলেই ফেললো,
—— ভাইয়া, এলিসা আপু অন্তঃসত্ত্বা।
অরুর কথাতে যেন ঘরময় ব'জ্রপাতের আওয়াজ হলো।
সায়র,অর্ণব, এমনকি ক্রীতিক পর্যন্ত হতভম্বের মতো চেয়ে আছে অরুর পানে। সবাই এখনো ভ্রম থেকে বেরোতে পারেনি বিধায়, অরু পুনরায় অর্ণবকে ডেকে বললো,—— আপু ছাঁদে অপেক্ষা করছে।
এবার একে একে টনক নড়লো সবার, এই মূহুর্তে ওদের চোখে সবচেয়ে বড় অ'পরাধী অর্ণব। সায়র তো রা'গ দমাতে না পেরে কটমটিয়ে বলেই উঠলো,
—— শালা ধা'ন্ধাবা'জ, বাসর ফাসর সেরে বাচ্চা পয়দা করে, এখন এখানে এসে ইনোসেন্ট সাজা হচ্ছে?
বেচারা অর্ণব চরম অসহায়ের মতো চুপসানো মুখে সায়রকে ঝাড়ি মে'রে বললো,
—- আমি কি জানতাম নাকি?যে এক বাসরেই বাচ্চা হয়ে যায়? তাহলে অন্তত গেস করা যেত।
তৎক্ষনাৎ বিরক্তি প্রকাশ পেলো সায়রের চোখে মুখে, ওর চোখে এই মূহুর্তে মী'রজাফরের চেয়েও বড় বে'ঈমান এই বন্ধুগুলো। নিজের ইমোশন সামাল দিতে না পেরে ও ক্রীতিক আর অর্ণবকে তর্জনী দিয়ে ইশারা করে ব্যথাতুর স্বরে বলে উঠলো ,—- তোদের

একটাকেও আমি আর বিশ্বাস করিনা, আমাকে না নিয়ে কিভাবে বাসর সেরে ফেললি তোরা? একটু ও মনে পরলো না আমার কথা?এই সিঙ্গেল ছেলেটার কথা?
ক্রীতিক ওর কথায় দু পয়সার পাত্তা দিলোনা, উল্টে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস হয়ে শুধালো,
—— কি করবি এখন?
অর্ণব মৃদু হেসে একটু লাজুক হওয়ার ভান ধরে বললো,
—— কি আর করবো, বাচ্চার মাকে বউ বানাবো।
ক্রীতিক অর্ণবের কথায় সম্মতি জানিয়ে বললো,—- ওকে ফাইন, প্রত্যয় অনুর গায়ে হলুদটা শেষ হোক দেন আমরা কোনো একটা রেজিষ্ট্রি অফিসে যাবো, রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেলে তারপর না হয় কোনো একটা চার্চে নিয়ে ফাদারের আশির্বাদ নিয়ে আসবি তোরা।
সায়র উৎসুক হয়ে ক্রীতিকের কথায় বাম হাত ঢুকিয়ে বললো,
—- ভাই এতো রাতে রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ? কে খুলে রাখবে তোদের জন্য রেজিষ্ট্রি অফিস?
ক্রীতিক বসা ছেড়ে উঠে এলো, অতঃপর সায়রের কাঁধে হাত রেখে বললো,
—- বাংলাদেশে একধরণের কাগজের প্রচলন আছে বন্ধু,যেটার মাধ্যমে শুধু রেজিষ্ট্রি অফিস কেন? গন ভবন ও চব্বিশ ঘন্টা খুলে রাখা যায়।অর্ণব আর সায়র মাত্রই ক্রীতিকের রুম থেকে বেরিয়ে গেলো, অরু এখনো এককোনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রীতিকের এতোক্ষণে নজর গেলো অরুর দিকে, যে ঠোঁট, নাক ফুলিয়ে কপাল কুঁচকে দাড়িয়ে আছে। অরুকে দেখে ক্রীতিক এগিয়ে এসে আলতো হাতে ওর নাক টেনে দিয়ে শুধালো,

—-- হোয়াট হ্যাপেন্ড হার্টবিট? খেয়ে ফে'লবি নাকি? নিজেকে লবন ম'রিচ মাখিয়ে প্রিপেয়ার করে আনবো কিনা বল ?
ক্রীতিকের এই মধুর আওয়াজ তেঁতো ঠেকলো অরুর নিকট, এই লোক ওকে ভাবে টা কি আসলে? পিচ্চি বাচ্চা? নাকি ফিডার খাওয়া দুধের শিশু? কোনো কথায়ই বলতে দেয়না আশ্চর্য!
তৎক্ষনাৎ মনে মনে ক্রীতিকের সঙ্গে কোনোরূপ কথা আদান-প্রদান না করার দৃঢ় প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হলো অরু।
অতঃপর নিজের প্রতীজ্ঞায় অটল থাকার উদ্দেশ্যে ওর প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়েই ফোসফাস করতে করতে ক্রীতিকের রুম ত্যাগ করলো অরু।—-- আগে হলুদ না লাগিয়ে এখান থেকে আমি এক পা'ও নড়বো না, ব্যাস।
সায়র ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
—-- নড়বে না মানে? তোমার আব্বাজান নড়বে,রেম্প ওয়াক থেকে বিলবোর্ড, সায়র কখনো লাস্ট হয়না,আর এই সামান্য হলুদের অনুষ্ঠানে আমি লাস্ট হবো? নো ওয়ে। তাছাড়া বউ জাতি সবসময় বর জাতির পেছনেই অবস্থান করে, দেখলে না তখন অরু জেকের পরে এসে হলুদ লাগালো।
—--বউ জাতি আর বর জাতি বলতে যে কোনো এলিয়েন জাতি হয়,সেটা আপনার মুখেই প্রথম শুনলাম, অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার সেরকম কিছু নেই, আপনি তো পাগলু একটা।
—-- হ্যা শুধু তোমার পাগলু, ঝিঙ্কু!
সায়র মাথায় হাত বুলিয়ে দেবের মতো একটু ভাব ধরতেই।নীলিমা চোখ গরম করে বলে,

—-- এ্যাই কি বললেন আপনি?সন্ধ্যা রাতের ইতি টেনে গভীর রাত ঘনিয়ে আসছে। চারিদিকে জোরকদম হাওয়া দিচ্ছে। মনে হয় খানিক বাদেই ঝুম বৃষ্টিতে মুখরিত হবে ধরনী, অথচ অনু আর প্রত্যয়ের হলুদ সন্ধ্যার এখনো ইতি ঘটেনি। এর কারণ একটাই সায়র আর নীলিমা তখন থেকে যায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বলছে আমি আগে হলুদ লাগাবো,তো আরেকজন বলছে না আমি আগে।

কেউ কাউকে এক চুল পরিমাণ ছাড় দিতে নারাজ তারা। এদিকে নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে অন্য অতিথিদের ও সময় খেয়ে দিচ্ছে ওরা দুজন। পেছনের অতিথি সমাজ বেশ বিরক্ত ওদের কান্ডে, এক পর্যায়ে একজন বয়জেষ্ঠ অতিথি না পেরে এগিয়ে এসে, ওদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো,

—— বাচ্চারা, তোমরা বরং একটা কাজ করো ওই পাশে গিয়ে আগে নিজেদের ঝামেলা মিটিয়ে আসো, দরকার পরলে সময় নাও,সুপ্রিম কোর্টে যাও,মা’মলা করো,ইনভেস্টিগেশন করে জাজের থেকে অনুমতি নিয়ে ফিরে আসো, আসলেই কার আগে হলুদ দেওয়া উচিৎ। তবুও এই বৃদ্ধের উপর দয়া ধরে যায়গা ছাড়ো ভাই, সেই তখন থেকে তোমাদের ঝগড়া দেখে দেখে সুগার বেড়ে গেলো আমার, বাড়ি গিয়ে ইনসুলিন লাগাতে হবে,তাড়া আছে সর,দেখি বাপু। সায়র নীলিমাকে নিয়ে সরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে সন্দিহান গলায় বললো,

—— আশ্চর্য কথা বললেন তো দাদু, কোর্টে যাবো,মা’মলা করবো, রায় হবে, ততক্ষণ কি ওরা দুজন বিয়ে না করে আইবুড়ো হয়ে এক চিমটি গায়ে হলুদ লাগানোর জন্য এখানে বসে থাকবে নাকি?

বৃদ্ধ এবার দাঁত খিঁচিয়ে সায়রের দিকে বিরক্তিকর দৃষ্টি নিক্ষেপ বললেন,
—- এতোই যখন বুঝিস হতচ্ছাড়া, তাহলে সেই তখন এক চিমটি হলুদ লাগানো নিয়ে এতো নাটক করলি কেন? দুইটা মানুষ চারটা গাল, যার যেখানে খুশি হলুদ লাগাতি, তা-না তখন থেকে যুক্তি দিয়ে দিয়ে কানের মাথা খেয়ে ফেলেছিস। তোরা দুজন এই হলুদ অনুষ্ঠান থেকে বয়’কট এক্ষুনি বিদেয় হ।
সায়র নীলিমাকে নিয়ে স্টেজ ছেড়ে নেমে যেতে যেতে গম্ভীর মুখে বিড়বিড়িয়ে বললো,
—– এ নিশ্চয়ই অরুর মায়ের বংশের কেউ হবে। নয়তো দাঁত না থাকা সত্বেও মুখের ভাষা এতো তেঁতো কেন?আজিব!অবশেষে অনুর গায়ে হলুদের রাতে অর্ণব এলিসার রেজিষ্ট্রিটা হয়েই যায়। ক্রীতিক নিজ উদ্যগেই ওদের বিয়েটা দিয়েছে। আর এই মূহুর্তে রেজিষ্ট্রি অফিসের বাইরের করিডোরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ক’জন।
বাইরে আকাশ ভে’ঙে বৃষ্টি হচ্ছে। নীলিমা আর অরু হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রীতিক একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে সিগারেটের শলাকা ধরিয়েছে। আর এলিসা এখনো অর্ণবের গলা জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। এলিসা কাঁদছে দেখে অর্ণব উদ্বিগ্ন হয়ে বললো,
—- এভাবে কাঁদছিস কেন এলি? ভুলে গিয়েছিস ইউ আর প্রেগি উইথ মাই বেবি? তুই এভাবে কাঁদলে আমার বাচ্চাটার ক’ষ্ট হবে,সাথে আমারও। সো স্টপ ক্রাইং রাইট নাও।
সায়র দু’হাতে কয়েকটা ছাতা নিয়ে ওদের নিকট এগিয়ে আসতে আসতে বললো,

—-- হয়েছে আদিখ্যেতা বন্ধ কর, আমাদের হার্ড ওয়ার্কিং এলিসাটাকে দিলি তো অসুস্থ বানিয়ে। এখন আর দরদ দেখাতে হবেনা।
অর্ণব জোর গলায় সায়রকে শাসিয়ে উঠে বললো,
—-- খবরদার আমাদের বাপ ব্যাটাকে কিছু বলবিনা সায়র, তাহলে তোর কপালে সারাজীবন আইবুড়ো থাকার সিল লেগে যাবে, বলে দিলাম।
অর্ণবের কথায় এলিসা মৃদু হেসে ফেলে। এলিসা হেসেছে দেখে অর্ণব ওর কপালে আলতো চুমু খেয়ে বলে,—-- এই তো লক্ষী বউ আমার।
এলিসা চারিদিকে চোরা চোখে চেয়ে অর্ণবকে সামান্য ধা’ক্কা মে’রে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললো,
—-- হয়েছে, ছাতা এসে গেছে চল এবার। কাল বিয়েতে অনেক কাজ। আর আমরা এখনো এখানে।
অর্ণব এলিসাকে কোলে নিয়ে একহাতে ছাতা ধরে এগোতে এগোতে বললো,
—-- তোর বাচ্চার বাবা হয়ে যাচ্ছি, এখনো তুই করেই ডাকবি জান?
এলিসা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দু’হাতে অর্ণবের গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ভাবুক হয়ে বললো,
—-- কি ডাকা যায় বলতো তোকে? আমার তো তুমি আসছে না। ভাবতেই কেমন হাসি পাচ্ছে।
অর্ণব এলিসা পায়ে পায়ে গাড়ির পর্যন্ত চলে গিয়েছে, ওরা যাওয়ার পরে ক্রীতিক একটা ছাতা ধরে অরুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলে,—-- বেইবি কোলে আয়।

—-- মোটেই না, আপনার কোলে আপনিই উঠুন।
কথাটা বলে মুখ ঝামটি দিয়ে বৃষ্টির মাঝেই তরতরিয়ে এগিয়ে যায় অরু। অরুর কান্ডে ক্রীতিক গম্ভীর মুখে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। সায়র একটুখানি সরে দাড়িয়ে নীলিমাকে নিজের ছাতায় আমন্ত্রণ জানালে নীলিমাও উপায়ন্তর না পেয়ে সহসা এগিয়ে এসে ওর পাশেই ছাতার তলায় দাড়িয়ে পরে।
সায়র নীলিমা সমেত গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্রীতিকের দিকে হতবাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ দিয়ে চু চু উষ্চারন করে ওকে টিপ্পনী কেটে বললো,
—-- তুই আসলেই জেকে তো? বিয়ে করে কি হাল হয়েছে ছেলেটার,বেচারা!
তৎক্ষনাৎ ক্রীতিক নিজের পায়ের স্লিপারটা ওর দিকে ছু’ড়ে মে’রে দাঁত খিঁচিয়ে বললো,—-- শালা যাবি এখান থেকে?
সায়র ওকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে যায়, ক্রীতিকের চোখমুখ এখনো রাগের তোপে র’ক্তিম হয়ে আছে, অথচ অরু কি হাসি মজাটাই না করছে সকলের সাথে। শুধু ক্রীতিককেই ইগ্নোর করছে। ক্রীতিক অরুর দিকে তাকিয়ে দু’হাত মুঠি বদ্ধ করে, মনেমনে তীক্ষ্ণ আওয়াজে বললো,
—-- অরুর বাচ্চা তোকে একবার হাতের কাছে পেয়ে নিই। তারপর তোর হচ্ছে।
নীলিমা লেহেঙ্গা সামলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, সায়র বারবার ঘাড় নামিয়ে নীলিমার দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। দুজন একই ছাতার নিচে হওয়ায় দূরত্ব বেশ স্বল্প। আপাতত তারই সুযোগের সৎ ব্যবহার করছে সায়র। নীলিমা লেহেঙ্গা সামলে যেই না মাথা তুলবে ঠিক

তখনই সায়রের চিবুকের সঙ্গে অকস্মাৎ ধা'ক্কা খেলো ও। সায়র এমন ঝুঁকে আছে দেখে চিড়িবিড়িয়ে উঠলো নীলিমার মস্তিষ্ক, মুখ দিয়ে বিরক্তির প্রতিক্রিয়া জানালো তৎক্ষনাৎ,
—- এভাবে ঝুঁকে আছেন কেন? আমি কি চিড়িয়া? যে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে না দেখলে মহাভারত অসুদ্ধ হয়ে যাবে?
সায়র নীলিমার কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে দিতে শুধালো,—- এতো সুন্দর স্মেল কেনো? কি শ্যাম্পু লাগাও চুলে হ্যা?
নীলিমা চোখ খিঁচিয়ে বললো,
—- আপনি আবার ইভ'টি'জিং করছেন? আমি কিন্তু আব্বাজান কে বলে দেবো।
নীলিমা ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাটছে, সায়র কিছুটা তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এসে আবারও নীলিমার মাথায় ছাতা ধরে রাশভারি গলায় বললো,
—- এ্যাই মেয়ে, সমস্যাটা কি? আমি যে তোমার বড়, বড়দের কথা শুনতে হয়, সে জ্ঞান কি বিয়ে বাড়ির বোরহানির সঙ্গে গুলে খেয়েছো নাকি?
নীলিমা হাঁটার গতি পুরোপুরি থামিয়ে দিয়ে সায়রের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বললো,
—- ওই জন্যই তো বলছি বড় বড়দের মতো থাকুন। সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরঘুর করছেন কেন শুনি?
সায়র এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে নীলিমার সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, তারপর ঘাড়টা কিঞ্চিৎ নিচে নামিয়ে গলার আওয়াজ

ক্ষীণ করে বললো,—— মনের সাথে মন মিলাতে চাই বলে, তোমার আব্বাজান কে শশুর বানাতে চাই বলে।
সায়রের কথা শুনে নীলিমা একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে ঠোঁট টিপে বলে ওঠে,
—- আব্বাজান কিন্তু এখনো আ'ছোলা বাঁশ হাতে নিয়ে বাড়ির আশেপাশে বিদেশি বাঁদরটা খুঁজে বেড়ায়।
নীলিমার কথা শুনে ফাঁটা বেলুনের মতো চুপসে গেলো সায়রের মুখখানা। নীলিমা দাঁড়ালোনা, সায়রের হাত থেকে ছাতাটা কেঁ'ড়ে নিয়ে সহসা এগিয়ে গেলো সামনের দিকে, সায়র পেছন থেকে হাঁক ছেড়ে বললো,
—- তবুও তোমার আব্বাজানকেই শশুর বানাবো আমি, কথাটা মনে রেখো।
পরক্ষণেই মুখ কাচুমাচু করে একাই বিড়বিড়ালো,
—- একটু আধটু বাঁ'শ খেলে কিছু হয়না। রাতের শেষ প্রহর চলমান... পুরো ক্রীতিক কুঞ্জ ভীষন নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে, ঘুমের ঘোরে সবাই বিভোর। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়ে হিমেল হাওয়া বইছে। ঠান্ডা হাওয়ায় ক্ষনে ক্ষনে কেঁপে উঠছে ঘুমন্ত অরু। শেষ রাতে আর জানালাটা বন্ধ করা হয়নি,ওই জন্যই এতো হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করার মতো শক্তিও নেই অরুর, তাই শীতল হাওয়া গায়ে মাখিয়ে কিছুটা জড়োসড়ো হয়েই নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা।
শীতল ঠান্ডা আর কোমলতার মাঝে একখন্ড খরখরে হাতের উষ্ণ পরশে আচমকাই কম্পিত হয়ে উঠলো ঘুমন্ত অরুর তনু শরীরটা। অরু ঘুমের মাঝেও স্পষ্ট টের পাচ্ছে কেউ একজন ওর তুলতুলে

নরম উদরে আবেশিত আঙুল বুলাচ্ছে। সেইসাথে টুকরো টুকরো চুমুতে ভিজিয়ে তুলছে সর্বাঙ্গ। লোকটা অরুর কপাল,ঠোঁট, গলা, এরপর আরেকটু নিম্নভাগে স্পর্শ করতেই হকচকিয়ে চোখ খুললো অরু।
চারিদিক নিকোশ আধারে তলিয়ে আছে, অন্ধকারে কারোর মুখ দেখার যো নেই, তবুও স্যান্ডাল উড পারফিউমের সুবাসটা নাকে ঠেকতেই সস্থির নিঃশ্বাস ছাড়লো অরু। অতঃপর গলা খাদে নামিয়ে শুধালো,—- আপনি এখানে?
ক্রীতিক জবাব দেয়না, নিঃশব্দে অরুকে বাচ্চাদের মতো কোলে তুলে নিয়ে পা বাড়ায় রুমের বাইরে। ক্রীতিক এভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে অরু উদ্বিগ্ন আওয়াজ অথচ বেশ নিচুস্বরে বললো,
—- আরেহ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এই রাত দুপুরে?
ক্রীতিক একহাত দিয়ে নিজের রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জড়ানো গলায় বললো,
—- বউকে ছাড়া ঘুম আসছে না।
অরু ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,
—- আপনি আবার ড্রিং’ক করেছেন?
ক্রীতিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—- ওরা সেলিব্রেশন করেছে,কিন্তু বিশ্বাস কর আমার একটুও নে’শা হয়নি, আমিতো এখন নে’শা করবো।
কথা শেষ করে অরুকে বিছানায় ছু’ড়ে মা’রলো ক্রীতিক। অরু হকচকিয়ে উঠে বসে ব্যথাতুর গলায় বললো,

—- আহ!ব্যথা পেলাম তো। ক্রীতিক নিজের টিশার্ট খুলে মেঝেতে ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে, ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হাস্কিটোনে বললো,

——ইউ নো হোয়াট বেইবি? ইউ আর ইয়াম্মি। টু মাচ ইয়াম্মি। লাইক মাই পার্সোনাল ডেজার্ট।

অরু ঝাঁজিয়ে উঠে নাক সিকোয় তুলে বললো,

—- আপনার মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি লেবু পানি খাওয়াতে হবে। দাঁড়ান নিয়ে আসছি।

অরুকে এক পা'ও নড়তে দিলোনা ক্রীতিক, উল্টো অরুর আঙুলের ভাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে মুখটাকে অরুর গলায় ডুবিয়ে দিতে দিতে হিসহিসিয়ে বললো,

—— আজকে রাতে একটু খা'রাপ এলাউ কর, কালকে একদম ভদ্র হয়ে যাবো। প্রমিস। রয়েল প্যালেসের ন্যায় লাইট গোল্ডেন থীমে সাজানো হয়েছে পুরো ক্রীতিক কুঞ্জ। সকাল সকাল ভৃত্যরা কাজে লেগে পরেছে। গেইট থেকে শুরু করে ব্যাক ইয়ার্ড পর্যন্ত এমন কোন যায়গা নেই যেখানে সৌন্দর্যের কৃত্রিম ছোঁয়া পরেনি। চারিদিক গোল্ডেন ফেইরী লাইট আর হ্যাজাকের আলোয় ঝিকমিক করছে। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে কোনো ড্রেসকোর্ট থীম না থাকলেও বিয়েতে বর কনের সঙ্গে মিলিয়ে ড্রেসকোর্ট থীম দেওয়া হয়েছে বেবি পিংক কালারের যে কোন দেশীয় পোশাক।

অতিথিদের বহুলাংশই রাতে আসবেন। তবে সন্ধ্যা নাগাদই বাড়িতে মানুষের কলরব শুরু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে বাড়ির স্বাদ আস্বাদনে সবাই ব্যস্ত,সেই সাথে হাতে হাতে কোমল পানীয় তো আছেই। সায়র,অর্নব এলিসা,ক্যাথলিন ওরা একসাথে দাড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে,

একই রঙের বিভিন্ন কারুকাজের জাঁকজমক পোশাকে বিয়ে বাড়ির সবার নজর কাড়তে সক্ষম ওরা ক'জন। সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে তারা ক্রীতিক কুঞ্জের ছোট সাহেবের বিলেত ফেরত বন্ধুবান্ধব। এক কথায় আজকের অতিথিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষন তারাই।
এছাড়াও মামির বাড়ির সবাই এসেছে আজ, এমনকি রেজাও, আজ রেজাকে বেশ হাসি খুশি লাগছে,চোখেমুখে গম্ভীরতা কপটতা কোনো কিছুর লেশমাত্র নেই ওর। রুপা আজ শাড়ি পরেছে, আর মোখলেস চাচা পাঞ্জাবি। বিয়ে উপলক্ষে ওদের জন্য আলাদা ভাবে এই উপহার গুলো পাঠিয়েছিল ক্রীতিক নিজেই।
মোখলেস চাচা কিছুটা হাসিখুশি থাকলেও রুপার চোখ মুখ থমথমে,সমগ্র মুখশ্রীতে মলিনতা বিরাজমান। হয়তো এখনো বিয়েটা স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছে না মেয়েটা। অবশ্য নিতে পারার কথাও নয়।
তবে তাতে যায় আসেনা জাহানারার, তিনি চাবির গোছা কোমড়ে ঝুলিয়ে বেশ খুশিতেই দিব্যি ঘুরে ঘুরে এর ওর সাথে গল্প করে বেড়াচ্ছেন। সন্ধ্যা নাগাদ তিথিও এসেছে নিজেকে দামি দামি শাড়ি গহনায় মুড়িয়ে পটের বিবি টি সেজে। সাথে তার বিলোভড হাসবেন্ড খন্দকার সাহেব ও আছেন। বড় বড় ভিআইপি গেস্টরা এখনো অনুপস্থিত। হয়তো সময়ের সাথে সাথে তাড়াও চলে আসবেন।
যে সকল টুকটাক ভিআইপি অতিথিরা উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকেই আপাতত সময় দিচ্ছেন আজমেরী শেখ।

বেশ কয়েকজন অফিস ক্লায়েন্টদের সাথে কুশল বিনিময় করায় তিনি যখন বেশ ব্যস্ত, ঠিক সে সময় হুট করেই একজন প্রতিবেশি এসে তাদের কথার মাঝখানে ঢুকে কিছুটা উৎসুক হয়ে আজমেরী শেখকে জিজ্ঞেস করলো ,

—— আচ্ছা আপা, আপনার ছোট মেয়েটাকে তো দেখলাম না, ওকে দেখার খুব ইচ্ছে জানেন? আমাদের ছেলে আছে ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। যদি বিয়ে দিতেন….মহিলা কথা শেষ করার আগেই আজমেরী শেখ অপ্রস্তুত হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের এসিসট্যান্ট কে শুধালেন,

—- ক্রীতিক কোথায়? এখানে নেইতো? আমি চাইনা অনুর বিয়েতে কোনোরূপ ঝামেলা ঝাটি হোক।

আজমেরী শেখের এহেন অগ্রাহ্য ভঙ্গিমায় মহিলাটি হতবাক, অপমান ও বোধ করলেন কিছুটা, মনেমনে ভাবলেন, তিনি কি জিজ্ঞেস করলেন আর আজমেরী শেখ কেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া করলো, এ আবার কেমন আতিথেয়তা? আজিব!

নীলিমা সেজেগুজে এসে মাত্রই অরুর রুমে প্রবেশ করলো। দরজা খোলাই ছিল, খাটের উপর বসে লেজ নাড়ছে ডোরা। ওকে একটা সুন্দর বার্বি ড্রেস পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

নীলিমা রুমে এসে প্রথমে ডোরাকে একটু আদর করে অরুর দিকে চাইলো, অরু এখনো কানে টানা ঝুমকো পড়া নিয়ে বেশ কসরত করে যাচ্ছে। নীলিমা এগিয়ে গিয়ে অরুর হাত থেকে দুলটা নিয়ে ওকে পড়িয়ে দিতে দিতে ওর প্রশংসা করে বললো,

— তোকে মাত্রাতিরিক্ত সুন্দর লাগছেরে অরু। আর এই লম্বা চুল গুলো, ইশ কি সুন্দর! কারও নজর না লাগুক।

তারপর একটু দুষ্টমি করে বললো,
— অবশ্য যার নজর লাগার, সে অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছে।
অরু মৃদু হেসে নীলিমাকে অভিবাদন জানিয়ে বললো,
— তোকে বুঝি কম সুন্দর লাগছে? হবু দুলাভাই তোর রূপের আ'গুনে ঝ'লসে গেলো বলে।
—- যাক, ঝ'লসে বারবিকিউ হয়ে যাক হাতে আমার কি?
কথাটা বলে, নীলিমা একফালি মুঁচকি হাসি ফেরত দেয় , পরক্ষণেই ভাবুক হয়ে অরুকে শুধায়,
—- হ্যারে নিচে সবাইকে দেখলাম কিন্তু তোর বর মহাশয়কে তো দেখলাম না। সে কোথায়?
প্রতিউত্তরে অরু ঠোঁট উল্টে কিছুটা অন্য মনস্ক হয়ে বলে,
—- উনিতো সকাল বেলা অফিসে গিয়েছে কি দরকারি কাজ আছে বলে, বলেছিল তো সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে, কি জানি এখনো আসলোনা কেন?
নীলিমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,—- বুঝলাম, কিন্তু অনু আপা কোথায় বলতো?
অরু ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে,
—- আপাকে তো সেই বিকেল বেলায় মেয়েরা সাজাতে এসেছিল, তারপর তো আর বের হলোনা, চল গিয়ে দেখে আসি। তাছাড়া এমনিতেও আপা সেই সকাল থেকে কা'ন্নাকাটি করছে, আমি সামনে গেলে আমারও কেমন কা'ন্না পেয়ে যাচ্ছে।
নীলিমা অরুর সাথে আর মন খারাপের নদীতে জোয়ার দিলোনা, উল্টো স্বাভাবিক কন্ঠে বললো,

—-- চল গিয়ে দেখে আসি, আপাকে নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর লাগছে, বর যাত্রী এলো বলে। নীলিমা আর অরু করিডোর পেরিয়ে অনুর রুমে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো অনু।

অকস্মাৎ বেরিয়ে আসায় ওরা তিনজন ধাক্কা খেতে খেতেও সামলে নিলো। অনুর পরনে ভারী বিয়ের সাজ, বেবি পিংক ভারী লেহেঙ্গাটা দু'হাতে ধরে উদ্বিগ্ন মুখে দাড়িয়ে আছে অনু। সাজানো গোছানো প্রতিমার মতো মুখটায় ভর করেছে অযাচিত আ'ত'ঙ্ক। তীব্র শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে হাপরের ওঠানামা করছে ওর বুক। অনুকে এমন বিভ্রান্ত চেহারায় দেখে, ভাঁজ পড়লো অরুর কপালে। নীলিমাও আশ্চর্য বনে গিয়ে শুধালো,

—-- কি হয়েছে অনু আপা? তুমি ঠিক আছো?

নীলিমার কথার জবাব দেয় না অনু, উল্টো শুষ্ক ঢোক গিলে অরুকে জিজ্ঞেস করে,

—-- অরু মা কোথায়?অরু ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু জবাব দিতে যাবে, তখনই পেছন থেকে আজমেরী শেখ পেছন থেকে কথা ছো'ড়েন ফের,

—-- কি প্রয়োজন? বর যাত্রী এসে পরেছে তোমাকে নিচে যেতে হবে।

অনু ওদের দুজনকে পাশ কাটিয়ে, এগিয়ে এসে আজমেরী শেখের দু বাহু ধরে গলা খাদে নামিয়ে কাঁপা কন্ঠে বললো,

—-- ম…মা, আমার মনে হলো আমি ওই লোকটাকে দেখেছি। জানালা দিয়ে দেখেছি, অতিথিদের মাঝে দিব্যি দাঁড়িয়ে আমার

দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হুট করে দেখে আমার আত্মা কেঁপে উঠেছে। আর..
আজমেরী শেখ মেয়েকে তৎক্ষনাৎ থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন,
—-- অযথা কথা রাখো অনু, এমন একটা শুভ দিনে একটা শ'য়তা'নের কথা মুখে আনলে কোন আক্কেলে? তাছাড়া পুরো বাড়ি বডিগার্ড দ্বারা সুরক্ষিত, স'ন্দেহভাজন কেউ এলে নিশ্চয়ই আমাকে ইনফর্ম করা হতো। শুধু শুধু এসব ভেবে নিজের স্পেশাল দিনটাকে মাটি করোনা তো। আমি আসছি নিচে অতিথিরা অপেক্ষা করছেন।
আজমেরী শেখ সামনে কয়েক কদম পা বাড়িয়ে ফের ঘুরে তাকিয়ে অরু আর নীলিমাকে উদ্দেশ্য করে বললো,
—--অনুকে নিয়ে জলদি এসো। প্রত্যয় বসে আছে ফুল সজ্জিত স্টেজে।
চারিদিকে বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি আমেজ, অতিথিরা সবাই কনেকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে,অমিত ও হাজির, তাকে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত দেখালেও মুখে লেগে আছে এক চিলতে প্রানোচ্ছল হাসি।
কালকে সবাই নাচ গান করলেও আজকে কেমন মনমরা হয়ে বসে আছে ক্রীতিকের বন্ধু মহল। বউ সাজে কনেকে দেখার চেয়েও দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে সামনের দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে সায়র, হয়তোবা প্রিয় মানবীকে এক ঝলক দেখার উদ্দেশ্যে, তার রাগীনির চাহনীতে আরও একবার ভ'স্ম হতে হতে প্রানে বেঁচে যেতে। সায়র নিজেও বুঝতে পারছে না, এইটুকু হাঁটুর বয়সী মেয়েটার সাথে মজার ছলে ঝগড়া করতে করতে কখন যেন তী'রের ফলার মতোই হুট করে মনে গেঁথে গেলো পুরান ঢাকার এই শ্যামলতা রাগীনি। এখন তো

আমেরিকা ফিরে গিয়েও শান্তি নেই, বারবার মনে হবে রাগীনিটা থাকলে ভালো হতো একটু ঝগড়া করে সময় কাটানো যেত। সবার মাঝে থেকেও শুধুমাত্র নীলিমাকেই দেখতে চাইছে সায়রের তৃষ্ণার্থ ব্যাকুল দু'চোখ। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষন ঘনিয়ে এলো, সকল জল্পনা কল্পনা শেষে স্টেজের দিকে পা বাড়ালো, আজকের মোক্ষম চরিত্র। সবার দৃষ্টি যার দিকে নিক্ষিপ্ত, আজকের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে সুন্দর রমনীটি,প্রত্যয়ের হবু স্ত্রী, ওর মনের রানী, ওর হৃদয় হরনী মিসেস অনন্যা এহসান।অরু আর নীলিমা সাথেই ছিল অনুর। সেই সাথে আরও ছিল প্রত্যয়ের বোন আর আত্মীয় স্বজনরাও। অনু ধীর পায়ে লেহেঙ্গা সামলে প্রত্যয়ের নিকট এগিয়ে আসছে, ফিনফিনে দোপাট্টা দিয়ে মাথায় একহাত ঘোমটা টানা,তার আড়াল থেকেই অপার সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ছে মেয়েটার। প্রত্যয় দাঁড়িয়ে আছে অধীর আগ্রহে, অনুর একেকটা পদধ্বনি যেন প্রত্যয়ের বুকে আনন্দ আর উত্তেজনার ঝড় বইয়ে দিতে সক্ষম। অবশেষে প্রত্যয়ের ঝড়ো হাওয়া মনে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়ে স্টেজে উঠে আসে অনু। প্রত্যয় নিজের একহাত বাড়িয়ে তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। অনু তা গ্রহন করে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যয়ের পাশের রাজকীয় ডিভানে বসে পরে। যদিও বা ওদের দুজনার মাঝে ফুলের এক বিস্তার পর্দা ঝুলানো, কেবল তিন কবুলের পরই তা তোলা হবে আর বর তখনই বউয়ের মুখ দেখবে। তার সত্যিকারের বউয়ের মুখ।ক্যাটারিং এর এদিকে সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ম ম করছে চারিপাশ । ওদিকে এই মূহুর্তে কনের মুখ দেখা নিয়ে বরের বাড়ির সবাই ব্যস্ত। আর এদিকে বরের একপায়ের জুতোটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে চোরের মতো চারিপাশে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে নীলিমা।

নীলিমা এককোণে দাড়িয়ে অনবরত দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল, তখন হুট করেই কে যেন নিঃশব্দে কাঁধে হাত রাখলো ওর। অকস্মাৎ ঘটনায় চকিতে লাফিয়ে উঠে পেছনে চোখ ঘোরালো নীলিমা। দেখতে পেলো, ওর দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সায়র।

সায়র কে দেখা মাত্রই নীলিমা ঝাঁজিয়ে ওঠে, তৎক্ষনাৎ দাঁত খিঁচিয়ে বলে,

—- এখানে কি চাই?

সায়র নিজ গ্রীবাটা আরেকটু সামনে বাড়িয়ে নীলিমার ডাগর চোখের পাতায় সন্দিহান চোখ দুটো রেখে শুধালো,

— কাউকে খুজঁছো?

নীলিমা ঠোঁট বাকিয়ে জবাব দিলো,—-জ্বি না, আর খুঁজলেও আপনাকে খুঁজিনি, যান তো, আজাইরা।

নীলিমার কথা গায়ে মাখালো না সায়র, মেয়েরা এমন একটু আধটু ঝাঁজিয়ে কথা বলে ওতে বেশ কিছু অসুবিধা নেই, অর্ণব কত শুনেছে এমন। থা’প্পড় খেতে খেতে ওর গালটাই বোধ হয় বেঁকিয়ে গিয়েছে , তবুও তো শেষমেশ এলিসাকেই পেয়ে গেলো। নীলিমা আর যাই হোক থা’প্পড় মা’রার সাহস নিশ্চয়ই দেখাবে না,উহুম কখনোই না।

যায়গাটা সরু এদিক দিয়ে ক্যাটারিং এর লোকজন আসা যাওয়া করছে হরদম। নীলিমা সেখানেই ঘাপটি মে’রে দাড়িয়ে আছে সেই সাথে সায়র ও। নীলিমা চুপচাপ শান্ত মস্তিষ্কে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সায়র ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে নরম স্বরে শুধালো,— এ্যাই মেয়ে, আমেরিকা যাবে আমার সাথে?

নীলিমা নিজ ভ্রু জুগল কুঞ্চিত করে বললো,
— কিহ!
সায়র ফের আওড়ালো,
— বলেছি আমার সাথে নিয়ে যাবো তোমায়, নয়তো এতো রাগ কাকে দেখাবে তুমি হ্যা?
তুমিতো রীতিমতো আমাকে মিস করবে, দেখা যাবে আমার উপর রাগ ঝাড়তে না পেরে তোমার বদ হজম হয়ে গেলো, তারপর ব'মি, আর পর ডি'সি'ন্ট্রি।
কথাটুকু শেষ করে চকিতে দাঁত দিয়ে জিভ কাটলো সায়র, পরক্ষণেই এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে মুখমন্ডলে কৃত্তিম গম্ভীর ভাব টেনে বললো,— নো ওয়ে, আমার জন্য কারও ডি'সিন্ট্রি হবে?সেটা তো হতে পারে না, পুরো আমেরিকা জানে আমি ভারী সদয় হৃদয়ের মানুষ,তাহলে এই নি'র্দয় কাজটা কি করে করবো আমি? কিছুতেই না, তোমাকে এমন ঘোর ডি'সিন্ট্রি আ'শঙ্কার মধ্যে রেখে আমি তো কখনোই ও দেশে গিয়ে শান্তি পাবো না রাগীনি। তার চেয়ে তুমি বরং আমার সাথে.....
সায়র টেপরেকর্ডারের মতো এক নাগাড়ে কথা বলছে তো বলছেই, থামা থামির নামই নিচ্ছে না, এই পর্যায়ে এসে ওকে মাঝ পথে থামিয়ে দিলো নীলিমা, ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কটমটিয়ে বললো,
—— চুপ করবেন আপনি? তখন থেকে ডি'সিন্ট্র ডিসি'ন্ট্রি বলে আমার পেট খারাপ করে দিলেন, বলি এসব বলতে আপনার কি মুখে বাঁধে না একটু ও?

সায়র বলতে চাইলো,—- ডি'সিন্ট্রি একটা প্রাকৃতিক সমস্যা, সেটা আবার মুখে বাঁধার কি আছে?
তবে কথা এগোতে পারলো না আর, তার আগেই ক্যাটারিং এর লোকের ধা'ক্কা খেয়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে আচমকা পা ফসকে উল্টে পরলো নীলিমার শরীরের উপর। অ সাবধানতায় ওর হাতটা গিয়ে ঠেকলো নীলিমা মেদহীন লতানো উন্মুক্ত কোমড়ের ভাঁজে।
নীলিমা সায়রকে সামলালো ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণেই চরম সাহসীকতা আর জিদের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সায়রের গালে ঠাটিয়ে চ'ড় বসালো ও। আচমকা চ'ড় খেয়ে সায়র অ'গ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো নীলিমার পানে,কিন্তু তার চেয়েও বেশি অ'ঙ্গার দেখা গেলো নীলিমার চোখে মুখে।
একপর্যায়ে সায়রের দিকে তাকিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কেঁদে উঠলো নীলিমা।
কিছু মানুষ আছে রাগ দেখাতে গিয়ে কা'ন্না পেয়ে যায়, নীলিমা বোধ হয় ওই ক্যাটাগরিতেই পরে।
নীলিমা কাঁদছে দেখে চোখমুখ কিছুটা স্থীর করলো সায়র, চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নরম কন্ঠে প্রশ্ন ছুড়লো,—- কাঁদছো কেন, কি হয়েছে? আ'ম সরি এটা ইচ্ছে করে হয়নি,আমি ইচ্ছে করে তোমার ওখানে…
সায়রের কথা না শুনে মাঝপথেই চোখ মুছতে মুছতে গটগট পায়ে ওখান থেকে চলে গেলো নীলিমা। নীলিমা চলে যেতেই কোথা থেকে যেন অরু এসে চারিদিকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বলে ওঠে,
—- আরেহ জুতোটা তো এখানেই পরে আছে তাহলে নীলিমা কাঁদতে কাঁদতে ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?

সায়র তখনো সেখানেই দাড়িয়ে এক ধ্যানে নীলিমার যাওয়ার পানে তাকিয়ে ছিল , অরু জুতোটা হাতে নিয়ে সায়রের দিকে তাকিয়ে অসহায় সুরে বললো,
—- আর বলবেন না ভাইয়া, বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই মেয়েটা শুধু শুধু কাঁদে। আশ্চর্য!
অরুর কথায় যেন আকাশ থেকে পরলো সায়র, তৎক্ষনাৎ চোখ বড়বড় করে শুধালো,
—- কি বললে তুমি? নীলিমার বিয়ে ঠিক হয়েছে? কবে, কোথায়, কখন?
অরু ঠোঁট উল্টে ভাবলেশহীন কন্ঠে জানালো,— এইতো আপার বিয়ের দুই তিন দিন পরেই আকদ হবে, পরবর্তীতে পড়াশোনা শেষ হলে তুলে দেওয়া হবে।
সায়রের গলাটা ধরে এসেছে,অরুর কথার পাছে ও আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা করে উঠতে পারলো না সাহস দেখিয়ে। কেমন যেন পুরো দুনিয়া দুলছে ওর চোখের সামনে।
তাই অরুও আর দাঁড়ালো না জুতোটা নিয়ে হেলেদুলে চলে গেলো অন্দর মহলের দিকে। অন্দরমহলের ভেতর প্রবেশ করে, সিঁড়ি ছাপিয়ে দোতলার করিডোরে পা রাখতেই থমকে গেলো অরু। পা দুটো আটকে রইলো সেখানেই, দক্ষিণের বাতাসে দোদুল্যমান জানালার দিকের মোমবাতি গুলো সব নিভে পরে আছে, সেখানেই সটান দাঁড়িয়ে নিকোটিনের ধোঁয়া ছাড়ছে এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। লোকটা উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে অরুর তাকে চিনতে অসুবিধে হলোনা খুব একটা। তাই খুব বেশি না চিন্তা করেই সহসা

এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে লোকটাকে ডেকে উঠলো অরু,—-
অমিত ভাই?
অমিতের বন্ধুত্বসুলভ আচরণে বরাবরই বিমোহিত অরু। কখনো এমন কোন ঘটনা কিংবা আচরণ ওর নজরে পরেনি যার কারনে অমিতকে এরিয়ে যেতে হবে কিংবা ঘৃ’ণ্য নজরে দেখতে হবে। তবুও সেদিনের ঘটনার পর থেকে ক্রীতিকের ভয়ে বলা চলে অমিতকে একপ্রকার এরিয়েই চলেছে অরু।
কিন্তু আজ তো সে বাড়ি বয়ে এসেছে, তারউপর বহুদিনের অসু’স্থতা ছাপিয়ে একটুখানি সুস্থ হয়েছে লোকটা, সেই সুবাদেই অমিতের সাথে নিজ থেকে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলো অরু।অমিত ঘুরে তাকালে অরু আন্তরিক হেসে শুধালো,— অমিত ভাই এখন ঠিক আছেন? পায়ের কি অবস্থা?
অরুর প্রশ্নে একটুকরো হাসি ঠোঁটের আগায় খেলা করে গেলো অমিতেরও, অতঃপর হেসে’ই জবাব দিলো অমিত,
—- এখন ঠিক ঠাক। তোমার কি খবর?
নোবেলটা কতদূর এগোলে?অমিতের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সুযোগ হলোনা অরুর, তার আগেই ওর চোখ গেলো দমকা হাওয়ায় নিভে যাওয়া মোমবাতি গুলোর দিকে, ও তাড়াহুড়ো করে অন্যপাশ থেকে আরেকটা জ্বলন্ত মোম নিয়ে এসে লম্বা চুল গুলোকে কাঁধের একপাশে রেখে , জানালার কাছে আয়েশ করে বসে নতুন উদ্যমে জ্বালাতে শুরু করলো মোমবাতি গুলো।
কাঁচা হাতে মোম জ্বালাতে জ্বালাতে অরু আর খেয়ালই করেনি অমিত এখনো আছে না চলে গিয়েছে। চুল সরানোর দরুন মোমের নরম আলোটুকু ঠিকরে পড়ছে অরুর ধবধবে কোমল পৃষ্ঠদেশে,

নতুন লেহেঙ্গার এই ব্লাউজের গলাটা বেশ বড়, এতোই বড় যে ক্রীতিকের হলুদ লাগানো অংশ স্পষ্ট দৃশ্যমান।
এরকম অপ্রত্যাশিত অথচ আকাঙ্খিত দৃশ্য দেখেই চোখ আটকে গেলো অমিতের। লোভাতুর কামুক চোখ দুটো ঘুরে ফিরে আটকে যাচ্ছে ওই একই যায়গাতে। অরুর প্রতি খারাপ আগ্রহ, লালসিত কিংবা দু'শ্চরিত্র মনোভাব কোনোকালেই ছিলোনা অমিতের।বরাবরই মনের এক কোনে অরুকে নিজের সহধর্মিণী, নিজের অর্ধাঙ্গিনী বানানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছে আড়ালে আবডালে। কিন্তু এই মূহুর্তে নিস্তব্ধ রাতে ওর সভ্য পুরুষ সত্তাটা কোথায় যেন যাচ্ছে ক্রমশ, অমিত নি'র্লজ্জের মতো অরুর দিকে তাকিয়ে আছে,আর শুষ্ক ঢোক গিলছে বারে বারে।
শুধু ভাবছে অরুর ওই নরম তুলতুলে শরীর অবধি পৌঁছাতে গেলে কতটা বাঁধা অতিক্রম করতে হতে পারে, ঠিক কতটা? অমিত যখন অরুর দিকে তাকিয়ে আবেশিত ঘোরে বিভোর, সেই ঘোরের মাঝেই হুট করে কপাল কুঁচকে গেলো ওর,অস্ফুটেই অমিত অরুর পিঠের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে ওঠে,
—- কি লেগে আছে হলুদ হলুদ? এখানে হলুদ কে লাগালো?
অমিতের হাতটা অরুর পিঠে ছুঁই ছুঁই হয়তোবা মেগা সেন্টিমিটার দূরত্ব এখনো অবশিষ্ট,আবার তার কমও হতো পারে,ঠিক তখনই, হুট করে, একদম অকস্মাৎ ঝ'ড়ের গতিতে, বাঁজপাখির মতো ছো মে'রে ওর হাতের কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরলো কেউ।আচমকা ঘটনাতে অপ্রস্তুত হয়ে গেলো অমিত, সেই সাথে কিছুটা ভয় ও পেলো। ভ্রম কেটে যেতেই অরুর থেকে চোখ সরিয়ে হাতের চাপে

ওর কব্জিটা ভা’ঙার জন্য উদ্যত হওয়া লোকটাকে দেখার উদ্দেশ্যে সামনে দৃষ্টিপাত করলো অমিত।
পিঠের উপর অচেনা হাতের আলতো স্পর্শ অনুভব হতেই ভয়ে সিটিয়ে গিয়ে তাড়াহুরো করে চুল গুলো পিঠে ছেড়ে দিলো অরু। তারপর হকচকিয়ে পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই অজানা ভয়ে হৃদয় নেড়ে উঠলো ওর।
তৎক্ষনাৎ শুকনো ঢোক গিলে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলো অরু, দেখলো ওরই সামনের অমিতের কব্জিটা চে’পে ধ’রে চোয়াল শক্ত করে দাড়িয়ে আছে সয়ং ক্রীতিক। পুরো বাড়ি ভর্তি সকলে বেবি পিংক থীমের জামা কাপড় পড়ে থাকলেও ক্রীতিকের পড়নে এখনো ব্ল্যাক স্যুট, একহাতে কিছু ফাইল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মাত্রই অফিস থেকে ফিরেছে সে। আর এই মূহুর্তে আ’গ্নেয়গিরির দা’বানলের মতোই হুর হুর করে আ’গুনের লে’লিহান জ্ব’লে উঠেছে ওর সবগ্র মস্তিষ্কে জুড়ে ।
কিন্তু ক্রীতিক সুকৌশলি,যার ফলসরুপ নিজের মেজাজ টাকে সুকৌশলেই সামলালো ও। কয়েক মূহুর্ত বাদে অমিতের হাতটা আস্তে করে ছেড়ে দিয়ে গভীর অথচ মসৃণ আওয়াজে প্রশ্ন ছুড়লো অমিতকে,
—- কি করছিলে তুমি এখানে? অতিথিরা তো সব নিচে অপেক্ষা করছে।
ক্রীতিকের কথার পেছনে অমিত আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বললো,
— এইতো স্মোক করতে এসেছিলাম, তারপর হুট করেই অরুর সাথে দেখা হয়ে গেলো, তাই না অরু?

অরুর দিকে তাকিয়ে ফিকে হাসলো অমিত।
পরক্ষণেই ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে পুনরায় অমিত বলে,—- আমি নিচে গিয়ে দেখছি কাজি সাহেব এলো কিনা, তোমরা ও চলে এসো।কেমন?
অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে কথাটুকু শেষ করে দ্রুত পদধ্বনিতে দোতলা ত্যাগ করে অমিত। অমিত চলে গিয়েছে কি যায়নি, নিজের ঘাড় ফুটিয়ে অরুর সামনে এসে কোনোরূপ কথা, কিংবা জবাবদিহিতা ছাড়াই ওর গালে নিজের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে চ'ড় বসালো ক্রীতিক। চ'ড়টা এতো জোরেই ছিল যে অরুর চুলের পাঞ্চ ক্লিপটা ছি'টকে পরলো অদূরে। থা'প্পড় খেয়ে গালে হাত দিয়ে কাঁপা গলায় কাই কুই করে অরু বলে,
—আ..আম..আমি..
—এই চুউউপ.. শাট ইউর ফা'কিং মাউথ।
ক্রীতিকের র'ক্তিম চোখ আর কঠোর ধমকে আরেক দফা কেঁপে উঠল অরুর ছোট্ট শরীরটা।
এই মূহুর্তে জবাব দেওয়া কিংবা ক'ষ্টে নয়,বরং ভয়ে কাঁপছে অরু। তবে ওর তো কোন দোষ নেই,সেটা ক্রীতিককে বোঝাতে হবেতো।কিন্তু ক্রীতিক বুঝলো না, উল্টো অরুর চোয়ালটা শক্ত হাতে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে বললো,
— ওই বা'স্টা'র্ড টা তোর শরীরের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস কোথায় পেলো? জবাব দে?
ওই নোং'রা হাতটা আমার জিনিসকে স্পর্শ করেছে, আমিতো তোকে আজ মে'রেই ফেলবো অরু। তুই জানতিস আমি কতোটা খারাপ,

তাহলে কলিজায় এতো সাহস কোথা থেকে এলো? হাউ ফা’কিং ডেয়ার ইউ টু টক উইথ সামওয়ান লাইক অমিত?
গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো ক্রীতিক।
অরু ব্যথায় জর্জরিত সেই সাথে ভয়ে তটস্থ, কথা বলার কোনো পরিস্থিতি অবশিষ্ট রাখেনি ক্রীতিক, তাই উপায়ন্তর না পেয়ে ফোপাঁতে ফোপাঁতে চোখের জল ফেলছে মেয়েটা।
হৃদয়টা ওর ভে’ঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত কিনা অমিত ও এমন একটা কাজ করে বসলো?
ক্রীতিক দমলো না, একই ভাবে অরুর গালটা চেপে ধরে বললো,—- আমি জানি তুই কিছু করিসনি, তুই বুঝতেও পারিসনি এমন কিছু হবে, কিন্তু তুই অন্যা’য় করেছিস অরু, ঘোর অ’ন্যায় করেছিস। আমি বারণ করা সত্বেও অমিতের সাথে কথা বলার স্পর্ধা দেখিয়েছিস, তোকে আমি কতবার স’তর্ক করেছি আপন ভাই ছাড়া আর কোনো ভাই’ই আদতে ভাই নয়, বলিনি বল?আন্সার মি!
রাগে আক্ষেপে অরুকে ঝাঁকিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করলো ক্রীতিক।
অরুর কা’ন্নার আওয়াজ জোড়ালো হলো, ক্রীতিক তীব্র রা’গে অরুকে সামান্য ধা’ক্কা মে’রে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরনের ব্লেজার আর ফাইল গুলো করিডোরের মেঝেতেই ছু’ড়ে মা’রলো। পুরো অন্দলমহল খাঁ খাঁ করছে, এদিকে একটা কাক পক্ষি ও নেই। বাইরে সবার আনন্দ উল্লাসের শোরগোল শোনা যাচ্ছে, হয়তো বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এটার জন্যই তো এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল ক্রীতিক।
বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অরুকে ওর রুমে আটকে রেখে,হাতে একটা হ’কিস্টিক নিয়ে নিজের সফেদ রঙা

শার্টের হাতাটা গুটাতে গুটাতে নিচে চলে যায় ক্রীতিক, যাওয়ার আগে অরুকে উদ্দেশ্য করে তীর্যক কন্ঠে বলে,
— আমি ফেরার আগ পর্যন্ত এখান থেকে এক পা ও ন'ড়লে তোর খবর আছে, এই দেহে প্রা'ন থাকবে না। ক্রীতিক হকি'স্টিক সমেত নিচে এসে সরাসরি প্রত্যয়ের মাকে জিজ্ঞেস করলো,
— অমিত কোথায়?
প্রত্যয়ের মা বিয়ে বাড়িতে ব্যস্ত সময় পার করছেন, তাই কোনো কিছু খেয়াল না করেই তিনি বললেন,
— ও তো বাবা মাত্রই বেরিয়ে গেলো, কি জরুরি কাজ আছে বললো।
ক্রীতিক ও আর দাড়ালো না সেখানে, বড় বড় পা ফেলে বাইক নিয়ে সোজা বেড়িয়ে গেলো ক্রীতিক কুঞ্জ থেকে।
আর কেউ খেয়াল না করলেও এই পুরো ঘটনাটা খেয়াল করলো ক্রীতিকের বন্ধুরা। ক্রীতিক বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিসা তরিঘরি করে বলে উঠলো,
—- অর্ণব, সায়র ওকে আটকা জলদি, নয়তো যাকে মা'রতে যাচ্ছে তাকে আজ মে'রেই ফেলবে।
অর্ণব সায়র আর ঘটনা বোঝার জন্য অপেক্ষা করেনা,কোনোকিছু না ভেবেই ওরাও বাড়ির গাড়িটা নিয়ে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে পরে ক্রীতিকের পিছু পিছু।জোস্ন্যা মাখা রাত, অমিত কে পাওয়ার জন্য খুব বেশিদূর যেতে হলোনা ক্রীতিকের, মহল্লা ছাড়ানোর আগেই অমিতের সাদা টয়োটা গাড়িটা ধরে ফেললো ও।
ক্রীতিকের চোখে গাড়িটা পরার সঙ্গে সঙ্গে কোনোকিছুর আশ'ঙ্কা না করেই একেবারে অমিতের গাড়ির সামনে গিয়ে স্ট্যান্ড করালো

বাইক, মাথার হেলমেট টা খুলে বাইকের পেছন থেকে হকি’স্টিক নিয়ে গাড়ির জানালায় কড়া নাড়তেই জানালার কাচ নামালো অমিত, জানালার কাচ নামাতেই ক্রীতিকের থমথমে মুখটা দেখে কিছুটা হতবাক চাহনি নিক্ষেপ করে অমিত বলে ওঠে,—- ক্রীতিক তুমি এখানে?
— গাড়ি থেকে নামো আগে, বলছি।
অমিত কিছু না ভেবেই ধীর পায়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো অতঃপর ক্রীতিকের হাতের হকি’স্টিকি’কের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো,
—- কি হয়েছে?
ক্রীতিক জবাব দিলো ,
—- আ’ম সরি অমিত।
এরপর আর কোনো কথা নয় সরাসরি অমিত কে হ’কিস্টিক দিয়ে আ’ক্রম’ন করে বসলো ক্রীতিক। কয়েক ঘাঁ শক্ত প্র’হার শরীরে আঁচড়ে পরতেই কিছুটা টলে পরলো অমিত। কিন্তু ও নিজেও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়,যথেষ্ট বলবান পুরুষ অমিত।কিছুদিন আগের এ্যা’ক্সিডে’ন্টের কারনে শক্তির কিছুটা ক্ষয় হলেও এতোটাও দূর্বল নয় যে,ক্রীতিকের হ’কিস্টি’কিকের প্র’হারের বিপরীতে ও চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।
এবং সে-ই শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটালো অমিত, উঠে গিয়ে শক্ত হাতের ঘু’ষি ছাড়লো ক্রীতিকের নাক বরাবর, তৎক্ষনাৎ নাক ফে’টে র’ক্ত বেরিয়ে এলে ওর।
ক্রীতিক সেটা আলগোছে মুছে নিয়ে, ঠোঁট কামড়ে আঙুলের ইশারায় অমিত কে বললো,

— গুড জব,জাস্ট হিট মি। নাহলে তোমাকে মা'রতে আমার অনুশোচনা হচ্ছে।
—- ইউ ফা'কিং সাই'কো'প্যাথ,
কথা টা আওড়ে ওকে মা'রতে গিয়েও মা'রলো না অমিত, থেমে গিয়ে উল্টো চিল্লিয়ে উঠে বললো,
—- কেন মা'রছো তাহলে? কিসের শ'ত্রু'তা আমার সাথে তোমার?
ক্রীতিক অমিতকে পুনরায় হ'কি'স্টিক দিয়ে মা'র'তে মা'র'তে বললো,
—- আ'ম সরি অমিত, বাট তুমি খুব বড় মিসটেক করে ফেলেছো, জানতে চাও সেটা কি?
অমিতের শরীর ফেটে র'ক্ত বেরোচ্ছে, তবুও চোখে মুখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে ক্রীতিকের পানে চাইলো অমিত।
ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে বললো,
—- আজ যে মেয়েটার দিকে তুমি নোং'রা চোখে চেয়েছিলে, যার শরীরে লালসা করে হাত বাড়িয়ে ছিলে, ওই মেয়েটা আমার বিয়ে করা বউ!!আমার সম্পত্তি, আমার হার্টবিট, ইভেন সি ইজ মাই এভ্রিথিং, বা'স্টা'র্ড।
ক্রীতিকের কথা শুনে চমকে ওঠে অমিত, এই তাহলে ক্রীতিকের রা'গের কারণ? কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? অমিতের জানা মতে অরুর মা ক্রীতিকের ও সৎ মা, তাহলে সৎ বোন কি করে বউ হয়?ও এম জি! ইটস আ হিউজ ব্লা'ন্ডার। কিন্তু এখন? ক্রীতিক নিশ্চয়ই এতো বড় ভুলের জন্য অমিতকে ছে'ড়ে দেবেনা?
অমিত চুপচাপ শুষ্ক ঢোক গিলছে দেখে ক্রীতিক পুনরায় বলে,

— আগের বার সতর্ক বার্তা হিসেবে শুধু গাড়ি এ্যা’ক্সি’ডেন্ট করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারপরেও ক্রমাগত একই ভুল করে গিয়েছো তুমি অমিত।
ক্রীতিকের শেষ কথাটা শোনা মাত্র অমিত হতবিহ্বল হয়ে পরে, মনেমনে ভাবে আগের বারও অরুর ব্যাপারে কথা বলে যাওয়ার সময়ই অনা’ঙ্ক্ষিত দূর্ঘ’টনা’র স্বীকার হতে হয়েছিল ওকে। আর এখনও।
নিজের কথা শেষ করে ক্রীতিক পুনরায় অমিতকে হকি’স্টিক দিয়ে প্রহার করতে যাবে, ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন ছুটে এসে সায়র অর্ণব দুজন মিলে তাড়াহুড়ো করে ধরে ফেললো হকি’স্টি’কটা। সেই সাথে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পরলো উ’গ্র মেজাজী ক্রীতিক কেও।অন্দরমহল এখনো নিস্তব্ধ, কারও কোনো সারাশব্দ নেই, হয়তো এখনো সবাই বাইরে স্টেজের ওখানে বর কনে নিয়ে মেতে আছে, অথচ অরু এখানে একা রুমে বসে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখের জল ফেলছে।
লম্বা পরিপাটি চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, থা’প্প’ড়ের আ’ঘা’তে গালটা জ্বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে হা করলেও ব্যথায় টনটন করে উঠছে। ক্রীতিকের মুখের আগেই হাত উঠে যায় শরীরে, যা অরু প্রচন্ড ভ’য় পায়, ওই জন্যই তো সবসময় ওইসব কাজ এরিয়ে চলে যেগুলো ক্রীতিকের অপছন্দ, কিন্তু আজ না চাইতেও সেই একই কাজ করলো ও।
আর অমিত? যে মানুষটাকে অরু চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করলো, ভাইয়ের মতো ভরসা করলো, এমনকি ক্রীতিকের সাথে পর্যন্ত যাকে নিয়ে ত’র্ক করলো, সে কিনা এভাবে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলো

ছিহ, ভাবলেই গা গিনগিন করে উঠছে অরুর। কাঁদতে কাঁদতে মাথাটা ধরে এসেছে ওর,একটু ঘুমাতে পারলে ভালো হতো, তারউপর নিচে আপা কি করছে কে জানে?
অরুর মস্তিষ্কে প্রবাহমান হাজারো ভাবনার ছেদ ঘটলো ক্রীতিকের আগমনে, ক্রীতিক রুমে প্রবেশ করতেই ঝকঝকে লাইটের আলোয় অরু দেখলো ওর নাকে মুখে র'ক্ত লেগে আছে, নিজের স্বামীর এহেন অবস্থা দেখে অরু উদ্বিগ্ন হলো বটে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না তীব্র অভিমানে। ক্রীতিক কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার ফুরসত ও দিলোনা, এগিয়ে এসে অরুর হাতটা ধরে টা'নতে টা'নতে নিয়ে নিয়ে গেলো রুমের বাইরে অতঃপর কোলে তুলে সিঁড়ি ভেঙে একে বারে নিচে বিয়ের আসরে।
বিয়ে বাড়িতে তখনো ওদের দুজনকে কেউ খুব একটা খেয়াল করেনি , কিন্তু যখন ক্রীতিক অরুকে টেনে এনে সবার মাঝে দাড় করিয়ে ওর সমগ্র মুখ মন্ডলটা চুমুতে চুমুতে ভিজিয়ে দিতে শুরু করলো, ঠিক তখনই পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল উপস্থিত সকলের।
ছোট বড় সবাই উপস্থিত এখানে, অথচ সবার মাঝখানে দাড়িয়ে দ্য গ্রেট অ'সভ্য খ্যাত জায়ান ক্রীতিক অরুর সমস্ত মুখে টুকরো টুকরো চুমু খেয়ে তবেই থামলো। ওদিকে আজমেরী শেখের লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে, অনু প্রত্যয়কে আয়না দেখানো হচ্ছিলো এতোক্ষন, কিন্তু এই মূহুর্তে আয়না দেখা বাদ দিয়ে ওরা ক্রীতিক অরুকে দেখায় ব্যতিগ্রস্থ হয়ে পরলো।

অরুর অবস্থা ম'রি ম'রি, চারিদিকের জোড়া জোড়া কৌতুহলী আর সন্দিহান চোখ গুলো এড়াতে নিজের চোখ দুটোই খিঁচিয়ে বন্ধ করে মাথাটা নুয়িয়ে রেখেছে অরু।
ক্রীতিক প্রথমে অরুর আঙুলের ভাঁজে আঙুল ঢুকালো, তারপর শক্ত গলায় বললো,
—- মাথা উঁচু কর অরু, রাইট নাও।
চারিপাশের সকলে এখনো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তা দেখে ক্রীতিক সবার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে ,
—- এভরি ওয়ান এটেনশন প্লিজ, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন ইটস আ বিগেস্ট মিসটেক কি আমি সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে ধুমধাম করে বিয়ে করতে পারিনি।
বাট আ'ম নট সিঙ্গেল এনি মোর, আই হ্যাভ আ ওয়াইফ। আর এখন, এই মূহুর্তে আমি সবাইকে জানাচ্ছি, আমার পাশে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী, মিসেস জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। হ্যা জানি, এখনো অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে , আমি সেটাও ক্লিয়ার করছি, আমার স্ত্রী আমারই সৎ মায়ের আগের পক্ষের সন্তান। এবং আমি জেনে শুনেই তাকে বিয়ে করেছি, উই আর হ্যাপিলি ম্যারেড নাও।
আশা করছি আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কারোর মাঝে আর কোনো সন্দেহ কিংবা জটিলতা নেই এখন আর। যদি থেকে থাকে তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসেনা, কারন জেকে কখনো সোসাইটির ধার ধারেনা। নেভার এভার।

এক নাগাড়ে কথা শেষ করে গলা কিছুটা খাদে নামিয়ে ক্রীতিক পুনরায় বলে,—- থ্যাংকস ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম গাইস, নাও ইউ ক্যান এনজয় দ্য ওয়েডিং পার্টি।
শেষ বাক্যটার ইতি টেনে অরুকে এক প্রকার ফেলে রেখেই হনহনিয়ে ভেতরে চলে গেলো ক্রীতিক। আজ বোধ হয় আর অরুর উপর থেকে রা'গ কমবে না ওর। চন্দ্রদীপ্ত মধ্যরাত, রুপোর থালার মতো চাঁদটা তীর্যক রুপোলী আলোতে ভূবণ ভরিয়ে তুলছে, তারপরেও ঈশান কোনে কয়েক সেকেন্ড অন্তর অন্তর জ্বলে ওরা বিদ্যুৎ এর ঝলকানি আর চারিদিকের তীব্র হিমেল হাওয়ায় মনে হচ্ছে শেষ রাতে বৈশাখী ঝড়ে লন্ড ভন্ড হবে প্রকৃতি।
প্রত্যয়দের বাড়িটা ক্রীতিক কুঞ্জের তুলনায় কুঁড়েঘর ই বলা চলে। ছোট মতো একটা দু'তলা বাড়ি। নিচ তলায় বসার ঘর, রান্না ঘর, আর অতিথিদের জন্য গেস্টরুম। আর উপর তলায় প্রত্যয়ের আব্বু আম্মু আর বড় আপুর শোবার ঘর। যদিও বা বড় আপু বেশির ভাগই তার শশুর বাড়িতেই থাকেন।
কালেভদ্রে যখন এ বাড়িতে আসা হয় তখনই কেবল তার রুমে মানুষের আনাগোনা লক্ষ করা যায়।
প্রত্যয় নিজেও আমেরিকা থেকে বছর অন্তর ছাড়া দেশে ফেরেনা, যার ফলরুপ মুরব্বি দুজন ছাড়া পুরো বাড়িটা শূন্যই থাকে বলা চলে। প্রত্যয়ের আব্বু আম্মু অমায়িক মানুষ। বিয়ের আগে শশুর শাশুড়ী নিয়ে অনুর মন গহীনে যে অযাচিত আ'তঙ্ক'রা ঘুরে বেড়াতো, চোখ বুজলেই শশুর বাড়ি নামক যায়গাটা কে যেন মহাযজ্ঞ স্থল ঠেকতো, সেই সকল ভুল ধারনাকে এক দর্শনেই বিনা'শ করেছেন প্রত্যয়ের আব্বু আম্মু।

আজ এই বাড়িতে পা রাখার পরে অরু আর ক্রীতিকের বিষয়টা নিয়ে প্রতিবেশী আত্নীয় স্বজনদের মুখ থেকে ইনিয়ে বিনিয়ে কম কথা শুনতে হয়নি অনুর।

কিন্তু প্রত্যয়ের আব্বুর কান অবধি সে সব কথা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ করেছেন, নিজের আত্নীয় স্বজন হোক কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী সবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর গলায় একটাই কথা বলেছেন,—— বউমা যেহেতু আমার, বউয়ের পরিবারটাও আমারই, আর আমার পরিবার নিয়ে যারা কুৎসিত মন্তব্য করার স্পর্ধা দেখাবে, তারা কখনোই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারেনা। তাছাড়া ধর্মীয় আইন কানুন বাদ দিয়ে সমাজের কুসংস্কারে গা ভাসানোর মানুষ আমি নই। ধর্মে যে সম্পর্কের প্রাধান্য আছে, আমার নিকট ও তার যথাযথ সম্মান রয়েছে। দ্বিতীয়বার বউমার বোনকে নিয়ে আর একটাও কথা যাতে না হয় এ বাড়িতে।

কথা শেষ করে তিনি তার স্ত্রীকে ডেকে দৃঢ় গলায় আদেশ করে বলেন,

—- প্রত্যয়ের আম্মু, তুমি খেয়াল রেখো। বউমার সম্মানহানী হয় এমন কোন কথা যাতে দ্বিতীয়বার আমার কান অবধি না আসে।নতুন শশুর শাশুরির কাছ থেকে এতোটা প্রাধান্য, এতোটা আন্তরিকতা পেয়ে সত্যিই তখন গর্বে বুকটা ফুলে ফেঁপে উঠছিল অনুর, বারবার মনে হচ্ছিল প্রত্যয়ের মতো একজন ভদ্র সভ্য, শান্ত ছেলে জন্ম দেওয়া কেবল তাদের মতো অমায়িক আর স্বচ্ছ হৃদয়ের মা বাবার দ্বারাই সম্ভব।

রুমের কোনে অবস্থিত লম্বাটে পুরনো সেগুন কাঠের ড্রেসিন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল মুছতে মুছতে সন্ধ্যা রাতের সেসব

কথা ভেবে আরও একবার চাপা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো অনুর চিত্ত চিড়ে।
প্রত্যয়ের রুমটা একতলা কিংবা দোতলায় নয়। বাড়ির একমাত্র ছেলে হিসেবে সম্পূর্ণ আলাদা ডেকোরেশন করে চিলেকোঠার ঘরটাই প্রত্যয়ের রুম হিসেবে বরাদ্দ করা। প্রত্যয় যখন দেশে ছিল তখন থেকেই এই চিলেকোঠার ঘরটা ওর। আর এখন ওদের বিয়ের প্রথম বাসর রাতের আয়োজন ও এ ঘরেই করা হয়েছে।
পুরো ঘরটাতে ভুর ভুর করে সুঘ্রান ছড়াচ্ছে পুরনো খাটে নতুন করে সাজানো তাজা রজনীগন্ধা আর থোকা থোকা গোলাপের আস্তরণ। সাদা চাদরে মোড়ানো বিছানা জুড়েও গোলাপের ছড়াছড়ি। সেদিকে তাকালেও কেমন অপার স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে মন প্রান। পুষ্প সজ্জিত স্নিগ্ধ সেই রুমের এক কোনে দাড়িয়ে নির্বিঘ্নে চুলে তোয়ালে চালাচ্ছে এই ঘরের নতুন ঘরনি, প্রত্যয়ের সদ্য বিয়ে করা নতুন বউ। যেন এই ঘরে আগমন তার নতুন কিছু নয়, সেভাবেই বিয়ের ভারী গহনা,পোশাক আশাক ছেড়ে একটা কালো পাড়ের খয়েরী তাঁতের শাড়িতে নিজেকে নতুন বউ রুপে আবিষ্কার করলো অনু।
ঠান্ডা পানি দিয়ে লম্বা শাওয়ার শেষে সারাদিনের ধকল কে ধুয়ে মুছে সাফ করে একেবারে সতেজ হয়ে বেরিয়েছে অনু। আর এখন এই হাল্কা শাড়িটা গায়ে চড়িয়ে আরও বেশি আরাম লাগছে ওর। শাড়ির ব্লাউজটা ব্যাকলেস, যার দরুন একটু একটু অসস্থি ও হচ্ছে। এমন একটা আটপৌরে শাড়ির সাথে এমন শরীর উন্মুক্ত ব্লাউজ কে কিনলো ভেবে পায়না অনু, ভাবার মতো সময় ও নষ্ট করে না অবশ্য, তার কারণ ওর মাথায় এই মূহুর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে

অন্য একটা প্রশ্ন, বারংবার মানস্পটে ভেসে উঠছে সেই তীক্ষ্ণ ক্রুর ভ'য়ানক চোখ দুটো।
অনুর মনে আছে ছোট বেলায় এই চোখ দুটোকে ভীষণ ভ'য় পেতো ও, আর এখনো পায়, কিন্তু হঠাৎ করেই এতো গুলো বছর পর কোথা থেকে উদয় হলো সেই মানব? কেনই বা ফিরে এলো ওদের শান্তশিষ্ট নিরিবিলি জীবনে?
ওদের জীবনে তো মানুষটার আর কোনো অস্তিত্ব নেই, তাহলে আজকের দিনেই কেনো এভাবে দেখা দিলো সে? এটা কি কেবলই অনুর মতিভ্রম নাকি অন্য কিছু?অনুর ভাবনার জগতের পর্দা টেনে যায় প্রত্যয়ের আগমনে, প্রত্যয় একটু অন্যমনস্ক হয়েই রুমে প্রবেশ করে। আত্নীয় স্বজনদের অধিকাংশই কর্মজীবি হওয়াতে যে যার মতো ফিরে গিয়েছে সবাই, বাড়িতে আপাতত আপু আর তার হাসবেন্ড ছাড়া আর তেমন কেউ রয়ে যায়নি। সবাইকে একেক করে বিদায় দিতে দিতেই রুমে আসতে এতো রাত হয়ে গেলো প্রত্যয়ের।
তারউপর ক্রীতিক কল করেছে কয়েক ঘন্টার জন্যে হলেও কাল অফিস যেতে হবে ওকে, শেয়ার হোল্ডারদের সাথে ইম্পর্টেন্ট মিটিং রয়েছে , তার চেয়েও বেশি চিন্তার বিষয় হলো কাল জামাই শাশুড়ী একই সাথে নিজেদের প্রজেক্ট লঞ্চ করবে, কি জানি কি হবে? কি করেইবা এই দু'জন হট টেম্পার কে একই সাথে সামলাবে ও? চিন্তায় মাথা ভোঁ ভোঁ করছে প্রত্যয়ের।প্রত্যয় রুমে ঢুকতেই অসম্ভব মিষ্টি সুঘ্রাণে ওর চোখ দুটো আবেশে বন্ধ হয়ে এলো, ফুল,মোমবাতি, সেই সাথে পরিচিত নারীর গায়ের গন্ধ মিলে মিশে পুরো ঘরটা সৌরভে ম ম করছে। অনু অনু সেই গন্ধটা আরও একবার নাক চিড়ে দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের সাহায্যে ভেতরে পুরে নিলো প্রত্যয়। তবে আজ আর এই সৌরভ ওর নাকে নয় ওর হৃদয় গিয়ে লাগছে।
খানিকক্ষন চোখ বুঁজে রেখে নিজেকে সামলালো প্রত্যয়, তারপর আস্তে ধীরে চোখ খুলতেই দেখলো ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে অনু,হাতে তার সেদিনের সেই ছোট্ট বক্সটা।
প্রত্যয় বক্সটার দিকে ভ্রু কুঞ্চন করে তাকালে অনু শুধায়,—- আপনার কি ঘুম পেয়েছে প্রত্যয় সাহেব? চশমাটাও দেখি পরেন নি, ঠিকঠাক দেখছেন তো আমায়?
অনুর কথায় এক চিলতে হাসি খেলে গেলো প্রত্যয়ের ঠোঁটের আগায়, ও অনুকে আগাগোড়া পরখ করে বললো,
—- তোমাকে দেখতে আমার চশমার প্রয়োজন নেই অপরিচিতা, চোখ বন্ধ করলে সর্বদাই তুমি আমার দু'চোখের পাতায় রাজত্ব করে বেড়াও, আর এখন চোখ খুললেও তুমি।
প্রত্যয়ের এসব প্রেম প্রেম কথা ভালোই লাগে অনুর, মাঝেমধ্যে লজ্জাও পায় বেশ, কিন্তু এই মূহুর্তে পেলোনা, উল্টো প্রত্যয়ের কথাকে দু আনা প্রশ্রয় না দিয়েই হাত বাড়িয়ে বক্সটা দেখিয়ে সোজাসাপ্টা জিজ্ঞেস করে,
—- বিয়ে হয়েছে গিয়েছে, আজ প্রথম রাত, তাহলে এবার বলুন,কি আছে এতে? আমি আর পারছিনা চুপ হয়ে থাকতে, কৌতুহলে মাথাটা কিলবিল করছে আমার।
প্রত্যয় এবারও অনুকে মসৃণ হাসি ফেরত দিয়ে বলে,—- প্রথম রাতে স্বামীকে সালাম না করেই উপহার দেখতে চাইছো? ইট'স নট ফেয়ার অনু।

অনু তৎক্ষনাৎ দাঁত দিয়ে জিভ কাটে, মনেমনে বলে,
—- এইরে ভুলেই গিয়েছিলাম।
পরক্ষণেই শাড়ির আঁচলটা পিঠের উপর দিক দিয়ে টেনে এনে সামান্য নিচু হয়ে সালাম করলো প্রত্যয়কে। তারপর আবারও সেই একই বুলি,
—- এবার বলুন এতে কি আছে?
অনুর উন্মুক্ত মসৃণ মোমের মতো পিঠের দিকে চেয়ে প্রত্যয় ঘোর লাগা গলায় বললো,
—- কি পরেছো এটা? সব দেখা যাচ্ছে।
অনু বলে,
—- আগে আমার কথার উত্তর দিন তারপর বলছি।অনুর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এতে কি আছে না জানা অবধি প্রত্যয়কে এক দন্ড বসতেও দেবেনা ও,আর প্রত্যয় কিনা এইটুকু সময়ে কত কিছুরই না স্বপ্ন দেখে ফেলেছে। সিলি্য ফিলিংস, হাহ!
প্রত্যয়ের দুচোখে এখন সেই সব অব্যক্ত,নেশাতুর অনুভূতি গুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু অনুকে বোঝানো মুশকিল। তাই এবার আর কোনোরূপ কথা না পেঁচিয়েই বক্সটা খুলে অনুর হাতে ধরিয়ে দিলো প্রত্যয়।
অনু অবাক চাহনিতে বক্সের ভেতর উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে, হবে হয়তো কোনো দামি জুয়েলারি, কিংবা কোনো হানিমুন টিকেটস।
অনুর জানা মতে বাসর রাতে তো স্বামীরা এসবই উপহার দেয়। কিন্তু এখানে তেমন কিছুই দেখতে না পেয়ে আশাহত হলো অনু, ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রত্যয়কে শুধালো,— কই?

প্রত্যয় কাবার্ড থেকে টিশার্ট আর ট্রাউজার বের করতে করতে বললো,
— কি কই?
— কেন উপহার?
অনুর কালো হয়ে যাওয়া চুপসানো মুখটা দেখে প্রত্যয় অনেকটা কাছে এগিয়ে এসে ওর চিবুক তুলে হিসহিসিয়ে বলে,
—- কি বলেছিলাম আমি? এর মাঝে তোমার স্বপ্ন আছে, আর সেটাই আমার তরফ থেকে তোমার জন্য বাসর রাতের বেস্ট গিফট।
অনু ভ্রু কুঁচকে বললো,— স্বপ্ন মানে? কেমন স্বপ্ন?
প্রত্যয় কিঞ্চিত ঠোঁট বাকিয়ে হেঁসে বক্স থেকে একটা আইডি কার্ড বের করে অনুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো,
—- এই যে আমার বউ সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।
এতোক্ষণে অনুর টনক নড়েছে, চোখ দুটো ছলছল করছে, ও সেই ছলছলে চোখ নিয়েই প্রথমে প্রত্যয়ের দিকে অবিশ্বাসের চাউনি নিক্ষেপ করলো, অতঃপর কাঁপা হাতে আইডি কার্ডটা চোখের সামনে তুলে ধরলো, যেখানে গুটি গুটি ইংরেজি অক্ষরে অনুর নাম আর ছবি বসানো,
অনন্যা শেখ নামের পাশেই ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে পরপর তিনটে অক্ষরে লেখা, L.L.B অনার্স।
এতো ঝড়ঝাপটা, এতো উত্থানপতনে অনু তো ভুলেই গিয়েছিল, নতুন করে পড়াশোনা শুরু করাটা যে ওর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। মায়ের অসুস্থতায়, যা না চাইতেও বিসর্জন দিতে হয়েছিল ওকে,

মস্তবড় গেইট পেরিয়ে ভার্সিটিতে প্রবেশ করার স্বপ্ন তো অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল।
মনের টানাপোড়েন তো কম হয়নি এককালে, কিন্তু অনু নিজেকে বুঝিয়েছিল বড় মেয়ে হতে গেলে দ্বায়িত্ব নিতে হয়,বাড়ির বড় সন্তান কে এতো নিজের কথা ভাবলে চলেনা,তাদের পৃথিবীতে পাঠানোই হয়েছে পরিবারের সর্বসকল্যের সুখ নির্ধারন করার জন্যে।
কিন্তু আজ, এই মূহুর্তে প্রত্যয় নিজ হাতে অনুর স্বপ্নকে অনুর হাতে ধরে দিলো, নতুন করে মনে করিয়ে দিলো অনু এখন আর একা নয়, ওরও নির্বিগ্নে মাথা রাখার জন্য একটা কাঁধ রয়েছে, যার নাম “প্রত্যয় এহসান”।—- তোমার এখনো অনেকটা পথ অতিক্রম করা বাকি অনু, এগিয়ে যাও আমি তোমার পাশে আছি। তোমার স্বামী, তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী সবসময় তোমার পাশে আছে।
প্রত্যয়ের কথায় এতোক্ষণের ভ্রমটা কেটে গেলো অনুর,মতিভ্রম থেকে বেরিয়ে বাস্তবে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়ের উপর ঝাপিয়ে পরে ওর গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, চিৎকার করে কেঁদে উঠলো অনু, কাঁদতে কাঁদতে বললো,
—— এটা কি করেছেন আপনি, কি করেছেন? এতো ভালোবাসা কেন দিচ্ছেন? পা’গল হয়ে যাবো তো আমি। আপনি আমাকে আজকে যা দিয়েছেন তা এই দুনিয়ার কেউ দেয়নি আমাকে, কেউ না।

অনু সরল মনে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বললেও, ওর বলা কথা আর চিৎকারে প্রত্যয়ের চক্ষু চড়কগাছ। প্রত্যয় তৎক্ষনাৎ চোখ মুখ খিঁচিয়ে অনুর মুখটা হালকা চেপে ধরে বললো,
—- আরেহ, কি বলছো এসব? নিচের সবাই শুনলে কি ভাববে? আস্তে বলো জান,আস্তে।
অনু নিজের নাকের পানিটুকু প্রত্যয়ের এক্সক্লুসিভ শেরওয়ানিতে মুছে নতুন উদ্যমে কাঁদতে কাঁদতে বললো,
—- আস্তে বলবো মানে? আমিতো সবাইকে জানিয়ে বলবো আপনি আমাকে কি দিয়েছেন এটা, কয়জন স্বামী দিতে পারে এটা? কার এমন আস্থা আছে, শুনি? কয়জন স্বামী পারে বিয়ের প্রথম রাতেই বউকে এতোটা ভালোবাসা দিতে, বলুন?...তারপর আবারও কান্নার আওয়াজ।
প্রত্যয়দের ঠিক নিচের রুমটাই ওর আপু দুলাভাইয়ের রুম, অনুর এমন কান্নাকাটি আর আহাজারি শুনে প্রত্যয়ের দুলাভাই আপুকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর গলায় বললেন,
—- তোমার ভাইয়ের একটু সংযত হওয়া উচিৎ ছিল অন্তুর আম্মু। মেয়েটার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, এতো কান্নাকাটি করছে। বিয়ের প্রথম রাতেই এভাবে পশুর মতো আচরণ কেউ করে?
স্বামীর কথাকে মুখ বাঁকিয়ে অগ্রাহ করে প্রত্যয়ের আপু ঝাঁজিয়ে বলে উঠলো,
—- নিজে কি করেছিলে সে কথা ভুলে গিয়েছো? এখন আবার আমার ভাইকে দোষারোপ করা হচ্ছে, চুপচাপ ঘুমাও, ওদেরটা ওরা বুঝে নিবে।অনেকক্ষন হলো রুম থেকে বেরিয়ে ছাঁদে

দাঁড়িয়ে আছে অনু। প্রত্যয় গিয়েছে ফ্রেশ হতে, তাই অনু একাই দাড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে আপাতত ।ঠান্ডা হিমেল হাওয়ার ঝাপটা ওর ক্রন্দনরত মুখ মন্ডলে আঁচড়ে পরছে ক্রমশ।
হাওয়ার তালে তালে আধ ভেজা রেসমের মতো চুলগুলোও ইতি উতি উড়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনের আঙিনায় জ্বলতে থাকা মরিচ বাতির রোশনাইএ ছাঁদটাও আলোকিত। আকাশের উজ্জ্বল হাসি হাসি চাঁদখানা এতোক্ষণে মেঘের আড়ালে ঢাকা পরেছে। কালো মেঘের গা থেকে খসে খসে পরছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। বাতাসের তোপে সেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি খুব একটা গায়ে লাগছে না যদিও।
বৃষ্টি ঝরা ফুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে অনু আজ তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে, ভীষণ তৃপ্তিতে অজানা তারকারাজিদের উদ্দেশ্যে মনটা বারবার চিৎকার দিয়ে বলতে চাইছে,—- শুনছো তোমরা, পৃথিবীটা এতোটাও খারাপ নয়, শুধু বদলে দেওয়ার জন্য একটা মানুষ প্রয়োজন, এই যা।
অনু যখন অদূরে আকাশ পানে চেয়ে মনের খুশিতে মন দিয়েই চিৎকার করছিল, ঠিক সেই মূহুর্তেই নিজের উন্মুক্ত বাঁকানো কোমড়ের খাঁজে শীতল দুটো হাতের স্পর্শে শিরশির করে উঠলো অনুর সর্বাঙ্গ। একটু কেঁপে উঠে অনু পেছনে ঘুরবে, তার ফুরসত দিলোনা প্রত্যয়,বরং আরও শক্ত করে ওর কোমড়টা চেপে ধরে নিজের সাথে মিশিয়ে দাঁড় করালো অনুকে,তারপর ওর কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে বললো,
—- তোমার ইমোশনের পাল্লায় পরে রাত তো শেষ হয়ে যাচ্ছে ম্যাডাম। এবার একটু ইমোশন টাকে সামলাও, আমি যে বেসামাল।

অনু সাদা মনে বললো,—- রাত তো শেষ হবেই, রাত না শেষ হলে দিনের আলো ফুটবে কি করে শুনি?
প্রত্যয় অনুর কাঁধে টুকরো চুমু খেয়ে ভারী নিশ্বাস ছেড়ে বললো,
—- আজকের রাতটা যে আমাদের বহু আকাঙ্খিত রাত জান , থাকনা একটু বেশি সময় ধরে এই আধার টুকু। ক্ষ'তি কি?
অনু নির্বাক, প্রত্যয়ের অবাধ্য স্পর্শে ওর গলা জড়িয়ে আসছে, শরীরের তোরনে তোরনে বয়ে যাচ্ছে শিহরণ জাগানো নাম না জানা এক সাইক্লোন। ও খুব করে চাইছে প্রত্যয়ের হাত দু'টোকে স্থির রাখতে কিন্তু পারছে না, প্রত্যয়ের হাতদুটো অবাধে বিচরণ করছে অনুর সমস্তটা জুড়ে। অনু কোনোমতে ছাঁদের পাঁচিলটা শক্ত করে দু'হাতে খামচে ধরে মাথা নুইয়ে রেখেছে। প্রত্যয় দু'চোখ বুঁজে অনুর ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে দিতেই এক পর্যায়ে তীব্র সংকোচে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যয়ের বুকেই মুখ লুকালো অনু।
প্রত্যয়ের বোধ হয় আজ এসব লজ্জা টজ্জা পছন্দ হচ্ছে না, তাই অনুকে খুব একটা আস্কারা না দিয়ে ওর ঠোঁটের ভাঁজে নিঃসংকোচে নিজের আধিপত্য বিস্তার করলো প্রত্যয়,এরপর সেভাবেই অনুকে কোলে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো ওদের সাজানো গোছানো চিলে কোঠার ঘরের দিকে। অনু বেশ কসরত করে প্রত্যয়ের ঠোঁট দুটো থেকে ছাড়া পেয়ে অস্ফুটে শুধালো,—- কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন?
প্রত্যয় দ্রুত গতিতে পুনরায় অনুর অধর জুগলে অধর ডুবিয়ে হিসহিসিয়ে জবাব দিলো,

—-- তোমার লজ্জা ভাঙাতে।শেষ রাতের তীব্র বর্ষনে চারিদিক কর্দমাক্ত। আজকেও আবহাওয়া বেশ শীতল। হয়তোবা এই বর্ষা বর্ষা আবহাওয়াটা এবার বেশ কয়েকদিন দীর্ঘস্থায়ী হবে।
স্টেট আমেরিকার মতো দেশ থেকে ফিরে পুরান ঢাকার এই ভাঙাচোরা পিচ ঢালা রাস্তা ধরে হাঁটতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে সায়রের। স্পঞ্চার শীপ থেকে পাওয়া পায়ের লাল সবুজ ট্যাগ লাগানো গুচ্ছি ব্র্যান্ডের জুতোটাও কাঁদায় মাখামাখি,যা দেখে এই মূহুর্তে এই কাঁদায় বসেই ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে সায়রের। চিপাগলি নিবাসী ওই ঝাঁজ ওয়ালা মেয়েটাকে কান ধরে টেনে এনে। এসব দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে,
— দেখ রাগীনির বাচ্চা, দেখ। তোর জন্য আমার লেটেস্ট ব্র্যান্ডের জুতোটার মান ইজ্জত কাঁদায় ডুবে গড়াগড়ি খাচ্ছে , তবুও রাগ দেখাবি? কথায় কথায় মুখ ঝামটি দিবি? কিসের এতো তেজ তোর? এই টুকুনি চুনোপুঁটির মতো শরীর আবার আমাকে তেজ দেখায়।হুহ!একমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে চিপাগলি নিবাসী সেই রাগীনির বাড়ির সামনে এসেই থামলো, তা টের পায়নি সায়র নিজেও যখন। গন্তব্য যখন এখানেই তাহলে জানা অজানা দিয়ে কিই বা আসে যায়?
সায়রের ও যায় আসলো না। ও আজ আর উঁকি ঝুঁকিও দিলোনা, অনেকটা নিশ্চিত হয়েই হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে গিয়ে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে উঠে গেলো নীলিমাদের শ্যাওলা পরা ছাঁদে। আজকে আর নীলিমা নাচ করছে না, ঘুঙুর সমেত ছাদে এলেও সেগুলো আপাতত অযত্নে ছাদের এককোনায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, আর নীলিমা ছাদের পাঁচিলে কনুই দিয়ে ভর করে দু'হাত কপালে

ঠেকিয়ে রেখেছে, দেখে মনে হচ্ছে কোনো এক অস্থির ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে মেয়েটা।
নীলিমা কি নিয়ে ভাবছে তা বোধগম্য হলোনা সায়রের, তাই ও পেছন থেকে আচমকা ডেকে উঠে নরম গলায় বললো,—- নাচবে না আজ আর? আমিতো দেখতে এলাম।
নীলিমা চমকে উঠলো না, তরিঘরি করে পেছনেও চাইলো না, ভাবটা এমন যেন ও সায়রের উপস্থিতি টের পেয়েছে। বাতাসের সাথে ভাসমান সায়র সায়র গন্ধটা নীলিমা বুঝতে পেরেছে। আদতে তেমন কিছু কিনা কে জানে?
তবে নীলিমা আপাতত আস্তে ধীরে ঘুরে তাকিয়ে চোয়ালটা শক্ত করে সায়র কে বলে ওঠে,
—- কি চাই, আবার কেন এসেছেন?
সায়রের গায়ে লাগলো না নীলিমার চরম তিক্ত কথাগুলো, ওর এতোদিনে বোঝা হয়ে গিয়েছে অর্ণব কেন এতো নি’র্লজ্জ।
সায়র নিজেও এই মূহুর্তে অর্ণবের পন্থাটাই অবলম্বন করলো, নীলিমার কথাতে ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে গিয়ে নীলিমার সামনে দাড়িয়ে বুকের বাম পাশে হাত রাখলো। অতঃপর কোনোরূপ কপটতা না করেই কাতর কন্ঠে বললো,—- কেন যেন সকাল থেকে বুকটা জ্বলে যাচ্ছিল, অযথাই দম আটকে আসছিল,চোখ দুটোও দারুন তৃষ্ণার্থ, কেন যেন মন বলছিল তোমার দেখা পেলে সব অসুখ এক নিমিষে সেরে যাবে, তাই সবার অগোচরেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি নীলিমা। কেউ জানেনা আমি এখানে।
সায়র নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে এই প্রথম নীলিমার নামটা উচ্চারণ করলো, যা নীলিমাকে অবাক করে দিতে সক্ষম।

নীলিমা অবাক হয়ে চট করে সায়রের চোখ চোখ রাখলে, সায়র আবার বলে,
—- চেয়ে দেখো, এখন আমি পুরোপুরি ফিট, আই থিংক আমার অসুস্থতার মোক্ষম কারন টা ই তুমি, তোমাকে বোধ হয় আমার লাগবে।
সায়রের কথায় নীলিমার কপালে সুক্ষ্ম চিন্তার ভাজ পরলো, ও তৎক্ষনাৎ প্রশ্ন ছু'ড়ে শুধালো,—- লাগবে মানে? আমি কি জড়বস্তু নাকি? আর তাছাড়া আমার….
নীলিমার কথাকে মাঝপথে আটকে দিয়ে সায়র শান্ত চোখে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বললো,
—- আমি বলেছি লাগবে, তার মানে লাগবে, তুমি আমাদের ফ্রেন্ডস জোনটাকে যতটা শান্ত আর নিরিবিলি ভাবো আমরা ততটাও সভ্য প্রজাতির নই। সব কটার ব্যাকরাউন্ড উত্তপ্ত কয়লার মতোই দ'গ্ধ। খুব বেশি নাড়াচাড়া করতে এসোনা পু'ড়ে যাবে তাহলে।
নীলিমা বুঝলোনা সায়রের কথার আগামাথা, তবে সায়র যে বেশ সাবলীল ভাষায় শান্ত স্বরে ওকে হু'মকি দিয়েছে সেটা খুব ভালো মতোই ধরতে পেরেছে ও।
এই মূহুর্তে কারও মুখে রা নেই, দুজনই দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে নিরবতা পালন করছে ওরা, হয়তোবা দু'জন দুজনার চোখের ভাষা পড়ে ফেলার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে।
তবে ওদের এই দীর্ঘক্ষনের চোখাচোখির অবসান ঘটিয়ে হুট করেই ছাঁদে চলে আসে নীলিমার আব্বাজান তাইয়েব জামান।
তিনি ভেতরের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে হাঁপানো সুরে বলেন,—- আম্মাজান,বাজার নিয়া আইছি, রাতের খাওন টা….

তিনি বাক শক্তি হারিয়ে ফেললেন তখন যখন দেখলেন, অচেনা এক সুদর্শন যুবক তার ছাদে দাঁড়িয়ে তার দিকেই হতবিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে এই মূহুর্তে।
তাইয়েব জামান মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক গলিয়ে সায়রকে আগা গোড়া পরখ করে গম্ভীর গলায় বললেন,
—- ওই মিয়া তুমি ক্যাঠা? এই মহল্লায় তো তোমারে আগে দেখি নাই। মাগার চেনা চেনা লাগতাছে।
সায়র তাইয়েব জামানের কড়া গলার প্রশ্নে জবাব দেওয়ার আগে নীলিমার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সুরে শুধালো,
—- এই তোমার আব্বাজান?
নীলিমা হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, সায়র আবার তাকালো তাইয়েব জামানের দিকে,সবুজ পাঞ্জাবি পরিহিত ছিপছিপে গড়নের লম্বা চওড়া সুঠাম দেহী এক সভ্য পুরুষ, চোখ মুখে কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য আর রাশভারি ভাব থাকলেও, এ মোটেও সায়রের ভাবনার ধারে কাছেও নেই।
সায়র তো ভেবেছিল নীলিমার আব্বাজান নিশ্চয়ই পেট মোটা, গোঁফ ওয়ালা, কুচকুচে কালো দেখতে কোনো পালোয়ান হবে হয়তো। যে সারাদিন সাদা লুঙ্গি ধরে ধরে পান চিবোয়, আর একে ওকে ধরে মে’রে তক্তা বানিয়ে ছেড়ে দেয়।
কিন্তু এই লোকটাকে তো যথেষ্ট ভদ্রলোক মনে হচ্ছে, নাহ মিললো না। সায়র হতাশ, ভারী হতাশ। সেই হতাশা থেকেই সায়র মলিন মুখে অবিশ্বাসের সুরে ঠোঁট উল্টে আরও একবার প্রশ্ন করলো নীলিমাকে,
—- উনি আসলেই তোমার বাবা তো?

সায়রের কথায় এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো নীলিমা, তেঁতো গলায় বললো,—- আশ্চর্য! এ আবার কেমন কথা? দেখছেন আমার আব্বাজান, তাও ভুলভাল বকে যাচ্ছেন?
—- ওই মিঁয়া, আমার লগে কথা কও তুমি? আমগো ছাঁদে কি কাম তোমার?
নীলিমার আব্বাজানের প্রশ্নে সায়র একটু গলা খাঁকারী দিয়ে বললো,
—- ইয়ে মানে আঙ্কেল, পানি খেতে আসছিলাম, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো।
তাইয়েব জামান বুঝতে পারার মতো করে হালকা মাথা নাড়িয়ে বললেন,
—-অহ, এইডা আগে কইবা না? আহো তাইলে নিচে আইসা পানি খায়া যাও।
এরপর নীলিমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,
—-আম্মাজান, মেহমানরে পানি দাও।
নীলিমা হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে, সায়রের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে গলা খাদে নামিয়ে বললো,
— আসুন। নিচে গিয়ে সায়র সবার আগেই নীলিমার রুমে প্রবেশ করে, পুরো রুমটা গার্লি জিনিস পত্র দিয়ে ভরা। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে সায়র বুঝতে পারে নীলিমার এক্সট্রা কারিকুলাম এক্টিভিটিস অনেক। তার চেয়েও বেশি গোছানো আর পরিপাটি ওর রুম। ছবি আঁকার ক্যানভাস ও রয়েছে রুমের এক কোনে, যেখানে সূর্যাস্থের অর্ধেক পেইন্টিং এখনো অসম্পন্ন। অসম্পন্ন ক্যানভাস দেখে সায়রের বোধগম্য হলো, দেওয়াল জোরা পোট্রেড গুলো তাহলে নীলিমার নিজের হাতেই আঁকা। মেয়েটা আসলেই

ট্যালেন্টেড, এই পর্যায়ে এসে নীলিমাকে সূর্যের সঙ্গেই তুলনা করে বসলো সায়র, মনে মনে হাজারটা বাহবা দিয়ে বললো,
—- যেমন তেজ, তেমন তার গুণ। কিন্তু নীলিমার আম্মা কোথায়?
সায়রের মাথায় প্রশ্নটা আসতেই রুমে প্রবেশ করে নীলিমা, হাতে ছোট্ট ট্রে, তাতে একবাটি ক্ষীর আর এক গ্লাস পানি।
নীলিমা সামনে এসে দাড়ালে সায়র পানির গ্লাসটা নিতে নিতে বললো,
— ক্ষীর কে বানিয়েছে?
নীলিমা থমথমে মুখে উত্তর দিলো,— আমিই।
তৎক্ষনাৎ পানির গ্লাস রেখে ক্ষীরের বাটিতে হাত দিলো সায়র, নীলিমা চেয়ে আছে এক ধ্যানে, সায়র গপাগপ করে ক্ষীর খেতে খেতে মৃদু হেসে বলে,
—— উমম!আমার লাইফের বেস্ট ক্ষীর এটা।
এবার নীলিমাও ঠোঁট কামড়ে সামান্য হাসলো, যা সায়রের দৃশ্যগত হওয়ার আগেই আবার উবে গেলো।
সায়র খেতে খেতে আবারও প্রশ্ন করে বললো,
—- আচ্ছা শাশুড়ী আম্মা, না মানে তোমার আম্মা কোথায়?
নীলিমা কোনোরূপ দুঃখ প্রকাশ না করেই স্বাভাবিক ভাবে বললো,
—- আম্মা নেই, আমার ছোট ভাইয়ের জন্মের সময়ই আম্মা দুনিয়া ত্যাগ করে, তারপর থেকেই আমি আব্বা আর নয়ন মিলেই আমাদের পরিবার। ওই জন্যই তো আমি দূরে কোথাও…
নীলিমা মাঝপথেই কি ভেবে যেন থেমে গেলো। সায়র ওকে আস্বস্ত করে বললো,— হ্যা বলো?

নীলিমা পুনরায় বলতে আরম্ভ করে,
—-- ওই জন্য আব্বা আর ভাইকে ছেড়ে আমি দূরে কোথাও যেতে পারবো না, যার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে সে আমার মহল্লারই.. এতো কাছাকাছি দেখেই বিয়ের প্রস্তাবে আর না করিনি।
—-- হয়েছে থাক, বিয়ের পরে এতো বাপের বাড়ি নিয়ে ভাবলে হয়না, দরকার পরলে তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী আমেরিকা নিয়ে যাবো।
— কিহ!!
ক্ষীরের বাটিটা ঠাস করে ট্রেতে রেখে, কথাগুলো বললো সায়র, অতঃপর ঢকঢক করে গ্লাসের পানিটুকু শেষ করে উঠে দাড়িয়ে নীলিমাকে শুধালো,
—-- তোমার আব্বাজান কোথায়?
নীলিমা আঙুল উঁচিয়ে বসার ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলে, সায়র বড়বড় পা ফেলে তাইয়েব জামানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তাইয়েব জামান তখন পেপার পড়ায় ভীষণ মনোযোগী, সায়র তার হাত থেকে ছো মে”রে পেপারটা টেনে নিয়ে পাশের টি-টেবিলে রেখে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে করতে মনেমনে বললো,
—-- খুব শীঘ্রই আপনাকে বড়সড় একটা ঝটকা দিতে যাচ্ছি আব্বাজান, আশা করি আল্লাহ আপনাকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান করবেন,আমিন। দিনের শেষ প্রহরে প্রকৃতি জুড়ে সন্ধ্যে নামার হাতছানি। অদূরের পাখিরা ডানা ঝাপ্টে ঘরে ফেরার সুর তুলেছে, সারাদিন উত্তাপ ছড়িয়ে বেড়ানো তেজস্ক্রিয় সূর্যটাও মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছে পশ্চিম আকাশে, সেথায় এখন কাঁদা মাটির ন্যায় লেপ্টে আছে সিঁদুর রঙা এক ফালি

নিয়ন আলোর ছটা। আর তো কিছুক্ষণ তারপরই নিকোশ আধারে তলিয়ে যাবে ধরনী।
সন্ধ্যার আয়োজনটা আজ ক্রীতিক কুঞ্জে বেশ ঘটা করেই পালন করা হচ্ছে। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ডাইনিং টেবিল ভরে উঠেছে নানান রকম সুস্বাদু নাস্তার বহরে।
অর্ণব, এলিসা, তার ক্যাথলিন সেখানে বসে বসে পাকোড়া চিবুচ্ছে, অরু আর সায়রও উপস্থিত, তবে ওদের মনটা ভালো নেই।
নীল আকাশের ভারী মেঘের ঘনঘটার মতোই কালো হয়ে আছে ওদের মুখশ্রী।
অরু মুখটা মলিন করে সেই তখন থেকে শূন্য চোখে গালে হাতদিয়ে বসে আছে দেখে এলিসা খেতে খেতে শুধালো,— এ্যাই মেয়ে ,কি হয়েছে তোমার? মুখ কালো কেন? নিশ্চয়ই জেকে কিছু বলেছে?
অরু জোরপূর্বক হেসে জানালো,
— তেমন কিছু নয় আপু, আসলে আপাকে খুব মিস করছি। সব সময় ,সব পরিস্থিতিতে একসাথে ছিলাম আমরা দু'বোন, অথচ এখন দেখো আজ তিনদিন হয়ে গেলো আপা শশুর বাড়িতে পরে আছে।
মনেমনে বললো,
— তোমাদের জেকে আর কিইবা বলবে, সে'তো তো আমার সাথে কথাই বলেনা সেই বিয়ের দিন থেকে।
অরুর কথায় ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এলিসা করুন স্বরে বলে,
—- তা ঠিক বলেছো অনুকে তো আমরাও মিস করছি, তার উপর বউ ভাতের দিন আমরা গেলেও জেকে তো তোমাকে যেতেই দিলোনা আর। বউ ভাতের দিনের কথা মনে পরতেই আরও

একদফা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো অরুর চিত্ত চিড়ে। সেদিন শুধু শুধু ক্রীতিক ওকে যেতে দিলোনা, বউ ভাতের দিন অনুর কাছে যেতে না দেওয়ার দুঃখ টা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই অরু ডুব দিলো সেদিনের ঘটনায়।একে একে মনে পরতে লাগলো ক্রীতিকের বিরক্তিকর কর্মকান্ড গুলো।
বউ ভাতের আয়োজনে সামিল হতে একে একে ক্রীতিক কুঞ্জের গেইট ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো অতিথিদের গাড়ির বহর। একেবারে শেষে যে গাড়িটা পরে রইলো সেটাতেই আপাতত ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, সায়র, অর্ণব,এলিসা, ক্যাথলিন আর অরু।
কালকের কাহিনির পরে অরুর যে বউ ভাতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে তেমনটা নয়,কিন্তু সবার জোরাজুরি আর অনুকে এক নজর দেখার স্পৃহার দরুন নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে রাখতে পারলো না অরু।
না গেলে নিশ্চয়ই আপা মন খারাপ করবে,সেই ভেবেই আপার মন খারাপকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে, অগত্যা, রেডি হয়ে অরু ও বেড়িয়ে পরলো সবার সাথে।
সায়র ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট করতে করতে পেছন তাকিয়ে বললো,—- সবাই এসেছে তো?
অরু তখনও ওঠেনি, ভারী সুতোর কাজ করা ফুল স্লিভ, ফুল নেক গাউনটা সামলে আস্তে ধীরে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই পেছন থেকে কেউ একজন বলে,
—- তোরা চলে যা, ও যাবেনা।
আগন্তুকের কথায় অরু বিষ্ফরিত নয়নে পেছনে চেয়ে দেখলো, বাসায় পরার সফেদ রঙা ওভার সাইজ টিশার্ট আর ওভার সাইজ

খাকি ট্রাউজার পরে এলোমেলো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রীতিক। এক হাত পকেটে গুজে, অন্য হাতে ধরে রেখেছে আইপ্যাড আর হেডফোন,
নির্ঘাত ডার্ক রোমান্টিক অডিও বুক শুনছিল।
চোখ ছোট করে ভাবছে অরু, মনেমনে বলছে,
—- সারাদিন হেডফোন লাগিয়ে এসব শুনবে আর আমার উপর ভুলভাল এ'ক্সপেরিমেন্ট প্রয়োগ করবে, খারুস লোক একটা।
সে যাই হোক কিন্তু এখন উনি কি বললো?
অরুর ভাবনার সুতো ছিড়লো এলিসার রুদ্ধ আওয়াজে, ও ক্রীতিকের কথার পাছে খেঁকিয়ে উঠে বললো,—-যাবেনা মানে? আমরা সবাই যাচ্ছি তাহলে অরু কেন যাবে না?
ক্রীতিক শান্ত স্বরে বললো,
— কারণ আমি যাচ্ছি না, আমার অনেক কাজ রয়েছে পেন্ডিং।
এবার সায়র গলা উঁচিয়ে বললো,
— তোর কাজ তুই কর গিয়ে, ওকে কেন যেতে দিবি না?
সায়রকে তীক্ষ্ণ চোখে ভস্ম করে দিয়ে, ক্রীতিক সবার উদ্দেশ্যে বলে,
——আমি যেহেতু যাচ্ছিনা, সেহেতু আমার বউয়ের ও যাওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া আমার অরুর সাথে দরকারি কাজ আছে, ইটস ভেরী পার্সোনাল।
ক্রীতিকের এহেন ঘুরানো প্যাচানো কথায় কেউ আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস দেখালো না, আবার প্রশ্ন করতে গেলে সবার সামনে কি জানি কিই ঠাস করে উত্তর দিয়ে বসে তখন আবার মান সম্মানের প্রশ্ন। তার চেয়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চলে যাওয়াই উত্তম, যার বউ তার কাছেই বরং থাকুক।

অরুর কোনো মতামত না নিয়েই সবাই চোখের পলকে হুঁশশ করে বেরিয়ে গেলো।
চলতি গাড়িটার দিকে নিস্প্রভ চোখে চেয়ে থেকে ভারাক্রান্ত আওয়াজে অরু বলে ওঠে,—- এটা কি হলো? আপা তো রাগ করবে। এটা কিইই করলেন আপনিইই?
অরুর দুঃখের বিলাপ ক্রীতিকের কান অবধি পৌঁছেছে বলে মনে হচ্ছে না, উল্টে ও অরুর কব্জি চেপে ধরে টান'তে টা'নতে নিয়ে গেলো দু'তলায় নিজের রুমে। পুরো ক্রীতিক কুঞ্জ খালি পরে আছে, একটা সার্ভেন্ট অবধি অবশিষ্ট নেই, সবাই রওনা করেছে বউ ভাতের অনুষ্ঠানে, বাড়িতে রয়ে গিয়েছে শুধু ক্রীতিক আর অরু। এতো বড় বাড়িটা হুট করে ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় অরুর গা ছমছম করছে, তারউপর ক্রীতিক এমন টানা হেঁচড়ে করছে দেখে অরুর এবার সত্যিই ভয়ে গা শিউরে উঠলো। ও নিজের সর্ব শক্তি দিয়ে হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে কাইকুই করে বলে ওঠে,—- ছাড়ুন না, লাগছে আমার।
ক্রীতিক রুমে এনে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে তবেই অরুর হাত ছাড়লো।
অরু দম নিলোনা ব্যথাতুর হাতটা অন্য হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে বললো,
—- কি হয়েছে যেতে দিলেন না কেন?
ক্রীতিক নিজের এক ভ্রু উঁচিয়ে বললো,
—- কালকের ঘটনার পরেও আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে আত্না কাপছে না তোর?

অরুর মেজাজটা বিগড়ে আছে, একে তো আপার সাথে দেখা হওয়ার সুযোগটা মাটি, তার উপর ক্রীতিকের এমন জোর জব'রদস্তি, আর এই মূহুর্তে বিগড়ানো মেজাজটাকে সামলে নেওয়ার কোনো ইচ্ছেও নেই ওর, অগত্যা নিজের নাকটা সিকোয় তুলে, ঝাঁজিয়ে উঠে অরু বলে,
—- না কাঁপছে না, কারন আপনি আমার স্বামী, স্বামীর সাথে কথা বলতে কারও আত্না কাঁপে শুনেছেন কখনো?
ক্রীতিক বুঝলো ওর দূর্বলতাটা অরু ভালোমতোই রপ্ত করেছে,কিভাবে কথা এগোলে ক্রীতিক দমে যাবে সেটা অরু শিখে গিয়েছে। তাই ওর সাথে তর্কে না গিয়ে ক্রীতিক কথা ঘুরিয়ে গম্ভীর মুখে বললো,—- এসব হাবিজাবি পোশাক এক্ষুনি চেঞ্জ কর,রাগ লাগছে আমার।
অরু ত্যক্ত গলায় বললো,
— চেঞ্জ করার জন্য হলেও তো রুমে যেতে হবে, যেতে দিন?
— না এখানেই কর।
— কিহ!
অরুর হতবিহ্বল মুখের পানে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ক্রীতিকের ঠোঁটের আগায় খেলে গেলো এক চিলতে কপট হাসি, এই ভীত হরিণীটাকে ভরকে দিতে ওর বেশ লাগে।
কিন্তু পরক্ষনেই গতকাল অমিত অরুকে স্পর্শ করেছে, সেই দৃশ্যটা মানস্পটে ভেসে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে এলো ক্রীতিকের। ও কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে অরুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে, চুলের পেছন থেকে অরুর সরু ঘাড়টা চেপে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গাঢ় গলায় বলে,

—- উল্টা পাল্টা চিন্তা করা বন্ধ কর, আমি তোকে আদর সোহাগ করার জন্য ড্রেস চেঞ্জ করতে বলিনি,অবশ্য আমার আদর তুই ডিজার্ভ ও করিস না।
কথা শেষ করে অরুকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিলো ক্রীতিক।
ক্রীতিক প্রচন্ড রাগে বো'ম হয়ে আছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অরু নিচু স্বরে বললো,—- এখানে পড়বো টা কি? জামা কাপড় তো সব রুমে।
ক্রীতিক স্টাডি টেবিলে গিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসে বললো,
—- ক্লজেটে অনেক গুলো ওভার সাইজ টিশার্ট আছে যেটা ইচ্ছে পর।
তৎক্ষনাৎ অরু চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে ,
—- আপনি কি পা'গল? এটা আপনার ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ি নয় যে চাইলেই আমি আপনার হাটু সমান টিশার্ট পরে ঘুরে বেড়াবো, এটা ক্রীতিক কুঞ্জ, বাংলাদেশের ক্রীতিক কুঞ্জ।
ক্রীতিক ল্যাপটপ স্ক্রিনে চোখ নিবদ্ধ রেখেই জবাব দিলো,
—- বাড়িতে কেউ নেই, যা বলছি চুপচাপ তাই কর।
অরু জানে ক্রীতিকের জিদের কাছে ওর হার মানতেই হবে, তাই অযথা কথা বাড়িয়ে নিজের সময় আর এনার্জি খরচ করলো না ও আর, ক্লজেট খুলে বড় দেখে একটা সাদা টিশার্ট নিয়ে ঢুকে গেলো ওয়াশরুমে।
অরু যখন বেরিয়ে এলো, তখনও ক্রীতিক আগের ন্যায় স্টাডি টেবিলেই বসে আছে, অরুর পায়ের আওয়াজে এক ঝলক ওর দিকে তাকিয়ে ক্রীতিক বলে,

—- তুই কি প্ল্যান করে আমার সাথে ম্যাচিং কালারের টিশার্ট পরেছিস নাকি? এই সব প্ল্যান ফ্ল্যান করে থাকলে ভুল করছিস, তোর অ'ন্যায়ের কোনো ক্ষমা নেই। এখন দাঁড়িয়ে না থেকে চুপচাপ পড়তে বস।
ক্রীতিকের শেষ কথায় অরু যেন আকাশ থেকে পাতালে পরলো, কপালে বিরক্তির একশো একটা ভাজ টেনে নাকটা চুড়োয় তুলে অরু বললো,—- পড়তে বসবো মানে?
ক্রীতিক নির্লিপ্ত গলায় বলে,
—- এতে এতো অবাক হওয়ার কি আছে? আমি ছিলাম না বলে পড়াশোনার বারোটা বাজিয়েছিস, এখন থেকে এসব একাডেমি ফ্যাকাডেমি যাওয়া বন্ধ,অমিতের মতো নোভেলিস্ট হওয়ার ভুত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল,অমিত কিংবা ওর পেশা সবকিছু থেকে একশো হাত দূরে থাকবি তুই। এ্যাম আই ক্লিয়ার?
এখন পড়তে আয়, আজকের লেসন এর উপর কিছু এসাইনমেন্ট দেবো তোকে, কাম হেয়ার।
অরু নির্লিপ্ত মুখে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে পরলে, ক্রীতিক ওর সামনে ল্যাপটপ এগিয়ে দিয়ে নিজে লেকচার শুরু করে। সময় নিয়ে একে একে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে অরুকে বোঝায়, কোথাও বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিনা সেটাও বারবার জিজ্ঞেস করে। এভাবে লেসন দিতে দিতে কয়েকঘন্টা অতিবাহিত হলে ক্রীতিক অরুকে কিছু শর্ট কোশ্চেন সলভ করতে দিয়ে নিজে পুনরায় ল্যাপটপে মনোযোগী হয়।
ক্রীতিক অন্যদিকে খেয়াল দিয়েছে, সেটা বোধগম্য হতেই অরু এগিয়ে এসে ক্রীতিকের সামনের চেয়ারটাতে বসে ওর দিকে ঝুঁকে

কিছু বলতে যাবে, তৎক্ষনাৎ ঘোর আপত্তি জানিয়ে ক্রীতিক বলে,—- খবরদার একদম কাছে আসবি না আমার। যা বলার দূর থেকে বল।
অরু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্রীতিকের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বললো,
—- দেখুন আমার ইকোনমিকস পড়তে একটুও ভালো লাগেনা,সত্যি বলছি।আমি বাংলা সাহিত্য পড়তে চাই।
অরুর কথাটা বোধ হয় মোটেই ভালো লাগেনি ক্রীতিকের,ও নিজের হাতে থাকা পেপার ওয়েটটা মুঠিতে নিয়ে চোয়াল শক্ত করে বলে,
—- তুই বলতে চাইছিস আমার সাবজেক্ট নয়,বরং অমিতের সাবজেক্ট তোর ভালো লাগে তাইতো?
অরু তরিৎ গতিতে না সূচক মাথা নাড়িয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলে,
—- না না তেমন কিছু নয়, আপনি ভুল বুঝছেন। কিন্তু ইকোনমিকস....
—- হয়েছে আর বলতে হবেনা, এটুকুতেই অনীহা ধরে গিয়েছে আমার প্রতি। সারাজীবন থাকলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে যাবি?ক্রীতিকের কথায় অরু বারবার না সূচক মাথা নাড়ায়, কিন্তু ক্রীতিকের জিদ তো কুন্ডলী পাকিয়ে বেড়েই চলেছে।
ও এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে, অরু ওর সাবজেক্ট রিজেক্ট করে অমিতের সাবজেক্ট পড়তে চাইছে, হাউ ডেয়ার শি?
ক্রীতিক মেজাজ হাড়িয়ে অরুকে তৎক্ষনাৎ রুম থেকে বের করে দিয়ে দরজা লক করে দিলো। ক্রীতিকের এমন হুটহাট রেগে যাওয়াতে এই মূহুর্তে অরু নিজেও বেশ বিরক্ত, তাই ওকে আর আগ বাড়িয়ে ডাকতে গেলো না অরু, চুপচাপ হাঁটু সমান টিশার্ট টাকে

আরেকটু টেনেটুনে নিচে নামিয়ে, লম্বা চুল গুলো চুড়ো করে বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে গেলো নিজের রুমের দিকে ।আড়মোড়া ভেঙ্গে অরু যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সূর্য মাঝ আকাশে। জানালা গলিয়ে দুপুর বেলার তীর্যক সূর্য রশ্মি এসে শরীরে আঁচড়ে পরতেই চোখ মুখ কুঁচকে গেলো অরুর। সেই যে তখন ক্রীতিকের রুম থেকে ফিরে শুয়েছিল, তারপর কখন যে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গিয়েছে তা আর টের পায়নি অরু, যখন টের পেলো তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায়।

ক্রীতিক আশেপাশে কোথাও নেই, তবুও ক্রীতিকের মাস্কি সুবাসটা চারিদিকে ভুর ভুর করছে, কোথা থেকে ভেসে আসছে এই সুঘ্রাণ তার উৎস খুঁজতেই গিয়েই অরুর খেয়াল হলো ও ক্রীতিকের টিশার্ট পরে আছে, পরক্ষণেই নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে অরু, কেন যেন এই টিশার্ট টা পরে মনে হচ্ছে ক্রীতিক ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

আর এই গন্ধটা, ভাবতে ভাবতে গলার কাছ থেকে টিশার্টটা টেনে নাকে ছোঁয়ালো অরু, এটা বোধ হয় আজকাল পরেছে ক্রীতিক, ওই জন্যই এতো সুন্দর ম্যানলি সুঘ্রাণ বেরোচ্ছে। সিগারেট, আফটার শেভ, স্যান্ডাল উড পারফিউম,শুকিয়ে যাওয়া ঘাম সবটা মিলেমিশে এক অকৃত্রিম নেশাতুর প্রভাব বিস্তার করে অরুর মস্তিষ্কের নিউরনে নিউরনে।হৃদ মাঝারে ক্রীতিকের জন্য পা'গলপারা অনুভূতির জোয়ার উগরে দিতে অরুর বোধ হয় এতোটুকুই যথেষ্ট। অষ্টাদশীর প্রথম প্রেম বলে কথা, আবেগ তো টইটম্বুর হবেই।অরু এসব ভেবে ভেবে আর সময় নষ্ট করে না, কারন ক্রীতিকের কথা ভাবতে বসলে ওর দিন পেরিয়ে রাত ঘনাবে

তবুও এই মানুষটাকে ভালোবাসার কোনো কারন মাথায় আসবে না ওর। এমন ছন্নছাড়া বদ মেজাজী মানুষকে কেউ ভালোবাসাবে অরু ছাড়া?
প্রকট গর্ববোধে মনে মনে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালো অরু, তারপর জামা কাপড় পাল্টে নিচে গিয়ে জোগান দিতে বসলো দুপুরের খাবারের।
বউকে রান্না করে নিজ হাতে খাওয়ানোর মতো হাসবেন্ড ম্যাটেরিয়াল পুরুষ ক্রীতিক নয়, হয়তো নিজেও অরুর সাথে জিদ দেখিয়ে না খেয়ে বসে বসে কাজ করছে।
তাই অরুই দ্রুত হাত চালিয়ে ভাত,ডাল রান্না করলো, ফ্রিজের লেফটওভার তরকারি গুলো গরম করলো, আর সাথে ক্রীতিকের জন্য মিক্সড স্যালাড বানালো।
সবকিছু তৈরী করে অরু খাবার দাবার সব ডাইনিং এ সাজিয়ে নিচতলা থেকে টেলিফোন করলো ক্রীতিকের নাম্বারে। ক্রীতিক ফোন তুলে রুদ্ধ আওয়াজে বললো,— কি চাই?
অরু কিছুটা কপটতা অবলম্বন করে নাক টেনে ফুপিয়ে উঠে বললো,
—- আ..আমার হাত কেটে গিয়েছে, অনেক র’ক্ত পরছে আপনি তাড়াতাড়ি নিচে আসুন।
অরুর বলতে দেরি হলো ক্রীতিকের ধরফরিয়ে নিচে নেমে আসতে দেরি হলোনা, এমনকি তাড়াহুড়োয় পায়ের স্লিপারটাও পরেনি ও, খালি পায়ে দৌড়ে এসে অরুকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ক্রীতিক উদ্বিগ্ন স্বরে বলে,
—- কি হয়েছে বেইবি, কোথায় লেগেছে?

—- আমি ঠিক আছি, কোথাও লাগেনি।
অরুর মিটিমিটি হাসি আর কথাটা বোধগম্য হতেই ক্রীতিকের ম্লান হয়ে যাওয়া সুপ্ত রাগটা পুনরায় ভলভলিয়ে ওঠে মস্তিষ্ক জুড়ে, ও তৎক্ষনাৎ বাজপাখির ন্যায় ছো মে’রে অরুর গলাটা হাল্কা চেপে ধরে আ’গুন চোখে তাকিয়ে বলে,
—- আমার সঙ্গে এই ধরনের মশকরা করার সাহস কোথায় পেলি তুই? তুই জানিস একটুর জন্য আমার হার্টবিট স্টপ হয়ে গিয়েছিলো? আমি কয়েক সেকেন্ড আগেও এটা ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম যে কতখানি কে’টে গেলো তোর,কাটা যায়গা থেকে ঠিক কতটা র’ক্ত ঝরছে , আর তুই কিনা আমার সাথে এই সব সেনসিটিভ বিষয় নিয়ে মশকরা করছিস? হাউ দেয়ার ইউ অরু? অনেক সাহস বেড়ে গিয়েছে তোর।
ক্রীতিকের বরফ কেটে ফেলার মতো ধা’রালো কথায় শুষ্ক ঢোক গিললো অরু, কোনো মতে সাহস জুগিয়ে মিনমিনিয়ে বললো,—- খেতে ডাকলে তো জীবনেও আসতেন না, তাই এভাবে ডেকেছি।
অরুর কথায় ক্রীতিক এবার আরও রেগে গেলো, রাগে ফোঁসফাস করে বলে উঠলো ,
—- আমার দূর্বলতা নিয়ে টানাটানি করা বন্ধ কর অরু, আই হেইট বিট্রে্।
কথা শেষ করতেই খাবার টেবিলে চোখ আটকে গেলো ক্রীতিকের। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, অথচ ওরা দুজনার একজন ও কিছু খায়নি এখনো।

অরু অভুক্ত সেটা মাথায় আসতেই অরুর গলাটা ছেড়ে দিয়ে ওকে নিয়ে বেসিনে চলে যায় ক্রীতিক, অতঃপর অরুর ঘর্মাক্ত মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে নরম স্বরে বলে,
—- আর কখনো এমন মশকরা করিস না হার্টবিট, আমাকে মানাতে তোর নিজেকে নিয়ে মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন নেই, সময় হলে আমি নিজেই মেনে যাবো, তোকে ছেড়ে কোথায় যাবো আমি বল? তুই ছাড়া কেইবা আছে আমার?সেদিনের কথাগুলো ভেবে আরেক দফা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অরু, ক্রীতিক তখন কথা দিয়েছিল মেনে যাবে, আর রাগ করে থাকবে না, কিন্তু কিসের কি?
এখনো অরুর সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেনা ক্রীতিক। যেটুকু বলে সেটাও ধমকের সুরে, সত্যি বলতে অরু শুধুমাত্র অনুকে নয়,ক্রীতিককেও মিস করছে, ওর ভালোবাসা গুলো ভীষণ মিস করছে অরু।
অর্ণব অরুর মলিন মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সায়রের দিকে চাইলো, সায়রের ও একই হাল,কয়েক সেকেন্ড অন্তর অন্তর খালি ফুসফাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে ছেলেটা। অর্ণব পাকোড়া ভর্তি মুখ নিয়ে সায়রের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে অস্পষ্ট আওয়াজে শুধালো,—- অরুর না-হয় অনুর জন্য মন খারাপ, ছোট বেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে এখন দু'বোন দুই বাড়িতে, কিন্তু তোর কি হয়েছে? তোর ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজে তো উপর ওয়ালার ও মন গলে যাবে বলে মনে হচ্ছে।
অর্ণবের কথার পাছে সায়র বুক ভার করা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই হুড়মুড় করে সদর দরজা ঠেলে অন্দরমহলে প্রবেশ করে ক্রীতিক আর আজমেরী শেখ।

ওদের পেছন পেছন প্রত্যয় ও এসেছে l তাদের সবার বেশভূষা আর হাতের ফাইলপত্র দেখে মনে হচ্ছে মাত্রই অফিস থেকে ফিরলো তারা, তবে আজমেরী শেখ আর ক্রীতিক দু'জনারই চোখ মুখ গম্ভীর হয়ে আছে।

দু'জনার তীক্ষ্ণ চোখ দেখে মনে হচ্ছে, পারছে না দুজন দু'জনকে কাঁচা গি'লে খেতে, আর ওদের মধ্যে চাপা পরে প্রত্যয় অসহায়ের মতো শুধু এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

ভেতরে প্রবেশ করে দু'জন দুজনার চোখের দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করে, দু'জনই বড় বড় পা ফেলে দুই দিকের সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে উপরে চলে গেলো তারা। নিজের মা আর স্বামীর এমন স্নায়ু যু'দ্ধ দেখে অরু হকচকিয়ে ওঠে, সহসা দৌড়ে এসে প্রত্যয়কে উদ্দেশ্য করে বলে,—- কি হয়েছে প্রত্যয় ভাইয়া?সব ঠিক আছে তো?

প্রত্যয় বিরক্তিতে চিড়বিড়িয়ে উঠে, তেঁতো গলায় বললো,

—- এই যে অরু, তোমার মা আর তোমার বর কে সামলাও। প্রতিদিন মিটিং এ তারা টেন্ডার নিয়ে একজন আরেক জনের পিছনে লেগেই থাকে। জামাই শাশুড়ী যদি একটু হলেই একজন আরেকজনের পেছনে লেগে যায়, তাহলে অন্য শেয়ার হোল্ডাররা কি করবে শুনি? মাঝখান থেকে আমি বেচারা সব কিছু সামলাতে সামলাতে টেনশনে ভর্তা হয়ে যাচ্ছি, এদের টেনশনে টেনশনে আমি যদি এ্যাটাক,ফ্যাটাক করে বসি তাহলে তোমার আপার কি হবে বলোতো?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সত্যিই তো প্রত্যয় ভাইয়া এই বয়সে পটল তুললে আপার কি হবে? তার উপর আপা যদি শোনে প্রত্যয় ভাইয়ার মৃ:ত্যুর পেছনে একমাত্র দায়ী তার ছোট বোনের একমাত্র

স্বামী জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী, তাহলেতো সব সম্পর্ক শেষ।—- কি ভাবছো?
প্রত্যয়ের ডাকে ভ্রম কেটে গেলো অরুর। ও তৎক্ষনাৎ সাবধানে প্রশ্ন ছুড়ে বললো,
—- মায়ের কি হয়েছে?
প্রত্যয় বললো,
—- শেয়ার হোল্ডারদের দুটো টেন্ডারই ক্রীতিক ভাই পেয়েছে, নতুন জয়েন করে একই সাথে দুটো টেন্ডার পাওয়া মুখের কথা নয় অরু, অনেক খাটুনির কাজ। ক্রীতিক ভাই কষ্ট করেছে, দিন রাত খেটেছে, কিন্তু মা এটাকে পজিটিভলি নিচ্ছে না। টেন্ডার গুলো যাতে হাতছাড়া হয় সে জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন মা, যা পরবর্তীতে ক্রীতিক ভাইয়ের কানেও চলে এসেছে। ওই জন্যই আর আরকি….
অরুকে আর খুলে বলতে হলোনা, ও যা বোঝার বুঝে গিয়েছে। ব্যক্তিগত জিদ এখন কোম্পানির কাজেকর্মেও প্রকাশ পাচ্ছে, আজকাল এসবের জন্য অরুর নিজেকেই সবচেয়ে বেশি অপ’রাধী মনে হয়, কেন যে ভালোবাসতে গেলো জায়ান ক্রীতিক কে? আচ্ছা অরু না ভালোবাসলে জায়ান ক্রীতিক কি ওকে ছেড়ে দিতো? ভাবছে অরু। অরুর ভাবনার ছেদ ঘটে উপর তলা থেকে ক্রীতিকের ডাকে,—- বেইবি একগ্লাস ঠান্ডা পানি।
অরু উপরের দিকে তাকিয়ে সস্থির নিঃশ্বাস ছাড়লো, আজ প্রায় তিনদিন পর ক্রীতিক আবারও ডাকছে অরুকে,যার ফলে বুকের ভেতরটাতে শীতল ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো ওর, একটু আগের

সন্দেহ, দোটানা সবকিছু মূহুর্তেই হাওয়ায় উবে গেলো। পাছে এসে জড়ো হলো একরাশ সস্থি আর ব্যকুলতা।
ক্রীতিক ডাকছে তার মানে রাগ পরেছে,কথাটা ভেবেই অরু আর অপেক্ষা করে না পানি নিয়ে সোজা চলে যায় উপরের ঘরে।
তবে রুমে এসে ক্রীতিককে পায়না অরু, ওয়াশরুম থেকে পানির কলকল আওয়াজ বেরোচ্ছে, মনে হয় শাওয়ার নিচ্ছে ক্রীতিক, তাই বেডসাইড টেবিলে পানির গ্লাসটা রেখে চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে যায় ও।সেই যে সন্ধ্যা বেলাতে একটু খানি চোখের দেখা হলো তারপর আর কোনো খোঁজ নেই ক্রীতিকের।
এখন মাঝরাত, মেঘের চাঁদরে ঢাকা পরেছে শুক্লপক্ষের চাঁদ, বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা ও সন্ধ্যা বেলাতে দরজায় খিল দিয়েছে, মামিরাও ঘুমাচ্ছে, এলিসা ক্যাথলিন ও ঘুমে বিভোর, ঘুম নেই শুধু অরুর দু'চোখে, ও কতক্ষণ পানি খাওয়ার ছলে নিচে আসছে তো কতক্ষন করিডোরে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে, মাথায় শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন এতো রাতে কোথায় যেতে পারে মানুষটা?
অবশেষে অরুর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাত আড়াইটা নাগাদ বাড়িতে ফেরে ক্রীতিক। ক্রীতিক ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাগ অভিমান সমস্তটা ভুলে গিয়ে এক ছুটে নিচে চলে আসে অরু।
নিচে এসে ক্রীতিকের মুখোমুখি হয়ে দাড়াতেই ক্রীতিক শান্ত গলায় বলে,—- ঘুমাস নি?
—- কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?
অরুর প্রশ্নে ক্রীতিক বাধ্য স্বামীর মতো জবাব দিলো ,
—- বিয়ের আসর থেকে মেয়ে ভাগিয়ে আনতে।

ক্রীতিকের এহেন কথায় অরুর দুনিয়া দুলে উঠলো, ও তৎক্ষনাৎ হিং'স্র বা'ঘিনীর ন্যায় ঝাপিয়ে পরে দু'হাতে ক্রীতিকের ডেনিম শার্টের কলারটা খামচে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো,
—- ঘরে বউ থাকা সত্বেও একটা মেয়ে ভাগিয়ে আনতে লজ্জা করলো না আপনার? একটু মনমালিন্য ঝগড়াঝাটি হয়েছে বলে আপনি এমন একটা কাজ করবেন? নাকি এখন আর আমাকে ভালো লাগেনা? আমার মাঝে কি অনুপস্থিত যা ওই মেয়ের মধ্যে আছে? কেন করলেন এটা?
জীবন দিয়ে দেবো তবুও আপনার ভাগ আমি কাউকে দেবোনা। জায়ান ক্রীতিক শুধু আমার,কই সেই হ'তচ্ছাড়ি ওকে আজ আমি ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে বিদায় করবো।
অরুর এসব কা'ন্নাকাটি আর আহাজারিতে বিরক্ত হয়ে শেষমেশ ওকে একটা রাম ধমক দিলো ক্রীতিক,
—- জাস্ট স্টপ ইট অরু। সেই তখন থেকে বলেই যাচ্ছিস, বলেই যাচ্ছিস, আমাকে এক্সপ্লেইন করার সুযোগটা দিয়েছিস? কিভাবে বলবো আমি?ক্রীতিকের ধমকে কেঁপে উঠল অরু, পরবর্তীতে দ্বিতীয় আর একটা কথাও মুখ থেকে বের করার সাহস দেখালো না আর। শুধু চুপচাপ মাথা নুইয়ে চোখের পানি ফেলছিল, ক্রীতিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরুকে মানানোর মতো করে বললো,
—- আমি আমার জন্য মেয়ে ভাগাতে যায়নি বেইবি।
—- তাহলে?
ক্রীতিকের আর কষ্ট করে অরুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হলোনা, তার আগেই ওর পেছনে উপস্থিত হলো আরও দুজন ব্যক্তি, অরু

ক্রীতিকের থেকে একটু খানি সরে দাড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখতে পায়,
—- সায়র আর নীলিমা হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নীলিমার পরনে লাল টুকটুকে বিয়ের শাড়ি, চোখ দুটো অ'শ্রুসীক্ত। ওর লাল লাল চোখদুটো দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা অনেক কেঁদেছে।
অরু নীলিমার দিকে এগিয়ে গিয়ে হতবাক হয়ে বললো,—- কি হয়েছে নীলিমার?
ওদের পর পরই অর্ণব আর এলিসা ভেতরে প্রবেশ করতে করতে হাসি মুখে বললো,
—- বিয়ে হয়েছে, আমাদের সায়রের সাথে।
নীলিমা কেঁদে উঠলো তৎক্ষনাৎ,
—- আব্বাজাআআন।
সায়র হতবাক হয়ে ওর ক্রন্দনরত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,
—- এখনো আব্বাজান আব্বাজান করবে? পালিয়ে এসেছি তো আমরা।
ওদের কারোর কথার আগামাথা বুঝতে না পেরে অরু একই সাথে অনেক গুলো প্রশ্ন ছু'ড়ে বলে,
—- এলিসা আপু তুমি না ঘরে ছিলে? আর নীলিমার তো আজ আকদ হওয়ার কথা ছিল, তাহলে সায়র ভাইয়া.....?
অরুর সকল প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে ওর হাতটা টেনে ক্রীতিক বলে,
—- সব প্রশ্ন কাল করতে পারবি, অনেক রাত হয়েছে আমি ঘুমাবো, তাছাড়া ওদেরকেও সকাল সকাল ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ধরতে হবে, চল এবার। অরুর মাথাটা এমনিতেই ঘুরঘুর করছে, চোখের সামনে সব

কিছু জটলা পাকিয়ে আছে, আর ক্রীতিক কিনা ঘুমাবে? এমন একটা ঘটনার পরে আদৌও ঘুম পায় কারও?আশ্চর্য!
অরু তৎক্ষনাৎ নিজের হাতটা ঝাড়ি মে'রে ক্রীতিকের থেকে ছাড়িয়ে বললো,
—- আপনার ঘুম পেলে আপনি গিয়ে ঘুমান, আমাকে কেন টানছেন?
ক্রীতিক চোয়াল শক্ত করে বললো,
— কেন টানছি বুঝতে পারছিস না?
অরু নাক ফুলিয়ে ত্যাড়া কন্ঠে বললো,
—- না বুঝতে পারছি না,বলুন?
ক্রীতিক এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো,
—- উপরে চল বলছি।
— না এখানেই বলুন।
ক্রীতিক আর নিজেকে সংবরণ পারলো না, তখনই অরুকে কোলে তুলে নিয়ে উপরে যেতে যেতে সবার মধ্যেই বলে উঠলো,
—- তোর জামার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ঘুমাবো তাই।
রুমের সামনে এসে ক্রীতিক দরজা খোলার উদ্দেশ্যে অরুকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য কোল থেকে নামালে, অরু সেই সুযোগে ক্রীতিকের হাতে জোরে কামড় মে'রে দৌড়ে পালিয়ে যায়, ক্রীতিক ও আজ পন করে নিয়েছে ও আজ আর অরুকে ছাড়বে না,কিছুতেই না। তাই ক্রীতিক ও এবার চুপচাপ এগিয়ে যেতে লাগলো অরুর পিছু পিছু।
অরু ছুটতে ছুটতে ছাঁদে চলে এসেছে, ক্রীতিক নিশ্চয়ই এতো রাতে ঘুম বাদ দিয়ে অরুকে তাড়া করে ছাঁদে চলে আসবে না? সেই ভেবে সস্থির নিঃশ্বাস নিলো অরু।

মাঝ রাতে আকাশে চাঁদ নেই, আছে কেবল
ঝিরিঝিরি মৃদু বাতাস, যে বাতাসে এলোমেলো হয়ে উড়ছে অরুর এক হাটু রেশমের মতো লম্বা চুল। অরু খোলা আকাশের দিকে মুখ তুলে দু'চোখ বন্ধ করে প্রান ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে যেই না চোখটা খুললো,অমনি কোথা থেকে যেন ছুটে এসে ঝড়ের গতিতে অরুকে চেপে ধরে ওর ঠোঁটের মাঝ বরাবর দাঁত বসিয়ে দিলো ক্রীতিক। অকস্মাৎ তীব্র ব্যথায় মৃদু আর্তনাথ করে উঠলো অরু, তরিৎ বেগে দু'হাতে খামচে ধরলো ক্রীতিকের শার্ট। একেবারে অরুর ঠোঁট থেকে কয়েক ফোটা র'ক্ত পান করে তবেই ওকে ছাড়লো ক্রীতিক। ছাড়া পেয়ে ইতিমধ্যে ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া ঠোঁটে হাত ছুয়িয়ে অরু আতঙ্কি'ত স্বরে বললো,—- কি করেছেন এটা? র'ক্ত বেরোচ্ছে কেন?
ক্রীতিক কপট হেসে বললো,
—- কি ভেবেছিলি ছেড়ে দেবো?
অরু অভিমানি গলায় বললো,
— আপনি কখনো ছাড় দিয়েছেন আমাকে? সবসময়ই তো ব্যথা দিতে থাকেন।
কথা শেষ করে অন্য দিকে ঘুরে চোখ মুছলো অরু। ক্রীতিক ওর সংস্পর্শে এসে দাঁড়িয়ে অরুর খোলা চুলে চুমু খেয়ে ওর মাথার উপরে নিজের চিবুক ঠেকিয়ে শান্ত গলায় বলে,
—- আর আদর করিনা বুঝি?
অরু জবাব দেয়না, ক্রীতিক অরুকে ঘুরিয়ে ওর দু'গালে চুমু খেয়ে বলে,

—— আমি মে’রেছি আবার আমিই আদর করে দিচ্ছি, আর কোথায় কোথায় মে’রেছিলাম বল, সব আদর আজ একসাথে পুষিয়ে দেবো। অরু ক্রীতিকের সুঠাম বুকে ধাক্কা মে’রে বলে,—- লাগবেনা আপনার আদর। আমি কেউ নই আপনার, যান এখান থেকে। ক্রীতিক সামান্য ঝুঁকে গিয়ে অরুর নাকটা হালকা টেনে দিয়ে বলে,
—- তুই ছাড়া কে আছে আমার, হুম?
ক্রীতিকের কথা গায়ে না লাগিয়ে, অরু পুনরায় পেছনে ঘুরে দাঁড়ালে, ক্রীতিক পেছন থেকেই ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নির্লিপ্ত গলায় বলে,
—- তুই ছাড়া আমার কেউ নেই অরু, তুই ছাড়া আমার পৃথিবীটা মরীচিকার মতো , কোনো আলো নেই, কোনো রঙ নেই, কোনো সুঘ্রাণ নেই, অমার অরু নেই। আমার চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের প্রতীক শুধু তুই, আমি পৃথিবীতে খুব একা বলেই হয়তো উপর ওয়ালা তোর মাঝে আমার সমস্ত সুখ রেখে দিয়েছে, নয়তো তুইই কেন বল?
হার্টবিট, আজকে এতো কথা তোকে কেন বলছি, জানিস ?
ক্রীতিকের প্রশ্নে অরু না সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক পুনরায় বলে,—- কারণ তুই আমার বেঁচে থাকার অঙ্গীকার অরু, তোকে আমি এভাবেই সারাজীবন হৃদয়ের গহীনে আগলে রাখতে চাই,যখন ইচ্ছে হবে দু’হাতে তুলে আদর করবো, তারপর আবার সযত্নে লুকিয়ে রাখবো। আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোকে আগলে রাখার দ্বায়িত্ব শুধু আমার।
even I will protect you, till my last breath baby…and I promise that.

তুই কেবল হৃদয় উজাড় করে আমাকে ভালোবাসবি, আমার জন্য পা'গল থাকবি, যেমনটা আজকে হয়েছিলি। বাকি পুরো দুনিয়া আমি একাই সামলে নেবো । আমার জীবনে তুই ছাড়া অন্য দ্বিতীয় নারী না কোনোদিন ছিল, আর না কোনো আসবে।জায়ান ক্রীতিক শুধু তোর বেইবি, শুধু তোর।
ক্রীতিকের কথা শেষ হতেই অরু আচমকা ঘুরে ক্রীতিকের গলা জড়িয়ে ধরে রিনরিনে আওয়াজে বলে,
—- আমি তোমাকে ভালোবাসি জায়ান ক্রীতিক, খুব ভালোবাসি, অকারণেই ভালোবাসি, ভালোবাসায় এতো কারন লাগেনা, তুমি আমার সেই লাগামহীন ভালোবাসা, যে ভালোবাসার গভীরতা আমি চাইলেও কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারবো না,কখনোই না।
ক্রীতিক নিজেদের অধর যুগলের মাঝে থাকা দূরত্বটুকু ঘুচিয়ে গভীর চুম্বনের তালে বলে,—- আই লাভ ইউ টু বেইবি।
ধীরে ধীরে ক্রীতিকের ভালোবাসার স্পর্শ গভীরতা লাভ করতেই অরু ছিটকে দূরে সরে যায়। ক্রীতিক দু'কদম এগিয়ে গিয়ে ব্যকুল কন্ঠে বলে,
—- কি হয়েছে কাছে আয়?
অরু ক্রীতিকের চোখে চোখ রেখে না সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক আসল ঘটনা বুঝতে পেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে বলে,
—- ইটস ওকে, মুখে বললেই তো হয়,এতো ভ'য় পাওয়ার কি আছে আমি কি মানুষ নই নাকি? এখনও পেট ব্যথা করছে?
অরু এবারও চুপচাপ না সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক ওর কপালে চুমু এঁকে দিয়ে বলে,

—-- ঠিকাছে নিচে চল অনেক রাত হয়েছে, আমাদের ঘুমানো প্রয়োজন। সকাল সকাল এয়ারপোর্টে এসেছে ওরা সবাই, নীলিমার আব্বাজান ওদের নাগাল পাওয়ার আগেই সায়রের বাড়ি দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বেরিয়ে পরেছে ওরা।
ইমিগ্রেশন শেষ করে নীলিমা আর সায়র ভেতরে প্রবেশ করলে, বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে মুখটা মলিন করে অরু বলে,
—-- ইশ! দার্জিলিং ভ্রমনে যাওয়া আমার ছোট বেলার শখ, অথচ নীলিমা কত সহজেই চলে যাচ্ছে।
ক্রীতিক পাশে দাড়িয়ে ফোন স্ক্রল করছিল, অরুর কথা শুনে মাথা তুলে ক্রীতিক শুধায়,
—-- যেতে চাস, দার্জিলিং এ??
অরু কোনোকিছু না ভেবেই হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো, তৎক্ষনাৎ অরুর হাতটা ধরে ক্রীতিক চট করে বলে ওঠে,
—-- চল তাহলে।
অরু হতবিহ্বল কন্ঠে বলে ওঠে,
—-- কি বলছেন? পাসপোর্ট নেই,টিকেট নেই কিভাবে যাবো?
—-- সব আছে আমার কাছে।
ক্রীতিক এক প্রকার ছুটছে অরুর হাতটা ধরে, অরুও ক্রীতিকের সাথে দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বললো,
—-- আর জামা কাপড়?
ক্রীতিক বললো,—-- যা যা লাগবে সব কিনে দেবো, এখন দ্রুত চল, নইলে ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে।
অরুও এবার আর ঘাবড়ালো না, দু’হাতে শক্ত করে ক্রীতিকের বলিষ্ঠ হাতটা ধরে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে আবদারের সুরে বলে,

—-- আমার একটা হ্যাট চাই, আর একটা ক্যামেরাও।
ক্রীতিক মৃদু হেসে অরুর কপালে শব্দ করে চুমু খেয়ে বলে,
—-- এজ ইউ উইশ বেইবি।
“দার্জিলিং”নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিভেজা,সবুজে ঘেরা এক অপার্থিব দৃশ্যপট। উঁচু নিঁচু পাহাড়, সারি সারি চা বাগান, ছোট বড় ঝরনা, জানা অজানা বুনোফুল আর মেঘমল্লার আস্তরণে মুড়িয়ে থাকা এই পাহাড়ি শহরটাকে প্রকৃতি প্রেমীদের সর্গ রাজ্য বললে খুব একটা ভুল হবেনা বৈকি। দার্জিলিং এর আরও একটি প্রধান আকর্ষন হলো, ব্রিটিশ আমলের তৈরি সেই আশির দশকের কয়লা চালিত টয় ট্রেন। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছয়হাজার সাতশত ফুট উষ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি শহরের নামকরণের সুস্পষ্ট কোনো ইতিহাস নেই, তবে লোকমুখে শোনা যায়,”দর্জেলিং” শব্দ থেকেই দার্জিলিং এর উৎপত্তি। দর্জে মানে বজ্র আর লিং মানে হলো দেশ, এককথায় দার্জিলিং মানে বজ্রেরদেশ।আবার অনেকের মতে সতেরো’শ পয়ষট্টির দিকে কোনো এক লামা এদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন তার নামানুসারেই দার্জিলিং নামকরণ করা হয়।শুধু মাত্র যে দার্জিলিং তেমনটা নয়, চোখের খোরাক, মনের বাসনা মেটাতে এর পরবর্তী নর্থ সিকিম, সিটং সবগুলোই যেন প্রকৃতির বক্ষস্থল। শহুরে একঘেয়ে জীবনের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষগুলোকে একটু খানি সস্থির সঞ্চার খুজে দিতেই বোধ হয় উপরওয়ালার এই নিদারুণ সৃষ্টি।
চা পল্লবে ঘেরা সুউষ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হোম’স্টে র যে ছোট্ট ছোট্ট কটেজ গুলো রয়েছে, তারই মধ্যে একটা কটেজের খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ার আর বেতের কারুকাজ করা রেলিং এ

কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে অরু। ওর মোহাবিষ্টের মতো চোখ দুটো পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামা সারি সারি চা বাগানে নিবদ্ধ,চা বাগানের পাশ দিয়েই কলকলিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু ঝর্ণার বহর,কাচের মতো দেখতে ঝর্ণার সেই স্বচ্ছ পানিতে টুপটাপ ঝড়ে পরছে হাওয়ায় উড়ে আসা রংবেরঙের বুনোফুল।সকাল সকাল মেঘের চাদরে ঢাকা পরেছে প্রকৃতি,অথচ
মাত্রই একপশলা বৃষ্টি হলো ঝমঝমিয়ে, ঝড়ে পরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি কনা গুলো সযত্নে ঠায় নিয়েছে চা পাতার গায়ে, নিয়ন সূর্যকীরনে সেই বৃষ্টি কনা গুলো ঝিল ধরছে বারেবারে, যেন এক নজরে দেখলে মনে হবে, চা-পাতা উপর কেউ সযত্নে স্বচ্ছ হিরের টুকরো সাজিয়ে রেখেছে।
অরু সেই সকাল থেকে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে দেখেই যাচ্ছে এসব। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে আসছে তবুও মন ভরছে না, বারবার ভাবনারা এক জায়গাতেই আটকে যাচ্ছে, প্রকৃতি এতো অপরুপ কেন? দু'গালে হাতদিয়ে চারিদিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে নয়ন জুড়াচ্ছে অরু, আর মনেমনে ভাবছে কালকের কথা,
কাল ক্রীতিকের সাথে ওমন তাড়াহুড়ো করে ফ্লাইটে উঠে আরও একদফা ঝটকা খেয়েছিল অরু। অরুর পড়নে তখন হালকা গোলাপি টপস আর সুতির ঘাগড়া ছিল,লম্বা চুল গুলো ছিল ক্লাচার দিয়ে বাঁধা, ওর পেছন পেছনই উঠেছিল ক্রীতিক,ফ্লাইটে ওঠার পরেও ক্রীতিক এমন একটা ভাব করছিল যেন ও আরেকটা দেশে নয়,বরং মতিঝিল থেকে হাতিরঝিল যাচ্ছে। চারিদিকের পরিস্থিতিতে একটু ও মাথাব্যথা নেই, আর না আছে কোন হেলদোল, ফোন স্ক্রল করছে তো করছে করছেই।

ওর কান্ডে একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে পেছনে ঘুরে অরু শুধায়,—
আমাদের সিট কোথায়?
ক্রীতিক ফোন থেকে চোখ সরিয়ে আলগোছে নিজের চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে,
—- বিজনেস ক্লাসে।
— আপনি এতোটুকুর মধ্যে বিজনেস ক্লাস কিভাবে ম্যানেজ করলেন? আশ্চর্য!
অরুর কথায় ক্রীতিক নির্বিকার ভঙ্গিতে উত্তর দিলো,
—- সামনে চল দেখতে পাবি।
অরু ত্যক্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্রীতিককে রেখেই গটগটিয়ে বিজনেস ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেলো। কেভিন ক্রু দের সাহায্যে বিজনেস ক্লাস খুঁজে নিয়ে, দরজাটা খুলে অরু ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভাবে চমকালো, সাথে ভয় ও পেলো মারা'ত্মক।
কারন ওকে দেখেই ভেতর থেকে এলিসা,অর্ণব, ক্যাথলিন ওরা সবাই একযোগে চেঁচিয়ে উঠে বললো,
— সারপ্রাইজ!অকস্মাৎ চিৎকারে হকচকিয়ে উঠলো অরু,সবাইকে এখানে এভাবে দেখতে পেয়ে মস্তিষ্ক আপাতত হ্যাং হয়ে আছে ওর, তাই অরু কোনোকিছু না ভেবে আবারও পেছনে ঘুরলো ক্রীতিকের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, তবে পেছনে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত ঢেউ খেলানো পুরুষালী বুকে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেলো অরু, তাড়াহুরো করে মাথা তুলতেই দেখতে পেলো এটা ক্রীতিক।
পরনে নেভি ব্লু হুডি আর ব্ল্যাক ওভার সাইজ ডেনিম,সামনের চুলগুলোকে সামলাতে মাথায় আটকানো কালো টুপি,আর ঠোঁটের কোনে লেগে আছে এক রহস্যময় হাসি, অরু ধরতে পারলো না

ক্রীতিকের এই হাসির আসল কারন। অগত্যা, চোখ বড়বড় করে বিস্ময়ে ক্রীতিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অবুঝের মতো ।
ক্রীতিক ওর রহস্যময় হাসির অবসান ঘটিয়ে কাঁধ বাকিয়ে অরুর চোখে চোখ রেখে শান্ত স্বরে বললো,
—- হ্যাপি ফার্স্ট হানিমুন জার্নি বেইবি।
ক্রীতিকের কথাতে অরুর চোয়াল ঝুলে পরার উপক্রম , এমন একটা আকস্মিক ঘটনায় আপনা আপনি ওর দু'হাত চলে গেলো নিজের মুখের উপর । অরু একবার ওদের সবার দিকে তাকাচ্ছে, তো আরেকবার ক্রীতিকের দিকে, এদিক ওদিক তাকিয়েই অস্ফুটে বলে ওঠে,
—- তারমানে এটা প্রি-প্ল্যান?
ক্রীতিক হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে অরু পুনরায় ঠোঁট ফুলিয়ে বলে,
—- তাহলে আমাকে ব্যাগ গোছাতে কেন বললেন না? আমিতো কিচ্ছুই নিয়ে আসিনি।
ক্রীতিক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে,
—-উহুম, মন খারাপ করতে হবে না,সব কিনে দেবো বেইবি, এনিথিং ইউ নিড। জামাকাপড়ের কথা মনে পরতেই অরু সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজের শরীরের দিকে চাইলো, কাল রাতে ঝুম বৃষ্টিতে ভিজে ওরা কোনমতে হোম'স্টে তে এসে উঠেছিল, রাতের বেলা এমন পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির মাঝে দোকানপাট সবই বন্ধ ছিল যার ফলরুপ জামা কাপড় আর কেনা হয়নি অরুর।
রাতে টপস খুলে গায়ে ক্রীতিকের হুডি চড়িয়ে ঘুমিয়েছে, আর এখনো সেভাবেই। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকবে ও, তাছাড়া ক্রীতিক ও তো কোনো জামাকাপড় আনেনি, জামা কাপড়

তো দূরে থাকে টুথব্রাশ টুথপেষ্ট টা পর্যন্ত নেই ওদের কাছে। বিষয়টা বোধগম্য হতেই বারান্দা ছেড়ে বেডরুমে প্রবেশ করলো অরু। ক্রীতিক এখনো কম্ফোর্টার মুড়ি দিয়ে খালি গায়ে ঘুমুচ্ছে। বিয়ের বয়স বেশ কয়েক মাস হলেও, অরু ক্রীতিকের একসাথে এক ঘরে রাত্রি যাপন করা হয়েছে হাতে গোনা কয়েকবার মাত্র। সেখানে কাল রাতে ওরা দুজন সত্যি কারের আর পাঁচটা স্বামী স্ত্রীর মতোই একসাথে একঘরে এক বিছানাতে ঘুমিয়েছে,বিষয়টা অরুর চিত্তে প্রশান্তির ঝড় বয়িয়ে দেয়, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসাটুকু উগড়ে আসে বারবার। হুটহাট মনে হতে থাকে উনি সত্যিই আমার পাশে? সত্যিই?অবিশ্বাস্য!
অরু যে কয়েকদিনই ক্রীতিকের সাথে ঘুমিয়েছে, ও খেয়াল করেছে ক্রীতিক সবসময় উপুর হয়ে ঘুমায়, ওর চওড়া পুরুষালী পৃষ্ঠদেশ কখনোই কম্ফোর্টারের আড়ালে ঢাকা পরেনা। বিষয়টা বরাবরই অরুর আকর্ষন কেড়ে নিতে সক্ষম। এই লোক ঘুমের মাঝেও ম্যানলি আচরণ করে। অরু ভেবে পায়না ক্রীতিক এমন কেন? একটু কি কিউট হওয়া যায়না? সবসময়ই ডার্ক চকলেট হতে হবে? একটু আধটু মিল্ক চকলেট হলে ক্ষতি কি?.অরুর মন গহীনের অযাচিত প্রশ্নের উত্তর দিলো না গাঢ় ঘুমে বিভোর হয়ে থাকা ক্রীতিক। অরু মনের ভাবনা মনে পুষে রেখেই এগিয়ে গিয়ে কাঠের তৈরি তকতকে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে ক্রীতিকের শিওরে বসে পরে, এরপর হাত বাড়িয়ে ওর ঘাড় ছুঁই ছুঁই এলোমেলো চুল গুলোতে নিজের নরম তুলতুলে আঙুল চালাতে চালাতে আনমনে বলে ওঠে,
—-- আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি আমার এতোটা কাছে, আপনি কি সত্যিই সেই জায়ান ক্রীতিক? যার বিছানায় ভুল

করে ঘুমিয়ে ছিলাম বলে আমাকে চোখ দিয়েই ভ’স্ম করে দিয়েছিলেন?
আপনি কি সেই জায়ান ক্রীতিক? যার সামনে একটু আওয়াজ করে কেঁদে ছিলাম বলে আমাকে কনকনে ঠান্ডার মাঝেই বাইরে বের করে দিয়েছিলেন? আমারতো এখনো সেই শুরু থেকে এই পর্যন্ত চোখ বন্ধ করলে মনে হয় সবটা স্বপ্ন। এতো ভালোবাসা, এতো আবেগ, আপনার এই মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি সবকিছু আমার মতিভ্রম মনে হয় মাঝেমাঝেই ?যেন এক্ষুনি ভ্রম কেটে যাবে আমার, আর আপনিও আমাকে রেখে হারিয়ে যাবেন সেই সূদুর ক্যালিফোর্নিয়ায়। দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে আপনার দেখা আর আমি পাবোনা। সেই আগের মতো, এর ওর মুখে শুধু নামটাই শুনবো আপনার, ক্রীতিক কুঞ্জের ছোট সাহেব জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। কিন্তু এবার তো আমি আর সহ্য করতে পারবো না সেই দ’হন, বলুন? সত্যি বলছি তেমনটা হলে আমি ম’রেই যাবো,কারন ক্রীতিক কুঞ্জের ছোট সাহেব তো কেবল ক্রীতিক কুঞ্জেরই মালিক নয়, আমার মন,প্রান, আত্না সবকিছুর দখলদারি ও যে একমাত্র তার।
জায়ান ক্রীতিক, আপনি হরণ করেছেন আমার হৃদয়, ভালোবাসার সংজ্ঞা না জানা এক তরুণীর বুকে আপনি ভালোবাসার বি’ষা’ক্ত তী’র নিক্ষেপ করেছেন, সূত্রপাত করেছেন প্রকান্ড জলোচ্ছ্বাসের। আর এখন আমার মনে ভালোবাসার তুফান বাঁধিয়ে দিয়ে, আমার স্বপ্ন ভেঙে হারিয়ে গেলে আপনার খবর আছে।
যেদিন আপনাকে খুঁজে না পাবো, সেদিন আমিও হারিয়ে যাবো অলীক আকাশে, সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার

রাতের আকাশে ঘুরে বেড়াবো, তখন খুঁজবেন তো আমাকে? মনে পরবে তো আমার কথা?

হুট করেই স্বপ্নের মতো করে পাওয়া মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে,একরাশ কাতরতা ঘীরে ধরেছে অরুর হৃদয় , এতোটা সুখ ওর কপালে সইবে কিনা তা নিয়েও সন্দিহান মেয়েটা, ওর কাছে জায়ান ক্রীতিক মানে অমূল্য সম্পদ, যা ও না চাইতেও নিজের করে পেয়েছে, হারিয়ে যাওয়ার ভ'য় তো একটু থাকবেই, এই মূহুর্তে সেই ভয়েই জর্জরিত হয়ে টুপটাপ অশ্রুকনা বিসর্জন দিচ্ছে অরু। ক্রন্দনরত অরুর ফোপাঁনোর আওয়াজে ঘুমের মাঝেই একটু নড়েচড়ে উঠলো ক্রীতিক, ঘুমঘুম গলায় অস্পষ্ট আওয়াজে ডেকে উঠলো অরুকে,

— বেইবি.. কোথায় তুই?

ক্রীতিক মাত্রই নড়েচড়ে উঠেছে দেখে অরু তাড়াহুড়ো করে চোখের পানিটুকু মুছে নিজেকে স্বাভাবিক করে, শান্ত স্বরে বললো,

— এই যে, উঠুন এবার, শপিং এ যেতে হবে তো। আমাদের পড়ার কিছু নেই তো এখানে বাথরব ছাড়া ।

অরুর কথার পাছে ক্রীতিক বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে হাস্কিস্বরে বললো,

— কেন, নেই কেন? কালকে তো কিছু করিনি।

অরু এবার উঠে দাড়িয়ে বিরক্ত স্বরে বললো,

— কাল যে এক কাপড়ে দার্জিলিং চলে এলেন, তা ভুলে গিয়েছেন?

অরুর কথায় এতোক্ষণে টনক নড়লো ক্রীতিকের, তবে ওর মধ্যে শপিং এ যাওয়ার কোনোরকম হেলদোল দেখা গেলোনা, ও শরীরের কম্ফোর্টারটা আরেকটু ভালোভাবে গায়ে চড়িয়ে নতুন উদ্যমে

ঘুমাতে ঘুমাতে অস্পষ্ট আওয়াজে বললো,— ওয়ালেটে ইন্ডিয়ান কার্ড আছে যেটা খুশি নিয়ে যা, আমি এলিসাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি ও তোর সাথে যাবে।
—এই অচেনা দেশে শুধুমাত্র এলিসা আপুকে ভরসা করে আপনি আমাকে একা ছেড়ে দেবেন?
ক্রীতিক জুতসই আরাম করে শুয়ে বললো,
— আমি সঙ্গে গেলে ঠিক তোকে যেভাবে আগলে রাখতাম, এলিসাও সেভাবেই রাখবে, আই বিলিভ ইন হার। এখন যা তো, ঘুমাতে দে,নয়তো রাইড করতে পারবো না।
—- আপনি এখানেও রাইডিং এ যাবেন, তাও এই পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির মাঝে?
— উমম,হুমমম।
অরুর কথার প্রতি উত্তরে ঘুমের দেশে তলিয়ে যেতে যেতে জবাব দিলো ক্রীতিক।অরু শপিং এর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে অনেকক্ষন, বেলা বেজেছে দশটা কি এগারোটা, ক্রীতিক এখনো ঘুমে তলিয়ে আছে, কি জানি কতদিনের ঘুম একসাথে ঘুমাচ্ছে ও। তবে ক্রীতিকের এই আরামের ঘুম বোধ হয় খুব একটা সহ্য হলোনা ওর ব্যাংক ম্যানেজারের,সেই সকাল থেকে মুঠো ফোনের ভাইব্রেট বাজিয়ে ম্যানেজার সাহেব কল দিয়েই যাচ্ছেন তো দিয়েই যাচ্ছেন। ভাইব্রেটের কাঁপা আওয়াজে একপর্যায়ে ঘুম ছুটে গেলে নড়েচড়ে উঠে ফোন রিসিভ করলো ক্রীতিক। এপাশ থেকে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার সাহেব সালাম জানিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে ওঠে ,— স্যার আপনি বোধ হয় ঘুমিয়ে, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত স্যার, বাট স্যার ইটস আর্জেন্ট।

— হ্যা বলুন।
ক্রীতিকের অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বললো,
—- স্যার সকাল সকাল আপনার ব্যাংক একাউন্ট থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উইড্রো করা হয়েছে।
ক্রীতিক মুখ থেকে একটু বিরুক্তিকর আওয়াজ বের করে বললো,
— সো হোয়াট?
ম্যানেজার সাহেব ভেবেছিল ক্রীতিক হয়তো অবাক হবে কিংবা প্রোপার ইনফেকেশন জানতে চাইবে, কিন্তু তেমন কিছু না হওয়াতে তিনি ভরকে গিয়ে বললেন,—- না মানে স্যার হুট করে সকাল সকাল এতোগুলা টাকা..
ম্যানেজারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্রীতিক মাঝ পথে বলে ওঠে,
— ডোন্ট ওয়ারী ইট'স জাস্ট মাই ওয়াইফ।
ম্যানেজার সাহেব তৎক্ষনাৎ নিজের বোকামিতে থামি খেয়ে দূর্বল গলায় বললো,
— ওহ ওকে স্যার,দেন ইট ওয়াজ মাই মিসটেক,আ'ম রিয়েলি সরি।
তারপর ওপাশ থেকে ভেসে এলো কল কেটে দেওয়ার পিক পিক আওয়াজ।
ম্যানেজার সাহেব কল কেটে দিলে,হাতের ফোনটা বিছানার একপাশে ছুঁ'ড়ে ফেলে দিয়ে, ক্রীতিক আবারও চোখ বুজে মৃদু হেসে অস্ফুটে বললো,
— বউটা বড় হচ্ছে, স্বামীর টাকা কিভাবে ওড়াতে হয় তার যথাযথ ট্রেনিং নিচ্ছে, গুড জব এলিসা। ক্রীতিকের কটেজের পাশেই

যে কটেজটা অবস্থিত তার বেলকনিতেই আপাতত বসে আছে নীলিমা। কোনোরকম চেয়ারে কিংবা স্টুলে নয় মেঝেতে বসে আছে মেয়েটা,পরনে এখনো সেই দু'দিন আগের বাসী বেনারসি। ডাগর ডাগর চোখ দুটো ক্লান্তিতে কোটরে ঢুকে গিয়েছে, মুখশ্রী মলিন। সেই মলিন মুখেই নিস্প্রভ চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে নীলিমা, বক্ষপিঞ্জর থেকে ক্রমাগত উগরে আসছে চাপা দীর্ঘশ্বাস। নীলিমা যখন ওর জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলো ভেবে ভারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, ঠিক সেসময় রুমে প্রবেশ করে সায়র, সায়রের চোখ মুখও ভীষণ গম্ভীর, সব সময়ের চঞ্চল হাসিখুশি, ঠান্ডা মস্তিষ্কের সায়র সত্তাটা হুট করেই কাল থেকে কেমন উধাও। সায়রের হাতে কিছু শপিং ব্যাগ ছিল, ও সেগুলোকে নীলিমার সামনে ধরে গম্ভীর গলায় বললো,— চেঞ্জ করে নাও।
নীলিমা ঝগড়া করার অবস্থায় নেই, তাছাড়া সায়রের চোখ মুখ দেখেও মনে হচ্ছেনা যে ও ঝগড়া করতে ইচ্ছুক, তার উপরে দুদিন ধরে এক কাপড়ে থাকার দরুন শরীরটাও কেমন কুটকুট করছে, তাই উপায়ন্তর না পেয়ে প্যাকেট গুলো হাতে নিলো নীলিমা। আসলে গতকাল অরু বেশকিছু জামাকাপড় দিয়েছিল নীলিমাকে, কিন্তু অরুর তুলনায় নীলিমা একটু গুলুমুলু আর লম্বা হওয়ায় সেগুলো নীলিমার হয়নি, কারন অরু বেশির ভাগই লং স্কার্ট আর টপস পড়ে, আর না তখন জামার কাপড় নিয়ে ওর কোনোরকম খেয়াল ছিল। অগত্যা এক কাপড়েই একদেশ থেকে পারি দিয়ে আরেক দেশে চলে আসতে হলো নীলিমাকে।
নীলিমা কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে গেলে, সায়র গিয়ে বারান্দায় দাড়ালো। বারান্দার রেলিং এ দু'হাত ভর করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে

চোখ বোলাতেই বুক চিড়ে একফালি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সায়রের। এটা মূলত সায়রের হোম'স্টে,শুধু একটা নয়, দার্জিলিং, সিটং মিলিয়ে বেশ কয়েকটা হোম'স্টে রয়েছে সায়রের।
সবগুলোই সায়রের বাঙালী ম্যানেজার দ্বায়িত্ব নিয়ে দেখা শুনা করেন। সায়রের পৈতৃক নিবাস দার্জিলিং এ। তবে পূর্বপুরুষ আর বন্ধু মহল বাংলাদেশী হওয়ায় বাংলাটা ওর ভালোই আয়ত্তে।
সায়রের বাবা মা নেই, বাড়িতে কাকা জেঠা দুঃর্সম্পর্কের আত্নীয় স্বজন যারা রয়েছেন তাদের সাথেও সায়রের একেবারে যোগাযোগ নেই বললেই চলে, এককথায় বলা যায় পুরো পৃথিবীতে একটা নীলিমা আর একটা শক্ত ভীতের মতো বন্ধুমহল ছাড়া সায়রের আপন বলে কেউ নেই।
তাইতো নিজের শহরে ফিরে নতুন বউ আর বন্ধুদের নিয়ে , নিজের সবচেয়ে পছন্দের হোম'স্টে তেই উঠেছে সায়র। এখন শুধু অপেক্ষার পালা, সায়রের নব্য বিবাহিতা রাগীনি সবকিছুর জন্য সায়রকে আদৌও ক্ষমা করে মেনে নেবে?নাকি মা বাবার মতো সেও তার নিজস্ব পথ বেছে নিয়ে সায়রকে একা করে দিয়ে চলে যাবে?
সায়রের ভাবনার ছেদ ঘটে কাঠের দরজা খোলার খুটখাট আওয়াজে, সম্বিত ফিরে এলে সায়র পেছনে তাকিয়ে দেখতে পায় নীলিমা দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ওর কিনে দেওয়া ফ্লোরাল প্রিন্টের সুতির চুড়িদার।
সায়রের পছন্দ বরাবরই অতুলনীয়,যার ফলরূপ বন্ধুমহলের অগাধ বিশ্বাস একবার সায়রের চোখ যেটাতে আটকে যায় সেটা সুন্দর হবেই হবে। সেক্ষেত্রে বলা যায় সায়রের চোখ নীলিমাতে আটকে

গিয়েছিল তাই নীলিমাও যথেষ্ট সুন্দরী রমনী। আর এই মূহুর্তে সায়রের কিনে দেওয়া জামা পড়ে ওকে আরও বেশি আকর্ষনীয় আর লাবন্যময়ী লাগছে সায়রের দু'চোখে। বারবার মনে হচ্ছে বাইরের অপরূপ প্রকৃতির মাঝে নীলিমাকে বসিয়ে দিলে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও বোধহয় ফিকে হয়ে যাবে এই শ্যামলতা তরুনীর কাছে। কি সুন্দর মেয়েটা, ফ্লোরাল চুড়িদারে চাপা গায়ের রঙটাও কেমন জ্বলজ্বল করছে। আজকে বোধহয় নতুন করে আবারও সায়র মুগ্ধ হলো তার রাগীনির রূপে। তবে মুখে টু শব্দও করলো না, নীলিমার দিকে এগিয়েও গেলো না, বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো যথাস্থানে।

সায়র কোন কথা বলছে না দেখে নীলিমাই ধীর পায়ে এগিয়ে এলো, সায়রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনেমনে নীলিমা ভাবছে,— কি হলো লোকটার? এতোদিন তো কথা বলে বলে পা'গল করে দিতো, অযথা বিরক্ত করতো, ভুলভাল জোক্স শোনাতো, অথচ আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে চুপ করে আছে কেন? এমন একটা ভাব যেন উনি আমাকে নয়, আমিই ওনাকে বিয়ের আসর থেকে তুলে এনে বিয়ে করেছি। আশ্চর্য!

নীলিমা সামনে এসে চুপচাপ দাড়িয়ে আছে দেখে সায়র নির্লিপ্ত কন্ঠে শুধালো,

— কিছু বলবে? জামা কাপড় সব ঠিকঠাক হয়েছে?

নীলিমা নিজের নিচু মাথাটা এদিক ওদিক নাড়িয়ে ইতস্তত কন্ঠে বললো,

— ইনারের সাইজ ঠিক হয়নি।

নীলিমা এতো সহজে কথাটা বলে দিলো যে, ওর কথাটা শুনে সায়রের আচমকা কাশি উঠে গেলো, ও কাশতে কাশতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

— আসলে, আমিতো জানতাম না, তাই ওইভাবে আরকি বুঝতে পারিনি। সমস্যা নেই বিকেলে সবাই ঘুরতে বের হবে তখন এক ফাঁকে কিনে দেবো, আমাকে একচুয়াল সাইজটা বলে দিও।

নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে ভ্রুকুটি করে বললো,

— আপনি কিনে দেবেন?

সায়র কাশতে কাশতে মাথা চুলকে এদিক ওদিক তাকিয়ে বোকাদের মতো বললো,

—- এখানে আমি ছাড়া কিনে দেওয়ার মতো আর কেউ আছে?দু'হাত ভর্তি শপিং ব্যাগ নিয়ে মাত্রই হোম'স্টে ফিরলো অরু, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে অথচ সূর্যি মামার দেখা নেই আজ I শহরের দিকে যা ও একটু সূর্যরশ্মী চোখে পরেছে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে সেটাও মিলিয়ে গিয়েছে।

চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন, পেজা তুলোর মতোন মেঘেদের ভেলায় সবুজ চা বাগানকে গাঢ় সবুজ লাগছে, কি অপরুপ দৃশ্য, অরু আরও একদফা মুগ্ধ হতে হতে কটেজে ফিরে এলো, দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে শপিং ব্যাগ গুলো একপাশে রেখে অরু এদিক ওদিক ক্রীতিক কে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পরে।

ও এমন একটা পর্যায়ে আছে যে, ক্রীতিককে ঠিক কি বলে সম্মোধন করবে সেটা ভেবে পায়না, ভালোবাসা যখন চরম শিখরে পৌঁছে যায়,কিংবা একান্ত কাছাকাছি মূহুর্ত গুলো, তখন তো নাম ধরেই ডেকে ফেলে, কিন্তু সচরাচর নাম ধরে ডাকাটা অরুর কেমন মুখে

বাঁধে, কারণ সম্পর্ক যাই হোক ক্রীতিক ওর চেয়ে বারো বছরের বড়। এদিকে কিছু একটা বলে ডাকা যাচ্ছে না দেখে অরু চোখ দিয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান, এক পর্যায়ে উপয়ান্তর না পেয়ে অরু ভাইয়া বলেই ডেকে উঠলো ক্রীতিককে,— ক্রীতিক ভাইয়া শুনছেন,কোথায় আপনি?
অরু ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক ওকে টান মে'রে বারান্দায় নিয়ে এসে দেওয়ালে চেপে ধরলো, কপালটা ভীষণ ভাবে কুঁচকে রেখে শক্ত গলায় বললো,
— কে তোর ভাইয়া?
অরুর মুখে জবাব নেই, ও তাকিয়ে আছে ক্রীতিকের দিকে, আজ এই প্রথম ক্রীতিককে গ্লাস পড়তে দেখলো অরু, চিকন ফ্রেমের বড়বড় দুটো জুতসই গ্লাসে তাকে মারাত্মক সুদর্শন লাগছে, আজকাল ল্যাপটপে কাজ করলেই চোখে গ্লাস লাগায় ক্রীতিক। আর এই মূহুর্তে চশমা পরিহিত ক্রীতিককে এতোটা কাছে দেখে শুষ্ক একটা ঢোক গিললো অরু, পরক্ষনেই ভেতরের উথাল পাথাল অবাধ্য অনুভূতি গুলো দমাতে চোখ নামিয়ে নিলো নিচে চাইলো ও।
অরু নিচে চেয়ে আছে দেখে ক্রীতিক ওর দিকে সামান্য গ্রীবা নামিয়ে হিসহিসিয়ে বললো,
—- কে তোর ভাইয়া, আন্সার মি্?
অরু জবাব দিলো না,মাথা নিচু করে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।—- ডু ইউ থিংক আ'ম ইওর ব্রাদার?
ক্রীতিকের কথায় অরু এবার তাড়াহুড়ো না সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক পুনরায় বলে,
— ওকে ফাইন,তাহলে আমার গ্লাস খোলো।

তৎক্ষনাৎ অরু চকিতে মাথা উঁচিয়ে ক্রীতিকের চোখে চোখ রাখলো, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও, কি বললো মাত্র ক্রীতিক? খোলো?
প্রথমবার তুমি সম্বোধনে হুট করেই কেমন যেন একটা বউ বউ শিহরণ ছড়িয়ে গেলো অরুর সর্বাঙ্গ জুড়ে। অরু কাঁচুমাচু করছে দেখে ক্রীতিক পুনরায় বললো,
—- আমি কিছু বলেছি, আমার চশমাটা খুলে ফেলো অরু।
অরু এবার কথা শুনলো ক্রীতিকের, নিজের কম্পিত দু'হাত বাড়িয়ে খুলে ফেললো ক্রীতিকের গ্লাস, গ্লাস তখনো অরুর হাতেই ছিল, ক্রীতিক আর সেটাকে রেখে দেওয়ার অপেক্ষা করলো না, তার আগেই ধৈর্য হারা হয়ে তরিৎ গতিতে অধর ডোবালো অরুর ওষ্ঠাধরের ভাঁজে। অরুর ঠোঁটে একের পর এক গাঢ় চুমু একে দিতে দিতে ক্রীতিক হিসহিসিয়ে বললো,— এবার বল কে তোর ভাইয়া? ভাইয়ারা কি বোনদের সাথে এমন কিছু করে, যা আমি করছি?
অরু তৎক্ষনাৎ চোখ খিঁচে না সূচক মাথা নাড়ালো।
ক্রীতিক সেভাবেই অরুর হাতটা তুলে চোখের সামনে এনে দু'জনার কাপল রিং গুলো ইশারা করে বললো,
—- দেখতো তোর অনামিকা আঙুলে আমার দেওয়া রিংটা চকচক করছে, এটা কারা দেয় জানিস?
অরু এবার হ্যা না দুইদিকেই মাথা নাড়ালো, ক্রীতিক একহাতে ওর তুলতুলে কোমল বাঁকানো কোমড়টা শক্ত চেপে ধরে বললো,
— লাভার'রা। আমি তোর লাভার, তাই তোকে এটা দিয়েছি, এটার মানে হচ্ছে তুই শুধু আমার প্রোপার্টি, তোকে আর কেউ এপ্রোচ করতে পারবে না। নো ওয়ান।

ক্রীতিকের কথায় ওকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে, অরু চোখ বুজে জলদি জলদি হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো। ক্রীতিক এবার অরুর বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে দু-হাতে ওর টপস টা ধরে ধীরে ধীরে উপরে তুলতে শুরু করে। এই পর্যায়ে এসে অকস্মাৎ চোখ খুলে ক্রীতিকের দু'হাত চেপে ধরলো অরু।
ক্রীতিক সঙ্গে সঙ্গে অরুকে ছেড়ে দিয়ে, দু'পকেটে হাত গুঁজে একটা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর টেবিল থেকে একগ্লাস পানি নিয়ে ঢকঢক করে সেটা পান করে ধপ করে বসে পরলো বেতের চেয়ারে। অরু একটু মাথা তুলে ক্রীতিকের আগাগোড়া পরখ করে মিনমিনিয়ে শুধালো,— রাগ করেছেন?
ক্রীতিক জবাব দিলোনা, অরুকে টেনে এনে নিজের উরুর উপর বসিয়ে ওর কাঁধে নাক ঘষতে ঘষতে অসহায় স্বরে বললো,
—- আর কতদিন হার্টবিট? ইটস বদারিং মি। আই কান্ট উফফ!
ক্রীতিক বেশ বিরক্ত, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অরু নরম স্বরে বললো,
— আমি সরি।
অরুর হঠাৎ ক্ষমা পার্থনায় ক্রীতিক নিজের মাথা তুলে শুধালো,
— তুই কেন সরি হচ্ছিস?
— এই যে বারবার আপনার মেজাজ খারাপ করে দেওয়ার জন্য।
অরুর কথায় ক্রীতিক জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁটের ভাঁজে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা টেনে বললো,
— ইট'স ন্যাচারাল বেইবি, এতে আমি মন খারাপ করিনি, তুই বড় হয়ে গিয়েছিস এটা আমাদের দু'জনার জন্যই ঠিক কতবড় ব্লেসিং,সেটা ভবিষ্যতে বুঝতে পারবি। এখন চল।

অরু অবাক হয়ে প্রশ্ন ছুড়লো,
— কোথায় যাবো?
ক্রীতিক ওকে কোলে তুলে বেডরুমের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললো,
—- তোর পছন্দের শহরে এসেছিস অথচ ঘুরে দেখবি না? নাকি আজকে সারাদিন আমার সাথে….
ক্রীতিককে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অরু হকচকিয়ে বলে ওঠে,
—- নাহ যাবো তো।
ক্রীতিক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বলে,
—- লেটস গো বেইবি। অরুর মতে পুরো দার্জিলিং শহরটাই বিস্ময়কর, এখানে আলাদা করে দেখতে যাওয়ার কিছু নেই, কটেজের বারান্দায় বসে বসেও দার্জিলিং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আহরণ করা যায় নির্বিঘ্নে। তবুও সবাই মিলেমিশে আজ বেশ কয়েকটা টুরিস্ট এরিয়তে ঘুরে বেরিয়েছে ওরা।
সারা বিকেল ঘোরাঘুরি করে এখন স্ট্রিট মার্কেটে ঢুকেছে সবাই। ক্রীতিক ভিড়ভাট্টার মধ্যে নেই। তাই একটা বাইক রেন্ট করে অরুকে নিয়ে সোজা বেরিয়ে পরেছে রাইডিং এ।
পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে সরু রাস্তা ধরে খুব ধীর গতিতে রাইড করছে ক্রীতিক,পাছে না বড়বড় খাদ দেখে অরু আবার ভয় পেয়ে যায় সেই চিন্তায়।
কয়েকঘন্টার রাইডিং শেষে ওরা যখন আবার শহর মুখী হলো তখনই পেট্রোল নিতে পেট্রোল পাম্পে ঢুকে পরে ক্রীতিক। ও অরুকে একটা যায়গায় দাড় করিয়ে বললো,
— বেইবি ওয়েট আ মিনিট, ওকে?

অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে সায় জানালে, ক্রীতিক গাড়িতে পেট্রোল তুলতে এগিয়ে যায়। ক্রীতিক যখন নিজের কাজে গভীর মনোযোগী তখনই পেছন থেকে একজন অত্যাধুনিক গোছের সুন্দরী মহিলা রিনরিনে আওয়াজে ডেকে উঠলো ওকে,— হেই জায়ান ক্রীতিক ওরফে মিস্টার অভদ্র।
পরিচিত অপরিচিতর মাঝে ঝুলতে থাকা এক নারী কন্ঠস্বর শুনে আস্তে করে ঘাড় ঘোরালো ক্রীতিক, পেছনে তাকিয়ে চোখ মুখ স্বাভাবিক রেখে স্পষ্ট কন্ঠে জবাব দিলো ,
— ইয়েস?
ক্রীতিক ঘাড় ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা আন্তরিকতা সরূপ শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ওকে। ক্রীতিক ও থতমত খেয়ে ওর পিঠে হালকা হাত ছোঁয়ালো।
ওদিকে মেয়েটার কান্ডে চোখ বড়বড় হয়ে গেলো অরুর, অধর জুগল আলাদা হয়ে গেলো আপনা আপনি, দু'হাত মুঠি বদ্ধ রেখে নিজেকে কোনোমতে সামলে অরু মনেমনে বললো,
—- ওনাকে ছেড়ে দিন আপু, উনি আমার, শুধু আমার।
মেয়েটা ক্রীতিককে অভিবাদন সূলভ হাগ করে, একগাল হেসে বললো,
— চিনতে পেরেছো, হু আই এ্যাম?
ক্রীতিক একটু চিন্তা করে বললো,
— শ্রাবনী রাইট? বাংলাদেশে আমাদের সাথে নর্থসাউথে পড়তে। আর তোমার বোন তো সানফ্রান্সিসকোতে পড়াশুনা করে, সায়নী অর সামথিং।

শ্রাবনী হেসে বললো,—- হ্যা ও দেশে এসেছে বলেই দার্জিলিং এ বেড়াতে আসা, বাই দা ওয়ে তোমার খবর কি? সেই যে নর্থসাউথ থেকে গ্রাজুয়েশনের আগেই বেরিয়ে গেলে, তারপর তো আর খোঁজই পেলাম না।
ক্রীতিক হাতের কাজ সারতে সারতে বললো,
— এই চলছে।
—- বিয়ে করেছো?
শ্রাবনীর কথায় ক্রীতিক হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে পাশ ঘুরে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলে,
— ইয়েস, মিট মাই ওয়াইফ, আব…
কথা মাঝ পথেই আটকে গেলো ক্রীতিকের, কারণ অরু এখানে নেই। এখানে তো দূরে থাক পুরো পেট্রোল পাম্পের আসেপাশেও নেই। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ক্রীতিক শ্রাবনীকে তৎক্ষনাৎ বিদায় জানিয়ে বললো,
— আমি আসছি।
শ্রাবনী উপর নিচ মাথা নাড়ালে, ক্রীতিক দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে, ক্রীতিক চলে যেতেই শ্রাবনী কাঁদো কাঁদো গলায় বিড়বিড়ালো,—- আমার ক্রাশের ও বিয়ে হয়ে গেলো?
গাড়ি থেকে নেমে পেছন দিক দিয়ে সায়নী বলে উঠলো,
— ওইটা আমারও ক্রাশ দি ভাই। তার চেয়েও বড় কথা জেকে স্যারের ওয়াইফ আমার ভালো ফ্রেন্ড।
শ্রাবনী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— আমরা মেয়েরা সবসময় রেড ফ্ল্যাগের প্রেমে পড়ি কেন বলতো?

সায়নী ঠোঁট উল্টে শান্ত স্বরে বললো,
— হু নোজ।
রাস্তার এদিকে ওদিক খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে অরুর দেখা পেলো ক্রীতিক।
ও দেখলো দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুটপাতে বসে আছে অরু। এভাবে অরুকে বসে থাকতে দেখে ক্রীতিক এগিয়ে এসে বললো,—- কি হয়েছে এখানে বসে আছিস কেন? তুই যে এতদূর চলে এলি, একবারও আমাকে বলে এসেছিস? তোর সাহস কি করে হলো এমন একটা অচেনা যায়গায় আমাকে না জানিয়ে এতো দুর চলে আসার?
ক্রীতিকের আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরু উঠে দাড়ালো, অতঃপর ওর কথার কোনোরুপ জবাব না দিয়েই একপ্রকার অগ্রাহ্য করে হাটা ধরলো অন্যদিকে,
অরুর এহেন কান্ডে পেছন থেকে ক্রীতিক ডেকে চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় গলায় বলে,
— অরু কোথায় যাচ্ছিস?
অরু যেতে যেতে জবাব দিলো,
— আপনি থাকুন আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আমি চললাম।
অরুর কথায় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো ক্রীতিকের বুক চিড়ে, অতঃপর অনেকটা জিদি গলায় অরুকে উদ্দেশ্য করে ক্রীতিক বলে উঠলো,—- যেখানে খুশি যা,তার আগে তোকে ছাড়া কিভাবে বাঁচবো সেটা শিখিয়ে দিয়ে যা।
এবার হাঁটার গতি পুরোপুরি থেমে গেলো অরুর, আর এক পা ও সামনে বাড়ানোর শক্তি নেই ওর, ও ওখানেই আটকা পরেছে, ক্রীতিকের প্রনয়াসক্তির অদৃশ্য শেকলে বাধা পরেছে ওর পা দু'টো ।

অরু দাড়িয়ে পরেছে দেখে, ক্রীতিক একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে শক্ত করে গলা জড়িয়ে ধরলো অরুর, এরপর ওর কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে হাস্কিস্বরে বললো,— আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি তুই? আমি যেমন অতিরিক্ত ভালোবাসা দিই ,তেমনি ক’ষ্টটাও অতিরিক্তই দিই, মাইন্ড ইট হার্টবিট।
আজকে প্রথমবার তাই ও’য়া’র্নিং দিলাম, দ্বিতীয়বার আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথাটা উষ্চারণ করার স্পর্ধা দেখানোর আগেই তুই শেষ। আই রিপিট মে’রে ফে’ল’বো একদম। দুদিন ধরে ভারী বর্ষন, দার্জিলিং এর সবুজ স্নিগ্ধ আবহাওয়া ভারী বর্ষনে ফ্যাকাশে রুপ ধারণ করেছে। আকাশ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো মহিষের পাল। কখন দিন আর কখন রাত তা ঠাওর করা দায়।
দু’দিন বৃষ্টিতে হোম’স্টে এর কটেজ থেকে বেরোতে না পারলেও,পাহাড়ের চূড়ায় মেঘেদের ভেলার সাথে খুনসুটি জমিয়ে বৃষ্টি মূখর দিনগুলো খুব একটা খারাপ কাটেনি অরুদের।
ওরা কখনো একসাথে বসে মনোপলি খেলায় মেতেছে, আবার কখনো গিটারের টুংটাং আওয়াজের সাথে তাল মিলিয়ে নিঃসংকোচে গান ধরেছে একই সুরে, মুশল ধারার বর্ষন কিছুটা কমে এলে ছেলেরা তাড়াহুড়ো করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে শহরের দিক থেকে খাবার কিনে এনেছে ,আর মেয়েরা খুব যত্ন করে সেগুলো রান্না করে সবাইকে পরিবেশ করেছে। একেক দেশের একেক জন মিলেমিশেই যেন আস্ত একটা পরিবার ওরা। নিজেদের বউকে কিছুটা ফুরসত দিতে কখনো বা পার্সেলও নিয়ে এসেছে ছেলেরা।
একসাথে মিলেমিশে গল্প, আড্ডা, খুনসুটি, দুষ্টমি অতঃপর দিন শেষে যে যার মতো জোড়ায় জোড়ায় ফিরেছে নিজেদের জন্য বরাদ্দকৃত

কটেজে। হয়তোবা ভালোবাসার মানুষের সাথে মধু রাত্রি যাপন করতে, নয়তো মনের মাঝে দমিয়ে রাখা একরাশ কাতরতা আর হতাশা নিয়ে ঘুমের দেশে পারি জমাতে ।
আর এভাবেই পার হয়েছে ওদের দার্জিলিং এর ঘরবন্দী দুটো দিন।
আজ সারাদিন বৃষ্টি নেই,তবে আকাশ গুমোট হয়ে ধূসর রঙ ধারণ করে আছে। এইতো কিছুক্ষণ হলো দিনের সুক্ষ্ম নিয়ন আলোতে আঁধারের পর্দা টেনে দিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে ধরনী জুড়ে। বাইরে মেঘ ডাকার গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে, এক পশলা ঝুম বৃষ্টি এক্ষুনি নেমে এলো বলে।
আর ভেতরে আঙুলের ভাঁজে শাড়ির কুঁচি ধরে কোমড়ে গুঁজতে ব্যস্ত লতানো মোহনীয় শরীরের অধিকারীনি সদ্য যৌবনে পা রাখা মারাত্মক এক রুপসী যুবতী।টকটকে লাল শীফনের শাড়িটা কোনমতে পড়া হয়ে গেলে, অরু ব্যস্ত হাতে আঁচল ঠিক করতে শুরু করে, প্রথমে সবসময়ের মতো আঁচলটা বাহু থেকে ছেড়ে দিলেও আজ কি ভেবে যেন আঁচল গুটিয়ে রাখলো কাঁধের উপরিভাগে।
যার দরুন এক ফালি নির্মেদ কোমড়ের রহস্য উন্মুক্তই রয়ে গেলো।
হাতের কাজ শেষ করে অরু ঘুরে দাড়ালো কটেজের দেওয়ালে লাগোয়া অত্যধুনিক গোলাকার আয়নাটার দিকে, যেখানে ভেসে উঠেছে এক লাস্যময়ী সুন্দরী রমনীর নিদারুণ প্রতিবিম্ব। আয়নার প্রতিবিম্বতে নিজেকে সুন্দরী আবিষ্কার করে নিজেই লাজুক হাসলো অরু, তারপর কাঠের স্টুল টেনে বসে পরলো মাথা ভর্তি রেশমের মতো চুলগুলো আঁচড়াতে। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতেই অরু ভাবতে লাগলো আজ সারাদিনের কথা,আজ বৃষ্টি ছিলোনা বলেই দু'দিন বাদে সবাই মিলে বেরিয়েছিল ওরা। স্যাতস্যাতে

আবহাওয়ার মাঝেই রকগার্ডেন, রেইনবো ফলস, পাম ফরেস্ট সবখানেই একটু করে ঢু মেরে, আবারও শহরের দিকে ফিরে এসেছে ওরা সবাই মিলে।
যেহেতু শহরটা সায়রের, তাই আজকের ট্যুর গাইড ও সায়র। ও সবাইকে এটা ওটা দেখাতে ব্যস্ত।
ওদিকে সারাদিন অরু নীলিমা আর এলিসারা এক সাথেই ছিল, আগমন টা যেভাবেই হোকনা কেন, হুট করে নিজেদের স্বপ্নের শহরে পা রেখে দু'বান্ধবীই পুলকিত ওরা, যার ফলরুপ উচ্ছ্বাসের কোন ঠিক ঠিকানা নেই ওদের। দুজন হাতে হাত ধরে হাটছে তো কখনো আবার দাঁড়িয়ে পরে একজন আরেকজনের ক্যামেরা ম্যান হয়ে ছবি তুলে দেওয়ার মোক্ষম দায়িত্ব পালন করছে। এতো উচ্ছ্বাস, এতো উদ্দীপনার মাঝেও ক্রীতিকের চোখ মুখ ছিল বিষন্নতায় ঘেরা,চাহনীতে ছিল অমাবস্যার মতোই কালো মেঘের ঘনঘটা। সবার মাঝে উপস্থিত থেকেও যেন কিছু একটা নিয়ে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল ওকে। গতানুগতিক বেপরোয়া চলন বলনের মাঝেও ওর চোখের সেই অপারগ দীর্ঘশ্বাস আর আক্ষেপটুকু স্পষ্ট খেয়াল করেছে অরু।
ক্রীতিক কখনো ফোন স্ক্রল করেছে তো কখনো সবার থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মোক করেছে, এমনকি পরনের কালো রঙা হুডিটার চেইনটা যে বক্ষস্থল পর্যন্ত খুলে ভেতরের সাদা স্যান্ডো গেঞ্জিটা দৃশ্যমান সে খেয়াল অবধি নেই ওর। এতো আনন্দের মাঝেও এই সবকিছু চোখ এড়ায়নি অরুর। ক্রীতিককে এভাবে বিষন্ন মুখে দাড়িয়ে থাকতে দেখে অরু যতবারই ওর শুকনো মুখশ্রীর পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে,ঠিক ততবারই

ক্রীতিকের চাহনিতে বুক কেঁপে উঠেছে অরুর। টলটলে দীঘির জলের মতো চোখ দুটোতে কি ভীষণ কাতরতা আর অপরাগতা তা কেবল অরুই টের পেয়েছে। ক্রীতিকের এমন ভগ্ন চাহনি দেখলে হৃদয়ে ভীষণ তোলপাড় হয় অরুর, বারবার মনে হয় সবার সামনেই ছুটে গিয়ে ক্রীতিকের বুকে ঝাপিয়ে পরতে,ওর ভাসা ভাসা চোখের পাতায় আবেশিত চুমু এঁকে দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে,
— এই তো আমি। তোমার বুকেই আছি,তাহলে কেন এই কাতরতা বলো?
কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়,কারণ ক্রীতিকের মতো ছন্নছাড়া, বেপরোয়া অরু নয়, যথেষ্ট লজ্জা আর সংকোচ রয়েছে ওর মধ্যে। তাই এবার নীলিমাকে রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে অরু দাঁড়ালো ক্রীতিকের পাশ ঘেষে, অরু পাশে এসে দাঁড়াতেই চোখ নামিয়ে এক ঝলক ওকে দেখে নিয়ে পুনরায় চোখ সরিয়ে নিকোটিনের ধোঁয়ার কুন্ডলীতে মন দেয় ক্রীতিক। ক্রীতিকের এহেন মুড অফ হওয়ার কারনটা যে ও নিজেই তা ভালোমতোই আঁচ করতে পারছে অরু। তবুও কিছুটা সংশয় নিয়ে কাঁপা কন্ঠে ক্রীতিককে শুধালো,
— কি হয়েছে, ঠিক আছেন আপনি।
অরুর কথায় ক্রীতিক আবারও সেই ব্যথাতুর চাহনি নিক্ষেপ করে, নরম গলায় জবাব দিলো,
— উমম, ঠিক আছি।
তারপর আর কোনো কথা নয়, অর্ণব আর সায়রকে ডাকতে ডাকতে অরুকে একপ্রকার এড়িয়েই ওখান থেকে চলে গিয়েছে ক্রীতিক।

এরপর সারাটাদিন অতিবাহিত হলো, অথচ দুজনার একটা বাক্য ও কথা আদান-প্রদান হয়নি, বেখেয়ালে দুজনার চোখচোখি হয়ে গেলে ক্রীতিকের ব্যাকুল দু'চোখ অরুকে ব্যথা দিয়েছে বারবার, এতো আনন্দের সবটাই কেমন ফিকে লেগেছে অরুর নিকট।

অবশেষে সন্ধ্যা নামতেই হৃদয়ের মাঝে একরাশ ব্যথাতুর অনুভূতি নিয়ে কটেজে ফিরেছে অরু। কটেজে ফিরে বেডরুমে প্রবেশ করে আর একমুহূর্ত ও অপেক্ষা করেনি ও, দ্রুত ব্যস্ত হয়ে পরেছে ক্রীতিকের জন্য নিজেকে সর্বোত্তম সাজে সজ্জিত করার কাজে। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে,বৃষ্টির ফোঁটার ঘনত্ব কম,তাই গায়ে লাগছে না মোটে,ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মাঝেই পাহাড়ের চূড়ায় হোম স্টে এর ফ্রন্ট ইয়ার্ডের কাঠের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অর্ণব, সায়র,আর ক্রীতিক। তিনজনের হাতেই একটা করে সিগারেটের শলাকা। ওদের নিঃশ্বাসের তালে তালে অন্ধকারের মাঝেই সেই শলাকা গুলো জ্বলছে আবার নিভছে।

নিকোশ আধারে পাহাড়ের ঢালে এক আধটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে অর্ণব দৃষ্টি নিক্ষেপন করে সায়রের দিকে, সায়র তখনো নির্লিপ্ত চোখে কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পানে চেয়ে আছে, সে'সময় অর্ণব হাত বাড়িয়ে ওর পিঠ চাপড়ে বলে ওঠে,

—- নীলিমাকে উঠিয়ে নিয়ে এলি ভালো কথা, এবার কি করবি? কিছু ঠিক করেছিস?

সায়র হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,— ভিসা পাসপোর্টের প্রসেস চলছে,কাজ হলেই ওকে নিয়ে ফিরে যাবো।

— আর তোর পুরান ঢাকাইয়া শশুর?

অর্ণবের কথায় সায়র কিছু একটা ভেবে ঠোঁট কামড়ে মৃদু হেসে বললো,
—- আমার মনে হয়না নীলিমা যতটা ভ’য় দেখিয়েছে শশুর আব্বা অতোটাও ডে’ঞ্জা’রাস। কিছুদিন হয়তো রেগেমেগে বাঁশ হাতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে,চিল ব্রো।
অর্ণব ফুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— তুইতো অলওয়েজই চিল, শশুরের ব’ন্দু’কের সামনে দাড়িয়েও বলিস চিল আব্বাজান। এতো চিল কই পাস?
অর্নবের কথায় সায়র মলিন হেসে ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে বলে,
— আমরা তো ফিরে যাচ্ছি, তুই কি করবি?সায়রের কথায় একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো ক্রীতিকের বুক চিড়ে,কিছুক্ষন থম মে’রে থেকে ও বললো,
—- আপাতত যাচ্ছিনা, কোম্পানির অনেক কিছু এখনো আয়ত্তে আসেনি, সবকিছু বুঝে উঠতে আরও বছর খানিক সময় লেগে যাবে, তারপর না হয় ফিরে যাবো।
ক্রীতিকের কথার পাছে অর্ণব স্ব-ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে উঠলো,
—- কোম্পানি তো তুই হেড অফিস থেকেও সামলাতে পারবি, এখানে থাকতে হবে কেন?
ক্রীতিক বললো,— অরুকে নিয়ে ভাবছি, আমাদের সম্পর্কটা আরেকটু স্বাভাবিক হোক, আমি ওর অভ্যেসে পরিনত না হলে কোনোকিছুই সম্ভব নয়। নয়তো দেখা যাবে ইউ এস এ তে ফিরে মা আর আপার জন্য কা’ন্নাকা’টি লাগিয়ে দিয়েছে।
ক্রীতিকের কথায় অর্ণব হ্যা সূচক মাথা নাড়ালেও সায়র বাম হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,

— কিন্তু অরুতো.... এ্যা,এ্যা,এ্যাহ...
সায়রের কথা জিহ্বা অবধি এসেই থেমে গেলো, কারণ এই মূহুর্তে নিজের বাহু দিয়ে ওর গলাটা চে’পে ধরে আছে ক্রীতিক, ওর হাতের বাঁধনটা ছাড়ানোর জন্য সায়র কাইকুই করছে খুব, অর্ণবের কাছেও সাহায্য চাইছে,অথচ অর্ণব মিনমিনিয়ে হাসছে আর স্মো’কিং করছে।
সায়রকে আরেকটু শক্ত করে চেপে ধরে ক্রীতিক দাঁত কটমটিয়ে বললো,— কতবার বলেছি আমার বউয়ের নাম মুখে নিবিনা তুই, কথা কানে যায় না?
সায়র খ্যাক খ্যাক কেশে উঠে অস্পষ্ট আওয়াজে বললো,
—- আরে ভাই আমি বিবাহিত এখন, ছাআআড়!
—- বিবাহিত কেন? তিন বাচ্চার বাপ হলেও তুই আমার বউয়ের নাম মুখে আনবি না,ব্যাস।
ক্রীতিকের কথায় সায়র এবার বিরক্ত হয়ে বললো,— এমন ভাব করছিস যেন আমার মুখে জীবানু লেগে আছে, আমি তোর বউয়ের নাম মুখে নিলেই ফোস্কা পরবে।
— হ্যা পরবে,একশো বার পরবে, কারণ তুই পুরোটাই একটা ম’হামারী, আজ থেকে তোর নাম রাখা হলো সায়র ভাইরাস। আর আমি একদমই চাইনা আমার ওইটুকুনি বউটা তোর ভাইরাসে আ’ক্রান্ত হোক, দূর হ শালা।
কথাশেষ করে সায়রকে ধা’ক্কা মে’রে কাঁদার মধ্যে ফেলে দিলো ক্রীতিক। তা দেখে অর্ণব না চাইতেও মুখ ফসকে হো হো করে হেসে দিলো। ক্রীতিক ও নতুন উদ্যমে সিগারেট ধরিয়ে মিটমিট করে হাসি সংবরণ করছে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মুখের আদলে গম্ভীর

ভাবটা ধরে রাখা যাচ্ছেনা কিছুতেই। ওদের দু'জনার এহেন কপটতা আর ষ'ড়যন্ত্র:কারীর ন্যায় আচরণ দেখে সায়র কাঁদা ছাড়িয়ে উঠতে নিয়ে আবারও পিছলে পড়ে গিয়ে ঠোঁট উল্টে বললো,
— শালা মীরজাফরের দল, তোদের কোনোদিন ভালো হবেনা, বউয়ের হাতে সকাল সন্ধ্যা উত্তম মাধ্যম খাবি তোরা, এই আমি অ'ভিশাপ দিলাম।ঘড়ির কাঁটার টিকটিক আওয়াজ জানান দিচ্ছে রাত তখন বারোটা বেজে এক, বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, হোম স্টে এর পুরো এরিয়াতে বিদ্যুৎ নেই। যার দরুন তিমিরে ঢাকা পরেছে পাহাড়ি এই নির্জন বসতিটা। অরু হাত বাড়িয়ে আলগোছে একটা চার্জার লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে, এখন কিছুটা আলোকিত চারিপাশ।
বজ্রপাত বিহীন শান্ত কোমল বারিধারা, তাও দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে কটেজের তকতকে মেঝে, তাই অরু এবার হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ব্যস্ত হাতে হাট করে খুলে রাখা জানালাটা বন্ধ করে দিলো।
অরু যখন রিনঝিন চুড়ি বাজিয়ে দ্রুত হস্তে জানালা বন্ধ করছিল, ঠিক তখনই অন্যপাশ দিয়ে চুল থেকে বৃষ্টিকনা ঝেড়ে সরাতে সরাতে একপ্রকার ছুটেই রুমে প্রবেশ করে ক্রীতিক। রুমে এসে আবছা আলোয় অরুকে না দেখতে পেয়ে গলা ছেড়ে ডেকে উঠলো ও,
— অরুউউ?
ক্রীতিকের আওয়াজ পেয়ে অরু তাড়াহুড়ো হাতে নিজের শাড়িটা ঠিকঠাক করে,চুলগুলো আরেকটু ভালো মতো পরিপাটি করে হাতে একটা রেড ভেলভেট কেক নিয়ে এগিয়ে গেলো মেইন ডোরের

দিকে, ক্রীতিক এখনো একই যায়গাতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, অরু এগিয়ে গিয়ে ক্রীতিকের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে ওর সামনে কেকটা বাড়িয়ে দিয়ে একগাল হেসে বললো,

—- হ্যাপি বার্থডে হাসবেন্ড, জন্ম দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে। মোমবাতিটা নিভে যাবে ঝটপট কিছু উইশ করে ফেলুন।

— আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

ক্রীতিকের দুচোখে তখন জ্বলজ্বল করছিল একটুকরো মোমবাতির নিয়ন অ'গ্নিশিখা, অথচ কেকের দিকে ওর কোনো রকম নজরই নেই, মা'দকতার অনলে ডুবে যাওয়া ঘোর লাগা দুটো চোখ আটকে আছে অরুর কাজল কালো চোখে,কৃত্তিম উপায়ে রঙিন করা রোজি দুটো ফিনফিনে ঠোঁটের ভাঁজে আর তারপর সেই আকর্ষিত একফালি নির্মেদ বাঁকানো কোমড় যা ক্রীতিকের সুস্থ সবল মস্তিষ্কটাকে অচল বানিয়ে দিতে সক্ষম,আর সেই ঘোরের মাঝেই অস্ফুটে কথাটা বলে ওঠে ক্রীতিক। ক্রীতিকের কথার পাছে অরু স্ব-ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো,— কিছু চাওয়ার নেই মানে? এ আবার কেমন কথা?

অরুর কথায় জবাব দিলো না ক্রীতিক, উল্টে অরুর আগাগোড়া ইশারা করে ওকে প্রশ্ন ছুড়ে হাস্কিস্বরে বললো,

— , ইজ ইট মাই বার্থডে প্রেজেন্ট বেইবি ?

অরু জবাব দিলো না,তীব্র সংকোচে মাথাটা নিচু করে ফেললো তৎক্ষনাৎ । মৌনতা সম্মতির লক্ষন সেটা ভেবেই বাঁকা হাসি খেলে গেলো ক্রীতিকের ঠোঁটের আগায়। ও আচমকা হাত থেকে কেকটা রেখে অরুকে ছোঁ মে'রে নিয়ে চলে গেলো কটেজের ছাঁদ খোলা

বারান্দায়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফুটো হয়ে পতিত বৃষ্টিকনা এসে ভিজিয়ে দিলো অরুর সর্বাঙ্গ, সুন্দর শাড়ি,সাজগোজ,লম্বা চুল সবকিছু ধুয়ে মুছে স্নিগ্ধতায় ছেয়ে গেলো ওর সমগ্র মুখ মন্ডল।

— হার্টবিট, ইউ লুকস্ প্রিটি।

ব্যাস এতোটুকুই, আর কোনো কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না ক্রীতিক। বরং কোনোরূপ কথাবার্তা ছাড়াই দু'হাতে অরুর কোমড়টা শক্ত করে চেপে ধরে ওর গলার মাঝে হুট করেই দাবিয়ে দিলো নিজের মুখটা।

প্রতিফলিত তীব্র আ'ক্রোশের ন্যায় একনাগাড়ের গাঢ় চুম্বন দিশেহারা করে দিচ্ছে অরুকে। ক্রীতিকের এমন আ'ক্রোশ দেখে এক পর্যায়ে অরুর মনে হচ্ছে, ওকে কোনো র'ক্তচো'ষা চেপে ধরেছে, এক্ষুনি নিজের লাল চোখ আর সূচালো দাঁত বের করে শরীরের সবটুকু র'ক্ত এক নিশ্বাসে শুষে নিয়ে যাবে সে, আর অরু পরে রইবে একটা নিথর র'ক্তহীন মানবী হয়ে। বিষয়টা ভাবতেই অরুর গায়ে কাটা দিলো। রাতের আধারে,বৃষ্টির মাঝে ক্রীতিকের এহেন অতিরিক্ত উত্তেজনা দেখে কিছুটা ভীত ও হয়ে পরলো মেয়েটা, তাই ওকে নিজের থেকে সরানোর খুব জোর চেষ্টা করে কম্পিত গলায় অরু বললো,

— আরেহ অন্তত কেকটা তো কাটুন।

ক্রীতিক অরুকে এক ঝটকায় পেছনে ঘুরিয়ে ওর পোশাকের লাগোয়া ফিতেটা মুখের সাহায্যে টেনে খুলতে খুলতে হিসহিসিয়ে বললো,

— সব পরে খাবো, তার আগে…

মাঝ পথেই থেমে গেলো ক্রীতিক, দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে সন্দিহান গলায় অরুকে বললো,
—- বেইবি, এখন অন্তত এটা বলিস না যে তুই ফিট নেই। এখনো তোর…আবারও থেমে গেলো ক্রীতিক, ভেতরের অস্থিরতাটা দমাতে চোখ বন্ধ করে রইলো কিছুক্ষণ।
অরুর পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত, ক্ষুদ্র বৃষ্টিকনা গুলো নিঃসংকোচে ঠায় নিয়েছে সেথায়,অথচ আলো পিছলে যাওয়ার মতোই মসৃণতা তার। এতোক্ষণে তো অরুও ডুব দিয়েছিল অজানা এক ঘোর লাগা শিহরণে,আর এখন এতো ঠান্ডার মাঝেও চোখমুখ গরমে জ্বলে যাচ্ছে ওর, তবুও ক্রীতিককে আসস্ত করতে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো অরু।
ক্রীতিক ওর হ্যা এর মানে বুঝতে না পেরে দৃঢ় কন্ঠে বলে উঠলো,
— এভাবে যন্ত্রনা না দিয়ে, মুখে বল। জাস্ট ইউজ ইওর ওয়ার্ড।
ক্রীতিকের ধমকে অরু কেঁপে উঠে নরম গলায় রিনরিনিয়ে বললো,
— ঠিক আছি।
অরুর কথাটা বলতে যতক্ষণ, তার পরক্ষনেই ঝড়ের গতিতে ওকে পুনরায় কাছে টেনে নিলো ক্রীতিক।
দিনশেষে আরও একবার অরুকেই সহ্য করতে হলো এই বেপরোয়া,খামখেয়ালি লোকটার উন্মাদনায় মত্ত মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসাময় এক দিশেহারা ঝড় তুফানের রাত। যা ওর নিকট চিরস্মরণীয়।বেলা বেজেছে অনেক, তবে চারিদিকে চোখ বোলালে মনে হচ্ছে মাত্রই ভোর হলো। মেঘের চাদরে ঢেকে আছে প্রকৃতি,বৃষ্টি হচ্ছে দফায় দফায়, তার মাঝেই বাইকার জ্যাকেট আর লেদার

প্যান্ট পরে ফ্রন্ট ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে দুরবিনের সাহায্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখার চেষ্টা করছে ক্রীতিক।
অরুর মাত্রই ঘুম ভেঙেছে, পরনে এখনো ক্রীতিকের হুডি, সেভাবেই একজোড়া হ্যালো কিটি পায়ে চড়িয়ে কটেজ থেকে বের হয়ে এলো ও।
ফ্রন্ট ইয়ার্ডে ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে চোখ ডলতে ডলতে ক্রীতিকের পাশ ঘেষেই দাঁড়িয়ে পরে অরু। অরুর আগমন টের পেয়ে দুরবিন থেকে চোখ সরিয়ে ওর কপালে শব্দ করে চুমু খেলো ক্রীতিক, অতঃপর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,— গুড মর্নিং বেইবি।
আদুরে বিড়াল ছানার মতো দু'হাতে ক্রীতিককে শক্ত করে আগলে ধরে আহ্লাদী গলায় অরু বললো,
— গুড মর্নিং, কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন?
— রাইডিং এ।
ক্রীতিকের কথায় অরু হকচকিয়ে উঠলো, ঘুমের ঘোর কেটে গেলো তৎক্ষনাৎ, সটান হয়ে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন গলায় অরু বললো,
— পা’গল আপনি? এই বর্ষায় কেউ রাইডিং এ যায়?
ওর কথায় ক্রীতিক ফিচেল হেঁসে জানালো,
—- পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির মাঝে রাইডিং এর থেকে এডভেঞ্চারাস আর কি হতে পারে হুম?
অরু ঠোঁট উল্টে বললো,
—- তাহলে আমিও যাবো।
ক্রীতিক তৎক্ষনাৎ অরুর কথায় ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললো,—- নো ওয়ে, তুই এখানেই থাকবি।

— কেন,আমি গেলে সমস্যাটা কি?
ক্রীতিক দুরবিনে নজর দিয়ে বললো,
— রাস্তাঘাট পিচ্ছিল, তার উপর একটু পরপর বৃষ্টি হচ্ছে এখন তোকে নেওয়া যাবে না।
অরু রুদ্ধ আওয়াজে বলে উঠলো,
— তারমানে আপনি বলতে চাইছেন রাস্তায় রি'স্ক আছে তাইতো?
—- সেটা কখন বললাম?
— এই যে এখন।
ক্রীতিক ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— আমি তেমন কিছু.....
— তাহলে আমাকে নিয়ে যান, আমিও আপনার সাথে রাইডিং এ যেতে চাই।
ক্রীতিকের কথার মাঝেই চট করে কথাটা বলে ওঠে অরু।
ক্রীতিক ওকে চোখ পাকিয়ে কিছুটা গম্ভীর গলায় বললো,
— জিদ করছিস কেন? বলেছিতো নেব'না। সারা রাতভর এতো ভালোবাসা দেওয়ার পরে সকাল সকাল ক্রীতিকের এতোটুকু শক্ত কথাও বেশ গায়ে লাগলো অরুর। অরু হলফ করে বলতে পারে, রাতের ক্রীতিক আর এখনকার ক্রীতিকের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যাবধান। কেন যেন না চাইতেও অভিমানি অশ্রুজলে টলটল করে উঠলো ওর দুচোখ। অরুর চোখে পানি ব্যাপরাটা বোধগম্য হতেই ক্রীতিক দ্রুত হস্তে ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললো,
— কাঁদছিস কেন বেইবি?এখনো শরীর খারাপ লাগছে?পেইন কি'লার নিয়েছিলি?
অরু ফুঁপিয়ে উঠে বললো,

— আমাকেও নিয়ে যান, প্লিজ। আমিও আপনার সাথে যেতে চাই।
অরুর অসহায় আবদারের কাছে চরম ভাবে হেরে গিয়ে একটা তপ্ত অপারগ নিঃশ্বাস ছাড়লো ক্রীতিক,অতঃপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,
—- ঠিক আছে নিয়ে যাবো, তবে আমার মতো, লেদারসুট, গ্লাভস, সেইফটি প্যাড সবকিছু পরতে হবে। বল রাজি?
ক্রীতিকের কথার পাছে অরু মুচকি হেসে জোরে জোরে মাথা ঝাকালো। বাইরে মুশলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, তারমধ্যেই পাহাড়ি রাস্তা ধরে সিটং এর দিকে শাঁই শাঁই করে এগিয়ে যাচ্ছে বাইকটা। ক্রীতিক খুব সাবধানে স্পিডোমিটারের গতি কমিয়ে বাইক রাইড করছে, যা অরুর কাছে প্রচন্ড বোরিং লাগছে, বাইকে বসে ঠেলা গাড়ির ফিল নিতে নিতে একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে অরু ক্রীতিকের দিকে ঝুঁকে গিয়ে বললো,
— এতো আস্তে চলছে কেন বাইকটা? আপনি না রাইডার? এই আপনার রাইড? আবার আমাকে দিয়ে সেইফটি প্যাড ও পরিয়েছেন। হুহ!
অরুর কথায় ক্রীতিক কপট হেসে বললো,
—- তোর যে ফাস্ট রাইডিং পছন্দ সেটা আগে বলিস নি কেন? আমি আরও ভাবলাম ছোট মানুষ।
ক্রীতিকের কথার আগামাথা না বুঝে অরু ভ্রুকুটি করে বললো,
— আপনি কি বলতে চাইছেন?
— কিছুনা ধরে বস।
ক্রীতিকের কথামতো অরু ওর কাঁধে রাখা নিজ হাতের বাঁধনটা জোড়ালো করতেই স্পিডোমিটারের গতি দিগুণ বাড়িয়ে ফেললো

ক্রীতিক। সচকিত চোখে রাইড করতে করতে সামনের লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে অরুকে শুধালো,—- আর ইউ ওকে বেইবি?
ওর প্রশ্নের জবাবে অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে স্পিডোমিটারের গতি আরও বাড়িয়ে দিলো ক্রীতিক। এবার অরু আর তাল সামলাতে না পেরে আচমকা পরে গেলো ক্রীতিকের পিঠের উপর। ক্রীতিক একই ভাবে লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে হেলমেট পরিহিত অরুকে বললো,
—- এভাবে নয়, শক্ত করে জড়িয়ে ধর।
অরু ধরলো। এরপর আর কোনো কথা নয় দুজনই চুপচাপ একটা লং রাইডিং উপভোগ করতে লাগলো পুরোটা সময় ধরে। এতোক্ষণ একই ভাবে বসে থাকায় অরুর বেশ সাহস বেড়েছে, ও হুটহাট করেই দু'হাত মেলে দিচ্ছে মুক্ত নীড় হারা পাখির ন্যায়। অরুকে চুপচাপ রাইডিং উপভোগ করতে দেখে ক্রীতিক ডেকে বললো,— বেইবি, হাউ ইজ ইট?
অরু মুক্ত বাতাসে দু'হাত মেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
— দারুন, আমাকে এভাবে প্রশান্তির সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য হলেও আপনার আয়ু বাড়ুক, আমার সব আয়ু আপনার হোক।
অরু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাইকের ব্রেক কষলো ক্রীতিক, হঠাৎ এভাবে ব্রেক কষায় অরু কিছুটা ঘাবড়ে গেলো, ও ভাবছে কোন কথায় আবার চটে গেলো ক্রীতিক, তাই একটু ইতস্তত গলায় বললো,
— কি হয়েছে?

কিন্তু না অরুর ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল হলোনা, আজ বোধ হয় ক্রীতিক পন করে নিয়েছে কোনো কিছুতেই রাগবে না সে, তাই সেই মোতাবেক, অরুকে আঙুলের ইশারা দিয়ে একটা স্থানীয় টং দোকান দেখিয়ে বললো,

—- বেইবি, চা খাবি?

— আমি খেতে পারি, কিন্তু আপনিতো সচারাচর চা খান'না।

অরুর কথায় ক্রীতিক ওর কপালে আঙুলের টোকা দিয়ে বললো,— তোর জন্য সব খেতে পারি আমি,ইভেন ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার ও।

ক্রীতিকের কথাটা চট করেই অরুর কাছে পরিচিত শোনালো, কবে কোথায় এমন কিছু হয়েছে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়েও বেশিদূর এগোতে পারলোনা ও, তার আগেই ক্রীতিক টেনেটুনে নিয়ে গেলো চায়ের দোকানে।

চা পান করে নতুন উদ্যমে আবারও বাইক এগিয়ে যায় স্বীয় গতিতে। দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা একটু থেমে গেলেও এখন বিকেল বাড়ার সাথে সাথে পুনরায় বৃষ্টির গতিবেগ বেড়েছে, অরুর তাতে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা না থাকলেও ক্রীতিক কিছুটা চিন্তিত, পাছে না আবার ঠান্ডা লেগে যায় দুজনারই।

ক্রীতিক চুপচাপ রাইড করছে দেখে অরু পেছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরে শুধালো,— আর কতদূর?

ক্রীতিক ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়েই বললো,

— এভাবে কাছে আসছিস কেন? কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবো তো। তারপর যখন তখন এ'ক্সি'ডে'ন্ট।

অরু এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে ক্রীতিকের কথায় ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললো,

—- উহুম, মোটেই না, আপনি খুব ভালো রাইড করেন, কতো মসৃণ, এতো দ্রুত চলেছে তাও আমি একটুও ভ'য় পাইনি।

— তাহলে তুমি করে ডাক?

ক্রীতিকের কথায় অরু ফিক করে হেসে বললো,

— আপনার তুমিতে এতো দূর্বলতা কেন বলুন তো?

ক্রীতিক বেখেয়ালে বললো,

— জানিনা, তোর মুখে তুমি ডাক শুনতে ভালো লাগে, মনে হয় দুনিয়াতে আমারও আপন কেউ আছে, আমি তার প্রয়োজন নই কেবলই প্রিয়জন।— তুমি।

ক্রীতিকের কথা শেষ হতে না হতেই, রিনরিনে আওয়াজ ভেসে এলো অরুর দিক থেকে।

ক্রীতিক দু'চোখ বন্ধ করে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাস্কিস্বরে বললো,

— আবার বল।

অরু ক্রীতিকের গলাটা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বললো,

— তুমি, তুমি, তুমি, তুমি শুধু আমার জেকে।

অরুর মুখে এতোবার তুমি ডাক শুনে পুলকিত ক্রীতিক, তাই ও ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে অরুকে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই কিছু একটা নজরে আসতেই অকস্মাৎ চোখ দুটো বড়বড় হয়ে গেলো অরুর।

ও দেখলো বৃষ্টির মাঝে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে হুট করেই কোথা থেকে যেনো রং সাইড দিয়ে একটা কাবার্ড ভ্যান ঢুকে পরেছে মাঝ

রাস্তায়, যার দূরত্ব ওদের থেকে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার বা তার ও কম।
অরুর চোখ বড়বড় হয়ে গিয়েছে, ক্রীতিক সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে হেলমেটের উপর থেকে অরুর গালে আলতো চুমু খেলো, তৎক্ষনাৎ চেঁচিয়ে উঠলো অরু,— দেখেএএএএ!!
অরুর কথায় ক্রীতিক আচমকা সামনে তাকিয়ে শরীরের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে হা'র্ডব্রেক কষলো, কিন্তু তার আগেই পিচ্ছিল রাস্তা আর কাবার্ড ভ্যানের ধা'ক্কা মিলেমিশে বিশাল দেহী বাইকটা দুটো মানুষ সহ'ই ছিটকে পরলো পাহাড়ি রাস্তার খাদে।
চোখের সামনে প্লাস্টিকের খেলনার মতো একটা বাইক ছিটকে পরেছে দেখা মাত্রই কাবার্ড ভ্যানটা দ্রুত গতিতে প্রস্থান করলো সেখান থেকে। তার পরবর্তী মূহুর্তটা একদম শুনশান নীরব। যেন আশেপাশে কিছুই ঘটেনি।লোকালয় ছাপিয়ে এই যায়গাটা বেশ অনেকটা দূরে অবস্থিত , তাও পাহাড়ের ঢাল, বৃষ্টি হওয়ার দরুন মানুষ তো দূরে থাক একটা কাক পক্ষীও নেই আশেপাশে ।
রাস্তাদিয়ে তখনও সরোবরের ন্যায় কলকলিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। সেই জলের ছাঁট চোখে মুখে আঁচড়ে পরতেই কেঁপে উঠল ক্রীতিক, শক্ত পাথর খন্ডে লেগে ওর হেলমেটটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে, অরু তখনো ক্রীতিকের বুকের মাঝে চেতনাহীন হয়ে পরে আছে। কিভাবে কিভাবে যেন বাইকটা হাত থেকে ছুটে গেলেও অরুকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরেছিল ক্রীতিক। যার দরুন অরুর হেলমেটটা এখনো অক্ষত।
নিভু নিভু চোখে একঝলক অরুকে দেখলো ক্রীতিক, নাহ ওর হেলমেট ঠিকই আছে, নিজেরটা আদৌও ঠিক আছে কিনা তা দেখার

মতো সুযোগ হলোনা ক্রীতিকের, কারণ ওর মাথাট শক্ত জড়বস্তুর মতোই ভার হয়েছে আছে, সেই সাথে চুলগুলো আঠালো মনে হচ্ছে, চোখ দুটো ঝাপসা, পুরো দুনিয়া ওলট-পালট দেখাচ্ছে, সেই ঝাপসা চোখেই ক্রীতিকের চোখ গেলো এককোনে উল্টে পরে থাকা বাইকটার দিকে। ও নিজের র'ক্তা'ক্ত হাতে বুক পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে কি ভেবে যেন দিয়াশলাইটা জ্বালিয়ে ছুঁ'ড়ে মা'রলো বাইকটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা সমান অ'গ্নিশিখা ছড়িয়ে দাউ দাউ করে 'জ্বলে উঠলো বাইকটা। বহুক্ষনের প্রচেস্টায় একটুখানি উঠে বসলো ক্রীতিক, অতঃপর খুব করে চেস্টা চালালো অরুকে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে কোলে নেওয়ার, কিন্তু পারলোনা,উঠে দাঁড়ানোর আগেই হাঁটু ভেঙে ধপ করে বসে পরলো চুনোপাথরের উপর। নাক দিয়ে অনর্গল র'ক্ত ঝরছে, আজকে একটু বেশিই ঝরছে। কিন্তু কানের কাছে? এখান থেকেও কি যেন চুয়িয়ে চুয়িয়ে পরছে, ক্রীতিক আস্তে করে হাত দিলো সেখানটায়, তারপর ভেজা হাতটা এনে ধরলো নিভু নিভু চোখের সামনে,
ধরতেই আবছা আবছা দেখতে পেলো ওর কান বেয়ে ঘন কালচে র'ক্ত গড়িয়ে পরছে,র'ক্তটা সাভাবিক নয়, ক্রীতিক তা দেখে একটু তাচ্ছিল্য করে হাসলো যেন কিছুই হয়নি। ব্যাস এটুকুই, এরপর পুরো রঙিন পৃথিবীটা ক্রীতিকের চোখের সামনে ধীরে ধীরে কালচে হয়ে এলো,হাত পা গুলো কাঁপতে কাঁপতে চোখের সামনে অকস্মাৎ আধারে তলিয়ে গেলো পুরো ধরনী। ক্রীতিক আস্তে করে পরে রইলো চেতনাহীন অরুর পাশেই।
একটু আগের খুনসুটি, অরুর গায়ের ঘ্রান, অরুর খিলখিল হাসির আওয়াজ আর সবশেষে দু'ঠোঁট নাড়িয়ে অস্পষ্ট ফ্যাস ফ্যাস

আওয়াজ,— মেইবি আই কুড'ন্ট প্রোটেক্ট ইউ,বাট আই লাভ ইউ হার্টবিট,
এরপর কয়েক মিনিট নিরবতা, পরক্ষনেই আবারও একটু ঠোঁট নাড়লো ক্রীতিক,
—আই লাভ ইউ আ লট। আমার সব আয়ু তোর হোক বউ। আমি না হয় তোর মধ্যেই বাঁচবো। অবশেষে আমি তুই মিলেমিশে একাকার হবো, আর বাঁধা নেই।
দেশের নামি-দামি ব্র্যান্ডেট বাইকটা তখনো দা'উদাউ করে জ্ব'লছিল এক কোনে, এটাই বোধ হয় অরুকে কষ্ট দেওয়ার জন্য অপারগ জায়ান ক্রীতিকের তীব্র রা'গের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সুন্দর বাসন্তিক সকাল,ঝকঝকে নীল আকাশ,সেথায় পেজা তুলোর মতোন ভেসে বেড়াচ্ছে শুভ্র মেঘেদের ভেলা,চোখের সামনে উত্তাল সমুদ্র। তবে সমুদ্র তটে যেতে হলে পারি দিতে হবে এক বিস্তৃত চেরিব্লোসমের বাগান। এখান কার চেরিব্লোসম গুলো সমসাময়িকের থেকে বেশ আলাদা,ফুলের ভারে নুয়িয়ে পরা গাছের থোকায় থোকায় গাঢ় গোলাপি রঙা কোনো ফুল নেই, এখানকার ফুল গুলো গোলাপির বদলে গাঢ় বেগুনি রঙের। পার্পল চেরিব্লোসম বলা চলে। ঝড়ে পরা বেগুনি রঙা ফুল গুলো পায়ে মাড়িয়ে সমুদ্র তটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চারিদিকে নিজের বিস্মিত চোখজোড়া বোলালো অরু, হুট করে এমন বেগুনি ফুলের রাজ্যে প্রবেশ করে ওর চোখের মনি দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো মূহুর্তেই। হ্যাভেনের মতো এতো সুন্দর একটা যায়গায় পা রাখতে পেরে অরু কিছুটা আবেগাপ্লুত ও বটে। বিস্ময় আর আনন্দ উদ্দীপনার চরমে পৌঁছে সুন্দর বেগুনি ফুলে ভর্তি গাছগুলোর চারিদিকে ঘুর পাক খাচ্ছে ও। অরু ঘোরার সঙ্গে

সঙ্গে ওর পরনের সফেদ রঙা ফিনফিনে গাউনটাও ঘুরছে, কি চমৎকার সেই দৃশ্য।
এমতাবস্থায় পাশ থেকে গলা ছেড়ে অরুকে ডেকে উঠলো কেউ,
— বেইবি লুক এট দিস।
চিরাচরিত ইংরেজি বাক্য আর অতিব পরিচিত সেই সম্মোধন "বেইবি" শব্দটা কর্ণকূহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়ালো অরু,কৌতুহল নিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলো, প্যান্টের পকেটে দু'হাত গুঁজে সমুদ্র তটে দাড়িয়ে অরুকেই ডাকছে ক্রীতিক। বরাবরের মতোই সেই আবেশিত চাহনি, অরু মাঝেমধ্যে বুঝে উঠতে পারেনা, ক্রীতিক কি এই নে'শা নে'শা চোখ দুটো শুধু মাত্র ওকে ঘায়েল করার জন্যই তৈরি করে?নাকি অন্য কিছু? ভেবে পায়না অরু। তবে ওর রহস্য মানবের তীক্ষ্ণ কুটিল আর গম্ভীর চেহারা ছাপিয়ে এই চোখ দুটোতে বরাবরই মায়া খুজে পায় ও, আজ বা থেকে কাল নয়, বরং সেই প্রথম দিন থেকেই সর্বনাশা চোখ দুটোর মাঝে হারিয়ে যায় ও। ডুব দেয় ভালোবাসার অতল গহ্বরে,এই যেমন এখনো হারাচ্ছে,নিজের ধ্যান,জ্ঞান, চেতনা সবকিছু ভুলে গিয়ে হারাচ্ছে ।
কিন্তু পরক্ষনেই ক্রীতিকের ইশারাতে ভাবনার ছেদ ঘটে অরুর, ওর চোখ অনুসরণ করে সামনে তাকাতেই অকস্মাৎ বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পরে অরুর দু'চোখ,আপনা আপনি ফাঁক হয়ে যায় চমকপ্রদ ওষ্ঠাধর, সেদিকে তাকিয়েই অরু দেখলো, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে এক বিশাল সুউচ্চ ক্যাস্টল,যার বাইরের দিকটা মার্বেল পাথর আর দামি দামি শেতপাথরের কোটিং এ আস্তরিত। এটা দেখে অরুর মনে হচ্ছে, ও হুট করেই ডিজনিল্যান্ডে পা দিয়ে ফেলেছে,ওই

জন্যই তো এতো সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো ঘটছে চোখের সামনে, এবং এটা মোটেও স্বপ্ন নয়, এটা বাস্তব,চিরাচরিত বাস্তব। জায়ান ক্রীতিক আশেপাশে থাকলে সকল অবাস্তবই বাস্তব, সে আশেপাশে থাকলে সকল দু’শ্চিন্তা, অবসা’দগ্রস্থতা, অশা’ন্তিকে পেছনে ফেলে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে নির্বিঘ্নে সস্থির নিঃশ্বাস নিতে পারে অরু, চেরিব্লোসমের রাস্তা ধরে চোখ বন্ধ করে বিনা দ্বিধায় হেঁটে যেতে পারে বহুক্রোশ ।
সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু সাগরের পারে কে বানিয়েছে এমন রাজকীয় ক্যাস্টল? সেই উত্তরের আশাতে’ই ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রীতিকের পানে চাইলো অরু, পেছনে ফিরেই আশ্চর্য হয়ে শুধালো,
— এটা এতো সুন্দর,কে বানিয়েছে এটা?আব…তবে পেছনে ঘুরতেই অকস্মাৎ কথার মাঝপথে থেমে গেলো অরু, কারণ ক্রীতিক এখানে নেই। আশ্চর্য! একটু আগেতো এখানেই সটান দাড়িয়ে ছিল, এখন কোথায় গেলো সে? অরু ভীষণ অবাক চোখে এদিক ওদিক তাকালো, যতদূর চোখ যায় শুধু ধূ ধূ সমুদ্র তট। আশেপাশে তো দূরে থাক, বিস্তার বেলাভূমিতে যতদূর দু’চোখ যায় কোথাও কোনো মানুষের পদচিহ্ন অবধি নেই, অথচ ও স্পষ্ট দেখেছে এখানে, এই যে এখানেই দাঁড়িয়ে অরুকে ডাকছিল ক্রীতিক।অরুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, চোখে মুখে অসহায়ত্বের নিদারুণ ছাপ স্পষ্ট, ক্রীতিককে খোজার উদ্দেশ্যে অরু এবার ছুটে গেলো পায়ে মাড়িয়ে ফেলে আসা চেরিব্লোসমের রাস্তার দিকে, কিন্তু হায়, কোথাও তো চেরিব্লোসমের গাছ নেই, উল্টো চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে ঝাঁঝালো রৌদ্রতাপ, প্রখর রৌদ্রতাপে গাছপালা শুকিয়ে ম’রাকাঠে পরিনত হয়েছে। পায়ের নিচের গরম

চিকচিকে বালিতে শরীর জ্বলে যাচ্ছে, অরু দরদরিয়ে ঘামছে, বাম হাতের পিঠ দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামটুকু আলগোছে মুছে অরু এবার চোখ ফেরালো খানিকক্ষণ আগের রাজকীয় ক্যাস্টলের দিকে, হতেও পারে ক্যাস্টলের মধ্যেই ক্রীতিক আছে।
কিন্তু এবার আরও বিশাল বড় ঝটকা খেলো অরু, কোথায় ক্যাস্টল,কোথায় কি? চারিদিকে শুধু ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। চোখের সামনে সাজানো গোছানো ডিজনিল্যান্ডটা হুট করেই কেমন উধাও হয়ে গেলো, সৌন্দর্য আর প্রাচুর্য্যে ঘেরা সুবিশাল সমুদ্র তট'টা চোখের পলকে পরিনত হয়েছে ভ'য়াবহ মরুভূমিতে, মস্তিষ্কটা পুরোপুরি ফাঁকা, যার হাত ধরে এতো দূর এগিয়ে আসা, সেও মাঝপথে হাত ছেড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলো,এখন কি করে সামনে এগোবে অরু?এই ভয়'ঙ্কর নির্জন মরুভূমি ছাপিয়ে কি করেই বা লোকালয়ের সন্ধান পাবে ও? অরুর মাথাটা যখন হাজারও দু'শ্চিন্তায় ফেটে যাচ্ছিল, তখনই সূদুর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাল তোলা জাহাজ নিয়ে হইহই করে এগিয়ে আসে একঝাঁক জলদ'স্যুর দল। কি বি'শ্রি তাদের মুখের হাসি। তাদের সেই নোংরা হাসির আওয়াজে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে অরু। মুখের মাঝের অবশিষ্ট তরল পদার্থ টুকু হারিয়ে যায় মূহুর্তেই, জাহাজে নোঙ্গর ফেলে অরুর দিকেই এগিয়ে আসছে লোক গুলো, অরু ভ'য়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো এবার,
— জায়ান ক্রীতিক কোথায় আপনি? ভ'য় করছে আমার।
"জায়ান ক্রীতিক", মানুষটা অরুর কাছে সুপার হিরোর মতোই, সে আশেপাশে থাকলে ভয় ডর, বিপ'দ, বাঁধা কোনো কিছুই ছুঁতে পারে না অরুকে, এই দীর্ঘদেহী কালো পোশাকধারী পৈ'চাশিক পায়ারেটস

গুলোও ছুঁতে পারবে না, এটা অরুর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ক্রীতিক তো নেই এখানে , কোথাও নেই। অরুকে বাঁচানোর জন্য ক্রীতিক আজ নেই, ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে উল্টো পথে ছুট লাগালো অরু, শরীরের শক্তি ক্ষীণ, তবুও বাঁচার লড়াই এ জিততেই হবে ক্রীতিক তো বরাবর এটাই শিখিয়েছিল ওকে।
কিন্তু অরু পারছে না, ওর হৃদয়টা ভে’ঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে,ভা’ঙা হৃদয়ে কতক্ষণই বা এভাবে শক্তি সঞ্চার করবে ও? এর চেয়ে তো ম”রে যাওয়াই ভালো। জলদ’স্যু গুলো কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না, অরু হাল ছেড়ে ছোটার গতি কমিয়ে দিয়েছে, জলদ’স্যুরা এখনই ধরে ফেলবে ওকে, ওদের লকলকে চাহনী আর ভ’য়ানক অ’গ্নিমূর্তি দেখে গা ঘিনঘিন করছে অরুর,অগত্যাই অরু থেমে গিয়েও নতুন উদ্যমে ছুটছে, আস্তে হলেও ছুটছে।
কিন্তু শেষমেশ পায়ারেটস গুলো যখন হুমড়ি খেয়ে ছুটে এসে ওর বস্র অবধি হাত ছোঁয়ালো,সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে চোরাবালির অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে লাগলো অরু, যে গহ্বর ব্ল্যাক হোলের থেকেও বেশি অ’ন্ধকার আর বর্বর,তবুও অরু হাসলো এক চিলতে ব্যথাতুর হাসি খেলে গেলো ওর ঠোঁটের ভাঁজে। চোরাবালির অতল গহ্বরের তলিয়ে যেতে যেতে অস্ফুটে অরু বললো,—- জীবনের রাস্তায় কারও হাত ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর, সেখান থেকে একা একা ফিরে আসাটা খুব কঠিন,অসাধ্যই বলা চলে, আমিও পারিনি এই অসাধ্য সাধন করতে,তবুও শান্তি, তুমি ছাড়া আর কোনো নোং’রা হাত আমার শরীর স্পর্শ করতে পারেনি, তোমার অরু শেষ অবধিই তোমার ছিল জায়ান।

কথা শেষ করে অরু যখন শেষ বারের মতো চোখ বুজবে, ঠিক তখনই ওর হাতটা খপ করে টেনে ধরলো কেউ, হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে ওকে উপরের দিকে টানতে লাগলো ধীরে ধীরে, কে টেনে ধরেছে এভাবে? ওই ভ'য়ানক দা'নবীয় লোকগুলো নয়তো? প্রশ্নটা মস্তিষ্কে গিয়ে লাগতেই ছটফট করে উঠলো অরু, নিজের হাতটা বহু কসরতে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে ক্রীতিকের নাম ধরে তৎক্ষনাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলো ও ,

—-- নাআআআহ, জায়ান ক্রীতিক কোথায় তুমিইই?

এক চিৎকারে আচমকা চোখ খুলে প্রচন্ড জোরে হাঁপাতে লাগলো অরু। চোখের সামনে গটগট করে ঘুরছে সফেদ রঙা সিলিং ফ্যান, এয়ারকন্ডিশার টাও ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে বেশ, চারিদিক শীতল, অথচ অরু ঘামে ভিজে একাকার, ওর শরীরটা থরথর করে কাপছে এখনো, আশেপাশের কোনোকিছু ঠাওর করা যাচ্ছে না, একটু আগের স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলো চোখের সামনে জীবন্ত, যার দরুন হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে ওর বক্ষদেশ। শুধু কানে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কিছু কথার আওয়াজ,—-- এক্সকিউজ মি, কে জায়ান ক্রীতিক? কাকে খুঁজছেন?

একটা শুষ্ক ঢোক গিলে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নকারীর দিকে আবছা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো অরু,

দেখলো একজন অল্পবয়স্ক সাদা এপ্রোন পরিহিত পুরুষকে,তার গলায় ঝুলছে স্টেথোস্কোপ, ডাক্তার হবে হয়তো, কিন্তু সে কি প্রশ্ন করলো এটা? অরু ভ্রু কুঁচকায়, লোকটা তৎক্ষনাৎ আবারও শুধালো,

— কাকে খুঁজছেন? আপনার তো জ্ঞান ফিরেছে, আমি আপনার মা আর বড় আপুকে ডেকে আনছি, ওয়েট।
কথাশেষ করে লোকটা পেছনে ঘুরলে অরু আস্তে করে তার কনু আঙুলটা টেনে ধরে, ফ্যাস ফ্যাসিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলতে চেষ্টা করে, তবে নাকের মধ্যে অক্সিজেন লাগানোর দরুন লোকটা ভালোভাবে শুনতে না পেরে, অরুর মুখের কাছে কিছুটা ঝুঁকে এসে বললো,— এবার বলুন।
লোকটা মুখের কাছে কান বাড়িয়ে দিতেই, অরু বেশ সময় নিয়ে আওড়ালো নামটা,
—- জায়ান ক্রীতিক কোথায়?
অরুর প্রশ্ন শুনে লোকটা ঠোঁট উল্টে অরুর নির্লিপ্ত চোখের দিকে চাইলো, কি ভীষন মায়া চোখ দুটোতে, অথচ সেই মায়া উবে গিয়ে নতুন করে জড়ো হয়েছে কাউকে দেখার ব্যাকুল তৃষ্ণা। কিন্তু কাকে? সেটাই তো বুঝতে পারলো না ডক্টর তন্ময় I অরু আস্তে করে আবারও শুধালো,
— কোথায়?
ডক্টর তন্ময় এবার বি'রক্ত হয়ে বললো,—- আমি কি করে জানবো সে কোথায়? তাছাড়া আপনি এখনো আই সি উ তে আছেন,জ্ঞান ফিরেছে মাত্র, এবার কেভিনে সিফ্ট করা হবে, তখন যা জানার যেনে নিয়েন নিজের পরিবারের কাছ থেকে।
লোকটার বি'রক্তি ভাব গায়ে মাখালো না অরু, উল্টো প্রশ্ন ছু'ড়ে বললো,
— আমি কি এখনো দার্জিলিং এ?

হাতে ফাইল নিয়ে অরুর মেডিকেল রেকর্ড গুলো চেক করতে করতে তন্ময় ভ্রু কুঁচকে বলে,
—- কিসের দার্জিলিং? আপনি ঢাকায় আমাদের প্রাইভেট নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন, তাও গত একসপ্তাহ যাবত। আর এই যে আপনার জ্ঞান ফিরলো।
অরু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ডুকরে কেঁদে বলে ওঠে,— তাহলে আমার জায়ান ক্রীতিক কোথায়? উনি ঠিক আছেন তো?
—- কি জায়ান জায়ান করছেন তখন থেকে,আর বাকি অর্ধেক নাম তো আমি উচ্চারণই করতে পারছি না, সে যাই হোক, জায়ান টায়ান এখানে নেই, আপনার মা আজমেরী শেখ ম্যাম আপনাকে এখানে ভর্তি করিয়েছেন। আর আপনি এখন এতো স্ট্রেচ নিতে পারবেন না, নিজেকে শান্ত করুন, আমি বড় স্যারকে কল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি, উনি এক্ষুনি এসে আপনাকে চেকআপ করে যাবেন।ডোন্ট ওয়ারি।
অরু নিজের রাগটা সংযত করে ক্ষীণ গলায় বললো,
— দার্জিলিং থেকে ফিরে এলাম কি করে সেটা অন্তত বলুন?
—- কিসের দার্জিলিং, কিসের ফেরা,কি বলছেন….
তন্ময় ফাইল চেক করতে করতেই থমকে গেলো, সত্যিই তো কেসটা দার্জিলিং এর, বাইক এ’ক্সি’ডে’ন্ট হয়েছিল মেয়েটার। তারমানে মেয়েটা একা ছিল না, কিন্তু একে ছাড়া তো আর কাউকে নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়নি, স্ট্রেঞ্জ।সকল ফর্মালিটিস পূরণ করে অরুকে কেভিনে দেওয়া হয়েছে আজ দুদিন হলো,আর আজকে অক্সিজেনও খোলা হয়েছে, তবে এক পায়ের ফ্যাকচারটা বেশ

গুরুতর, ওয়াশরুম কিংবা শাওয়ারে গেলে ক্রীসের উপর ভর করে হাঁটতে হয়, আর নয়তো বিছানায় শুয়ে দিনরাত্রি যাপন করতে হয় একনাগাড়ে, অরু ভেবে পায়না এতো বড় একটা এ'ক্সি'ডেন্টের পরেও ও কিভাবে এতোটা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে?
ওর মনে আছে শেষ বার যখন ওরা বাইক সহ পাহাড়ের খাদে পরে যাচ্ছিল,তখন ক্রীতিক বাইক ছেড়ে দিয়ে ওকে টান মে'রে নিজ বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিল, আর তারপর পরই পুরো দুনিয়াটা ঝিননন ধরে অ'ন্ধকার হয়ে গেলো অরুর দুচোখের পাতায়।
আর এখন ক্রীতিক ও চলে গেলো ওকে এখানে একা রেখে, যার ফলরুপ মাঝেমধ্যেই ক্রীসটাকে দেখে অরু তাচ্ছিল্য করে হাসে আর মনেমনে উপহাস করে বলে,—- আমার বাহুবলি এখানে থাকলে তোকে আর প্রয়োজন হতো না তুচ্ছ ক্রীস।
ক্রীতিকের কথা ভাবতেই বুকটা ভার হয়ে গেলো অরুর,দলা পাকানো কা'ন্নার জোয়ারে আরও একবার ধরে এলো গলাটা।
গলগলিয়ে উগরে আসা কা'ন্নাটাকে যথাসাধ্য দমিয়ে রাখতে ঠোঁট কামড়ে জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি স্থাপন করে অরু। আর ভাবতে থাকে সেদিনের কথা, যেদিন অরুকে আই সি ইউ থেকে কেভিনে শিফট করা হয়েছিল,
নাকের ছিদ্রতে তখনও আটকে ছিল অক্সিজেনের নল, অরু পিটপিটিয়ে চোখ মেলে যখন দেখেছিল ওর সামনে মা আর আপা দাঁড়িয়ে, তখন আর নিজের কান্নার বাঁধ আটকে রাখতে পারেনি অরু, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ভিজিয়ে ফেলেছিল চোখের কার্নিশ।
অরুকে এভাবে অস্থির হয়ে কাঁদতে দেখে অনু তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এসে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে শুধালো,— কি হয়েছে বোন

আমার? এভাবে কাঁদছিস কেন?কিছু খেতে ইচ্ছে করছে আপাকে বল?
এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে, ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠে অরু বললো,
— আমার জায়ান ক্রীতিক কোথায় আপা? আমি তার কাছে যাবো।
অরুর কথায় মূহুর্তেই উৎকন্ঠা মিশ্রিত মুখের আদলটা শুকিয়ে এইটুকুনি হয়ে গেলো অনুর। ও শুষ্ক ঢোক গিলে অরুর কথায় কিছু একটা প্রত্যুত্তর দেবে তার আগেই পেছন থেকে আজমেরী শেখ পেপারে মনোযোগ নিবিষ্ট করে বলে ওঠেন,—- সে ফিরে গিয়েছে।
তৎক্ষনাৎ অনু -অরু দু'বোনই চোখেমুখে হাজারো বিস্ময় নিয়ে তাকালো মায়ের পানে, আজমেরী শেখের ভাবভঙ্গিমা তাতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, তিনি এখনো পেপার পড়ায় বেশ মনোযোগী, মায়ের মুখে এহেন জটিল কথা শুনে অরু একটু হকচকিয়ে উঠে বসতে চাইলো, ধীরে ধীরে উঠে বসে উদ্বিগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে বললো,
— ফিরে গিয়েছে মানে? কোথায় গিয়েছে?
আজমেরী শেখ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন,
— তার গন্তব্য যেখানে সেখানেই, সে তো আর সারাজীবন বাংলাদেশে থাকার জন্য আসেনি,কিছুদিনের অতিথি হয়ে এসেছিল আবার ফিরে গিয়েছে নিজের অসামাজিক জীবনে, তাছাড়া ফিরে যাবারই কথা,তার মতো লাগাম ছাড়া মানুষ গুছিয়ে সংসার করার জন্য বিয়ে করেছে বলে তোমার মনে হয়?

মায়ের কথা শুনে হতবাক অরু, সবগুলো কথা এখনো মস্তিষ্কে ঠিকভাবে সাজাতে পারছে না ও, তাই বাইরে থেকে চোখ মুখ স্থির। তবে যেই মায়ের সবগুলো কথা বুঝে আসলো,ঠিক তখনই মায়ের কথায় ঘোর আপত্তি জানিয়ে তপ্ত শ্বাস ছেড়ে অরু বললো,—-
অসম্ভব জায়ান ক্রীতিক আমাকে রেখে কোথাও যাবে না, তাছাড়া উনি তো আমাকে ছাড়া থাকতেই পারেনা।
মেয়ের কথা শুনে চোয়াল শক্ত হয়ে এলো আজমেরী শেখের, তিনি তৎক্ষনাৎ কিঞ্চিৎ খেঁকিয়ে উঠে বললেন,
— মায়ের সামনে এসব বলতে লজ্জা লাগছে না তোমার বেয়া’দপ মেয়ে? একটা অভ’দ্রের সাথে দিনরাত থেকে অ’ভদ্রে পরিনত হয়েছো। তাছাড়া যার জন্য এতো আহাজারি করছো সে তোমাকে রেখে সেই কবেই ফিরে গিয়েছে, যদি ফিরে নাই যেত, তাহলে তার বন্ধু বান্ধব কাউকে তো অন্তত দেখতে পেতে কেউ আছে এখানে?
মায়ের চড়াও মেজাজে একটু খানি লাগাম টানতে এবার মুখ খুললো অনু,সে আজমেরী শেখের দিকে তাকিয়ে গলা খাদে নামিয়ে বলে ওঠে,—- আহ মা, অরু অসুস্থ এখন তো একটু থামো,সুস্থ হলে সব বলা যাবে।
দুই মেয়ের দিকে গম্ভীর চাহনী নিক্ষেপ করে, কেভিন থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আজমেরী শেখ অনুকে উদ্দেশ্য করে বলেন,
—- জায়ান ক্রীতিক যে সত্যি সত্যি চলে গিয়েছে সেটা তোমার বোনকে এবার বোঝাও।
মা বেরিয়ে যেতেই অরু অনুর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বললো,

—-- আআপা সত্যি করে বল, উনি কি আসলেই ফিরে গিয়েছে? আর কেউ না জানুক তুই তো জানিস যে আমি ওনাকে কতটা ভালোবাসি, আমি জায়ান ক্রীতিকের কাছে যেতে চাই আপা। বলনা উনি কোথায়?
কথা বলতে বলতে আবারও কেঁদে ওঠে অরু। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাহায্যে ভেতরের অস্থিরতাটাকে বের করে দিয়ে অনু অরুকে আস্বস্ত করে বলে,
—-- হ্যা অরু,ক্রীতিক ভাইয়া ওনার বন্ধুরা সবাই ফিরে গিয়েছে।
—-- আআমাকে ররেখেই…?
সফেদ বিছানার চাদরটা শক্ত হাতে খামচে ধরে দু'চোখের প্লাবনে বুক ভাসালো অরু। ওর এমন ব্যথাতুর কান্না সহ্য হলোনা অনুর, তাই তাড়াহুড়ো করে বোনকে বুকের মধ্যে নিয়ে অজস্র শান্ততা দিতে শুরু করলো অনু। অনুর কাঁধে মুখ লুকিয়ে অরু শব্দ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—-- এটাতো কথা ছিল না আপা, উনি আমাকে রেখে কেন চলে গেলো? কিভাবে পারলো আমাকে এভাবে হসপিটালে রেখে চলে যেতে? উনি কি মানুষ? মা ঠিকই বলে উনি একটা অ'মানুষ।
— শান্ত হ বোন আমার, এতোটা উত্তেজিত কেন হচ্ছিস? তোর শরীরটা দূর্বল।
অনু বারবার একই কথা বলে অরুকে শান্ত করতে চাইছে কিন্তু কাজ হচ্ছেনা, ক্রীতিকের জন্য অরুর জান বেরিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে রোগীর এহেন কা'ন্নাকাটি শুনে ছুটে আসে নার্স, পরক্ষণে তারাই ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পারায় অরুকে।সেই ঘটনার আজ দুদিন হতে চললো, ক্রীতিকের আর কোনো খোজ খবর পায়নি অরু, কি করেই

বা পাবে? নিজেই সারাদিন ইনজেকশনের উপর ছিল, খোঁজ নেওয়ার সময় কোথায়? আর এখন যখন একটু একটু সুস্থতার দিকে ধাবিত হচ্ছে তখনও ক্রীতিক ওর খোঁজ খবর নিচ্ছে না, এটা কি মানা যায়? অরু মানতে পারছে না কিছুতেই, তাইতো বাইরে তাকিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে একমনে।
একটা দুঃস্বপ্ন, একরাশ অস্থিরতা আর এক বুক কান্না, এভাবেই সারাদিন কেটে যায় অরুর, সে বেলা ঠিক কতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়েছিল জানা নেই ওর, চোখ মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে, সুন্দর ফিনফিনে ঠোঁট গুলো ফুলে কমলার কোষের মতো হয়ে আছে, সেখানটায় এখনো ক্রীতিকের দেওয়া গভীর ভালোবাসার ক্ষতগুলো সুস্পষ্ট, অথচ ক্রীতিক কোথাও নেই। দার্জিলিং এর পাহাড়ি বাঁকে হারিয়ে যাওয়া সুন্দর দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে অরু যখন ঘুমিয়েই যাচ্ছিল ঠিক তখনই কেভিনের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে অনু। ওর হাতে কিছু খাবারের বক্স। অনু খাবারের বক্সগুলোকে একপাশের টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে অরুকে বললো,—- সরি'রে, তোর পছন্দের খাবার গুলো বানাতে বানাতে দেরি হয়ে গেলো।
— আপা প্রত্যয় ভাইয়া কই রে?
অরুর প্রশ্নে অনু একটু দোনোমোনো করে বলে ওঠে,
— হঠাৎ প্রত্যয়ের খোঁজ করছিস যে?
অরু শোয়া থেকে উঠে, আধশোয়া হয়ে বসে পরলো, অতঃপর খুব শান্ত স্বরে বললো,
— জায়ান ক্রীতিক মঙ্গল গ্রহে থাকলে প্রত্যয় ভাইয়াও সেখানেই আছে, সেটা আমি ভালো করেই জানি।

অনু একটা শুষ্ক ঢোক গিলে বললো,
— হ্যা ঠিকই বলেছিস, প্রত্যয়ও ক্রীতিক ভাইয়ার সাথে ফিরে গিয়েছে।
— তাহলে তোকে নেয়নি কেন?
অরুর কথায় অনু একটু ইতস্তত কন্ঠে অরুর উপর জোর খাটিয়ে বললো,—বা'রে তুই এখানে অসুস্থ, হসপিটালে পরে থাকবি আর আমি তোকে রেখে বিদেশ চলে যাবো, এটা হয় বল?
অনুর কথায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অরু, পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে বললো,
—- আপা তোর ফোনটা দে তো?
—- কি করবি? আমার কাছে তো ক্রীতিক ভাইয়ার নাম্বার নেই।
অনুর ইতস্তত কন্ঠস্বর শুনে অরু ভ্রু কুঁচকে বললো,
— এমন করছিস কেন আজিব?প্রত্যয় ভাইয়াকে কল দেবো, এখন দে।
অরু এমন ভাবে ফোন চাইলো যে, অনুর করনীয় আর কিছু নেই,অগত্যা নিজের ফোন বাড়িয়ে দিলো অরুর হাতে, ফোন পেয়ে অরু সবার আগে কল দিলো ক্রীতিকের ইউ এস এ এর নাম্বারে কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত নাম্বারটা বন্ধ।
তাই এবার দ্বিতীয় কলটা টুকলো প্রত্যয়ের নাম্বারে,আর সব সময়ের মতোই ক্রীতিক ফোন না তুললেও আদর্শ স্বামীর মতো দুইবার রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন তুললো প্রত্যয়, এপাশ থেকে অরু কিছু বলার আগেই প্রত্যয় তাড়া দিয়ে বললো,— হ্যা জান বলো, আমি একটু ব্যস্ত আসলে ক্রীতিক ভাই....
—হ্যালো!

অনুর বদলে অরুর কন্ঠস্বর শোনা মাত্রই থেমে গেলো প্রত্যয়,তারপর দুইপাশেই কিছুক্ষণ নিরবতা, প্রত্যয় চুপ হয়ে আছে দেখে অরু আগ বাড়িয়ে বললো,
— ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন?
প্রত্যয় চট জলদি প্রত্যুত্তর করলো ওপাশ থেকে,
— হ্যা অরু, কিছু বলবে?
প্রত্যয়ের আস্কারা পেয়ে অরু চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো,অতঃপর জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে কা'ন্না গুলো গলায় আটকে রেখে বললো,
— ওনাকে দিন, বলুন আমি কথা বলতে চাই।
অরুর কথার বিপরীতে প্রত্যয় নির্লিপ্ত কন্ঠে বললো,
— অরু, ভাইতো মিটিং এ আছেন, বুঝতেই তো পারছো মাত্র দিন দশেক হলো আমেরিকা ফিরেছে সময়টা ব্যস্ততার।
অরু শক্ত গলায় প্রত্যয়কে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে,— বলুন যে আমি কথা বলবো। আমার চাইতে ইম্পর্টেন্ট ওনার জীবনে আর কিছু নেই, থাকতে পারেও না।
প্রত্যয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— ভাই সত্যিই তোমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী নয় অরু, তুমিকি খেয়াল করোনি যে ভাই তোমাকে ফেলে চলে এসেছে? এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে দাঁড়াও ভাইকে মিটিং এর মাঝখানেই ফোন হ্যান্ডওভার করছি, বাট সবার মাঝে তোমাকে উল্টাপাল্টা বললে আমার কিছুই করার নেই।
এবার সত্যি সত্যি দমে গেলো অরু, ঠিকই তো সবাই একই কথা বলছে, ক্রীতিক ইচ্ছে করে ওকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে, আর এখন ফোনটাও তুলছে না,কথাও বলতে চাইছে না। এই দূরত্বের

কারন জানা নেই অরুর, কিন্তু ক্রীতিক যে ওকে স্পষ্ট সবার সম্মুখে ইগনোর করছে, এড়িয়ে যাচ্ছে, সেটা ভালোই বুঝতে পারছে অরু। তাই প্রত্যয়কে তৎক্ষনাৎ থামিয়ে দিয়ে ও বললো,— লাগবে না থাক, বলবেন সময় হলে অন্তত একটা কল দিয়ে যাতে যোগাযোগ করে, আমি অপেক্ষা করবো।

—- ঠিক আছে।

ছোট্ট করে উত্তর দিয়ে পিক পিক আওয়াজে কল কেটে দিলো প্রত্যয়।

কথাশেষ হলে অনুর দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিয়ে অরু ছলছল চোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে ,

—-আপা, জায়ান ক্রীতিক তাহলে সত্যিই আমাকে রেখে চলে গিয়েছে, আর এখন আমার সাথে কথাও বলতে চাইছে না। কি দো'ষ করলাম আমি আপা? সবকিছুতো ভালোই চলছিল, তাহলে হঠাৎ এভাবে অবহেলা করার কি মানে আছে বলনা?

বোনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনু গাঢ় গলায় বললো,— আগেই বলেছিলাম তোকে, ক্রীতিক ভাইয়া মানুষটা সুবিধার না,শুনিস নি তুই, প্রেমের তোপে নিজের শরীর হৃদয় সবকিছু তাকে দিয়ে, এখন নিজের সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছিস।

অনুর কথার পাছে অরু শুধুই চুপচাপ চোখের জল ফেললো, ওর আর এই মূহুর্তে বলার মতো কিছুই নেই।কাকে নিয়েই বা বলবে? যে ওকে হসপিটালে ফেলে রেখে সেই সূদুর আমেরিকায় ফিরে গিয়েছে, তাকে নিয়ে? সেটা কি আদৌও শোভা পায়? না পায়না, মোটেই পায়না, তীব্র অভিমান আর বিচ্ছেদের যন্ত্র'নায় অরুর কলিজা ধরে আছে, এই মূহুর্তে ওই পা'ষান, হৃ'দয়হীন, অভ'দ্র

লোকটাকে নিয়ে আর একটা কথাও নয়।বেলা বেজেছে অনেক,তবে আজ রোদ ওঠেনি, আকাশ ছেয়ে আছে কালো মেঘের চাদরে। তবুও ভ্যাপসা গরম চারিদিকে, বাগান বিলাশের গাছ গুলোও শূন্য পরে আছে, কোনোরকম ফুল না ফোঁটায় ক্রীতিক কুঞ্জের বিশাল গেইট টাকেও কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে।
ক্রীতিকের খালি পরে থাকা রুমের জানালা দিয়ে মহল থেকে মেইন গেইট অবধি স্পষ্ট দেখা যায়, আপাতত ক্রীতিকের শূন্য রুমের দোলনায় বসে, হাঁটু ভাজ করে তাতে মাথা ঠেকিয়ে সেই ফুলবিহীন বাগানবিলাশ গুলোই একধ্যানে পর্যবেক্ষন করছে অরু।
পড়নে ক্রীতিকের শার্ট,তাতে লেগে আছে ক্রীতিকের গন্ধ, চোখ দুটো নির্ঘুম আর ক্লান্ত। মুখের আদলে বিষ'ন্নতা আর ব্যথার ছড়াছড়ি, আজ প্রায় একমাস হয়ে গিয়েছে অরু হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরেছে, অথচ গত একমাসে একটাও খবর পায়নি ক্রীতিকের।প্রথম প্রথম নিজের আত্ম সম্মানের মাথা খেয়ে পা'গলের মতো কল করে গিয়েছে প্রত্যয়কে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ক্রীতিক ওর সাথে কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, নানা ছুতোয় ফোন কল এড়িয়ে গিয়েছে, এভাবে যেতে যেতে এক পর্যায়ে অরু না চাইতেও যোগাযোগ করার চেষ্টাটা বন্ধ করে দিয়েছে পুরোপুরি। এর পরবর্তী দিন গুলো ছিল অরুর জন্য অত্যন্ত দূ'র্বিষহ আর চরম য'ন্ত্রনার,যে মানুষটা ওর খোঁজ নেয়না,কথা বলেনা,জানতে চায়না অরু কেমন আছে, আদৌও বেঁচে আছে নাকি ম'রে গিয়েছে, তার জন্যই কত রাত যে ফ্লোরে গড়াগড়ি খেয়ে চিৎকার করে কেঁ'দেছে তা কেবল এই মহলের চার দেওয়ালই জানে।মাঝে মধ্যে অষ্টাদশীর এমন ভালোবাসার কাতরতা চোখে সহ্য করা যেতো না, ওর

হৃদয়বি’দারক চি’ৎকার আর আ’হাজারিতে না চাইতেও বাড়ির ভৃত্যদের চোখের কোটর ভিজে উঠতো। এমনও দিন গিয়েছে সারারাতে ওয়াশরুম থেকেই বের হতোনা অরু, সারারাত শাওয়ারের নিচে বসে ভিজতে ভিজতে সেখানেই টালমাটাল হয়ে ঘুমিয়ে যেত। অথচ ওর এই কষ্ট, এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা ক্রীতিকের অগোচরেই রয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম লুটিয়ে পরে কেঁদে কেটে দুনিয়া ভাসালেও তারপরের কিছুদিন ইচ্ছে মতো ভা’ঙচুর করেছে ও।স্বামীর অবহেলায়, জিদে, দুঃখে, অসহ্য য’ন্ত্রনায় ও যেন পা’গল হয়ে যাচ্ছিল, হাতের কাছে যা পেয়েছে একটু পান থেকে চুন খসলেই তাই ভে’ঙে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। বাড়ির অর্ধেক জিনিস ভে’ঙে ফেলার পরেও কেউ টু শব্দটিও করেনি অরুর সাথে , কারন যে ভেঙেছে সে ক্রীতিক কুঞ্জের ছোট সাহেবের কলিজার টুকরো,এই বাড়ির আসল মালকিন, তাকে কিছু বলার সাধ্যি কার? তাছাড়া ক্রীতিক গতবার এসে সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় কিনে রেখে গিয়েছে, সুতরাং অরু যেটাই ভাঙুক না কেন, স্টোর রুমে সেটার রিপলেসমেন্ট এখনো সযত্নে রয়েছে।প্রথমে হৃদয়ভরা আবেগের জোয়ার, এরপর তীব্র জিদের বহিঃপ্রকাশ আর এখন কিছুদিন যাবত অরু একেবারে শান্ত। সারাদিনে মুখ ফুটে দু’টো কথা বলে কিনা সন্দেহ, কথা বলা তো দূরে থাক দু’বেলা খাওয়া ছাড়া ক্রীতিকের রুম থেকেই বের হয়না ও। সারাক্ষণ ক্রীতিকের রুমে দরজা আটকে বসে নয়তো শুয়ে থাকে। মাঝেমাঝে কাঁদে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুকের ব্যথা সংবরণ করে, তবে সেটা সবার আড়ালে নিঃশব্দে।

ছোট্ট মস্তিষ্কটা কখনো কখনো কষ্টে ফেটে যায়,কখনো বা অভিমানে, তবে আজকাল অরুও নিজেকে সামলে নিতে চাইছে, অরুর অযাচিত অভিমানী মন বলে, যে মানুষটা অরুকে দেখতে চায়না, তার জন্য এতোটা বিরহ মানায় না,

—হি ডাজ'ন্ট ইভেন্ ডিজার্ভ ইট,ফা'কিং বা'স্টা'র্ড। ক্রীতিককে সবচেয়ে খা'রাপ গা'লিটা দিয়েও মন ভরছে না অরুর, ইচ্ছে তো করছে সামনে পেলে খামচে খুমচে সুন্দর চেহারাটার স্ট্রাকচারই বদলে দিতে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার জন্য হলেও তো তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে হয়, সেটাই তো দেখতে পারছে না অরু, ক্রীতিক কেন বদলে গেলো এভাবে? কোন অপ'রাধের শা'স্তি সরূপ অরুকে বেচে থাকতেই মৃ'ত্যুদ'ন্ড প্রদান করা হলো, সেই কারণ ভাবতে ভাবতেই আরও একদফা নিঃশব্দে টপাটপ চোখের জল ফেললো অরু। পরক্ষণেই তা মুছে নিলো হাতের পিঠ দিয়ে। ঠিক তখনই নিচ তলা থেকে ভেসে এলো অনুর গলার আওয়াজ,—-

অরুউউ,দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলোতো, খাবি না?

বুক চিড়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের করে সাড়া দিলো অরু,

— আসছি আপা।

বিয়ের পরে অনুর এক মাথা দ্বায়িত্ব বেড়েছে বৈকি, কমেনি। এখন ওর সংসার হয়েছে দুটো। দুটো সংসারই সমান তালে সামলাতে হয় অনুকে, তারউপর ভার্সিটি তো আছেই। প্রতিদিন অন্তত দু'বার করে এ বাড়ি ও বাড়ি করতে হয় ওকে। এ বাড়িতে যেমন অসুস্থ মা আর ভগ্নহৃদয়ের বোনটাকে সামলাতে হয়, তেমনই ও বাড়িতে দু'জন মা বাবার ও দেখভাল করতে হয় অনুকে।এতো দ্বায়িত্ব পালন করেও অনুর সুখের অভাব ছিলোনা, যদি না চোখের সামনে নিজের

ছোট্ট বোনটাকে এভাবে তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখতে হতো। এখন ভালোয় ভালোয় অরুটা নিজেকে সামলে নিতে পারলেই হলো, সেই ভেবেই আপাতত সস্থির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো অনু।
অনুর কথামতো খেতেই বেড়িয়েছিল অরু, কিন্তু করিডোরের মাঝপথে মায়ের রুম থেকে ভেসে আসা কিছু কথোপকথন শুনে অকস্মাৎ থমকে গেলো অরুর পা, ভেতরে মামি কিছু বলছে হয়তো, যা স্পষ্ট নয়, মামির কথাগুলো স্পষ্ট শোনার উদ্দেশ্যে এবার আরেকটু পিছিয়ে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাড়ালো অরু, তৎক্ষনাৎ কানে এলো মাকে দেওয়া মামির কুটিল শ'লাপরামর্শ,—- অরুকে এভাবে কতদিন রেখে দেবে? ওই ছেলে তো আর ফিরবে বলে মনে হচ্ছে না, না ফিরলে তোমারই লাভ, এখন ভালোয় ভালোয় অরুর বিয়েটা দিয়ে দাও।
—-কিন্তু,
আজমেরী শেখের চিন্তিত কন্ঠস্বর শোনা গেলে, জাহানারা পুনরায় মা'কে আস্বস্ত করে বললেন,
— জানি জানি, মেয়ে তোমার সতীসাবিত্রী নেই, তার উপর অনুর বিয়ের দিন সকলের সামনে ভরা মজলিসে যা খেল দেখালো ওই ছেলে, তারপর আর পাত্র পাবেও না ওর জন্য, তার চেয়ে বরং একটা কাজ করো আমার রেজার সাথেই না হয় অরুর বিয়েটা, না মানে আমি মুখ থেকে একবার বললে আমার ছেলে কিন্তু না করবে না, তাতে তোমার মেয়ে যতই অন্য ছেলের সাথে শু'য়ে আসুক,আমার ছেলে আমার কথা…—- এক্ষুনি থামো মামি!

অরুর কঠিন আওয়াজে একপ্রকার লাফিয়ে উঠলো জাহানারা। তিনি হকচকিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখলেন অরু র’ণমূর্তি ধারন করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে,
—- আমার মায়ের কানে শি’শা ঢালা বন্ধ করো।
আজমেরী শেখ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন শুধু, এই মূহুর্তে অরুকে কিছু বলতে কেন যেন সায় দিচ্ছেনা তার মন, তাই বললেন ও না, চুপচাপ বসে রইলেন শুধু।
ওদিকে অরুর চাওনিতে ভেতরে ভেতরে একটু ভীত হলেও, উপরে মেকি সাহস ধরে রেখে জাহানারা চোখ রাঙিয়ে বলেন,
—- বেয়া’দব মেয়ে আড়ি পেতেছিস কেন?
অরুর নিজের চোয়ালটা শক্ত করে তেঁতো গলায় বললো,— আড়ি পেতেছি বেশ করেছি, আমার স্বামীর বাড়িতে আমার যা ইচ্ছে হবে আমি তাই করবো, তুমি বলার কে? দ্বিতীয়বার যদি আমার বাড়িতে এসব ব’স্তাপঁচা বিয়ের আলাপ শুনেছি, তাহলে এ বাড়িতে তুমি আর যায়গা পাবেনা মামি। আর তোমার ছেলের জন্য যদি এতোই মেয়ের অভাব হয়, তাহলে আমাকে বলো, মোখলেস চাচার মতোন বিপরীত লি’ঙ্গের কাউকে খুঁজে দেবো। তাও দয়া করে নিজের গোবর মাথার বুদ্ধি বিলাতে এসোনা এখানে।
মামির মুখের উপর একনাগাড়ে কতগুলো কথার তী’র নিক্ষেপ করে হনহনিয়ে রুম ত্যাগ করে অরু। আজমেরী শেখ এখনো মেয়ের যাওয়ার পানে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আজ হুট করেই অরুর মাঝে নিজের যৌবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন তিনি, সাধারণত অনুর মাঝে একটু আধটু দাম্ভিকতা থাকলেও অরুর মাঝে তা পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু আজ যখন হুট করেই

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলো, তখন অরুও কঠোর দাম্ভিকতা নিয়ে ঝাঁজালো এক ক্রুদ্ধ কন্ঠে প্রতিবার করলো অন্যা'য়ের, যা আজমেরী শেখকে অনেকটাই বিস্মিত করেছে। মায়ের রুম থেকে আর নিচে খেতে যাওয়া হলোনা অরুর, ও তৎক্ষনাৎ বেড়িয়ে দৌড়ে চলে এসেছে নিজের রুমে। রুমে ফিরে আজ আবারও বহুদিন বাদে ল্যাপটপ নিয়ে বসলো অরু, অর্নগল চোখের জল ফেলতে ফেলতে ইমেইলে গিয়ে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে টাইপ করতে লাগলো কাঁপা হাতে ,

—- টলটলে প্রেমের জোয়ারে বানভাসি হৃদয়টা যে তুমিহীন খরায় চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে, কোথায় তুমি জায়ান?

অরু বার্তা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে রিপ্লে এলো,

— আমি আছি তোমার অস্তিত্বের মিশেলে নিভৃতে, চোখ দিয়ে নয় মন দিয়ে খোঁজো, মস্তিষ্কে নয় হৃদয়ে অনুভব করো, বিলিভ মি, ঠিক খুঁজে পাবে, হার্টবিট। হুট করে এমন একটা রিপ্লে পেয়ে খুব অবাক হলো অরু, অবাকের চরম সীমানায় পেছনের ইমেইল গুলো চেক করতে লাগলো একে একে, যেখানে ওর করা প্রত্যেকটা ইমেইলের আলাদা আলাদা রিপ্লে করেছিল ক্রীতিক।

আর সর্বশেষ যে ম্যাসেজটা ছিল,

— দেখতে পাচ্ছি না, ছুঁতে পাচ্ছি না, ভুলতে পারছি না, তবুও তুমি আছো, এ তোমার কেমন থাকা জায়ান ক্রীতিক?

ঠিক সেই ম্যাসেজের রিপ্লে ছিল এটা,— আমি আছি তোমার অস্তিত্বের মিশেলে, চোখ দিয়ে নয় মন দিয়ে খোঁজো, মস্তিষ্কে নয় হৃদয়ে অনুভব করো, বিলিভ মি,ঠিক খুঁজে পাবে, হার্টবিট।

এরপরের ম্যাসেজ গুলোতে ক্রীতিক অটোমেটিক এই রিপ্লেটাই সেট করে রেখে দিয়েছে, যার ফলরুপ বার্তা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লে এসেছে।
আর এই মূহুর্তে এতোকিছু অবলোকন করার পরে অরুর দৃঢ় মন বলছে,
—- এই মানুষটা কোনোদিনও আমাকে ভুলতে পারেনা, মানুষটা নিজেকে নিজে ভুলে যেতে পারে কিন্তু আমাকে নয়, এটা অসম্ভব। তৎক্ষনাৎ ল্যাপটপ ফেলে রেখে সোজা নিজে গিয়ে অনুর হাত থেকে ফোন ছি'নিয়ে নিয়ে প্রত্যয়ের নাম্বারে কল লাগালো অরু। ওপাশ থেকে কল রিসিভ হতেই অরু তীক্ষ্ণ গলায় বললো,—- আমার জায়ান ক্রীতিক কোথায়?
— অরু, আসলে,
প্রত্যয়কে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অরু পুনরায় বলে ওঠে,
—- অরু নই, মিসেস জায়ান ক্রীতিক বলছি, আপনার বসের ওয়াইফ, আমার হাসবেন্ড কোথায়?
অরুর কথায় এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলো প্রত্যয়, কিছুক্ষন দোনোমোনো করেও অরুকে লক্ষ্যচ্যুত করা যাচ্ছে না মোটেই, মনে হচ্ছে আজ অরু ব্যাটে বলে ছক্কা হাঁকিয়েই ছাড়বে। তবুও কিঞ্চিৎ গলা উঁচিয়ে প্রত্যয় বলে ওঠে,
— ভাই আসলে….
— একটু ও কপটতা নয়, ছাফছাফ উত্তর দিন, নয়তো মিসেস জায়ান ক্রীতিক হিসেবে নিজের ক্ষমতা গুলো ব্যাবহার করতে বাধ্য হবো আমি।

অরুর কথা শেষ হতেই একটা বড়সড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রত্যয় বললো,— ভাই সানফ্রান্সিকোতেই আছে, গত সপ্তাহেই লস এঞ্জেলস থেকে এখানকার হসপিটালে সিফট করা হয়েছে ভাইকে,ব্রেইনে বেশ কিছু অ'স্রপচার করার দরুন এখনো জ্ঞান ফেরেনি, তবে এখানকার ডক্টররা আশা করছেন খুব শীঘ্রই সেটা ফিরবে।
প্রত্যয় আরও কি কি বলেছে তা আর কান অবধি পৌঁছায়নি অরুর, ও ফোনটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে, কিছুক্ষন কষ্ট করে ভেতর থেকে শ্বাস টেনে তুললো,অতঃপর ধপ করে মেঝেতে বসে গগন কাঁপানো চি'ৎকার দিয়ে কেঁ'দে উঠলো, কি ভীষণ য'ন্ত্রনাদ্বায়ক সেই কা'ন্নার আওয়াজ বলে বোঝানোর নয়।
দু'হাতে নিজের চুল গুলো নিজেই টেনে ধরে চি'ৎকার করে কাঁদছে অরু, ও এতোদিন ধরে কি ভেবে এসেছে? কতোটা ভুল বুঝেছে অথচ ওর স্বামী দিনের পর দিন মৃ'ত্যু'র সাথে পাঞ্জা লড়েছে, এখনো লড়ছে।
এতোদিন তো যা ছিল ভালোই ছিল, কিন্তু এই ভুলের ব্যথা কি করে সইবে অরু? কার ভালোবাসায় স'ন্দেহের আঙুল তুললো ও? ছিহ!
বিশাল হলরুমের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পরে হৃদয় চিড়ে চিৎ'কার করছে অরু, ওর কা'ন্না দেখে পুরো মহল কাঁদছে, তখনো মহল্লার সরু গলি ভেদ করে অস্পষ্ট আওয়াজে অরুর কানে ভেসে আসছে মিনারের গাওয়া দুটো ব্য'থাতুর গানের লাইন,” “আহারে আহারে, কোথায় পাবো তাহারে,
যে ছিলো,
মনেরই গহীন কোণে””দিনের দ্বি-প্রহর চলমান, দুপুরের ভাতঘুমে বিভোর পুরো মহল্লা। আকাশের ধূসর মেঘ টুকু ধীরে ধীরে কেটে

গিয়ে তীক্ষ্ণ সূর্য কীরণে ছেয়ে গিয়েছে ক্রীতিক কুঞ্জ। পুরো গলি ফাঁকা, সেই সাথে ফাঁকা পরে আছে সুবিশাল বাড়ির লন টাও। এই তো মাস দেরেক আগেও ক্রীতিকের বন্ধুদের হৈ-হুল্লোড় আর কথার বহরে সর্বক্ষন জমজমাট হয়ে উৎসব মুখর পরিবেশ ঘিরে থাকতো বাড়িটায়, দীঘির পারের বৈঠক খানায় বিকেল হলেই বসতো চায়ের আসর।

অথচ মাত্র এই কয়েক দিনের ব্যবধানে সব আনন্দ উল্লাস কেমন ফিকে হয়ে গেলো, বাড়িটা সেই আগের ভূতুড়ে বাড়ির মতোই ঝিনঝিন করছে এখন,চারিদিকে কেউ নেই, কেউ নেই গন্ধটা মা'রাত্মক পীড়া দিচ্ছে আজকাল। আর এখন এই মূহুর্তে যা সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছে,তা হলো ক্রন্দনরত অরুর চি'ৎকার।ওর কান্নার আওয়াজ মহলের চার দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কর্ণকূহরে,যা আরও বেশি ব্যথাতুর শোনাচ্ছে। আজ থেকে বছর খানিক আগেও কি কেউ জানতো? যে অরু নিজের বিলেত বাসী সৎ ভাইয়ের জন্য এভাবে আ'র্তনাদ করবে কোনোদিন ? না জানতো না, অরু নিজেও হয়তো জানতো না,কোনোদিন কল্পনাও করেনি, অথচ সময় ওকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এলো, সবচেয়ে অপছন্দের আর বিরক্তিকর সেই ভাইয়াটার জন্য অরুর এখন কষ্টে দুঃখে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে চোখের সামনে দুনিয়াটা দুলছে, মানস্পটে ভেসে উঠছে শুধু একটা মুখ, একজোড়া ঘোর লাগানো চোখ, নাকে এসে স্পর্শ করছে একটা পছন্দের সুঘ্রাণ, আর কর্ণকূহরে বাড়ি খাচ্ছে গাঢ় গলার আওয়াজে ডাকা একটামাত্র শব্দ,— তুই আমার "হার্টবিট"।

গত একমাস ধরে মানুষটার উপর দিয়ে কি কি গিয়েছে কে জানে? আচ্ছা কতটা আ'ঘাত পেয়েছেন উনি? আগের বার ও তো মাথায় আ'ঘাত পেয়ে হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছিল,এখন আবারও। এই একমাসে কি একবারও অরুর কথা মনে পরেছিল চেতনাহীন ক্রীতিকের?সব কিছু কবে আবার আগের মতো হবে?আচ্ছা ক্রীতিক আদৌও বাঁচবে তো?নিজের মনে পায়তারা করে বেড়ানো হাজারো অনিশ্চিত প্রশ্নের জালে জড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ কেঁদে চলেছে অরু। ওর ভালো লাগছে না,দম বন্ধ হয়ে আসছে,মুখের সমগ্র ছড়িয়ে পরেছে নিমের মতো তেঁতো স্বাদ,গলাটা শুকিয়ে কাঠ, চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট আর ঝাপসা, দেখে মনে হচ্ছে এখনই মূর্ছা যাবে মেয়েটা।
ওদিকে অরুর এহেন আর্তনাদ শুনে উপর থেকে ছুটে আসেন আজমেরী শেখ আর জাহানারা। অনু ডাইনিং এ খাবার পরিবেশন করছিল, ছোট বোনকে হঠাৎ এভাবে ভেঙেচুরে পরে কাঁদতে দেখে ও দৌড়ে আসে হলে, তরিঘরি করে হাঁটু ভেঙে বসে দু'হাতে আগলে ধরে অরুকে। অনু অরুকে ধরে রেখেছে ব্যাপার বোধগম্য হতেই তৎক্ষনাৎ শরীরের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে অনুকে একটা ঝটকা মে'রে দূরে সরিয়ে দেয় অরু।
অরু সরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অনু পুনরায় অরুর দিকে এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে,— অরু,বোন আমার, শোন একটু আপার কথাটা,
অনু আবারও অরুকে ছুঁতে চাইলে অরু হাতে ভর করে দূরে সরে গিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে,
— একদম ছুবি না আমায়, তোরা সবাই মি'থ্যেবাদী।

অনু আকুতি ভরা কন্ঠে ফুপিয়ে উঠে বললো,
— শোন একটু।
অনুর কথার পাছে অরু কাঁদতে কাঁদতে বললো,— কি শুনবো? আবার কি গল্প শোনাবি তোরা আমাকে? আমার স্বামী মা'রা যাচ্ছে আপা,গত একটা মাস ধরে অপারেশন থিয়েটারের কামরায় দিনরাত অতিবাহিত করছে, অথচ আমি কিচ্ছুই জানিনা। উল্টো তোরা আমাকে দিনের পর এটা বুঝিয়ে এসেছিস কি,আমার জায়ান ক্রীতিক আমার সাথে কথাই বলতে চায়না, আমার সাথে দূরত্ব বাড়াতে চায় বলে আমাকে রেখেই ইউ এস এ ফিরে গিয়েছে, কেনো আপা?কেনো তোরা আমার সুন্দর অনুভূতি গুলোকে এভাবে পায়ে পিষে ফেললি বল? শুধু তো ভালোই বেসেছি, অন্যায় তো করিনি।
অরুর এতো এতো অ'ভিযোগের পাছে অনু ডুকরে কেঁদে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতে নাক টেনে বললো,
— আমার কথাটা তো একটু শোন।অরুর মাথা ঠিক নেই, এই মূহুর্তে হৃদয় আর মস্তিষ্ক জুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধুই জায়ান ক্রীতিক, এছাড়া আর কোনো কিছু শোনার অবস্থাতে নেই ও। তাই অনুর কা'ন্নাকাটিকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে টলতে টলতে হলরুম ত্যাগ করে অরু, হেলেদুলে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে ধরা গলায় বলে,
— সবাই ঠকিয়েছে আমায়, আমার আপা ও।
অরু ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে, আজমেরী শেখ সেদিকে তাকিয়ে শান্ত নির্জীব গলায় বললেন,
— কেউ ঠকায়নি তোমাকে,বরং বাঁচিয়েছে।

মায়ের কথায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেঁসে রুমে ঢুকে ধাপ করে দরজা লাগিয়ে দিলো অরু। গভীর রাতে পিক পিক করে দরজার পাসওয়ার্ড খোলার আওয়াজে আচমকা তন্দ্রা ছুটে গেলো নীলিমার। তবে তীব্র জ্বরের দাবদাহে ঝাপসা চোখ দুটো খুলে রাখা যাচ্ছেনা মোটেই। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, মাতাল মানুষের মতোই একমনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে নীলিমা। কোথায় আছে, কি করছে, কেন করছে, কিছুই বোধগম্য নয় ওর। শুধু মনে হচ্ছে খোলা আকাশের শূন্যতায় আপন মনে গা ভাসাচ্ছে ও। একটু পর রুমে এসে হাজির হলো সায়র, হাতে একটা খাবারের পার্সেল, চোখ মুখ বি’ষন্ন, দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে ফিরেছে মাত্র। রুমের ভেতরে প্রবেশ করে, জ্বরে কাতরাতে থাকা নীলিমাকে দেখে বুক চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো সায়রের। গত দেরটা মাস ধরে ওদের চারজনের দিন আর রাত সমান হয়ে গিয়েছে, কখনো লস এঞ্জেলস তো কখনো সানফ্রান্সিসকো, মোট কথা প্রাইভেট জেটে একপ্রকার ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেছে ওরা চারজন। তবুও আজ এতোগুলো দিন পর একটু স্বস্তিতে বাড়ি ফিরেছিল সায়র, কারন ক্রীতিকের জ্ঞান ফিরেছে আজ সকালেই। যেখানে ওর বাঁচার সম্ভাবনাই ক্ষীণ ছিল, ইন্ডিয়ান ডক্টররা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে ওরা তিনজন বন্ধু হাল ছাড়েনি কখনো।
এশিয়ান ডাক্তারদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্রীতিককে সেদিনই এমার্জেন্সী ফ্লাইটে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ইউ এস এ। যার ফলসরুপ উপর ওয়ালার অশেষ রহমত,এবং এলিসা,অর্ণব আর সায়রের দৃঢ় মনের জোরে আজ এই পর্যন্ত ফিরে এসেছে ক্রীতিক। কিন্তু সায়রের এহেন দিনের পর দিন অনিয়মিত জীবন যাপন আর দিনরাত

ডেইলি প্যাসেঞ্জারীতে আরেকজন যে একাকী বি’ষন্নতায় দিন কাটাতে গিয়ে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল তা আর ঠাওর করে উঠতে পারেনি সায়র। বন্ধুমহলের সব থেকে স্ট্রং আর দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন বেস্ট ফ্রেন্ডের এমন জীবন ম’রণের সন্নিহিত সময়ে দাঁড়িয়ে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করার কথা যেমন নয়। ঠিক তেমনই, এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়ে সায়রও পারেনি নীলিমার যত্ন নিতে, ওকে যথাযথ মূল্যয়ন করতে, যার ফলে নীলিমা আজ পুরোপুরি বিছানা সজ্জায়।
ভাগ্যিস নীলিমার আব্বাজান এখানে নেই, নইলে আদরের মেয়ের এমন নাজেহাল অবস্থা দেখে তিনি সায়রের কয়টা হাড্ডি আস্ত রাখতেন সেটাই ভাবনার বিষয়।
নিরবে নীলিমাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষন করতে করতে আবারও দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো সায়রের বুক চিড়ে। পরক্ষণেই নিজের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে একনজর ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখলো সায়র।দেখলো, রাত তখন দের টার কাছাকাছি।এতো রাত হয়ে গিয়েছে অথচ এখনো নীলিমার কিছুই খাওয়া হয়নি, সেই ভেবে সায়র তাড়াহুড়ো করে জামা কাপড় ছেড়ে পাজামা সেট গায়ে চড়ালো, অতঃপর পার্সেলের খাবার গুলো প্লেটে করে নিয়ে এলো নীলিমার কাছে, নীলিমা তখনো একমনে বিড়বিড়াচ্ছে।
সায়র ওকে আলগোছে নিয়ে নিজের বুকের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে একটু একটু করে খাবার তুলে দিতে লাগলো নীলিমার মুখে, নীলিমা কতক্ষণ চিবুচ্ছে তো কতক্ষণ খাবার গালে নিয়ে থম মে’রে বসে আছে। ওর মাথাটা টলছে, সায়র নিজের ঘাড়টা বাকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে শুধালো,

— কি হলো খাচ্ছো না কেন? বেশি খারাপ লাগছে?
নীলিমা চোখ বুজেই হ্যা সূচক মাথা নাড়ালো।— এই তো আমি ফিরে এসেছি, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে,আমি সব ঠিক করে দেবো,তোমাকে আর একা থাকতে হবে না, সায়র মোটেও বউকে অবহেলা করার মতো ছেলে নয়। একটু সুস্থ হও তারপর পুরো আমেরিকা চষে বেড়াবো আমরা দুজন, প্রমিস।
একমনে কথাগুলো বলে আবারও নীলিমার মুখে খাবার তুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পরলো সায়র।
একেএকে খাবার আর অষুধ খাইয়ে, হাত পা মুছিয়ে নীলিমাকে পুনরায় বেডে শুয়িয়ে দিলো সায়র। অতঃপর সবকিছু গুছিয়ে রাখতে বেড ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। তৎক্ষনাৎ পেছন থেকে সায়রের আঙুলটা টেনে ধরে অস্পষ্ট গলায় নীলিমা বললো,— আমার শীত করছে, এখানে অনেক ঠান্ডা। জলদি আসুন।
সায়র ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলো, সত্যিই নীলিমার চিবুক কাঁপছে থরথরিয়ে, মনে হয় জ্বরটা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, অথচ নীলিমার শরীরে দু’দুটো কম্ফোর্টার।
সায়র ব্যাচেলর মানুষ, নীলিমাকেও এনে উঠিয়েছে নিজের ছোট্ট এপার্টমেন্টে, এখনো জিনিসপত্র সেরকম কিছুই কেনা হয়নি, বাসায় আর কোনো কম্ফোর্টারও নেই, এদিকে সায়রের নিজেরও শীত করছে আর নীলিমাও শীতে অস্থির হয়ে উঠেছে, কি করা যায় এখন? সেই ভেবে, পরিশেষে নিজেদের পরিস্থিতি পরখ করে, সায়র অনেক কিছু ভেবেচিন্তে আজ প্রথমবারের মতো নীলিমার সাথে এক বিছানায় এক কম্ফোর্টারের নিচে শুয়ে পরলো। সঙ্গে সঙ্গে আদুরে বিড়াল ছানার মতো ওর বুকের মধ্যে এসে ঠায় নিলো

নীলিমা। নীলিমা এভাবে কাছে আসায় সায়র একটুও ইতস্তত বোধ করলো না। আর নাতো, ওর মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কোনো অবাধ্য পুরুষালী ইচ্ছে। উল্টো নীলিমার কম্পনরত শরীরটাকে নিজের বুকে আগলে নিয়ে ওর উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে লাগলো নীলিমার সর্বাঙ্গে,কিছুক্ষণ যেতেই নীলিমা কাঁপা-কাঁপি থামিয়ে একটু শান্ত হয়ে এলে সায়র ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে হিসহিসিয়ে শুধালো,
— এখন ভালো লাগছে?
নীলিমা প্রথমে হ্যা না দু'দিকেই মাথা নাড়ালো, অতঃপর কোনোরকম কথা বার্তা ছাড়াই সায়রকে বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বানিয়ে দিয়ে, নিজের শরীরের উপরিভাগে এটে থাকা সবটুকু সম্ভ্রম টেনেটুনে খুলে ফেললো। নীলিমার এহেন কান্ডে সায়র চোখ বড়বড় করে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো ,—- এই মেয়ে কি করছো তুমি? আমি এসব জীবনেও দেখিনি, এক্ষুনি ঢাকো।
সায়রের কথার দু'পয়সা পাত্তা না দিয়ে ওকে পুনরায় শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নীলিমা বিড়বিড়িয়ে বললো,
— গরম লাগছে তো।
—কি আজিব মুড সুইং রে বাবা, একটু আগে শীত শীত করে মাথা খারাপ করে ফেলছিল, এখন আবার হুট করেই গরম লাগছে।
মনেমনে হাজারটা যুক্তি দাড় করালেও বস্তুত সায়র এই মূহুর্তে কথা বলার অবস্থাতেই নেই, ও নিজের হাত-পা, দাঁত সবকিছু খিঁচিয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, এক্ষুনি পানি খাওয়া প্রয়োজন, নীলিমার তুলতুলে শরীরের স্পর্শে ক্রমশ একটা ভেজা নরম অনুভূতি ছড়িয়ে পরছে সায়রের মন মস্তিষ্ক

জুড়ে, সেই ছড়িয়ে পরা বেসামাল অনুভূতির জোয়ারে কাবু হয়ে যাচ্ছে সায়রের ভালো মানুষী সত্তাটা, ওর হৃদয়টা অবাধ্য কিছুর আস্কারা দিয়ে যাচ্ছে বারবার। কিন্তু সেটাতো সম্ভব নয়, নীলিমা এমনিতেই জ্বরের ঘোরে বুদ হয়ে আছে, তারউপর সম্পর্কটা এখনো এতোটা স্বাভাবিক হয়নি,অগত্যা উপয়ান্তর না পেয়ে সায়র দু-হাত মুঠি বদ্ধ করে দাঁত খিঁচিয়ে নিজের মনটাকে ধমকাচ্ছে ক্রমাগত, নিজেকেই নিজে চোখ রাঙিয়ে বলছে,

—- কন্ট্রোল সায়র, কন্ট্রোল ইওর সেল্ফ, তুই হলি জেন্টেল ম্যান, তুই কেন জেকের মতো অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিস, কন্ট্রোল, কন্ট্রোল,কন....

এভাবেই কন্ট্রোল বুলি আওরাতে আওরাতে কখন যে সায়র নিজেও উন্মুক্ত নীলিমাকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমের দেশে পারি জমিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।সেদিনের ঘটনার আজ প্রায় একসপ্তাহ হতে চললো। সেই যে অরু ঘর মেড়েছিল আজ অবধি আর বের হয়নি, কেউ খাবার দিয়ে গেলে খেয়েছে, নয়তো না।

এর মাঝে অনু অনেকবার এসেছিল অরুর সাথে একটু কথা বলতে কিন্তু প্রত্যেকবারই দরজার বাইরে থেকে ফিরে যেতে হয়েছে ওকে। এক কথায় অরু নিজেকেই নিজে ঘরবন্দী করে ছেড়েছে। অরুর দুচোখে সব কিছু ধোঁয়াসা, ও ক্রীতিককে দেখতে চায়, ক্রীতিককে ছুঁতে চায়, ক্রীতিকের কন্ঠস্বর শুনতে চায়, কিন্তু কিভাবে? ক্রীতিক যে সেই সূদুর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের সানফ্রান্সিসকো শহরে রয়েছে। আর অরু এখানে ক্রীতিক কুঞ্জে। নিজের মা বোনের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গিয়েছে অরুর,তাদের কাছে কখনোই সাহায্য চাইবে না ও। ওদিকে চেনা জানা কারোর

থেকে সাহায্য চাইবে তেমন কেউই নেই ওর জীবনে। কেইবা ওকে সাহায্য করবে অতো দূরের গন্তব্য পৌঁছাতে? সবাই তো আর ক্রীতিক নয়, যে অরু মুখ দিয়ে আ করলো অমনি সেটা মঞ্জুর হয়ে গেলো।
এক আকাশ পাতাল চিন্তায় জর্জরিত হয়ে সবসময় গুমোট হয়ে থাকে অরুর মন মস্তিষ্ক, ও ধরেই নিয়েছে ওর আর ক্রীতিককে দেখা হবে না। এই যে দেখা হবেনা, এটা ভাবলেই প্রচন্ড রকম য'ন্ত্রনা শুরু হয়ে যায় বুকের মাঝে, নিজের অজান্তেই মেয়েটা ছটফট করে ওঠে তৃষ্ণার্থ চাতকের মতো। অথচ সামনে পেছনে, ধারে দূরে, একটু খানি মাথায় হাত বুলিয়ে শান্তনা দেওয়ার মতো কেউ নেই ওর, কেউনা।ডোরাকে কোলে নিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছে অরু। ওর ভাবনারা যেন অন্তহীন। অরুর দুঃখ গুলো বোঝার সাধ্যি নেই ডোরার, ও শুধু উপলব্ধি করতে পারে অরুর ভারী দীর্ঘশ্বাস। এই যেমন এখন, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়ে উঠছে অরুর, আর ওর কোলে বসে বসে আনমনে মাথা ঘষছে ডোরা, এমন সময় বাইরে থেকে কড়া নেড়ে একজন ভৃত্য জানায়,সে দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছে l
বুক চিড়ে ভেতরের আহত বাতাসটুকু বের করে দিয়ে, অরু ডোরাকে রেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই লোকটা ভেতরে প্রবেশ করে টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রেখে ফিরে যেতে যেতে বলে,
—- আফা জলদি খায়া লয়েন,নাইলে অনু আফায় আবার আমার লগে চ্যাত দেহাইবো,অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে লোকটাকে বিদেয় জানায়, লোকটা চলে যেতেই অরু পুনরায় দরজা লাগাতে যাবে

ঠিক তখনই দরজা ঠেলে হুট করে ভেতরে প্রবেশ করে রেজা।
রেজার কর্মকান্ডে অরু বিস্মিত হয়ে ঝাঁঝালো কন্ঠে বলে,
— এটা কোন ধরনের ম্যানার রেজা ভাই? আপনি এক্ষুনি বের হন আমার রুম থেকে।
অরুর কথা কানে নিলোনা রেজা, সে এগিয়ে গিয়ে ডিভানে পায়ের উপর পা তুলে বসে, কৌতুক হাসি দিয়ে বললো,
—- তোর সৎ ভাই ওরফে নাগর,জায়ান ক্রীতিক, সে-তো দেশে নেই, শুধু তাই নয়, বিদেশ থেকেও এখানে এসে আমাকে মা'রার ক্ষমতা এখন আর তার নেই, তবুও এতো তেজ কোথায় পাচ্ছিস?
রেজার কথায় মস্তিষ্কটা মূহুর্তেই টগবগিয়ে উঠলো অরুর, ও দু'কদম এগিয়ে গিয়ে রেজার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তুলে বললো,— আপনি এখন যেখানে পায়ে পা তুলে বসে আছেন, সেই গদিটাও ওনার টাকায় কেনা, তাই ভালোয় ভালোয় বলছি মুখ সামলে কথা বলুন। আপনার সাহস হলো কি করে আমার রুমে আসার?
অরুর কথা শেষ হতেই রেজা ওর আঙুলটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অরুকেও ডিভানে বসিয়ে দিলো, অতঃপর ওর দিকে খানিকটা ঝুঁকে গিয়ে বললো,
—- প্রথমে জায়ান ক্রীতিকের বউকে বিয়ে করবো, তারপর দেখাবো এই রেজার সাহস আদতে কতখানি।
রেজার কথায় অরু ঘৃ'নিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে ওঠে,
— আপনি না আপাকে ভালোবাসতেন? এই ক'দিনেই ভালোবাসা শেষ হয়ে গেলো?

অরুর কথায় রেজা তাচ্ছিল্য করে হেসে বলে,— ভালোবাসা মাই ফুট, ওর থেকেও আমার তোকে বেশি ভালো লাগে, আমি জানি তুই ভা'র্জিন না,কিন্তু তাতে আমার যায় আসেনা বিশ্বাস কর।
রেজার কথাগুলো বলতে বাকি, সঙ্গে সঙ্গে ওর গাল বরাবর চোখ মুখ খিঁচিয়ে শক্ত চড় বসাতে দেরি হলোনা অরুর। চ'ড় মে'রে ওর দিকে অ'গ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অরু বললো,
—- আপনি আমার দিকে যে নোং'রা দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, তার শা'স্তি সরুপ আপনার চোখ দুটোই তুলে দেবে জায়ান ক্রীতিক, শুধু অপেক্ষা করুন।
এমনিতেই জায়ান ক্রীতিকের মা'র খেয়ে খেয়ে ভর্তা হয়ে গিয়েছে রেজার শরীরটা, তার উপর অরু কথার মাথায় শুধু জায়ান ক্রীতিকের বয়ান করছে। যে মানুষটা হাজার মাইল দূরে হসপিটালের বেডে পরে আছে, তার উপর এখনো কি ভরসা মেয়েটার।ব্যাপারটা বুঝে আসতেই র'ক্ত চ'ড়ে উঠলো রেজার মাথায়, জায়ান ক্রীতিকের উপর এতোদিন ধরে দমিয়ে রাখা সুপ্ত প্রতিহিং'সার আ'গুনটা মূহুর্তেই দা'উদাউ করে জ্বলে উঠলো মস্তিষ্কে, সঙ্গে সঙ্গে খেইর হারালো রেজা, একহাত দিয়ে অরুর চুলগুলো মুঠি বদ্ধ করে, কঠিন গলায় বললো,
—- বুঝেছি, যেটা আর কয়েকদিন পরে করতাম সেটা এখনই করতে হবে, প্রতি'শোধ তো আমি নিতামই অরু,কারন তুইই হলি আমার প্রতিশো'ধের মোক্ষম অ'স্ত্র। তোকে কিছু বলা বা করা মানেই জায়ান ক্রীতিকের কলিজায় আ'ঘাত করা, তবে এতো তাড়াতাড়ি এই সূবর্ণ সুযোগটা পেয়ে যাবো সেটা আমি আশা করিনি ।

রেজার কথা শুনে এবার মুখ থেকে র'ক্ত সরে গেলো অরুর, ও আত'ঙ্কিত চোখে রেজার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বললো,—- রুম থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যান, নয়তো খুব খারাপ হবে।
রেজা কুটিল হেসে নিজ পাঞ্জাবির বোতাম গুলো খুলতে খুলতে বললো,
— কেন? খারাপ কেন হবে? সৎ ভাইয়ের সাথে যা করতে পেরেছিস, তা মামাতো ভাইয়ের সাথে করলে কি সমস্যা? মানছি তোর সৎ ভাই একটু বেশিই সুদর্শন,কিন্তু তাতে কি? চেয়ে দেখ, তোর সৎ ভাইয়ের থেকে আমার বয়স কম।
—- ওনাকে সৎ ভাই বলে বলে আপনি মোটেও আমাকে দূর্বল করতে পারবেন না , উনি আমার স্বামী, উপর ওয়ালার নাম নিয়ে তিন কবুল বলে বিয়ে করেছেন উনি আমায়। আর নিজেকে জায়ান ক্রীতিকের সাথে তুলনা করা বন্ধ করুন, তার নখের যোগ্যতাও নেই আপনার। কথাটা বলে রেজাকে দু'হাতে ধা'ক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো অরু, তারপর তাড়াহুড়ো করে ডিভান থেকে উঠে গিয়ে পা বাড়ালো বাইরের দিকে, কিন্তু যেতে আর পারলো না, তার আগেই ওর টপস এর কলারটা শ'ক্ত হাতে টেনে ধরলো রেজা, একটানে অরুকে নিজের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে ওর দিকে চোখ রাঙানো দৃষ্টিপাত করে বললো,
—- আমার হাত যে ঠিক কতটা লম্বা তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না অরু, তাই ভালোয় ভালোয় বলছি চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পর। এবার সত্যি সত্যি ভ'য় পাচ্ছে অরু, এই মূহুর্তে এরকম একটা বাজে পরিস্থিতিতে পরে ওর অন্তরা'ত্মা থরথরিয়ে কাঁপছে, এতোটা সাহস দেখিয়েও রেজাকে দমানো যাচ্ছেনা

মোটে,সেই ভেবে অপারগ অরু এবার সত্যি সত্যি ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠলো, রেজার থেকে নিজেকে ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করতে করতে বললো,

— ছেড়ে দিন, ভালো হবেনা একদম, এই পা'পের চরম শা'স্তি পাবেন আপনি।

—- যখনের পাপ তখন দেখা যাবে, এখন এনজয় করি, কি বলিস?ক্রুর হেঁসে কথাটা বলে রেজা যখনই অরুর কাছাকাছি আসতে উদ্যত হয়, ঠিক তখনই ওর গাল বরাবর আঁচড়ে পরে একটা শক্ত পোক্ত হাতের চপেটাঘা'ত। ভীষন জোরে থা'প্পর খেয়ে তাল সামলাতে না পেরে দু কদম পিছিয়ে যায় রেজা, সঙ্গে সঙ্গে ওর অন্য গালে আবারও চ'ড় বসিয়ে দিলো আগন্তুক।

থা'প্পড় খেয়ে রেজা ধরাশায়ী হয়ে তাড়াহুড়ো করে রুম ত্যাগ করলো। ও সরে যেতেই অরু দেখতে পায় অনু দাঁড়িয়ে আছে ওর মুখ বরাবর। রাগের তোপে রক্তিম হয়ে উঠেছে অনুর সমগ্র মুখশ্রী। যেন এখনি রেজাকে সর্বেসর্বা বিনাশ করবে ও। ওদিকে অনুকে দেখা মাত্রই এক ছুটে ওর বুকের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পরলো অরু। শব্দ করে কেঁদে উঠে অতি আপন সুরে ডাকলো অনুকে,

—- আপায়ায়া..বিকেল ছাপিয়ে গোধূলির আভায় ছেয়ে গিয়েছে চারিপাশ, বাড়ির পেছনে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে আরেকটু পরে সন্ধ্যা আঁধারের পর্দা টেনে রাত নেমে আসবে ধরনী জুড়ে। তখনও গলির মাথা থেকে ভেসে আসছে মুয়াজ্জিনের সুমধুর আহ্বান, বোধ হয় আসরের সালাতের সময় হলো।

অনুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে, নিস্প্রভ চোখে বাইরে চেয়ে আছে অরু। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুও তাকিয়েছিল এতোক্ষণ,

হয়তো অরুকে একটু স্বাভাবিক হয়ে ওঠার জন্য সময় দিচ্ছিল, কিন্তু এখন তো অনুকেও বাড়ি ফিরতে হবে, তাই কোনোরূপ সময় নষ্ট না করেই হাত বাড়িয়ে অরুর চোখের সামনে পাসপোর্ট ভিসা আর বোর্ডিং পাসের কাগজ গুলো এগিয়ে দিলো অনু।
চোখের সামনে পাসপোর্ট দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে উঠে বসলো অরু, অতঃপর সেগুলোকে হাত দিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বিস্মিত চোখে অনুর পানে তাকিয়ে অরু শুধালো,—- এগুলোতো আমার, তুই এগুলো কিভাবে? না মনে…
অরুর কথার মাঝপথে অনু মুচকি হেসে ওর কপোলে হাত বুলিয়ে জানায়,
— প্রত্যয় সাহায্য করেছে, এই সপ্তাহেই তোর ফ্লাইট, ক্রীতিক ভাইয়ার কাছে চলে যা অরু, তার তোকে প্রয়োজন।
অরু ছলছল চোখে একবার কাগজ গুলোর দিকে তো একবার অনুর দিকে তাকাচ্ছে, কোনোমতে গলার মাঝে কা’ন্নাটা আটকে রেখে অবিশ্বাসের সুরে ও বলে উঠলো,
— আপা তুই জোগাড় করেছিস এগুলো? কিন্তু তুই তো,
অনু এবার টান মে’রে অরুকে বুকের মাঝে নিয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলে,
— আমি জানি তুই খালি মুখে আমার কোনো কথায়ই শুনতে রাজি না,তাই ভাবলাম অ’পরাধ যেহেতু করেছি প্রায়শ্চিত্তটাও আমিই করি, কিন্তু তুই’ই বল? ক্রীতিক ভাইয়ার ওমন অবস্থা শুনলে তুই আদৌও ঠিক থাকতে পারতিস?
অরু মাথা তুলে অনুর চোখে চোখ রেখে শুধালো,—- কি হয়েছিল আপা?

অনু বলে,
—- ক্রীতিক ভাইয়ার এর আগেও নাকি এ’ক্সি’ডেন্ট হয়েছিল ইউ এস এ বসে, তখনই ওনার ব্রেইন সেলস গুলো আহত ছিল, র’ক্ত জমেছিল অনেকদিন ধরে, আর দ্বিতীয়বার সেই একই যায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ওনার আর বাঁচার সম্ভাবনা ছিলনা, এমনকি তোর যখন জ্ঞান ফিরলো তখনও ক্রীতিক ভাইয়ার অবস্থা ছিল বেশ ক্রি’টিক্যাল,ওনাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল অনেকদিন। আর তখন তো তুইও অসুস্থ ছিলি, এমন একটা সময়ে যদি তোকে এসব জানাতাম তুই ঠিক থাকতিস বল?ক্রীতিকের বিগত দের দু’মাসের মাসের কন্ডিশন শুনে অরুর কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গিয়েছে, শ্বাস টেনে তুলতে পারছে না মেয়েটা। তবুও অস্পষ্ট আওয়াজে অনুকে বললো,
— আপা, এসব কি বলছিস তুই? উনি এতোটা কষ্ট কিভাবে সহ্য করেছেন? আমাকে কেন নেওয়া হলোনা ওনার সাথে?
অনু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— ওনার বন্ধুরা নিতে চেয়েছিল তোকে, কিন্তু মা যেতে দেয়নি, তাছাড়া এমন একটা পরিস্থিতি যে কারোরই কথা বাড়ানোর উপায় ছিলনা।
অরু কাঁদছে খুব, অনু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে পুনরায় বললো,— এখনো আপার উপর রা’গ করে থাকবি?
অরু অকস্মাৎ অনুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো,
— একটুও না, তুই বেস্ট আপা, তোর মতো আপা দু’টো নেই। তুই আমার মা হলিনা কেন বলতো?

অরুর ক্রন্দনরত কথার পাছে অনু শুধু মিষ্টি করে হাসলো তারপর হাসতে হাসতেই বললো,
— ইউ এস এ ফিরে আমার স্বামীটাকে কান ধরে প্লেনে তুলে দিবি মনে থাকে যেন, তোর স্বামীর সেবা করতে করতে আমার স্বামীটা শুকিয়ে গেলো বোধ হয়।
অনুর কথা শুনে অরু এবার কাদঁতে কাঁদতেই ফিক করে হেঁসে দিলো।
আজ কতগুলো দিন বাদে অরু একটু হাসলো, কালো মেঘের বর্বরতা ছাপিয়ে মেঘের চাদর ভেদ করে একটু খানি আলোক ছটা উঁকি দেওয়ার মতোই, অরুর একটু খানি হাসিতে মূহুর্তেই প্রফুল্লতায় সজীব হয়ে উঠলো অনুর হৃদয় মন সবকিছু। অবশেষে নিজেই নিজেকে বাহবা দিয়ে মনে মনে আওড়ালো অনু,
—- আমি আপা হিসেবে ওতোটাও খারাপ নই। নদীর স্রোতের মতোই সময় বয়ে যায়, বহমান সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে আজ আবারও জীবনে দ্বিতীয় বারের মতো আমেরিকার মাটিতে পা রাখলো অরু।
তবে আজ আর আপার সাথে নয়,বরং একাই এসেছে অরু। একা এসেছে বললে ভুল হবে, মনের মাঝে অনেকটা সাহস আর আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে আসতে হয়েছে অরুকে।
জীবনের কিছু কিছু পরিস্থিতিতে যেমন উপরওয়ালা ছাড়া কেউ পাশে থাকেনা, অরুর জন্য একাকী ইউ এস এ তে আসাও তেমনই একটা জীবন যু'দ্ধ ছিল, যা অরু অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে পার করে এসেছে, আর এখন উবারে করে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রীতিকের সেই নির্জন শহরতলীর দিকে,যেখানে ওদের প্রথম প্রেমের সূচনা হয়।

যদিও অরু জানেনা ক্রীতিক আদৌও বাড়িতে নাকি হসপিটালে, এদিকে নতুন কেনা ফোনটাও চার্জের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে,প্রত্যয়ের সাথে যোগাযোগ করার উপায়টাও নেই। তবুও বাড়ির পাসওয়ার্ড তো অরুর জানা, সেই হিসেব মতে এয়ার্টপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছে ও। এখনো অনেকটা পথ যাওয়া বাকি, যদিও অরু আমেরিকাতে কিন্তু এই মূহুর্তে ওর মনটা পরে আছে সূদুর ক্রীতিক কুঞ্জে। কাল আসার আগ মূহুর্তের প্রত্যেকটা ঘটনা মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে বারবার। সেসব ভাবতে ভাবতেই গাড়ির ব্যাক সিটে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলো অরু। কাল যখন অরু নিজের ট্রলি সমেত বেরিয়ে যাচ্ছিল, আজমেরী শেখ কেন যেন তখনো নিশ্চুপই ছিলেন।বোধ করি, তার দাম্ভিকতা,তার জিদি মানসিকতা কিছুটা হলেও ক্ষীণ হশে এসেছে এতোদিনে। তবে বিগত কয়েকদিন আগের ঘটনার প্রেক্ষিতে অরু আর নিশ্চুপ ছিলনা, এগিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুকণা বিসর্জন দিতে দিতে ক্রদ্ধ গলায় বলেছিলো,— আমি চলে যাচ্ছি মা, পারলে দোয়া করলো, না পারলে প্রয়োজন নেই, তবুও একটু শান্তিতে থাকতে দিও। অনেক তো হলো, এবার নাহয় আমাকেই আমার জীবনটা বুঝে নিতে দাও।

মেয়ের কথার পাছে আজমেরী শেখ টু শব্দটিও করেনি। মায়ের স্থির মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে অরু পুনরায় বলে,

— যেদিন তুমি তোমার ভাইয়ের পরিবারকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারবে, সেদিন জানিও, আমি চলে আসবো।

এবারে গভীর গলায় ছোট্ট করে উত্তর দিলেন আজমেরী শেখ

—- ভালো থেকো।

মায়ের মুখ থেকে “ভালো থেকো” শব্দটা শুনে অরুকি একটুও কষ্ট পায়নি? পেয়েছে তো। তবে ও সেটা নিছকই আন্তরিকতা ভেবে উড়িয়ে দিলো। অতঃপর অনুর কাছে এগিয়ে গিয়ে ডোরাকে অনুর হাতে তুলে দিয়ে বললো,

—- আমার মেয়েটাকে দেখে রাখিস আপা।

ডোরার মাথায় হাত বুলিয়ে অনু মৃদু হেসে বললো,

— তোর মেয়ে?

অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলো,

— পিতা মহামান্য জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী, আর মাতা মহোদয়া অরোরা জায়ান।হঠাৎ গাড়িতে ব্রেক কষায় সম্বিত ফিরে পেলো অরু, তন্দ্রা ছুটে গিয়ে হকচকিয়ে উঠে ড্রাইভার কে উদ্দেশ্য করে বললো,

— হোয়াট হ্যাপেন?

ড্রাইভার জানালো ওরা গন্তব্যে এসে গিয়েছে।

কথাটা শোনা মাত্রই অরুর হৃদস্পন্দন দিগুণ তালে বেড়ে গেলো, ও খেয়াল করলো হৃদস্পন্দনের সমান তালে ওর হাত পা গুলোও কাঁপছে, খুশিতে নাকি ভ’য়ে, কে জানে?

অবশেষে সকল জল্পনা কল্পনার ইতি টেনে, অনেকটা সময় নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করে, লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে গাড়ি থেকে নামলো অরু। সন্ধ্যা রাত, তবে ল্যামপোস্টের আলোয় চারিদিক ঝকঝকে পরিস্কার, সেই পরিস্কার আলোতেই অরু স্পষ্ট দেখলো এটা ক্রীতিকের বাড়ি নয়, কিংবা সেই রাস্তাও নয়, তাহলে এটা কোথায়? কথাটা ভাবতেই আ’তঙ্কে রক্তশূণ্য হয়ে গেলো অরুর মুখ চোখ, ও চকিতে পেছনে ঘুরে লোকটাকে কিছু বলতে যাবে, তার

আগেই দৃশ্যগত হলো কালো জ্যাকেট পরিহিত বয়স্ক গোছের আর একটা লোক। ল্যামপোস্টের আলোয় লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে অরু অস্ফুটে বলে উঠলো,

— বাব.... উমমম।

অরুর মুখ থেকে শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার আগেই গ্লাভস পরিহিত লোকটা,ওর মুখের উপর সাদা রঙের রুমাল জাতীয় কিছু একটা চেপে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে অবচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরে অরুর ক্লান্ত পরিস্রান্ত অসার শরীরটা।— এক্সকিউজ মি স্যার, ইউ কান্ট স্মোক রাইট নাও।

কথাটা বলে ক্রীতিকের হাত থেকে দিয়াশলাই আর সিগারেটটা নিয়ে চলে গেলো সিস্টার।

ক্রীতিক সেদিকে তাকিয়ে চোখমুখ শক্ত করে একটা বিরক্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। অতঃপর উঠে চলে গেলো কেভিনের ড্রেসিং রুমে।

শারীরিক দিক থেকে এখন মোটামুটি ফিট আছে ক্রীতিক, তবে ট্রিটমেন্ট এখনো শেষ হয়নি, যার দরুন প্রত্যয় ওকে ধরে বেধে হসপিটালে রেখে দিয়েছে। এখন দিন রাত এখানে শুয়ে থেকে স্যালাইন নাও, সকাল বিকাল বডি টেস্ট করাও, সিটি স্ক্যান করাও এসব নিয়ে বেশ বিরক্ত ক্রীতিক, এই যে সন্ধ্যা বেলা স্যালাইন শেষ হয়েছে বলে ছাড়া পেয়ে একটু স্মোক করতে চাইলো, সেটাও কে'ড়ে নিলো সেবিকা সাহেবা, বিরক্তিকর।

ক্রীতিক ড্রেসিং রুম থেকে জামা কাপড় বদলে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বের হতেই দেখলো প্রত্যয় হাজির, তবে ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, ওর উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে ক্রীতিক কিছু জিজ্ঞেস

করবে তার আগেই প্রত্যয় বললো,—- হঠাৎ চেঞ্জ করলেন কেন ভাই?
— বাড়িতে ফিরবো।
ছোট্ট করে উত্তর দিলো ক্রীতিক,কিন্তু ওর উত্তরে খুশি হতে পারলো না প্রত্যয়,সহসাই ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে উঠলো,
— বাড়ি ফিরবেন মানে? আপনার ট্রিটমেন্ট এখনো শেষ হয়নি।
ক্রীতিক ক্যানোলা হাতেই শার্টের হাতাটা ফোল্ড করার দূরহ চেষ্টা করতে করতে বললো,
—- আমি ফিট আছি, আর ট্রিটমেন্টের দরকার নেই, বাড়িতে গেলেই ঠিক হয়ে যাবো।
প্রত্যয় জোর গলায় বললো,
— বললেই হলো ফিট আছেন? ডক্টর বলেছে আপনি ফিট নেই আরও ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন। আগের বারও এমন করেছেন, এবার আর আমি আপনাকে যেতে দিচ্ছি না।— যা ট্রিটমেন্ট বাকি আছে সব বাসায় গিয়ে করবো, এখানে আর এক মূহুর্ত ও নয়।
ক্রীতিকের কথার পাছে প্রত্যয় কিছু বলবে, তার আগেই ওর ফোনটা বেজে ওঠে তারস্বরে। তৎক্ষনাৎ প্রত্যয় এক প্রকার হুমড়ি খেয়ে পরে ফোনের উপর, ওপাশ থেকে কে কি বলেছে শোনা না গেলেও, এপাশ থেকে প্রত্যয় বললো,
— ওহ শীট, এখনো পাওনি? দেখো আশেপাশে খোঁজো পেয়ে যাবে, ওর ফোনটাও বন্ধ।
প্রত্যয়ের কথায় ভাঁজ পরলো ক্রীতিকের চওড়া কপালে, ও এগিয়ে এসে গভীর গলায় শুধালো,
— কি হয়েছে? কাকে পাওয়া যাচ্ছেনা?

প্রত্যয় একটা শুষ্ক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বলে ওঠে,
— ভাই আসলে অরু,
অরুর নামটা শোনা মাত্রই ক্রীতিক দু'হাতে প্রত্যয়ের কলার চেপে ধরে উদ্বিগ্ন স্বরে বললো,— অরুর কি হয়েছে?
প্রত্যয় এবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু না বলে ক্রীতিককে খুলে বললো সবটা, সব শুনে ক্রীতিকের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো, ও দুশ্চিন্তা গ্রস্থদের মতো নিজের কপালে আঙুল বোলাতে বোলাতে প্রত্যয়কে ঝাড়ি দিয়ে বললো,
—- ওহ মাই গুডনেস, আর ইউ ফা'কিং কিডিং মি প্রত্যয় এহসান? আমার বউ ইউ এস এ তে আসছে অথচ আমি জানিনা, আমাকে আগে জানাওনি কেন, হোয়াই?
প্রত্যয় আতঙ্কিত স্বরে বলে,
— কোম্পানির কাজে নিজে যেতে পারিনি বলে, গাড়িও পাঠিয়েছি আমি, কিন্তু…
— শাট আপ!
ক্রীতিকের ক্রুদ্ধস্বরে থেমে গেলো প্রত্যয়, ক্রীতিক কয়েক মিনিট ধরে থম মে'রে বসে কিছু একটা ভাবলো, অতঃপর শার্টের বোতাম গুলো খুলতে খুলতে প্রত্যয়ের উদ্দেশ্যে বললো,— তোমার হুডিটা খোলো, ফাস্ট।
তৎক্ষনাৎ দু'হাত আড়াআড়ি করে বুকের উপর চেপে ধরে প্রত্যয় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো,
— কি বলছেন ভাই এসব?
ক্রীতিক শার্ট খুলে হাতের ক্যানোলাটা টেনে হিঁচড়ে খুলতে খুলতে বললো,

— ঢং বাদ দিয়ে যা বলছি তাই করো।
অগত্যা উপায়ন্তর না পেয়ে নিজের সম্ভ্রমটুকু খুলে ক্রীতিকের হাতে তুলে দিলো প্রত্যয়।
হুডিটা গায়ে চড়িয়ে, মাথার বাজ কাট স্টাইলের চুল আর সেলাইলের দাগগুলো ক্যাপের সাহায্যে ঢেকে নিলো ক্রীতিক, তারপর প্রত্যয়ের ফোন, এয়ার প্ল্যাগ আর গাড়ির চাবি হাতিয়ে নিয়ে, প্রত্যয়কে রোগী বানিয়ে রেখে আস্তে করে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে পরলো ও। দুনিয়া উল্টে গেলেও হয়তো অরুকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে যেতো ক্রীতিক, সেখান এখন তো সে বেশ ভালোই সুস্থ।
গাড়িতে বসে ড্রাইভ করতে করতে কানে এয়ারপ্ল্যাগ লাগিয়ে সবার আগে ক্রীতিক কল দিলো অর্ণবকে, ওপাশ থেকে হ্যালো বলতেই কোনো রকম আজেবাজে কথায় না গিয়ে ক্রীতিক সরাসরি বললো,— একটা নাম্বার দিচ্ছি, এস সুন এস পসিবল লোকেশনটা ফরওয়ার্ড কর আমায়।
যেহেতু ক্রীতিকের ভাব ভঙ্গিমা ছিল বেশ সিরিয়াস, তাই অর্ণব ও আর বেহুদা প্রশ্ন করলো না, বরং ক্রীতিকের কথায় সায় জানিয়ে কল কেটে তাড়াহুড়ো করে লেগে পরলো কাজে। ক্রীতিক এই মূহুর্তে বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল, কারন অরু যদি ক্যাব নিয়ে এগোয় তাহলে বাড়িতেই গিয়েছে, তবে মাঝপথে হঠাৎ করেই ফোনে টুংটাং আওয়াজ তুলে লোকেশন ট্র্যাকিং এর ম্যাসেজ আসায়, গাড়ির স্পিড কিছুটা কমিয়ে আনলো ক্রীতিক, অতঃপর ফোন হাতে নিয়ে লোকেশনটায় একনজর চোখ বোলাতেই মুখের আদল শক্ত হয়ে এলো ওর। চোখ দুটো রঙ পাল্টে ধারণ করলো হিং’স্র বাঘের রূ’প।

পরমূহুর্তেই গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা বদলে স্পিডোমিটারে একশোর উপর গতি তুলে হুঁশশ করে চোখের আড়াল হয়ে গেলো ব্ল্যাক মার্সিডিজ গাড়িটা। আমেরিকাতে এখন পুরোদমে গ্রীষ্মকাল। যে কারনে ঘড়ির কাঁটা আটের ঘরে গিয়ে ঠেকলে তবেই সূর্যাস্ত হয় এখানে। বাংলাদেশে তো আটটা মানে নিশুতি রাত, সেখানে আমেরিকাতে আটটার সময় ও মিয়িয়ে যাওয়া সূর্য কীরণে ঝকঝক করছে চারিপাশ। সূর্যের আলো আর, হু হু বাতাস, দুটোই এখানে মাত্রাতিরিক্ত। তবুও যেহেতু আটটা বেজে গিয়েছে তাই সন্ধ্যা নামার মূহুর্ত এখন।
এদিক দিয়ে ছেলে পেলেরা সব বাস্কেটবল, বেজবল খেলে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরেছে, ঠিক তার বিপরীত দিকের রাস্তা ধরে বাতাসের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক মার্সিডিজটা। ক্রীতিক এতো দ্রুত আর উন্মাদের মতো গাড়ি চালাচ্ছে যে গাড়িটা অতিক্রম করার সময় আসেপাশের পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়ে যায়, দু'একজন তো চোখের আড়াল হওয়ার পরেও তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ে। একটু আগে অর্ণব যে লোকেশনটা পাঠালো সেটা এদিকেই, এয়ারপোর্ট থেকে বেশ অনেকটা দূরে কোনো এক নির্জন এলাকায়। ক্যালিফোর্নিয়া তে এরুপ নির্জন শহরতলীর অভাব নেই। উঁচুনিচু পাহাড়ের ভাঁজে এখনো এমন অনেক যায়গা রয়েছে, যেখানে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে গেলেও কোনো একটা বসতি খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও বা খুঁজে পাওয়া যায়, হয় সেটা কোনো ফার্মহাউজ,নয়তো নিরবিচ্ছিন্ন কৃষকদের ছোট্ট ছোট্ট কটেজ। কিন্তু দূর্ভাগ্যবসত অর্ণব কোনো সঠিক লোকেশন পাঠাতে পারেনি, কারণ অরুর ফোনটা বন্ধ,ওর লাস্ট লোকেশন ছিল এই ফাঁকা

রাস্তাতেই, আর এই মূহুর্তে সেই নির্জন পাহাড়ি হাইওয়েটা ধরেই তরিৎ বেগে গাড়ি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে ক্রীতিক। ওর কপাল জুড়ে দুশ্চিন্তার অনেকখানি ভাঁজ। কিছুদিন আগেই সার্জারি হওয়ার দরুন মাথাটা চিনচিনিয়ে ব্যথা করছে, তবুও সে-সবকিছু বেমালুম ভুলে গিয়ে দক্ষ হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং সামলাচ্ছে ক্রীতিক। কারণ এই মূহুর্তে ওর মস্তিষ্কের চেয়েও হৃদয়ের ব্যথাটা দিগুণ।—- অরু, হার্টবিট কোথায় তুইই? আমার জন্য কি একটু অপেক্ষা করা যেত না? আমি বেঁচে আছি যেহেতু তোর কাছেই তো ফিরে যেতাম। ইভেন হাউ কুড আই লিভ উইদাউট ইউ?
দুশ্চিন্তাগ্রস্থদের মতো রাস্তার এদিক ওদিক চোখ বোলাচ্ছে আর স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে একমনে বিড়বিড়াচ্ছে ক্রীতিক। ওর কন্ঠ রোধ করে আছে এক অযাচিত ব্যর্থতা। ঠিক এমন সময় এ্যাপল খচিত মুঠো ফোনটা হুট করেই আওয়াজ তুলে বেজে ওঠায় সম্বিৎ ফিরে ফেলো ক্রীতিক। ভ্রম কেটে যেতেই ফোন রিসিভ করে তাড়াহুড়ো এয়ারপ্ল্যাগটা কানে লাগিয়ে আস্তে করে ক্রীতিক বলে ওঠে,— হ্যালো।
ওই পাশে শুনশান নীরবতা,
ক্রীতিক পুনরায় হ্যালো বললো, এবার আর শান্ত স্বরে নয়, একটু জোরেই।
ক্রীতিক এপাশ থেকে হ্যালো উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে এলো ক্রন্দনরত অরুর কাঁইকুই আওয়াজ। ওর কথা স্পষ্ট নয়, শুধু বোঝা যাচ্ছে অরু হিঁচকি তুলে কাঁদছে খুব, তবে ওর গলার স্বরটা ভীষণ অস্পষ্ট, মুখটা বাঁধা হবে হয়তো।

মোবাইলের অপর পাশে অরুকে এভাবে কাঁদতে শুনে অকস্মাৎ হাইওয়ের মাঝখানেই গাড়ির ব্রেক কষলো ক্রীতিক। ওর চক্ষু ছানাবড়া, মস্তিষ্কটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে,কোনোকিছু বুঝে উঠতে না পেরে ক্রীতিক বোকাদের মতো অবিশ্বাসের সুরে ডেকে উঠলো অরুকে,— অরু! জান আমার।
ক্রীতিক ডেকে উঠতেই খ্যাক খ্যাক আওয়াজের কৌতুক মিশ্রিত হাসি ভেসে এলো ওপাশ থেকে। ওই বিশ্রী হাসির আওয়াজটা কর্ণকূহরে পৌঁছাতেই চোখ মুখ শক্ত হলে গেলো ক্রীতিকের, সন্দেহাতিক চোখ তার রঙ পাল্টালো মূহুর্তেই, হাসির রহস্য ধরতে পেরে কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই ক্রীতিকের সমগ্র মুখশ্রী রাগে রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো,ও তৎক্ষনাৎ দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠে বললো,
— হু দ্য হেল আর ইউ ফা'কিং এ্যাসহোল?
ক্রীতিকের রণমূর্তি অনেকেরই ভয়ের কারন, ওর এহেন চেহারা সুরত, আর ধা'রালো কথার ভঙ্গিমা ওর বন্ধুদের কাছেও স্বাভাবিক মনে হয়না কোনোকালেই , অথচ ওপাশের লোকটা ক্রীতিকের এই গর্জন গায়ে পিছলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো,—- গালিটা বাংলাতেই দাও জামাই বাবাজীবন, আমি বাংলাটা বেশ ভালোই বুঝি।
লোকটার কথায় ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে এলো ক্রীতিকের, ও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করে বললো,
— কি চাই? অরুকে কেন কি'ডন্যা'প করেছেন? লিসেন ম্যান, আমার বউয়ের শরীরে একটা নখের আঁচড় লাগলেও আপনার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে দেবো আমি।

ক্রীতিকের এহেন কঠিন হু'মকির সম্মুখীন হয়েও লোকটার হেলদোল দেখা গেলো না মোটেই, সে কিছুটা রহস্যময় কন্ঠে বললো,—- এই তো লাইনে এসেছো বাবাজীবন , তোমার বউকে কিচ্ছু করবো না,শুধু আমার একাউন্টে তিন মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করো, আর তোমার বউকে সহি সালামতে বাড়িতে নিয়ে যাও, নো ওয়ান ইভেন কেয়ারস।
ক্রীতিকের বুঝে আসছে না, বাবা হয়ে মেয়েকে কিভাবে টাকার জন্য কি'ডন্যা'প করতে পারে মানুষ ? তাই ও একটু বিভ্রান্ত গলায় বলে ওঠে,
— মানে?
লোকটা ঠোঁট বাকিয়ে বললো,—- রেজা বলেছিল বড় মেয়েটাকে কি'ড'ন্যাপ করতে, সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম বিডিতে,কিন্তু গিয়ে দেখি বড়টা যেমন তেমন, ছোট জামাই আমার টাকার কুমির, তারউপর বিয়ে বাড়িতে আমার মেয়েকে যেভাবে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিলে,ওয়াহ!আই ওয়াজ স্পিচলেস, ব্যাস তখনই প্ল্যানটাকে তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুড়িয়ে ফেললাম। কজ, ইউ নো হোয়াট? আমি তোমার মতো বাংলাদেশী ইয়ং বিলিয়নিয়র এর আগে দুটো দেখিনি।
যদিও ক্রীতিক নিজেকে বিলিয়নিয়র দাবি করার একদমই পক্ষপাতি নয়, কারণ এতো ধনদৌলত, প্রতিপত্তি কিছুই ওর দু'হাতে কামানো নয়, সবই পূর্ব পুরুষদের অবদান, ও তো কেবল এসবের একমাত্র উত্তরাধিকারী এই যা।
কিন্তু এই মূহুর্তে ক্রীতিকের কৌশলী মস্তিষ্কটা অন্যান্য চিন্তায় বিভোর, এতোসব ভাবার সময় কোথায়? ও বেশ ভালোই বুঝতে

পারছে অরুর বাবা মোটেই মেন্টালি স্ট্যাবল নয়, হতে পারে সাইকোপ্যাথ, তাহলে তো দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেলো, কখন আবার অরুকে রাগের বশে আ’ঘাত করে বসে এই পা’গল। অনেক কিছু একসঙ্গে ভেবে ক্রীতিক ফোনটা হাতে নিয়ে ফ্রেন্ডস গ্রুপে sos লিখে টাইপ করে ম্যাসেজ করলো, এরপর সেটাকে পুনরায় আগের যায়গায় রেখে দিলো। ওদিকে অনেক্ষন ধরে ক্রীতিকের কোনো সারা শব্দ না পেয়ে লোকটা থমথমে গলায় বলে উঠলো,

—- পুলিশের চিন্তা ভুলে যাও বাবাজীবন, চালাকি করার চেষ্টাও করোনা, চুপচাপ টাকা ট্রান্সফার করো, নয়তো,

থেমে গেলো লোকটা,তার কথার সূত্র ধরে ক্রীতিক বলে উঠলো,

— নয়তো কি?

— মা’র্ডা’র।

কথাটা বলে ক্রন্দনরত অরুর মুখের সামনে আবারও ফোনটা এগিয়ে দিলো সে।

অরুর কান্না শুনে ক্রীতিক এবার হকচকিয়ে উঠলো, আচমকা চেচিয়ে উঠে বললো,— নো নোহ! ডোন্ট টাচ্ হার, ডোন্ট, ওকেই? আমি ডলার ট্রান্সফার করছি, তার আগে আপনার এ্যাড্রেস দিন, আমি একাই আসবো, আর কেউ নয়।

লোকটা কিছুক্ষন ভাবলো, পরক্ষণেই বললো,

— এ্যাড্রেস পাঠাচ্ছি, বাই এনি চান্স চালাকি করার দুঃসাহসও দেখালে আই সয়ার, হাত পায়ের সবগুলো র’গ কে’টে এখানেই ফেলে রেখে যাবো মেয়েটাকে, মাইন্ড ইট।

— ডোন্ট ডেয়ার টু টাচ হার, এ্যাসহোল!লোকটার মুখের উপর চেঁচিয়ে কথাটা বললেও অরুর বেলায় বরাবরই ক্রীতিক অপারগ,

অবুঝ, আর নাজেহাল , এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। অরুর ক্ষতি হবে সেই শঙ্কায় সত্যি সত্যিই ক্রীতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে টাকা'টা ও দেবে, তবুও যদি অরু অক্ষত থাকে এর চেয়ে স্বস্তির আর কিইবা হতে পারে? সেই ভেবেই ক্রীতিক গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো লোকটার পাঠিয়ে দেওয়া গন্তব্যে। এদিকে জায়ান ক্রীতিক কল কেটে দিতেই লোকটা একমনে খ্যাক খ্যাক করে হেঁসে উঠলো। তার এই বিদঘুটে হাসির আওয়াজ শুনে কান্নাকাটি বাদ দিয়ে আঁতকে উঠল অরু। অরুকে আচমকা লাফিয়ে উঠতে দেখে লোকটা ধীরে ধীরে সময় নিয়ে ঘাড় বাকিয়ে অরুর চোখের দিকে চাইলো,তৎক্ষনাৎ চোখের আ'তঙ্ক ছড়িয়ে পরলো অরুর সমগ্র শরীরে।
লোকটার চোখে অসহ্য রকম হিং'স্র'তা অথচ কথাবার্তার ধরন শান্ত নদীর মতোই ঠান্ডা আর নির্জীব। তার এরকম দু'মুখো আচরণে বারংবার আঁতকে উঠছে অরুর হৃদয়,দেখে মনে হচ্ছে লোকটা চোখ দিয়েই খু'ন করে ফেলবে ওকে,সেই সাথে জ্বালিয়ে দেবে সবকিছু। অরু তখন থেকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দিকে তাকিয়ে আছে দেখে,লোকটা হঠাৎ করেই চোখের পলকে অরুর মুখের সামনে এসে দাড়ালো, লোকটার হঠাৎ এভাবে আগমনে আত'ঙ্কে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অরু, ওর শীড় দাঁড়া অতিক্রম করে গেলো হিমশীতল ঠান্ডা স্রোত। না চাইতেও বেঁধে রাখা মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অযাচিত ভ'য়ার্ত চাপাকান্না। অরুকে এভাবে ভয় পেতে দেখে লোকটার বোধ হয় আনন্দই হলো বেশ,সে গ্রীবা নামিয়ে ঠোঁট দুটো দিগুণ প্রসারিত করে ফ্যাসফ্যাসিয়ে শীতল কন্ঠে বললো,

— বাবাজীবন টাকা নিয়ে আসছে মামুনি, ধৈর্য ধরো,ধৈর্য ধরো,ধৈর্য ধরো,ধৈর্য ধরো….
একই বুলি আওড়াতে আওড়াতে অরুকে ম্যানিউপুলেট করে আচমকা ছোট্ট সাইজের চা’কু বের করে অরুর হাতে একটা টান মে’রে দিলো লোকটা।
সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা হাত কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে র’ক্ত বেড়িয়ে এলো ওর ক্ষত স্থান থেকে। এমতাবস্থায় ভয় আ’তঙ্ক আর প্রতন্ড ব্যথায় জর্জরিত হয়ে অরু চিৎকার দিয়ে উঠবে তার আগেই ছোট্ট দোচালা কুটিরের বাইরে থেকে অরুর নাম নিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো অন্য কেউ। — অরুউউউ!
ক্রীতিকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে অরু হাতের ব্যথা ভুলে গিয়ে পুনরায় কাঁইকুই শব্দ করে উঠলো, ওদিকে বাইরের দিকে কারও আওয়াজ শুনে লোকটা সটান উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যেতে যেতে,তার সাথে থাকা অন্য চ্যালা প্যালাদের ইশারা করে বললো অরুর দিকে নজর রাখতে।
হাইওয়ে থেকে অনেকটা দূরে শুনশান নিরিবিলি নিরবিচ্ছিন্ন এই যায়গাটা দিনের বেলাতেও ঝিমঝিম করে সারাক্ষণ, আর এখন তো সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত প্রায়, তাই চারিপাশ আরও বেশি নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে। চোখের সামনে বেত আর কাঠের সংমিশ্রণে তৈরি বেশ কয়েকটা ছোট্ট সাইজের কুটির ছাড়া আর কিছুই লক্ষ করা যাচ্ছে না। কুটিরের সামনে বিস্তৃত লনে একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব পর্যন্ত অনুপস্থিত, খালি চোখে কিছুই দেখার উপায় নেই, তাই মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে ধীর পায়ে সামনে এগোতে এগোতে আওয়াজ করলো ক্রীতিক,—-এক্সকিউজ মি, কেউ আছেন?

ক্রীতিক এগোতে এগোতেই থমকে গেলো, কারণ ততক্ষণে কুটিরের ভেতর থেকে বেড়িয়ে এসেছে, সুঠাম দেহী বয়জেষ্ঠ একজন, ষাটোর্ধ এই লোকটাকে এর আগে কখনো না দেখলেও, তাকে চিনতে খুব একটা অসুবিধে হলোনা ক্রীতিকের, এক দেখাতেই লোকটাকে চিনে ফেললো ও,সেই সাথে মনে পরে গেলো তার সকল বায়োডাটা, ইশতিয়াক পাঠান,একজন সাইকো কি'লা'র তার সাথে বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রি'মিনালদের মধ্যে একজন। পত্র পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলের ক্রি'মিনাল নিউজে তার ছবি অহরহ ভেসে বেড়ায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে দেশের বড়বড় মাথা ওয়ালা লোকদের কারনেই এরা এখনো দিব্যি বাইরের দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে আরামসে ক্রা'ইম করে বেড়াচ্ছে, অথচ পুলিশ এদের টিকিটিও ছুঁতে পারেনা। এটা বাংলাদেশ পুলিশের খুব বড় অক্ষমতা বললেও কথাটা ভুল কিছু হবেনা বোধ করি।কিন্তু এরকম একটা বাজে লোক কি করে অরুর বাবা হলো সেটাই আপাতত ভাবনার বিষয়,আর আজমেরী শেখের মতো মানুষই বা কেন এমন একটা পশুকে বিয়ে করে ঘর বেধেছিল সেটাও অবশ্য রহস্যই থেকে যায়।
ইশতিয়াক পাঠানের আগমনে ভাবনার সুতো ছিড়লো ক্রীতিকের,সম্বিৎ ফিরে এলে ওর দৃষ্টি বরাবর এসে হাজির হয় লোকটা, লোকটা ষাটোর্ধ অথচ তার সুঠামদেহ, চেহারার কাঠিন্যতা, উজ্জ্বলতা সবকিছু দেখলে মনে হয় তিনি কোনো অ'পরাধী নন বরং সুন্দরী মেয়েদের পছন্দের সুগার ড্যাডি।
এই লোককে দেখেই ক্রীতিক বোধ হয় আজ ঠাওর করতে পারলো যে, অরুর চেহারা কেন এতো আকর্ষনীয়।কিন্তু পরক্ষণেই ক্রীতিকের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো এই ভেবে যে, লোকটা অরুকে

কি’ডন্যা’প করেছে, অরুকে কষ্ট দিয়েছে,না জানি কোথায় কোথায় ব্যথা দিয়েছে ওর হার্টবিটকে। ক্রীতিক হাত দুটো মুঠি বদ্ধ রেখে চোখ মুখ কঠিন করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, লোকটা সামান্য ঠোঁট বাকিয়ে গমগমে আওয়াজে বললো,— হোয়েয়ার ইজ মানি?
লোকটার কথার দু’পয়সা কেয়ার না করে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লো ক্রীতিক,
— হোয়েয়ার ইজ মাই ওয়াইফ?
, এভাবে ছক্কা হাঁকানো বাউন্ডারি বলকে সরাসরি ক্যাচ করাটা মোটেই ভালো লাগলো না সাইকোপ্যাথ লোকটার, অগত্যা মূহুর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলো তার মুখের কপট হাসিটা,তার বদলে চোয়াল শক্ত করে আঙুল উঁচিয়ে পেছনের কটেজ ইশারা করে বললো,
—-ওখানে।
হিতে বিপরীত হতে পারে সেই ভেবে, অরুর সন্ধান পাওয়ার পরেও ক্রীতিক হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে গেলো না, বরং সময় নিলো লোকটার ভাব ভঙ্গিমা বুঝে ওঠার জন্য।— এবার টাকাটা?
লোকটা নিজের একাউন্ট নাম্বার এগিয়ে দিতে দিতে বললো কথাটা।
এই মূহুর্তে অরুর সেইফটির থেকে আর কিছু জরুরি হতে পারেনা, তিন মিলিয়ন ডলার ও না। সেই ভেবে ক্রীতিক কার্ডটা হাতে নিয়ে, দ্রুত হাতে মোবাইল স্ক্রিনে একাউন্ট নাম্বারটা টুকতে টুকতে সন্দিহান গলায় শুধালো ,
— অরু ঠিক আছে তো?
লোকটা আবারও ঠোঁট প্রসারিত করে জোকারের মতো হাসলো,কি ভয়া’নক যে সেই নীরব হাসি তা বলে বোঝানার নয়। হাসতে

হাসতেই আস্তে করে জবাব দিলো সে ,—- শী ইজ কম্পিলিটলি ফাইন।
ক্রীতিক কয়েকটা একাউন্টের টাকা মিলিয়ে তিন মিলিয়ন ট্রান্সফার করে সস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো, বহু আগে থেকেই কোম্পানি থেকে একটা মোটা অংকের সম্মানি জমা হতো ক্রীতিকের একাউন্টে, এতোগুলা দিন জিদের বসে তাতে হাত না দিলেও, আজ সেগুলোতে হাত দিতেও এইটুকু দ্বিধাবোধ করেনি ক্রীতিক। যদিওবা ওর সব একাউন্ট গুলো এখন শূন্য ব্যালেন্স হয়ে আছে কিন্তু তাতে কি যায় আসে? অরু যে ঠিক আছে এটাই শান্তি।
— ডান।
ক্রীতিকের কথায় লোকটা নিজের ফোন চেক করলো, অতঃপর কাউকে ফোন করে কানে লাগানো ব্লুটুথের সাহায্যে বললো,— চলে এসো, কাজ হয়ে গিয়েছে।
লোকটার কথা শুনে ক্রীতিক ও ফোনের মাঝে কিছু একটা চেক করলো, অতঃপর লোকটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো অন্ধকার কটেজের দিকে।
একদিক দিয়ে ইশতিয়াক পাঠান বেড়িয়ে যাচ্ছে অন্য দিক দিয়ে ক্রীতিক লন ছাড়িয়ে কটেজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আড়াআড়ি একটা দৃশ্য, দুজন দুজনকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, যেতে যেতে ক্রীতিক আরও একবার ফোন চেক করলো।
ওদিকে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে পেছনে ঘুরে একনজর ক্রীতিকের বাঁজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসলো লোকটা, অতঃপর কানে লাগানো ব্লুটুথে অপর পাশের কাউকে হিসহিসিয়ে বললো,— জাস্ট বার্ন ইট!

ক্রীতিকের তীক্ষ্ণ নজর তখনো মোবাইল স্ক্রিনে নিবদ্ধ ছিল, ঠিক সেই সময় আচমকা চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো কাঠের তৈরি কটেজ গুলো। চোখের সামনে অনাকাঙ্ক্ষিত এই দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে উঠলো ক্রীতিক, এতোগুলো টাকা পাওয়ার পরেও লোকটা এমন কিছু করবে সেটা বোধ হয় কল্পনাতেও আশা করেনি ও। ওই জন্যই হুট করে ঘাবড়ে গিয়ে দাউদাউ করে জ্বলন্ত কুটির গুলোতে নজর বুলিয়ে লোকটার পানে অবিশ্বাসের চোখে তাকালো ক্রীতিক। ওর আহত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে লোকটা গা ছাড়া ভাবে হেঁসে বললো,

—- কেন যেন মনে হয়েছিল বাবাজীবন আমাকে এতো সহজে ছেড়ে দেবে না, তাই ছোট্ট একটু প্রটেকশন দিলাম,এবার তুমিই ভাবো কি করবে, আমাকে ধরবে? না-কি নাকি নিজের বউকে বাঁচাবে?

কথা বলতে বলতে ভাবলেশহীন হয়ে ঠোঁট উল্টালো লোকটা, ক্রীতিকের চোখে তখন জ্বলে উঠেছে তীব্র রাগের অ'গ্নিস্ফুলিঙ্গ ,মা'রাত্মক ক্রোধে শরীরটা কাঁপছে ওর, চোখের সামনে কটেজ গুলো পু'ড়ে যাচ্ছে, ভেতরে অরু, ওদিকে লোকটার হাসি দেখে রাগ সংবরণ করার কোনো উপায় নেই, ইচ্ছেতো করছে এখনই গিয়ে লোকটাকে কে'টে টুকরো টুকরো করে ফেলতে, কিন্তু ক্রীতিক দুইয়ের মাঝে আটকা পরে আছে।

লোকটা হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ক্রীতিক ওর হাসি মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য করে বললো,— শুয়ো*** বাচ্চা আমি তোর থেকেও জ'ঘন্য, শুধু ভদ্রলোক সেজে থাকি এই যা।

ক্রীতিকের কথায় এবার সত্যি সত্যি লোকটার কপাল কুঞ্চিত হয়ে এলো,ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না কোন দিক থেকে আদতে ঝড়টা

আসবে। লোকটা ভাবছে, ঠিক তখনই, কোথা থেকে যেন ছুটে এসে পেছন দিক থেকে লোকটার নাক বরাবর ঘু’ষি ছেড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে চোখের পলকে লোকটার হাত পা সব বেধে ফেললো এলিসা। তবে লোকটা এখনো খ্যাক খ্যাক করে হাসছে, যেন কিছুই হয়নি। এরকম মা’রধর খেয়ে অভস্ত্য সে। ওর হাসি দেখে র’ক্ত উঠে গেলো ক্রীতিকের মাথায়, লোকটাকে ইচ্ছে মতো পে’টাবে বলে এগিয়ে আসতে গিয়েও জ্বলন্ত কটেজ থেকে অরুর চিৎকারের আওয়াজে ওর পা দুটো থমকে গেলো অকস্মাৎ, এতোক্ষণের রাগ ঢাক সব ঠিকেয় তুলে হুট করেই একটা ভ’য়ানক কাজ করে বসলো ক্রীতিক। কোনোকিছু না ভেবেই এগিয়ে গিয়ে আচমকা ঝাপ দিয়ে ঢুকে পরলো জ্বলন্ত কটেজের মধ্যে। ওর এহেন কান্ডে চোখ মুখ খিঁচে চিৎকার দিয়ে উঠলো এলিসা। এই প্রথমবার এলিসার কন্ঠস্বর ভ’য়ার্ত শোনালো। অকুতোভয় মেয়েটাও কাছের বন্ধুকে হারানোর ভয়ে জর্জরিত হয়ে কেঁদে ফেললো হুট করেই, আর হবে নাই’বা কেন? ওরা তো একজন আরেকজনের আপনের চেয়েও আপন। ওদিকে যতক্ষনে অর্ণব আর সায়র পুলিশ আর ফায়ার ফাইটারস নিয়ে হাজির হয়েছে , ততক্ষণে ক্রীতিকের আর হদিস নেই, কারণ ইতিমধ্যে কটেজ গুলোর সর্বত্র আ’গুন ছড়িয়ে পরেছে, দাউদাউ করে একেকটা কটেজকে যেন গ্রাস করে নিচ্ছে রা’ক্ষুসে অ’গ্নিশিখার দল। এখানে এসে এমন জ্বলন্ত আ’গুনের লেলিহানের মাঝে ক্রীতিককে হারিয়ে যেতে দেখে সায়র আর অর্ণব দূর্বল চিত্তে হাটু ভেঙে ধপ করে মাটিতে বসে পরলো একই সাথে ।ক্রীতিক এতো সহজে হার মানার ছেলে নয়,খুব অল্প বয়সেই জীবন ওকে অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়েছে,তাছাড়া ও বরাবরই বেপরোয়া স্বভাবের,

কলিজার মধ্যে ভয় ডর কিছু নেই বললেই চলে, যদিও বা থেকে থাকে সেটা শুধু মাত্র অরুকে হারানোর ভয়। যেই ভয়ে আগাগোড়া তটস্থ ক্রীতিক।
আর আজ এই মূহুর্তে, অরুর জন্যই জ্ব'লন্ত কুটিরের মধ্যে নির্দ্বিধায় পা বাড়িয়েছে ও।ছোট্ট ঘরের চারিদিকে আ'গুন ছড়িয়ে পরলেও ভেতরটা ধোঁয়ার কুন্ডলীতে ঝাপসা হয়ে আছে, ক্রীতিক ধোঁয়ার মধ্যেই ছুটে গেলো অরুর নিকট, অরুর হাত,পা, মুখ সবকিছু চেয়ারের সাথে বাঁধা, লম্বা চুলগুলো মাটি ছুঁই ছুঁই করছে, মাথাটাও টলছে, অরু হয়তো ভেবেই নিয়েছিল এটাই ওর শেষ, কিন্তু হঠাৎ করেই সবসময়ের মতো আঁধারের মরিচীকার মধ্যে একটু খানি আলোর ছটা হয়ে ওর সামনে এসে দাড়ালো ওর সেভিয়র, ওর জায়ান ক্রীতিক।যাকে এই মূহুর্তে ঝাপসা, অথচ ব্যাকুল চিত্তে পরখ করছে অরু,ক্রীতিক হুডি পরে আছে, মাথাটা ক্যাপ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা, তবুও লম্বা চুলের অনুপস্থিতিটা ঠিকই ধরতে পারলো অরু। সেই সাথে ক্রীতিক শুকিয়েও গিয়েছে অনেকটা, এতোগুলা দিন পরে,এতোটা বিচ্ছেদের য'ন্ত্রনার ইতি টেনে ক্রীতিকের মুখোমুখি হওয়াটা ছিল অরুর কাছে স্বপ্নের মতোই সুন্দর আর চমকপ্রদ। তাইতো, এই আগুনের লেলিহান, এই শারীরিক যন্ত্রনা, এই ফাঁকা মস্তিষ্ক সবকিছুকে ছাঁপিয়ে চোখের সামনে ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে সহসা ছটফট করে উঠলো অরু, মুখ বাঁধা অবস্থাতেই কেঁদে উঠলো চিৎকার করে। ক্রীতিক ব্যথাতুর চাহনীতে তাকিয়ে আছে অরুর মুখের দিকে, যে এই মূহুর্তে ওকে দেখে হাত পা দমাচ্ছে আর শব্দ করে কাঁদছে।আজ এই মূহুর্তে দাঁড়িয়ে অরু ঠিকই বুঝতে পেরেছে, সেদিনের সেই স্বপ্নে অরু যখন গভীর চোরাবালির নিচে হারিয়ে

যাচ্ছিল, তখন ওর হাতটা অন্য কেউ নয় সয়ং ক্রীতিকই টেনে ধরেছিল। কারণ ও এতোদিনে এইটুকু বিশ্বাস করে ফেলেছে যে , শেষ নিঃশ্বাসের আগ পর্যন্ত এই লোকটা ওর হাত ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না।
ক্রীতিক এগিয়ে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে অরুর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই, অরু তৃষ্ণার্থ চাতকের মতো উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাঁপা কাঁপা হাত দুটো ছোঁয়ালো ক্রীতিকের মসৃণ তীক্ষ্ণ গালে,সেভাবে দু'হাত রেখেই এক ধ্যানে দেখতে লাগলো নিজের ফেরারী ভালোবাসার মুখখানা। আজ কতগুলো দিন বাদে এই মানুষটাকে স্পর্শ করলো ও, ভীষণ স্বস্তিতে দম বন্ধ হয়ে আসছে অরুর, চোখ দুটোও ঝাপসা, ক্রীতিক কোনোকিছু না বলে অরুর হাতে ঠোঁট ছুয়িয়েছে কি ছোঁয়ায় নি তার আগেই অকস্মাৎ চেতনা হারিয়ে ক্রীতিকের বুকেই ঢলে পরলো অরু।
ফায়ার ফাইটারদের সাহায্যে অচেতন অরুকে কোলে নিয়ে খুব সহজেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ক্রীতিক, ততক্ষণে ইশতিয়াক পাঠান কে ধরে ফেলেছে ইউ এস এ পুলিশ। ক্রীতিক অরু সমেত লোকটার কাছে এগিয়ে এসে বললো,—- ইউ ফা'কড আপ শশুর আব্বা,আগেই বলেছিলাম তোকে, আমি ক্রীতিক এতোটাও ভদ্রলোক নই, এবার জেলে গিয়ে ডিসাইড কর তিন মিলিয়ন দিয়ে কি কি করবি। আর হ্যা, এটা বাংলাদেশ পুলিশ নয়,যে চাইলেই বড় মাথা ওয়ালাদের পা চেটে বেরিয়ে আসবি, তোকে উপযুক্ত শা'স্তি প্রদানের জন্য ঠিক যা যা করার দরকার আমি তাই তাই করবো, প্রথমে আমেরিকান গভমেন্টের কঠোর শা'স্তি ভোগ করে নে, এরপর নাহয় কোনোদিন মুক্তি পেলে আমি

নিজেই তোর যমদূত হবো। তুই আর এ জীবনে আমার হাত থেকে নিস্তার পাবিনা।
কথাটা বলে লোকটার মতো করেই নিঃশব্দে একটা কপট হাসি দিলো ক্রীতিক। অন্ধকারের মাঝে হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেবার মতোই ভয়া'নক দেখালো সেই মেকি হাসি। একটা ছোট্ট যায়গায় গুটিসুটি মেরে ঘুমাতে ঘুমাতে শরীরের মাংসপেশী সব ব্যথায় টনটন করছে অরুর, অথচ মস্তিষ্কটা সেই তুচ্ছ ব্যথার উর্ধে গিয়ে নীরব আর চিন্তামুক্ত হয়ে ক্রমশ ঘুমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ওকে,ঘুমের রেশ কাটাতে না পেরে সরু যায়গা টুকুতেই এবার একটু আরাম করে শুলো অরু, ওর মাথার নিচের বালিশটা বেজায় শক্ত কিন্তু উষ্ণ,এমন উষ্ণতা বিগত দু'মাস ধরে অরু কত খুঁজেছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আজ হুট করেই এই উষ্ণ বস্তুটা ওর কাছে নিজে থেকেই ধরা দিলো। এর প্রশান্তির আর কিইবা হতে পারে?এতোকিছু ভাবতে ভাবতে ঘুমের ঘোরেই শক্তপোক্ত উষ্ণ বালিশে নাক ঘষলো অরু, বরাবরের মতো বদভ্যাসের বশবর্তী হয়ে মুখের কোন বেয়ে বেড়িয়ে আসা লালা টুকু ও তাতে মুছলো। কিন্তু যখনই নাক টেনে লম্বা শ্বাস নিলো,ঠিক তখনই টনক নড়লো অরুর, কারণ এখান থেকে ভেসে আসছে অরুর সবচেয়ে পছন্দের মাদকীয় সুবাস ওর প্রিয় পুরুষের গন্ধ । এই স্নিগ্ধ ম্যানলি সুঘ্রানটা শুধুমাত্র ক্রীতিকের শরীর থেকেই পায় অরু, তাহলে কি এটা ক্রীতিক?প্রশ্নটা মস্তিষ্ক ছুঁতেই তন্দ্রা ছুটে গেলো অরুর,তৎক্ষনাৎ চকিতে চোখ খুলে দেখতে পেলো এটা অন্য কারোর নয়,সয়ং ক্রীতিকেরই চওড়া ঢেউ খেলানো বক্ষদেশ।

যা নিঃশ্বাসের তালেতালে বার ওঠানামা করছে ওর চোখের সামনেই, তারমানে কি এটা স্বপ্ন ছিলোনা?
—বেইবি!ক্রীতিকের শান্ত গলার আওয়াজ টুকু কানে ভেসে আসতেই শোয়া থেকে ধরফরিয়ে উঠে বসলো অরু, চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝলো ওরা এই মূহুর্তে গাড়িতে বসে আছে, গাড়িটা এক যায়গায় স্থির, তারমানে চলছে না, আর অরু এতোক্ষণ ধরে ক্রীতিকেরই বুকে শুয়ে নিরিবিলি ঘুমুচ্ছিল।
চারিদিকে চোখ বুলিয়ে এতোক্ষণে অরুর নজর গেলো ক্রীতিকের দিকে, যে সেই তখন থেকে ওর পানেই নিস্প্রভ চোখে চেয়ে আছে, চোখের সামনে জলজ্যান্ত ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে অরু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলো,
—- তুমিহ, না মানে আপনি ঠিক আছেন?
ক্রীতিক আস্তে করে অরুকে কাছে টেনে নিয়ে ওর কপালে কপাল ঠেকিয়ে হাস্কিস্বরে বললো,
— সে ইট এগেইন বেইবি।
— কিহ!
অরুর ক্ষুদ্র প্রশ্নে ক্রীতিক কাতর গলায় বললো,—- তোর মুখে কতদিন এই ওয়ার্ডটা শুনিনা, আবার ডাক তুমি করে।
ক্রীতিকের কথায় অরুর চোখের কার্ণিশ বেয়ে গড়িয়ে পরলো তপ্ত নোনাজল, ক্রীতিকের এই সামান্য কথাতে কি যে পূর্ণতা ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না অরু। এই পূর্ণতা টুকু যদি টাকায় কেনা যেতো তাহলে বোধ হয় অরু নিজের শেষ সম্বল দিয়ে হলেও এই মূহুর্তটুকু বারবার কিনে নিতো। কিন্তু হায় অরুর সেই সাধ্য নেই,কোনোদিন ছিলোওনা, তাইতো নিজের স্বামীর জীবন ম’রনের

সন্ধিক্ষনে ও পাশে থাকতে পারেনি অরু, একনজর দেখতে পারেনি তাকে। কত রাত যে নির্ঘুম কাটিয়েছে এই মানুষটার পথ চেয়ে, কতদিন মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছে শুধুমাত্র এই মানুষটা ওকে কেন অবহেলা করছে সেই দহনে, অথচ আজ সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটাই চোখের সামনে বসে এরূপ কাতরতা দেখালে কেই'বা ঠিক থাকতে পারে? অরুও পারেনি,অগত্যাই কেঁদে উঠেছে বাচ্চাদের মতো ঠোঁট ভেঙে। হতবিহ্বল ক্রীতিক ক্রন্দনরত অরুর দিকে মাথা নুইয়ে ওর চুলগুলো আলতো হাতে মুঠি বদ্ধ করে একই সুরে বললো,
— কি হলো ডাক। আই ওয়ান্না হেয়ার ইওর লাভলী ভয়েস বেইবি। আই ডেস্পারেটলি ওয়েটিং ফর ইট।
ক্রীতিক ওর জন্য এমন ভাবে ব্যাকুল উঠেছে দেখে অরু আর নিজেকে সামলাতে পারলোনা, মাথা উঁচিয়ে আলতো হাতে ওর পুরুষালী খড়খড়ে গাল দু'টো স্পর্শ করে আজ প্রথমবারের মতো চোখ বন্ধ করে নিজ উদ্যোগে ক্রীতিকের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো অরু। কান্নার তোড় বেড়েছে বৈকি কমেনি,সেই কান্নারত আওয়াজেই ক্রীতিকের ঠোঁটে চুমু খেয়ে রিনরিনিয়ে অরু বললো,— তুমি, আমার তুমি, যতবার শুনতে চাও ততবার ডাকবো , তবুও দয়াকরে আর দূরে যেও না,ম'রে যাবো আমি।
অরুর এহেন কথায় ক্রীতিকের শক্তপোক্ত পাথর হৃদয়টাও হুট করে কেমন ধরে এলো, ও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ওর হৃদয়ে কষ্ট হচ্ছে, ব্যথায় চিনচিন করছে বুকের বাম পাশটা, অগত্যাই অরুকে হ্যাচকা টান মে'রে নিজের কোলে বসিয়ে শক্ত করে বুকে চেপে ধরলো ওর ছোট্ট নারী শরীরটা। অরুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওর গলায় মুখ গুঁজে দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ ক্রীতিক বললো,

—- বেইবি, আমি ম'রে গেলে তোর কি হতো বলতো? কে ভালোবাসতো তোকে আমার মতো করে? সেই চিন্তায় তো এখন আমার প্রেসার ফল হয়ে যাচ্ছে।
অরু কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলো,
— আপনি ম'রে গেলে আমিও ম'রে যেতাম। আর কারোর ভালোবাসার দরকার নেই আমার, আপনি যা দিয়েছেন তা আমার এক জীবনের জন্য যথেষ্ট।
অরুর কথা শুনে ক্রীতিক এবার মাথা তুলে ওর চোখে চোখ রেখে নিজের হাত পেছন থেকে অরুর জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো,— তুই আমার জন্য এতোটা পা'গল কবে হলি অরু?
অরু নাক টেনে বললো,
— জানিনা তো।
— বেইবি, এবার না-হয় আমার সাথে এই অচেনা শহরে থেকে যা? মাঝে মাঝে তোকে নিয়ে যাবো দেশে, কিন্তু সারাজীবন আমার সাথেই থাকবি তুই। আমি আর দূরত্ব চাচ্ছিনা অরু, থাকতে পারবো না তোকে ছাড়া।
ক্রীতিকের কথা শুনে অরু ওর হুডির ফিতেয় আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বললো,
—- থেকে গেলে কি করবেন?
অরুর তুলতুলে কোমল পৃষ্ঠদেশে আলতো হাতে স্পর্শ করে ওর কপালে কপাল ঠেকিয়ে ক্রীতিক হিসহিসিয়ে বলে,
— আদর করবো, অনেক আদর করবো, একটুও কষ্ট দেবোনা, আই প্রমিস।
অরু ঠোঁট উল্টে বললো,

— কিন্তু আপনিতো রেগে গেলে মা'রেন। ক্রীতিকের হাতের স্পর্শ প্রগার হলো,সেভাবেই জিভ দিয়ে অধর ভিজিয়ে ক্রীতিক জবাব দিলো,

—- আমিই মা'রবো, আবার আমিই আদর করবো, সব আমি করবো। আর কেউ না। কারণ তুই আমার যতখানি আছিস, আমি তার থেকেও তোকে আরোও বেশি চাই হার্টবিট।

The more i have of you, the more i want you. you kno what i mean.

ক্রীতিকের হাতদুটো অবাধে বিচরণ করছে অরুর জামার ভেতর,এহেন স্পর্শে ঠান্ডার মাঝেও মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণতায় রক্তিম হয়ে উঠেছে ওর মুখমন্ডল, হাত পা অবস হয়ে আসছে, যার ফলরুপ কনভার্সেশনটা আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না অরু,চুপচাপ ভেঙেচুরে পরে রইলো ক্রীতিকের শক্ত বুকের উপর। আর নাতো ক্রীতিক আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলো ওকে, বরং অরুর উন্মুক্ত পিঠে আদুরে দু'হাত বোলাতে বোলাতেই আকস্মিক গতিতে অধর ডোবালো অরুর ওষ্ঠাধরের ভাঁজে। বহুদিনের কামনা বাসনার অবসান ঘটিয়ে চুমু, পাল্টা চুমুতে দু'জনই ভরিয়ে দিচ্ছিল একজন আরেকজনের হৃদয় মন সবকিছু। ক্রীতিক বরাবরই বেসামাল, অরুর সংস্পর্শে এলে ওর মাথা ঠিক থাকেনা,তারউপর অরু আজ সারা দিচ্ছে ওর স্পর্শে, এহেন অবস্থায় ক্রীতিক ওর ঠোঁট ছাড়িয়ে গলায় মুখ ডুবিয়ে দিয়ে দু'হাতে টেনে উপরে তুলতে লাগলো অরুর পরনের ফিনফিনে সাদা টপসটা।

ভালোবাসা তখন তুঙ্গে, অরুও কেন যেন এতোগুলা দিন পর না করতে পারছিলনা ক্রীতিককে, ঠিক এমন সময় হুট করেই কি যেন

দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো অরু,তরিৎ গতিতে ক্রীতিকের থেকে সরে গিয়ে ওর পেছনেই মুখ লুকালো চোখ খিঁচে। এমন একটা সময়ে অরু হঠাৎ সরে গিয়েছে যে ক্রীতিক নিজের মেজাজ সংবরণ করতে পারলো না, সহসাই অরুর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে দাঁত কটমটিয়ে বলে উঠলো ,

— তোর মাসে কয়বার পি'রিয়ড হয়, ইডিয়েট?

অরু অবুঝের মতো চোখ উঁচিয়ে বললো,— আমি কখন বললাম, অরুর শরীর ঠিক আছে, ব্যপারটা বুঝে আসতেই ক্রীতিক আবারও তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে,

— তাহলে দূরে সরে গেলি কেনো? বেইবি বোঝার চেষ্টা কর, একটু কাছে আয় আমি তোকে…

তৎক্ষনাৎ ক্রীতিককে থামিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো অরু,

—- চুপ করুন বেহায়া লোক, সবাই দেখছে।

অরুর চোখের ইশারা অনুসরণ করে ক্রীতিক তাকাতেই দেখলো জানালা দিয়ে, সায়র, অর্নব, এলিসা চোখ বড়বড় করে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে,

ক্রীতিকের কাহিনি দেখে ওদের তিনজনের চোয়াল ঝুলে পড়ার উপক্রম, ওদের এই অদ্ভুত চাহনিকে কোনোরূপ গুরুত্ব না দিয়ে ক্রীতিক পেছনে ঘুরে ওর পিঠে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা অরুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

— বেইবি জানালাটা লাগিয়ে দেবো? তাহলে আর…

—-চুপ করুউউউউন!

ক্রীতিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই অরু এমন চিৎকার দিলো, যে ক্রীতিক কেন ওদের তিনজনারও কানের পর্দায় তালা লেগে

গিয়েছে। মাঝরাতে ক্রীতিকের বাড়ির ছোট্ট হলরুমটাতে গোল হয়ে বসে আছে ওরা তিনজন, সবার সিরিয়াস ভাব ভঙ্গিমা দেখে মনে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে এখানে।
ঘুমন্ত অরুকে বিছানায় শুয়িয়ে দিয়ে, একটু পরে ক্রীতিকও নেমে এলো নিচে, সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে বিরক্ত আওয়াজে ক্রীতিক বললো,
— কি ব্যাপার ,তোদের বাড়িঘর নেই নাকি? এখানে কি চাস?
ক্রীতিকের কথায় সায়র মানে লাগার মতো করে বললো,
— তুই আমাদের খোঁটা দিচ্ছিস, আমাদের? তুই জানিস আমার নেট ওয়ার্থ কতো?
ক্রীতিক সায়রের কথায় পাত্তা দিলোনা, অর্ণব ওকে ডেকে বললো,
— সিরিয়াস আলাপ হচ্ছে এখানে জেকে,পারলে বুদ্ধি দে।
ক্রীতিক গিয়ে আসন পেতে বসে পরলো কাউচে, অতঃপর গেমিং রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে বললো,
—- কি হয়েছে বল? কি এমন জরুরি কারনে তোদের মাঝ রাতে গোল মিটিং এ বসতে হলো?
অর্ণব বললো,— খুবই জরুরি কারণ, তুই একটু সায়রকে টিপস দে তো ভাই, বেচারা বাসর তো দূরে থাক, বউকে একটা চুমু অবধি খেতে পারছে না।
ক্রীতিক চোখ ছোট ছোট করে সায়রের দিকে তাকিয়ে সন্দিহান গলায় বললো,
—- কেন পারছিস না? কোনো গোপন সমস্যা? কলিকাতা হার্বাল অর্ডার দেবো নাকি?
অর্ণব তৎক্ষনাৎ ক্রীতিককে থামিয়ে দিয়ে বললো,

— আরে ধুর, এমন কিছু না, বুঝিসই তো নার্ভাস, সবাই তো আর তোর মতো না যে গাড়ির ঘোড়ার মধ্যেই….
হুট করে এলিসার চোখ পাকানো দেখে অর্ধেক কথাতেই আটকে গেলো অর্ণব।
ক্রীতিক গেইম খেলতে খেলতে জিভ দিয়ে গাল ঠেলে বললো,
—- ওহ এই ব্যাপার, দু পেগ মাল খায়িয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দে, দেখবি শুধু চুমু না আরও অনেক কিছু খেয়ে বসে থাকবে।
ক্রীতিকের কথা শুনে সায়র ভ্রু কুঁচকে বললো,— তুইও কি মাল খেয়ে চুমু খাস নাকি?
ক্রীতিক ঠোঁট উল্টে বললো,
— আমার ওসবের প্রয়োজন হয়না, বউয়ের কাছে গেলে এমনিতেই নেশা ধরে যায়। বউই আমার ব্যক্তিগত মাল।
সায়র ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,
— তাতো রাস্তাতেই দেখে এলাম।
সায়র রাস্তার কথা বলতেই, ক্রীতিক হাতের রিমোটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে যেতে যেতে বললো,
—- দূর শালা, এতোক্ষণ ধরে নিজেকে সামলেছিলাম, দিলি তো মনে করিয়ে।
ওদিকে অর্ণব সায়রের জন্য গ্লাস ভর্তি বিয়ার নিয়ে এসে ক্রীতিকের যাওয়ার পানে তাকিয়ে বললো,
—- কিরে কোথায় যাচ্ছিস? ওকে মাল খাওয়াতে হবে তো।
ক্রীতিক যেতে যেতে নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দিলো,— বউয়ের কাছে।
অর্ণব বেচারা আর কিইবা করবে একা হাতেই সায়রকে মাল খাওয়ানোর মোক্ষম দায়িত্বটা পালন করতে শুরু করলো। ভরসা

একটাই, এবার যদি ছেলেটা একটু খোলস থেকে বেরিয়ে নিজের আপন বউকে দু'একটা চুমু খেতে পারে। গভীর রাতে সানফ্রান্সিসকোর রাস্তা ঘাট কিছুটা ফাঁকা। তবে শহরের অলিগলিতে মাতাল মানুষের অভাব নেই। কেউ অফিস কলিগদের সাথে লেট নাইট পার্টি করে বাড়ি ফিরছে, তো কেউ বন্ধু বান্ধবদের সাথে। কেউ বা প্রচন্ড নেশায় বুদ হয়ে রাস্তার মাঝেই শুয়ে পরেছে নির্দ্বিধায়। ওয়েল, আমেরিকাতে এটা নতুন কিংবা আশ্চর্যের কিছুই নয়।

এই মাতালদের ভীড়ে আজ এক নতুন মাতাল যোগ হয়েছে,নাম তার সায়র আহমেদ। সে হলো ফরেইনার মাতাল।

সায়র আমেরিকান সিটিজেন বহু বছর ধরে, কিন্তু ক্রীতিক, অর্ণব, এলিসার মতো উদভ্রান্ত আর অনেকটা উগ্র টাইপ থ্রীলিং বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশেও ওর স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি একটুও। হতে পারে ওদের সাথে মিলে অনেক উল্টো পাল্টা কাজে সঙ্গ দিয়েছে সায়র, কিন্তু এসব কাজে সবসময়ই সায়র থাকতো পেছনের সারিতে, আর সবার সামনে ক্রীতিক। ছেলেটার জন্মই হয়েছে বোধ হয় সবার সাথে বেয়াদবি করার জন্য। রিডিকিউলাস। এককথায় ক্রীতিকের সাথে তুলনা করতে গেলে সায়র হলো শুদ্ধ পুরুষ, সরলতার প্রতীমা যাকে বলে। নিজের বউকে চুমু খাওয়ার কথা কল্পনা করলেও আ'তঙ্কে শরীরের লোমকূপ সব দাড়িয়ে যায় তার। কিন্তু আজ নিজেকে বরাবরই শুদ্ধ পুরুষ খেতাবে ভূষিত করা এই সায়রের দু'মগ বিয়ার খেয়েই নেশা ধরে গিয়েছে। চোখের সামনে সবকিছু কেমন দুলছে, ওর মনে হচ্ছে ও মেঘের মতো হাওয়ায় ভেসে ভেসেই বাড়ি ফিরছে,কি আশ্চর্য

চমৎকার এই অনুভূতি। একপর্যায়ে ভাসতে ভাসতেই ঘরের দুয়ারে পা রাখলো সায়র। সায়র যখন বাড়িতে ফেরে, তখন নীলিমা কোমড়ে ওড়না গুঁজে ঘরের কাজ করায় ভীষণ ব্যস্ত, সে একদিকে ঘরদোর ভ্যাকিউম করছে,অন্যদিকে একটু পরপর দৌড়ে গিয়ে দক্ষ হাতে কড়াইয়ে স্প্যাচুলা নাড়ছে। নীলিমার কর্মকান্ডে হয়তো কেউ কল্পনা ও করতে পারবে না যে এই মেয়েকে সায়র বিয়ের আসর থেকে তুলে এনে জোর করে বিয়ে করেছে। মাত্র দু'মাস যেতে না যেতেই কেমন পাঁকা ঘরনি হয়ে উঠেছে সে। আচ্ছা, নীলিমাকে কি আসলেই জোর করে বিয়ে করা হয়েছিল? নাকি অন্যকিছু?
কাজের ফাঁকে হঠাৎ সায়রকে দেখতে পেয়ে নীলিমা তরিঘরি করে এগিয়ে এসে বলে উঠলো,— দেখুন না,সন্ধ্যা হতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, রাতের রান্না বসাতে একদম মনে নেই।
— থাক, মঙ্গলগ্রহ থেকে খেয়ে এসেছি।
অস্ফুটেই কথাটা বেরিয়ে এলো, টালমাটাল সায়রের মুখ ফস্কে।
সায়রের এহেন অদ্ভুত কথার মানে বুঝতে না পেরে নীলিমা দরজার দিকে এগিয়ে এসে ভ্রু কুঁচকে শুধালো,
— কি বললেন?
নীলিমার কথার প্রত্যুত্তরে,কিছুই জবাব দিলো না সায়র, উল্টো ওকে সুক্ষ্ম চোখে পরখ করে আঙুলের কর গুনতে গুনতে বিড়বিড়ালো,
—- একটা বউ, দুইটা বউ, তিনটা,চারটা.....
হাআআ,দশটা বউ!!চোখ দুটো বড়বড় করে মুখের উপর একহাত চেপে ধরে বিস্ময়কর কন্ঠে কথাটা বললো সায়র।

সায়রের কথার আগামাথা কিছুই বোধগম্য নয় নীলিমার, এতো রাতে এ কিসব মশকরা বুঝতে পারছেনা ও, তাই সায়রের উপর কিছুটা চটে গিয়ে নীলিমা ঝাঁজিয়ে বলে উঠলো ,
— কি বলছেন এসব আবোল তাবোল?আর দশটা বউই বা কোথায় পেলেন?শুট থেকে তো আসেন নি,তাহলে কোথা থেকে এসেছেন সত্যি করে বলুন?
সায়র একটু দম নিয়ে ভাবলো, অতঃপর আঙুল উচিয়ে সিলিং এর দিকে দেখিয়ে বললো,
— জুপিটার থেকে। মাত্রই তো স্পেসশীপে ল্যান্ড করলাম। সায়রের কথায় নীলিমা ঠোঁট টিপে হাসি সংবরণ করে বললো,
— তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি এতোক্ষণ মহাকাশে ছিলেন তাইতো?
সায়র তৎক্ষনাৎ ঠোঁট উল্টে জোরে জোরে হ্যা বোধক মাথা নাড়ালো।
— তা মহাকাশে মদ কোথায় পেলেন?
সায়র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— আর বলোনা, মাঝ আকাশে এলিয়েন গুলো হকারী করছিল,খুবই দরিদ্র ওরা,দেখে মায়া হলো, তাই কিছু মদ দিয়ে দুটো টাকা কিনেছিলাম।
নীলিমা ভ্যাঁবাচ্যাকা খেয়ে গেলো সায়রের প্রত্যুত্তর শুনে, ওকে আরেকটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হয়না সেই ভেবে এবার আরও দিগুণ উৎসাহ নিয়ে কৌতুক কন্ঠে নীলিমা শুধালো,— তা এখন আপনি কোথায় আছেন?
সায়র ঢুলতে ঢুলতে হলের কাউচের উপর গিয়ে বসে পরে বললো,

— কোথায় আবার চাঁদে, অর্ণবের বাচ্চাটা কি জোরে জোরে স্পেসশীপ চালায়, মাথাটা ঘুরে গেলো আমার, এমনিতেই মদ খেয়েছি, তারউপর যদি নেশা ধরে যায় তাহলে কি হবে বলোতো? আমিতো ভুলভাল বকতে শুরু করবো তখন।
নীলিমা সায়রের দিকে এগিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বললো,— আচ্ছা আপনি যদি চাঁদেই থেকে থাকেন, তাহলে বলুন তো আমি কে?
সায়র তৎক্ষনাৎ ভ্রু কুঞ্চিত করে নাকটা সিকোয় তুলে নীলিমার দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীর গলায় বললো,
— তুমি আবার কে? চাঁদের সেই ডা'ইনী বুড়িটা না? কাজকম্ম বাদ দিয়ে যে সারাক্ষণ সুতো কাঁটে?
—- কিহ! আমি ডা'ইনী বুড়ি?
সায়রের কথায় খেঁকিয়ে উঠলো নীলিমা।
সায়র দিন দুনিয়ার হুঁশ হারিয়ে পুনরায়, চোখমুখ কুঁচকে বললো,
—- হ্যা ডা'ইনীই তো, কি বিচ্ছিরি দেখতে তুমি ওয়াক!
বমির ভান করতে গিয়ে, অবশেষে সত্যি সত্যিই বমি করে নীলিমার সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে দিলো সায়র। নীলিমা সব সময় একটু বেশিই পাষাণ, সায়রের মতো সফ্টহার্টেড লাভিডাভি, হাসবেন্ড ম্যাটেরিয়াল ছেলের সঙ্গেও তার ভাব জমেনা খুব একটা। হয়তো নীলিমা পারেই না সেভাবে ভাব জমাতে, নিঃসংকোচে মুখ ফুটে ভালোবাসি শব্দ আওড়াতে।
নীলিমার ভাষ্যমতে ভালোবাসা এতো ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়ানোর কি আছে? দু'চোখ দেখলেই তো পড়ে ফেলা যায়, আদতে কে তোমায় ভালোবাসে, আর কেইবা ঘৃ'ণা করে। অথচ সায়রের নিকট চোখের ওই কঠিন ভাষাগুলো পড়া অসাধ্য সাধনের মতোই

দূর্লভ। কারণ সায়রের দৃষ্টিকোন এতোটাও জটিল নয়, যতটা জটিল ভাবে নীলিমা নিজেকে উপস্থাপন করে। তবুও দিন শেষে সায়রের মতো এমন একটা উষ্ণ হৃদয়ের ছেলেই কিনা এইব পাষাণ মেয়েটার প্রেমে পরতে গেলো, কি অদ্ভুত! ছেলেটা এ জীবনে বউয়ের আদর সোহাগ তো দূরে থাক, বউয়ের মুখ থেকে একটু আধটু মিষ্টি মাখোমাখো কথা শুনতে পাবে কিনা, সেটাই এখন দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু কথায় আছেনা, মানুষের ভাবনা যেখানে এসে শেষ হয়, উপরওয়ালার সুক্ষ্ম ভাবনাগুলো সেখান থেকেই শুরু হয়। আজ তেমন কিছুই হলো, সবসময় সব পরিস্থিতিতে নীলিমা সায়রকে উপেক্ষা করে গেলেও, আজ গেলোনা, বরং সায়রকে বসিয়ে রেখে নিজে ফ্রেশ হয়ে এসে, ওকেও সুন্দর করে পরিস্কার দিলো। অতঃপর টেনেটুনে সায়রকে নিয়ে শুয়িয়ে দিলো বেডরুমে। সায়র অচেতন নয়, তবে ওর দৃশ্য কিছুটা ঝাপসা, তবুও ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নীলিমার পান পাতার মতোন ঢলঢলে আদুরে মুখটা, এই মূহুর্তে ওর ডাগর চোখ দুটো ওর ঝাপসা চোখেই নিবদ্ধ রয়েছে। সায়র সেই কতক্ষণ ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে নীলিমা নির্লিপ্ত কন্ঠে শুধালো,

— তাকিয়ে আছেন কেন এভাবে? আমিতো ডা'ইনী বুড়ি।

নীলিমার কন্ঠে ক্ষোভ অভিমান দুটোই প্রকাশ পেলো, সায়র তাতে পাত্তা না দিয়ে বোকার মতো হেঁসে বললো,

— চুমু খাবো বলে, জেকে বলেছে মাল খেলে চুমু খাওয়া খুব ইজি। সায়রের কথায় নীলিমা নাক মুখ কুঁচকে বললো,

—- যেমন আপনি, তেমন আপনার বন্ধুরা,কি শিক্ষা, ছ্যাহ!

সায়র চোখ ছোট ছোট করে নীলিমার হাত টেনে ওকে কাছে এনে বললো,
— আসোনা একটা চুমু খাই, নইলে আমি ওদের মুখ দেখাবো কি করে বলোতো?
—- মাস্ক পড়ে থাকবেন ব্যাস তাহলেই আর মুখ দেখাতে হবে না, এখন ঘুমানতো।
নীলিমার কথার প্রত্যুত্তরে সায়র নেশালো গলায় আবদারের সুরে বললো,
—- সেদিনের মতো ড্রেস খুলে আমার সাথে ঘুমাবে প্লিইইইজ, এক্সুয়ালি,এক্সুয়ালি আই ওয়াজ এনজয়েড ইট,কি সুন্দর তুমি। সায়রের মাতাল মাতাল অস্পষ্ট কথা শুনে শুষ্ক ঢোক গিললো নীলিমা, কি ভেবে যেন সায়রের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো হুট করেই, আজ প্রথমবার ওর নিজের হৃদয়টাও কেমন যেন সায়রের জন্য উথাল পাথাল করছে, মন বলছে এটাই ভবিতব্য, আজ কিংবা কাল সায়রের কাছে আবেদনময়ী নারী রূপে নিজেকে উপস্থাপন করতেই হবে। এ যে সায়রের কঠোর অধিকার,তাতে কি করেই বা বাঁধা দেবে নীলিমা? যার দরুন একটু আগের সেই জিদি নারী সত্তাটা সায়রের পুরুষ সত্তার কাছে হার মেনে মাথা নত করে ফেলেছে মূহুর্তেই।
নীলিমা ভবঘুরে হয়ে কি যেন ভাবছে তখন থেকে, সায়র সেই মূহুর্তটারই ফায়দা নিলো, ওকে একটানে নিজের দিকে ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট ডোবালো নীলিমার তুলতুলে নরম র’ক্তরাঙা অধর যুগলের ভাঁজে। সায়রের প্রথম স্পর্শে অকস্মাৎ কেঁপে উঠল নীলিমা, অথচ সায়রের স্পর্শগুলো কতটা নরম আর স্বস্তিদায়ক তা বলে

বোঝানোর নয়, এটা ছিল একটা সুন্দর প্যাসোনেট চুমু যার ফলরূপ নীলিমার হৃদয় মন সবকিছু ক্রমশ নাড়িয়ে দিচ্ছে উত্তাল সমুদ্রের মতো বেসামাল ঢেউ। ক্ষণে ক্ষণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে অযাচিত বন্য চাহিদারা। সায়র নীলিমার হাতে হাত রেখে আধশোয়া হয়ে আছে, আর নীলিমা ওর উপরে,গভীর চুম্বনে একটা ভেজা নরম অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে নীলিমাও কেমন যেন নেতিয়ে পরলো, নিজের অজান্তেই হাত নিয়ে রাখলো সায়রের কাঁধের উপর, ঠিক সেই সময় সায়র চেতনা হারিয়ে বিড়বিড় করতে করতে আস্তে করে ঢলে পরলো নীলিমার বুকের উপর।

, অসহ্য রকম বিরক্তিকর একটা পরিস্থিতিতে পরে অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ খুললো নীলিমা, ও এখনো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সায়র অস্পষ্ট আওয়াজে বলছে,— তুমি অনেক সুন্দর রাগীনি, তুমি অনেক বেশি সুন্দর, আই ওয়ান্না টাচ ইউ, কিস ইউ, ইভেন .....

এটুকু বলেই পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে পরে রইলো সায়র,

এদিকে সায়রের কথায় প্রচন্ড বিরক্ত লাগছে নীলিমার। ও এক ধাক্কায় সায়রকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দাঁত কটমটিয়ে বললো,

—- মাতাল একটা। কাল সারারাত ক্রীতিককে ফোনে না পেয়ে আজ সকাল সকাল ডাক্তার সমেত বাড়ি বয়ে এসে ক্রীতিককে চেকআপ করিয়েছে প্রত্যয়, ডাক্তার বলেছে ক্রীতিকের শরীর এখনো অনেকটা দূর্বল, এ্যা'ক্সিডেন্টের ধকল কাটিয়ে উঠতে আরও কিছুটা সময় লাগবে, তার উপর কালকে একটু বেশিই প্রেশার দিয়ে ফেলেছে নিজের অসুস্থ শরীরটাকে, যার দরুন এই মূহুর্তে হাতে স্যালাইন লাগিয়ে হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে ক্রীতিক।

ওর একহাতে আইপ্যাড আর কানে হেডফোন,এভাবে বসে বসে কি শুনছে কে জানে?ক্রীতিকের থেকে হাত কয়েক দূরে স্টাডি টেবিলে বসে তখন থেকে ল্যাপটপে কি যেন টাইপ করছে অরু। আসলে আজ বহুদিন বাদে আবারও লিখতে বসেছে ও, লিখালিখিটা মূলত এমনই, হৃদয় থেকে শব্দগুচ্ছ উগরে না বেরোলে একটা অক্ষরও লেখার শক্তি নেই। অরুও পারেনি এতোগুলা দিন বসে থেকেও কোনো একটা বাক্য সাজাতে, কারণ মনের ব্যথা আর মস্তিষ্কের হয়রানি ওকে লিখতে দেয়নি, কোনো এক অজানা শক্তিবলে আঙুল গুলোকে করে দিয়েছিলো অসার আর অপারগ। বহুদিনের সেই অপারগ শক্তিবলকে হটিয়ে, আজ আবারও শান্ত মস্তিষ্কে মনদিয়ে লিখছে অরু।অফিসে কাজ আছে বলে প্রত্যয় অনেক আগেই চলে গিয়েছে, যদিও ক্রীতিক নিজেই নিজের কাজ করতে পারে, তবুও প্রত্যয় যাওয়ার আগে অরুকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে, এছাড়া ক্রীতিকের কথামতো কালকের ঘটনার জের ধরে অরুকেও প্রাথমিক চিকিৎসা আর কিছু ওষুধ পত্র লিখে দিয়ে গিয়েছেন ডাক্তার।
ক্রীতিকের স্যালাইন শেষ পর্যায়ে, অরু তখনও সচকিত হয়ে একধ্যানে টাইপ করছিল, এমন সময় ভাইব্রেট আওয়াজ তুলে কম্পিত হয়ে বেজে উঠলো ক্রীতিকের ফোন, মোবাইল ফোনটা তখন অরুর কাছেই ছিল, কারণ অনুর সাথে কথা শেষ করে আর ক্রীতিককে ফেরত দেওয়া হয়নি ফোনটা, এখানেই রেখে দিয়েছিলো মনের ভুলে। তাই এই মূহুর্তে ল্যাপটপের দিক থেকে চোখ সরিয়ে চেয়ার ছেড়ে মোবাইল হাতে ক্রীতিকের কাছে এগিয়ে গেলো ও,

ক্রীতিকের দিকে মোবাইলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো,—- ক্লাব থেকে কল এসেছে।
ক্রীতিক কানের হেডফোন খুলে একনজর মোবাইলে চোখ বোলালো, অতঃপর কলটা কেটে দিয়ে সেটাকে অযত্নে ছুড়ে মা'রলো বিছানার এককোনে।
— কি হলো?
অরুর প্রশ্নে ক্রীতিক ওর পানে চেয়ে শান্ত স্বরে বললো,
— কিছুই হইনি বেইবি।
—- তাহলে ফোনটা এভাবে ছুড়ে ফেললেন কেন?
ক্রীতিক অরুকে কাছে টেনে এনে নিজের পাশে বসিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললো,
—- যে রাইডিং এর কারনে আমার হার্টবিট এতোটা ব্যথা পেয়েছে, যে রাইডিং আমাদের এভাবে আলাদা করে দিয়েছে, সেই রাইডিং আমি পুনরায় কন্টিনিউ করবো ভেবেছিস? ইভেন আই হেইট বাইক। আজ থেকে আমার একটাই অবসেশন, আর সেটা হলি তুই।
এতোক্ষণ ধরে ক্রীতিকের কথাগুলো মনোযোগী হয়ে চুপচাপ শুনলেও,এই মূহুর্তে চট করে উঠে দাড়িয়েছে অরু।
অরুকে উঠে যেতে দেখে ক্রীতিক গভীর গলায় প্রশ্ন ছুড়লো,— হোয়াট হ্যাপেন বেইবি?
অরু দ্রুত হাতে স্যালাইন খুলতে খুলতে বললো,
— স্যালাইন শেষ হয়ে র'ক্ত উঠে এসেছে, তবুও চুপ করে আছেন, বলি আপনার কি অনুভূতি শক্তি নেই নাকি?
স্যালাইন খোলা হয়ে গেলে, ক্রীতিক অরুকে হ্যাঁচকা টানে নিজের বুকের উপর ফেলে দিয়ে বললো,

—- কে বলেছে নেই?কাছে আয় দেখাচ্ছি,
অরু মুখ ভার করে বললো,
— থাক আর দেখাতে হবে না, হাতে লাগবে আপনার।
—- নো ওয়ে।
কথাটা বলেই অরুকে ধা'ক্কা মে'রে বিছানায় ফেলে দিয়ে ওর উপর উঠে বসলো ক্রীতিক, দু'হাতে অরুর নরম কব্জি দুটো চেপে ধরে হাস্কিস্বরে বললো,—-কাল আমার কতটা কষ্ট হয়েছে সে খবর রাখিস তুই? সারারাত একটুও ঘুমাতে পারিনি, তাও নিজেকে বারবার বুঝিয়েছি, আমার পিচ্চি বউটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল,এই ঘুমন্ত পরীটাকে কি করে জাগাতাম আমি? আমিতো নির্দয় মানব তবুও এই নি'ষ্ঠুরতম কাজটা করতে পারিনি আমি,ফলে রাতের মতো ছাড় দিয়েছি তোকে। সকাল বেলা যে কিছু করবো তাও সহ্য হলোনা তোর উজবুক দুলাভাইয়ের,কোথা থেকে যেন উড়ে এসে স্যালাইন ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলো, আর এখন তুই ও বাহানা দেখাচ্ছিস? কি সাহস তোর অরু? ভয় করছে না আমাকে?
মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে অরু লাজুক হেসে জবাব দিলো,
— না করছে না, আপনার সবরকম রুপ দেখেই অভস্ত্য আমি।—- বেইবি লুক এট মি,
ক্রীতিকের ডাকে ওর চোখে চোখ রাখলো অরু, তৎক্ষনাৎ হৃদয়ে ঝড় বইতে শুরু করে অরুর, ওলট পালট হয়ে যায় আবেগের সমুদ্র, কি ভ'য়ানক আকর্ষন ওই ভাসমান চোখ দুটোতে, অরু আজও বুঝতে পারেনা কি আছে ওই দু'চোখে? যা অরুকে এভাবে নিস্তেজ করে ছাড়ে, হৃদয়ের কূল ভে'ঙেচুড়ে প্লাবিত করে দেয় মূহুর্তেই।

আজ সকল সংকোচ উপেক্ষা করে অরু প্রশ্নটা করেই বসলো ক্রীতিককে, তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধালো,

—- কি আছে আপনার দু’চোখে বলুন না?

হাতে ক্যানোলা থাকার দরুন ব্যস্ত হাতে অরুর শরীরের সম্ভ্রমটুকু টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ক্রীতিক হিসহিসিয়ে জবাব দিলো,

—- অবসেশন, আই থিংক আনহেলদি অবসেশন।

নিজের জামার নড়বড়ে হাল দেখে অরু অসহায়ের মতো করে বললো,

—- কি করছেন, আমার পছন্দের জামা এটা।

ক্রীতিক উদভ্রান্তদের মতো অরুর কপালে চুমু খেয়ে জবাব দেয়,

— আবার কিনে দেবো বেইবি, একটা নয় দশটা কিনে দেবো, তাও এখন চুপ করে থাক, না না কি যেন বলছি? জাস্ট কন্টিনিউ ইট।

ক্রীতিকের কথা মতো অরু পুনরায় শুধালো,

—- আর?অবসেশনের বাইরে গিয়ে অরুর প্রশ্নের সঠিক উত্তর বোধ হয় ক্রীতিকেরও অজানা, দুনিয়াতে এতো সুন্দরী আর আকর্ষনীয় মেয়ে থাকতে কেন ও অরুর জন্যই শুধু এতো পাগলামি করে, কে জানে? অজানা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলো ক্রীতিক, বরং এক সমুদ্র ভালোবাসায় হারিয়ে যাওয়ার প্রয়াশে মুখ বাড়িয়ে দিলো অরুর তুলতুলে নরম উন্মুক্ত গলার ভাঁজে। তবে ওর অধর জুগল অরুকে স্পর্শ করার আগেই অরুর গলায় অনেক গুলো কালচে ক্ষত দেখতে পেয়ে ভীষণ ব্যতিগ্রস্থতায় কপাল টা কুঁচকে এলো ক্রীতিকের।

ও সেগুলোতে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে অকস্মাৎ শক্ত হাতে গলাটা চে’পে ধরলো অরুর। ক্রীতিকের স্পর্শ বরাবরই তীব্র বেদনাদায়ক, কিন্তু

কোনটা ভালোবাসার স্পর্শ আর কোনটা ক্ষো'ভের সেটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে অরু। যার দরুন, অসহনীয় ভালোবাসার স্পর্শের মাঝে হুট করেই এমন রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় কিছুটা আ'তঙ্কিত হয়ে ক্রীতিকের চোখের দিকে চাইলো অরু, দেখলো একটু আগের সেই কামুক চোখদুটো কখন যে উধাও হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্রীতিকের হাতের বাঁধনটা এতোই দৃঢ় যে অরুর দম আটকে আসছে,চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পরছে আপনাআপনি, তবুও বহু কসরত করে ক্রীতিকের আ'গুনের হালকার মতো চোখের দিকে চেয়ে অস্পষ্ট আওয়াজে অরু শুধালো,— কি হয়েছে, লাগছে তো আমার।

অরুর কথায় পাত্তা দিলোনা ক্রীতিক, মুখের পেশীগুলো শক্তকরে অত্যন্ত ধীর কন্ঠে বললো,

—- গত দু'মাস ধরে তোকে স্পর্শ করিনি আমি, তাহলে এগুলো কি? কে করেছে তোর শরীরে পার্পল মার্ক? আমার জিনিসে কে হাত দিয়েছে?

শেষ কথাতে ধমকে উঠলো ক্রীতিক, অরু নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না কোন দাগের কথা বলছে ক্রীতিক? তাছাড়া কেমন করেই বা এলো এই দাগ? অরুর মাথাটা কাজ করছে না, এদিকে ছাফছাফ উত্তর দিতে না পারলে ক্রীতিক নির্ঘাত মে'রে ফেলবে ওকে, সেই ভয়ে অরু আমতাআমতা করে বললো,

—- আপনি কাল কথা দিয়েছিলেন আআমাকে আর মা'রবেন না, আ…

— এইইই চুপ, রাখ তোর কমিটমেন্ট, আগে জবাব দে, আমার জিনিস কে এভাবে স্পর্শ করেছে? নয়তো আজ তোর শরীরের

কোনো যায়গা বাদ রাখবো না আমি অরু, র’ক্তা’ক্ত করে ফেলবো একদম , এর থেকেও বেশি জঘন্য অবস্থা হবে তোর। কথা বলতে বলতে অরুকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিলো ক্রীতিক। ক্রীতিকের সেই টানে অরুর মনে হলো বাহু থেকে ওর হাতটাই ভে’ঙে চলে আসবে, কোনোমতে কম্ফোর্টারের ভাঁজে নিজেকে আড়াল করে অরু ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে হেচঁকি তুলে বললো,

— বিশ্বাস করুন, আমি জানিনা কি ভাবে হলো এসব।

এই মূহুর্তে ক্রীতিকের মেজাজ চড়ে আছে সপ্তম আসমানে,সেই সাথে উগ্রতা ছড়িয়ে পরেছে চোখে মুখে এমনকি সমগ্র শরীর জুড়ে, ও পারলে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো অরুকে, ওর জিনিসকে কেউ এতোটা গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে আর অরু কিনা সেটা এরিয়ে যাচ্ছে? কত বড় কলিজা ওর।

মাত্রাতিরিক্ত চড়াও মেজাজের ফলসরুপ এবার অরুর চো’য়ালটা শ’ক্ত হা’তে চেপে ধরলো ক্রীতিক, সেভাবেই অরুর মুখের সামনে মুখ এনে কঠিন গলায় বলে উঠলো ,—- জানিস না মানে? তোকে কেউ এভাবে স্পর্শ করলো আর তুই জানিসই না? কার সাথে শুয়েছিস সত্যি করে বল? দাগগুলো তো তরতাজা মনে হচ্ছে, অমিতের সাথে নয়তো?

অরু তৎক্ষনাৎ আ’তঙ্কি’ত হয়ে এদিক ওদিক জোরে জোরে মাথা নাড়ালো।

তবে তা দৃষ্টিগোচর হলোনা ক্রীতিকের তার আগেই ওর চোখ গিয়ে ঠেকল স্টাডি টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপের দিকে, যেখানে অরুর বহুকষ্টের লেখাগুলো এখনো ফ্রন্টপেজে ভাসছে, ক্রীতিক

সেদিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে দাঁত পিষে বললো,—- আমি জানতাম এই অমিতের প্রতি তোর ভীষণ দূর্বলতা।
—- কি বলছেন এসব পা’গল লোক?
এতোক্ষণ নিজেই ভীষণ দ্বিধাদন্দের মধ্যে থাকায় অরু খুব একটা খেয়াল করতে পারেনি ক্রীতিকের কর্মকান্ড, কিন্তু যেই মূহুর্তে মনে পরে গেলো এটা আসলে রেজার কাজ, সেদিন ধ’স্তাধস্তি’র সময় রেজা অসংখ্যবার অরুর কলার টেনে ধরেছিল, যার প্রেক্ষিতে নখের আঁচড় বসে এমন কালচে হয়ে গিয়েছে কলার বোন গুলো, ঠিক তখনই চেচিয়ে উঠলো অরু।
তবে অরুর চেঁচানোতে খুব একটা যায় আসলো না ক্রীতিকের, ও রাগের বশবর্তী হয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে অরুর ল্যাপটপটা তুলে নিয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আছাড় মা’রলো মেঝেতে , প্রথমবারে খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি না হওয়ার দরুন, ক্রীতিক পুনরায় সেটা হাতে তুলে নিয়ে এবার জানালা দিয়ে বাইরে ফেলতে উদ্যত হয়।
চোখের সামনে নিজের স্বপ্ন, এতোগুলো দিন ধরে জমানো লেখা সব এভাবে নিজের স্বামীর হাতে ধ্বং’স হয়ে যেতে দেখে বিছানা ছেড়ে ছুটে এসে ক্রীতিককে আটকালো অরু, পেছন দিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—- থামো প্লিজ, ওটা ফেলোনা, আমি তোমাকে সব খুলে বলছি, তাও ওটা ফেলোনা দয়া করে, এখানে অমিতের কোনো যোগসূত্র নেই, লেখালিখি আমার ছোটবেলার স্বপ্ন।
ক্রীতিক থামলো, ল্যাপটপটা বাইরে না ফেলে ছুড়ে মা’রলো টেবিলের উপর।

অরুর” তুমিতে” কাজ হয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ও। এরপর সেভাবেই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে একে একে রেজার ঘটনা সব খুলে বললো ক্রীতিককে, ক্রীতিক শুধু দু'হাত মুঠি বদ্ধ করে সবটা চুপচাপ শুনে গেলো, অতঃপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অরুকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে গমগমে আওয়াজে শুধালো,

—- আর কোথায় টাচ করেছে বা’স্টা’র্ডটা?ক্রীতিকের কথার জবাবে অরু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে না সূচক মাথা নাড়ালে, ক্রীতিক কি ভেবে যেন নিজের শার্টটা খুলে অরুর উন্মুক্ত শরীরটা ঢেকে দেয়,পরমূহুর্তেই নিজে একটা হুডি পরে সিগারেট আর ওয়ালেট নিয়ে গটগটিয়ে বেরিয়ে যায় রুম থেকে, যেতে যেতে অরুর উদ্দেশ্যে বলে,

— ফ্রেশ হয়ে রেস্ট কর, তোকে টায়ার্ড লাগছে।

ক্রীতিকের কথায় জবাব দিলোনা অরু, উল্টো রাগে ক্ষো’ভে ফোসফাস করতে করতে ক্রীতিক বেড়িয়ে যেতেই ধাপ করে লাগিয়ে দিলো বেডরুমের বিশাল দরজাটা।সে বেলা সেভাবেই কেটে গেল, সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো, দুপুর পেরিয়ে বিকেল ,এক পর্যায়ে বিকেল পেরিয়ে আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে রাত নেমে এলো সুবিশাল ধরনী জুড়ে, তখনও অরু যেন অস্তিত্বহীন, সারাদিনেও একটিবার দরজা খোলে নি ও। আর নাতো খোঁজ নিয়েছে ক্রীতিকের, ওদিকে ক্রীতিকও কেন যেন আগ বাড়িয়ে ঘাটায়নি অরুকে,আর ঘাটাবেই বা কেন? ও কি তার যোগ্যতা রাখে আদৌও? তাছাড়া অরু দরজা খুললে কিইবা জবাব দেবে ও? এইতো সকালেই, শুধু শুধু মেয়েটাকে কথার আ’ঘাতে ছি’ন্নভি’ন্ন করে দিয়েছে ক্রীতিক। ওর মাত্রাতিরিক্ত পসেসিভনেস, অবসেশন,

টক্সিসিটি এসব অরুকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, ক্রীতিক সেটা ভালোকরেই জানে, তবুও কেন যেন রাগ উঠলে নিজেকে সংযত করতে পারেনা ক্রীতিক, অরুর বেলায় তো মোটেই না, তখন বারবার মনে হতে থাকে এই শরীর এই আত্মা সব আমার, সব। ওর সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি আমি, আমাকে বাঁধা দেওয়ার অধিকার কেউ রাখেনা, সয়ং অরু নিজেও না।অথচ রাগ পরে গেলে সে সব ঘটনার জন্য ভীষণ অনুশোচনায় হৃদয়টা হাহাকার করে ওঠে ক্রীতিকের, বারবার মনে হয়, একটু একটু করে ভালোবাসার বীজ বপন শেষে ছোট্ট চারাগাছ থেকে বেড়ে ওঠা ফুলের মতো পবিত্র আত্মাটাকে কি করে এতোটা আ’ঘাত করলাম আমি? আমার মতো একটা লাগামহীন ছন্নছাড়া ছেলেকে ভালোবেসে অরুও তো আজ অবধি কম য’ন্ত্রনা সহ্য করেনি, শুধু মাত্র আমার টানে ইউ এস এ পর্যন্ত চলে এসেছে মেয়েটা, আর আমি? হিজিবিজি ভাবতে ভাবতেই ভীষণ ক্ষো’ভে চিৎকার করে উঠলো ক্রীতিক,

—- আআআআহ ফা’কড মাই এ্যারোগেন্সী।এখন নিশ্চয়ই অরু ক্রীতিকের কোনো কথা শুনবে না? হ্যা, ক্রীতিক পারে অরুকে জোর জবরদস্তি করতে কিন্তু সকালের ঘটনার পরে সেটাকি আদৌও উচিৎ হবে? সেই ভেবেই নিজেকে সারাটাদিন গুটিয়ে রেখেছে ক্রীতিক, দুপুরের সময় অরুর পছন্দের বিরিয়ানি অর্ডার করে সেটাকে ড্রোনের সাহায্যে জানালা দিয়ে অরুর রুমে পাঠিয়েছে, তাও ওকে এই টুকু বিরক্ত করেনি ক্রীতিক। খাবারের সাথে দিয়ে দিয়েছে ছোট্ট একটা চিরকুট, যাতে লেখা,

—- আ'ম সরি হার্টবিট, আর এমন হবে না, জীবনেও হবেনা, একটু রুমে এলাউ কর, তোকে অনেক আদর করবো।
সাথে দুঃখী দুঃখী একটা ইমোজি। তবে এই চিরকুট ফিরকুটে আজ আর মন টললো না অরুর। ও খাবারটা রেখে দিয়ে চিরকুটটা পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দেয় ড্রোনের সাথে , ড্রোনটা চিরকুট সমেত ফিরে আসায় ক্রীতিক ভেবেছিলো অরু হয়তো কিছু লিখে পাঠিয়েছে, তাই তাড়াহুড়ো করে ব্যাকইয়ার্ড থেকে ড্রোনটা কুড়িয়ে চিরকুট খুলে ক্রীতিক দেখতে পায়, ওর সরিটা কেটেকুটে সেখানে কতগুলো রাগি ইমোজি এঁকে দিয়েছে অরু।
অগত্যাই বউয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাটা, নদীতে বহমান উল্টো স্রোতের মতোই বিফলে চলে গেলো জায়ান ক্রীতিকের।অন্ধকারের মাঝে হাই পাওয়ারই চশমা দিয়েও খালি চোখে চারিদিকের কোনোকিছুই দেখার উপায় নেই, অথচ এই নিকোশ আধারের মাঝেও সায়রের দুঃখী দুঃখী মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অর্ণব। খানিকবাদে বাদেই ফোঁসফাস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে সে। ঘটনাটা এক কিংবা দু'মিনিট ধরে চলমান নয়, সেই যে পাহাড়ের চূড়ায় এসে তিনজন মিলে বসেছে তখন থেকেই চারিদিকে নিরবতা বিরাজমান, ফাঁকে ফাঁকে সায়রের দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ ভেসে এলেও ক্রীতিক নিরবে স্মোক করছে শুধু , এদের দুঃখী দুঃখী ব্যথাতুর চিত্তের মাঝে পরে অর্ণবের নিজেকে এলিয়েন মনে হচ্ছে, যার আদতে কোনো দুঃখ কষ্ট বলে কিছুই নেই।
অথচ এলিসার প্রেগন্যান্সি মুড সুইং এর খপ্পরে পরে প্রতিদিন কি মা'রটাই না হজম করে ছেলেটা, সে কথা না হয় অজানাই থাক। আপাতত সায়রের এই দীর্ঘশ্বাস মেনে নেওয়া যাচ্ছে না মোটেই,

ওকে থামাতে হবে, তাই কিছুটা বিরক্ত হয়ে অর্ণব বলে ওঠে,—- কি হয়েছে বলতো? এভাবে নিঃশ্বাস নিতে থাকলে তো হায়াত ফুরাবার আগেই ম’রে যাবি তুই?

তৎক্ষনাৎ সায়র খেঁকিয়ে উঠে বললো,

—- তোদের মতো হা’ড়বজ্জাত বন্ধু থাকার চেয়ে ম’রে যাওয়া অনেক ভালো, শালা কি খাইয়ে পাঠালি কাল রাতে? কিছুই মনে নেই, সকালে উঠে দেখি বউ আমার রেগে বো’ম হয়ে আছে।

অর্ণব কপাল কুঁচকে বললো,

— চুমু কি খেয়েছিলি নাকি খাসনি? রাগটা করেছে কেন সেটা নিশ্চয়ই জানিস?

সায়র মুখ কাচুমাচু করে বললো,

—- আমার কিছুই মনে নেই, আর নীলিমা তো কথাই বলছে না,ব্রেকফাস্টে পো’ড়া রুটি খেতে দিয়েছে,তাও একটা।

সায়রের কথার পাছে অর্ণব মিনমিনিয়ে অসহায় সুরে বললো,

— তোর বউতো তাও খেতে দেয়, আমার বউ তো সকালে উঠেই ক্যারাটে প্র্যাকটিস করতে বেরিয়ে যায়।

— কিছু বললি?

অর্ণব না সূচক মাথা নাড়ালো, বললো,— শোন, তুই আজ গিয়ে নীলিমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবি, যে আদৌও তুই কিছু করেছিস নাকি করিসনি। যদি না করিস, তাহলে নতুন প্ল্যান বানাবো আমরা।যার নাম হবে মিশন ফুলসজ্জা ।

অর্ণবের কথায় সায়র হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে ক্রীতিকের দিকে তাকিয়ে বললো,

—-- তুই এখানে কি করিস? তোর না বাড়িতে বউ এসেছে? তাও তোর আমাদের সাথে আড্ডা দিতে মন চাইলো? স্ট্রেঞ্জ!
ক্রীতিক মুখ দিয়ে নিকোটিনের ধোঁয়া ছেড়ে বললো,
—-- বউ রাগ করেছে।
তৎক্ষনাৎ নির্বিকার গলায় অর্ণব বলে উঠলো,
—-- তো রাগ ভাঙালেই তো হয়, তাছাড়া অরু একটা সফ্টি, ও তোর উপর কতক্ষণই বা রাগ দেখাবে? বেশি হলে একঘন্টা।—-- সারাদিন,
অর্ণবের মুখের উপর কথাটা বলে সায়রের মতো করেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ক্রীতিক।
অর্ণব বুদ্ধিমানদের মতো মাথা দুলিয়ে বললো,
—-- বুঝেছি জটিল সমস্যা, তুই একটা কাজ কর, তুই বরং অরুকে কোনো একটা সারপ্রাইজ দিয়ে দে, দেখবি রাগ ফাগ সব উধাও।
অর্ণবের কথায় ক্রীতিক ওর পানে প্রশ্ন সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, অর্ণব পুনরায় বলে,—-- এই ধর, ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে নিয়ে গেলি, ফুল দিয়ে প্রপোজ করছি, কিংবা কোনো রয়েল প্যালেসে নিয়ে গিয়ে ওকে একটু বেহালার সুর শোনালি, সেই বেহালার তালে তোরা দুজন বল নাচ করলি, তোদের পায়ের কাছে জমা হয়ে থাকবে অসংখ্য রঙিন বেলুন, মাথার উপর থেকে ঝড়ে পরবে টকটকে লাল গোলাপের পাপ…..
অর্ণব কথা শেষ করার আগেই ক্রীতিক ওকে ঠাস করে থামিয়ে দিয়ে বললো,
—-- হয়েছে থাম, আমি এসব পারিনা, এগুলো আমার ডিকশনারিতেই নেই, ইভেন আজ পর্যন্ত আমি অরুকে নিয়ে

কোনোদিন শপিং এ অবধি যাইনি, যখন যা প্রয়োজন সব অনলাইনে অর্ডার করেছি, বিয়েটা পর্যন্ত করেছি কোনোমতে, সেখানে তুই কিসব বুদ্ধি দিচ্ছিস? এসব আমার দ্বারা হবেনা।
কথা শেষ করে ক্রীতিক উঠে দাড়িয়ে, ওদেরকে রেখেই চলে যায়, অর্ণব পেছনে ঘুরে ক্রীতিকের যাওয়ার পানে তাকিয়ে গলা উঁচিয়ে শুধায়,—- আরেহ কোথায় যাচ্ছিস?
ক্রীতিক যেতে যেতে জবাব দেয়,
— বউয়ের রাগ ভাঙাতে।
ক্রীতিক চলে গেলে সায়র অর্ণবকে বলে,
—ওদের হঠাৎ কি হলো বলতো?
অর্ণব মোবাইলে কিছু একটা চেইক করতে করতে জবাব দেয়,
—- জানিনা, তবে অরুর মামাতো ভাই রেজা এবার শেষ, ছেলেটা একটু বেশিই ধূর্ত।
সায়রের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পরলো, ও তৎক্ষনাৎ উদ্বিগ্ন গলায় শুধালো,
—- শেষ মানে?
অর্ণব কপট হেসে বললো,
—- কুল সায়র, কাল ইন্টারনেটে এমনিই দেখতে পাবি, এতো হাইপার হওয়ার কিচ্ছুই নেই। গভীর রাতে ঘুমের মাঝে অরুর যখন মনে হতে থাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে একটা খরখরে উষ্ণ হাত অবাধে বিচরণ করছে ওর সমস্ত পৃষ্ঠদেশে ,ঠিক তখনই লাফিয়ে উঠে বসলো অরু, এদিক ওদিক চোখ বোলাতে গিয়ে ড্রীম লাইটের হলদে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো ক্রীতিক বসে আছে ওর মুখোমুখি হয়ে। তারমানে একটু আগের হাতটা ক্রীতিকেরই ছিল,ব্যাপারটা

বোধগম্য হতেই অরু রেখেমেগে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই ক্রীতিক বলে ওঠে,—- ব্যথা করছে হার্টবিট।
ক্রীতিকের কথায় রাগঢাগ ভুলে গিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো অরু, মনেমনে ভাবলো, সত্যিই তো আজ ক্রীতিক একটা অষুধও খায়নি, কি করেই বা খাবে? অষুধ তো সব বেডরুমে ছিল, আর অরুতো রাগের চোটে দরজাই খোলেনি বেডরুমের। ক্রীতিকের ব্যথার কথা শুনে অনুশোচনা হতে লাগলো অরুর মনে, ও তৎক্ষনাৎ ক্রীতিকের বাজ কাট সূচালো চুল গুলোতে হাত বুলিয়ে করুন স্বরে বলে ওঠে,—- মাথায় কি বেশি ব্যথা করছে?
ক্রীতিক না সূচক মাথা নাড়িয়ে অরুর হাতটা নিজ বুকের বাম পাশে রেখে শান্ত স্বরে বললো,
— এখানে ব্যথা করছে , তুই ইগনোর করলে আমার হৃদয়টা ব্যথা করে অরু, খুব ব্যথা করে।মেঘলা আকাশ, বাইরে ঝড়ো হাওয়া বইছে প্রবল বেগে,মাথার উপরের পাইনগাছ গুলো অন্ধকারের মাঝে উথাল-পাথাল হয়ে উড়ছে, যেন কোনো বিদঘুটে জন্তুজানোয়ার।ঘুনাক্ষরেও ভুলবশত সেদিকে একবার চোখ চলে গেলে মনে হয়, এখনই ছুটে এসে বিশাল হা তুলে থাবা বসাবে ঘাড়ে, শুষে নেবে শরীরের শেষ র’ক্তবিন্দু।
দেখলেই কেমন ভয়ে শীড় দাঁড়া বেয়ে নেমে আসে হীমধরা শীতল স্রোত। এমন একটা গা ছমছমে পরিবেশেও নিদারুণ ভঙ্গিমায় ব্যালকনিতে বসে আছে নীলিমা। ওর কোন হেলদোল নেই এই দমকা বাতাসে, যেন এক নির্জীব আত্না, খুলে রাখা রেসমের মতো চুলগুলোও সেভাবেই উড়ছে এলোমেলো হয়ে।নীলিমাকে উদাসীন দেখাচ্ছে, সেই সন্ধ্যা থেকেই কি যেন অযাচিত ভাবনায় বুদ হয়ে

আছে মেয়েটা,মনের মাঝে চলছে হাজারো জটিল সমীকরণ, যা ওর একান্ত নিজের। সমীকরণের সমাধান যে নীলিমার অজানা, তেমনটা নয়। ও তো স্রেফ নিজের যোগ্যতা আর অপরিনামদর্শীতা নিয়ে দ্বিধাদন্দের মধ্যে আটকে আছে, তবুও আজ মন বলছে এবার একটা সমাধান প্রয়োজন,সত্যিই প্রয়োজন।
সায়রের মতো এমন একটা সজীব হৃদয়ের পুরুষের সাথে ঘর বাঁধতে হলে আরও আগে প্রয়োজন।
সায়রের নাম নিতে না নিতেই রুমে এসে হাজির হলো সায়র, কাঁধে তার ছোট্ট ব্যাগপ্যাক, মনে হয় শুট ছিল আজ। সায়রের উপস্থিতি টের পেয়ে নীলিমা পেছনে ঘাড় ঘোরালে সায়র একটা ক্লান্ত মাখা হাসি নিক্ষেপ করলো নীলিমার পানে, নীলিমা সেভাবেই নিস্প্রভ চোখে তাকিয়ে রইলো শুধু , সায়র ব্যালকনির দিকে দু'কদম এগিয়ে এসে নীলিমাকে বললো,— রান্না করেছো কিছু? নাকি আমি করবো?
ওয়েল, সায়রের এই কথাটা নীলিমার কাছে নতুন কিছু নয়, কারন গত দু'মাসে নীলিমা হাতে গোনা কয়েকদিন রান্না করলেও, বেশির ভাগ সময়ই রান্নাবান্নাটা সায়র নিজেই করে , যখন সময়ের অভাবে করতে পারেনা, তখন বাইরে থেকে খাবার অর্ডার দিয়ে দেয়। তবুও রান্নাবান্নার জন্য নীলিমাকে হুকুম করেনা কখনো।
সায়রের কথার পাছে নীলিমা জানালো,
—- করেছি, ফ্রেশ হয়ে আসুন আমি খাবার বাড়ছি।
পরিবেশটা কিঞ্চিৎ অসহনীয় আর দমবন্ধকর, কেমন যেন গুমোট ভাব প্রকাশ পাচ্ছে নীলিমার আচার আচরণে, এ যেন তীব্র ঝড়ের পূর্বাভাস, অবশ্য বাইরেও ঝড়ো হাওয়া বইছে খুব। তাই বেশি কথা

না বাড়িয়ে ফ্রেশ হওয়ার উদ্দেশ্যে জলদি ওয়াশরুমে ঢুকে যায় সায়র। আর যখন বেরিয়ে আসে তখন দেখতে পায় ডাইনিং এ খাবার বেড়ে অপেক্ষা করছে নীলিমা।
মখমলের মতো নরম বাথ টাওয়ালটা গলায় ঝুলিয়ে সায়র এগিয়ে গিয়ে খেতে বসলো চুপচাপ, সবকিছু এখনো আগের ন্যায় থমথমে, নীলিমা কেমন যেন আজকে একটু বেশিই চুপচাপ। চুলফুল খুলে অমন বারান্দায় বসেছিল, পাইন গাছের পেত্নী ভর করলো কিনা সেটাও ভাবনার বিষয়, সায়র ভাবলো কিছুক্ষণ, অতঃপর নিরবতা ভেঙে আগ বাড়িয়ে বলে উঠলো ,
—- বলছি যে নীলিমা, কোম্পানি থেকে আমাকে বড় একটা এপার্টমেন্টে ওঠার জন্য বলা হচ্ছে, আমার ম্যানেজার ও সেখানে সর্বক্ষন কর্মরত থাকবে, তুমি যদি বলো তো এই এ্যাপার্টমেন্টটা আমরা শীঘ্রই ছেড়ে দেবো।
নীলিমা খেতে খেতে গভীর কন্ঠে বললো,— কেন, এই বাসাটায় কি সমস্যা? এখানেও তো আপনার ম্যানেজার আসে প্রয়োজন হলেই।
সায়র একটু ভেবেচিন্তে শান্তস্বরে জবাব দিলো,
— আই নো, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে , এবার আমাদের এই বাসাটা থেকে অন্য কোথাও মুভ করা দরকার, একটা প্রোপার গোছানো সংসার প্রয়োজন আমাদের, ইউ নো হোয়াট আই মিন। নয়তো..
থেমে গেলো সায়র, নীলিমা বেশ শান্ত স্বরে শুধালো,
— নয়তো কি?
— নয়তো আমাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক হচ্ছে না কিছুতেই,আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে, যেটা ঘুচিয়ে ফেলা খুব

প্রয়োজন নীলিমা, আমি তোমার সাথে সারাজীবন থাকতে চাই আর পাঁচটা কাপলের মতো গুছিয়ে সংসার করতে চাই, বাচ্চাকাচ্চা জন্ম....
আবারও মাঝপথে কথা আটকে গেলো সায়রের। নীলিমা কিছুই বলছে না,মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে শুধু l নীলিমার নীরবতা সায়রকে পীড়া দেয়, অজানা অধিকারবোধে ফুঁসে ওঠে হৃদয়টা, তবুও নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রেখে গভীর কন্ঠে সায়র বলে,— হতে পারে আমার এই পুরাতন এপার্টমেন্টটাই সেই দূরত্বের একমাত্র কারন,নয়তো এখনো সংসার সংসার ফিলটা পাচ্ছি না কেন? কেনইবা কাছে থেকেও তুমি এতো দূরে?
এবার একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো মনে হচ্ছে, সায়রের কথায় কোনোরূপ প্রত্যুত্তর না করেই টেবিল ছেড়ে উঠে যায় নীলিমা, ওর থমথমে চেহারা সুরতে রাগ স্পষ্ট। নীলিমাকে চলে যেতে দেখে সায়র ওকে আবারও পিছু ডেকে বলে,
— সত্যি করে বলো তো, তুমি এখনো আমার উপর রাগ করে আছো তাইনা? জোর করে বিয়ে করেছি বলে?
—- না নেই,
— কি নেই?
— আমি আপনার উপর রাগ করে নেই।
নীলিমার সোজাসাপটা উত্তর, নীলিমার উত্তর শুনে সায়র একটু স্বস্তিতে চোখ বুজলো, পরক্ষণেই চট করে চোখ খুলে নীলিমাকে ডেকে বলে উঠলো,— নীলিমা!লাস্ট কোশ্চেন?
এবার দাড়িয়ে পরলো নীলিমা, আস্তে করে পেছনে তাকিয়ে শুধালো,
—কি?

— কাল রাতে আমি কি কিছু...? না মানে তোমার সাথে কোনো অভদ্রতা?
সঙ্গে সঙ্গে কঠিন জবাব ভেসে এলো নীলিমার দিক থেকে,
— হ্যা করেছেনই তো, চরম অভদ্রতা করেছেন। যা নয়, তাই বলে গালি দিয়েছেন আমাকে ,ডা'ইনী বুড়ি, কু'টনী বুড়ি, পিশাচিনী, আরও কত কিই।
নীলিমার কথা শুনে সায়র আহাম্মক হয়ে গেলো, শেষমেশ কিনা মাল খেয়ে নিজের বউকে এভাবে গা'লিগালাজ করেছে ও, ছিহ! সব দোষ এই হা'রামি বন্ধুগুলোর। শালা বুদ্ধি দেওয়ার নাম করে একেবারে ফাঁ'সির আ'সামি বানিয়ে ছেড়ে দিলো?
সায়র অসহায়ের মতো করে ঠোঁট উল্টে তাকিয়ে আছে দেখে,নীলিমা এবার হনহনিয়ে রুমের দিকে চলে গেলো। নীলিমা রেগেমেগে চলে যাচ্ছে,ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পেছন থেকে হাঁক ছেড়ে ডাকলো সায়র,— নীলিমা, নীলিমা শোনো একটু, আমি আসলে ওভাবে মিন করতে চাইনি, বিশ্বাস করো কাল রাতে যা করেছি, যা বলেছি, সে সব কিছুই আমি মনের ভুলে করেছি, আই সয়ার একটা কথাও আমার মনের কথা ছিলনা।
সায়রের কথায় পেছনে ঘুরে চোখ ছোট ছোট করে তাকালো নীলিমা, বললো,
— তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কাল আপনি আমাকে ভুল করে চুমু খেয়েছেন? আর যে ওই যে আদুরে কথাগুলো, সেগুলোও সব মিথ্যে ছিল?
এবার যেন আকাশ ভেঙে পরলো সায়র, ওর মাথার মধ্যের ঘিলু সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি ও কাল নীলিমাকে চুমু

খেতে পেরেছিল? নাকি নীলিমা ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে? মনের মাঝের হাজারো কনফিউশান দূর করার উদ্দেশ্যে ভ্যাঁবাচ্যাকা খেয়ে সায়র অস্ফুটে বললো,
— ইয়ে মানে সত্যিই কি চুমু খেয়েছিলাম?
বুকের উপর দু'হাত ভাজ করে দাঁড়িয়ে, নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় নীলিমা,
—হ্যা, খেয়েছিলেন।
নীলিমার কথায় বুকের উপর থেকে যেন পাথর সরে গেলো সায়রের, এতোক্ষণে ভেতরটা কেমন শান্তি শান্তি লাগছে, মনে থাকুক বা না-ই থাকুক, চুমু যে খেয়েছিল এটাই বড় কথা, সেই ভেবে উৎফুল্লতায় কুলকুলিয়ে হেঁসে উঠে সায়র বললো,—- বিশ্বাস করো নীলিমা কাল যা করেছি, যা বলেছি, সব মন থেকে করেছি, সব।
সায়রের কথায় আচমকা চোখ মুখ কুঁচকে গেলো নীলিমার,যেন বিয়ে বাড়ির পঞ্চ ব্যাঞ্জনের মাঝে হুট করেই কাঁচা করল্লা মুখে পুরে দেওয়া হয়েছে ওর। মুখটাকে সেভাবেই রেখে খেঁকিয়ে উঠে নীলিমা বললো,
— কি বললেন, আপনি যা বলেছেন সব মন থেকে বলেছেন?
সায়র মুচকি হেসে উপুর নিচ মাথা ঝাকালে, নীলিমা দ্বিগুণ রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলো তৎক্ষনাৎ ,
—- তারমানে আপনি বলতে চাইছেন আমি আসলেই একটা ডাইনী বুড়ি?
হকচকিয়ে উঠলো সায়র, জলদি হাসি থামিয়ে বললো,
— এমা সেটা কখন বললাম?

নীলিমা ঠোঁট উল্টে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো,— এই যে এখন বললেন। আপনি কাল রাতে যা বলেছেন সব আপনার মনের কথা। এরপর আর সায়রের প্রত্যুত্তরের জন্য এক মূহুর্ত ও অপেক্ষা করলো না নীলিমা, ঠাস করে ওর মুখের উপরেই লাগিয়ে দিলো দরজাটা। এদিকে নিজের কথায় নিজেই বোকা বনে গেলো সায়র, মনেমনে চোখ মুখ খিঁচিয়ে নিজের গালে নিজেই থাপ্পড় বসালো সজোরে, তারপর চোখ খুলে অসহায় সুরে নীলিমাকে ডেকে বললো,

— বউ আমার, বিশ্বাস করো কাল রাতে একটুও নিজের মাঝে ছিলাম না আমি, আর নাতো হুঁশে থেকে কোনোকিছু করেছি। কাল যা যা বলেছি , যা যা করেছি, এমনকি যদি চুমুও খেয়ে থাকি তাহলে সেটার জন্যও আমি খুবই দুঃখীত, তোমাকে হার্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয় রাগিনী, আমিতো তোমাকে ভালোবাসার জন্য নিয়ে এসেছি, দুঃখ দিতে যাবো কেন বলো? সবাই তো বিয়ের আগে প্রেমে পরে, আমরা না-হয় বিয়ের পরেই প্রেম করবো, তুমি সময় নাও, আমি অপেক্ষারত। আমাদের গল্পটা হবে লাভ আফটার ম্যারেজ।ইজন’ট ইট বিউটিফুল?দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও উদগ্রীব হয়ে নিজেকে নির্দোষ আর শুদ্ধ পুরুষ প্রমান করায় ব্যস্ত সায়র। আজ যে করেই হোক নীলিমাকে বোঝাতেই হবে, যে তার একমাত্র স্বামী হলো সরলতার প্রতীমা, আগাগোড়া একজন শুদ্ধ পুরুষ। সে মাল খেয়ে এসে অনুমতি ব্যাতীত বউকে চুমু্ খেয়ে ফেলেছে, এটা মোটেও শুদ্ধ পুরুষের কাজ নয়, তাই ভুলটুকু স্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ প্রমান করাটা জরুরি।

তবে নীলিমার বোধ হয় এতো বেশি শুদ্ধতায় কিঞ্চিৎ আপত্তি রয়েছে, তাই তো নিজের শুদ্ধ স্বামীকে খানিকটা অশুদ্ধ বানানোর

পায়তারা করে একটা খোলামেলা নাইট ড্রেস পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে খানিকটা আবেদনময়ী রূপে দাঁড়িয়ে পাতলা অধর জুগলে গাঢ় লিপস্টিক লাগাতে লাগাতেই নীলিমা বলে,—- এই নাইটড্রেসটা জামা কাপড়ের প্যাকেটে পেয়েছি, সাইজটা আমারই, কে কিনলো বলুন তো?
নীলিমার কথার কোনোরূপ জবাব দিলো না সায়র, বরং গভীর চোখে ওর ধনুকের মতো বাঁকানো নারী শরীরটা একঝলক পরখ করে শুষ্ক ঢোক গিললো শুধু ।
— কি দেখেছেন অমন করে?
সায়রের চোখদুটো চিকচিক করছে, ও কিছু বুঝে উঠতে না পেরে মনের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বেসর্বা প্রশ্রয় দিয়ে ফট করেই বলে উঠলো,
—- আজকে একটু অশুদ্ধ হতে চাই নীলিমা,উহুম একটু নয় অনেকটা অশুদ্ধ। বাইরে বাতাসের তান্ডব, শেষ রাতে বোধ হয় ঝড় উঠবে। সায়রদের এপার্টমেন্টের চাইতেও ক্রীতিকের এই নির্জন শহরতলীর বাড়িতে বাতাসের বেগ দিগুণ । তবে থাই লাগানো বিশাল জানালা ভেদ করে সেই প্রকান্ড ঝড়ো হাওয়া প্রবেশ করতে পারেনা অরু ক্রীতিকের মাস্টার বেডরুম অবধি। ভেতরে যা প্রবেশ করে তা হলো প্রতিধ্বনিত বাতাসের শাঁই শাঁই আওয়াজ। আওয়াজটা ভ'য়ানক, কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠে,হুট করে যে কেউ শুনলে নির্ঘাত আঁতকে উঠবে। কিন্তু হঠাৎ বইতে থাকা তীব্র ঝড়ো বাতাসের শাঁই শাঁই আওয়াজে আঁতকে উঠল না অরু, এমনকি চমকালোও না খুব একটা। কারণ এর থেকে বড় চমক তো ওর সামনেই বসে আছে, যার নাম জায়ান ক্রীতিক চৌধুরী। মানুষটা আস্ত একটা চমক,প্রতি সেকেন্ড অন্তর

অন্তরই সে চমকে দেয় অরুকে, এই যেমন মাত্রই নিজের খোলস ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে, একেবারে বাধ্য স্বামীর মতো বউয়ের কাছে নিজের অসহায়ত্ব স্বীকার করে নিলো,কোনোকিছু না ভেবেই হদিস দিয়ে দিলো নিজ হৃদয়ের অসহনীয় পীড়ার, এ পীড়া যে নতুন নয়,তবে মুখ ফুটে প্রকাশ করাটা ছিল পুরোপুরি নতুন এক অধ্যায়, এই যে জায়ান ক্রীতিক নিজের অসহায়ত্ব অরুর সামনে তুলে ধরলো, নিজের দূর্বলতা প্রকাশ করে দিলো, এটা কি চারটে খানি কথা? বোধ হয় না। কিন্তু অরুও তো ক্রীতিকেরই বাঁকা পাঁজরের হাড়, এমন ঘাড় ত্যাড়া পুরুষের পাঁজর থেকে সৃষ্টি হওয়া নারী ও তো কম যায়না,তাইতো ক্রীতিকের এমন আবেগাপ্লুত কথাকেও একেবারে সোজাসাপ্টা অগ্রাহ্য করলো অরু, নিজের চূড়ায় উঠে থাকা রাগটাকে এক বিন্দুও না দমিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে সোজা হাঁটা দিলো পাশের বেডরুমের উদ্দেশ্যে, যেখানে আগে, ও আর অনু ঘুমাতো।

অরুর কোমল চেহারায় কাঠিন্যের ছাপ স্পষ্ট, আজ বেজায় চটেছে সে, তারউপর রুম থেকে অবধি চলে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্রীতিক নিজেও এগিয়ে গেলো অরুর পিছু পিছু, ওকে আটকানোর চেষ্টা করে বললো,

— বেইবি, কোথায় যাচ্ছিস? ব্যথা করছে তো।

অরু পিছু ফিরলো না, হনহনিয়ে এগিয়ে গেলো করিডোর ধরে, অরু থামছে না দেখে ক্রীতিক এবার দ্রুত কদমে এগিয়ে অরুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, অতঃপর গেস্ট রুমের দরজাটা সশব্দে লক করে দিয়ে বললো,

— কোথায় যাচ্ছিস?

অরু গাল ফুলিয়ে জবাব দিলো,
— ঘুমাতে। ক্রীতিক ভ্রু কুঁচকে দাঁতে দাঁত চাপলো,মাথাটা সামান্য নুয়িয়ে অরুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো,
— সাহস তো কমনা, আমার সাথে ঘুমাবি না, সেটা আবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিস? তোকে অনুমতি দিয়েছি আমি অন্য রুমে ঘুমানোর?
ক্রীতিকের ডমিনেটিং কথায় অরুর মেজাজটা আরও বেশি বিগড়ে যায়, ও তৎক্ষনাৎ দু'হাতে ক্রীতিকের চওড়া বুকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সামনে থেকে, তারপর গটগটিয়ে হেটে চলে গেলো ছাঁদ বারান্দার দিকে।
বাইরে ঝড়ো হাওয়ার তোড় বেড়েছে বৈকি কমেনি, তবে এই মূহুর্তে অরুর চড়াও মেজাজের কাছে এসব ঝড়ো হাওয়া টাওয়া কিছুই পাত্তা পেলোনা। অরু চলে যাচ্ছে দেখে ক্রীতিক আবারও এগিয়ে এসে পেছন থেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ওকে, পেছন থেকেই এক নাগাড়ে অরুর মাথায়, খোলা চুলে, পিঠে সবখানে শব্দ করে চুমু খেতে খেতে অরুকে মানানোর চেষ্টা করে বললো,— বেইবি, বেইবি আই ডিডন'ট মিন ইট, ইউ নো না, হাউ মাচ আই লাভ ইউ। তাহলে কেন বুঝতে চাইছিস না? কেন এভাবে অবহেলা করে হার্ট করছিস আমাকে? তুই শুধু একবার বল, তুই যা বলবি আমি তাই করবো, তাও প্লিজ আমার সাথে একটু কথা বল। প্লিজ হার্টবিট, আই কান্ট টলারেট দিস পেইন এনি মোর।
ক্রীতিকের চোখে মুখে ভীষন অসহায়ত্ব,হাতে এখনো ক্যানোলা লাগানো , তাই খুব শক্ত করে ধরতে পারেনি অরুকে,যার দরুন অরু একঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ক্রীতিকের বাঁধন থেকে।

নিজেকে ছাড়িয়ে ক্রীতিকের থেকে দূরত্ব বাড়াতে চুপচাপ এগিয়ে গেলো পুলের দিকে। তবুও ক্রীতিক কিছু বললো না,বরং নতুন উদ্যমে এগিয়ে গিয়ে পুনরায় জড়িয়ে ধরলো অরুকে, এবার একটু কৌশল খাটিয়েই অরুকে জব্দ করেছে সে, একহাত রেখেছে অরুর কোমড়ে, অন্যহাত গলা আর বুকের মাঝখানে, এবার আর নড়াচড়া করতে পারছে না অরু, যার ফলরুপ ক্রীতিকের হাতের মধ্যে থেকেই একপ্রকার ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে ও, বলিষ্ঠ দেহের ক্রীতিকের হাতের মধ্যে থেকে চিংড়ি মাছের মতোই লাফাচ্ছে অরু, ওদের ধস্তাধস্তিতে ক্রীতিকের ক্যানোলা লাগানো হাত থেকে ফিনকি দিয়ে র'ক্ত বেড়িয়ে আসে একপর্যায়ে , তবুও ক্রীতিক এইটুকুনি ছাড়ছে না অরুকে, বারবার শান্ত স্বরে বোঝানোর চেষ্টা করছে শুধু ,— বেইবি প্লিজ, বলেছি তো আর হবেনা, দেখ আমি সরি বলছি। আ'ম এক্সট্রেমলি সরি,তাও তুই কথা বল প্লিজ,আমার থেকে নিজেকে এভাবে বারবার আলাদা করিস না, এতে আমি রেগে যাই, তোর দূরত্ব সহ্য হয়না আমার। বোঝার চেষ্টা কর একটু। ক্রীতিকের কথা শেষ হতে না হতেই ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে পা ফসকে আচানক পানিতে পরে গেলো ওরা দুজন। পানিতে হাবুডুবু খেয়ে অরু তাড়াহুড়ো পুল থেকে উঠতে গেলে স্কার্ট সমেত একটা পা টেনে ধরে আবারও অরুকে পুলের মাঝে ছু'ড়ে মা'রে ক্রীতিক, আকস্মিক কাহিনিতে আপনা আপনি কয়েক ঢোক পানি খেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা তুললো ক্রন্দনরত অরু।
ঠান্ডা পানিতে ভিজে একাকার হয়ে গমরঙা ত্বকে লালচে বর্ণ ধারন করেছে ওর, কৃষ্ণচূড়ার ন্যায় রাঙা কপোল বেয়ে অবাধে গড়িয়ে পরছে তপ্ত নোনাজল, যা চোখ এড়ালো না স্বয়ং

ক্রীতিকেরও,নিজের কর্মকান্ডে ব্যতিগ্রস্থ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অরুকে একটানে কাছে নিয়ে এসে ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ক্রীতিক শুধালো,— ব্যথা লেগেছে?

পরমূহুর্তেই কান্নার বাঁধ ভেঙে গেলো অরুর,কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করেই অনেকটা শব্দ করে কেঁদে উঠলো ও, কাঁদতে কাঁদতে ক্রীতিকের বুকে ইচ্ছে মতো কি’ল ঘু’ষি ছেড়ে অভিমানি কন্ঠে চেঁচিয়ে বললো,

— তুই একটা পঁ’চা স্বামী, তোর সাথে কোনো কথা নেই আমার,থাকতে পারেও না, তুই সবসময় আমাকে বকিস, কথায় কথায় গায়ে হাত তুলিস, তোর দেওয়া হাজারটা ভালোবাসার ক্ষত আমার শরীরে, তাও আমি সবকিছু সহ্য করি, চুপচাপ মেনে নিই, কারন আমি জানি যে আমি তোর দূর্বলতা, তুই আমাকে না পেলে উন্মাদ হয়ে যাবি,থাকতে পারবি না আমায় ছাড়া, তাই বলে তুই আমার ভালোবাসায় এভাবে আঙুল তুলবি, এভাবে?

তোর মতো একরোখা, অবাধ্য, বদ মেজাজী মানুষকে ভালোবেসে কিই না সহ্য করেছি আমি? কথার আ’ঘাত, শারীরিক য’ন্ত্রনা, মানসিক যন্ত্র’না,আরও কত কিই তার ইয়াত্তা নেই। তাহলে তুই কিভাবে আমার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললি, কিভাবে বল?শেষ কথাতে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠে ক্রীতিকের বাহুতে সজোরে কামড় বসিয়ে দিলো অরু। ও এতো জোরেই কামড়ে ধরেছে যে ব্যথায় চোখ মুখ খিঁচিয়ে বন্ধ করে রেখেছে ক্রীতিক,তবুও অরুকে সরায়নি নিজের থেকে, আর না তো অরুর এতো এতো অভিযোগের পাছে একটা টু শব্দ করেছে।

নিজ দাঁতের শক্তি পরে এলে, ক্রীতিকের ভেজা টিশার্টটা টেনে ধরে অরু আবারও কাঁদতে কাঁদতে বলে,
—- সত্যি করে বলুন তো, ভালোবাসা আর অবসেশন এক না তাই না? তার মানে কি আপনিও আমাকে ব্যবহার করছেন? যখন আমার বাহ্যিক সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে তখন….
—জাস্ট শাট ইউর ফাকিং মাউথ অরু!অরুর কথা শেষ হওয়ার আগেই গর্জে উঠলো ক্রীতিক,ওর কথায় নিজের অজান্তেই কপালের রগ ফুলে উঠে কখন যে শান্ত মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাগের পারদ ছড়িয়ে পরেছে তা টের পায়নি ক্রীতিক নিজেও।
এদিকে ক্রীতিকের ধমকে কম্পিত হয়ে উঠেছে অরুর শরীর, ক্রীতিক এতোটা ভ’য়ানক টোনেই ধমক দিয়ে উঠেছে, যে অরু এবার কান্নাকাটি ভুলে গিয়ে মূহুর্তেই ক্রীতিকের অগ্নিদৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে শুষ্ক একটা ঢোক গিলে, পুলের মধ্যেই পিছু হাটতে শুরু করলো। অরু খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে, যে অযথাই একটা ঘুমন্ত সিংহকে জাগ্রত করেছে ও। এবার অরুর কপালে দুঃখ আছে, বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা দরকার, অরু তা ছাড়িয়ে গিয়েছে, ক্রীতিকের হাত থেকে সেই কখন থেকে র’ক্ত ঝড়ছে তাতে অবধি নজর নেই ওর, চোখ মুখ খিঁচে যা মন চায় তাই বলে গিয়েছে ক্রীতিককে। বলতে বলতে শেষ পর্যায়ে এসে মুখ ফসকে যেটা বললো, সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাগের চোটে গুমোট হয়ে উঠেছে ক্রীতিকের চোখ মুখের ভঙ্গিমা।— কি বললি তুই? আবার বল? ক্রীতিকের গুরুগম্ভীর পুরুষালী প্রতিটি কথার ভাঁজে ভাঁজে উপচে পরছে কতৃত্ব আর কঠিন শাসন।

অরু তাতে ভড়কালো,জিভ দিয়ে শুষ্ক অধর ভিজিয়ে ক্রীতিকের ইস্পাতের ন্যায় কঠিন মুখমন্ডলের দিকে আড় চোখে চেয়ে রইলো শুধু।
অরুকে অনুসরণ করে ক্রীতিক সামনে এগোতে এগোতে চোখ মুখের আদলে আরও খানিকটা কাঠিন্যতা ফুটিয়ে তীর্যক কন্ঠে বললো,
—- কতটা ভালোবাসিস তুই আমাকে? কতদিন ধরেই বা ভালোবাসিস? তোর প্রতি আমার আসক্তি সম্পর্কে কতটুকুই বা ধারণা রাখিস তুই? তুই কি আদৌও জানিস তোর জন্যই যে আমি এমন?
অরু কিচ্ছুই বলছে না, শুধু চুপচাপ ভয়ে ভয়ে পেছনে পা ফেলছে, আর ক্রীতিক ওকে অনুসরন করে সামনে এগোচ্ছে।যার দরুন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বারবার সুইমিং পুলটা চক্কর দিচ্ছে ওরা দুজন। অরু চুপ করে আছে দেখে ক্রীতিক আচমকা ওকে হ্যাচকা টানে নিজের কাছে টেনে এনে ওর কোমড়টা শক্ত করে চেপে ধরে কিছুটা তাচ্ছিল্য করে বললো,—- তুই যখন এগারো বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে ছিলি তখন থেকে তোর প্রতি আসক্ত আমি। এই রুপ, এই যৌবন কোথায় ছিল তখন? আমাকে বোঝার মতো মনটাও তো তৈরি হয়নি তখনও।
ক্রীতিকের কথা শুনে সচকিত হয়ে নুয়িয়ে রাখা মাথাটা অকস্মাৎ তুলে ওর চোখে চোখ রাখলো অরু।
ক্রীতিক তীর্যক হেসে বললো,— আই নো, ইটস নট ফেয়ার। কিন্তু কি করবো বলতো? নারী জাতির উপর এক আকাশসম ঘৃণা আর অভিমানের উর্ধে গিয়ে তোকে আমার ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল তোর হৃদয়টা পেজা তুলোর মতোন নরম আর উষ্ণ।

আমার কঠিন বরফের মতো শীতল, নির্জীব হৃদয়ে একটু খানি উষ্ণতার ছোঁয়া দিতেই উপর ওয়ালা বোধহয় তোকে আমার নিকট পাঠিয়েছিল সেদিন। সেই উষ্ণতা, সেই ছোট্ট হাতের স্পর্শ আজও আমাকে পুলকিত করে অরু, ঠিক সেদিনের মতোই চমকে দেয় বারবার , নিজের অজান্তেই সেদিন আমার বুকে ঘুমিয়ে গিয়েছিল তুই। ব্যাস, তখন থেকেই শুরু হয়ে গেলো হৃদয়ে তোলপাড়, তিরতির করে ভেঙে গেলো দাম্ভিকতার পাহাড়, সেদিন আমিও বোধ করেছিলাম, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মায়ার বাঁধনের বড্ড প্রয়োজন, আর তুই হলি আমার সমগ্র জীবনের একমাত্র মায়াপরী। সেদিনের পর থেকেই নিজের স্ট্যাটাস,পাসোর্নালিটি,বয়স, সম্পর্কের সমীকরণ সবকিছুর মাথা খেয়ে তোর প্রতি অবসেসট হয়ে গিয়েছিলাম আমি। চোখ বুঝলে কিংবা চোখ খুললে, দিন রাত শুধু তোকেই দেখতাম, তুই আমার মাথা থেকেই বের হতিস না। আমি জানতাম এটা ঠিক নয়, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে , তাও আমি সারাক্ষণ তোকেই চাইতাম।শুধুমাত্র নিজের অবাধ্য চিন্তাচেতনা, আর বেপরোয়া ইচ্ছে গুলোর হাত থেকে তোকে বাঁচিয়ে রাখবো বলে, নিজেই সরে এসেছিলাম তোর কাছ থেকে, বাড়িয়েছিলাম হাজার মাইলের দূরত্ব, দু’জনার মাঝে টেনে দিয়েছিলাম তিক্ততার এক মহা প্রাচীর, একাকী বিষন্ন জীবনে কতটা যন্ত্রনায় দিন রাত অতিবাহিত করেছি সে হদিস রাখিস তুই? অথচ কোনোকিছু না যেনেই, আমার ভোগ করা যন্ত্রনার একাংশ ও সহ্য না করেই আজ এখন এই যায়গায় দাঁড়িয়ে কি সুন্দর আমার ভালোবাসায় নিজের ছোট্ট আঙুলটা তাক করে ফেললি অরু? আমার থেকেও বেশি ভালোবাসিস তুই? আন্সার

মি?অরুর মুখে কথা নেই,কিইবা বলবে ও? জেনে শুনেই তো ভালোবাসার মহাসমুদ্রে ঝাপ দিয়েছে ও, ক্রীতিকের মতো করে অন্য কেউ ভালোবাসতে পারবে না বলেই তো ক্রীতিকের প্রেমে পরতে বাধ্য হয়েছে অরু, নতুন করে মনকে বোঝানোর তো কিছু নেই। এই মানুষটার হাতে নিজের ভালোবাসার গল্পের শিরোনাম উপসংহার সবই তো লেখা শেষ বহু আগেই। অরু জানে ক্রীতিক যেমন অতিরিক্ত ভালোবাসা দেয়, কষ্টটাও তেমন অতিরিক্তই দেয়, তাও অরুর জায়ান ক্রীতিককেই চাই, মুখে একশোবার না বললেও, মনেমনে হাজার বার হ্যা বলে বসে আছে ও। এ যেন জেনেশুনে বি'ষপান।
নিজের শক্ত হাতের বাঁধন ঠিলে করলো ক্রীতিক, আস্তে করে অরুর কোমড় ছেড়ে দিতেই ভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে ক্রীতিকের দিকে প্রশ্ন সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অরু, যেন ও বলতে চাইছে,
— কি ব্যাপার ছেড়ে দিলেন কেন? এতোক্ষণ এতো জোরাজুরি করলেন, আর এখন এভাবে ছেড়ে দিচ্ছেন? ধরে রাখুন না আমাকে। কিন্তু তার একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না অরু, আত্মসম্মানেরও তো একটা ব্যাপার আছে। অরু নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে আছে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো ক্রীতিকের বুক চিড়ে, কিছুক্ষন চোখ বুজে নিজেকে খানিকটা সংযত করে শান্ত স্বরে ক্রীতিক বলে,
— আই নো, মাই অবসেশন ইজ আনহেলদি, রাগের সময় যা খুশি তাই করি আমি,নিজের অজান্তেই তোকে অনেক অনেক কষ্ট দিই, আমি মানি, সব দোষ আমার। আমি অনেকটা বেপরোয়া, আর

ছন্নছাড়া তাও মানি, কিন্তু তুই শুধু একটাবার আমার হয়ে থেকে যা অরু, ট্রাস্ট মি, আমি ভালোবাসতেও জানি।
ক্রীতিকের শেষ কথাগুলোতে ঠিক কিই পরিমাণ জাদু ছিল, তা বোধ হয় অরু বলে বোঝাতে পারবে না। ক্রীতিকের মতো পিছুটান বিহীন মানুষও যে এতো কাতর হয়ে কাউকে থেকে যেতে বলতে পারে, সেটা অরু আজকেই প্রথম আবিষ্কার করলো, আর ও এটাও জানে যে ক্রীতিক এই কথাগুলো আজ প্রথম বারই বলেছে,অথচ প্রথম বারেই কি সুন্দর হৃদয় নাড়িয়ে দিলো। ক্রীতিকের কথার পাছে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অরু বলে,—- ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি তো,তাছাড়া ফিরে গেলে তোমাকে কোথায় পাবো আমি? তোমার অতিরিক্ত ভালোবাসার অ'গ্নিস্ফুলিঙ্গে নিজেকে দ'গ্ধ করা যে এখনো বাকি।
বাইরে বিজলি চমকাচ্ছে, ক্ষনে ক্ষনে বিজলির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে সুইমিং পুলের নীল বর্ণের টলটলে স্বচ্ছ পানি, বাতাসটাও বেড়েছে দিগুণ, বাইরের এহেন বৈরী আবহাওয়া দৃষ্টিগোচর হতেই ক্রীতিক অরুকে উদ্দেশ্য করে অনুভূতিহীন কন্ঠে বলে,
—- আমার স্পর্শ খারাপ লাগলে, আমি আর তোকে টাচ্ করবো না কখনো, আর না তো তোকে কোনোকিছুর জন্য জোরজবরদ'স্তি করবো, শুধু আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ঘুনাক্ষরেও মুখে আনবি না, ব্যাস এটুকুই চাওয়া। ওয়েদার খারাপ জলদি রুমে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ কর, নয়তো ঠান্ডা লেগে যাবে।
কথা শেষ করে পুল থেকে ওঠার উদ্দেশ্যে সামনের দিকে পা বাড়ায় ক্রীতিক, তৎক্ষনাৎ পেছন থেকে অরু ডেকে বলে,— কে বলেছে আপনার স্পর্শ আমার খারাপ লাগে?

অরুর কথায় ক্রীতিক পেছনে ঘাড় ঘোরালে, অরু এগিয়ে এসে লাফ দিয়ে ক্রীতিকের কোলে উঠে পরে।
অরুর দুই উরুতে হাত রেখে ওকে সামলে নিয়ে, ক্রীতিক গম্ভীর মুখে বললো,
— এখন আবার কি চাই?
— আপনার স্পর্শ। কতদিন হয়ে গেলো আপনি আমাকে একটু আদর করেন না।
ক্রীতিক শুষ্ক ঢোক গিললো, ঢোক গেলার সময় ওর এ্যাডামস এ্যাপেলটা কি আকষর্নীয় ভাবে ওঠা নামা করলো,যা দেখে চোখ দুটো আচানক নেশায় বুদ হয়ে গেলো অরুর, অগত্যাই অরু নিজের থেইর হারিয়ে হাত বাড়িয়ে আলতো হাতে স্পর্শ করলো ক্রীতিকের গলাটা। অরুর গভীর চাহনী পড়ে ফেলতে খুব একটা সময় লাগলো না ক্রীতিকের,ও একটানে অরুর হাতটা নিজের গলা থেকে সরিয়ে বাঁকা হেসে শুধালো,— যা বলছিস, আর যা করছিস, তা কি সজ্ঞানে ভেবে চিন্তে করছিস? আমার ভালোবাসা যে য'ন্ত্রনাদ্বায়ক সেটা ভুলে গেলি?
অরু আস্তে আস্তে নিজের চাহনি উপরে তুলে ক্রীতিকের চোখে চোখ রেখে বলে,
— এতোকিছু বুঝিনা, আমি আপনাকে চাই, জেনে শুনে আপনার বি'ষাক্ত ভালোবাসা গ্রহন করেছি আমি, যন্ত্রনা তো সহ্য করতেই হবে,তাছাড়া আজকে নতুন তো কিছু নয়।
প্রথমে গাল, এরপর কানের লতিতে আলতো স্পর্শ করে নিজের হাতটা অরুর চুলের ভাঁজে প্রবেশ করায় ক্রীতিক, অরুর লম্বা চুল গুলোকে মুঠি বদ্ধ করে মুখটা নিয়ে আসে নিজের মুখের খুব

কাছে,অতঃপর সেভাবেই ধরে রেখে হিসহিসিয়ে ক্রীতিক বলে,—-
আজ আমি একটু বেশিই রেগে আছি অরু, সহ্য করতে পারবি না আমায়। আর না তো আমি তোকে কষ্ট দিতে চাইছি।
ক্রীতিকের বলা কথা গুলো চুপচাপ শুনে গেলো অরু, অতঃপর কোনোকিছুর ইঙ্গিত না দিয়েই চোখের পলকে ক্রীতিকের সিগারেটে পো'ড়া বাদামি ঠোঁটে নিজের ওষ্ঠাধর চেপে ধরে কয়েক সেকেন্ড। আবেগের বশবর্তী হয়ে স্বামীর রাগ ভাঙানোর আশায় ওই একটা ছোট্ট চুমুই যথেষ্ট ছিল এই মূহুর্তে ক্রীতিককে ব্লাডিবিস্ট বানিয়ে দিতে,
ক্রীতিকের থেকে নিজের ঠোঁটের কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্ব বাড়িয়ে মাথাটা নিচু করে অরু বলে,
—- আর কখনো আপনার উপর রাগ করবো না আমি, আর নাতো আপনাকে এভাবে জ্বালাতন করবো। আপনি কতো অসুস্থ বলুন তো। আমি সত্যিই একটা ইমম্যাচিউর,সব ভুলে যাই আমি।
ক্রীতিক প্রথমে চুপচাপ অরুর কথা শুনে গেলো, পরক্ষনেই বাঁজপাখির মতো আ'ক্রমণ বসালো ওর ফিনফিনে কোমল ওষ্ঠাধরে, অরুর দম ফেলার ফুরসত নেই, অথচ ক্রীতিক ছাড়লো তো নাই, উল্টো ঠোঁটের কাজ অবহ্যত রেখেই হিসহিসিয়ে বললো,—- একশো বার করবি, যত ইচ্ছে তত রাগ করবি আমার উপর, দিন শেষে তোর সব রাগ ভাঙানোর দ্বায়িত্ব শুধু আমার, তোর রাগ ভাঙাতে যা করতে হয় তাই করবো আমি,দরকার পরলে সারাদিন সারারাত তোর পিছু পিছু ঘুরবো,কোনো সমস্যা নেই তাতে ।ইউ হ্যাভ প্রোপার রাইট টু বি এ্যাঙ্গরি উইথ মি বেইবি। এ্যান্ড আই হ্যাভ প্রোপার রাইট টু পানিশ ইউ হার্ড।

শেষ কথাতে তীর্যক হাসির রেখা ফুটে ওঠে ক্রীতিকের ভেজা অধরের কোনে,
অরু তৎক্ষনাৎ নিজেদের দূরত্ব বাড়িয়ে, ক্রীতিকের পানে ভ'য়ার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
— আবারও মা'রবেন?এবার আর জবাব দিলো না ক্রীতিক, অরুকে বাচ্চাদের মতো কোলে নিয়েই পুল থেকে উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো করিডোর আর ছাঁদ বারান্দার মাঝখানে রাখা কাউচের দিকে, সেখানে অরুকে ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে নিজের হাতের ক্যানোলা খুলতে উদ্যত হলে অরু হকচকিয়ে উঠে বললো,
—- ওটা খুলবেন না প্লিজ। এমনিতেই অনেকটা জখম হয়েছে, আর না।
ক্রীতিক চোখ ছোট ছোট করে অরুর আগাগোড়া পর্যবেক্ষন করে হাস্কিস্বরে বললো,
— দেন ইউ হ্যাভ টু হেল্প মি বেইবি।
কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্থ হলো অরু, মিয়িয়ে যাওয়া গলায় শুধালো,
— ক..কি হেল্প?
ক্রীতিক অরুর কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে একই স্বরে বললো,
— জাস্ট আনবাটন মাই শার্ট।— আমাদের গল্পের ইষ্টিকুটুম হলেন আপনি সায়র, আমি নই।
স্বামী স্ত্রীর একান্ত ঘনিষ্ঠতম মূহুর্ত পার করে সায়র যখন নীলিমার বুকে মাথা ঠেকিয়ে পরম আবেশে চোখ বুজেছিল মাত্র কয়েকসেকেন্ড, ঠিক তখনই কথা ছোড়ে নীলিমা। নীলিমার কথায় তন্দ্রা ছুটে যায় সায়রের, মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে নীলিমার গলায় থুতনি ঠেকিয়ে ভ্রু কুঁচকে সায়র বলে ওঠে ,

— মানে? আমি এতো কঠিন বাংলা বুঝিনা নীলিমা, একটু বুঝিয়ে বলবে?
সায়রের কথার পাছে নীলিমা রহস্যময়ী হাসি উপহার দিয়ে বলে,
—- আপনাদের সবার ধারণা ভুল সায়র, আপনি আমাকে বিয়ে করতে জোর করেন নি, আর নাতো আপনি আমাকে বিয়ের আসর থেকে তুলে এনেছেন।
নীলিমার কথা শুনে সায়র এবার ধরফরিয়ে উঠে বসে, অবাক কন্ঠে বলে,— কি বলছো এসব? আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি তোমাকে বিয়ের আসর থেকে তুলে এনেছি বলে তোমার আব্বাজান আমার দিকে ব'ন্দুক অবধি তাক করেছিলেন।
নীলিমা নিঃশব্দে হাসলো, ওর হাসিটা ছিল ব্ল্যাকহোলের মতোই রহস্যেঘেরা, কিংবা মোনালিসার হাসির থেকেও বেশি অদ্ভুত।
মুখের হাসিটা ধরে রেখেই নীলিমা বলে,
— শুরু থেকে শেষ অবধি সবকিছুই সাজানো ছিল সায়র।
সায়র শুষ্ক একটা ঢোক গিলে বললো,
— একটু খুলে বলবে প্লিজ?
নীলিমা হ্যা সূচক মাথা নাড়ায়, পরক্ষণেই বলে,—- আচ্ছা আপনার একটুও অদ্ভুত লাগেনি, কথা নেই বার্তা নেই হুট করেই আমার বিয়ে কি করে ঠিক হয়ে গেলো? কিংবা আমাদের বিয়ের পরে আব্বাজান আমাদের কেন খুজলো না? আচ্ছা বাদ দিন আমিই বলছি, আসলে আমি আর আব্বাজান চাইতাম কোনোভাবে আপনি আমাকে বিয়েটা করুন, কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে ছিলনা, শুনলাম আপনিও অনু আপার বিয়ের পরেই চলে যাবেন, তাই বুদ্ধি করে নিজের বিয়ের নাটক টা সাজিয়েছিলাম,পরে নিজেই অন্য ফোন দিয়ে

আপনাকে আমার বিয়ের খবরটা দিয়েছি, যাতে আপনি এসে আমাকে নিয়ে যান। আর জোর করে বিয়ে করে নেন।
সায়র স্তম্ভিত কন্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,— এতোটা নাটক কেন করেছিলে নীলিমা? আমিতো তোমাকে শুরু থেকেই পছন্দ করতাম, আর তোমার যদি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছেই থাকে, তাহলে শুধু শুধু আমাকে ইগনোরই বা করেছিলে কেন?
নীলিমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— একটা একটা করে বলি?
সায়র বুঝদারদের মতো মাথা ঝাকালো।
নীলিমা বললো,
— প্রথমত মানুষ বিপরীতমূখী জিনিসে আকর্ষিত হয় বেশী, আপনার মতো সুপুরুষদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু বেশিই দেখা যায়, তাইতো আমি ছিলাম আপনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যার ফল দেখুন, আপনি খুব দ্রুতই আমার প্রতি আকর্ষন অনুভব করেছেন। তবে বিয়ের পরেও আপনার সাথে স্বাভাবিক না হতে পারার কারণ একটাই ছিল। আর তা হলো, অনুশোচনা। নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যে অবলম্বন করেছিলাম আমি, আপনার মতো মানুষকে ব্যবহার করেছি শুধু মাত্র নিজের স্বার্থ হাসিলের আশায়, এসব ভাবতে গেলেই তীব্র অনুশোচনা আর অ'পরাধ বোধে মাথাটা হেট হয়ে যেতো আমার।— বিয়েটা কেন করেছিলে?
নীলিমার কথার মাঝেই প্রশ্ন করে সায়র,
প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীলিমা বলে,
—- একটা শয়তানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, মা মা'রা যাওয়ার সময় চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে অভাবে পরে

আমাদের বাড়িটা বন্ধক রেখেছিলেন আব্বা। বাড়িটা যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল, সে হলেন আমাদের পুরান ঢাকার প্রভাবশালী জনৈক ব্যক্তি। টাকার গরমে যা নয় তাই করে বেড়ান তিনি, দিনদুপুরে মেয়েদের তুলে এনে সম্ভ্রম হানি করেন,এছাড়া লুটপাট, মা'রামারি হানাহানি এসব তো তার নিত্যদিনের কারবার।
কিন্তু বলেনা যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো,
বাড়ি বন্ধক দেওয়ার কয়েক মাসের মাথাতেই ঋণের বোঝা দিগুণ হয়ে গেল, প্রতিমাসে এতো মোটা অংকের সুদ দিতে গিয়ে আব্বা হিমসিম খেতে শুরু করলেন, একপর্যায়ে ঋণের বোঝা ভারী হয়ে এলে নির্দয় লোকটা সুযোগ বুঝে এক সাথে সব টাকা দাবি করে বসে, না দিতে পারলে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে সেই হুমকি ও ঢুকিয়ে দিয়ে যান আব্বাজানের চিন্তিত মস্তিষ্কে।— ইটস টুয়েন্টি টুয়েন্টি ফোর নীলিমা, এরকম লোক এখনো এক্সিস্ট করে? আমিতো ভাবতেই পারছি না।
কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে, দুশ্চিন্তা গ্রস্থ কন্ঠে কথাটা বললো সায়র, সায়রের কথার পাছে নীলিমা বলে,
—- করে, বাংলাদেশে এর থেকেও বহুগুন খারাপ লোক এক্সিস্ট করে সায়র।
— তারপর কি হলো?
নীলিমা নির্লিপ্ত কন্ঠে বলে,
— তারপর আর কি, যা হওয়ার তাই হয়েছে, আব্বাজানের কাকুতি মিনতিতে লোকটা আমাকে তুলে নেয়নি ঠিকই, তবে একটু বড় হতেই, পুরো মহল্লায় ঘোষণা করে দিয়েছে সে আমাকে বিয়ে করবে,

এমনকি আব্বাকেও হু'মকি দিয়ে রেখেছে, তার সাথে বিয়ে না দিলে আমাকে সমাজে মুখ দেখানোর অবস্থাতেই রাখবে না।
জানেন, সে সময় এমন একটা কু'প্রস্তাবকেও চুপচাপ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না আব্বাজানের হাতে, নয়তো কোনোদিন দেখা যেত সুস্থ মানুষ ভার্সিটি গিয়েছি,আর ফিরে এসেছি লা'শ হয়ে। নিজের মেয়েকে হারানোর ভয়ে আব্বাজান সর্বদা তটস্থ ছিলেন, তাই তিনি লোকটাকে অনুরোধ করেন আমাকে যাতে পড়তে দেওয়া হয়, বিয়ে আমার তার সাথেই হবে। লোকটা আব্বাজানের কথায় রাজি হলেও চারিদিকে ততদিনে জানাজানি হয়ে যায় যে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।যার দরুন লোকটার ভয়ে বিয়ের প্রস্তাব তো দূরে থাক, আমার চোখে চোখ তুলে পর্যন্ত কেউ তাকাতো না অবধি।এভাবেই দিন যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে নিজেকে বলির পাঁঠা ভাবতে শুরু করি আমি, কারন আমার ভবিষ্যতে বলে আর কিছু নেই,ঠিক এমন একটা দম বন্ধকর জীবনের মাঝপথে আটকে গিয়ে আমি যখন ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই ইষ্টিকুটুম রূপে আমার জীবনে পদচারণ ঘটান স্বয়ং আপনি। ততোদিনে মনে মনে আপনার মতোই কাউকে খুজছিলাম আমি সায়র, উপর ওয়ালারা কাছে দিনরাত প্রার্থনা করে বলেছিলাম, যাতে আমার জীবনে এমন কেউ আসে, যে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে দূর বহুদূরে, অনেক অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে সযত্নে নিজের আস্তিনে লুকিয়ে রাখবে সে আমায়। দেখুন সত্যি সত্যিই তাই হলো, আমার প্রার্থনা কবুল হলো। আপনি আমায় বাঁচালেন, আমার জীবনে ইষ্টকুটুম রূপে এসে আমার রক্ষাকবজ হয়ে গেলেন।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলতে বলতেই ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠলো নীলিমা। সায়র দ্রুত হস্তে নীলিমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো,— কাঁদছো কেন বউ? আমি আছি তো, তোমার ইষ্টিকুটুম। এরপর কোন ভুড়িওয়ালা আমার বউকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় দেখবো আমি, ব্যাটাকে চোখের সামনে পেলে যদি ওর গোঁফ টেনে না ছিঁড়েছি তো আমার নামও সায়র আহমেদ নয়।

সায়রের কথায় ফিক হেসে দিলো নীলিমা, নীলিমা হাসছে দেখে হাতের বাঁধন দৃঢ় করে নীলিমাকে নিজের চওড়া বুকের সাথে আষ্টেপৃষ্টে মিশিয়ে নিয়ে ওর ঘাড়ে তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে সায়র বললো, — আজ রাতে আর শুদ্ধ হতে ইচ্ছে করছে না বউ, একদমই করছে না।সুন্দর একটা দিনের সূচনা হলো ধরণীতে। বিগত ঊনিশ বছরের জীবনে যতগুলো সুন্দর সকাল পার করে এসেছে অরু, তার মধ্যে আজকের সকালটা অন্যতম। অবশ্য অরুর নিকট ক্রীতিকের সংস্পর্শের সকাল গুলো বরাবরই স্বপ্নের মতোই সুন্দর আর আনন্দদায়ক। কাল রাতে ঝড়ো হাওয়ার তান্ডব ছিল প্রকট, তবে বৃষ্টি হয়নি এক ফোঁটাও। অথচ আজ সকাল সকালই আকাশ বাতাস ছাপিয়ে ঝুম বৃষ্টিতে মুখরিত চারপাশ।সকালের আকাশটা ঘুটঘুটে কালো মেঘে ঢাকা পরেছে, আজ আর সূর্যের মুখ দেখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমেরিকার এই এক বেহাল দশা, আবহাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই এখানে, এই রোদ তো এই বৃষ্টি।

আজ অরুর ঘুম ভাঙলো বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজে। বাইরে একফোঁটাও দিনের আলো নেই,তাই পর্দার ভাড়ি পাল্লা টেনে রাখা রুমটাও ঘুটঘুটে আঁধারে ছেয়ে আছে, অরু পিটপিট করে চোখ খুলে পুরো রুম হাতরে কোথাও ক্রীতিকের দেখা পেলো না। এই ঝুম

বৃষ্টির মাঝে হুট করেই কোথায় চলে গেলো লোকটা, কে জানে? অরু খুব বেশি ভাবলোও না, আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসে স্বভাব বশত বিছানা হাতরে ক্রীতিকের ফোনটা তুলে নিলো হাতে। দুজনার বার্থডে দিয়ে সেট করা পাসওয়ার্ডটা খুলে একেকটা ফোল্ডারে ঢুকে এটা সেটা দেখতে লাগলো অরু, যদিওবা অরুর মতে এই মোবাইলটার থেকে বোরিং মোবাইল ফোন দুনিয়াতে আর দুটো নেই। কি সব হাবিজাবি ডকুমেন্টস দিয়ে ভর্তি সব। গ্যালারীতেও কিছু নেই, সর্বশেষ ছবি তোলা হয়েছে আরও মাস দুইয়েক আগে। তাতে দেখা যাচ্ছে দার্জিলিং এ সায়রের হোমস্টে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা ঝাপসা ভিউ।— ধুর বোরিং। ফোনের সব গুলো সফটওয়্যারে ছোটমোটো একটা ঢু মে'রে হতাশ হয়ে ঠোঁট উল্টে কথাটা বলে ফোনটা সাইডে রেখে দিলো অরু, ঠিক এমন সময় ফোন থেকে আগত টুংটাং ম্যাসেজের আওয়াজ পুনরায় আকর্ষন কেড়ে নিলো ওর, তাইতো সকাল সকাল কে ম্যাসেজ দিয়েছে দেখার জন্য আবারও নতুন উদ্যমে ফোনটা হাতে নিলো অরু, নোটিফিকেশনে ভাসছে অর্ণবের নাম, সাথে কিছু ভিডিও লিংক আর ছোট্ট বার্তা।
— ডান ব্রো।
ছোট্ট ম্যাসেজে চোখ বুলিয়ে মনের মাঝের কৌতুহল আর দমিয়ে রাখতে পারলো না অরু, ফট করেই ঢুকে গেলো লিংকে। আর ঢুকে যা দেখলো তাতে সমস্ত গাঁ গুলিয়ে উঠলো ওর, তৎক্ষনাৎ একটা বিরক্তিকর ভাব প্রকাশ পেল চেহারার আদলে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকহাত দূরে ছুড়ে মা'রলো ফোনটাকে,অতঃপর ক্রীতিকের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে একা একাই তেঁতো গলায় বলে উঠলো,— ডার্ক

রোম্যান্স শোনেন সেটা মানলাম, তাই বলে উনি এইসব দেখবেন? ছিহ!
কথাটা বলতে বলতেই কপালের মাঝে সুক্ষ্ম চিন্তার ভাঁজ পরলো অরুর, কিছু একটা মনে পরার মতো সচকিত হয়ে বিড়বিড়ালো ও,
—- এক সেকেন্ড, ভিডিওর লোকটাকে চেনা চেনা লাগলো মনে হচ্ছে , কোথায় যেন দেখেছি।
সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরও একবার ভিডিও তে চোখ বোলালো অরু, আর যা দেখলো তাতে ওর হাড় হীম হয়ে গেলো আ'তঙ্কে। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে চোয়াল জোড়া আপনা আপনি দু'দিকে ফাঁক হয়ে গেলো ওর, মুখ দিয়ে বেরোলো অস্পষ্ট আওয়াজ,—- রেজা ভাই এসব কি করছে? আর এমন একটা ভিডিও ইন্টারনেটেই বা কি করে এলো?
অরুর ছোট্ট মস্তিষ্কটা কোনো কিছুরই ইঙ্গিত দিতে পারলো না হঠাৎ করে, একটু নড়েচড়ে বসে ভিডিওটাতে আবারও নজর দিয়ে বারবার পজ করে লেকটার চেহারা ভালোমতো পরখ করলো অরু, অতঃপর অস্ফুটেই বললো,
— অর্ণব ভাইয়া রেজা ভাইয়ের এমন গোপনীয় একটা ভিডিও ওনাকে পাঠালো কেন হঠাৎ? ক্রীতিক কুঞ্জের সব ঠিকঠাক আছে তো? নাকি সাংবাদিকরা মা'কে এসবের জন্য বিরক্ত করছে?
হাজারটা দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে এলো অরুর মাথাটা, মস্তিষ্কে জড়ো হওয়া কোনো প্রশ্নেরই উত্তর নেই অরুর কাছে। সবকিছুর উত্তর জানতে হলে ক্রীতিককে প্রয়োজন, কিন্তু সে কোথায়? শেষ প্রশ্নটা মস্তিষ্কে নাড়া দিতেই ক্রীতিককে খোঁজার উদ্দেশ্যে মোবাইল সমেত রুম থেকে বেরিয়ে গেলো অরু। তাড়াহুড়োয় ভুলেই গেলো যে ওর

পড়নে এখনো ক্রীতিকের ওভার সাইজ টিশার্ট রয়েছে , জামাটা অন্তত বদলানো উচিৎ ছিল। এদিক সেদিক খুঁজে অবশেষে ক্রীতিকের দেখা মিললো জিমে। ছোট্ট ডুপ্লেক্স বাড়িটার সবচেয়ে বড় রুমটাই ক্রীতিকের ব্যক্তিগত জিমনেশিয়াম। যদিওবা এই রুমে খুব কমই আসা হয়েছে অরুর, কারণ জিমে ওর কাজটাই বা কিই? তাও আজ খুঁজতে খুঁজত এখানেই হদিস মিললো ক্রীতিকের, অরু একটু উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখলো, ক্রীতিক ট্রেডমিলের উপর সমানে দৌড়াচ্ছে, ওর পরনে ওভার সাইজ ব্যাগী প্যান্ট আর কালো রঙা স্যান্ডোগেঞ্জি। মাথাটা কালো ক্যাপ দিয়ে ঢাকা। তাও পেছন থেকে মাথার শেষভাগের সেলাইয়ের দাগ গুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান, চুল বড় হলে হয়তো ধীরে ধীরে ঢেকে যাবে সেগুলোও। কিন্তু ছোট ছোট বাজ কাটিং হেয়ার স্টাইলেও যে গৌড় বর্ণের জায়ান ক্রীতিককে এতোটা মানাবে সেটা বোধ হয় অরুর কল্পনাতীত।
আর এই মূহুর্তে, ট্রেডমিলের উপর দৌড়াতে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক সুদর্শন যুবকটির চওড়া বলিষ্ঠ পৃষ্ঠদেশের দিকে চেয়ে অষ্টাদশীর মুখ থেকে একটাই কথা বেরোলো শুধু ,—- হাউ ম্যানলি!
অরুর আওয়াজ পেয়ে ট্রেডমিলের গতি কমালো ক্রীতিক, ধীর গতিতে দৌড়াতে দৌড়াতেই অরুকে উদ্দেশ্য করে বললো,
— গুড মর্নিং বেইবি।
ক্রীতিকের মুখ থেকে পাওয়া সকাল সকাল উষ্ণ সম্মোধনে ভ্রম কেটে গেলো অরুর, অন্য সময় হলে হয়তো এখন গিয়ে একটু ঢং করতো স্বামীর সাথে, কিন্তু এই মূহুর্তে এসবের জন্য একটুও সময় নেই ওর হাতে, নিজের অযাচিত ভাবনা গুলো বড়'ই ভাবাচ্ছে

অরুকে, যার দরুন সময় নষ্ট না করে ক্রীতিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভিডিওটা প্লে করে ওর মুখের সামনে ধরলো অরু, থমথমে গলায় শুধালো,
— এসব কি?
ক্রীতিক খানিকটা মিনারেল ওয়াটার পান করে, নতুন উদ্যমে দৌড়াতে দৌড়াতে নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিলো,— তোর মামাতো ভাই রেজার নু** ভিডিও।
অরু দাঁত কটমটিয়ে বললো,
— সেটা আমিও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনার ফোনে এসব কি করে এলো?
ক্রীতিক ঠোঁট উল্টাল, গা ছাড়া একটা ভাব নিয়ে বললো,
— শুধু আমার ফোনে নয়, পৃথিবীতে যত সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার মানুষ আছে সবার ফোনেই এটা শো করছে। ছাত্রলীগ সহসভাপতির অপকর্ম ফাঁস। আরও কয়েকটা আছে দেখবি নাকি? ইজন’ট ইট ইরোটিক? অবশ্য তোর আমার কাছে কিছুই না এসব। শেষ কথাটা বলে এক ভ্রু উঁচিয়ে, অরুর পানে শয়তানি হাসি নিক্ষেপ করলো ক্রীতিক।
ক্রীতিকের হাসিতে গা জ্বলে উঠলো অরুর, ও তৎক্ষনাৎ ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,— চুপ করুন অসভ্য লোক, আপনি একটা অ’শ্লীল।
ক্রীতিক ট্রেডমিল থেকে নেমে কাঁধের উপর তোয়ালে রেখে, সেটা দ্বারা গলার ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে গিয়ে বসলো এককোনে রাখা ডিভানের উপর, অতঃপর আঙুলের ইশারায় অরুকে কাছে ডেকে বলে উঠলো,

—পৃথিবীর সব পুরুষই বউয়ের কাছে অসভ্য বেইবি, আমার বন্ধু সায়রকেই দেখনা, সারা পৃথিবীর সামনে শুদ্ধ পুরুষ নামে খ্যাত হলেও গিয়ে দেখ, ব্যাটা দিন শেষে বউয়ের কাছে গিয়ে ঠিকই অশুদ্ধ হতে চায় ।
অরু ক্রীতিকের নিকট এগিয়ে এসে বিরক্তি নিয়ে বললো,
—- আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন, সত্যি করে বলুন এসবের পেছনে আপনার হাত রয়েছে, তাইনা?
ক্রীতিক এবার নিজের উরুর উপর ইশারা করে অরুকে বসতে বললো, অরু চোখমুখ কালো করে, ঠাস করেই গিয়ে বসে পরলো সেখানে। ক্রীতিক অরুর পিঠে নিজ কপালে ঘাম মুছতে মুছতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,— রাগ করতে হবেনা, কি জানতে চাইছিস বল?
পেছনের দিকে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে অরু শুধালো,
— কেন করেছেন এটা? মামির পরিবার কি এখন আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবে? তাছাড়া হলুদ সাংবাদিকরা যদি ক্রীতিক কুঞ্জে এসে মাকেও হ্যারাস করে তখন?
— চিন্তা নেই,তোর মাকে কেউ হ্যারাস করবে না, সাদা পোশাক ধারী পুলিশ রয়েছে বাড়ির চারিদিকে। আর তোর মামির পরিবারের কথা যদি বলিস তাহলে বলবো তাদের একটা উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া উচিৎ,রেজাকে আমি একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু জা'নোয়ার টা সেই সুযোগের যোগ্যতাই রাখেনা।
— মানে?
অরুর সামান্য মানের পেছনে অনেক বড় কৌতূহল লুকিয়ে রয়েছে, তাই একটু খোলাসা ভাবেই জবাব দিলো ক্রীতিক,বললো,

—– মনে আছে আমাদের ভিডিও ধারণ করতে মিডিয়ার লোক লেলিয়ে দিয়েছিল রেজা?
অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়ালে ক্রীতিক বলে,— এই ভিডিও গুলো তখনই সংগ্রহ করেছিলাম। বা’স্টা’র্ড টা ক্ষমতার বদৌলতে রাত হলেই মেয়েদের সাথে এসব নোংরামি করে বেড়াতো, আর দিনের বেলা স্বাধু সেজে মাইকের সামনে গিয়ে মানুষকে শান্তির বানী শোনাতো। রেজার কিংবা ওর এসব নোংরা কাজকর্মে আমার কিছুই যায় আসতো না, যদি না ও আমার সাথে লাগতে আসতো। তখনই চেয়েছিলাম ওর সব অপকর্ম ফাঁস করে ওকে জেলে পাঠাবো। কিন্তু ওই যে, একটা সুযোগ দিয়েছিলাম। মস্ত ভুল করেছিলাম তখন, যার ফলরূপ আমার কলিজা অবধি নজর দিয়ে ফেলেছে রা’স্কেলটা। তবে কথায় আছে না, লাস্ট বাট নট লিস্ট। আমি ওর চোখ উপড়ে ফেলিনি, কিন্তু এমন ব্যাবস্থা করেছি যে, চোখ থাকতেও আর কোনোদিন চোখ তুলে কারও দিকে তাকিয়ে কথা বলার মতো মান সম্মান টুকু অবশিষ্ট নেই ওর।
কথা বলতে বলতেই ক্রীতিকের চোখ মুখের ভঙ্গিমা কেমন পাল্টে গিয়েছে, শান্ত নদীর মতো চোখ দুটোতে ফুটে উঁঠেছে কাঠিন্যতা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক্রীতিক এখনো রেগে আছে।রেজার ভাগ্যটা ভালো যে ও আমেরিকাতে রয়েছে , নয়তো বাংলাদেশে থাকলে না জানি কি করতো রেজার সঙ্গে। হয়তো দেখা যেত, সত্যি সত্যিই রেজার চোখ দুটো হ্যামার দিয়ে গেলে দিতো ক্রীতিক।
কি সব উদ্ভট চিন্তা করতে করতেই শরীর কাটা দিয়ে উঠলো অরুর, আজেবাজে চিন্তা সব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে একটা শুষ্ক ঢোক গিলে ও ক্রীতিককে শুধালো,—– এখন কোথায় আছে রেজা?

জবাবে ক্রীতিক বললো,
— ভিডিও ভাইরাল হবার পর থেকেই পলাতক, ভুক্তভোগী মেয়েগুলো সব একেএকে পুলিশের কাছে গিয়ে কমপ্লেইন করেছে, সবাইকে চাকরি, রেশন,বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের সিট, এসবের প্রলোভন দেখিয়ে, দিনের পর দিন নিজের স্বার্থ হাসিল করতো রেজা, ছাত্র লীগের নেতা বলে ভয়ে এতোদিন কেউ মুখ না খুললেও, এবার সুযোগে সব অপকর্ম বেরিয়ে আসছে ব'দমাশ টার।
ক্রীতিকের কথা শুনে চুপচাপ মুখে আঁধার নামিয়ে বসে রইলো অরু, দক্ষিণের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে আঁচড়ে পরছে ওদের শরীরে, হঠাৎ ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে জানালার দিকে এক ঝলক পরখ করে পুনরায় অরুর দিকে দৃষ্টিপাত করে ক্রীতিক শুধালো,— মুড অফ?
অরু এদিক ওদিক না সূচক মাথা নাড়ায়, ক্রীতিক ওর কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে বেশ সিরিয়াস হয়ে বললো,
— অনেক তো হলো, এবার তো পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে হবে বেইবি, তোকে গ্রাজুয়েট হতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোর গ্রাজুয়েশন কম্পিলিট না হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আর বিডি তে ফিরবো না। লাস্ট একবছরে একটা সেমিস্টারও কম্পিলিট করতে পারিস নি এদিক ওদিক করতে গিয়ে, অনেক হয়েছে ফাঁকিবাজি আর না।
অরু নাকটা সিকোয় তুলে, অসহায় মুখে বললো,
— কিন্তু আমার তো ইকোনমিকস পড়তে একটুও ভালো লাগেনা।

—- লাগতে হবে, ভবিষ্যতে জেকে গ্রুপে বসতে হবে। আমার পাশাপাশি বিজনেসের হাল ধরতে হবে, যেভাবে তোর মা আমার বাবার ছাঁয়া হয়ে পাশে থেকেছিল,ঠিক সেভাবে।
অরু তৎক্ষনাৎ পেছনে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বললো,—- আপনি কি চাইছেন আমিও আমার মায়ের সাথে কোম্পানি নিয়ে দন্দে লিপ্ত হই?
অরুর কথার জবাবে তীর্যক হাসলো ক্রীতিক, অতঃপর বললো,
— আমি বেঁচে থাকতে তোর সাথে লাগতে আসার মতো কলিজা কারোর নেই বেইবি, কিন্তু আমি যখন না থাকবো, তখন তো তোর নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হবে এই ক্রুয়েল পৃথিবীটাতে। আমাদের নিষিদ্ধ সম্পর্কের জের ধরে তোকে অনেকে অনেক ভাবে হেয় করতে চাইবে, দেখবি কাছের মানুষরাও কেমন রূপ বদলে ফেলবে, তখন যদি তুই বিগেইনার হোস তো তোর জন্য সবকিছু সামলানো খুব কঠিন হয়ে যাবে, নিজের দ্বায়িত্ব বুঝে নিতে গিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে কটাক্ষের স্বীকার হতে পারিস, যা তোকে সামনে এগোতে দেবে না, কারণ ওরা চাইবে তুই যাতে ভেঙে পরিস, ভেঙে পরে নিজের অধিকার ছেড়ে দিস। তাই আমি থাকতে থাকতেই আমার পাশে থেকে আমার হাত ধরে নিজের যায়গাটা নিজেই তৈরি করে নিতে হবে তোকে বেইবি। আর এসবের জন্য পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই।
ক্রীতিকের এতোসব জ্ঞানের বানী কানে ঢুকলো না অরুর, বরং ও বেশ বিরক্ত হয়ে ক্রীতিকের দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে তাকিয়ে বললো,— আপনি থাকতে থাকতেই মানে?আমায় ছেড়ে কোথায় যাবেন আপনি? কিছুদিন আগে এতো বড় একটা এ্যা’ক্সিডেন্ট হলো, এখন

আবার এসব বলছেন, আমার একটুও ভালো লাগছে না আপনার কথাবার্তা চুপ করুন এক্ষুনি।
ক্রীতিক মৃদু হেসে অরুর খোলা চুলে হাত বুলিয়ে শান্ত স্বরে বললো,
—- এটাতো কথার কথা বললাম বেইবি, তবে যা বলেছি খুব ভেবে চিন্তে চিরন্তন সত্যি কথাগুলোই বলেছি, তুই জানিস আমি আবেগে গা ভাসানো মানুষ নই, তাই তিক্ত হলেও সত্যি বলতে আমার মুখে বাঁধেনা।
অরু ঠোঁট উল্টে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো,
— তাই বলে এসব বলবেন?
ক্রীতিক অরুর কলার বোনের ভাঁজে টুকরো চুমু খেয়ে বললো,— বলবো না, তার আগে তুই বল, তুই পড়াশোনা শুরু করবি এবং সিরিয়াস হবি।
অরু একটু ভাবলো,পরক্ষণেই ছোট ছোট চোখ করে ক্রীতিকের দিকে নজর দিয়ে বললো,
—- ঠিকাছে পড়বো, তবে একটা শর্ত।
— কি শর্ত?
ক্রীতিকের বুকের উপর নিজের পিঠ ছেড়ে দিয়ে আবদারের স্বরে অরু বললো,
— পড়াশোনার পাশাপাশি আমি উপন্যাস লিখতে চাই, এটা আমার স্বপ্ন, না করতে পারবেন না কিন্তু।
অরুর কথার প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হার মেনে নেওয়ার মতো করেই ক্রীতিক অসহায় গলায় বললো,
— ইউ ক্যান ডু ইট।

ক্রীতিকের আস্কারা পেয়ে অরু এবার আবদারের ঝুড়ি খুলে বসলো, একনাগাড়ে বলতে লাগলো সব,—- আর আমি সকালে ব্রেকফাস্টও বানাতে চাই।
—- ইউ ক্যান।
— এ বাড়িটাকে নতুন করে ডেকোরেট করতে চাই।
— ইউ ক্যান।
—- নীলিমার সাথে দেখা করতে চাই?
—- ইউ ক্যান।
—ডোরাকে এনে দিন।
— ইউ ক্যান। ক্রীতিকের শেষ কথাতে থেমে গেলো অরু, ডোরাকে এনে দিতে বলার সাথে ইউ ক্যান এর কি সম্পর্ক ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে, চকিতে পাশ ফিরে তাকায় অরু। পাশে তাকাতেই দেখলো গালে হাত দিয়ে ওর দিকেই নিস্প্রভ চোখে চেয়ে আছে ক্রীতিক, যেন শিল্পী তার নিজ হাতে বানানো কোনো স্কাল্পচারকে বিস্ময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ক্রীতিককে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অরু হাত নাড়িয়ে শুধালো,
— কি দেখছেন?
তৎক্ষনাৎ জবাব দিলো ক্রীতিক,
— তোকে।
ক্রীতিকের কথায় খানিকটা লজ্জা পেয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথায় নুয়িয়ে ফেললো অরু।
অরুকে লজ্জা পেতে দেখে ক্রীতিক এবার সটান বসে কাঠকাঠ গলায় বললো,

— লেনদেনে আমি খুব কড়া অরু, তোকে আমি বিনা শর্তে এতোকিছুর অনুমতি দিয়ে দিলাম, বিনিময়ে আমি কি পাবো?
অরু হেঁসে বললো,
— আপনার তো সবই আছে, আর কি চাই?
— রাইট নাও ইউ হ্যাভ টু শাওয়ার উইথ মি, আপাতত এটাই চাই, লেটস গো।
যদিও ক্রীতিকের চাহিদার কথা শুনে বিশাল বড় একটা ঝটকা খেলো অরু, তবে ক্রীতিক তার ধার ধারলো না মোটেই, বরং অরুকে টেনে হিঁচ'ড়ে, সাথে করে নিয়ে ত্যাগ করলো জিম রুম। নদীর স্রোতের মতোই কলকলিয়ে বয়ে যায় সময়। চোখের পলকে খসখস করে উল্টে যায় ক্যালেন্ডারের পাতা। মিনিট, ঘন্টা, দিন,রাত পরবর্তীতে মাসের পর মাস কিভাবে যে সময় গুলো চলে যায় তা ঠাওর করা দুষ্কর। স্থান কাল ভেদে সময়ের এই বিবর্তন কিছুটা মিশ্র প্রতিফলন ফেলে রেখে যায় মানুষের মাঝে, কেউ মরিচীকার মতো হাতরে বেড়ায় পুরনো ফেলে আসা স্মৃতি, কেউবা এক বুক আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করে নতুনের আগমনী বার্তার। আজ তেমনই একটা সুন্দর দিন, এলিসার বেবি শাওয়ার আজ, দেখতে দেখতে কখন যে সাতটা মাস পেরিয়ে গেলো,পেটের মাঝে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা সত্তাটার আসারও সময় হয়ে গেলো অথচ কোনোকিছুই সেভাবে অনুভব করতে পারলো না এলিসা। কি করেই বা পারবে? গত সাত মাসে প্রেগন্যান্সী সিকনেস ওর ধারে কাছেও ঘেষতে পারেনি, বেবি বাম্প নিয়েই কর্পোরেট অফিসে ফুল টাইম ডিউটি করে গিয়েছে পুরো সময়টাতে। কিন্তু এতোগুলো দিন পেরিয়ে এলিসার নিজেরও মনে হলো এখন একটু অর্ণবের কথা

শোনা প্রয়োজন, বাচ্চাটা গর্ভে বড় হচ্ছে, তারও তো ভালো থাকা মন্দ থাকার ব্যাপার রয়েছে, তাছাড়া অর্ণব সেই তিন মাস থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছে যাতে এলিসা এবার একটু শান্ত হয়। অবশেষে সাত মাসের মাথায় এসে বাচ্চার মুখ চেয়ে এতো ভালো কর্পোরেট জবটা ছেড়েই দিলো এলিসা। আর আজকে যে এই বেবি শাওয়ারের এতো বড় আয়োজন, সেটা মূলত সায়র, ক্রীতিক আর অর্ণবেরই প্ল্যান। ওদের তিনজনার একটা মাত্র মেয়ে বেস্টফ্রেন্ড, অবশ্যই সে প্রিন্সেস ট্রিটমেন্ট ডিজার্ভ করে।যতই হোক ওদের চারজনের মধ্যে আর কেউ কোনোদিন মা হবে না আর, যা হবে সব বাবা।বেবি শাওয়ারের আয়োজন করা হয়েছে বেশ জাঁকজমক ভাবে, চারিদিকে ল্যানটার্ন আর স্ফটিকের রোশনাই এ পুরো হলরুমটা ঝিলমিল করছে। পুরো অনুষ্ঠানের থীম আজ স্কাই ব্লু। এলিসাকে থীমের সাথে মিলিয়ে আকাশী রঙের গাউন আর পার্লের মুকুট পরানো হয়েছে, তাতে গুটি ইংরেজি অক্ষরে লেখা মম টু বি। অর্ণব ও এলিসার সাথে মিলিয়ে স্কাই ব্লু রঙের স্যুট চড়িয়েছে গায়ে, বউয়ের সাথে রঙ মিলিয়ে জামা কাপড় পড়ার অভ্যেসটা আর গেলোনা ছেলেটার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আজকে এলিসা একটুও রেগে নেই অর্ণবের উপর, বরং নিজের বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো হাসবেন্ডের গলা জড়িয়ে ধরে একের পর একে ফটোতে পোজ দেওয়ায় ভীষণ ব্যস্ত সে।হলের এক কোনে ডোরাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে এলিসা অর্ণবকে দেখে মৃদু হাসলো অরু, অতঃপর চোখ ঘুরিয়ে তাকালো প্রত্যয় আর অনুর দিকে, গত মাসেই আমেরিকা এসেছে অনু। আসলে এসেছে বললে ভুল হবে, প্রত্যয় জোর করে নিজের সাথে নিয়ে এসেছে অনুকে, কারন অনু দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

মাঝখানে কোম্পানির কাজে বেশ কয়েকমাস দেশে ছিল প্রত্যয়, পরে যখন অনুর এই অবস্থা হলো, তখন নিজের অনাগত সন্তানের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আর একা একা ইউ এস এ ফিরতে পারলো না প্রত্যয়। একজন দ্বায়িত্বশীল স্বামী আর সন্তানের মতোই আব্বু আম্মু স্ত্রী সমেত ফিরে এলো সে। প্রত্যয়ের ছোট্ট এ্যাপার্টমেন্টে এখন প্রতিনিয়ত খুশির ফোয়ারা বয়ে যায়, মাঝেমধ্যে তো অরুও এসে যোগ দেয় ওদের পারিবারিক আড্ডায়, তারপর সন্ধ্যা হয়ে এলেই কোথা থেকে যেন ক্রীতিক ফিরে এসে ঠিক সময় মতো নিয়ে যায় তার ছোট্ট বউকে। বউ টউ নিয়ে আবার রাত্রিবেলা একদমই রিস্ক নেয়না সে,অরুকে কাছে না পেলে যদি ঘুম না হয়? সেই দুশ্চিন্তায়।স্বভাবটা যে শুধুমাত্র ক্রীতিকেরই, তেমনটা বললে মিথ্যে বলা হবে। আজকাল অরুর ও তো ঘুম হয়না মানুষটার শক্ত, চওড়া, ঢেউ খেলানো বুকে মাথা না ঠেকালে।— কিরে কি ভাবছিস?

নীলিমার অকস্মাৎ ডাকে ভাবনার সুতো ছিড়লো অরুর, ধ্যান ভেঙে গেলে অরু আস্তে করে ঘাড় ঘোরালো নীলিমার পানে,শ্যামা মেয়েটাকে আজ এই অফ হোয়াইট গাউনে চমৎকার লাগছে, কি সুন্দর গাউনের সাথে ম্যাচিং করে হেয়ার স্টাইল করেছে, পুরোই ডিজনি প্রিন্সেস সিনড্রেলা। অবশ্য নীলিমার এই পরিপাটি সাজগোজের পেছনো সায়রের অবদানই সবচেয়ে বেশি, কারণ আগে পরে যে কোনো পার্টি ফাংশনেই নিজের পার্সনাল স্টাইলিস্টকে দিয়ে নীলিমার ড্রেসআপ করায় সায়র, ওই জন্যই প্রত্যেকবারই চমৎকার লাগে নীলিমাকে, যেন কোন সর্গ পরী,পার্ফেকশনের উর্ধে যা থাকে তাই হলো নীলিমা ।

— আবার কি ভাবতে বসলি বলতো?
অরুর পাশের চেয়ারটাতে আয়েশ করে বসে কথাটা বললো নীলিমা।
অরুও এবার এগিয়ে গিয়ে নীলিমার পাশে বসলো। ডোরাকে আদর করতে করতে নীলিমাকে শুধালো ,—- শুনলাম লন্ডন গিয়েছিলি? কেমন কাটলো ভ্যাকেশান?
নীলিমা ঠোঁট উল্টে জানালো,
— সায়র শুটের কাজে বিজি ছিল খুব, সেভাবে ঘোরা হয়নি, তোদের কি খবর?
— এই চলছে, বকুনি ঝকুনি আর পড়াশোনা।
নীলিমা নিঃশব্দে হাসলো, অতঃপর বললো,
—- তুই বলেই ক্রীতিক ভাইয়াকে সামলাতে পারিস, অন্য কেউ হলে নির্ঘাত মুখ চালাতে গিয়ে ওনার হাতে মা'র খেয়ে ভর্তা হয়ে যেত। নীলিমার কথা শুনে অরু মৃদু হেসে ক্রীতিকের পানে চাইলো, যে এই মূহুর্তে হলের এককোনে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সাথে কুশল বিনিময়ে ব্যস্ত সময় পার করছে, পরনে ফুল ব্ল্যাক স্যুট তার, কানে লাগানো এয়ারপড,হাতের ঘড়ি এমনকি টাই'টা অবধি কালো রঙের। ক্রীতিকের চুল বড় হয়ে গিয়েছে এখন, সেই আগের মতো ঘাড় ছুঁই ছুঁই লম্বা চুল গুলো বেশ স্টাইল করে সেট করা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো দিয়ে আবৃত গৌড় বর্ণের লোকটাকে দেখে সবার আড়ালে লাজুক হাসলো অরু, এই ভেবে লাজুক হাসলো যে, এই ড্যাশিং, হ্যান্ডসাম, হিরোদের মতো দেখতে ছেলেটা তার প্রতি কি ভীষণ ভাবে আসক্ত। গত সাত মাসে কতবার কত রকম ভাবেই না পা'গলামি করেছে তার জন্য। প্রয়োজনে শাসন করেছে, নিজের রাগ

সংবরণ করতে না পারলে একটু অতিরিক্তই করেছে, তবে দিন শেষে ঠিকই অরুর রাগ ভাঙাতে উঠে পরে লেগেছে, নিজেকে যতটা অসহায় প্রমান করলে অরুর মন টলবে, ঠিক ততটাই দূর্বল হয়েছে সে। সেই সময়গুলোতে কোথায় যেন উবে যায় ক্রীতিকের ম্যানলি ইগো। পাছে এসে ভর করে আর্দশ স্বামী হওয়ার ভীষণ পায়তারা। তবে পুরো পৃথিবী সেই ভেতরের জায়ান ক্রীতিকটাকে আবিষ্কার করতে পারেনি কোনোকালেই,যা অরু পেরেছে। অরুকে যদি কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে, এই বদ মেজাজী, উগ্র লোকটার সাথে কি করে থাকো বলোতো? অরু তখন একগাল হেসে জবাব দেয়,—- তোমরা যা জানোনা, তা কেবল আমিই জানি। কারণ আমি ওনার উগ্রতা নয় ভালোবাসার মাপকাঠিতে তলিয়ে আছি।যেখানে ওনার এক বুক ভালোবাসার রাজ্যে উগ্রতা নিছকই এক কীটপতঙ্গ মাত্র। ভালোবেসে সেটুকু ও সহ্য করতে না পারলে ভালোটা আর বাসলাম কই?
ক্রীতিকের দিকে সেই তখন থেকে শুকনো মুখে চেয়ে আছে দেখে নীলিমা অরুকে কনুই দিয়ে খোঁচা মে’রে এলিসাকে দেখিয়ে বললো,
— তবে যাই বলিস না কেন, অনু আপা আর এলিসা আপু কিন্তু এগিয়ে গেলো আমাদের চেয়ে।
এলিসার ভরাট গুলুমুলু চেহারাটার দিকে চেয়ে আপসোসের সুরে অরু বলে ওঠে,
— ঠিকই বলেছিস। ওরা সত্যিই লাকি।
অরুর আপসোস শুনে মনটা ভার হয়ে এলো নীলিমার, পরক্ষণেই বুদ্ধিমানদের মতো চট করেই নীলিমা বলে উঠলো,—- বেবি নিলে

কেমন হয় বলতো? আমিতো সায়র কে বললেই ও বেবি নেওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠবে।
অরু মুখ কাঁচুমাচু করে ক্রীতিকের দিকে দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
— তুই তো চাইলেই পেয়ে যাবি, কিন্তু আমার যে অনুমতি নিতে হবে।
অরু যখন কথাগুলো বলছিল ঠিক তখনই স্টেজ থেকে বল নাচের ঘোষণা করলো ক্যাথলিন আর তার ফিয়ন্সে।
ঘোষনা শুনে সায়রের সঙ্গে বল নাচ করবে বলে তৎক্ষনাৎ খুশিতে লাফিয়ে উঠলো নীলিমা , আনন্দে আত্মহারা হয়ে খুশিতে করতালি দিয়ে নীলিমা যায়গা ছেড়ে উঠে গিয়েও পুনরায় ফিরে এসে, অরুর কানে কানে হিসহিসিয়ে বলে গেলো,
—- এই সুযোগে জিজুকে কনভিন্স করে ফেল, দেখবি নাচতে নাচতেই হ্যা বলে দেবে।— চলুন ডান্স করবো।
আচমকা সু'পরিচিত রিনরিনে আওয়াজটা কর্ণকূহরে পৌঁছাতেই কানের একটা এয়ারপড খুলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পাশে তাকালো ক্রীতিক। দেখলো ওর দিকেই চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে দাঁড়িয়ে আছে অরু। অরুর এমন গদোগদো ভাবসাব দেখে হাসি পেলো ক্রীতিকের, তবে ও হাসলো না নিজেকে যথাসম্ভব সংবরণ করে, মুখের আদলে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে এক ভ্রু উঁচিয়ে শুধালো,
— কাহিনী কি?
—কোনো কাহিনী নেই, চলুন তো সবাই নাচ করছে।কোনো রকম জবাবদিহিতা ছাড়াই একপ্রকার টেনেটুনে ক্রীতিককে বল নাচের

মঞ্চে নিয়ে গেলো অরু। এখানের পরিবেশটাই অন্যরকম, সবাই নিরিবিলি পার্টনারের সাথে কোমড় দোলাচ্ছে আর একটা হ্যাপি মোমেন্টের সাক্ষী হচ্ছে, এলিসাকেও খুব সাবধানে আঙুলের মাথায় ঘোরাচ্ছে অর্ণব। তবে আজকের বল নাচের স্টেজে দাঁড়িয়ে হুট করেই সেই প্রথম দিনের কথা মনে পরে গেলো ক্রীতিকের । যখন ওর সামনের মেয়েটা স্বয়ং অরুই ছিল, কিন্তু মেয়েটার দু'চোখে ছিল অনিশ্চয়তা আর শঙ্কার ছড়াছড়ি , ভীত হরিণীর মতো একরত্তি শরীর নিয়ে ক্রীতিকের বাহুতে সেদিন কুঁকড়ে ছিল অরু , আর শেষমেশ কিছু না বলেই হুট করে এক পায়ের নুপুর ফেলে রেখেই পালিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। অথচ আজ মেয়েটার দু'চোখে রয়েছে নিদারুন চঞ্চলতা, নেই বিন্দু মাত্র সংশয়, আর নাতো আছে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা। একরাশ খুশির পারদ যেন উপচে পরছে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা থেকে, যা চাইলেও টাকার বিনিময়ে কিনে নিতে পারবে না ক্রীতিক। অগত্যাই অরুর খুশিতে খানিকটা ঢেউ তুলে দিয়ে, ওর কোমড় চেপে ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এলো হঠাৎ। অরু ভড়কালো না, বরং নিজের হাতটাকে তুলে রাখলো ক্রীতিকের কাঁধের উপর, তারপর শুরু করলো দুজন দুজনার সাথে গানের তালে পা মেলানো। ল্যাভেন্ডার কালারের গাউন সাথে স্মোকি আইশ্যাডো আর হালকা স্টোনের জুয়েলারিতে অরুকে মারাত্মক সুন্দর লাগছিল, ক্রীতিক কম্পলিমেন্ট দিতে জানেনা খুব একটা, তবুও আজ অরুর সব সংশয় কাটিয়ে দিতে ওকে ঘোরাতে ঘোরাতে হাস্কিস্বরে বলে উঠলো ,— তোকে অপরূপ লাগছে বেইবি। অরু হাসলো সামান্য, তারপর আবারও চোখ রাখলো ক্রীতিকের কালো চোখের মনিতে ,মূহুর্তেই দুজন দু'জনার চোখে চোখ রেখে

হারিয়ে গেলো গভীরে, চোখে চোখেই হাজারো কথা আদান প্রদান হলো ওদের বোধ করি। চারিদিকে প্রেম প্রেম সুগন্ধ, পৃথিবীর সকল চিন্তা ভুলে গিয়ে হুট করেই ক্রীতিকের মনে হচ্ছে, আশেপাশে এই চোখ জোড়া ছাড়া কিচ্ছু নেই। কোন মানুষ নেই, কোনো শব্দ নেই, কোন বস্তু নেই, কেউ নেই।
আছে শুধু দুইজোড়া তৃষ্ণার্থ চোখ, যার ঘোলাটে চাহনী দেখে মনে হয় একে অপরের দিকে জনম জনম তাকিয়ে থাকলেও সেই তৃষ্ণা মিটবে না কোনদিন, উল্টো দিনকে দিন বেড়েই যাবে তাকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দুটো চোখ নেশার ঘোরে বুদ,তখনও পারিপার্শ্বিক সকল আওয়াজ ছাপিয়ে মিষ্টি একটা সুরেলা গলা কানে ভেসে এলো ওদের দুজনার, সেই গানে আরও একবার সবকিছুর উর্ধে গিয়ে মনের মাঝে ভালোবাসার হলকা জ্বলে উঠেছিল দুজনারই, খুব কাছেই কেউ একজন প্রান দিয়ে গাইছে,i have died every day waiting for you,
Darling don’t be afraid,
i have loved you,
For a thousand year’s
I’ll love you for a
Thousand year’s……
ক্রীতিক যখন অরুর চোখের অতল গহ্বরের ডুবে যাচ্ছিল, ব্যস্ত হয়ে ওর চোখের মাঝে নিজের সত্তাটাকে খোজার আপ্রান চেষ্টা করছিল,ঠিক সেই মূহুর্তে সকল রোমান্টিকতায় একবালতি জল ঢেলে দিয়ে অরু ঠাস করেই বলে ওঠে,
— আমার বাবু চাই।

অরুর এহেন আবদার শুনে ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেলো ক্রীতিকের, চোখে কয়েকবার পলক ফেলে নিজেকে স্বাভাবিক করে উল্টো প্রশ্ন ছুড়লো ক্রীতিক,—- কিহ, কি চাই?
অরু চোখের ইশারায় এলিসাকে দেখালো, যে এই মূহুর্তে ডিভানে বসে বসে পেস্ট্রি কেক খাচ্ছে। এলিসাকে এক ঝলক পরখ করে ক্রীতিক অরুর পানে তাকিয়ে বললো,
— তো?
—- আমারও বাবু চাই।
অরুর কথার প্রত্যুত্তরে ক্রীতিক ভাবলেশহীন গলায় বললো,
—- হ্যা তোর তো বাবু আছেই, ডোরা না তোর মেয়ে?
ক্রীতিক ইচ্ছে করে কথা ঘোরাচ্ছে, তিল কে তাল বানাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেলে তেতে উঠলো অরু, বিরক্ত কন্ঠে বললো,
—-এই বাবু সেই বাবু না, এলিসা আপুর মতো বাবু চাই আমার, আপার মতো বাবু চাই আমার।
ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বলে উঠলো,— বাবু কি হাতের মোয়া? যে চাইলেই পাওয়া যাবে?
অরু ঠোঁট উল্টে বললো,
— এনে দিন, আমি জানি আপনি সব পারেন।
ক্রীতিক অরুর কপালে আলতো চুমু খেয়ে জানালো,
— এখন নয়, একটু বড় হ। ঠিক সময় মতো পেয়ে যাবি।
ক্রীতিকের কথার পাছে অরু রেগেমেগে কিছু বলবে তার আগেই অর্ণব আর সায়র এসে কি দরকারে যেন ডেকে নিয়ে গেলো ক্রীতিককে। যাওয়ার আগে পেছন ঘুরে অরুর উদ্দেশ্যে ক্রীতিক বললো,

— এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না বেইবি,ওদিকে গিয়ে বস।স্টেজটা পিচ্ছিল, সামলাতে পারবি না।
ক্রীতিকের এতো কেয়ারিং এই মূহুর্তে আদিখ্যেতার মতোই বিরক্ত ঠেকলো অরুর নিকট। যার দরুন রাগে দুঃখে অরু একাই নাচতে শুরু করলো পা'গলের মতো, যদিও বা জীবনে প্রথমবার চার ইঞ্চি পেন্সিল হীল পরে নাচতে গিয়ে অরু জুত করতে পারলো না খুব একটা, কয়েক মিনিটের মাথাতেই ক্রীতিক যে ওকে এতোক্ষণ সামলে রেখেছিল তার হাতেনাতে প্রমান সরুপ পা মচকে পরে গেলো মেঝেতে ।অরু এভাবে পরে গিয়েছে দেখে দ্রুত ছুটে এলো অনু, উদ্বিগ্ন কন্ঠে শুধালো,
— কিরে এভাবে পরে গেলি কি করে? ব্যথা পেয়েছিস কোথাও ?
অরু মাথা তুলে অসহায় স্বরে বলে উঠলো,
— পায়ে ভর দিতে পারছি না আপা, মনে হয়ে মচকে গিয়েছে।
অনু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শক্ত হাতে বোনকে তুলে একসাইডে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলো চেয়ারে। অরু হঠাৎ হঠাৎ ব্যথায় চোখ মুখ খিঁচিয়ে ফেলছে, তা দেখে অনু বললো,
— তুই বস, আমি এক্ষুনি বরফ ম্যানেজ করে নিয়ে আসছি, বরফ লাগালে ব্যথা কমবে আশা করি।কথাটা বলে অরুকে বসিয়ে রেখে দ্রুত কোথাও একটা চলে গেলো অনু। ওদিকে অরু ব্যথা পেয়েছে শুনে কই থেকে যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো ক্রীতিক, আশেপাশে তখনও সবাই ছিল,কিন্তু ক্রীতিককে দেখতে পেয়ে ওদের কে স্পেস দিয়ে যে যার মতো চলে গেলো সবাই।

— কতবার বলেছি এসব হাই হীল পড়তে হবে না, তবুও জিদ ধরে পরলি, এখন ব্যথাটা কে পেলো শুনি? ইশ গোড়ালিটা কালচে হয়ে গিয়েছে একদম।
অরুর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে, ওর পা থেকে জুতো গুলো খুলতে খুলতেই রাগি গলায় অরুকে ধমকালো ক্রীতিক। কিন্তু অরুতো অরু, ও এখনো তখনকার ব্যাপারটা নিয়ে ঝুলে আছে, তাইতো অভিমানে ক্রীতিকের হাত থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বসলো চট করে। ওর কান্ডে ক্রীতিক ভ্রু কুঞ্চন করে বললো,— কি হয়েছে?
অরুর সোজাসাপ্টা জবাব,
— আমার বাবু চাই।
অরুর এহেন ছেলেমানুষী তে রাগ হলো ক্রীতিকের, কোনমতে নিজেকে সংবরণ করে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,
—- বলেছি না পরে।
— না এক্ষুণি।
ক্রীতিক চেয়ার সমেত অরুর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে, গম্ভীর গলায় শুধালো,
— বাচ্চা বাচ্চা যে করছিস, বয়স কত তোর? তুই নিজেই তো একটা বাচ্চা। একটা বাচ্চাকে বাচ্চা দিয়ে তারপর দুই বাচ্চাকে সামলাতে হবে আমার, আমি এসব রিস্কে নেই।
হ্যা, না কিচ্ছুই না বলে,মুখে কুলুপ এঁটে চুপচাপ বসে আছে অরু, তা দেখে ক্রীতিক ওকে একটু মানানোর চেষ্টা করে বললো,—প্রেগন্যান্সীর জন্য একটা নূন্যতম বয়স লাগে বেইবি, নয়তো বাচ্চাকে সামলাবি কি করে? তাছাড়া তোর হেলথ কন্ডিশন

বেবি নেওয়ার জন্য উপযুক্ত কিনা সেটাও তো যাচাই-বাছাই করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা,
মাঝপথেই থেমে গেলো ক্রীতিক, অরু এবার আগ বাড়িয়ে শুধালো,
— সবচেয়ে বড় কথা কি?
— তোর ভালোবাসায় আমি কোনো ভাগিদার এলাউ করতে রাজি নই অরু।
অরু আশ্চর্য হয়ে গেলো ক্রীতিকের এহেন ছেলে মানুষী কথায়, ও আশ্চর্য কন্ঠেই বলে উঠলো ,
—- আপনি কি পাগল? বাচ্চাটা আপনার হবে, আর আপনি তাকে এখনই হিংসা করছেন?
ক্রীতিক গম্ভীর গলায় বললো,—- যা বলেছি তাই।
অরুও যেন নাছোড়বান্দা, ও গাল ফুলিয়ে প্রত্যুত্তর করে জানালো,
—- না আমার বাবু চাই, চাই-ই চাই।
মেয়েটার ডানপিটে জিদের কাছে আরও একবার পরাজিত হয়ে হার মানার মতোই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ক্রীতিক, অতঃপর একহাতে অরুর জুতো আর অন্য হাতে অরুকে কোলে তুলে গভীর গলায় বললো,
—- ঠিকাছে বাসায় চল, দিচ্ছি তোকে বাচ্চা।
কথাটা বলে অরুকে নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল ক্রীতিক, তখনই পেছন থেকে অনু এসে দেখলো এই কাহিনি, ক্রীতিক অরুকে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে অনু বিড়বিড়িয়ে বললো,
—- আরেহ বরফ না লাগিয়েই কোথায় যাচ্ছে এরা?
প্রত্যয় পাশ থেকে অনুর কাঁধে হাত রেখে তীর্যক কন্ঠে বলে,

—-- চিন্তা নেই, ক্রীতিক ভাই ঠিক সামলে নেবে অরুকে। তুমি এদিকে এসে একটু বসোতো, আজ অনেক নড়াচড়া করেছো এবার একটু রেস্ট করো।
প্রত্যয়ের কথায় অনু হাসি সংবরণ করতে না পেরে, মুখের উপর হাত রেখে বললো,—-- তুমি এমন ভাব করছো, যেন তোমার বাচ্চাটা কালকেই পৃথিবীতে চলে আসবে।
প্রত্যয় বোকাদের মতো মাথা চুলকে বললো,
— কি করবো বলো? তর সইছে না তো।
ওদিকে ক্রীতিককে এভাবে চলে যেতে দেখে, সায়র হাঁক ছেড়ে ডেকে উঠে শুধালো,
—-- কিরে জেকে, পার্টি তো শেষ হয়নি, এখনই কোথায় যাচ্ছিস তোরা?
ক্রীতিক অরুকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে না ঘুরেই উত্তর দিলো,
—-- বউকে বেস্ট গিফট দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, তাই বাসায় যাচ্ছি।
ক্রীতিকের ঘুরানো প্যাচানো কথাটা প্রথমে ধরতে না পারলেও, যখন এর আসল মানে সায়রের ব্রেইনে ক্যাঁচ করলো, তখন আর এক মূহুর্তও অপেক্ষা করলো না সায়র, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নীলিমার হাত থেকে খাবার দাবার সব কেড়ে নিয়ে সাইডে রেখে বললো,—-- তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো, আই থিংক আমাদের বাসায় যাওয়া উচিৎ।
মুখ ভর্তি খাবার গুলো তাড়াহুড়ো চিবুতে চিবুতে নীলিমা বলে ওঠে,
— কেন?
বড়সড় তান্ত্রিকদের মতো করে, কৌশলী কন্ঠে সায়র বললো,

— জেকে কে এবার হারাতেই হবে আমায়, ব্যাটা সবকিছুতে ফাস্ট। এবার আর সেটা হতে দিচ্ছি না আমি। দ্রুত খাও জান, হারি আপ,বাসায় গিয়ে প্রসেসিং শুরু করতে হবে তো।
ওই হিটলার ব্যাটাকে আমার আগে কিছুতেই বাবা হতে দেওয়া যাবেনা, নেভার।
সায়রের কথার আগামাথা কিছুই মাথায় ঢুকলো না বেচারী নীলিমার, তবুও মেয়েটা বাধ্য স্ত্রীর মতোই স্বামীর কথায় ব্যস্ত হয়ে পরলো মুখ ভর্তি খাবারকে দ্রুত গলধঃকরন করার কাজে। প্রায় তিন বছর পরে.......
ক্যালেন্ডারের পাতায় ডিসেম্বর মাস চলমান, পৃথিবীর সর্বত্র এখন শীত বুড়ির রাজত্ব। কৃত্রিম তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক মেশিনে আবর্তিত ঘরের বাইরে পা রেখে, দু'দন্ড দাঁড়ালেই যেন তুষারে ঢেকে স্নো ম্যানে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে সমস্ত শরীর,ঠিক এতোটাই ঠান্ডা পরেছে চারিদিকে।
ক্যালিফোর্নিয়াতে সাধারণত তুষার পাত হয়না খুব একটা, কিন্তু এবছর বিভিন্ন যায়গায় স্নো ফলের খবর পাওয়া যাচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার যে যে স্টেট গুলোতে এ বছর স্নো ফল হয়েছে, ক্রীতিকের শহরতলীও তার অন্তর্ভুক্ত এরিয়া। পুরো শীতের অনেকটা সময় ধরে দিনরাত তুষার পাত দেখে দেখে ওদের সময়গুলো উড়ন্ত মেঘের মতোই মসৃণতায় ভেসে গিয়েছে কোথাও। জীবনটাকে মনে হয়েছে তুষারের মতোই শুভ্র আর সহজ। হাত লাগাতেই কেমন পেজা তুলোর মতো গলে যায় সব। ঠিক তেমনই তুষারে ঢাকা মসৃণ দিনগুলোকে পেছনে ফেলে আজকের সকালটা

শুরু হয়েছে তীক্ষ্ণ সূর্য কীরনের এক ছটাক সোনালী আলোক রশ্মির আগমনে।
বাংলাদেশ আজ রোদ্রজ্বল, ইট পাথরে ঢাকা শহুরে বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে সেই উজ্জ্বল টুকরো টুকরো রোদের ছটা আঁচড়ে পরছে যত্রতত্র। বহুদিন বাদে চোখের সামনে আজ এই সূর্যালোক বড়'ই আনন্দিত করলো অরুকে। আলো ছায়ার সুন্দর সমীকরণ দেখতে দেখতেই এক টুকরো প্রশান্তির হাসিতে প্রসারিত হলো তার দু'ঠোঁট। আলোগোছে চোখ দুটো বুঁজে বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে অস্ফুটে বিড়বিড়ালো সে,
—- আহ, আমার দেশ। "সাইনিং ইভেন্ট ২০২৭। অথর, অরোরা জায়ান চৌধুরী। "
মাঝারি সাইজের হলরুমটার স্টেজ বরাবর উপরিভাগের বোর্ডে ঝুলছে লেখাগুলো। স্টেজের সামনেই বসে আছে কিছুসংখ্যক পাঠক পাঠিকা। তাদের সবার হাতে একটা করে পুরু বই। বইগুলোর কভার পেজ দেখে মনে হচ্ছে কোন থ্রীলার রোমান্টিক জনরার উপন্যাস হবে হয়তো। পুরোটা প্রচ্ছদে ফুটে উঠেছে রঙ তুলিতে ধারন করা জীবন্ত তুষার পাতের প্রতিচ্ছবি। তার মাঝেই ভীষণ ব্যাকুল দুজন কপোত-কপোতীর গভীর চাহনি। যেন একজন আরেকজনকে দেখে ভূবণ ভুলে গিয়েছে তারা। তার ঠিক উপরে রক্তরঞ্জিত বাংলা অক্ষরে লেখা,
"গোধূলি বেলার রোদ্দুর"
এমন তুষার পাতের দৃশ্য পটের মাঝে হঠাৎ গোধূলি বেলার রোদ্দুর কোথা থেকে এলো সেটা রহস্যই বৈকি।

পাঠক পাঠিকাদের একটা বিরাট অংশের তুমুল আকর্ষন কেড়ে নিয়েছে এই রহস্যময়ী প্রেমের উপন্যাস। তাইতো এ বছরের বেস্ট সেলের শীর্ষে রয়েছে নোবেলটি।প্রথম উপন্যাসেই এতো ভালো সারা পেয়ে, পাঠক পাঠিকাদের সম্মানার্থে একটা সাইনিং ইভেন্ট না করলেই নয়, তাইতো ক্রীতিক কে হাজার বারবার বলে কয়ে, দেশে আসার জন্য রাজি করানো হয়েছে।যদিও এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ওর বন্ধু মহলের। অরুর কথা হলে তো এককান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতো সে।
সাইনিং ইভেন্টে আগত সমগ্র পাঠক পাঠিকাদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে, স্টেজ থেকে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে একজন এ্যাংকর মতোন মহিলা ঘোষণা দিয়ে মঞ্চে ডাকলেন অরুকে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও তো অরু নেই। আমন্ত্রিত পাঠক পাঠিকারা এদিকে ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছে লিখিকাকে, কিন্তু দেখা নেই তার। ব্যাপারটা হতাশা জনক। লেখিকা মানুষ এইটুকুনি তো কমনসেন্স থাকা উচিত ছিল। পাবলিকেশনের এ্যাংকর মেয়েটা নিজেও হুট করে ঘোষণা দিয়ে বেশ বিব্রত বোধ করছেন সবার সামনে।
এমনই একটা সময় ঘোষনার প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে, হলের মধ্যে প্রবেশ করে শাড়ি পরিহিত একজন রমনী। ছাই রঙা শীফনের শাড়িটার কুঁচি ঠিকঠাক করতে করতেই মেয়েটা উঠে এলো মঞ্চে। হাটু অবধি নেমে আসা লম্বা চুলগুলো আলগোছে কানের পাছে গুঁজে, এ্যাংকরের অনুমতি সাপেক্ষে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে মেয়েটি বলে ওঠে,—- শুভ সকাল পাঠকবৃন্দ। এতোক্ষন যাবত অপেক্ষা করিয়ে আপনাদের মূল্যবান সময় করার জন্য

আন্তরিক ভাবে দুঃখীত আমি। আসলে বিলম্বটা ইচ্ছাকৃত নয়, আজ সকালের ফ্লাইটেই বাংলাদেশে এসেছি আমি, ফ্লাইট কিছুটা ডিলে হওয়ার দরুন এই বিলম্ব। তবুও নিজের অপরিনামদর্শীতার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন আমায়।
এই পর্যায়ে পাঠক পাঠিকাদের করতালির আওয়াজ শোনা গেলো, যার অর্থ তারা সকলে লিখিকার ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। সকলের করতালির আওয়াজে মিষ্টি করে হাসলো লিখিকা, অতঃপর পুনরায় মাইক্রোফোনটা মুখের সামনে এনে বললো,
—- আমরা উপন্যাস নিয়ে কথা বলবো,এর চরিত্র গুলোর যথাযথ বিশ্লেষন করবো। তার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই,
আমি অরোরা জায়ান চৌধুরী। গ্রাজুয়েশন ফাইনাল ইয়ারে অধ্যয়নরত, সেই সাথে পারিবারিক কোম্পানিতেই ইন্টার্নশীপ করছি এ বছর। লেখালেখিটা আমার পেশা নয়, আর না তো আয়ের কোনো উৎস। শখ করে লেখি আমি, কারণ আমি কল্পনাবিলাশী। কলমের আঁচড়ে কল্পনাগুলোকে জীবন্ত ফুটিয়ে তুলতে পারলে আত্মতৃপ্তি পাই আমি। যেহেতু আমার মূল পেশা কিংবা পড়াশোনার অংশ সাহিত্য নয়, তাই একটা উপন্যাস বইয়ের পাতায় আনতে আমার তিনবছর লেগে গেলো। তবুও আমার এইটুকু ক্ষুদ্র জ্ঞানকে এতোটা সমাদর করার জন্য আমি আপনাদের সবার প্রতি কৃতার্থ পাঠকবৃন্দ। আ…— আমার মেয়ে তখন থেকে কাঁদছে, আর তুই এখানে ভাষন দিচ্ছিস?
এর পরের বাক্যটা আর শেষ করতে পারলো না অরু, তার আগেই কোথা থেকে যেন একটা লম্বা মতো সুদর্শন যুবক উঠে এলো স্টেজে, তার কোলে দুই কি আড়াই বছরের একটা পিচ্চি মেয়ে বাবু,

বাবুটার চোখ ছলছল করছে, চেরীর মতো কোমল মিষ্টি নিষ্পাপ অধর খানা উল্টে গিয়ে ঠেকেছে চিবুক বরাবর, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এতোক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করেছে সে।
মুখের সামনে মাইক্রোফোন থাকায়, হলে উপস্থিত সকলে শুনতে পেল তাদের লিখিকা মহোদয়াকে বাচ্চাকে কাঁদানোর অপ'রাধে বড়সড় ধমক দিয়েছে একজন লোক। ক্রীতিকের এহেন ঝাড়িতে অরু সামনে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হাসলো,অতঃপর ক্রীতিকের পানে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নিলো মেয়েকে। মায়ের উষ্ণ স্পর্শ পেতেই মেয়ে কা'ন্নাকাটি ভুলে আলতো করে মাথাটা এলিয়ে দিলো মায়ের বুকে। মেয়ে তার মাকে কাছে পেয়ে শান্ত হয়েছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ক্রীতিক। মেয়েটাও হয়ে বাবার ফটোকপি, সে অরুকে ছাড়া কিছুই বোঝেনা। এদিকে ক্রীতিকের দুনিয়া তার একমাত্র মেয়ে, মেয়ের কোনো অসন্তোষ কিছুতেই বর্দাস্ত করে না সে।
অরু স্টেজে দাড়িয়েই কিছুক্ষণ মেয়েকে আদর দিলো,অতঃপর ক্রীতিকের দিকে অসহায় চাহনি নিক্ষেপ করে ঠোঁট উল্টাল, ক্রীতিক তাতে কোনোরূপ পাত্তা দিলোনা, উল্টো অরুর হাত টেনে ধরে ওকে স্টেজ থেকে নামাতে নামাতে বললো,— হয়েছে আর ভাষন দিতে হবে না তোর, আমার মেয়ের খিদে পেয়েছে ওকে খাওয়াতে হবে, চল এক্ষুনি।
অরু করুন কন্ঠে বললো,
— তাই বলে এভাবে ইভেন্টের মাঝখানে চলে গেলে ওরা তো আমাকে জরিমানা করবে।

ক্রীতিক যেতে যেতে জবাব দেয়,
— করলে করুক, তোকে না এই মাসে স্যালারী দিয়েছি? সেখান থেকে দিয়ে দিবি।
অরু মুখ কালো করে বললো,
— আমার প্রথম স্যালারী ছিল ওটা।
—তাহলে আর কি জরিমানা না দিতে পেরে জেলে যাবি।
— তখন আপনার মেয়ের কি হবে?ও তো কাঁদবে।
অরুর কথায় থেমে গেলো ক্রীতিক,পেছনে ঘুরে নিজের ঘুমন্ত মেয়ের দিকে নিস্প্রভ চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এটা তার সত্তা, তারই অংশ, ভাবলেই ভেতরটা কেমন গলে যায়। মায়ার জোয়ারে ফুলেফেঁপে ওঠে হৃদয়টা, ক্রীতিকের জীবনে এখন দুইটা মেয়ে, যাদের কাছে ও ভীষণ অসহায় আর ভীষন কৃতজ্ঞ। এদের ছাড়া যে ওর দুনিয়া অচল।আর এই বাচ্চা মেয়েটা ওর সব সবকিছু, এই মেয়ের জন্য জীবনটা দিয়ে দিতেও বোধ হয় দ্বিতীয়বার ভাববে না ক্রীতিক। ক্রীতিকের জীবনে কখনো নারীর টান ছিল না, আর না তো ও মেয়েদের খুব একটা পছন্দ করতো কোনো কালেই, ওই জন্যই হয়তো উপরওয়ালা ওকে দুজন ভালোবাসার মেয়ে উপহার দিয়েছেন, যারা এই মূহুর্তে ওর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে,— কি হলো, কি ভাবছো?
আজকাল অরু, আপনি তুমি গুলিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা দারুণ লাগে ক্রীতিকের, এই মূহুর্তেও সেই তুমি শুনেই ধ্যান ভঙ্গ হলো ওর। মেয়ের দিক থেকে নজর সরিয়ে অরুর কাছাকাছি এগিয়ে এসে ক্রীতিক বললো,

—-- ঠিকাছে যা, আমার মেয়ের জন্য তোর জরিমানার টাকা মওকুফ। এখন চল, তোদের কে ক্রীতিক কুঞ্জে ড্রপ করে দিয়ে আমি একটু ফ্যাক্টরী ভিজিটে যাবো।
কথাশেষ করে অরু সমেত আবারও হনহনিয়ে হাটা দেয় ক্রীতিক। অরু পুনরায় ক্রীতিককে বাঁধা দিয়ে বললো,
— আস্তে হাঁটুন না, শাড়ি পড়ে আছি, বাবুকে নিয়ে পরে যাবো তো।
ক্রীতিক থামলো, এরপর দু'কদম পিছিয়ে অরুর কোমড় চেপে ধরে ওকে নিজ বাহুতে তুলে নিতে নিতে বললো,
— বেইবি, মেয়েকে শক্ত করে ধর।
ক্রীতিকের কান্ডে থতমত খেয়ে গেলো অরু, সামনেই হাইওয়ে, সবাই তাকিয়ে আছে,অথচ ক্রীতিকের তাতে কোনোরূপ হেলদোল নেই, সে মা মেয়েকে কোলে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে পার্কিংলটের দিকে। এমন একটা বিব্রতকর পরিস্থিতে পরে অরু দাঁত খিঁচিয়ে তেঁতো কন্ঠে ক্রীতিককে বললো,
—-- কি হচ্ছে টা কি? সবাই দেখছে, ভুলে যাচ্ছেন কেন এটা আমেরিকা নয় বাংলাদেশ।
অরুর কথায় কর্ণপাত না করেই গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্রীতিক ধমকালো ওকে,
— শাট আপ, সবার দিকে কে নজর দিতে বলে তোকে? জাস্ট ফোকাস অন মি,এ্যান্ড মাই ডটার।—-- গ্রাম্মা!
মেরীর রংমহলের সবচেয়ে কর্ণারে যে রকিং চেয়ারটা রয়েছে, সেখানেই বসে বসে বেশ মনোযোগ দিয়ে ফিলোসোফির একটা চমৎকার বই পড়ছিলেন আজমেরী শেখ। আজকাল অবসরের

বেশিরভাগ সময়ই এখানে কাটান তিনি, একাই কাটান, নিজের পছন্দের বইগুলোর সাথে, আজমেরী শেখের মতে বইয়ের মাঝে অন্যরকম একটা সুঘ্রাণ রয়েছে, যা তাকে প্রশান্তি দেয়। আর নীরবে বসে একা একাই সেই বইয়ের সুঘ্রাণ বিশ্লেষণ করলে তো আর কথায়ই নেই। কিন্তু আজ সেই নীরবতায় বিঘ্ন ঘটিয়ে বই পড়ার মাঝখানেই মনোযোগ ক্ষুন্ন করে ভেসে এলো একটা ছোট্ট বাচ্চার আধো আধো গলার আওয়াজ।
আচানক সেই অযাচিত ডাকে পেছনে ঘুরলেন আজমেরী শেখ, দেখলেন,তার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে, একটা ছোট্ট বার্বি ফর্ক পরিহিত বাচ্চা মেয়ে চুপচাপ দাড়িয়ে আছে, পায়ে তার আটকানো ভেলভেটের তৈরি লাল রঙা দুটো ব্যালেরিনা জুতো, পিঠ অবধি ছড়ানো রেশমের মতো হালকা বাদামী চুলগুলোকে সাবধানে হ্যালোকিটি হেডব্যান্ড দিয়ে আটকানো। ফর্সা তুলতুলে তার শরীরের গঠন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো আলালের ঘরের দুলালি হবে হয় তো। যার মাথার চুল থেকে থেকে পায়ের নখ অবধি ভীষণ যত্ন আদরে মোড়ানো। বাচ্চা মেয়েটার হাসিহাসি মুখ দেখে আজমেরী শেখের চোখে সবার আগে ভেসে উঠল জায়ান ক্রীতিকের রাগি চেহারাটা, কিন্তু মেয়েটা তো হাসছে, কি আশ্চর্য!
আজমেরী শেখ খুব একটা ভাবলেন না,বরং হাতের ইশারা করে কাছে ডাকলেন বাচ্চা মেয়েটাকে। আস্কারা পেয়ে মেয়েটা তৎক্ষনাৎ কুরকরিয়ে দৌড়ে এলে, তিনি হাতের বইটা সাইডে রেখে হাঁটু মুড়ে মেয়েটার মুখোমুখি বসলেন, অতঃপর নরম গলায় বাচ্চাটাকে শুধালেন,— গ্র্যান্ড মা কাকে বলে, তা কি তুমি জানো?

অবুঝ শিশুটি উপুর নিচ মাথা নাড়ালো, যার অর্থ সে জানে, তারপর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পারদর্শীতা দেখিয়ে নিজেই উচ্ছ্বাসিত গলায় বলে উঠলো,
—- পাপা বলেচে গ্রাম্মা মানে দাদু নানু দুতোই।
আজমেরী শেখ বেশ অবাক হলেন, ভাবলেন এইটুকু মেয়ে ভালোই কথা জানে, তাই তিনি আরেকটু আগ বাড়িয়ে শিশুটিকে শুধালেন,
—- আমিই যে তোমার গ্র্যানি সেটা কে শেখালো তোমায়?
মেয়ে তৎক্ষনাৎ জবাব দিলো,
— পাপা। আজমেরী শেখ ক্ষনে ক্ষনে আশ্চর্য হচ্ছেন আজ,ক্রীতিক তাহলে তার পরিচয় মেয়ের কাছে এভাবে তুলে ধরেছে? সারাজীবন তো দা কুমড়োর মতোই আচারন করে এসেছে, এই তিন বছরে চিকিৎসার জন্য বহুবার ইউ এস এ গিয়েছেন আজমেরী শেখ , সেখানে তিনি অনুর বাসায় থাকলেও, ক্রীতিকের বাড়ির রাস্তাও মাড়ান’নি কোনো কালে, আর না তো ক্রীতিক কখনো যেচে পড়ে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাকে। অথচ সেই ক্রীতিকের মতো মানুষই কিনা নিজের মেয়েকে এরকম সুশিক্ষা দিয়ে বড় করছে? ব্যাপারটা কল্পনাতীত।
আজমেরী শেখ নিজের কানকে’ই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। বাচ্চা মেয়েটা তার গোলগোল ভাসমান চোখদুটো মেলে তাকিয়ে আছে আজমেরীর পানে, তাই তিনিও এবার নিজের ভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে পিচ্চিকে জিজ্ঞেস করলেন,— তোমার নাম কি বাচ্চা ?
মেয়েটা যেন কথা বলতে খুব আগ্রহী, তেমন করেই চনমনিয়ে উত্তর দিলো সে,
— কিয়ালা জায়ান চৌদুলী।

যতদূর বোঝা গেলো ওর নাম কিয়ারা, যা শুনে বিস্মিত আজমেরী শেখের মাথায় খেলে গেলো আরেকটা নাম, কিয়ারা রোজারিও। তিনি নিজ মনের আগত প্রশ্নগুলোকে আবারও বাচ্চা মেয়েটার নিকট উগড়ে দেবেন, তার আগেই কিয়ারাকে ডাকতে ডাকতে দরজায় এসে হাজির হলো অরু।

—- কিয়ারা, মামুনি তুমি কোথায়?

চোখের সামনে অরুকে দেখতে পেয়ে উঠে দাড়ালেন আজমেরী শেখ, মনের মধ্যে দানাবাঁধা অন্য সকল প্রশ্নকে বাদ দিয়ে, অস্ফুটেই তিনি মেয়েকে শুধালেন,—- ওর নাম কিয়ারা?

অরু হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

—- কে রেখেছে এই নাম?

আবারও শুধালেন আজমেরী।

অরু মেয়ের লম্বা চুলগুলো রাবার ব্যান্ডের সাহায্যে উপরে তুলে বেধে দিতে দিতে বললো,

—- ওর পাপা।

আজমেরী শেখ অমায়িক হাসলেন, জানালেন,

— ভারী মিষ্টি হয়েছে তোমার মেয়ে, পুরোই বাবার ফটোকপি।

মায়ের কথা শুনে আশ্চর্য বনে গেলো অরু, কিছুটা কৌতুহল নিয়েই বলে উঠলো,

—- ও ওর পাপার মতো দেখতে হয়েছে, আর তুমি কিনা ওকে মিষ্টি বলছো মা? কিন্তু তুমিতো ওর পাপাকে খুব অপছন্দ করো, এক কথায় দেখতেই পারোনা। অরুর কথা শুনে হাটিহাটি পা পা করে এগিয়ে গিয়ে ডিভানে বসলেন আজমেরী, চোখের সামনে প্রসস্থ দেওয়ালে ফ্রেমবন্ধী হয়ে আছে তার যৌবন কালের আটপৌরে

একখানা ছবি। সেদিকে একধ্যানে পরখ করতে করতেই কিছু মনে করার মতো করে আজমেরী বলে ওঠেন,

—— আমি আসলে জায়ান ক্রীতিককে নয়, তোমার প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিকে অপছন্দ করি অরু। এখন হয়তো কারনটা জিজ্ঞেস করবে কেন করি, তাইনা?

অরু হ্যা না কিছুই বললো না, শুধু প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মায়ের পানে।

আজমেরী শেখ পুনরায় বললেন,—- তোমাদের বাবার স্বভাব চরিত্র খানিকটা ক্রীতিকের মতোই ছিল, ক্রীতিক যেমন তোমার প্রতি ভীষণ ভাবে আসক্ত, ইশতিয়াক ও আমার প্রতি আসক্ত ছিল। ওর আসক্তি গুলো ছিল ভ'য়ানক। কিন্তু আমি সেই আসক্তির মাঝেই তীব্র সুখ অনুভব করতাম, মনে হতো এমন একজন মানুষ জীবনে থাকলে আর কি চাই? সেই মুগ্ধতার জের ধরেই ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম তোমার বাবাকে। কিন্তু বিয়ের কিছু বছর যেতেই লোকটার মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা অসুস্থ ভালোবাসায় পরিনত হতে থাকে, কেউ আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেও দিন দুপুরে তাকে কঠিন শা'স্তি দিতো তোমার বাবা, ছেলে বন্ধু তো দূরের থাক আমার মেয়ে বান্ধবীদের পর্যন্ত আমার হাত ধরার অপ'রাধে হাতের রগ কে'টে দিতো সে। তারপর বাড়িতে এসে চোটপাট মা'রামারি অশা'ন্তি তো ছিল প্রতিদিনের রুটিন।

আমি যদি তাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইতাম,তো সে আমার সামনেই নিজেকে এমন ভাবে আঘা'ত করতো যা দেখে আত্মা শিউরে উঠতো আমার, বারবার ক্ষমা করে দিতাম এই ভেবে যে মানুষটা আমার জন্য পা'গল, আমাকে ভালোবেসে পা'গল। কিন্তু না, দিনকে দিন

তার অসুস্থ ভালোবাসায় হাঁপিয়ে উঠছিলাম আমি, কারণ সময়ের সাথে সাথে লোকটা আরও বেশি ভয়’ঙ্কর হয়ে উঠলো,বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আগে যাদের শুধু শা’স্তি দিয়ে ক্ষান্ত হতো, তাদের এবার কৌশলে হ’ত্যা করতে শুরু করলো সে। আর কি বিভৎস তার খু’নের ধরন তা ভাবতেও পারবে না তুমি।কথার এই পর্যায়ে এসে চোখ মুখ খিঁচিয়ে বন্ধ করে ফেললেন আজমেরী। কিছুটা সময় নিলেন নিজেকে শান্ত করার জন্য, অতঃপর চোখ খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,
—- তখনই বুঝেছিলাম লোকটা আসলে সাধারণ মস্তিষ্কের কোনো স্বাভাবিক মানুষই নয়, সে সাইকোপ্যাথ।
— কিন্তু জায়ান তো সাইকোপ্যাথ নয় মা।
অরুর কথায় ওর পানে দৃষ্টি নিক্ষেপন করলেন আজমেরী। অরু এগিয়ে এসে মায়ের পাশের ডিভানে বসতে বসতে, শান্ত স্বরে বললো,— জায়ান ক্রীতিক প্রচন্ড রাগি, বদমেজাজি, বেপরোয়া,চরম উগ্র, কিন্তু সে সাইকোপ্যাথ নয় মা। নিজের কন্ট্রোললেস রাগটুকুর বাইরে গিয়ে আমাদের মা মেয়েকে ভীষণ যত্ন সহকারে আগলে রাখতে জানে জায়ান। নিজের দু’বছরের মেয়ের প্রতি তার কতটা অগাধ মায়া,চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না তুমি।
অরুর কথায় আজমেরী মৃদু হাসলেন, ওর গালে আলতো হাত ছুয়িয়ে তিনি বললেন,
—- তাতো দেখতেই পাচ্ছি, তোমার আর তোমার মেয়ের খুশিই বলে দেয় তোমরা আদতে কতটা সুখে আছো। জায়ান ক্রীতিক তোমাদের কতটা ভালোবাসায় মুড়িয়ে রেখেছে।আজ প্রায় মাস

তিনেক হলো ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে ছোট্ট নিনিত কে নিয়ে দেশে এসেছে নীলিমা। ওদিকে বউ ছেলের শোকে বেশিদিন একা একা থাকতে না পেরে আজ ক্রীতিকদের সাথে একই ফ্লাইটে বাংলাদেশে উড়ে এসেছে সায়র ও। গন্তব্য পুরান ঢাকার চিপাগলি, অবশ্য এছাড়া উপায় কি? পুরান ঢাকার চিপাগলি নিবাসী শ্যামলতা মেয়েটাকে যে বড্ড ভালোবাসে ও।
সায়র যখন নীলিমাদের দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাড়ালো, তখন দেখলো মা ছেলে দু'জনই অপেক্ষারত তার জন্য । ছাদে ওঠার সরু সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে তারা, এতোগুলা দিন পর বাবাকে দেখে উৎকন্ঠায় চেঁচিয়ে উঠলো ছোট্ট নিনিত, গালে হাত দিয়ে বসে বসে ঝিমুতে থাকা নীলিমাকে ঝাঁকিয়ে আলতো কন্ঠে বলে উঠলো,— মাম্মাহ, পাপা!
ছেলের কথা শুনে নীলিমা সামনে তাকাতেই দেখলো তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সায়র। এতোগুলো দিন পর সায়রকে দেখতে পেয়ে ছেলেকে রেখেই একছুটে গিয়ে স্বামীর কোলে উঠে পরলো নীলিমা। অতঃপর ওর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বললো,
— উই মিসড ইউ সায়র।
— আই মিসড ইউ টু জান, কেমন আছো তুমি?
সায়রের গলায় মুখ লুকিয়ে নীলিমা বাচ্চাদের মতো এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে বললো,
—- ভালো নেই, তোমাকে ছাড়া আমি একটুও ভালো নেই।
প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে ওর পিঠে আদুরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সায়র বললো,

—- এইতো এসে গিয়েছি, এবার আর না নিয়ে ফিরছি না তোমাদের।
ওদিকে ছোট্ট নিনিত ছলছলে চোখে বাবা মায়ের প্রেমলীলা দেখতে দেখতে হাতদুটো উপরে বাড়িয়ে ঠোঁট উল্টে ভীষণ করুন সুরে বলে উঠলো,
—- পাপাহ কোলে।গেইট দিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই ক্রীতিকের নজরে এলো একটা ইয়ামাহা খচিত বাইক। ওর স্পষ্ট মনে আছে বছর তিনেক আগে দেশে ফিরে এই বাইকটা'ই প্রত্যয়ের সাহায্যে কিনেছিল ও। কিন্তু এটা তো গ্যারেজে পরে থেকে মরীচা ধরে যাওয়ার কথা, এখানে এনে কে রাখলো এটাকে? তাও একদম ঝকঝকে তকতকে পরিস্কার।
এককালে ক্রীতিকের অন্যতম আবেগ ছিল বাইক রাইডিং, বাইক মানেই ওর কাছে থ্রীল, এডভেঞ্চার, সবকিছু। যার দরুন এতোদিন পর চোখের সামনে বাইকটাকে দেখতে পেয়ে সেটাকে এদিক ওদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করতে লাগলো ক্রীতিক। ওদিকে সারাদিন পর পাপাকে দেখে, অন্দরমহল থেকেই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো কিয়ারা। ক্রীতিকের কাছে এসে আধো আধো কন্ঠে ডাকলো সে,— পাপা, অপিচ সেস?
মেয়ের আদুরে গলার আওয়াজ শুনে চোখ ঘোরালো ক্রীতিক, আসলে এটা কিয়ারার অভ্যেস, ক্রীতিক বাড়িতে এলেই ও এই প্রশ্নটা করে, কারন ওর মাম্মা বলে,
— তোমার পাপা অফিসে গিয়েছে।
ক্রীতিক হাঁটু ভেঙে বসলো মেয়ের মুখোমুখি হয়ে, অতঃপর আলতো হাতে ওর চুলগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললো,

—-- এখানে তো অনেক গরম পাপা, চুলগুলো কেন খুলে রেখেছো তুমি? তোমার মাম্মা কোথায়?
কিয়ারা বাচ্চা মানুষ, সে হাত দিয়ে পাপার শার্টের বোতাম নিয়ে খেলতে খেলতেই জবাব দিলো,
—-- জানিনা।
মেয়ের কথায় তৎক্ষনাৎ কপাল কুঁচকে গেলো ক্রীতিকের,অরুর উপর মেজাজটা চড়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে দু চোয়াল, কতটা কেয়ারলেস হলে এতো বড় বাড়িতে বাচ্চা মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিতে পারে মানুষ? সেই ভেবেই রাগ লাগছে ক্রীতিকের, ও তখনই কোনোকিছু না ভেবেই বাইরে থেকে গলা উঁচিয়ে ডাকলো অরুকে,
—-- অরুউউ, অরুউউ!
ক্রীতিকের আওয়াজ পাওয়া মাত্রই অন্দরমহল থেকে ছুটে এলো অরু, ক্রীতিক অরুকে কিছু বলবে তার আগেই মেয়েকে শাসিয়ে উঠলো অরু, চোখ পাঁকিয়ে বললো,—-- খুব দুষ্ট হয়েছো তুমি কিয়ারা, সারা বাড়ি খুঁজছি আমি তোমায়,আর তুমি এখানে? পাপার পঁচা মেয়ে একটা তুমি।
মায়ের কথা কিয়ারার গায়ে না লাগলেও, ক্রীতিক কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে অরুকে উদ্দেশ্যে করে বললো,
— খবরদার আমার মেয়েকে বকবি না তুই।
— বকবো না মানে? দেখেছেন ওকে খুঁজতে গিয়ে আমার হাতের কি অবস্থা হয়েছে?
এই বলে নিজের ছিলে যাওয়া কোমল হাতটা ক্রীতিকের চোখের সামনে তুলে ধরলো অরু। অরু ব্যথা পেয়েছে, ব্যাপারটা বুঝে

উঠতেই হকচকিয়ে উঠলো ক্রীতিক, অকস্মাৎ ওকে কাছে টেনে উদ্বিগ্ন গলায় বললো,
— বেইবি বেশি লেগেছে?
— তুমি মাম্মাকে বেবি কেন ডাকচো? বেবি তো আমি।
মেয়ের কথায় অরু ক্রীতিক দুজনই হতবাক,মেয়ে রাগ করেছে, গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, তা দেখে অরুকে ছেড়ে কিয়ারাকে কোলে তুলে নিলো ক্রীতিক। কিয়ারা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে আছে, ক্রীতিক মেয়েকে মানানোর চেষ্টা করে বললো,
—- তোমার মাম্মা আমার বেইবি, আমার হার্টবিট, আমার সব তাই ডাকছি। কিন্তু তুমি তো বেইবি নও পাপা, তুমি তো আমার মা, কিয়ারা জায়ান চৌধুরী। ভুলে গেলে?
বাবা মেয়ের খুনসুটির মাঝে হুট করেই পেছন থেকে অর্ণব এলিসার আওয়াজ শোনা গেলো, ক্রীতিক পেছনে তাকিয়ে দেখলো,—- অর্ণব, এলিসা, সায়র নীলিমা তাদের পুচকু সমেত দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে বিরক্তির ছাঁপ স্পষ্ট। শীত কাল হলেও দুপুর বেলা ভালোই সূর্যের তেজ বেড়েছে, সেই তেজি সূর্যের আলোয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে সবকটার মুখ মন্ডল। ক্রীতিক ওদের দেখে আশ্চর্য হলোনা, সবসময়ের মতোই ভাবলেশহীন গলায় বললো,
—- কি’রে তোরা এখানে কি করছিস? বাড়িঘর নেই?
নিজ বন্ধুদের দেখে ক্রীতিকের কপাল কুঁচকে এলেও, এই অচেনা দেশে পাপার বন্ধুদের দেখে কিয়ারার আনন্দ হলো খুব, কারণ কিয়ারা এই মানুষ গুলোকে প্রায়ই তাদের ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে দেখতে পায়। সে পাপার কোলে বসেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গলা ছেড়ে ডাকলো,

—- আর্থাল ভাইয়া।
সঙ্গে সঙ্গে অর্ণবের কোল থেকে সারা দিলো ওদের সারে তিন বছরের ছেলে আর্থার সায়ন্ত। সে গলা উঁচিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো,— কিয়ারা মনি!
ওদিকে নিনিত যে এতো করে চাইছে কিয়ারা তার সাথে একটু কথা বলুক, বন্ধুত্ব করুক, সেদিকে কোনো হেলদোল নেই কিয়ারার,সে পাপার কোল থেকে জোর জবরদস্তি করে নেমে দৌড়ে ছুটে গেলো আর্থারের কাছে। পিচ্চি গুলোকে সাইড করে সায়র এগিয়ে এসে ক্রীতিককে বললো,
— তোর সমস্যাটা কি জেকে? আমরা সবাই মিলে এতোটা পথ জার্নি করে এসে গিয়েছিলাম অরুর সাইনিং ইভেন্টে, সেখানে গিয়ে শুনি তুই নাকি ইভেন্ট শুরু হওয়ার আগেই অরুকে নিয়ে চলে এসেছিস? এর মানেটা কি?
— হ্যা নিয়ে এসেছি, আমার মেয়ে কাঁদছিল তাই।
সোজাসাপটা জবাব ক্রীতিকের।
ক্রীতিকের কথায় চিড়বিড়িয়ে উঠলো সায়রের মাথাটা, ও দাঁত খিঁচিয়ে বললো,
—- পাবলিকেশনের লোকেরা তোর উপর বেজায় চটে আছে। তাদের এতো বড় ইভেন্ট, এতোগুলো টাকা, সব পন্ড করে দিয়ে এসেছিস তুই, তারা বসে থাকবে মনে হয়? মামলা করবে তোর আর তোর মেয়ের নামে।
সায়রের কথায় দু পয়সা পাত্তা না দিয়ে, ক্রীতিক চটে গিয়ে সায়রের কলার চেপে ধরে বললো,

—-- অরু অরু করছিস কাকে তুই? শালা কতবার বলেছি আমার বউয়ের নাম মুখে আনবি না তুই। কানে কথা যায় না?
ক্রীতিককে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, সায়র গম্ভীর গলায় বললো,— সম্মান দিয়ে কথা বল জেকে, ভুলে যাস না আমি তোর আগে বাবা হয়েছি।
ক্রীতিক ছাড়েনা উল্টে হাতের জোর বাড়িয়ে সায়র কে চেপে ধরে বললো,
—-- হ্যা একদিন আগে হয়েছিস,ওই একদিন কেউ গোনায় ধরে বলে আমার মনে হয় না।
সায়র ক্রীতিকের হাত দুটো টেনেটুনে ছাড়াতে ছাড়াতে বললো,
—-- হিটলারের বাচ্চা ছাড় আমাকে, বাচ্চারা দেখছে, একদিন আগে হই আর একঘন্টা আগে, তোর আগে বাবা তো হয়েছি, সো আ'ম ফার্স্ট।
— তোর একদিনের ফার্স্ট আমি মানিনা।
কথাটা বলেই সায়রকে আরও জোরে চেপে ধরলো ক্রীতিক। ওদের কান্ড দেখে এবার এগিয়ে এলো এলিসা। দুটোকে দুদিকে সরিয়ে, বিরক্ত গলায় বললো,
—-- উফফ, তোদের এই ফার্স্ট সেকেন্ড ঝগড়া দেখতে দেখতে বিরক্ত আমি। সেই হসপিটাল থেকে শুরু করেছিস, এখনো শেষ হওয়ার নাম নেই। সায়র নিজের মুচড়ে যাওয়া কলারটা ঠিক করতে করতে বললো,
—-- আমি ফার্স্ট সেটা আমি সারা জীবন বলবো, দরকার পরলে মাইক হাতে নিয়ে ঢোল পিটিয়ে বলবো, ওর মেয়ের জামাইকে বাড়ি

বয়ে গিয়ে ভাঙানি দিয়ে পর্যন্ত বলে আসবো, যে তার অলরাউন্ডার শশুরকে হারিয়ে দিয়েছি আমি। আমিই ফার্স্ট।
—- শালা তুই বেশি কথা বলিস।
এই বলে ক্রীতিক তেড়ে মে'রে সায়রের দিকে এগিয়ে যাবে, তার আগেই পেছন থেকে ওকে ডেকে উঠলো অরু,
— চলুন রাইডিং এ যাবো, আমি রেডি।
রাইডিং ছেড়ে দেওয়ার এতোগুলো বছর পরে অরুর মুখে এমন একটা কথা শুনতে পেয়ে অকস্মাৎ পেছনে ঘুরলো ক্রীতিক।দেখলো, লেদার জ্যাকেট, সেইফটি প্যাড সবকিছু পরে, কালও রঙা দুটো হেলমেট হাতে সটান দাঁড়িয়ে আছে অরু। দেখে মনে হচ্ছে ঘর সংসার ছেড়েছুড়ে এখনই বাইক আর স্বামী সমেত নিরুদ্দেশ হতে চায় সে।
অরুকে এভাবে হেলমেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্রীতিক এক ভ্রু কুঞ্চিত করে শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে শুধালো,
—- কি বললি, কোথায় যাবি?
অরু নির্লিপ্ত কন্ঠে জবাব দিলো,
— বাইক রাইডিং এ যাবো, আপনার সাথে।
— অসম্ভব, আমরা কোনো বাইক ফাইক রাইডিং এ যাচ্ছি না, এক্ষুনি ভেতরে গিয়ে এসব ড্রেস চেঞ্জ করে আয়, সন্ধ্যা হোক মেয়েকে সহ লং ড্রাইভে নিয়ে যাবো ,এখন নয়।সবার সামনে ক্রীতিকের স্পষ্ট ধমকে মুখ কালো হয়ে গেলো অরুর, তবুও গলায় কিছুটা সাহস ধরে রেখে বললো,
—- আমার জন্যই তো আপনি আপনার শখের রাইডিং বাদ দিয়েছেন, এখন না-হয় আমার জন্যই করুন।

ক্রীতিক স্থীর মূর্তির ন্যায় দু'পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে, শক্ত গলায় বললো,

— রাইডিং আমার শখের সেটা কে বললো তোকে? লিসেন, এই পৃথিবীতে কিয়ারা জায়ানের চেয়ে শখের জিনিস আমার আর কিচ্ছু নেই, আর সেটা তুই আমাকে উপহার দিয়েছিস। আর কোনো শখ অপূর্ণ নেই আমার।

ক্রীতিক রেগে যাচ্ছে দেখে এলিসা এবার এগিয়ে এসে ওদের মধ্যে আগ বাড়িয়ে বলে উঠলো,

—- নিয়ে যা না জেকে, এমন করছিস কেন? অরু শখ করে তোর কাছে আবদার করেছে।

—- নো ওয়ে। স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে এলিসা এভাবে কাকুতি মিনতি করছে, তবুও ক্রীতিক নিজের কথায় অনড়, ব্যাপারটাতে বেশ অপ'মানিত হলো অরু, ও তৎক্ষনাৎ হেলমেটটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলো অন্দরমহলের দিকে। তবে ভেতরে প্রবেশ করার আগেই ওকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলে নিলো ক্রীতিক।

সবার মাঝে বকবেও আবার নির্লজ্জের মতো কোলেও নেবে, ক্রীতিকের এসব পাগলাটে বিহেভিয়ার দেখে দেখে অভ্যস্ত অরু, তাই ও নিজেও বিরক্ত হয়ে ক্রীতিকের থেকে নিজেকে ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করে ঝাঁজিয়ে উঠে বললো,

— ছাড়ুন আমাকে।

ক্রীতিক অরুকে সামলে, বাইকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো,— এতো জিদ কেন তোর বেইবি? কোনো কিছুতে এখন আর তোর সাথে পেরে উঠি না আমি, সবসময় হেরে গিয়ে

স্যারেন্ডার করি।মেয়েটাকে উপহার দিয়ে একেবারে জায়ান ক্রীতিকের মাথা কিনে নিয়েছিস, উল্টাপাল্টা যা মন চায় তাই আবদার করে বসে থাকিস, কিচ্ছু বলতে পারি না আমি।
ক্রীতিকের কথার পাছে অরু চেঁচিয়ে উঠে বললো,
—-- যাবো না আমি আপনার সাথে ছাড়ুন।
ক্রীতিক অরুকে বাইকে বসিয়ে দিয়ে বললো,
—-- তুই যাবি তোর ঘাড় ও যাবে, চুপচাপ বস।
অতঃপর হেলমেট পরে, বাইক স্টার্ট করতে করতে ক্রীতিক এলিসার দিকে তাকিয়ে বললো,
—-- মেয়েটাকে দেখে রাখিস এলি, মেয়ের মায়ের রাগ ভেঙে গেলেই ফিরে আসবো, আর যদি আজ রাতে না ফিরি, তাহলে বুঝবি মেয়ের বাবা একটু প্রাইভেসী চায়,হি জাস্ট ক্রেভিং ফর হিজ ওয়াইফ,সবকিছু সামলে নিস, আর ফোন করিস।সবসময়ের মতো বন্ধুকে আস্কারা দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালো এলিসা, তৎক্ষনাৎ ক্রীতিক কুঞ্জের গেইট ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলো বাইকটা। ক্রীতিক চলে গেলে সায়র একাই বিড়বিড়ালো,
— শালা নির্লজ্জ একটা, মেয়েটাকে অবধি নিয়ে গেলোনা।
এলিসা সায়রের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁত কটমটিয়ে বলে উঠলো,
— চুপ করবি তুই? আমি জেকে কে খুব ভালো করেই চিনি,ও যেখানেই যাক, আর যে কাজেই যাক না কেন, রাতের আগেই ফিরে আসবে। তাছাড়া কিয়ারা আর্থার কে পেলে আর কিছু লাগেনা ওর, দেখছিস না কেমন খেলছে।

এলিসার কথায় বাচ্চা গুলোর দিকে তাকিয়ে, মৃদু হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সায়র, কি জানি কেন? হয়তো ওদের গল্পটার সমাপ্তি চলে এসেছে সেই বিরহে।গেইট ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই অরুদের সাথে দেখা হলো অনু আর প্রত্যয়ের, ওরা অরুর সাথে দেখা করার জন্য ক্রীতিক কুঞ্জেই যাচ্ছিল, আর মাঝপথেই দেখা। অনুর কোলে ঘাপটি মেরে বসে আছে ডোরা। দূর্ভাগ্য বশত সেবার মিসক্যারেজ হয়েছিল অনুর, তারপর থেকে শত চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয়নি আর। তাইতো অরু সেবার আপার দুঃখ ভোলাতে নিজের শখের ডোরাকে তুলে দিয়েছিল অনুর হাতে। এখন অনুই ডোরার মা। অনেক গুলো দিন পর ডোরাকে দেখতে পেয়ে মাঝরাস্তায় বাইক থামিয়ে ডোরাকে মন ভরে আদর করলো অরু, তারপর পুনরায় ওকে অনুর কোলে তুলে দিয়ে, দ্রুত পায়ে বাইকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো,—- এখন আসি আপা, রাতে আড্ডা হবে।
ক্রীতিকের ডেনিম জ্যাকেট খামচে ধরে বাইকে উঠে গিয়েছে অরু, ঠিক সে সময় পেছন থেকে হাঁক পেরে অনু বলে,
—- আরেহ যাচ্ছিসটা কোথায়? সেটা তো বলে যা?
অরু হেলমেটটা মাথায় চড়াতে চড়াতে খুশি মনে গলা উঁচিয়ে বলে ওঠে,
—- মেয়ের পাপার সাথে রাইডিং এ যাচ্ছি আপা, বাকি কথা এসে বলবো।
অরু যতক্ষণে কথাগুলো শেষ করেছে, তৎক্ষনে স্পিডোমিটারের গতি বাড়িয়ে হুঁশশ করে বাইকে টান দিয়েছে ক্রীতিক। না বলে হুট করে এভাবে গতি বাড়ানোর দরুন,আচমকা ক্রীতিকের পিঠের

উপর ঝুকে পড়লো অরু, ক্রীতিক লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে ডাকলো অরুকে,— বেইবি,
— হুম।
—- আমি স্পিড বাড়াবো, ধরে বস।
ক্রীতিকের কথার জবাবে অরু ঠোঁট উল্টে বললো,
—- ধরেছি তো।
ক্রীতিক লুকিং গ্লাসে চোখ রেখেই হাস্কিস্বরে বললো,
—- আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধর, তোকে ফিল করতে পারছি না।
ক্রীতিকের কথায় লাজুক হেসে নিঃসংকোচে পেছন থেকে ওকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে চিবুক ঠেকালো অরু, সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতিক সবসময়ের মতোই বলে উঠলো,— নাও পার্ফেক্ট।
বাইকের তীব্র গতির সাথে তাল মিলিয়ে শীতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া নাক মুখ চিড়ে ভেতরে প্রবেশ করছে, হাড় হাড্ডি সব কনকনে ঠান্ডায় হীম হয়ে আসছে, তবুও হৃদয়ের উষ্ণতা প্রশমিত হচ্ছে বারে বারে, অরু জানে এ উষ্ণ কমার নয়, আজ আর কমানোর সুযোগ দেবেও না ওর বেহায়া বরটা। শরীরের শীতলতা আর হৃদয়ের উষ্ণতা মিলেমিশে একাকার হয়ে অনুভূতির জোয়ার আজ বানভাসি হয়েছে, অরু সেই প্লাবিত অনুভূতি গুলোকে হৃদ গহীনে লালিত পালিত করতে চায় সারাজীবন। প্রতিদিন একই ভাবে একই মানুষকে বারবার হাজার বার জানাতে চায়,
—— আমার ভালোবাসার উপন্যাসের প্রতিটি পাতায়, সূচনা থেকে সমাপ্তি জুড়ে শুধুই আপনি জায়ান।

ক্রীতিক অরুর কথা শোনেনি ঠিকই তবে ওর মন বলছে,—- শুধু উপন্যাস কেন? এই জীবনে এমন কোনো অধ্যায় অবশিষ্ট নেই যেখানে তোর আবির্ভাব ঘটেনি হার্টবিট, যদিও তা থেকে থাকে, তবে সেই অধ্যায় ছিল নিছকই মূল্যহীন, অনুভূতিহীন, আর পরিশেষে অস্তিত্বহীন।

দুজনার মনগহীনের বিস্তৃত সুপ্ত অনুভূতির আদান প্রদান বোধ হয় শেষ হবে না আজ আর, আর না তো সমাপ্তি ঘটবে সঙ্গিন প্রনয়াসক্তির। শুধু পাল্টে যাবে দৃশ্যপট, ইয়ামাহা খচিত নীলচে বাইকটা মাইলের পর মাইল পেরিয়ে গিয়ে একসময় আড়াল হয়ে যাবে দৃষ্টি সকলের। পশ্চিমাকাশ সিঁদুর রাঙা হয়ে ধীরে ধীরে আঁধারের ভীরে তলিয়ে যাবে সূর্য কীরন I অস্ত যাবে ধরনী। তবুও মুক্ত শালিকের ন্যায় ডানাঝাপ্টানো একজোড়া হৃদয়ের আজ আর পায়তারা মিলবে না নীড়ে ফেরার। তারা আজ পাখির মতোই অবাধে দাপিয়ে বেড়াবে পুরো শহর জুড়ে I এ যেন তাদের দৃঢ় প্রতীজ্ঞা। বাইরে হালকা হালকা তুষার পাত হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই রোদের দেখা নেই,চোখের সামনে কাঁচের দেওয়াল গলিয়ে পেজা তুলোর মেঘের মতোন ঝরে পড়ছে শুভ্র বরফ কনা, বরফের আস্তরণে পুরো শহরতলী শুভ্রতায় ছেয়ে গিয়েছে, দেখলেই কেমন প্রান জুড়িয়ে আসে।

গেইটের সামনে চেরিব্লোসম গাছ দু'টো ন্যাড়া হয়ে পরে আছে,রঙিন ফুল তো দূরে থাক, তরতাজা সবুজ পাতার ছিটেফোঁটাও নেই তাতে, যতদূর চোখ যায় শুধু বরফের আস্তরণ।

ক্রীতিকের মাস্টার বেডরুমের বিশালাকৃতির জানালাটার পর্দা সরিয়ে বাইরের ফ্রন্ট ইয়ার্ডটায় একঝলক চোখ বুলিয়ে নিলো অরু,

অতঃপর হাতে এক কাপ কফি নিয়ে, ফায়ারপ্লেসের পাস ঘেঁষে বসে পরলো গিয়ে জানালার মুখোমুখি হয়ে। আজ সকাল সকাল অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছে ক্রীতিক, কি নাকি ক্লায়েন্ট ফ্লায়েন্ট এর সাথে দরকারি মিটিং রয়েছে, না গেলেই নয়। নয়তো অরুর বাবু পেটে আসার পর থেকে খুব একটা প্রয়োজন ছাড়া স্ব'শরীরে অফিসে যায়না সে। বাড়িতে বসেই নিজ দ্বায়িত্ব গুলো বেশ নৈপুণ্যতার সহিত সামলে নেয়। যদি কখনো প্রয়োজন পরে তো প্রত্যয়ই বাড়ি বয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।
সারাজীবন একা থাকতে পছন্দ করা ক্রীতিক গত দু'মাস ধরে দু'জন সার্ভেন্ট ও রেখেছে বাড়িতে, অরুর আন্ডার এইজ প্রেগন্যান্সি, ডক্টর বলেছে খুব সাবধানে থাকতে, মিসক্যারেজ হওয়ার সম্ভাবনা ও প্রকট, তাই রান্না বান্না থেকে ঘরের যাবতীয় কাজ, সবকিছু সার্ভেন্ট দ্বারাই করানো হয়। অনুর মিসক্যারেজের কথা চিন্তা করে অরু নিজেও বেশ ভয়ে থাকে এসব নিয়ে, তাই মন চাইলেও খুব বেশি একটা ধকল দেয় না নিজের শরীরকে। অবশ্য এই ক্রুটিপূর্ণ প্রেগন্যান্সির পেছনে মোক্ষম কারন রয়েছে। কারণটা আর কেউ নয় , স্বয়ং মাথা গরম, রগ চটা, বেপরোয়া ক্রীতিক নিজেই। ক্রুটিপূর্ণ প্রেগন্যান্সির কথা ভাবতে গিয়েই ছয়মাস ধরে বেড়ে ওঠা নিজের ছোট্ট উদরে আলতো হাত ছোঁয়ালো অরু। মনে মনে ভাবতে লাগলো সেদিন সকালের কথা,
সেবার নেদারল্যান্ডের টিউলিপ গার্ডেনে ঘুরতে যেয়ে ভ্যাকেশনটা বেশ ভালোই কেটেছিল ওদের সবার। সায়র নীলিমা, অর্ণব এলিসা সহ মোট তিন জোড়া কাপল একসাথে যাওয়ায় টিউলিপ গার্ডেনের পাশেই একটা মস্তবড় ভিলা রেন্ট করেছিল ওরা, যেই ভিলাতে

দু'তলার প্রত্যেকটা বারান্দা থেকে টিউলিপের বাগান স্পষ্ট দেখা যেত।
নেদারল্যান্ডস পৌঁছানোর পরে তিন চারটা দিন সবাই একসাথে ঘুরে ফিরে, হইহুল্লোর করে ভালোই আনন্দে কেটেছিল ওদের সবার। কিন্তু বিপত্তি ঘটে পাঁচ দিনের মাথায়, সেদিন হঠাৎ করেই ঘুম থেকে উঠে অরুকে পাশে পেলোনা ক্রীতিক। এমনটা সাধারনত কখনো হয়না,কারণ আড়মোড়া ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও, ওই শক্ত চওড়া বুকের মধ্যে ঢুকে খানিকটা সময় ধরে ওম না নিলে, মোটেই ভালো লাগেনা অরুর। অথচ আজ সে সকাল সকাল গায়েব।আগের রাতে অনেক বেশি দেরি করে ঘুমাতে যাওয়ার দরুন ক্রীতিক ভেবেছিল হয়তো ওর নিজেরই ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে গিয়েছে, তাই অরু হয়তো আছে লিভিং রুমে কিংবা অন্য কোথাও। কিন্তু কিসের কি? পুরো ভিলাতে কোথাও অরু নেই।
শেষমেশ না পেরে দরজায় নক করে করে ওদের সবার ঘুম ভাঙিয়েছে ক্রীতিক। তবে ওরাও কোনো হদিস দিতে পারলো না অরুর। এমন একটা অচেনা দেশে, অচেনা যায়গায় এসে হুট করে কোথায় হারিয়ে গেলো মেয়েটা? কোনো বিপদ আপদ হলোনা তো আবার? এক আকাশ পরিমান হিজিবিজি ভাবতে ভাবতেই একহাত দিয়ে নিজের চুল নিজেই খাঁমচে ধরলো ক্রীতিক। ওকে এভাবে উদ্বিগ্ন হতে দেখে এলিসা মানানোর স্বরে বলে,
— শান্ত হ জেকে,ঠান্ডা মাথায় ঠিক করে ভাব কোথায় যেতে পারে মেয়েটা? আচ্ছা ফোন করেছিলি নিশ্চয়ই?
এলিসার কথায় দাঁত দাঁত চাপে ক্রীতিক, অতঃপর বিরক্তির সুরে বলে,— ফোনটা নিয়ে গেলে তো করবো? ইডিয়েট একটা, আজ

ওকে খুঁজে পেলে খবর আছে, আমি যে ওর কি হাল করবো নিজেও জানিনা।
ক্রীতিকের কথার মাঝে ওকে থামিয়ে দিয়ে, ওর দিকে টিস্যু বক্স এগিয়ে দিতে দিতে সায়র বললো,
—- তোর নোজ ব্লেডিং শুরু হয়েছে আবার।
ক্রীতিক এক টুকরো টিস্যু হাতে নিয়ে, সেটা দ্বারা নাক মুছতে মুছতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো,
—- এই মেয়েটা আর আমাকে শান্তি দিলোনা। আমার জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে ওকে খুঁজে বের করতে করতে।
কথা শেষ করে টি টেবিল থেকে গাড়ির চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরের দিকে হাটা ধরে ক্রীতিক, ওকে চলে যেতে দেখে অর্ণব উদ্বিগ্ন গলায় বলে ওঠে,
— কোথায় যাচ্ছিস তুই একা একা? আমরা আসবো?
ক্রীতিক যেতে যেতে জবাব দেয়,—- দরকার নেই, আসেপাশের টুরিস্ট এরিয়া গুলো একটু খুজে দেখে আসছি আমি, তারপরেও যদি না পাই, তো পুলিশের কমপ্লেইন করা ছাড়া আর উপায় দেখছি না।
ক্রীতিকের কথার পাছে অর্ণব পুনরায় বলে,
—- কিন্তু তোর তো নোজ ব্লেডিং হচ্ছে, কার ড্রাইভ করতে পারবি তো?
ক্রীতিক আর দাঁড়ায় না, ইতিমধ্যে ওর বুকের মধ্যে দাউদাউ করে অস্থিরতার আ’গুর ধরিয়ে দিয়েছে, এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ও আর নিজেকে সামলাতে পারবে না, নির্ঘাত বুকের ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে মা’রা যাবে। তাই আর দাঁড়িয়ে না থেকে দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে যেতে যেতে তপ্তস্বরে জবাব দিলো ক্রীতিক,

—-- পারবো। সারাটা দিন হন্যে হয়ে এদিক সেদিক খুঁজেও লাভ হলোনা কোনো। ক্রীতিক ধারণা করেছিল অরু হয়তো বা পাকামি করে একা একাই কোনো টিউলিপ গার্ডেনে ঢুকে পরেছে, কিন্তু তেমন কিছুই নয়। অবশেষে উপায়ন্তর না পেয়ে একরাশ বিষন্নতা আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পুনরায় ভিলাতে ফিরে এলো ক্রীতিক, উদ্দেশ্য ফোন করে পুলিশ কে জানানো, তারা যদি কোনো সোর্স এর মাধ্যমে খুঁজে দিতে পারে ওর হৃদস্পদন কে।
তখন তাড়াহুড়োয় ফোনটাও নিয়ে বের হতে পারেনি,তাই আবারও ভিলাতেই ফিরতে হলো ক্রীতিক কে। ক্রীতিক যখন চোখ বন্ধ করে ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘরের দুয়ারে পা রাখে, ভেতরে গিয়ে সবার একেক করে নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, সেই ভেবে যখন ওর বক্ষপিঞ্জর ব্যথায় টনটন করে ওঠে, ঠিক তখনই ভেতর থেকে ভেসে আসে এলিসার ধমকা ধমকির আওয়াজ, কাউকে উদ্দেশ্য করে একটু রাগান্বিত স্বরেই এলিসা বলছে,—-- কোথায় গিয়েছিলে তুমি? সারাটা দিন একটা খোঁজ নেই খবর নেই, জেকে টা উদভ্রান্তের মতো খুঁজে বেরিয়েছে তোমায়, কি জানি হয়তো পুলিশেও কল করে দিয়েছে এতোক্ষণে, আজ ও ভিলাতে ফিরলে তোমার সাথে কি হবে ভাবতে পারছো?
এতোটুকু শোনা মাত্রই ক্রীতিকের কৌশলী মস্তিষ্কটা সচল হয়ে উঠলো, কারও উপর ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেলো মূহুর্তেই, মাথার মধ্যে ভলভলিয়ে বেড়ে ওঠা তীব্র ক্রোধটাকে ক্রীতিক সামলালো না মোটেই, বরং দু'হাত মুঠি বদ্ধ করে হনহনিয়ে ভেতরে গিয়ে বাজপাখির মতো ছো মে'রে শক্ত হাতে চেপে ধরলো অরুর চোয়াল, ক্রীতিকের হাতের বাঁধন এতোটাই শক্ত যে অরুর

মনে হচ্ছিল এক্ষুনি গালের হাড় হাড্ডি সব গুড়ো গুড়ো হয়ে ভেঙে যাবে।— আমাকে না জানিয়ে কোথায় গিয়েছিলি বল?
দাঁতে দাঁত পিষে অরুর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছোড়ে ক্রীতিক।
ক্রীতিকের এমন ক্ষ্যাপাটে সিংহের মতো আচরনে ভড়কে যায় সবাই , নীলিমা ভয়ে সিটিয়ে গিয়ে সায়রের শার্ট খামচে ধরে হিসহিসিয়ে বললো,
—- ভাইয়াকে থামাও, অরুকে তো মে'রেই ফেলবে আজ।
সায়র ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো, অতঃপর নীলিমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড়ালো,
—- কিচ্ছুই করবে না।
ক্রীতিক চক্ষু গরম করে অরুকে ভস্ম করে দিতে চাইলো, সেভাবেই ক্ষুদ্ধ কন্ঠে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো,— কোথায় গিয়েছিলি জবাব দে?তোকে না পেলে আমি যে কুত্তার মতো তোকে খোঁজার জন্য পুরো শহর চষে বেড়াবো সেই হুঁশ ছিলনা তোর ব্রেইনে? আন্সার মি!
গর্জে উঠলো ক্রীতিক, ওর এহেন কঠোর ধমকে কম্পিত হয়ে উঠলো অরু, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তৎক্ষনাৎ জবাব দিলো ,
— আআমি তো একটু বড় টিউলিপ গার্ডেন দেখতে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম চলে আসবো তাড়াতাড়ি, কিন্তু গাড়ি পাইনি একটাও।
— এইইই! কাকে মিথ্যে গল্প শোনাচ্ছিস তুই? শহরের এমন কোন টিউলিপ গার্ডেন নেই যেখানে আমি তোকে পাগ'লের মতো খুঁজিনি, আর তুই এখানে আমাকে বানিয়ে বানিয়ে উপন্যাসের ডায়লগ শোনাচ্ছিস? কলিজায় ভয় নেই?এই পর্যায়ে গর্জে উঠে অরুর

বুকের কাছের জামাটা খামচে ধরে ওকে নিজের কাছে নিয়ে এলো ক্রীতিক।
অরুর মিথ্যে জবাবে ক্রীতিকের রাগের পারদ দিগুণ তালে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, এবার এলিসা এগিয়ে এসে ক্রীতিকের হাতটা টেনে হিঁচড়ে ছাড়ালো অরুর থেকে। অতঃপর ক্রন্দনরত অরুকে নিজের বাহুতে টেনে নিয়ে বললো,
— অনেক হয়েছে জেকে, আজকের মতো ছেড়ে দে মেয়েটাকে, কাল না হয় ঠান্ডা মাথায় শুনিস সবকিছু।
ক্রীতিক ক্রুদ্ধস্বরে বললো,
— ওকে সাফসাফ উত্তর দিতে বল এলিসা,ও সারাদিন কোথায় গিয়েছিল, নয়তো আজ আর ওকে ছাড়াছাড়ি নেই, আমি ওর সাথে যা ইচ্ছে হয় তাই করবো আজ।
এলিসা আর অরু কে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো না ক্রীতিকের সম্মুখে , বরং তাড়াহুড়ো করে অরু সমেত চলে গেলো নিজের বেডরুমে। তখন গভীর রাত, সন্ধ্যা রাতে অরু ক্রীতিকের ঝামেলার দরুন, পুরো ভিলা এখন শুনশান নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে, অন্য কোনো দিন হলে হয়তো এখনো সবাই লিভিং এ বসে আড্ডা আনন্দে মেতে থাকতো। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি, খানিক বাদে বাদেই রাতের আঁধারকে সঙ্গ দিতে লেকের পার থেকে ভেসে আসছে কোলাব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ আওয়াজ। সেই সাথে টিউলিপের বাগান থেকে ধেয়ে আসা রাতজাগা পাখিদের ডানা ঝাপ্টানোর শব্দে গভীর ঘুমে কাঁদা হয়ে আছে সকলে। ঠিক এমন সময় অর্ণবের গভীর আরামদায়ক ঘুমের ইস্তফা দিয়ে ওর মুঠোফোনটা বেজে উঠল তার স্বরে।

এতো রাতে এই ফোনের আওয়াজ বড্ড বিরক্ত ঠেকলো অর্ণবের কানে, অগত্যাই ফোনটা কেটে দিয়ে পাশ ঘুরে শুয়ে পরলো অর্ণব। কিন্তু ফোনের ওপাশে থাকা ব্যক্তিটির বোধ হয় এই প্রত্যখ্যান সহ্য হলোনা মোটেই, যার দরুন আবারও ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল মোবাইলটা। এবার আর উপায়ন্তর না পেয়ে ঘুমু ঘুমু চোখে মোবাইল রিসিভ করে কানে ধরলো অর্ণব, তবে এপাশ থেকে কিছু বলার ফুরসত না দিয়ে ওপাশ থেকে বিরক্তির স্বর ভেসে এলো ক্রীতিকের, সে দাঁত কটমটিয়ে বিরক্তিকর কন্ঠে বলে উঠলো ,— শালা ফোন তুলছিস না কেন? ম’রে গেছিস?

অর্ণব চোখ কচলাতে কচলাতে হাই তুলে বললো,

—- ম’রিনি, তবে তুই কেন অন্য রুম থেকে বারবার কল দিয়ে আমার হা’র্টঅ্যাটাকের বন্দোবস্ত করছিস সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না?

ক্রীতিক ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর গলায় বললো,

—- আমার বউ কই?

— লাইক সিরিয়াসলি জেকে? তোর বউ কই সেটা জানার জন্য তুই আমায় মাঝরাতে কল দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছিস?

ক্রীতিক দমলো না, নতুন উদ্যমে গম্ভীর গলায় বললো,

— তোর বউ তখন আমার বউকে বগলদাবা করে রুমে নিয়ে গিয়েছে, এখন দিয়ে যেতে বল, বউ ছাড়া আমার ঘুম আসেনা।

অর্ণব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অসহায় সুরে ক্রীতিককে মানানোর চেষ্টা করে বললো,

—- ভাই বিশ্বাস কর, এতো রাতে এলির ঘুম ভাঙালে ও নির্ঘাত আমায় উষ্ঠা মে’রে ইউ এস এ পাঠিয়ে দেবে।

—-- তাহলে ট্রিক্স খাটা।
ক্রীতিকের কথায় অর্ণব ভ্রু কুঞ্চিত করে শুধালো,
—-- ট্রিক্স খাটাবো মানে?
ক্রীতিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো,— মানে আবার কি? তুই এই মূহুর্তে এলিসাকে কল করে বলবি, তোর প্রচন্ড পেট ব্যথা করছে, ঘরে বাইরে শুরু হয়ে গিয়েছে, এক্ষুনি হসপিটালে না গেলে বাইরে যাওয়ার আর উপায় থাকবে না,ঘরেই শুরু করতে হবে।
ক্রীতিকের কথায় অর্ণব নাকটা সিকোয় তুলে বলে ওঠে,
— ইউউ, এসব বলবো? ভাই এসব আমি বলতে পারবো না, তুই প্লিজ আজকে রাতটা একটু নিজেকে সামলা, কাল ভোর হলেই তোর বউকে আমি নিজে তোর হাতে তুলে দিয়ে আসবো। প্লিজ ভাই।
অর্ণবের কন্ঠে ভীষণ আকুতি, অথচ ক্রীতিক তাতে দু'পয়াসার আবেগ না ঢেলেই কাঠ কাঠ কন্ঠে বললো,
—-- যা বলেছি চুপচাপ তাই কর, নয়তো কাল এলিসা নয় আমি নিজেই তোকে কিক মে'রে ইউ এস এ পাঠিয়ে দেবো।
এরপর অর্ণব আর কিছু বলতে গিয়েও পারলো না, কারণ কথা বলার আগেই পিক পিক আওয়াজ করে লাইন কেটে দেয় ক্রীতিক। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে উপায়ন্তর না পেয়ে বুকে মাথায় ক্রুশ একে এলিসার নাম্বারে কলটা করেই ফেললো অর্ণব। গভীর রাত, ঘুমে তলিয়ে আছে পুরো শহর,অত্যাধুনিক ভিলার প্রত্যেকটা জানালা হাট করে খুলে রাখা হয়েছে, সেখান থেকেই বইতে থাকা ঝিরিঝিরি হিমেল হাওয়ায় ঘুমটা গাঢ় হয়ে উঠেছে অরুর, ঠিক এমন হয় তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হতেই ধীরে ধীরে কিছুটা

তন্দ্রা কেটে গেলো ওর। ঘুমের মাঝেই মনে হতে লাগলো ও হাওয়ায় ভাসছে।
প্রচন্ড হাওয়ার তোড়ে লম্বা চুল উড়ে এসে আঁচড়ে পরছে চোখে মুখে। কিন্তু ঘুমের মাঝে এমন অদ্ভুত অনুভূতি হওয়ার কারণ টা কি? এটা কি স্বপ্ন? কথাগুলো মস্তিষ্কে ক্যাচ করতেই অকস্মাৎ চোখ খুলে ধরফরিয়ে উঠলো অরু।
হঠাৎ ঘুম ভেঙে লাফিয়ে ওঠায় কোথাও একটা থেকে পরে যেতে গিয়েও পরলো না ও, কারণ কেউ একজন দৃঢ় হাতে সামলে রেখেছে ওকে। ঘুমটা পুরোপুরি ছুটে গেলো এবার, অরু চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ওকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ক্রীতিক।
অন্ধকারের মাঝেও ক্রীতিকের উপস্থিতি টের পাওয়ার মতো ক্ষমতা অরুর আছে, কিন্তু এভাবে ঘুমের মধ্যে অ'পহরণ করে তুলে নিয়ে যাওয়ার মানেটা কি? কেন যেন বিরক্তিতে শরীরটা চিড়বিড়িয়ে উঠলো অরুর, ক্রীতিক সবসময় বাড়াবাড়ি করে। তাই অরু এবার ধাতস্থ হয়ে ক্রীতিককে কয়েকটা কড়া কথা শোনানোর প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু তার আগেই ওকে রুমে এনে বিছানায় ছু'ড়ে মা'রে ক্রীতিক। অরুকে বিছানায় রেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা জানালা গুলো লাগিয়ে দিতে দিতে কঠিন স্বরে বলে,— কোথায় ছিলি সারাদিন সত্যি করে বল অরু।
ব্যাস, এক বলেই ছক্কা হাঁকালো ক্রীতিক, যার ফলসরুপ অরুর সব হাওয়া ফুঁসস। অরু ভেবেছিল ক্রীতিক হয়তো ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছে এতোক্ষণে, এখন হয়তো একান্তে অরুর সঙ্গ চায় বলেই এভাবে তুলে নিয়ে এসেছে ওকে। কিন্তু না, এটা তো জায়ান

ক্রীতিক, ওভার পসেসিভ, ওভার রিয়েক্টিভ। তার কাছ থেকে ছাড় পাওয়া কি এতোই সহজ?
অরু ভাবছে দেখে ক্রীতিক আবারও এগিয়ে এসে অরুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, অতঃপর রাশভারি আওয়াজে শুধায়,
—- কি হলো, এই ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে এতো সময় লাগছে কেন? আমি কি খুব কঠিন প্রশ্ন করেছি?
অরু ভড়কালো, সামান্য তোতলানোর সুরে বললো,— দদেখুন প্রত্যেকেরই তো এইটুকুনি প্রাইভেসির প্রয়োজন তাই না? তাছাড়া আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি।
অরুর কথায় সন্তুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো ক্রীতিকের দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিং ফুটে উঠলো মূহুর্তেই। তীক্ষ্ণ চোয়ালটা শক্ত হয়ে ব্লেডের মতো ধারালো হয়ে উঠলো যেন, সে এগিয়ে গিয়ে বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চকচকে হ্যা’ন্ডকাফ্ বের করতে করতে বললো,
—- তোর মাঝে এমন কি আছে? যা আমার অজানা অরু?কি এমন প্রাইভেসি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, যা আমি উন্মুক্ত করিনি? চল দেখবো আজ।
ক্রীতিকের গতিবিধি পরখ করে অরু এবার ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতে ক্রীতিককে মানানোর চেষ্টা করে কিছুটা আত’ঙ্কিত সুরে বললো,—- এমনটা করোনা প্লিজ, এটা মোটেই উচিত হবে না, খুব বেশি অন্যায় হয়ে যাবে।
অরুর তুলতুলে নরম গালে পরম আবেশে হাত বুলিয়ে, হাস্কিস্বরে ক্রীতিক বলে,

—-- আই হ্যাভ প্রোপার রাইট টু মেকিং লাভ উইথ ইউ বেইবি, এখানে অন্যায় কোথায় দেখলি? আমাকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা ভুলেও করিস না।
ক্রীতিকের কথার টোনে হু'মকি সুস্পষ্ট, কিন্তু অরু তাও বাঁধা দিচ্ছে ওকে। বারবার বলছে,
—-- প্লিজ এভাবে না, এটা ঠিক হচ্ছে না।
ক্রীতিক সেসবের তোয়াক্কা না করে অরুর হাতদুটো আটকে ফেললো হ্যা'ন্ডকাফ্, অতঃপর ওর কান্না থামাতে মুখে লাগিয়ে দেয় এক টুকরো ডাকট্ টেপ। এবার অরু পুরোপুরি ক্রীতিকের বশে, ব্যাপারটা উপলব্ধি করতেই অরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ক্রীতিক হিসহিসিয়ে বললো,— তোর ভালোর জন্য বেঁধেছি, কারণ আজকে যতক্ষণ না সত্যিটা বলবি, ততক্ষণে আমার হাত থেকে তোর নিস্তার নেই। বি রেডি ফর ইওর হার্ড পা'নিশমেন্ট বেইবি।
অরুর মুখ বাঁধা, তাই ও কাঁদতে কাঁদতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ালো শুধু, যার অর্থ,
— এটা করবেন না প্লিজ।
তবে ক্রীতিক আর অপেক্ষা করে না, নিজের সবটুকু আকর্ষন, উন্মাদনা অরুর মাঝে বিলিয়ে দিয়ে ডুবে যায় ভালোবাসার অতল গহ্বরে। অবশেষে ক্রীতিকের দেওয়া অতিরিক্ত ভালোবাসাময় য'ন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে শেষ রাতে অকস্মাৎ নিস্তেজ হয়ে পরলো অরু। অরু জ্ঞান হারিয়েছে ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই ক্রীতিকের যেন ভ্রম কেটে যায়। নিজের মাঝের পৈচাশিক আর ডমিনেটিং ভাব উবে গিয়ে মূহুর্তেই চোখে মুখে ঝরঝরিয়ে নেমে আসে একরাশ

কাতরতা। সেই কাতর স্বরেই অরুর গালটা আলতো ঝাঁকিয়ে ডেকে ওঠে ক্রীতিক,
—- বেইবি, আর ইউ ওকে না? খুব বেশি ব্যথা দিয়েছি?
অরু জবাব দেয় না, তা দেখে ক্রীতিকের পিলে চমকে গেলো, এমনটা তো কখনো হয়না, ক্রীতিকের বরাবরই ওয়াইল্ড লাভ, লাভ ট'র্চার এসব বেশ পছন্দ। ব্যাপারগুলো ক্রীতিকের নিকট রোমাঞ্চকর বলে অরুও মুখ বুঝে সহ্য করে নেয় সবটা। কিন্তু এমনটা তো কখনো হয়না। এর আগেও বহুবার এভাবে মিলিত হয়েছে তারা,কিন্তু অরু আজ প্রথম বারই জ্ঞান হারালো, কিন্তু কেন?হাজারও অযথা চিন্তাদের বহর একসাথে ঘীরে ধরেছে ক্রীতিকের মন মস্তিষ্ক, কিন্তু এখন চিন্তা করার সময় নয়, যত দ্রুত সম্ভব অরুর জ্ঞান ফেরাতে হবে, সেই ভেবে ক্রীতিক নিজেদের মাঝের বস্ত্রটুকু ঠিকঠাক করে তাড়াহুড়ো পায়ে উঠে গিয়ে অরুর হাত মুখ সব খুলে দিলো। এরপর অরুকে ছোট বাচ্চার মতো করে কোলের মধ্যে নিয়ে ঠান্ডা পানির ছাট দিতে লাগলো ওর চোখে মুখে।
খুব বেশিক্ষণ নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাবধানেই অরুর চেতনা ফিরে এলো, অরু চোখ খুলেছে দেখে ওকে বুকের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে, চোখ দু'টো বন্ধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো ক্রীতিক। ওদিকে চেতনা ফিরতেই প্রচন্ড ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে ক্রীতিকের থেকে ছিটকে দূরে সরে যায় অরু। অরু এভাবে দূরে সরে গিয়েছে দেখে, ক্রীতিক অপ'রাধী গলায় বললো,— বেইবি আস্তে, তুই উইক।

অরু নাক টেনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো এবার, কাঁদতে কাঁদতে বললো,
— আপনি একটা জা'নোয়ার, আপনার জন্যই আমি উইক, এখন আবার দরদ দেখাচ্ছেন কোন মুখে?
অরুর আপসোসের কান্নায় হৃদয় ছিড়ে যাচ্ছে ক্রীতিকের, ও এগিয়ে গিয়ে অরুর মুখোমুখি হয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পরে বললো,
—- আ'ম সরি হার্টবিট, আমি বুঝতে পারিনি তুই এভাবে হঠাৎ করেই জ্ঞান হারাবি, তোর শরীরটা দূর্বল জানলে আমি কখনোই এমনটা করতাম না, আর হুট করে ব্লেডিং....
ক্রীতিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো অরু, কাঁদতে কাঁদতে দু'হাতে ক্রীতিকের চুল খামচে ধরে বললো,—- আমার বাচ্চার কিছু হয়ে গেলে, আমি তোকে ছাড়বো না জায়ান।
অরুর কথা শুনে ক্রীতিকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পরলো, এসবের মাঝে বাচ্চা আবার কোথা থেকে এলো? অরুর পানে একটা আহত চাহনি নিক্ষেপ করে, ক্রীতিক বলে ওঠে,
— বাচ্চা মানে?
অরু কাঁদতে কাঁদতে বললো,
— বেশ কয়েকবার টেস্ট করেও বারবার পজিটিভ রেজাল্ট আসছিল, তাই পুরোপুরি সিওর হতে ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম।
অরুর কথায় ক্রীতিকের চোখ কপালে উঠে গেলো, অরু প্রেগন্যান্ট তার মানে বাচ্চাটা ওর নিজের, এটা ভাবতেই, অরুর দু'বাহু ঝাঁকিয়ে ক্রীতিক দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে,

—- তো আমাকে বললি না কেন ইডিয়েট? সারাদিন তোকে পা’গলের মতো খুঁজেছি আমি, এই অচেনা শহরে এমন কোনো টুরিস্ট এরিয়া নেই যেখানে আমি তোকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেরাইনি। আর তুই কিনা ডক্টরের ক্লিনিকে ছিলি?
জবাবে কাঁদতে কাঁদতে অরু বলে,—- আপনি বাচ্চা চাচ্ছিলেন না কিছুতেই , কিন্তু এটা এসে গিয়েছিল কোনোভাবে, ভয় করছিল যদি আপনি এ্যাবরশন করার জন্য জোর করেন, তাহলে আমার বাচ্চাটার কি হতো? তাই চুপি চুপি গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি চলেও আসবো কিন্তু, কি জানি কেন, আসার পথে একটাও গাড়ি পাচ্ছিলাম না।
অরুর এতোসব কথা শুনে নিজের চুল নিজেই টেনে ধরলো ক্রীতিক,অরুর উপর চরম বিরক্ত হয়ে ক্রীতিক রাশভারী গলায় বললো,
— তুই কি পা’গল অরু? নিজের অনাগত বাচ্চাকে কেন আমি নষ্ট করতে বলবো? হোয়াই? এটা তুই ভাবলি কি করে, সেটা আমায় বল? আচ্ছা সত্যি করে বলতো তোর ব্রেইন কোথায় থাকে?
— তাহলে কেন করলেন এটা বলুন?
অরুর প্রশ্নের জবাবে ক্রীতিক রেগেমেগে বলে,—- আমি কি জানতাম ইডিয়েট?
ক্রীতিকের কথায় ঝাঁজিয়ে ওঠে অরু, কাঁদতে কাঁদতে আহত সুরে বললো,
—- বাচ্চাটা মনে হয়না আর টিকবে।
— টিকবে না মানে? এক্ষুনি ডক্টরের কাছে যাবো আমরা, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি, জাস্ট ফাইব মিনিটস বেইবি।

অরু হকচকিয়ে উঠে বললো,
— কিন্তু এখনো তো সকাল হয়নি, এই সময় ডক্টর কোথায়?
অরুর বাক্যটুকু শেষ হওয়ার আগেই ক্রীতিক ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে গম্ভীর গলায় জবাব দিলো,
—- সেটা তোর না ভাবলেও চলবে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আজ সবার প্রথমে ডাইনিং এ হাজির হয় সায়র আর নীলিমা। সায়র আগে আগে ছিল আর নীলিমা পেছনে। ও যখন হাই তুলতে তুলতে ডাইনিং এর দিকে এগোচ্ছিল, ঠিক তখনই নজরে পরে ক্রীতিক আর অরুকে। সাধারণত ভ্যাকেশনে আসার পর থেকে ক্রীতিক আর অরুই একমাত্র জুটি যারা সবার শেষে ডাইনিং এ হাজির হতো। ক্রীতিক নিজে বেলা করে ঘুমাতো দেখে, অরুকেও জোরজবরদস্তি করে নিজের কাছে আটকে রাখতো। অথচ আজ সূর্য একেবারে পশ্চিম আকাশে উদয় হওয়ার মতোই অরু ক্রীতিক সবার আগে ডাইনিং এ। শুধু ডাইনিং এ বললে ভুল হবে, অরুকে পাশে বসিয়ে রেখে ক্রীতিক নিজ হাতে ফ্রুটস খাওয়াচ্ছে ওকে, ব্যাপারটা পুরোপুরি সন্দেহজনক। তাই ডাইনিং এ এসে বসতে বসতে সায়র শুধালো ,
—- সূর্য আজ কোন আকাশে উদয় হলো জেকে? কাল রাতেই দেখলাম বউ কে ধমকাচ্ছিস, আর এখন পাশে বসিয়ে ফ্রুটস খাওয়াচ্ছিস? বাহ বাহ।
সায়রের কথার বিপরীতে ওর দিকে গরম চাহনি নিক্ষেপ করে, ক্রীতিক ক্ষুব্ধ গলায় বলে,— শাট আপ, শী ইজ প্রেগন্যান্ট উইথ মাই বেইবি, ইডিয়েট।

ক্রীতিকের কথায় শুনশান নীরবতায় ছেয়ে গেলো পুরো লিভিং রুম, কারও মুখে কোনো রা নেই, কেবলই চামচ নাড়ার টুংটাং আওয়াজ। এমতাবস্থায় ফট করেই অরুর নিকট এগিয়ে গিয়ে নীলিমা বেকুবের মতো বলে ওঠে ,

—- কিরে অরু, তুই না বলেছিলি ক্রীতিক ভাইয়া বাচ্চা নিতে মোটেই ইচ্ছুক নয় তাহলে হলো টা কি করে?

অরু গাল ভর্তি ফ্রুটস চিবুতে চিবুতে জবাব দিলো,

— ভুল করে।

অরু কথাটা বলতেই ঠোঁট টিপে কৌতুক মিশ্রিত হাসি হাসলো সায়র, হাসতে হাসতে ক্রীতিককে উদ্দেশ্য করে সায়র বললো,— তুই আজকাল এসবেও ভুল করিস ভাই?

ক্রীতিক জবাব দিলো না, উল্টো নিজের মাথামোটা বউটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। অরু পাপ্পি আইস করে তাকিয়ে আছে ক্রীতিকের পানে, যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেনা সে। সায়র ক্রীতিককে খোঁচা মে'রে আরও দু'একটা কথা শোনাবে, তার আগেই ওদের মাঝে আগমন ঘটে অর্ণব আর এলিসার।

এলিসার কাঁধে ভর করে মুমূর্ষু রোগীর মতো হাটছে অর্ণব, ওকে এভাবে হাটতে দেখে সায়র উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে ওঠে,

—- কি হয়েছে তোর অর্ণব?

অর্ণব কিছু বললো না, এলিসা জবাব দিলো,

— কি জানি কি স্ট্রিট ফুড খেয়ে, ডিসিন্ট্রি বাঁধিয়েছে, কাল থেকে কতবার গিয়েছে তার হিসেব নেই, তাই রাতেই হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম।

পুনরায় প্রশ্ন ছুড়ে সায়র বলে,— কি বলিস , আমাদের কেন জানালি না? রাস্তা ঘাটে কোথাও কাজ সারেনি তো আবার?
অর্ণব দাঁত কটমটিয়ে সায়রের পানে অগ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো,
—- শালা বেশি কথা বলিস তুই।
অর্ণবের ঝাড়ি খেয়ে থামলো সায়র, এবার অর্ণবের চোখ গেলো ক্রীতিক আর অরুর দিকে, ওদের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা মাত্রই এলিসার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পরলো অর্ণব, ওকে দাঁড়িয়ে পরতে দেখে এলিসা ঠোঁট উল্টে শুধালো,
— কি ব্যাপার এতোক্ষণ তো হাঁটতেই পারছিলি না, এখন ওমন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পরলি যে, ক্লান্ত লাগছে না?
কাঁধ ঝেড়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে অর্ণব বললো,
— নাহ এখন ঠিক আছি, আয় জান তুই ও আমার পাশে এসে বস, কাল থেকে বড্ড খাটুনি গিয়েছে তোর।
সায়র খেতে খেতে অবাক দৃষ্টিতে অর্ণবকে পরখ করে বললো,—- কি অদ্ভুত ডিসিন্ড্রি রে বাবা, এইটুকুর মধ্যে সেরে গেলো?
সায়রের কথার জবাবে অর্ণব কথা ছুড়বে, তার আগেই অরুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পরলো ক্রীতিক।
সায়র ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রীতিকের পানে চেয়ে শুধালো,
— তুই আবার বউ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?
সায়রের কথার জবাব না দিয়ে, ক্রীতিক ওদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো,
— আমরা আগামী কাল তোদের সাথে ইউ এস এ ফিরছি না, ডক্টর অরুকে সম্পূর্ণ বেড রেস্টে থাকতে বলেছে, এই মূহুর্তে জার্নি করা পসিবল নয়। তাই আমরা আর কিছুদিন পরে ফিরবো।

কথা শেষ করে অরু সমেত রুমের দিকে পা বাড়ায় ক্রীতিক।
এদিকে সায়রের সব খটকা থেকেই যায়, ও খাবার চিবুতে চিবুতে একা একাই বিড়বিড়ায়,
— অদ্ভুত তো, আমার বউকে তো ডক্টর বেড রেস্টে থাকতে বললো না,অথচ ওর বউকে বললো। কালকেই গিয়ে ডক্টর ব্যাটাকে ধরতে হবে। বিগত দিন গুলোর কথা ভেবে আরও একবার প্রানোচ্ছ্বল হাসি হাসলো অরু। ঠিক সেসময় দরজার পাসওয়ার্ড খোলার পিক পিক আওয়াজ হলো নিচ তলা থেকে, বোধ হয় ক্রীতিক এসেছে,সেই ভেবে তাড়াহুড়ো করে আবারও কম্ফোর্টারের নিচে গিয়ে ঘুমের ভান ধরে পরে রইলো অরু।
উদ্দেশ্য একটাই, তার শক্ত চওড়া উষ্ণ বুকে মুখ লুকিয়ে একটু খানি আবেশিত ওম গ্রহন করা। তার মাতাল মাতাল স্যান্ডাল উড পারফিউমের গন্ধটা নিজের সর্বাঙ্গে ধারণ করা। এই ছোট্ট জীবনে প্রাপ্তির ঝুড়ি পরিপূর্ণ, আর কিইবা চাই?